বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ—প্রথমার্দ্ধ

ফাল্গুন, ১৩২৮ হইতে শ্রাবণ, ১৩২৯

সম্পাদক—

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

ও

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

প্রথম ষাণ্মাসিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী

ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ

১৩২৯

লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী

ফাল্গুন

চৈত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

বঙ্গবাণী

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

ফাল্গুন, ১৩২৮ [১ম সংখ্যা

বঙ্গবাণী

তুষার-ফলকে উষার আলোক, হিমাদ্রি-শিখর-ভাগে
চমকে, মৃদুল দীপনে তপ্ত কাঁচা কাঞ্চন-রাগে।
হীরক-কুচির রুচির দীপ্তি, ঝলকে ঝর্ণা 'পরে;
সানুর সোপানে অসীম সুষমা গলিয়া দুলিয়া ঝরে।
নেহারি সেথায়, বিহরে তোমার-ই উজল অঙ্গ খানি;
হসিত মাধুরী-ভূষিত নিত্য তুমি গো বঙ্গবাণী।

অরুণ-পরশে তরুণ পদ্ম, সরসী ভূষিয়া সাজে;
যেন সে কবির মানসে তোমার শোভন আসন রাজে।
ললিত বিলাসে লুলিত পবন, লহরী তুলিয়া জলে,
শিহরি' তোমার চরণ চুমিয়া, বিহরে সরোজ-দলে।
ছন্দ নাচিয়া বন্দে তোমায়,—প্রাচীর অঙ্ক-রাণী!
সঙ্গীত-রসে উৎসবময়ী, তুমি গো বঙ্গবাণী।

তপনে তপ্ত দীপ্ত দিবায় শব্দ-মুখর ভবে,
জাগ্রত তব গৌরব রাজে রৌদ্র-দলিত নভে।
কর্ম্মে ব্যগ্র দক্ষ হস্ত, নিযুত লক্ষ্য-ভেদে ;
শৌর্য্য প্রভাবে কঠোর বিঘ্ন গলিয়া পড়িছে স্বেদে।
সংগ্রাম, সদা বাড়ায় পরাণ, নব তরঙ্গ আনি'।
স্ফুরিত জীবনে তোমার-ই মহিমা, ওগো ও বঙ্গবাণী

সান্ধ্য আঁধারে শঙ্কর-পদে তাণ্ডব জাগে ঝড়ে ;
সিন্ধু মথিয়া আকুল ঊর্ম্মি অকূলে আছাড়ি' পড়ে।
অম্বর হ'তে দম্ভোলি ছোটে ডমরু-নিনাদে মাতি ;
বিশ্ব ধাঁধিয়া উল্লাসে দ্রুত, খর বিদ্যুৎ-ভাতি।
প্রলয়ে শাসিয়া বাজাও হাসিয়া অভয়-শঙ্খ, জানি।
মৃত্যু মাঝারে অমৃত-দায়িনী তুমি গো বঙ্গবাণী।

উষায়, নিশায়, আশা-নিরাশায়, সাধিব তোমার-ই প্রীতি ;
তোমার-ই প্রসাদে, বিশ্ব-বিষাদে বহিবে অমিয়া গীতি।
চন্দন সম গন্ধে ফুটিব. ক্ষয় করি মোরে ভবে ;
দুঃখ-বিনোদে, দুঃখে গলিয়া গাহিব করুণ রবে।
বিতরে নিত্য অমৃত সত্য, তোমার সঙ্গ, রাণী !
ঢাল গো ভূতলে আলোক, শান্তি, ওগো ও বঙ্গবাণী।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার যে আশার কথা কমলাকান্তি খেয়ালের ব্যাজে লিখিয়াছিলেন, তাহাই আজ আনন্দে স্মরণ করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আশার স্বপ্ন সফল করিয়া, বিদেশীয়েরা আমাদের দেশমাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে, ইউরোপে ও আমেরিকায় বঙ্গসাহিত্যের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা সারস্বতপীঠের উচ্চমঞ্চে বঙ্গবাণীর আসন পড়িয়াছে,—খাঁটি জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সাহিত্যের উদ্বোধন হইয়াছে।

নূতন যুগ আসিয়াছে; দেশে নূতন উৎসাহ ও নূতন উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। এটি ইতিহাসসিদ্ধ যে, নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার যুগে অনেক নূতন বিপদ আসিয়া উন্নতির বাধা হইয়া দাঁড়ায়; ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় সেই বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবুদ্ধির পরিচালনা না থাকিলে হিতৈষণার মোহ, কেবল অন্ধকার সৃষ্টি করে, ও উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহ সমাজে আত্মদ্রোহ ও আত্মহত্যা টানিয়া আনে। যাহারা কর্ম্মের নামে ব্যগ্র ও চঞ্চল, তাহারা চিন্তাশীলদিগকে অকর্ম্মা বলিয়া উপেক্ষা করিবেই, কিন্তু উৎসাহ-পীড়িত কর্ম্মীদলের নায়কদিগকে পরোক্ষভাবে নিয়মিত করিবার জন্য চিন্তাশীলদিগের অভিজ্ঞতার বাণী নিরন্তর প্রচার করিবার প্রয়োজন। আমরা এদিনে হিতৈষী মন্ত্র-দ্রষ্টাদের মন্ত্রণা ভিক্ষা করিতেছি।

সাহিত্য মানুষের খামখেয়ালিতে গড়া একটা নিরর্থক পুতুল নহে; সার্থক জীবনের সার্থক অভিব্যক্তিই সাহিত্য। প্রতি মানুষের জীবন যেমন একটী নির্দিষ্ট ভিটায় ভূমিষ্ঠ হইয়া পরিবার বা বংশ-বিশেষের বিশিষ্টতায় বাড়িয়া সামাজিকতার প্রসারে আপনাকে বহুদূরে প্রসারিত করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করে, সাহিত্যও সেইরূপ প্রদেশবিশেষে জন্মিয়া, যদি বিশ্বের সাহিত্যসমাজে প্রসার লাভ করিতে পারে,—সাহিত্য যদি বিশ্বজনীয়তায় ও বিশ্বজনীনতায় বাড়িতে পায়, তবেই সে সুসাহিত্য নামে পরিচিত হইতে পারে। ঋগ্বেদে যেখানে সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে বিশ্বের মঙ্গলসঙ্কল্পে ও সকল জীবনের মুক্তির কামনায় একসঙ্গে মিলিবার আহ্বান আছে, সেখানে সেই মিলনকে "সু-সহ" বলা হইয়াছে; এই 'সহ' বা মিলনের অবস্থাই হইল সাহিত্য; সায়ন ইহাকে ঠিক সাহিত্যই বলিয়াছেন; এই সাহিত্যকথা হইতেই সমাজে বহুলোকের রচনাসমষ্টির নাম হইয়াছে সাহিত্য। যে ঋষিবচনের উল্লেখ করিলাম, দেশের কল্যাণ কামনায় সেই পবিত্র ঋক্‌টি উচ্চারণ করিতেছি :—

সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানম্ অস্তু বঃ মনঃ যথা বঃ সুসহ অসতি॥

[হে ঋত্বিকগণ!] তোমাদের সকলের "আকূতি" বা সঙ্কল্প এক হউক, তোমাদের সকলের হৃদয় এক হউক, তোমাদের সকলের মন এক হউক, আর এইরূপে তোমাদের সকলের 'সু-সহ' অর্থাৎ (সায়নের ভাষায়) শোভন সাহিত্য বা সহযোগজাত মন্ত্র এক হউক।

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হ'তিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হ'ত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা ব'লে' তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠ্‌ত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কি বল্‌ত যে
ঝল্‌মলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তা'রা
নাচন দিত জুড়ি।

উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে'
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে'
কোথায় যেত ভেসে'।
সেই হ'ত তোর বাদল বেলার
রূপকথাটির মত;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত;
সেই আমারে বলে' যেত
কোথায় আলেখলতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা;
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে-উঠে' পাতা আমার
কাঁপত থরথর।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নাম্‌ত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে;

সেই হ'ত তোর কাঁদন সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হ'ত তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ দিনের ছড়া।
মা, তুই হ'তিস্ নীলবরনী,
আমি সবুজ কাঁচা;
তোর হ'ত, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।

তোর হ'ত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে' চাওয়া,
আমার হ'ত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে' গান গাওয়া।
তোর হ'ত, মা, চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হ'ত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পে অনধিকার *

আজ থেকে প্রায় ১৫ বৎসর আগে আমার গুরু আর আমি দুজনে মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-কোণে শিল্পের একটা খেলাঘর কল্পনা করেছিলেম। আজ এইখানে যাঁরা আমার গুরুজন ও নমস্য এবং যাঁরা আমার সুহৃদ এবং আদরণীয়, তাঁরা মিলে আমার কল্পনার জিনিষকে রূপ দিয়ে যথার্থই আমায় চিরদিনের মতো কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আমার কতকালের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে—আজ সন্ধ্যায়।

কেবল সেদিনের কল্পনার সঙ্গে আজকের সত্যিকার জিনিষটার মধ্যে একটি বিষয়ে অমিল দেখ্‌ছি—সেটা এই সভায় আমার স্থান নিয়ে। সেদিন ছিলেম আমি দর্শকের মধ্যে,—প্রদর্শক কিম্বা বক্তার আসনে নয়। তাই এক-একবার মনে হচ্ছে আজকেরটাই বুঝি দরিদ্রের স্বপ্নের মতো একটা ঘটনা—হঠাৎ মিলিয়ে যেতেও পারে।

কিন্তু স্বপ্নই হোক্ আর সত্যই হোক্, এরি আনন্দ আমাকে নূতন উৎসাহে দিনের পর দিন কাজ কর্‌তে চালিয়ে নেবে—যতক্ষণ আমার কাজ করার এবং বক্তৃতা দেবার শক্তি থাকবে।

যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখীর মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনা-লোকে ও বাস্তব-জগতে সুখে বিচরণ কর্‌তে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds (Millet).

Art has been pursuing the chimera attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation. (Bracquemont). আমাদেরও পণ্ডিতেরা artকে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বলেছেন; সুতরাং এই artকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে যে ধরে দিয়ে যাব এমন আশা আমি করিনে এবং আমাকে যিনি এখানে ডেকেছেন তিনিও করেন না। আমি ক-বছর নির্ব্বিবাদে art সম্বন্ধে যা খুসি, যখন খুসি, যেমন করে খুসি, যা-তা—অবিশ্যি যা জানি তা—বকে যেতে পারবো এই ভরসা পেয়েছি। আমার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার যথেষ্ট হলেই

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী প্রফেসররূপে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা।

তো হলনা, আরো পাঁচজন রয়েছেন—দেশের ও দশের কি হল?—এ প্রশ্ন তো উঠবে একদিন, তাই আমি এই কাজের দিকে দুপা এগোই, দশপা পিছোই আর ভাবি এই যে এতকাল ধরে নানা ছবি আঁকলেম, ছবি আঁকতে শিখিয়ে চল্লেম, স্কুল বসালেম এবং বারো-তেরো বছর ধরে কত exhibitionই দেখালেম লোক-সমাজে, এই যে নবচিত্রকলাপদ্ধতি বলে একটা অদ্ভুত জিনিষ, এই যে প্রাচীন ভারতচিত্র বলে একটা গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া গেল, আর আগেকার সাদা মাসিকপত্রগুলোকে সচিত্র, ছেলেদের বইগুলোকে রঙিন ছবিতে ভরিয়ে সমালোচকদের হাতে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" সমালোচনা গড়বার মহাস্ত্র আরও একটা বাড়িয়ে তোলা হল—এগুলো বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়া বলেই কি যথেষ্ট হল না? বিনামূল্যে, আনন্দে একটু দেওয়া, সেই তো ভাল দেওয়া। মূল্য নিয়ে ওজন করে যা দেওয়া, সেটা দোকানদারের ফাঁকি দিয়ে ভরা হলেই যে যথেষ্ট ভাল হয় তাতো নয়! তাই বলি—আমি বলে যাব, তোমরা শুনে যাবে; আমি ছবি লিখে যাব, তোমরা দেখে আনন্দ করবে অথবা সমালোচনা করবে; কিম্বা তোমরা লিখবে বলবে, আমি দেখব শুনব আনন্দ করব—আর যদি সমালোচনা করি তো মনে-মনে; এর চেয়ে বেশী আপাতত নাই হলো।

শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে নালমতিবিস্তরেণ। অতি-বিস্তরে যে অপর্য্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত! আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তার মস্ত, কিন্তু খেলে পেটটা মস্ত হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম। শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প, তা আমি যেমন জানি, এমন তো কেউ নয়। কাজেই অমৃত বণ্টনের ভার নিতে আমি একেবারেই নারাজ। আমার সাধ্য যা তাই দেবার হুকুম পেয়েছি। দিতে হবে যা আছে আমার সংগ্রহ করা,—শিল্পের ভাবনা-চিন্তা কাজকর্ম্ম সমস্তই—যা আমার মনোমত ও মনোগত। কারো মনোমত করে গড়া নয়, নিজের অভিমত জিনিষ গড়তেই আমি শিখেছি,—আর শিখেছি সেটাকে জোর করে কারু ঘাড়ে চাপাবার না চেষ্টা করতে। 'আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা'—শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে সব জিনিষের কৌশল আর রস চটপট্ আদায় করতে হবে; কিন্তু সেটা পরিবেষণ করবার বেলায় ভেবে-চিন্তে চল্‌বে। কেউ-কেউ ভয় করছেন, সুযোগ পেয়ে এইবার আমি নিজের এবং নিজের দলের শিল্পের একচোট বিজ্ঞাপন বিলি করে নেব। সেটা আমি বল্‌ছি মিথ্যে ভয়। শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্য্যন্ত রচনা করার অভিসন্ধি আমার নেই, কেন না আমিও একজন যাত্রী —যে চলেছে আপনার পথ আপনি খুঁজতে-খুঁজতে। এই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। শুধু যাঁরা এই শিল্পের পথে আমার অগ্রগামী, তাঁদেরই উপদেশ আমি সবাইকে স্মরণে রেখে চল্‌তে বলি—"ধীরে ধীরে পথ ধরো মুসাফির, সীড়ী হৈ অধবনী!"—দুর্গম সোপান, হে যাত্রী, ধীরে পা রাখ। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনের কথা যা শুনছি তার উত্তরে আমি বলি—ফুল যেমন তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নানাবর্ণে সাজিয়ে, বসন্তঋতু লটকে দিচ্ছে তার বিজ্ঞাপন

আকাশ বাতাস পৃথিবী ছেয়ে, তেমনি করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন সব কবি, শিল্পীই; আর তাই দেখে ও শুনে কেউ করছে উহু, কেউ উঁহু, কেউ আহা, কেউ বাহা! এটাতো প্রতি পলেই দেখছি, সুতরাং শিল্পের বিজ্ঞাপন দেব আমি আজকালের নূতন প্রথায় কেন? মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটলো, —এর বেশিও তো শিল্পীর দিক্ থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই; তবে কেন অধম শিল্পী হলেও আমি ছুটে মরবো যথা-তথা হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে? এ আশঙ্কার কারণ তো আমি বুঝিনে। মধুকর মধু নিয়ে তৃপ্ত হন; এতে ফুলের যতটুকু আনন্দ, তার চেয়ে শিল্পীর সজীব আত্মা সমজদার পেলে আর-একটু খানি আনন্দ বেশি পায় সত্য, কিন্তু সেটা তার উপরি-পাওনা—হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে। গোলাপ সৌরভ ছড়িয়ে রাঙা হয়ে ফুটলো, শিমুলও ফুটলো রাঙা হয়ে—খালি তুলোর বীজ ছড়াতে, কিন্তু রসিক যে, সে তো সেই দুই ফুলেরই ফোটার গৌরব দেখে খুসি হয়। এই ফোটার গৌরব দিয়ে ওস্তাদ যাঁরা, তাঁরা শিল্পীর কাজের তুলনা করে থাকেন—'দিবস চারকে সুরংগ ফুল ওহি লখ মনমে লাগল্ শূল'!—দুদণ্ডের জীবন ফুটলো, রসিকের এই দেখেই মন বলে—মরি মরি! এই খানেই শিল্পীতে আর কারিগরে তফাৎ; শিল্পের মধ্যে শিল্পীর মন ফুটন্ত হয়ে দেখা দিলে, আর কারিগরের গড়া অতি আশ্চর্য্য কাগজের ফুল ফুটন্ত ফুলকেও হার মানালে কিন্তু মনের রস সেটাকে সজীব করে দিলে না। জগতে কারিগরেরই বাহবা বেশি শিল্পীর চেয়ে, কেননা কারিগর বাহবা পেতেই গড়ে, শিল্পী গড়ে চলে নিজের কাজের সঙ্গে নিজকে ফুটতে বোধ করতে-করতে। এই কারণেই শিল্পচর্চ্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ, যেমন শিশুশিক্ষার গোড়াতে হচ্ছে শিশুবোধ।

রসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চ্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হতো, তবে সব কটা অলঙ্কার-শাস্ত্রের পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌঁছচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে। তেমনি মানুষের রসবোধ কি উপায়ে হয় কেমন করে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস-শাস্ত্রে তারি জল্পনা যেমন দেখি তেমনি এওতো দেখি যে রসশাস্ত্র নিংড়ে পান করেও কমই রসিক দেখা দিচ্চে। এই যে আলো-মাখা রামধনুকের রঙে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের অফুরন্ত রস, এ তো মাটি থেকে প্রস্তুত রঙের বাক্সয় ধরা পড়েনা, কালীর দোয়াতেও নয়, বীণার খোলটার মধ্যেও নয়। এ বাঁধা পড়ে মনে;—এই হলো সমস্ত রসশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ পাঠ। মৌচাক আর বোল্‌তার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্য্য ভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোলতায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না, কিম্বা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না —অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর, তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো! তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামিগ্রি, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়ত বা বেশী চমৎকার হলো কিন্তু রসিক দেখেন শুধু তো গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়লো কি না। এই বিচারেই

তাঁরা জয়মাল্য দেন শিল্পীকে, বাহবা দেন কারিগরকে। শিল্পীর কাজকে এই জন্যে বলা হয় নির্ম্মিতি অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে যেটি মিত হলেও অপরিমিত। আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্ম্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমাণের মধ্যে সেটি ধরা। একটা নির্ম্মাণের মতো ঠিক, আর-একটি নির্ম্মাণ-সম্ভব কিন্তু শিল্পীর নির্ম্মিতিকে কৌশলের কলে ফেলে বাইরের ধাঁচাটা নকল করে নিলেও ভিতরের রসের অভাব কিম্বা তারের বৈষম্য থাকবেই। এই জন্যেই শিল্পীর শিল্পকে বলা হয়েছে "অনন্যপরতন্ত্রা"। আমার শিল্প এক, আর তোমার শিল্প আর-এক, আমার দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য,—এ না হলে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকতনা; জগতে এক শিল্পী একটা-কিছু গড়তো, একটা-কিছু বলত বা গাইত আর সবাই তার নকলই নিয়ে চলত। রোমক শিল্প নকল নিয়েই চলেছিল—গ্রীক দেবতার মূর্ত্তিগুলির কারিগরিটার। রোম ভেবেছিল গ্রীক শিল্পের সঙ্গে সমান হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে, কিন্তু যেদিন একটি গ্রীক শিল্পীর নির্ম্মিতি মানুষের চোখে পড়লো সেই দিনই ধরা পড়ে গেল অতবড় রোমক শিল্পের ভিতরকার সমস্ত শুষ্কতা ও অসারতা। সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাণ্ড, অস্টাদশ পর্ব্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিম্বা নিজের কারিগরি কি কারদানিটাকে হিন্দু বা মোগল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের ও জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ করে কলাবৌটি সেজে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবে এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে সব শিল্পীর যাত্রাপথের আরম্ভে একটুখানি অথচ অতি ভয়ানক, অতি পুরাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার, চক্‌চকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম Tradition বা প্রথা। অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ; একে অতিক্রম করে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে, ডোববার আর ভয় থাকেনা। শিল্পলোকের যাত্রাপথে এই যে একটা মোহপাশ রয়েছে—চিরাগতপ্রথার অনুসরণ-প্রিয়তা, সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশস্ত্র বৈদিক ঋষিরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন—'মানুষের নির্ম্মিত এই সমস্ত খেলানার সামগ্রী, এই হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র—একে শিল্প বলা চলে না, এ তো দেব-শিল্পীর দ্বারায় করা হয়ে গেছে, মানুষের কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এ তো শুধু প্রতিকৃতি (নকল) করা হলো মাত্র! হে যজমান শিল্পী, দেবশিল্পীর পরে এলেম আমরা, সুতরাং আমাদের করাটা নামে মাত্র অনুকৃতি বলে ধরা যায়, কিন্তু আমাদের কাজে সৃষ্টির কৃতিত্ব যেখানে, সেখানে মানুষের শিল্পের সঙ্গে দেবশিল্পের রচনার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথাও নেই, শুধু সেটি পরে করা হয়েছে—অনুকৃত হয়েছে মাত্র—এই রহস্য জানো! এ যে জানে সকল শিল্পই তার অধিকারে আসে, শিল্প তার আত্মার সংস্কারসাধন করে, এই যে শিল্প, এমন যে শিল্পশস্ত্র, কেবল তারি দ্বারায় যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় করে যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করে এবং প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করে।'

যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তার চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্ব্বতশিখরকে ভাবছিল দুরারোহ, ভীষণ; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোনো প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিলনা; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মতো ঠেকছিল; সে চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠলো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে। শুধু এই নয়, ভয় দূরে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ তার এই দুদিনের খেলাঘরে অতি আশ্চর্য্য খেলা—কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করে দিলে। আগুনকে সে বরণ করে নিয়ে এলো নিজের ঘরে ঘুমন্ত দেশের রাজ-কন্যার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া তুলে! অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তার ঘরে বেজে উঠলো লোহার তার আশ্চর্য্য স্বরে, মাটির প্রদীপ জেলে দিলে নূতনতর তারার মালা; মানুষ সমস্ত জড়তার মধ্যে ডানা দিয়ে ছেড়ে দিলে;—আকাশ দিয়ে বাতাস-কেটে উড়ে চল্লো, সমুদ্রের পরপারে পাড়ি দিয়ে চল্লো—মানুষের মনোরথ, মনতরী—তার স্বপ্ন তার সৃষ্টির পসরা বয়ে। এই শিল্পকে জানা, মানুষের সব-চেয়ে যে বড়-শক্তি—সৃষ্টি-করার কৃতিত্ব, তাকেই জানা। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এতটুকু মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকতো যদি এই শিল্পকে সে লাভ না করত! শিল্পই তো তার অভেদ্য বর্ম্ম, এইতো তার সমস্ত নগ্নতার উপরে অপূর্ব্ব রাজবেশ! আত্মার গৌরবে আপনি সেজে নিজের প্রস্তুত-করা পথে সে চল্লো—স্বরচিত রচনার অর্ঘ বয়ে—মানুষ নিজেই যাঁর রচনা তাঁর দিকে! মানুষের গড়া আনন্দ সব তো এতেই শেষ! সে জানাতে পারলে আমি তোমার কৃতী সন্তান! শিল্পের সাধনা মানুষ করেই চল্লো পৃথিবীতে এসে অবধি, তবেই তো সে নানাকৌশলে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলে; সাত-সমুদ্র তের-নদী, এমন কি চন্দ্রলোক সূর্য্যলোকের ঊর্দ্ধেও তার শরীর ও মনের গতি, চলার সব বাধাকে অতিক্রম করে, কতক সমাধা হলো, কতক বা সমাধা হবার মতো হলো। সূর্য্যের মধ্যে ঝড় বইল, মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর সঙ্গে-সঙ্গে এসে পোঁছলো, নিহারিকার কোলে একটি নতুন তারা জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ সেটা চোখে দেখলে! এর চেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি হলো—মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রং, ছন্দ, সুর, গতি, মুক্তি সব দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে। এমন যে শিল্প, এত বড় যে শিল্প, তারই অধিকার ঋষিরা বলছেন নাও; আর আমরা বলছি না, না, ও পাগলামি-খেয়াল থাক, চাকরীর চেষ্টা করা যাক্, ওইটুকু হলেই আমরা খুসি। ঋষিরা বল্লেন—একি, একি তুচ্ছ চাওয়া?—নাল্পে সুখমস্তি! আমরা বল্লুম—অল্পেই আমি খুসি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বতন যাঁরা, তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো যা-তা যেমন-তেমন নয়। শিল্পলক্ষ্মীর কাছে তাঁদের চাওয়া বাদসার মতো চাওয়া—একেবারে ঢাকাই মস্‌লীন, তাজমহলের ফরমাস; জগতের মধ্যে দুর্ল্লভ যা, তারই আবদার! বৌদ্ধ-ভিক্ষু, তাঁরা থাকবেন; শুধু পাহাড়ের গুহা মনঃপুত হলো না, তাদের জন্যে রচনা হয়ে গেল অজন্তাবিহার—শিল্পের এক অদ্ভুত সৃষ্টি—ভিক্ষুরা যেখানে জন্তুর মতো গুহাবাস করবেন না, নরদেবের মতো বিহার করবেন!

রমণীর শিরোমণি তাজ, দুনিয়ার মালিক সাহাজাহান তার স্বামী, সোহাগ-সম্পদ সে কি না

পেয়েছিল, কিন্তু তাতেও তো সে তৃপ্ত হলোনা, সাহাজাহানের অন্তরে ছিল যে শিল্প, তারই শেষ দান সে চেয়ে নিলে—দুজনের জন্যে একটি মাত্র কবর, যার মধ্যে দুজনে বেঁচে থাকবে এমন কবর যার জোড়া ত্রিভুবনে নেই। একেই বলে চাওয়ার মত চাওয়া, দেওয়ার মতো দেওয়া। কোনো শিল্প নেই, কোনো রস নেই—এটা সেকালের লোক কল্পনা করতে পারেনি; তাদের শিল্পসামগ্রীগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু আজকালের-আমরা কি পেরেছি, এখনও পারছি, আমাদের ঘর-বার চারিদিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিল্পে অধিকার আমরা কি মুখের বক্তৃতায় পাব? মনের মধ্যে যে রয়েছে আমাদের—যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা, কোনো-রকমে যা-তা করে লীলা সাঙ্গ করা! এভাবে চল্লে হাতের মুঠোয় কেউ শিল্পকে ধরে দিলেও তো আমরা সেটা পাবনা। খোঁজই নেই শিল্পের জন্যে, কোথা থেকে পাব সেটা!

কি দিয়ে ঘর সাজালেম, কি ভাবেই বা নিজে সাজলেম, আমোদই বা হলো কেমন, পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-বছরের জীবনটা কাটলই বা কেমন করে—এ খোঁজের তো প্রয়োজনই আছে বলে মনে করিনা; মনের মধ্যে যে লুকিয়ে রয়েছে যেমন-তেমন ভাব,—অল্পেই মন ভরে গেল যেমন-তেমনে! শুধু অল্প হলে তো কথা ছিলনা, সেটা বিশ্রী হবে কেন? মাসে বার-পঁচিশ বায়স্কোপ-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ এবং ফুটবলের ভিড়, ঘোড়দৌড়ের জুয়ো এবং দু'চারটে স্মৃতিসভার বার্ষিক-অধিবেশন ও যতটা পারা যায় বক্তৃতা—এই হলেই কি চুকে গেল সব ক্ষুধা, সব তৃষ্ণা? ধর ক্ষুধা মেটানো গেল—সোনালী গিল্টি-করা মার্বেল-মোড়া বৈদ্যুতিক-আলোতে ঝক্‌মক্ হোটেলের খানা-কামরায়, এবং তৃষ্ণাও মেটালেম মদের বোতলে; কিন্তু তারপর কি? মনের খোরাক যে মধু, মনকে তা দেওয়া হলনা—পেয়ালা ভরে! মন রইলো উপবাসে। দিনে-দিনে মন হতবল হতশ্রী হলো, স্ফূর্ত্তি হারালে। তারপর একদিন দেখলেম, আনন্দময়ের দান আনন্দ দেবার ক্ষমতা, আনন্দ পাবার ইচ্ছা—সবই হারিয়েছি; সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দবোধ—সবই আমাদের চলে গেছে। বাতাস যে কি বলছে তা বুঝতে পারছিনে, ফুলন্ত পৃথিবী কি সাজে যে সেজে দাঁড়াচ্ছে ঘরের সামনে তাও দেখতে পাচ্ছিনে। আকাশে আলো নেই, অন্তরে তেজ নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই, শুকনো জীবন ঝুঁকে রয়েছে—রসাতলের দিকে! এটা যে আমি কেবল অযথা বাকজাল বিস্তার করে ভয় দেখাচ্ছি তা নয়; এই ভয় সত্যিই এখন আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় করতেই হবে,—শিল্পের অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাবনা আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্য্যে কালে-কালে ভর্ত্তি হলো সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হাল-চাল দেখে কেউ কি বলবে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী, নিরানন্দ, অত্যন্ত অশোভনভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাত-জোড় ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্য্যের কণা দিয়ে গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী বলেই কি এগুলো আমাদের হলো? তাতো হতে পারে না। এই সব শিল্পের

নির্ম্মিতি, এদের নিজের বলবার অধিকার অর্জ্জন করবো শুধু সেইদিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করবো, তার পূর্ব্বে তো নয়। শিল্প যেদিন আমাদের হবে, সেদিন জগৎ বলবে এসবই তো তোমাদের! —আমাদের শিল্পও তোমাদের! আমাদের দেশের রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। আমার দেশ বলে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হতেও পারে কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমাদের দাবি যে গ্রাহ্য হবে না, সেটা ঠিক। তা যদি হতো তবে কালাপাহাড় থাকলে, সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবি দিতে পারত; কেন না কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী এবং আমাদেরই মত ভাঙতে পটু, গড়তে একবারেই অক্ষম; শুধু কালাপাহাড় ভেঙে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙচি বিরাগে—এই মাত্র তফাৎ। কাব্যকলা, শিল্পকলা, গীতকলা—এ সবাইকে 'রসরুচিরা' বলে কবিরা বর্ণন করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী—আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে ত তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরা সঙ্গিনী সবই। আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং সেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাইনে, রস পাইনে, পাবার চেষ্টাও করিনে, তাদের কাছ থেকে শিল্প দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য্য কি? অলসস্য কুতো শিল্পং অসিল্পস্য কুতোধনং!

নিজের শিল্প থেকে ভারতবাসী হলেও আমরা কতখানি দূরে সরে পড়েছি এবং বিদেশী হলেও তারা এই ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছে তার দুটো-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষ-বার এদেশে এলেন, শঙ্কট রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চ্চা, রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। সেই বিদেশী ভারতবর্ষের একটি তীর্থ দেখতে এসেছেন—দূর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে একবার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরটা কেমন শিল্পকার্য্য দিয়ে সাজানো দেখে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা, আর সেই কোণার্ক মন্দির যার প্রত্যেক পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দেখে নেবার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখলেম। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী-ভাইকে; কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না, ভারতের বড়লাটকে পর্য্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে! তাকে কি ভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে-শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেল। চুপি-চুপি পরামর্শটা হলো বটে কিন্তু বন্ধু গেলেন জগবন্ধুর দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো। এইটেই ছিল বিশ্বশিল্পীর মনোগত;—শিল্পী বিদেশী হলেও তার যেন গতিরোধ না হয় দর্শনের দিনে। দ্বার খুলে গেল, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হলো, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে-গড়া দেব-মন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্য্যন্ত। এই পরমানন্দের প্রসাদ পেয়ে বন্ধু দেশে চল্লেন অক্ষত শরীরে। তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ-কথা

আমার এখনো মনে আছে—ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এইতো গেল শিল্পের যথার্থ অনুরাগী অথচ বিদেশীর ইতিহাস। এইবার স্বদেশী অথচ বিরাগীর কথাটা বলি। ঐ জগন্নাথের মাসির বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করতে হবে। একটা কমিটি করে খানিকটা টাকা তোলা হয়েছে; এস্‌টিমেট বক্তৃতা ইত্যাদি হয়ে ঠিক হয়েছে—অনেক কালের পুরোনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ কারুকার্য্য-করা পাথরের বড় বারাণ্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটুখানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে আর যার নানা ফাটলের শূন্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে—বনলতার সবুজে আর সোনায়, সেই পুরোনোটাকে আরো-পুরোনো আরো-মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার কতকালেরলেখা শঙ্খলতার পাড়, হংসমিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্‌পনা নক্সাখোদকারি কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগায় যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা! গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম মন্দির সংস্কার হচ্ছে, মাসির বাড়িতে প্রাচীন মূর্ত্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি-চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, চুড়োর সিংহি উল্টে পড়েছে ভূঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিৎ শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে; সব ওলট-পালট, তছনছ! কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হলো। চরকে শুধোলেম—এই সব পাথরের কাজ ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়? চরের কথার ভাবে বুঝলেম এই সব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে—এমন লোক নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার! ভাঙা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নাল হরিণ চারচোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো! কত কালের পোষা হরিণ, এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে,—এদের কি হবে? শুধিয়ে জানলেম এদের বিক্রি করা হবে, আর এদের সঙ্গে-সঙ্গে যে বাগিচা বড় হতে-হতে প্রায় বন হয়ে উঠেছে—বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে, পাখী যেখানে গাইছে, হরিণ যেখানে খেলছে, সেই বনফুলের পরিমলে ভরা পুরোনো বাগিচাটা চষে ফেলে যাত্রীদের জন্যে রন্ধনশালা বসানো হবে। আমার যন্ত্রণা-ভোগের তখনও শেষ হয় নি তাই একটা ডবল তালা-দেওয়া ঘর দেখিয়ে বল্লেম—এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে-আস্তে ঘরটা খুল্লে, দেখলেম মিণ্টন আর বরণ কোম্পানির টালি দিয়ে অতবড় ঘরখানা বোঝাই করা। ভাণ্ডার মধ্যে—ধ্বংশের স্তূপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মতো, বাসা বেঁধে ছিল;—সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না আমাদের, ভাল ঠেকল দুখানা চক্‌চকে রাঙা মাটির টালি।

শিল্পে অধিকার জন্মালোনা, চুপ করে বসে থাকা গেল—ঘেঁটে-ঘুঁটে যা পেলেম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো শিল্পসংস্কার করতে হবে, কিম্বা দ্বিতীয়-একটা অজন্তা-বিহার কিম্বা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে

উঠলো, অমনি লাঠিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁবোঁ-শব্দে শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুস্কিল ! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা অনাদরে পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুস্কিল তখন ! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না ! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্প-জ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ওনা, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে,—স্নেহেভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্ করে ! একেই বলে inspiration। Inspiration কি অমনি আসে ? অর্জ্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই ! আমাকে প্রত্যয় না হয় তো এখনকার ইউরোপের মহাশিল্পী রোদাঁ কি বলেছেন দেখ—

"Inspiration ! ah that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination : it will drive him one night to make a masterpiece staight off because it is generally at night that these things occur, I do not know why... Craftsmanship is every thing ; craftsmanship shows thoughtful work, all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art !"

কিছু অর্জ্জন নেই, inspiration এলো—গড়তে গেলেম তাজ, হয়ে উঠলো গম্বুজ ; গড়তে গেলেম মন্দির হয়ে পড়ল ইষ্টিসান বা ছিষ্টিছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু ! Inspirationএর খেয়াল ছোট বয়েসে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে।

শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জ্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে-আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না ; কেননা শিল্প হলেন 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। বিধাতারও নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে ! নিজের নিয়মে যে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।

চুলোয় যাক্‌গে inspiration ! সাধনা, অর্জ্জনা, ওসবে কি দরকার ? টাকা ঢাল্লে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না ? কেনো ছবি, মূর্ত্তি ; বসাও মিউজিয়াম ; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার ; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক্ ডিপ্লোমা ; library হোক্ রসশাস্ত্রের ; স্কুল হোক—সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি, খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে ; লিখতে লেগে যাক্ বড়-বড় থিসিস্ শিল্পের উপরে ; ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরেজিতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে পর্য্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সুড় করে আপনি আসবে ! হায়, যে-শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যিই ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে ?—হুজুরের তলব মজুরের উপরে ? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাইরে জুতো রেখে, দুহাতে সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে ?

আমেরিকা তার কুবের-ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী নূতন-পুরাতন সমস্তই আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল—নিজের বাসায়। সেখানে সংগ্রহের বিরাট্ আয়োজন, চর্চ্চারও বিরাট-বিরাট বন্দোবস্ত, হাঁকডাকও বিরাট; কিন্তু সেখানে কল হলো, কারখানা হলো, আকাশ-প্রমাণ সব বাড়ি, যোজনপ্রমাণ সব সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেল্লে নায়াগ্রা নির্ঝর; কিন্তু সেই আয়োজনের পাহাড় এত উঁচু হয়েছে যে তার ওপারে কোথায় যে শিল্পীর আনন্দের নির্ঝর ঝর্‌ছে তা জানাই মুস্কিল হয়েছে তাদের—যারা আয়োজন করলে এত করে শিল্পকে জানতে! একথা আমার এক আমেরিকান বন্ধু জানিয়ে গেছেন—আমি বলছিনে।

আমি যখন আমার মনকে শুধাই—এই এত আয়োজন, এই ছবি, মূর্ত্তির সংগ্রহ, এই লেক্‌চার হল, শেখবার studio, পড়বার লাইব্রেরি, এর প্রয়োজন কোন্ খানটায়? কেনই বা এসব? মন আমার এক উত্তরই দেয়—হয়তো কোথাও একটি আর্টিষ্ট পরমানন্দের একটি কণা নিয়ে আমাদের মধ্যে বসে আছে, অথবা আসছে, কি আসবে কোনো দিন—সুন্দর যে ভাবে এসে অতিথি হয়, বিচিত্র রস বিচিত্র রূপ আর গান নিয়ে, ষড়্‌ঋতুর মধ্যে দিয়ে—তারি জন্যে এই আয়োজন, এত চেস্টা।

যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চল্লো—কবে মেঘের-কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন সহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্যে থেকেই আনন্দ পাবেন বলে। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে-পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস, এক মাইলোস্, এক রেঁাদা, এক মেস্ট্রোভিফ্ ব্রেজেস্কা এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগল-বাদশার রত্নভাণ্ডারে তিন পুরুষ ধরে জমা হতে লাগলো মণি-মাণিক্য সোনারূপো—এক রাজশিল্পীর ময়ূরসিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্ম্মিতি দেবে বলে! তেমনি এই যে আমরাও আয়োজন করছি, চেস্টা করছি; শিল্পের পাঠশাল, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলাভবন—এটা-ওটা বসাচ্ছি সব সেই একটি আর্টিস্টের একটি রসিকের জন্য—যে হয়তো এসেছে কিম্বা হয়তো আসবে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপরাজিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎ

সে আমার জীবনের কতখানি স্থান কেমন করিয়া পূর্ণ করিয়াছিল ও আছে তাহা তাহার সেই পলায়নের দিন হইতে প্রতিদিন নানারূপে, নানাকাজে, নানাবিষয়ে অনুভব করিতেছি ; আর বেদনা পাইতেছি। তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ—সে যেন সে দিনের কথা। দিনে—সপ্তাহে—মাসে—বৎসরে কালের পরিমাণ হয় না। সুখের দিন স্বল্পায়ু—দুঃখের দিন দীর্ঘ। আমারও সুখের সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গিয়াছে,—কবে আসিয়া কবে চলিয়া গিয়াছিল বুঝিতেও পারি নাই ; সুখের স্বাদ ভাল করিয়া লইতেই পারি নাই। তাহার পর এই দুঃখের দিন—অতি দীর্ঘ। এখন এই দীর্ঘ দিন কাটাইতেছি ; উৎসাহ-উদ্যম-উল্লাস-উদ্দেশ্য সব হারাইয়া, জীবন ভারমাত্র করিয়া সেই দুর্ব্বহ ভার বহিয়া দীর্ঘপথ চলিতেছি। এ পথের শেষ কোথায় ?

আমি শ্রীনিশীথ রায়, যে বন্ধন মানুষের থাকিবেই, কেবল সেই বন্ধন লইয়া সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমার বন্ধনে বাহুল্যের লেশমাত্র ছিল না। পিতা ও মাতা ব্যতীত সংসারে আমার আর কেহ ছিলেন না। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লইয়া মনান্তরের ফলে বাবা যৌবনে তাঁহার স্বজনদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ এমত ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন যে, আমি আর তাঁহাদের পরিচয়ও পাই নাই ; মাও তাঁহাদের পরিচয় জানিতেন না। আপনার প্রাপ্যের একাংশ হইতে অন্যায়রূপে বঞ্চিত হওয়ায় বাবা পৈত্রিক সম্পত্তির সকল অংশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় দারুণ দারিদ্র্যে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া সংসারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইয়া তিনি যখন জয়ের ফল সম্ভোগ করিবেন মনে করিতেছিলেন, সেই সময় সংগ্রাম-শ্রান্তি লইয়াই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন আমি মা'র কাছেই পিতামাতার স্নেহ ও যত্নলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। সংসারে আমার আর কেহ ছিলেন না। তাহার পর আমি যে বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কি করিব ভাবিতেছিলাম,—অথচ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, সেই বৎসর মা'র মৃত্যু হইল,—আমি একেবারে নির্ব্বন্ধন হইলাম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মা আমার জন্য বন্ধনের সন্ধান করিতেছিলেন এবং ঘটকীরা তাঁহার আঁধার ঘর আলো করিবার জন্য "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" কনের—ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা কাটা পরীর—সন্ধান

দিতেছিল। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে যাহাদের সন্ধান দিতেছিল, তাহাদের একটিকেও ঘরে আনিবার পূর্ব্বে মা চলিয়া গেলেন। বিবাহ করিব না, এমন অকারণ কঠোর সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পের ভাণ কোন দিন করি নাই। কিন্তু মা'র মৃত্যুতে বিবাহ-চেষ্টা শেষ হইল। কেবল যে আপনার বিবাহের উদ্যোগ আপনি করা লজ্জাজনক বোধে সে চেষ্টা ত্যাগ করিলাম, তাহাই নহে। প্রথমতঃ, সংসারে যে মা ছাড়া আমার আর কেহ ছিলেন না, তাঁহার মৃত্যুতে লোকাচার পালন করিব, স্থির করিলাম,—এক বৎসর কালাশৌচ পালন করিব। দ্বিতীয়তঃ, মনে করিলাম, বিবাহ করিয়া আমার গৃহে স্ত্রীকে আনিব কেমন করিয়া? সংসারে যে দেখিবার কেহ নাই। তৃতীয়তঃ, সংসার যাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তিই দিতেছে, সে ইচ্ছা করিয়া সংসারের বন্ধনে বদ্ধ হয় কেন?

আমি গৃহের বাহিরে কাজ খুঁজিয়া লইলাম। সংসারে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে বাবা শেষে "কাজ পাগলা" হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই "কাজ পাগলামী" পাইয়াছিলাম। এ সংসারে কতক লোক প্রতিভাকে কাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে; তাহারা অলস,—মতলব করিতে পারে, মতলব হাসিল করিতে, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। আমি সে দলের লোক ছিলাম না। আমি কাজে সাফল্য লাভের জন্য যেরূপ ব্যস্ত হইতাম, বোধ হয় মধ্যাহ্ন-রৌদ্র-তপ্ত মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক জলের জন্য তত ব্যস্ত হয় না। দেহের আকাঙ্ক্ষার সীমা আছে—মনে আকাঙ্ক্ষা অসীম—অনন্ত। একটা সীমা অতিক্রম করিলে দেহের আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়,—মৃত্যু আসিয়া সব শেষ করিয়া দেয়; মনের আকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায়?

আমি যখন কাজের সন্ধান করিতেছিলাম, তখন দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা উঠিল। তখন জাতীয় শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা যাইত, তাহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা কিনা,—শিক্ষা কেবল দেশের লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে আমি বরাবরই মন দিতাম এবং প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজনও অনুভব করিতাম। আমার মত,—মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যই যখন শিক্ষার প্রয়োজন, তখন মানুষ যে সমাজে বাস করে তাহাকে সেই সমাজের উপযোগী করিয়া গঠিত করিবার কথা না ভাবিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিদ্যা যাহাতে ভারমাত্র না হইয়া জীবনের ও সমাজের কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ দেশে যে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিলাতী আদর্শে গঠিত,—বিলাতী। অথচ বিলাতের সমাজে আর এ দেশের সমাজে প্রভেদ পদে পদে সপ্রকাশ। সেই জন্য এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা অর্থার্জ্জনের উপায় মাত্র হইতেছে,—মানুষের জীবন উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছে না। বিশেষ ধর্ম্ম যে সমাজের লোকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব কাজ নিয়ন্ত্রিত করে, সে সমাজের লোকের পক্ষে ধর্ম্মহীন শিক্ষা কোন মতেই উপযোগী হইতে পারে না। এ সব মত আমি অনেক বিচার বিবেচনার পর স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। যে শিক্ষার ফলে আমি বিচারবুদ্ধি বিকাশের

সুযোগ পাইয়াছিলাম, যে শিক্ষার ফলে আমি প্রতীচীর জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলাম, সে শিক্ষাকে আমি নিষ্ফল বলিতে প্রস্তুত ছিলাম না ; আর যে বিশ্ববিদ্যালয় সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার উপাধি-পত্রকেও "চোতা কাগজ" বলিতে সম্মত ছিলাম না। তাই আমি জাতীয় শিক্ষার—সমাজোপযোগী শিক্ষার সমর্থক হইলেও কোনদিন শিক্ষাকে রাজনীতির আন্দোলনের বাহন করিতে চাই নাই ; কোন দিন সভা-সমিতিতে ছাত্রদিগকে নন্দদুলালের বংশীরবাকৃষ্টা গোপিকার মত সব ত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষদে আসিতে বলি নাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে সংস্কার সাধনের উপায় হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছিলাম।

তাই সেই পরিষদের কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিবার জন্য আমি কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিতেছিলাম।

পুরাতন—ভগ্ন—প্রোথিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষে যেমন সেকালের সভ্যতার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সহর হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামে তেমনই সেকালের বাঙ্গালার,—"সোণার বাঙ্গালার" —স্বরূপ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। আর কতদিন সে পরিচয় পাওয়া যাইবে জানি না ; কারণ, রেলপথ, ষ্টীমার, সংবাদপত্র, থানা ও আদালত সে বাঙ্গালার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া দিতেছে— বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। এ বাঙ্গালার সঙ্গে পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না— এবার হইয়াছিল। এ বাঙ্গালার অতিথি, অতিথি,—আপদ নহে ; অতিথি সৎকার আয়োজনবাহুল্যে বিরক্তিকর হয় না, পরন্তু আন্তরিক যত্নে মধুময় বোধ হয়। গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, বাগানে তরকারী, গাছে ফল, গোশালায় গাভী,—ইহাই গৃহস্থের লক্ষণ। সেই বাঙ্গালার আতিথ্য সম্ভোগ করিয়া আবার স্বার্থসঙ্ঘাতপূর্ণ সহরে ফিরিতেছিলাম—সেই বাঙ্গালার স্মৃতি লইয়া সেকালের বাঙ্গালার ছবি মনে আঁকিতে আঁকিতে যাত্রা করিয়াছিলাম।

যাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে সে সময় যাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—যাইলে পথে কষ্ট পাইব। কথাটা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; কারণ, জোয়ার ভাঁটার উপর যে মানুষের গতায়াত নির্ভর করে, এমন অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে আমার ছিল না। তাই গাছের পাতাগুলি প্রভাতের আলোকে উজ্জ্বল ও প্রভাতের বাতাসে চঞ্চল হইতে না হইতে আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। পথে আসিয়া নিষেধের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম—জোয়ারের জল না আসিলে নৌকা ভাসিবে না ; আমি একান্তই অসময়ে আসিয়াছি। শেষে যখন ষ্টীমারঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন একখানা ষ্টীমার চলিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী ষ্টীমারের জন্য আমাকে পাঁচ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। ষ্টীমারের ষ্টেশনঘর নদীর ধারে —গ্রামের পার্শ্বে—জঙ্গলের মধ্যে। ষ্টেশন-মাষ্টার তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ

করিতেছিলেন। নিকটে একখানা ছোট দোকান—ডাব, পান, সিগারেট প্রভৃতি বিক্রয় হয়। দোকানী শুইয়াছিল ; আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল ; বলিল, "বসিবেন ?" আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম—মাথা নত করিয়া ঢুকিতে হইল। তখন সে তামাক সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ব্রাহ্মণ ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, কিন্তু আমি তামাক খাই না।"—"ওঃ!" বলিয়া সে তাকের উপর হইতে সিগারেট বাহির করিল এবং আমি সিগারেটেরও ভক্ত নহি শুনিয়া বলিল, —"আজকাল বিড়ীরই চলন বটে। ভাল বিড়ীই আছে।" আমাকে যেরূপেই হউক ধূমপান করাইবার জন্য তাহার আগ্রহে আমার হাসি আসিল।

পাঁচ ছয় ঘণ্টা! কি করিব ? আমি উঠিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। আকাশভরা রৌদ্র। বেড়াইতে বেড়াইতে আমি তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিশ্বাসের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, জোয়ার ভাঁটা হইতেই আমাদের পঞ্জিকা দেখিয়া সব কাজ করা আরব্ধ হইয়াছিল। আমাদের দেশ নদীমাতৃক—পূর্ব্বে জলপথ ব্যতীত যাতায়াতের অন্য পথ প্রায় ছিল না ; কাজেই লোককে জোয়ার ভাঁটা বুঝিয়া গতায়াত করিতে হইত। কেবল তাহাই নহে ; অনেক স্থানে স্নানের জন্য, পানীয় জল সংগ্রহের জন্য, জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হয়। এ অবস্থায় লোক কি জোয়ার ভাঁটার তিথির অধীনতা অস্বীকার করিতে পারে ? যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল ; এতদিন এ কথাটা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই! এ বিষয়ে কেহ গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ লিখে নাই।

আমি যে স্থানটায় বেড়াইতেছিলাম, তাহারই পার্শ্বে জমীতে একটা ফাটল দেখিতে দেখিতে বাড়িতেছিল। আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। সেটা আরও বাড়িয়া গেল এবং অনেকটা জমির মৃত্তিকা সহসা সশব্দে নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। সেই জমীতেই একটা খেজুর গাছ ছিল—সেটা হেলিয়া পড়িল। আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলাম ; দোকানী আমাকে একান্তই "সহুরে" ঠাহরাইয়া দোকান হইতে ডাকিয়া বলিল, "বাবু, নদীর অত কাছে যাইবেন না—নদীর একূল ভাঙ্গিতেই আছে। কখন কোন জায়গাটা ভাঙ্গিবে, আপনারা ঠিক বুঝিতে পারেন না।"

আমি একটু সরিয়া গেলাম। পার্শ্বেই একটা কাঁটাঝোপে ফুল ফুটিয়া ছিল—ঠিক যেন মোমের ফুল ; ফুলের গর্ভের লাল রং ক্রমে ফিকা হইয়া পাপড়ীর আগায় সাদায় মিশাইয়া গিয়াছে। আমি এক গুচ্ছ ফুল তুলিয়া লইলাম।

তাহার পর পায় পায় আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রাম যেন সুপ্ত। অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই ; মধ্যাহ্নের রৌদ্রে চালের ও বাহিনের উপর লতাগুলি ম্লান দেখাইতেছে। তালগাছের উপর বসিয়া কাক ডাকাডাকি করিতেছে—আর সব পাখী গাছের ডালে ছায়ায় বসিয়া আছে। ঘরের পশ্চাতে বৃতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে আমি যে স্থানে উপনীত হইলাম সে স্থানে গ্রাম্য পথ একটা বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীটার একাংশ ইষ্টক নির্ম্মিত—জীর্ণ হইয়া

আসিয়াছে; আর কয়খানি খড়ে ছাওয়া ঘর; পশ্চাতে গোশালা ও খানিকটা খোলা উঠান।—বেড়া দিয়া ঘেরা। সেই উঠানে একটা গাব গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া একটী গাভী অর্দ্ধমুদিতনেত্রে অলসভাবে বিচালী চর্ব্বণ করিতেছিল। সহসা গাভীটি সম্মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, এক কিশোরী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যে বয়সে কৈশোর-মুকুল যৌবন-পুষ্পে বিকশিত হয়, তাহার সেই বয়স। সে যেন স্বাস্থ্যের, সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের প্রতিমা। তাহাকে নিরাভরণা বলিলেই সঙ্গত হয়—কেবল প্রকোষ্ঠে কয়গাছি শঙ্খের চুড়ী—ব্যবহার হেতু হরিদ্রাভ; সেগুলির বর্ণ তাহার দেহের বর্ণের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে—সহসা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূতই হয় না। কিন্তু রূপে—লাবণ্যে—অবেণীবদ্ধ দীর্ঘ কেশজালে তাহাকে এমনই সালঙ্কারা মনে হয় যে, অলঙ্কারের অভাব মনে হয় না। কিশোরী অগ্রসর হইয়া আসিয়া গাভীটার গাত্রে করতল অর্পণ করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর এদিকে ওদিকে চাহিয়া—"আয়! আয়!" বলিয়া কাহাকে ডাকিল। সেই আহ্বানে খোপের মধ্য হইতে—কার্ণিসের নিম্ন হইতে কতকগুলি শ্বেতকায় পারাবত উড়িয়া আসিয়া ঘুরিয়া কেহ কিশোরীর মস্তকে, কেহ বাহুমূলে, কেহ বা পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। কিশোরী তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। তাহার আদরের ভাগ ইহারা লইতেছে দেখিয়া গবী ঈর্ষায় মাথা নাড়িয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল। তাহার ব্যবহারে কিশোরী হাসিয়া বলিল, "ছিঃ, কালিন্দী, তুমি এমন হিংসুটে!"

আমি দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

পারাবতগুলির গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কিশোরী একবার উপরের দিকে চাহিল। উজ্জ্বল আলোকে তাহার নয়নদ্বয়ে অশ্রু জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। তাহার পর চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে তাহার বক্ষের কম্পন লক্ষিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত দুঃখ ব্যতীত কেহ তেমন করিয়া কাঁদিতে পারে না—সে ক্রন্দন বুকভাঙ্গা বেদনার।

কিশোরীর এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ইহার তরুণ জীবনের রহস্য কে ভেদ করিতে পারে?

এ দিকে আমি প্রাঙ্গণের যে দিকে বৃতির পরপারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে একজন যুবকের আবির্ভাব হইল। সে কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কাঁদিতেছ?" তাহার কথায় কিশোরী যেন চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সব ঠিক করিয়াছ?" যুবক উত্তর দিল, "হাঁ।"

এই সময় যুবকের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—অপরাধী অপরাধ করিবার সময়েই ধরা পড়িলে তাহার অবস্থা যেমন হয় যুবকের অবস্থা তেমনই হইল। যুবকের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া কিশোরী ফিরিয়া দাঁড়াইল; ফিরিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। সেই কোমল—

স্নিগ্ধ—বিষণ্ণভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল ; সে যেন অনলশিখার মত উগ্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আমাকে তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?"

আমি কে ? আমি, শ্রীনিশীথ রায় ; পিতা, পরলোকগত নন্দগোপাল রায় ; জাতি, ব্রাহ্মণ ; পেশা—অজ্ঞাত, এই সত্য কথা বলিলে ত কুলায় না ! আমি যে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম ; কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "আমি পথিক।"

কিশোরী বলিল, "ভদ্রলোকের অন্দরবাড়ীর পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখা কি পথিকের কাজ ? আপনি কেমন ভদ্রলোক ?"

লজ্জায় আমি মুখ তুলিতে পারিতেছিলাম না। আমার জীবনে আমি কখনও এমন বিপন্ন হই নাই। এ বিদেশে এই অপরিচিতা কিশোরীর এই তিরস্কারের উত্তর দিবার ক্ষমতাও আমার নাই। সত্যইত আমি ভদ্রলোকের অন্তঃপুরের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছি। আমি তাহাতে দোষ বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু লোক তাহা বুঝিবে কি ? আমি বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। যে যুবককে লক্ষ্য করিয়াছিলাম সে আমার স্থানত্যাগের পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল।

আমি গ্রাম দেখার সাধ ত্যাগ করিয়া আবার নদীকূলে ফিরিয়া আসিলাম। কখন দোকানে বসিয়া—কখন নদীর ধারে বেড়াইয়া কি কষ্টে যে দীর্ঘ সময় কাটাইলাম, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কর্ম্মভোগও অদৃষ্টে থাকে ! সময় সময় দোকানীর সঙ্গে গল্প করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যে পথিক সিগারেটটি পর্য্যন্ত কিনিল না তাহার সহিত আলাপে দোকানীর আগ্রহ ছিল না। সে এক মাসের পুরাতন একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র লইয়া অত্যন্ত মনোযোগসহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিল—বোধ হয় প্রত্যেক কথা বানান করিয়া পড়িতে লাগিল।

দীর্ঘদিনও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। নদীর পরপারে পশ্চিম গগনে সূর্য্য রক্তাভ ও বৃহৎ দেখাইতে লাগিল। তখন জোয়ারের জলে নদী ভরিয়া উঠিয়াছে—নদীবক্ষে বহু নৌকা—উপরে পক্ষ সঞ্চালন শব্দে আকাশ মুখর করিয়া বলাকাশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে—পার্শ্বের প্রান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে বাবুই পাখী উড়িতেছে আর বসিতেছে। তাহার পর দিন শেষ হইল—'কুকা'র "কুব্—কুব্" রব সূর্য্যাস্ত ঘোষিত করিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—যেন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া যখন দূরে ষ্টীমারের বংশীরব শুনা গেল, তখন যে আনন্দ অনুভব করিলাম, বোধ হয় বন্দী তাহার মুক্তি সংবাদ পাইলেও সে আনন্দ অনুভব করে না। ষ্টেশন-মাষ্টার কালীমলিন কাচের চিমনি দেওয়া ল্যাম্পটি জ্বালিয়া টিকিট দিতে আরম্ভ করিলেন। টিকিট লইয়া যখন ষ্টীমারে উঠিলাম, তখন মনে হইল—এমন অভিজ্ঞতা যেন আর লাভ করিতে না হয়।

ষ্টীমার অল্পসময়ের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল—কেবল আগুপিছু করিয়া কূলে লগ্ন জেটীতে

ভিড়িতে কিছু বিলম্ব হইল। ষ্টীমার ঘাটের উপরেই রেলষ্টেশন—ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল। একটা কামরায় ব্যাগটি রাখিয়া অর্থাৎ স্থানটি দখল করিয়া আমি প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়াইতে লাগিলাম। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

ট্রেন ছাড়িবামাত্র একজন যুবক ব্যস্তভাবে একটি কামরা হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের যে দিকটা অন্ধকার, দ্রুতপদে সেই দিকে চলিয়া গেল। আমার মনে হইল, আমি যে যুবককে কিশোরীর সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম—এ সেই। আমি মনে মনে হাসিলাম—লোককে যেমন "ভূতে পায়" তাহারা কি আমাকে তেমনই "পাইয়াছে?" তাহারা অবশ্যই এ পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করে নাই।

ট্রেন চলিতে লাগিল। দীর্ঘদিনের শ্রান্তির ও বিভ্রাটের পর আমি গাড়ীর বেঞ্চে শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভারতে শাসনসংস্কার

পলাশীর যুদ্ধের ফলে, বাঙ্গলাদেশ ইংরাজের করতলগত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকসঙ্ঘ (East India Company) দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ পাইলেন। ইহাই ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। কিছুদিনের জন্য, নবাবের হাতে শাসনভার কতক পরিমাণে রাখা হইল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ দেওয়ানেরাই রাজা হইয়া বসিলেন। অন্যান্য প্রদেশেও যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ষড়যন্ত্রের ফলে, ইংরাজের আধিপত্য স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শাসনভার একজন গভর্ণর জেনেরাল ও তাঁহার পরিষদের চারিজন সভ্যের উপর ন্যস্ত হইল। স্থির হইল যে, এই পাঁচজনের মধ্যে অধিকাংশের যে মত সেই অনুসারে শাসন-কার্য্য চলিবে। কিন্তু অবিলম্বে দেখা গেল যে, এই ব্যবস্থাতে অনেক অসুবিধা হয়। সুতরাং গভর্ণর জেনেরালের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং অন্যান্য প্রদেশের শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান বিষয়ে তাঁহাকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম পিট যে আইন প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে কর্ম্মচারীনিয়োগ ব্যতীত শাসনসম্পর্কীয় অন্য সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন করিবার জন্য ইংলণ্ডে একটী তত্ত্বাবধায়ক সমিতি (Board of Control) স্থাপিত হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য ও রাজত্ব উভয়বিধ কার্য্য করিতেন।

এই সময়ে তাঁহাদের বাণিজ্য-অধিকার শেষ হইল, এবং তাঁহারা কেবল শাসক-সম্প্রদায় হইলেন। আরও একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীভূত শাসন-প্রণালী আরম্ভ হইল। সপরিষদ গভর্ণরজেনেরালের উপর নিখিল ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা খর্ব্ব হইল, এবং বাঙ্গলা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের জন্য দুই জন গভর্ণরের ব্যবস্থা হইল। অনেক দিন হইতেই ভারত-গভর্ণমেণ্ট শাসন বিষয়ে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এখন তাঁহারা সমস্ত ভারতের আইন প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং যাহাতে আইন-প্রণয়ন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য একজন ব্যবস্থা-সদস্যের নিয়োগ হইল।

আইন-প্রণয়নের সুবিধার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনেরালের কাউন্সিলে ১০ জন অতিরিক্ত সরকারি সভ্য-নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

যখন সিপাহী বিদ্রোহ সমস্ত ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত করিতে উদ্যোগ করিল, তখন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিলেন যে, কোম্পানীর শাসন ঠিক চলিতেছেনা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট বণিকসঙ্ঘের হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইয়া উহা রাজকরে অর্পণ করিলেন। বিলাত হইতে এই শাসনকার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন ভারতসচিব নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটী ভারতপরিষৎ (Council of India) গঠিত হইল। এই পরিষদের অধিকাংশ সভ্য ভারতফেরত কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহাই স্থির হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত ক্ষমতা সপরিষদ ভারত সচিবের উপর প্রদত্ত হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারি সভ্য নিয়োগের প্রথা আরম্ভ হইল। প্রাদেশিক গভর্ণরেরাও তাঁহাদের ব্যবস্থা-প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন, এবং ঐ সকল সভাতেও বে-সরকারি সভ্য নিযুক্ত হইতে লাগিল। দেশের লোকের মতামত জানিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে জনকয়েক ভারতবাসী সরকারকর্ত্তৃক মনোনীত হইতে লাগিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন প্রথার সূচনা হইল, এবং সভ্যগণকে শাসন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার দেওয়া হইল। সুবিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ জন মর্লি মহোদয় যখন ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তিনি ভারতের শাসন-সংস্কার আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। ভারত-সচিবের পরিষদে দুইজন ভারতবাসী সভ্য নিযুক্ত হইলেন; এবং গভর্ণর-জেনেরালের ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের শাসন-পরিষদে এক একজন ভারতবাসী সভ্যনিয়োগের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থাপক সভাগুলিও পুনর্গঠিত হইল। প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা বাড়িল। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, এবং প্রাদেশিক সভাগুলিতে বে-সরকারি সভ্যের সংখ্যা সরকারি সভ্যের সংখ্যা হইতে অধিক করা হইল। সভ্যগণ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার পাইলেন, এবং বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার

বাড়াইয়া দেওয়া হইল। দেশের লোক এই সংস্কারে সন্তুষ্ট হইলেন না, এবং রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতে থাকিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে জাতীয় মহাসমিতি স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করিলেন। ইংরাজ-সরকার দেখিলেন যে আর কিছু না করিলে চলে না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব মান্যবর মণ্টেগু, সম্রাটের পক্ষ হইতে ভারত-শাসন বিষয়ে পার্লামেণ্টে একটী ঘোষণা পত্র পাঠ করিলেন, এবং কিছুদিন পরে তিনি নিজে এদেশে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করিয়া, লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহযোগে একখানি রিপোর্ট লিখিলেন। এই রিপোর্টের ফলে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ভারতশাসনবিধি লিপিবদ্ধ হইল।

যখন ইংরাজ-বণিক-সঙ্ঘ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বণিক-কর্ম্মচারীরাই দেশের শাসক ও বিচারক হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও শাসন-পরিষদের সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উচ্চপদেই এই কর্ম্মচারিগণ অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভারতবাসীরা সামান্য বেতনে নিম্নপদগুলি আশ্রয় করিয়া রহিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট হইতে এই আদেশ হয় যে, কেবল যোগ্যতানুসারে ও জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, কর্ম্মচারি-নিয়োগ হইবে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর, সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণাপত্রে এই আদেশের পুনঃ প্রচার করেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ (Board of Directors) কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করিতেন। এই সময় হইতে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত হইল।

মণ্টেগু-সংস্কার-বিধি-প্রণয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতের শাসনপ্রণালী বিদেশী কর্ম্মচারিতন্ত্র (Foreign Bureaucracy) ছিল। সত্য বটে, ব্যবস্থাপক সভার ক্রমবিকাশে কর্ম্মচারিগণের ক্ষমতা কতক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল; নির্ব্বাচিত সভ্যগণের প্রভাব (influence) ক্রমশঃ বাড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকারের কর্ত্তৃত্ব (power) পান নাই। নূতন সংস্কার-বিধিতে এই প্রণালীর কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সংস্কারের দোষগুণ আমাদের বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানি উপন্যাস

(১)

মেশের বাসায়
পাশের পড়া—
রঙীন্ আশায়
কাশ্‌ল্ গড়া!
পাশের বাড়ীর
জান্‌লা খোলা,—
আঁচল শাড়ীর,
কেশের দোলা—
মিষ্টি মুখের
একটু হাসি—
গভীর সুখের
ছন্দরাশি!

(২)

দৃষ্টি উদাস
আবছা দেখা—
শুধুই হুতাশ
ভাগ্যে লেখা!
কেতাব বন্ধ,
পড়ায় ছাই!
কেশের গন্ধ—
পাই, না-পাই!
গেজেট খুলি,
নাইকো নাম!
আসল ভুলি,—
—প্রেমের দাম।

(৩)

সাম্‌নে বাড়ীর
বিরাট ধূম—
বাজনা-গাড়ীর
দো-দুম্-দুম্!
সাঁজের বেলায়
খ্রোনের পর—
ভিড়ের মেলায়
আস্‌ল বর!
বাজ্‌ছে শাঁক,
বাজ্ শানাই!
বেজায় হাঁক
—"রামকানাই —!"

(৪)

রোশনি-রূপ,
রূপ-সাগর!
গেলি সে চুপ।
বাসর ঘর,—
ঝুমুর ঝুম্
বাজ্‌ছে মল—
নাইকো ঘুম,
সুর পাগল!
"গাও গো বর,
চাঁও কনে—"
—প্রাণ পাথর—
বাজ মনে!

* * * *

হোথা সুরবাহার
পুর মাতায়—
হেথা, বুক আঁধার—
হায়রে, হায়!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

পত্রালী

৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আসন আমাদের দেশে কত উচ্চে আমরা তাহা জানি। এই মহাত্মা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়কে সময় সময় যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহার কয়েকখানি মুদ্রিত করিবার অধিকার পাইয়া আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। পত্রগুলির অল্পকথার মধ্য দিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র জীবনের ছবি অনেক স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিগুলি মানুষে ছাপাইবার জন্য লিখে না, সরল আন্তরিকতাতেই লিখিয়া থাকে—সেই জন্য ক্ষুদ্র চিঠিগুলি একজনের জীবনের প্রাকৃত চিত্র অঙ্কনে বড় উপযোগী।

(১)

১৮৯৮।

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। আপনি ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ সুখই লাভ করিবেন। ফলতঃ ইহলোকের কর্ত্তব্যসাধন পারমার্থিক সুখলাভের বিরোধী নহে, পরন্তু উপযোগীই বটে। গীতাতে কথিত হইয়াছে ঃ—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ ॥

(২)

১৮৯৮।

বিষয়বাসনা চিত্তে উদয় হয় বলিয়া আপনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সংসারে আমরা কেহই একেবারে নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিতে আসি নাই এবং সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিতে পারি না। তবে ... যাহার হৃদয়ে বিষয়চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিষ্ফলতা এবং ভগবৎচিন্তার উদয় হয় সেই যথার্থ সাধু এবং তাহার শান্তিলাভ অচিরে ঘটিবে। ......

সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ কি নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের মীমাংসার উপর বেশী কিছু আসে যায় কি? যাহার যে ভাব লাগে, তাহার সেই ভাবের উপাসনাই বোধ হয় যথেষ্ঠ। এ বিষয়ে গীতার ১২ অধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অধিক কিছু বলা যায় না।

(৩)

১৯০২।

... ... আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ... ... বিজয়ার উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে সময় যাইতেছে ও শেষ সময় নিকট হইয়া আসিতেছে এই চিন্তা অবশ্য চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে আইসে। তবে ভাবিয়া দেখিলে ইহা নিরানন্দের কারণ মনে করা উচিত নহে। এখানকার লীলাখেলা ফুরাইলে ঘরের ছেলে ঘরে যাইবে, আনন্দময়ী মাতার নিকট পৌঁছিবে, ও গুণই হউক আর নির্গুণই হউক তিনি স্নেহভরে কোলে লইবেন। তবে এ কথাটী সকল সময়ে মনে থাকে না।

বর্ত্তমান সমস্যা

সেদিন রেলগাড়িতে এদেশে নবাগত এক ইয়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। বর্ত্তমানে এ দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে এ দেশের মিসনগুলির উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে তিনি আসিয়াছেন।

তাঁহার সহিত প্রথমে ভারতীয় মিসনগুলির সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হইল। নূতন ইংরাজী শিক্ষার পত্তনের সময় কিরূপে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত কি প্রকারে সে স্রোত ফিরিয়াছিল, সে সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তখন হিন্দু সমাজে আচারের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, আহারে বিহারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কত সঙ্কীর্ণ ছিল, এবং এই সকল কারণে কত শিক্ষিত লোক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা হইল। পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে সর্ব্বোত্তম ফল দেশভক্তি তাহা যখন এ দেশের লোকের মনে জাগ্রত হইল, তখন নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হইতে এ দেশের লোক কিরূপে বিস্মৃত অমূল্য তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং তাহা হইতে বুঝিতে পারিল যে, পূর্ব্বে যাহা খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব বোধ হইয়াছিল, আমাদের স্বধর্ম্মের মধ্যেই সেইরূপ নৈতিক এবং ধর্ম্মজীবনের সাধনাগুলির পবিত্র এবং স্বর্গীয় ভাবগুলির অভাব নাই। কাজেই পরধর্ম্ম অবলম্বনের প্রয়োজনও নাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যখন আহারে বিহারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করা সম্ভব হইল, তখন সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আর কোন কারণই রহিল না।

এই সকল কথা হইতে আলাপটা একবারে বর্ত্তমান কালের উপর আসিয়া পড়িল, এবং আজ ভারতসমাজের উপর দিয়া যে একটা অসন্তোষের চাঞ্চল্য ছুটিয়া চলিতেছে, সাহেব তৎসম্বন্ধে আমাকে একটা প্রশ্ন করিলেন। তখন হঠাৎ যে উত্তরটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই ভদ্র লোককে বলিলাম।

তাঁহার প্রশ্নটি ছিল—"বর্ত্তমান সমস্যাটি কি" ?

সেই দিন হইতে আমার মনের মধ্যে সাহেবের কথা কয়টি কেবলই ঘুরিতেছে। ভারত সমাজে এই যে বিষম বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, ইহার মূল নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে ত কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। ইতিহাসে অনেক বিপ্লবের কথা পড়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি বল-প্রয়োগে তাহাদের সাময়িক নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু একেবারে নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে বিপ্লবের নেতৃবর্গও অস্বস্তির. প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না

পারিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও সমাজের যথার্থ হিতসাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এবং তাঁহাদের অসংখ্য ভক্তগণ মঙ্গল ইচ্ছার উন্মেষণে আপনাদিগকে অকাতরে দেশমাতৃকার পূজায় বলি দিয়া গৌরবময় হইয়াছেন, বহুশতাব্দীর পরিশ্রমে গঠিত পুরাতন সমাজকে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু নূতন শান্তিময়, সুখময় সংঘ সংগঠন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী দেশে যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহাকে বর্ত্তমান সভ্যজগতের বিপুলতম বিপ্লব বলিয়া গণ্য করা, বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐ বিপ্লবের যাঁহারা মস্তিষ্ক স্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রীয় প্রণালীকেই, রাজকীয় স্বেচ্ছাচার তন্ত্রকেই, দেশের সর্ব্ববিধ দৈন্য ও দুর্নীতির জন্য দায়ী মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষার ঘোষণায়, জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। উন্মত্তপ্রায় জনসাধারণ নেতৃবর্গের বাণী ধ্রুবসত্য মনে করিয়া নির্দ্দোষীর রক্তস্রোতে রাজতন্ত্র ভাসাইয়া দিল। তাহাতে কিন্তু সামাজিক ব্যাধির নিরাকরণ হইল না, সমাজের কোন কল্যাণই হইল না। আবার সেই জনসাধারণই পরমসমাদরে গৌরবময় রাজতন্ত্রকে, তাহাদের প্রিয় সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনে বরণ করিয়া লইল। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে ভুলটি হইয়াছিল, তাহা যে ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই, এরূপ নহে। প্রথম চার্লসের সময় ইংলণ্ডে নেতৃবর্গ ঐরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া, রাজতন্ত্র ধ্বংস করিয়া সাধারণতন্ত্র আনিতে গিয়া ক্রমওয়েলের অধীনে অধিকতর স্বেচ্ছাচারময় রাষ্ট্রীয় প্রণালীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

সুচিকিৎসক ব্যাধির প্রতিবিধানচেষ্টার পূর্ব্বে তাহার মূল কারণ নির্ণয় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ দিয়া থাকেন। অন্যথা, বাহ্যিক স্ফোটকের বা ব্যাধির অন্যরূপ বাহ্য অভিব্যক্তির সাময়িক নিবৃত্তিমাত্র হইতে পারে, কিন্তু রোগী নিরাময় হয় না। তেমনি, সমাজের বাহ্যাবয়বে যখন একটা বিপ্লবের উষ্ণ বাষ্পের অনুভূতি হয়, তখন তাহার অভ্যন্তরে যে একটা মালিন্যের, একটা ব্যথার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বুঝা গেলেও, সেই পীড়ার প্রকৃতি এবং মূল কারণ সম্যকরূপে নির্ণয় না করিয়া তাহার সাময়িক নিবৃত্তির চেষ্টা খুব সমীচীন নহে।

আমাদের এই ভারতসমাজের অভ্যন্তরে প্রকৃতিগত এমন একটা ব্যাধির সঞ্চার নিশ্চয়ই হইয়াছে যাহার উত্তেজনায় সমাজের বাহ্যিক অবয়বে উষ্ণতার অনুভূতি হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন এই উত্তাপের প্রথম অনুভূতি হয়, তখন অধিকাংশ নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গকেই ইহার কারণ মনে করিয়া তাহার প্রতিরোধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ফলে বঙ্গভঙ্গ রোধ হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতিকার হইল না। রাজপুরুষেরা কিন্তু ব্যাধির মূল কারণটি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়া, সাধ্যমত তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থার মনোযোগী হইয়াছিলেন। তবে সেই কারণটী তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলে কি না, পারিয়া থাকিলে উপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, এবং সেরূপ ঔষধ প্রয়োগ তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল কি না, বিবেচ্য। ইহা স্থির যে তাঁহারা যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যাধি নিরাকৃত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর

বাড়িয়া গিয়াছে এবং তখন ব্যাধির যে অভিব্যক্তি ভারতের একাঙ্গে মাত্র হইয়াছিল, তাহা এখন আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্য হাতেকলমে করিতেছেন, যাঁহারা বর্ত্তমানে সামাজিক শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় শান্তিরক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী, তাঁহারা অনেক সময় সত্য অনুধাবন করিতে পারিলেও নানা কারণে তাহা চাপিয়া রাখিতে বাধ্য। তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ করা দুর্নীতিমূলক না হইয়া সদুদ্দেশ্যমূলকও হইতে পারে। অন্ততঃ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক শাস্ত্রে এরূপ কার্য্যের সমর্থন আছে। কিন্তু যাঁহারা সামাজিক শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় শান্তিরক্ষার কর্ম্মচারী নহেন, কেবলমাত্র সমাজ বা রাষ্ট্রতত্ত্ব অধ্যয়নে ব্রতী, যাঁহাদের এই অধ্যয়ন মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য-মূলক নহে, যাঁহারা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক, কোন অংশেই কর্ম্মী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে সত্যগোপন শুধু যে ন্যায়বিরুদ্ধ তাহা নহে, নিরর্থকও বটে। যদি এইরূপ সত্য প্রকাশে জননেতৃগণের দৃষ্টি ব্যাধির মূল কারণের উপর আকৃষ্ট হয়, অথবা রাজপুরুষগণ সেই কারণের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েন, তাহাহইলে সমাজের যথার্থ উপকার সাধিত হইতে পারে। এইরূপ সত্যপ্রকাশে যে নির্ভীকতার প্রয়োজন, তাহা যে শুধু শক্তিশালী রাজকর্ম্মচারিগণের অসন্তোষউৎপাদনের সৎসাহস, তাহা নহে, জনপ্রিয়নেতৃগণের অভিমতের বিরুদ্ধবাণী ঘোষণার দুঃসাহসও বটে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এই যে সুবিপুল জনসংখ্যা, একই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অজানিতভাবে সংঘবদ্ধ হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ কারণগুলির অনেকেই অনুধাবন করিতেছেন। ধর্ম্মের নামে, জাতীয়মানাপমানের নামে, মানবীয় অধিকারের নামে, কতকগুলি শিক্ষিত এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে নীতিতে ভারতীয় শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে হিতকর নহে। সুতরাং যাহাতে সত্বর সে নীতির পরিবর্ত্তন হয়, তাহার জন্য ভারতবাসীকে স্বার্থত্যাগ করিতে তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন। সাধারণ লোকে এই সকল নেতৃগণের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। শুধু যে আজ আমাদের দেশে এই অভিনয় হইতেছে তাহা নহে, জগতের সর্ব্বত্রই বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় এইরূপই হইয়া থাকে।

কিন্তু এটা ঠিক যে যদি বর্ত্তমান উত্তেজনার গৌণ কারণগুলির নিরাকরণ রাজপুরুষেরা এখনই করিয়া দেন, যদি ধর্ম্মের নামে যে উত্তেজনা, জাতীয় অপমানের নামে যে উত্তেজনা, রাজনৈতিক অধিকারের নামে যে উত্তেজনা, তাহা একবারে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন; এমন কি, যদি অচিরে সত্যসত্যই সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভারতবাসীর ভাগ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই যে দেশব্যাপী তীব্র অসন্তোষ তাহা তখনই নিরাকৃত হইবে না। স্বল্প সময়ের জন্য চাপা পড়িলেও পড়িতে পারে মাত্র।

রাষ্ট্রীয় অধিকারই হউক আর জাতীয় স্বাধীনতাই হউক, সকলই উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। স্বাধীনদেশে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের একান্ত অভাব নাই, বরং বড় বড় বিদ্রোহগুলি যে সেইরূপ স্থানেই হইয়াছে ইতিহাস তাহার অক্ষুণ্ণ প্রমাণ বহন করিতেছে। রাজনৈতিক অধিকারের স্বরূপ ও তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব, জাতীর স্বাধীনতার গৌরব, বর্ত্তমান ভারতবাসীর শতকরা ৯০ জনের উপলব্ধির বাহিরে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অন্যদিকে ইটালী, রুশিয়া প্রভৃতি স্বাধীনদেশে, এমন কি চিরস্বাধীন ইংলণ্ডেও জনসাধারণ যে সন্তোষের শান্ত-আবরণে বর্ত্তমানে আবৃত আছে তাহা নহে। সুতরাং ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইলেই যে সে স্বরাজ শান্তির আধার হইবেই, হিন্দুমুসলমানের বিদ্বেষ, অস্পর্শীয়ের অসন্তোষ, বুভুক্ষুর হাহাকার দূর করিবেই—এমন ভরসা নিঃসন্দেহে করিতে পারা যায় না। অশান্তির মূলকারণ যদি পরাধীনতাই হইত, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু অশান্তির মূল কারণ যদি অন্য কিছু হয় তাহা হইলে এরূপ আশা করা বৃথা।

ইংরাজের আমলে যে ভারতের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে অপকারও যে না হইয়াছে তাহা নহে। উপকার অপকারের তুলনা করিয়া দেখিলে ভার যে কোন দিকে বেশী হইবে সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে ভারতবাসীর দুঃখের মাত্রা অতি তীব্র। এই কষ্টের জন্য কেবলমাত্র রাজশাসনই দায়ী, অথবা আমাদের জাতিগত প্রকৃতিও দায়ী সে সমস্যার সংবিধান করা তত প্রয়োজনীয় নহে, যত ওই দুঃখের প্রকৃতি নির্ণয় করা। আমাদের প্রাথমিক দুঃখ—অন্নের, বস্ত্রের, আশ্রয়ের, স্বাস্থ্যের, শিক্ষার অভাব। কবি গাহিয়াছেন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দউজ্জ্বল পরমায়ু"

আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অপমানে, আশঙ্কায় মৃতপ্রায় হইয়া যে বাঁচিয়া থাকা তাহা নহে; সবল সুস্থ দেহে, তেজে জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমোন্নতির পথে, মানবীয় সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে চাহি। কিন্তু এ সকলেরই যাহা মূল, তাহা আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছিনা—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" এই শরীরই আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছিনা অন্নাভাবে। সুতরাং মনে হয় অন্নাভাবই বর্ত্তমান অশান্তির মূলকারণ। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছেন যে যাঁহাদের অন্নাভাব নাই, যাঁহাদের শরীর রাজকর্ম্মচারীরূপে রাজকোষের অর্থেপুষ্ট, যাঁহাদের ধনভাণ্ডার বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে পরিপূর্ণ, যাঁহারা বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের স্বামীরূপে পুরুষপুরুষানুক্রমে অন্নচিন্তার অতীত, তাঁহাদের অধিকাংশই এই আন্দোলনে যোগ দেন নাই। তাঁহাদের মধ্য হইতে দুই একটি মহাপ্রাণ যদিবা যোগ দিয়া থাকেন, দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতিতেই সেরূপ করিয়াছেন মাত্র।

অন্নসংস্থানের উপরই আমাদের স্থায়ী শান্তি নির্ভর করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতেও বহুকাল ব্যাপিয়া এই সমস্যার মীমাংসার জন্য চেষ্টা হইতেছে; এবং সে মীমাংসা না হওয়াতে নানা

প্রকারের অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। এই দিক দিয়া দেখিলে ভারতীয় অশান্তি জাগতিক অশান্তি হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সমস্যার মীমাংসার পথে অন্যদেশানুগত একটা বাধা আছে। এ দেশে লোকের অন্ন সমস্যা, ইংরাজ জাতির অন্ন সমস্যার সহিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সহিত ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত। ভারতবাসী যদি তাহাদের অন্ন সমস্যার সংবিধান করিতে গিয়া এমন পথে অগ্রসর হয় যে তাহাতে ইংরাজ জাতির অন্নাভাব বা ব্রিটিশ সামাজ্যের ধ্বংসের আরম্ভ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির পক্ষে ভারতবাসীকে সে পথে যাইতে বাধা দেওয়া শুধু যে স্বাভাবিক তাহা নহে মানবনীতিসম্মতও বটে। কিন্তু যদি এমন পথ কিছু আবিষ্কৃত হয় যাহা ধরিয়া অগ্রসর হইলে ভারতের অন্নাভাব দূর হয়, অথচ বৃটনের জীবনে আঘাত না লাগে, তাহাহইলে তাহাতে ইংরাজ জাতি মুক্তমনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেই হইবে।

আজ এইযে অশান্তি রাজাপ্রজাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে, রাজাপ্রজার মধ্যে—ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে—বিরোধের ভাবের পরিবর্ত্তে সদ্ভাব ও প্রীতির ভাব পুনরানয়ন করিতে হইলে, সেই পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। যতদিন তাহা আবিষ্কৃত এবং অবলম্বিত না হইবে ততদিন অশান্তির নিরাকরণ হইবে না, বর্ত্তমান সঙ্কটের অবসান হইবে না; অশান্তি বাড়িয়াই চলিবে, সঙ্কট লোমহর্ষণ হইয়া উঠিবে। মূলব্যাধি দূর না হইলে, শত প্রলেপে —কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় অধিকার দানেই, ভারত সমাজ সুস্থ হইবে না। সেই পথ যিনি আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তিনি দুইটি মহাজাতির, দুইটি ইতিহাসবিশ্রুত জনপদের, চির-কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। সেই পথের অবিষ্কারই—বর্ত্তমান সমস্যা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার।

গ্রেপ্তার

প্রথমে গৃহিণী ধরিলেন চড়ায়, আর শ্যামবাবু কাটিতে লাগিলেন সরু। সহসা পরদা উল্টিয়া গেল; শ্যামবাবু আরম্ভ করিলেন গর্জ্জন, ও গৃহিণী ধরিলেন নরম অনুনয়। এ ক্ষেত্রে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়াই ঘটে, কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। গৃহিণী কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন দুটি খেয়ে নাও, আফিসে যাওয়ার বেলা হয়ে গেল।" শ্যামবাবু একেবারে সদর দরজা ছাড়াইয়া, সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া, গর্জ্জিয়া বলিলেন—"চুলোয় যাক্ চাকরি! আমি আফিস যাবনা।" রাস্তায় সোরগোল পড়িয়া গেল; শ্যামবাবুর হাত ধরিয়া কে যেন বলিল—"পাক্ড়ো, পাক্ড়ো!—নন্-কো-অপারেশন।"

পাষাণী

বাড়ীর বড় মেয়ে হয়ে জন্মানর অধিকারে কনকের নিজের আদর আব্দার ও ছেলেবেলার খেলা-ধূলা চঞ্চলতার অধিকারটুকু একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হয়েছিল।

গরীবের ঘরে ঝি-চাকরের অভাবে, ছোট ভাই-বোনগুলিকে কোলে-পিঠে করেই কনকের দিন যেত। যদি কোন দিন খেলায় একটু মেতেছে, অমনি একটা না একটা অনর্থপাত হতই। কে পা কেটে বসেছে, কে মারামারি করেছে ;—আর সব দোষ পড়ত কনকের ঘাড়ে।

কনকের মা কাজের ভিড়ে নিশ্বাস ফেলতে সময় পান না। তবু গোলমাল শুনলেই কনককে একচোট বকুনি, কখনও বা চড়টা চাপড়টা দিয়ে বলতেন,—বুড়ো মেয়ে, নিজেই খেলায় মত্ত! ঘরের কাজে ত হাত দেবে না,—ছোট ভাই-বোনগুলোকে একটু দেখবে, তাও ইচ্ছা করে না ?

বকুনির ভয়ে সাত আট বছরের 'বুড়ো' মেয়ে কনকের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

কনকের মেজ বোন প্রতিমা ছিল ভারি সুন্দর দেখ্‌তে। কনকের যখন বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ বাপের টাকার অভাবে তাড়াতাড়ি বর জুটছে না, সেই সময় গ্রামের জমিদার-বাড়ী থেকে প্রতিমার জন্যে সম্বন্ধ এল।

বড় মেয়ের বিয়ে না হ'লে ত ছোটটির হ'তে পারে না, এদিকে জমিদার-গিন্নিও আর সবুর কর্‌তে চান না। অন্য এক জায়গায় মেয়ের সন্ধান পেয়ে সেইখানেই ছেলের বিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর হ'তে কনক বাড়ীর সকলের দুচক্ষের বিষ হ'য়ে উঠ্‌ল—ওরই জ্বালায় ত প্রতিমার এমন সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। লোকের কাছে বাপ-মায়ের মুখ দেখান ভার হয়ে উঠেছে।

এক দিন কনকের মামা একটি সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। খুব বড়মানুষ তারা। টাকাকড়ি কিছু চায় না। বরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুবছর হল মারা গেছে, একটি ছেলে আছে তিন বছরের—তাই একটু বড়সড় মেয়েই তাদের দরকার।

বরের ইচ্ছে গরীবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। এমন সুযোগ কি আর ছাড়া যায় ?

বরের বাড়ী থেকে মেয়ে দেখে গেল—পছন্দ হল। তার পর পনের দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।

শুভদৃষ্টির সময়ে বর শূন্য দৃষ্টিতে কোন্ দিকে যে তাকিয়ে রইল ; কনকের সঙ্গে তার চোখের মিলন হ'ল না—কনকের বুকের ওপর যেন পাথরের ভার চেপে রইল।

বিদায়ের দিন ঠান্‌দি বল্‌লেন—তা কনক তোর কপাল ভাল। দোজপক্ষের বর হলে কি হবে, শিশিরের বয়েস কিছুই হয় নি। আর জানিস্ ত দিদি, প্রথম পক্ষের চেয়ে দ্বিতীয় পক্ষের আদর বেশি।

কনক মাথা নীচু করে রইল। এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে বাপের বাড়ী থেকে সে চলে গেল।

পাড়ার লোকে বল্‌ল—কি মেয়ে। না হয় কপালজোরে বড়মানুষের বৌ হ'ল, তাই বলে গরীব বাপের জন্যে প্রাণের একটু টান থাক্‌তে নেই।

শ্বশুরবাড়ীতে এক শাশুড়ী ছাড়া অন্য কেউ কনককে আদরের কথা বল্‌ল না।

শাশুড়ী বল্‌লেন—বৌমার আমার ভারি লক্ষ্মী শ্রী। শিশিরের ভাঙ্গা মন ঠিক জোড়া লাগবে।

খোকাও কনককে মা বলেই জড়িয়ে ধর্‌ল। কনকের বুকের পাথরের নীচে যেন একটু স্নিগ্ধ জলের ধারা বয়ে গেল!

শিশির কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই কনককে বল্‌ল—দেখ, তোমাকে সব কথা প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে বলে নেওয়া আমার কর্ত্তব্য। বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু চুপ করে রইল। তার পর আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল—

সুষমা যে দিন চিতায় আমার চোখের সাম্‌নে পুড়েছে, সেই দিন আমার হৃদয় প্রাণ সব সেই আগুনে আমি পুড়িয়ে এসেছি।

—মা এই দুবছর ধরে আমার লক্ষ্মীছাড়া রকম সকম দেখে কেঁদে অস্থির হলেন। তাঁর বিশ্বাস আমি বিয়ে করলেই আবার আগের মতন হব। তাঁর অসহ্য কান্নায় আমি তোমাকে বিয়ে করে আন্‌লাম। রাগের ঝোঁকে এটা যে অন্যায় করেছি তাও বুঝ্‌ছি। তুমি দুঃখ করো না, কনক। আমার 'আমি' টুকু ছাড়া আর যা কিছু আমার, তা সবই তোমায় দিলাম।

কনক নীরবে সব শুনে গেল, কোন উত্তর সে দিল না।

খোকা একদিন কনকের কোলে বসে গল্প শুন্‌ছে, শিশির কি নিতে সেই ঘরে ঢুক্‌ল। খোকা অমনি বলে উঠ্‌ল—বাবা, ছবির মার চেয়ে এই মা ঢের ভাল। এ কেমন গল্প বলে। ছবির মাকে আর আমি মা বল্‌ব না।

শিশিরের মুখে একটা ব্যথার আভাস ফুটে উঠ্‌তেই, কনক বল্‌ল—দূর বোকা ছেলে, অমন কথা বল্‌তে নেই। আমি ত তোমার মা নই। আমি যে বৌমা।

খোকা বল্‌ল—ঠাকুমারও বৌমা, আমারও বৌমা?

কনক বল্‌ল—হাঁ।

শিশির অবাক হয়ে ভাব্‌ল এই মেয়েটির প্রাণে কি কোথাও কোমলতা নেই? তবু এই ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে—সুষমার ছেলেকে আর এক জন কেড়ে নিল না।

শিশিরের মা নাতির বৌমা ডাক শুনে চটে গেলেন। কিন্তু খোকা কনককে বৌমা বলেই ডাক্‌তে লাগল।

বছর না ঘুরুতেই শিশিরের মা সংসারের কাজে অবসর নিয়ে কাশীতে ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্যে চলে গেলেন। কনককে দেখ্‌বার বা একটা আদরের কথা বল্‌বার মানুষ আর বাড়াতে রইল না। তার ছোট যায়েরা বড়মানুষের বাড়ীর মেয়ে সব, কেউ বিশেষ কনকের কাছে ঘেঁস্‌ত না।

কনকের প্রতি শিশিরের অবহেলা সকলের চোখেই পড়্‌ত। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কনকের ব্যথার ব্যথী হ'তে আসে নি।

সংসারে যে দুর্ব্বল, তার একটা সুবিধা, সবাই তাকে তুলে ধর্‌তে আসে। যে কাঁদে, লোকে তার চোখের জলে নিজের চোখের জল মেশায়। যে ব্যথায় ছট্‌ফট করে, তাকে সবাই সমবেদনার স্পর্শ দিয়ে আরাম করে তুল্‌তে চায়। কিন্তু যার শক্তি বেশি, তাকে সব ঝড় একা বইতে হয়। সব ব্যথা একা সইতে হয়। কনকের দুঃখের আভাস দেখা গেলে তবে ত লোকে সান্ত্বনা দেবে? সে বাইরে নির্ব্বিকার বলে লোকে তার ব্যথার অস্তিত্বই স্বীকার করত না। সবাই জান্‌ত—তার প্রাণ বলে কিছুই নেই—তার অনুভূতিও নেই।

শিশিরের হঠাৎ খেয়াল হ'ল সে কল্‌কাতায় গিয়ে ওকালতি কর্‌বে। তা না হ'লে তার আইন পাশ করাটা যে বৃথা হ'য়ে যায়। কনক আর খোকাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে এল।

কনকের এক হিসাবে সুবিধা হ'ল। এখানে সে আপন মনে থাক্‌তে পায়, দশ জনের মন রাখ্‌বার জন্যে নিজের মনটাকে সর্ব্বদা সতর্ক করে রাখ্‌তে হয় না।

একদিন বিকালে কনক নিজের হাতে কিছু খাবার ক'রে শিশিরকে খেতে দিতেই সে বল্‌লে—এ সবত আমি খাই না, অনেক দিন পূর্ব্বেই ছেড়ে দিয়েছি যে।

কনক কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে এল। খোকাকে কিছু খাইয়ে বাকিটা সে ফেলে দিল। কিন্তু নিজেও আর কোনদিন ঐ সমস্ত খাবার মুখে তুল্‌ল না।

সেদিন কনক খেতে বসেছে এমন সময় শিশির সেই ঘরে ঢুকে কনকের খাওয়া দেখে অবাক হয়ে বল্‌ল—তুমি এই খেয়ে থাক? দেখ কনক, আমাদের সমাজে মেয়েদের একটা কুসংস্কার, স্বামী যা খাবে না, পতিভক্তি দেখাবার জন্যে স্ত্রীও তা সব ছেড়ে দেবে। এটা অন্যায়। তুমি অমন কর্‌তে পার্‌বে না। তোমাকে সব খেতে হবে। বল খাবে?—নইলে আমি ভয়ানক কষ্ট পাব। বল শুন্‌বে আমার কথা?

কনকের ইচ্ছা হ'ল চেঁচিয়ে বলে—না শুন্‌ব না। আমি তোমার কে, যে তোমার সব কথা শুন্‌ব? কিন্তু সব কথা চেপে রেখে সে স্বীকার করে নিল—শুন্‌ব।

কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামীর কাজ করে শিশির নিশ্চিন্ত মনে উঠে গেল—বুঝ্‌ল না, না খাওয়ার চেয়ে এই খাওয়াটা কনকের পক্ষে কত বেশি কষ্টের হবে।

কল্ শিশিরকাতায় এসে এইবার প্রথম কনকের দিকে একটু ভাল ক'রে চাইল। হয়ত

বুঝেছিল নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে একটা কষ্ট থাক্‌তে পারে। তাই কনককে নিয়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ কর্‌ল।

সন্ধ্যার পর খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে যে দুঘণ্টা শিশিরের সঙ্গে সে পড়াশুনা কর্‌ত, সেই দুটি ঘণ্টার প্রত্যাশা করেই কনকের বাকি সময়টুকু বিপুল উৎকণ্ঠায় কেটে যেত! এই অতি অল্পক্ষণের সঙ্গটি তাকে আরো বেশির আশায় চঞ্চল ক'রে তুল্‌ত।

মনের আবেগের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে করতে তার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল। তার কালিপড়া চোখের দিকে তাকিয়ে একদিন শিশিরের মনটা করুণায় ভরে উঠ্‌ল। কনকের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কেন, কনক? এখানে তোমার একলাটি কষ্ট হয়? কিছুদিন বাপের বাড়ী ঘুরে আস্‌বে? ঐ স্পর্শের মাদকতায় কনক সব ভুলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ফেল্‌ল।

শিশির আদর করে তার মাথার উপর মুখ রেখে বল্‌ল—বল্‌বে আমায় তোমার কিসের দুঃখ?

কনক সমস্ত শরীর মনের বল সংগ্রহ করে বলে ফেল্‌ল, আমি কোথাও যাব না, আমায় দূরে পাঠিও না। তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

কনকের এতদিনের প্রাণের গোপন কথাটি ব্যক্ত হয়ে পড়্‌তেই সে লজ্জায় শিউরে উঠল। তখনি ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। শিশির স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল।

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কনক মাটিতে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। নিজেকে শত ধিক্কার দিল। ছি ছি মেয়ে মানুষের লজ্জা সরম সব কি সে বিসর্জ্জন দিয়েছে? সে শিশিরকে কি সব বলে এল? মাগো! এ মুখ সে কেমন করে আবার সকলকে দেখাবে?

তার কৈশোর যৌবনের সমস্ত ব্যর্থ বাসনা কামনার বিরাট পাহাড় ভেদ করে আজ প্রথম কান্নার নির্ঝর ছুট্‌ল। অশ্রুজলে কি পাথর গলে যাবে?

সারারাত কেঁদে শ্রান্ত হ'য়ে ভোরে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন মাথার উপর শিশিরের স্পর্শ পেয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—অনিদ্রার ক্লান্তিমাখা দৃষ্টি নিয়ে শিশির তার দিকে তাকিয়ে আছে।

শিশির বল্‌ল—কনক, আমি এত দিন যেন বুঝেও বুঝিনি যে তুমি আমায় ভালবাস্‌তে পার। মার কথায় যখন আমায় বিয়ে কর্‌তেই হল, তখন এ দিক্‌টা একেবারেই ভাবিনি।

গরীবের মেয়ে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমার ঐশ্বর্য্যে আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারব। ভালবাসার দৈন্য সে অনুভব কর্‌বে না। তারপর ক্রমে ক্রমে তোমার পরিচয় পেয়ে তোমাকে বন্ধু করে নেব ভেবেছিলাম,—কিন্তু একি হ'ল কনক? আমার যে আর দেবার কিছুই নেই—সুষমা যে তার সঙ্গে আমার সব নিয়ে গেছে.........

কনক আগের রাত্রের মূঢ়তার কথা মনে করে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল।

শিশির বল্‌ল—যে প্রতিদান দিতে পার্‌বে না, তাকে ভালবেসে কেন মিছে কষ্ট পাও? আমি কিছুদিনের জন্য অন্য জায়গায় বেড়িয়ে আসি, তুমি ততদিন মনটাকে ঠিক করে নাও।

কনক মনে মনে বল্‌ল—মন ঠিক করা যদি যেত, তবে তুমিই বা এত দিন পার নি কেন?

শিশির বিদেশে গিয়ে দিন পনের ঘুরে এল। খোকাকে ফেলে বেশি দিন সে থাক্‌তে পার্‌ল না। শিশির যখন বাইরে ছিল সেই সময় সে কনককে যে দু একখানি চিঠি লিখেছিল, কনক তা অতি যত্নে রেখেছিল। দিনে শতবার অবসর খুঁজে নিয়ে পড়ত। অতি সাধারণ চিঠি, তবু প্রত্যেকটি অক্ষরের দিকে কনক এমন করে চেয়ে থাকৃত, যেন ওর ভিতর অনেক কথাই লুকান আছে!

শিশির দেখ্‌ল কনকের শরীর একটুও সার্‌ছে না। অথচ খাওয়া-দাওয়া সব পূর্ব্বের মতই নিয়মিত চল্‌ছে।

তাই একদিন বল্‌ল—কনক, আমাকে কি রক্তমাংসলোলুপ একটা রাক্ষস বলে তোমার মনে হয়? তুমি আমার জন্যে ভেবে শরীর ক্ষয় কর্‌লে, আমি নিজেকে রাক্ষস বলেই ভাব্‌ব।

কনকের মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সে বল্‌তে চাইল—এক ফোঁটা রক্ত মাংস শরীরে থাক্‌লেও যে আমায় মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই বেঁধে রাখ্‌বে। তা হলে ত তোমার মনের মত হতে পার্‌ব না। যে শক্তি তুমি আমার মধ্যে দেখতে চাও, তা'ত রক্ত মাংসের শরীরে সম্ভব নয়। —তোমায় দেখ্‌বার জন্যে যে চোখ দুটো ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকে। তোমার কথা কানে গেলে বুকের মধ্যে যে রক্তের চঞ্চলপ্রবাহ খেলে যায়। তোমার হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে কাঙ্গাল হয়ে থাকি। এসব ঘোচাব কি করে, সব নির্ব্বাণের সাধনা না কর্‌লে?—কিন্তু মনের এসব কথার একটিও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল না।

যে মুখ বুঁজে সয়, ভগবান তাকে বুঝি বেশি ঘা দেন। তিন দিনের জ্বরে খোকা সবার মায়া কাটিয়ে চলে গেল। শিশির পাগল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কনকের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন কেউ দেখ্‌তে পেল না। সবাই বল্‌ল, মাগো, সৎমা হ'লেই কি ডাইনি হ'তে হয়! যেন পথের কাঁটাই ওর দূর হল... .....

কনকের কানে যেন কে গলান আগুন ঢেলে দিল। বুকটি চেপে ধরে সে মাটিতে বসে পড়্‌ল। বুকটা ফেটে যায়নি ত! ঠিকই আছে! এ ত ফাট্‌বার নয়—পাথরের চেয়েও শক্ত এ যে!

কনককে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে শিশির নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। অনেক দিন পরে একখানা চিঠি কনকের নামে এল। কনক পড়্‌তে লাগ্‌ল—

কনক,

আমি তোমার কাছে চির-বিদায় চাচ্ছি। আমি আর ফির্‌ব না। কেউ যেন আমার খোঁজ না করে।

আজ তোমায় একটা কথা বলে নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে যাব। আমি একদিন তোমায় বলেছিলাম যে সুষমা তার সঙ্গে আমার সমস্ত ভালবাসার শক্তিও নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু কিছু দিন থেকে বুঝ্‌তে পেরেছি—মানুষের ভালবাসা ফুরায় না। তোমাকে আমি ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেছিলাম—আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই। যে দিন নিজের কাছে ধরা পড়্‌লাম, সে দিন একটা পুরান প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। সুষমা একদিন বলেছিল আমায়—তুমি আমাকে যেমন ভালবাস, আমি মরে গেলে তেমনি করে আর একজনকে ভালবাসতে পার্‌বে ?

আমি শিউরে উঠে বলেছিলাম—না, এ জীবনে নয়। এই কথাটা মনে করে সে দিন কি লজ্জা পেয়েছি তা ত তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। তাই সাবধানে মনের সমস্ত পথ ঘাট বন্ধ করে রেখেছিলাম। তোমার চাওয়া কি আমি বুঝতাম না মনে কর ? তবু জোর ক'রে চোখ বুজলাম—তোমার কাছে আর বেশি যেতাম না। কিন্তু অভিমানী সুষমার ওটা সইল না। তাই সে খোকাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। তার কোন চিহ্নই আর আমার কাছে রইল না। এটাকে আমার শাস্তি বলেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সব পৃথিবী আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। তোমার বুকে মাথা রাখবারও অধিকার নেই—থাক্‌লে বুঝি বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমি সুষমাকে কথা দিয়েছি যে। কনক, তোমার শক্তি অসাধারণ। তুমি ভেঙ্গে পড়োনা আমার মত। তোমাকে যে প্রচণ্ড দুঃখ দিলাম তা আমার বুকেও জ্বল্‌তে থাক্‌ল।

আমার আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার আছে কি না, জানি না। তবু আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—যে দুঃখ তুমি জীবন ভরে পেলে, সে দুঃখের সরোবরে তোমার শক্তিকমল ফুটে উঠুক——

শিশির

বাতি জ্বেলে কনক চিঠি পড়্‌তে বসেছিল। কখন সেটা তেল ফুরিয়ে নিভে গেছে সে জান্‌তে পারে নি। চিঠিখানা হাতের মুঠোয় শক্ত করে সে ধরেই রইল। চোখ দুটিও সেই কাগজখানার উপরে নিবদ্ধ।—বুকের রক্ত যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়্‌ছে টপ্—টপ্—টপ্......

শ্রীসুনীতি দেবী।

শিক্ষার কথা

অসহযোগ আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম উদ্যম প্রযুক্ত হইয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গস্বরূপ বিদ্যালয়গুলির বিপক্ষে। অসহযোগবাদিগণের অন্য চেষ্টার ফল যাহাই হউক না কেন, এই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বহু বিদ্যালয় ছাত্রশূন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, স্বয়ং ভাইস্-চান্সেলর সিনেট সভা হইতে তাহা দেশের লোককে জানাইয়াছেন। তারপর কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শূন্য কক্ষগুলি আবার পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার ঠিক সংবাদ আমরা পাই নাই, বোধ হয়, হয় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশের লোকের মনে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব আছে।

ছাত্রবিদ্রোহের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ শুনা গিয়াছিল। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ই বাঙ্গালী জাতির অন্তরে দাসভাব (Slave mentality) অঙ্কুরিত, ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট এখন আর পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের গৃহে আগের মত প্রচুর অর্থ বহন করিয়া আনে না। দাসমনোভাব এই গুরুবাদের দেশে কতকাল হইতে আছে তাহার আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে। এখন দেখা যাউক অর্থকরী বিদ্যাকে অবহেলা করিয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যা প্রচারের ও প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কতটুকু এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র, জাতীয় রুচিরই বা দায়িত্ব কতটুকু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি দেশের ও সমাজের সেবার জন্য। দেশে যেরূপ শিক্ষার আদর, দেশের লোক যেরূপ শিক্ষা চাহে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়কে করিতে হইবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সময় আসিবেই যখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার অনৈক্য দেখা যাইবে। কেননা সজীব জাতি এবং প্রাণবান সমাজ হিমালয়ের মত অচল নহে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক কারণে অল্প কালের মধ্যেই ভাবজগতের বিপ্লব হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ঠিক তত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গঠন করা সম্ভব হয় না এবং প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তন বা সংস্কারসাধন করাও সহজ হয় না। কারণ জাতীয় উন্নতি বা অবনতি, সামাজিক আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন ও অর্থনৈতিক জগতের বিপ্লবের বেগ, সকল সময় সমান দ্রুত বা সমান মন্থর থাকে না। অথচ প্রতি দশ বারো বৎসর অন্তর দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। কাজেই দেশের ও সমাজের গতি কোন্ দিকে তাহা ভাল

করিয়া বুঝিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু সময় দেওয়া দরকার। কেননা, দেশের আদর্শের সহিত শিক্ষার ব্যবস্থার ঐক্য যথাসম্ভব দীর্ঘকালের জন্য স্থাপন করিতে হইলে কখনও কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের একটু আগে চলিতে হইবে, এবং কখনও কখনও তাহার পিছাইয়া পড়াও অনিবার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয় যখন পিছাইয়া গিয়াছে তখনই তাহার সংস্কারের সময় আসিয়াছে। আবার এমনও হইতে পারে যে, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে, এবং কোন কোন বিষয়ে দেশের লোকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। এরূপ সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সংস্কার প্রয়োজন। প্রবল আন্দোলনের সময় সাধারণ লোকের চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না, এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরই দেশের শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুণ বিচার করিবার যোগ্যতা, অবসর বা ইচ্ছা থাকিবে এমন আশা করাও যায় না। ভাবিবার লোক সকল দেশেই কম। হুজুগে মাতিবার লোক সকল দেশেই বেশী, কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের মত দুরূহ কাজ কেবল খেয়ালের বশে বা আবেগের প্রভাবে সম্পন্ন হয় না, হওয়া উচিতও নহে। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বহু লোক বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কমিশন প্রায় সাতশত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেহই মনে করিতে পারেন নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কারের প্রয়োজন নাই বা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিই দেশের সকল অভাব ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারে। যে অর্থকরী শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী পিতামাতা আজ এত উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন এই সাক্ষীরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না কেন?

এক কথায় বলা যাইতে পারে, এতদিন সেরূপ শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের বিরাগ ও বিতৃষ্ণাই দেখা গিয়াছে, অনুরাগ দেখা যায় নাই, সুতরাং অসময়ে সে ব্যবস্থা করিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠান, তাঁহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও শিল্প বা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন নাই। রাজসাহীতে যে টেক্‌নিকাল স্কুল আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও রাজসাহী জেলার ছাত্র তাহাতে পাওয়া যায় নাই। এমন কি রাজসাহীর বহু মান্যগণ্য লোক অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ স্কুল তুলিয়া দিবার জন্যও সরকারের নিকট আবেদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কৃষি কলেজ আছে। ঐ সকল কলেজে এ পর্য্যন্ত এমন ছাত্র অতি অল্পই গিয়াছে, যাহারা বি, এ, বা এম্, এ, পরীক্ষা সম্মানের সহিত পাশ করিতে পারিত। কৃষি কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরাও আবার তাহাদের শিক্ষালয়ে অর্জ্জিত জ্ঞান ও লব্ধ বিদ্যা কৃষিক্ষেত্রে কার্য্যে খাটাইতে একান্ত অনিচ্ছুক। কৃষিবিদ্যার সার্টিফিকেটের জোরে তাহারা চাহেন সরকারী চাকুরী। বোম্বাইর কমার্স কলেজেও গুটিকয়েক বাঙ্গালী ছাত্র গিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়জন ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন

জানি না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে কিছুদিন পূর্ব্বেও এ দেশে পুথিগত বিদ্যারই অধিক আদর ছিল।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমরা পুথিগত বিদ্যার আদর ইংরেজের নিকট শিখি নাই। ইংরেজের দেশের কাঞ্চনকৌলিন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অল্পদিনমাত্র। এ দেশের কৌলিন্য বংশানুক্রমিক ও জন্মগত। এ দেশের দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও স্থান ছিল ধনবান ব্যবসায়ীর বহু উচ্চে। সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গেসঙ্গেই যদি ভাবজগতের বিপ্লবও ঘটিত তাহা হইলে হয়ত আরও পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেই এদেশে অর্থকরী বিদ্যার আদর ও প্রচলন হইতে পারিত। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রকৃতিগত ও রুচিগত বিশিষ্টতা কোন জাতি বা কোন ব্যক্তিই অল্পদিনের মধ্যে বা অল্প চেষ্টায় পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমাদের দেশের দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম,—তাঁহার দারিদ্র্যের জন্য নহে, তাঁহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপবীতগুচ্ছের জন্য নহে, তাঁহার সম্মানের, তাঁহার প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। এ দেশের ব্রাহ্মণেই এ দেশের culture মূর্ত্তিমান হইয়াছিল। সুতরাং ব্রহ্মণ্য যখন জন্মগত হইল তখনও ব্রাহ্মণ আগের মত সম্মান ও পূজা পাইতে লাগিলেন; আর অর্থনৈতিক বিপ্লবে যখন জীবন ধারণের সমস্যাটাই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখনও দরিদ্র অধ্যাপক তাঁহার শ্রদ্ধার আসন হইতে ভ্রষ্ট হইল না। দেশের লোক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রুচিবশে পুথিগত বিদ্যারই আদর করিতে লাগিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় আটশত স্কুল আছে। একটু খোঁজ লইলেই জানা যাইবে যে, ইংরেজশাসনের প্রাক্কালে বাঙ্গালা দেশে টোলের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম ছিল না। এই সকল টোলে আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অর্থকরী কোন বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। অধ্যাপনার সাধারণ বিষয় ছিল, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়, যাহাতে মনের ক্ষুধা মিটাইবার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও, পেটের ক্ষুধা মিটাইবার কোন উপায় হইত না। সেকালে যাহারা টোলে পড়িত একালে তাহাদেরই বংশধরেরা স্কুলে পড়ে। একটা হিসাব লইলেই দেখা যাইবে যে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। ইহারা মানসিক উৎকর্ষের জন্যই বিখ্যাত, ব্যবসায় ইহাদের কৌলিক বৃত্তি নহে। ব্যবসায়বুদ্ধির জন্য সুখ্যাতি এই সকল জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বেও অর্জ্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ততটা দায়ী নহে, যতটা দায়ী তাহাদের কৌলিক অবদান (tradition) এবং বংশানুক্রমিক রুচি। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারা আমাদের দেশে বাণিয়া বা বণিক্ নামে আখ্যাত। আমাদের সাহিত্যের, ধনপতি, লক্ষপতি, চাঁদ সদাগর সকলেই বাণিয়া ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজাইয়া সাগর পারে বাণিজ্যে গিয়াছিলেন, এমন কাহিনী আমাদের কোন পাঁচালীতেই পাওয়া যায় না। তাই

জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থেরা যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যে অক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন, তেমনই সাহা প্রভৃতি বণিকবৃত্তিধারী জাতিরা আজিও বাঙ্গালার বাজারে পূর্ব্বপ্রতিপত্তি একেবারে হারায় নাই। আরও একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। এই সকল বাণিয়া জাতির ব্যবসায়ীর মধ্যে যতটা সাধুতা (business honesty) দেখিতে পাওয়া যায়, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা পরিয়া বাজারে দোকান খুলিলেও সকল সময় ততখানি সাধুতার পরিচয় দিতে পারেন না। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্শী, মহারাষ্ট্রীয় ও সিন্ধি তিন জাতীয় ছাত্রেরাই একই প্রকারের শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু সিন্ধি ও পার্শী ছাত্রদিগের মধ্যে যে প্রকার বাণিজ্যানুরাগ দেখা যায় মহারাষ্ট্রীয়ে তাহা লক্ষিত হয় না। সুতরাং পুথিগত বিদ্যার দিকে বাঙ্গালীর যে অনুরাগ তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বাহির করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের নিকট জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি জানাইতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালা দেশের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষা পুথিগত বিদ্যাপ্রচারের ব্যবস্থা কম দেখা যায় না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি দোষ শিক্ষকের সহিত ছাত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। ইংরেজ সরকার ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে যে কারণেই হউক উদাসীন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং সরকারী বিদ্যালয় গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় গুলিতে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা কেন নাই তাহার কারণ উপলব্ধি করা কঠিন। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাস করিত। গুরুরা ছিলেন দারিদ্র্যব্রতধারী অধ্যয়ন ও অধ্যাপননিরত নিরীহ গৃহস্থ। নীতি ও ধর্ম্মের এইরূপ জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ছাত্রগণ কিরূপ অনুপ্রাণিত হইত তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এখন ছাত্রেরা মাত্র চারি পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে থাকে। এই চারি পাঁচ ঘণ্টায় তাহারা চারি পাঁচজন শিক্ষকের নিকট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করে। শিক্ষকেরা মনে করেন, স্কুলের বাহিরে আর ছাত্রদের প্রতি তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। আর অভিভাবকেরা মনে করেন, স্কুলে পাঠাইয়াই তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। সুতরাং নীতিশিক্ষার ব্যবস্থার অভাবে ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হইলে অভিভাবকেরা দেন শিক্ষকের দোষ, আর শিক্ষকেরা মনে করেন অভিভাবকের দোষেই ছাত্র বিগড়াইয়া যায়।

এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিত, যদি শিক্ষক ও অভিভাবক ছাত্রের চরিত্র গঠনে পরস্পরের সাহায্য করিতেন। কিন্তু শিক্ষকেরা সে পুরাতন আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন পিতা মাতা যে কর্ত্তব্য দিবসের ১৮।১৯ ঘণ্টা অবহেলা করিতেছেন, আমি সে কর্ত্তব্য এক ঘণ্টায় কেমন করিয়া নিষ্পন্ন করিব? বিদ্যালয়ে যে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা নাই তাহাত অভিভাবকের অজ্ঞাত নহে। অতএব ব্যাকরণের সূত্র বা গণিতের নিয়ম ব্যাখ্যা করা ব্যতীত ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। অধিকাংশ শিক্ষকই অন্য কোন বেশী বেতনের চাকরী না

পাওয়াতে অনিচ্ছাসত্ত্বেই এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন; সমাজে তাঁহারা প্রাচীন কালের অধ্যাপকের ন্যায় সম্মান লাভ করেন না। তাঁহাদের মত অধ্যয়নানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ও উচ্চ আদর্শও ইঁহাদের নাই। সুতরাং ইঁহাদের জীবনের আদর্শ ছাত্রের চিত্তে রেখাপাতও করিতে পারে না।

অভিভাবকেরা শিক্ষকের সহিত করেন 'নন-কো-অপারেশন'। স্কুলে ছাত্র কি করে, কি পড়ে, তাহার সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। বাড়ীতে ছাত্র কি ভাবে কাটায় তাহার সংবাদ শিক্ষককে দেওয়া তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না। পিতা থাকেন আফিসে, মাতা থাকেন গৃহকর্ম্মনিরত, এক এক ঘণ্টায় নিয়মবদ্ধ কাজ করিয়া এক এক জন শিক্ষকের কর্ত্তব্য শেষ হয়, সুতরাং বাঙ্গালীর ছেলেরা যদি প্রকৃত মানুষ না হইতে পারে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

অসহযোগ আন্দোলনে একটি মহৎ উপকার হইয়াছে। এখন দেশের লোকের পুথিগত বিদ্যার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। বহু অভিভাবকই বুঝিয়াছেন যে, সকল ছেলেকে বি, এ, এম্, এ, পাশ করিতে কলেজে না পাঠাইলেও হানি নাই। এখন যাহারা কলেজে আসিবে তাহারা সত্য সত্যই চিত্তের উৎকর্ষ চাহে, তাহারা cultureএর কাঙ্গাল। অপরপক্ষে ছাত্রবিদ্রোহে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের প্রশ্নটাও সকলের মনে জাগিয়াছে। শিক্ষার ধর্ম্ম ও নীতির অভাবও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এবার যখন শিক্ষাসংস্কার হইবে তখন বিশেষ করিয়া স্কুলের সহিত, গৃহের অভিভাবকের সহিত, শিক্ষকের অধীতব্য বিষয়ের সহিত, ধর্ম্ম ও নীতির ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।

ছিটে ফোঁটা

ব্যর্থ

দুজনে দেখা,—নিভৃত নিকুঞ্জে নয়, পুষ্পিত লতাবিতানে নয়, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীর তীরে নয়, ফেণোচ্ছ্বাসময় সাগরতীরে নয়, অভ্রভেদী গিরিশিখরেও নয়,—কল্‌কাতার একটা ঘুপ্‌সি গলির মধ্যে একটা সেঁৎসেঁতে বাড়ীর উঠানে।

দুজনে দেখা হল,—শারদ প্রাতে নয়, মাধবী রাতে নয়, ঊষার আলোয় নয়, নিশার কালোয় নয়, অরুণের রক্তিমা কি সন্ধ্যার ম্লানিমায় নয়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বা অমাবস্যার কালিমাতেও নয়;—তখন বাবুরা আফিস গেছেন, ছেলেরা স্কুলে গেছে, ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করে বৌয়েরা কেউ বা ঘুমোচ্ছেন, কেউ বা বটতলার একখানা বই পড়্‌ছেন, কেউ বা চুড়িওয়ালা ডাক্‌বেন বলে রাস্তার ধারের জান্‌লার খড়খড়িটা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন,—এমন এক মধ্যাহ্নে তাদের দুজনার দেখা হল।

তারা রবিবাবুর গান কখনও গায় নি, পড়েও নি, কিন্তু দেখা হতেই দুজনে,—"থমকি থেমে গেল পথ মাঝে।"

কে বলে চোখের ভাষা নেই; সেই যে তারা চোখে চোখে চেয়ে রইল, তাতে কত প্রশ্নই ফুটে উঠ্‌ল। একজনের চোখ জিগেস্ কর্‌ল,—কে তুমি? আমি ত রোজ আসি; কই তোমায় ত দেখি নি? অন্যজনও সেই কথাটাই মৌন ভাবে জিগেস্ কর্‌ল,—তাই ত! তুমিই বা কে? আমিও যে প্রতিদিন এখানে আসি;—তোমার সঙ্গে ত দেখা হয় নি একবারও!

ভাগ্যবিধাতা অন্তরালে হেসে বল্‌লেন,—এক মুহূর্ত্ত আগু পিছু আসা যাওয়াতে যে দুজনের দেখা হয় না সে আমারই কারসাজি। আজ যে দেখা হল এও আমারই খেলা।

তারা দুজনে কখনও সংস্কৃত কাব্যের প্রেমের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে নি; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত চক্ষের মিলনের পরই স্তম্ভ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণ ধীরে ধীরে তাদের শরীরে দেখা দিল।

তারা দুইজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে এল। এবার আর চোখের ভাষায় চল্‌ল না;—সে ভাষা শব্দে প্রকাশ পেল.........

ঠিক এই সময় একটি মেয়ে,—বছর বারো হবে,—ওপরের বারাণ্ডা থেকে চেঁচিয়ে উঠল,—ও বৌদি, এদের কাণ্ড দেখে যাও। এবার ধরা পড়েছে ওদের বিদ্যে।

বৌদি এসে দেখে বল্‌লেন,—আ গেল যা। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? মর্‌তে আর জায়গা পায়নি ওরা, এখানে এসে রঙ্গ দেখান হচ্ছে!

কথার সঙ্গেসঙ্গে দোতলা থেকে একখানা ঝাঁটা ঝুপ করে তাদের দুজনের ঘাড়ে প'ড়ে সেদিনকার মত এই মনোরম নাট্যের রসভঙ্গ করে দিল। উঠানরূপ রঙ্গমঞ্চ থেকে মাছের কাঁটার অধিকারসাব্যস্ত করা ফেলে তারা দুজনে দুদিকে বেগে প্রস্থান করল।

যাবার সময় একজন রোমাঞ্চিত শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে শব্দ করে উঠল,—ম্যাও। অন্যজন আরও একটু ফুলে উঠে অপর প্রান্ত থেকে উত্তর দিল,—ফ্যাঁস্।

স্বপ্ন

উঃ! সে এল না। তা'র পথ চেয়ে সারাটা দিন কেটে গেল,—সে এল না। রাস্তায় কত লোক আসে যায়, আর আমি আগ্রহে তাকাই; তা'র পায়ের শব্দ ভেবে কতবার চম্‌কে চেয়েছি। পথ চেয়ে চেয়ে প্রায় সারাটা দিনের অনাহারে তন্দ্রা এল; আর সেই তন্দ্রার স্বপ্নে দেখ্‌লাম সে এসেছে। আগ্রহে তার পানে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু কৈ? হাতে সন্দেশের ঠোঙ্গা নাই,—এটা স্বপ্ন। সে টাকা নিয়ে একেবারে সরে পড়েছে।

খেয়ালি

এক্ যে ছিল নেলা-খেপা এক-বগ্গা খেয়ালি,
কর্‌ত শুধু রচনা সে নিত্য নূতন হেঁয়ালি।
দেখ্‌লে তাকে, আঁচল-মুখে হাস্‌ত যত স্ত্রীলোকে ;
বালক ছাড়া কেউ ছিল না শ্রোতা তাহার ত্রিলোকে।
শোলোক পড়ে' কর্‌লে প্রশ্ন, দিত না কেউ উত্তর-ই,
যুবায় কর্‌ত উপহাস, বুড়ায় বল্‌ত—ধুত্তোর-ই।

বস্‌ত ঘিরে ছেলে পিলে, শুন্‌ত ধাঁধা গা-করে',
যুট্‌তনাক জবাব কিছু, থাক্‌ত মিছে হাঁ-করে'।
পড়্‌ল কবি—"মানুষ কেন হাঁপিয়ে মরে কর্ম্মেগো ?
না থাক্‌লেই মাথা, কেন মাথার ব্যথা জন্মে গো ?"
বল্‌লে একটা দুষ্ট ছেলে—"উল্টা কেন অবস্থা ?
দিনের বেলায় কাজকর্ম্ম, রাত্রে শোবার ব্যবস্থা ?"
ধাঁধা গেল উড়ে পুড়ে পরিহাসের দহনে ;
মনে হ'ল বৈরাগ্য, কবি গেলেন গহনে।

ভাব্‌ল কবি—মানুষ গুলা ঘরে কেন বন্দীরে ?
দেবতা কেন শেওড়া গাছে, ভূতের বাসা মন্দিরে ?
আওড়াতে সে মন্ত্রটুকু, অস্তে গেলেন সবিতা ;
নেমে এলেন বনদেবী, শুন্‌তে ধাঁধার কবিতা।
দেবীর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে খেয়ালি,
জিজ্ঞাসিল প্রশ্নে তাকে সদ্য-রচা হেঁয়ালি।

প্রশ্নে কহে ধাঁধার কবি, নত করে' জানু সে ঃ
"দেবের ভাগ্যে দুঃখ কেন, সুখী কেন মানুষে ?" •
দেবী কহে—"ধাঁধা সবই, এস কবি খেয়ালি !
আঁধার পারে দেখ্‌বে ধাঁধা তারার ঘরে দেয়ালি।
সাপের যেন ছুঁচা গেলা, মাছের গেলা বঁড়শিগো !"
উড়্‌ল কবি ; খুঁজ্‌ল না তায় কোন পাড়া পড়সিগো !
দেখ্‌ল কবি, নূতন ধাঁধা লেখা তারার কাম্‌রাতে ঃ—
বুকের পাড়ে দুঃখের বাসা, সুখের বাসা চাম্‌ড়াতে।

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু, নামাও—

কলিকাতায় ট্রাম-ধর্ম্মঘট।

টমাস্ ও রামরাম বসু

টমাস কে ?

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের ফেয়ারফোর্ড নগরে টমাসের জন্ম হয়। টমাস ডাক্তারী পাশ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় প্রাজ্ঞ হইয়া উঠেন।

কিন্তু চিকিৎসা তাঁহার ধাতের জিনিষ নয়, ধর্ম্ম লইয়াই টমাস পাগল হইয়া পড়েন। ঠিক গোঁড়ামি বলিলে বুঝা যায় না, ধর্ম্মরাজ্যের যে সীমানায় গেলে পাগলা-গারদটা খুব দূরে থাকেনা, টমাস প্রায় সেই সীমানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্ন-বোদ্ধা, অর্থাৎ যাহা কিছু স্বপ্নে দেখিতেন, তাহারই মধ্য থেকে বাইবেলের কোন রহস্য কিম্বা যিশুর কোন আদেশ বুঝিয়া লইতেন। শুধু বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না,—সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে জীবনের কর্ম্মপ্রণালী বহাইয়া দিতেন। টমাস ডাক্তারী ছাড়িয়া ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে পাদ্রী হইয়া আসেন। এখন যে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ এত বড় খ্যাত-নামা, টমাসই তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। তারপর কেরি, মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশের লোক তখন তখনই দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় হাত পাতিয়া লইল না ; ভক্ত টমাস বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে একটা কাঁকড়া, —সেটা তার তীক্ষ্ণ পাদহুল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে এবং তারপরই আবার কাঁকড়াটা সদ্য সদ্য একটা পদ্ম-ফুলে পরিণত হইয়া গেল। এই স্বপ্নে টমাস নিশ্চয় করিয়া যিশুর মহিমা বুঝিলেন,—বাঙ্গালীরা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে সত্য, কিন্তু অচিরাৎ তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, কাঁকড়া পদ্ম-ফুল হইয়া দাঁড়াইবে। এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তাঁহার সমস্ত অবসাদ ও নৈরাশ্য দূর হইল এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের বিজয়-কেতন যে শীঘ্র এ দেশে প্রোথিত হইবে—তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনই দ্বিধা রহিল না। শুধু স্বপ্ন নহে, মানুষের কথা-বার্ত্তা হইতে অতর্কে উচ্চারিত দুই একটি কথার মধ্যে তিনি যিশুর আদেশ বুঝিয়া ফেলিতেন। একদিন কোন গুরুতর বিষয়ে চিঠি লিখিয়া তাহা ডাকে ফেলিতে যাইবেন, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী খালে মাঝিদের কথা-বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। টমাস বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন—তিনি শুনিলেন এক মাঝি আর এক মাঝিকে বলিতেছে, "জমিদার মারে—কাল যাবে।" এই অনির্দ্দিষ্ট বাক্য তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া যিশুর কি একটা আদেশ বুঝাইল। তিনি চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং সেই মাঝির উক্তিতে প্রভু তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তদনুসারে নূতন এক চিঠির খসড়া প্রস্তুত করিলেন।

শঠের পাল্লায়।

এমন লোককে প্রতারণা করা খুব সহজ। কেউ যদি তাঁহাকে আসিয়া বলিত "মহাশয়, প্রভু যিশু ভিন্ন আমার আর গতি নাই", কিংবা কোন স্বপ্নের উল্লেখ করিত—তবে টমাস ভক্তিতে গলিয়া যাইতেন এবং জানু পাতিয়া বসিয়া গলদশ্রুচক্ষে খ্রীষ্টের মহিমা স্মরণ করিতেন। তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক টমাসের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাহা তাহাদের সুবিধায় লাগাইয়া দিল।

একদিন পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় রাত্রি দুইটার সময় কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল, এবং তাহার হাত ধরিয়া বদনচন্দ্র অধিকারী কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "বল কি হইয়াছে ?" বহু জিজ্ঞাসার পর মুখুজ্যা বলিল, "ঈশ্বরের দূত স্বরূপ টমাস পাদ্রীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি! আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন নরকাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—এবং তাহা আমাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে, এ সময়ে ঈশ্বরের একমাত্র জাত-সন্তান যিশু ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে ?" এই কথা শুনিয়া বদন অধিকারীর চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না,—দুই জনে হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া পাদ্রীধামে উপস্থিত হইল! পাদ্রীর সরল চক্ষের জল, ঐ দুই ব্যক্তির কপটাশ্রুর সঙ্গে মিশিয়া বিষামৃতের সৃষ্টি করিল। টমাস তদবধি এই দুই জনের বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের ভার নিজে লইলেন, এবং তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিতে যাইয়া নিজে এরূপই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, একবার তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল এবং দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহার উত্তমর্ণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া আসিল। অথচ প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের নাম শুনিয়া দুটি বাঙ্গালী বন্ধুর দেহ যতই কণ্টকিত হউক না কেন, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব হইলে নানা ওজুহাতে তাহারা দিন পিছাইয়া দিতে লাগিল। মুল কথা, তাহারা পাদ্রীদের খরচায় দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা প্রভৃতি পালন করিয়া চিরকালই মহাসুখে দিন গুজরাণ করিয়াছে, কোন কালেই খৃষ্টান হয় নাই।

রামবসু।

কিন্তু তৃতীয় শঠের নাম বলিতে স্বতঃই আমাদের দ্বিধা হয়। তিনি বর্ত্তমান বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি ষোলবর্ষ বয়সে আরবি ও পারশী পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচড়ায় এক প্রধান কায়স্থ বংশে অনুমান ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহারা এককালে বঙ্গদেশের জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের কোপানলে পড়িয়া এই বংশ সর্ব্বস্বান্ত হন। রামবসু ইংরাজিতেও বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন—রামবসুর মত একান্ত অধ্যয়ন-নিরত পণ্ডিত তিনি দেখেন নাই। টমাস তাঁহার জারনেলে লিখিয়াছেন, "এই বঙ্গদেশের নিঃসঙ্গ কষ্টকর

জীবনের একমাত্র সুখ—রামবসুর সঙ্গ।" কেরি ও টমাসে গলায় গলায় ভাব ছিল। কিন্তু কেরি তাঁহার জারনেলের এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"টমাস হইতেও রামবসুকে আমার ভাল লাগে।" রামবসু এত দূর মুক্তহস্ত ও বদান্য ছিলেন যে কেরি লিখিয়াছেন "তাঁহার একদিনের মুক্তহস্ততা দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। য়ুরোপের ভদ্রবংশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিও যদি এরূপ মুক্তহস্ততা দেখাইতে পারিতেন, তবে তাঁহারও গৌরব বৃদ্ধি হইত।" রামবসুর কথা বলিবার কায়দা এমনই চমৎকার ছিল যে, টমাস এবং কেরি উভয়ই বহু স্থানে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই প্রতিভাবান লেখক পূর্ব্বোক্ত দুই শঠের সমব্যবসায়ী ছিলেন,—বিশেষ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা রামবসু পাদ্রীদিগকে এমনই বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শত শত শঠতা—যাহা আমাদিগের নিকট দিবালোকের মত পরিষ্কার বোধ হয়—তাহা পাদ্রীদের চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছে। রামবসু বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথ—গুরুস্থানীয়, কিন্তু তাহা লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব। একাধারে এত গুণের সঙ্গে ধূর্ত্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রকারে থাকিতে পারে- রামবসুর চরিত্র তাহারই একটা দৃষ্টান্ত স্থল। পদ্মলতা ও চন্দনতরুর গা জড়াইয়া যেরূপ ভীষণ অজগর থাকে, রামবসুর উৎকৃষ্ট গুণগুলির সঙ্গে সেইরূপ ভয়াবহ ও জঘন্য দোষের সমাহার হইয়াছিল।

কৃতঘ্নতা ও ব্যভিচার।

যে বৎসর টমাস বঙ্গদেশে আগমন করেন সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রামবসু মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। রামবসু টমাসকে বাঙ্গালা শিখাইয়াছিলেন, এবং বাইবেলের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অনুবাদে পাদ্রী সাহেবকে বিশেষ সহায়তা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব বাইবেলের যে বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করেন, রামবসু এই সময় তাহার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন। টমাসকে বিশেষরূপে হাত করিবার উদ্দেশে রামবসু খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার তথা-কথিত অনুরাগ দেখাইতে সুরু করেন এবং যিশু সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় এক গান রচনা করেন। গানটি আমার কাছে আছে। ঐ গানটি টমাস সাহেব ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। সে তর্জ্জমাটিও আমি পাইয়াছি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এই যিশুস্তোত্রটি বঙ্গদেশের গির্জ্জাগুলিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক পুস্তক লিখিয়া রামবসু বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং পাদ্রীসাহেবের বিশেষ পেয়ারের হন। তিনি টমাসের চোখের তারার মত প্রিয় হইয়াছিলেন। কেরি সাহেব পরবর্ত্তী সময়ে যেখানে খৃষ্টমহিমা প্রচার করিতেন, রামবসু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সেই সেই স্থানে জনবৃন্দকে বাঙ্গলা ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন।

কিন্তু এ সকলই ভুয়া। বদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখার্জ্জির সঙ্গে ফন্দী আঁটিয়া রামবসু নানা ছুতায় সাহেবদিগের কাছ থেকে টাকা আদায় করিতেন। মৌখিক যিশু-ভক্তি সত্বেও এই ত্রিমূর্ত্তি কখনই সাহেবদের সঙ্গে বসিয়া খাইতেন না, সাহেবের মড়া ছুঁইতেন না, এবং সাহেবদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করিতেন না। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মের দীক্ষার কথা উঠিত, তাহা হইলে তিন জনে একত্র হাত জোড় করিয়া বলিতেন "ব্যস্ত কেন? সেতো হবেই।" একবার বলিলেন "নবদ্বীপে যাইয়া দীক্ষা লইব।" কেরি ও টমাস তথায় যাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্ত-কোম্পানী চম্পট দিলেন।

প্রতিবার এই ভাবে প্রতারিত হইয়াও সাহেবদের মোহ ভাঙ্গিল না,—তাঁহাদের আশা ফুরাইল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও পাদ্রীরা পুনঃ পুনঃ রামবসু-এবং-কোম্পানীকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পর যখন ইঁহাদের ভুল ভাঙ্গিল, তখন টমাস্ এক দিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এদের কথা কি বলিব! এই সব বাহ্যিক খ্রীষ্ট-ভক্তি সত্বেও স্বয়ং খৃষ্টও যদি উপস্থিত হন, তবে ইঁহারা তাঁহার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে না।"

একবার টমাস বিলাতে গিয়াছিলেন। তারপর তিনি কেরিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলে শুনিতে পাইলেন, রামবসু খ্রীষ্টভক্তিতে ইতি দিয়া দিব্য দুর্গোৎসব ও দোলোৎসব করিয়া বেড়াইতেছেন। কেরি সাহেব কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তখন রামবসু ন্যাকা সাজিয়া বলিলেন—"খ্রীষ্ট ধর্ম্মে যে বিগ্রহ পূজা নিষিদ্ধ, তাহাতো জানিতাম না—ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা তো মন্দিরে যিশু ও মেরীর আরতি ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষ আমার বড় আমাশা হইয়াছিল। আমি পূজা-আর্চ্চায় যোগ না দিলে আমার কুটুম্ব-স্বগণ কেউ আমার চিকিৎসা শুশ্রূষা প্রভৃতি করিতে রাজি হয় নাই।" টমাস সরলপ্রাণে তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব গুলি রামবসুকে কেন ভাল করিয়া বুঝান নাই, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন, রামবসু তাঁহার বন্ধু রাজা রামমোহনের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কখনই নয়। তাহা হইলে কি দেবদেবী পূজা তিনি এত ঘটা করিয়া করিতে পারিতেন?

কিন্তু ইহার পরে তিনি আরও ভয়ানক শঠতা করিয়াছিলেন। এক কায়স্থ বিধবার গুপ্ত অনুরাগের ফলে তিনি ভ্রূণ হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। তখন তিনি টমাসের মুন্সীগিরী ছাড়িয়া কেরির মুন্সী হইয়াছিলেন। কেরি যথাসাধ্য নিজকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এই অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু যখন ঘটনা উৎকটভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল তখন আর তিনি কি করিবেন?—রাম বসুর মুন্সীগিরি আর টিঁকিল না। কেরি দুঃখের সহিত রামবসুকে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রামবসুর এমনই পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভা ছিল যে, কেরি পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী দিলেন। এই কার্য্যে রামবসু তাঁহার মৃত্যু

পর্য্যন্ত বহাল ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে রাম বসুর মৃত্যু হয়, তৎপর কেরি তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসুকে সেই কার্য্যে বহাল করেন।

টমাস কেন পাগল হইলেন।

বস্তুতঃ টমাসের ন্যায় সরলবিশ্বাসী, খৃষ্ট-ভক্ত ব্যক্তি দুর্লভ ছিল। ১৪ বৎসর কাল ক্রমাগতঃ উক্ত তিন বন্ধু ইঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার লোভ দেখাইয়া আশা ও নিরাশায় এরূপ উত্তেজিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন হর্ষবিষাদে ক্রমাগত দোল খাইতেছিল। তাঁহার মাথা কোন কালেই ঠিক ছিল না। কিন্তু ১৪ বৎসর পরে (১৮০০ খৃঃ) সত্য সত্যই তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণ পাল নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই দিনকার অসহ্য সুখ টমাস বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি সারারাত্রি আনন্দের চোটে লাফাইতে লাগিলেন,—কোন সময় জানু পাতিয়া বসিয়া, কোন সময় দাঁড়াইয়া, কোন সময় অট্ট হাসিয়া, কখনও বা ঝর ঝর চোখের জল ফেলিয়া, যিশু-মহিমায় এমনই গদগদভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, কেরি প্রভৃতি বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা তাঁহাকে হাতে হাতকড়ি পরাইয়া পাগলা গারদে লইয়া গেলেন।

রাম বসুর বাঙ্গালা।

এটি স্থির কথা, বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীনতর নমুনা যতই থাকুক না কেন, রামবসুই আধুনিক গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ছন্দের গদ্যে প্রতাপাদিত্যচরিতের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক কেহ লেখেন নাই। পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের একটা খুঁৎ ধরিয়াছেন,—রামবসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট ব্যূহের সৃষ্টি করিয়া অনেক স্থলে তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণবুদ্ধির অগম্য ও অনায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—সে তুলনায় রামবসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। বিশেষ তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন, দরবারের চিত্র দিয়াছেন,—সেখানে মুসলমানী শব্দ তখন চলিত ছিল, তিনি তাঁহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? একথা নিশ্চয় যে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা যে যুগে বাঙ্গালা গদ্যটাকে সংস্কৃতে পরিণত করিবার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন সে যুগে মুসলমানী শব্দের উপর একটা বিদ্বেষ খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই ছোঁয়াছে রোগের জন্য রামবসুর লেখা ততটা আদর সে সময়ে পায় নাই। কিন্তু পণ্ডিত-মহলে এ পুস্তকের প্রতিষ্ঠা যে বিশেষরূপ হয় নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জার্ম্মানিতেও পুস্তকখানির খোঁজ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সাহেবদের মত কতকটা নিজেদের অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, এজন্য লঙ্গ সাহেব তাহার গ্রন্থ তালিকায় এই পুস্তকের

মুসলমানী প্রভাবের নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় ঐ নিন্দা পুনরায় বিঘোষিত হইয়াছিল। পুস্তক খানির লেখা আগাগোড়া সাধু ভাষায় পরিণত করিয়া কয়েক বৎসর পরে হরিশ তর্কলঙ্কার আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু এ সকল সত্বেও রামবসুর পুস্তকখানি আমাদের নিকট অতি উপাদেয় মনে হইতেছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ খাঁটি, বাহুল্যবর্জ্জিত, এবং সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার ইতিবৃত্তের অংশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী প্রভাব-বর্জ্জিত। এই পুস্তক সেই যুগের বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ। রামবসুই বঙ্গবাণীর এই যুগের আদি সেবক। তাঁহার চরিত্রের ক্রটির জন্য তিনি জীবনে অনেক নিন্দা সহিয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের বিচারে আমরা তাঁহার চরিত্রেব কথা তুলিব না, বরং বাগ্দেবীর পায়ের বড় পদ্ম কুসুমের মালাটি, তাঁহার গলায় পরাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।

রাম বসুর লিপিমালাও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হয়। চ্যাটারটন হইতে লর্ড বায়রণ পর্য্যন্ত অনেক লেখকের চরিত্রের ক্রটীর জন্য তৎসময়ে সমালোচকগণ তাঁহাদের লেখার যথাযথ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, রাম বসুও ইঁহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

জাতীয় চরিত্র।

এখানে একটি কথা বলা উচিত,—রামবসু ও তাঁহার দুই বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ম্যাকলে আমাদিগকে সেই যুগে যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন নহে। যে যুগের কথা হইতেছে সেই যুগেই আমাদের সমাজে রাজা রামমোহনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয় এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে শপথ লইতে হয়; ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণের হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন,—প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে ত্রিরাত্রি তিনদিন উপবাস করিয়া রহিলেন,—প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি আদালতে শপথ করিবেন না,— এই তাঁহার পণ। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কেরি সাহেব বিচারপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন,—"এই কুসংস্কার সত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকে, আমাদের খৃষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ অনুরাগের সিকি ভাগও দেখিতে পাই না।" এই সময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম

দেখাইয়া সতীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হ্যালিডেপ্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কেরি ও টমাস নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতগণের যে আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা হিন্দু সভ্যতার গৌরব চাক্ষুষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সমাজের সাধুতা অনেক সাহেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং বদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দুটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত শঠের ব্যবহার জাতীয় চরিত্রের নিদর্শন নহে। পৃথিবীর সকল সমাজেই এরূপ চরিত্র সুলভ। আমরা রামবসুর ন্যায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যবহার স্মরণেই বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু অন্যদেশেও সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ চরিত্রের অভাব নাই।

রামবসু যে খৃষ্টীয় সমাজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এদেশে খৃষ্টীয় গির্জ্জা স্থাপনের প্রয়োজন দেখাইয়া তিনি বিলাতে যে চিঠি লিখিয়াছেন, সেই চিঠি ও তাহার উত্তর আমরা দেখিয়াছি এবং একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে বঙ্গদেশে আধুনিক ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠার মূলে রামবসুর সেই চিঠি অনেকটা কাজ করিয়াছিল। রামবসুর সাহায্য ভিন্ন টমাস ও কেরি কখনই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিতে পারিতেন না। কলিকাতার ৪২ মাইল পূর্ব্বে দেহাটা নামক গ্রামের জমিদার রামবসুর খুল্লতাত ছিলেন। রামবসুর চেষ্টায় সেই অঞ্চলে পাদ্রীরা অনেক জমি অতি সুবিধায় পাইয়াছিলেন এবং রামবসুর সেই খুল্লতাতের কলিকাতাস্থিত মাণিকতলার বাসভবনে কেরি সাহেব বিনা খাজনায় অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং রামবসু যে খৃষ্টান সমাজের নানারূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেরি ও টমাস শেষ পর্য্যন্ত একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, রামবসু তাঁহাদের সঙ্গে শঠতা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস রামবসু হিন্দু-সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া দীক্ষা লইতে পারেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামবসুর বেতন ছিল ৪০৲ টাকা। সেই সময়ে এই বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না, স্বয়ং কেরি বঙ্গদেশে আসিয়া বোধ হয় ইহার অধিক অর্থ মাসিক পাইতেন না। টমাস মাসে ২০০৲ শত টাকা খরচ করেন শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়, যাহাকে কেরি এবং মার্সমান ডাঃ জনসনের সমকক্ষ মনে করিতেন, তাঁহারই বেতন ছিল মাসিক ২০০৲ টাকা!

এই সন্দর্ভের প্রায় সকল কথাই মৌলিক। এই বিষয় লইয়া আমি রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপ লেকচার বিস্তৃত ভাবে প্রস্তুত করিব। কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে আমি এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা সেই সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিব। অতি সংক্ষেপে এই স্থানে আমরা বিষয়টির আলোচনা করিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হারানো খাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বার খোল ওগো দ্বার খোল ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—
ঘর ছাড়া মোরে যে করিল ওরে,
তারই ঘর খুঁজি দেশ দেশ।

পরিমল।

সমস্ত দিনের আমোদপ্রমোদ পরিসমাপ্ত করিয়া যখন সপারিষদ রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুর প্রমোদোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাগমন কল্পনায় লাল কঙ্করযুক্ত—ঝাউ, কামিনী, করবী এবং অরোকেরিয়া কুঞ্জচ্ছায়াসুশীতল—উদ্যানপথ অতিক্রম পূর্ব্বক ফটকের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন সবেমাত্র সরমরাগজড়িত শিথিলচরণে সন্ধ্যাদেবী সেই কাননপথে নামিয়া আসিতেছেন।

বসন্তের অপরূপ সজ্জাসম্ভারে সেদিন রাজোদ্যানের আগাগোড়া ভরিয়া আছে। কেয়ারি করা যুঁই, বেল, মল্লিকার আপাদমস্তকের সবটুকুই ফুলে ভরা—গন্ধের পিচকারী দিকে দিকে ছুটিতেছে। রাজা বাবুর বড় সাধের গোলাপ বাগানে বর্ণ-গন্ধের সমারোহটা সব চেয়ে বেশী। টক্‌টকে লাল 'মণ্টিকৃষ্ণ,' বহুদলযুক্ত সুবৃহৎ 'ভিক্টোরিয়া,' হল্‌দে গোলাপ, সাদা গোলাপ এবং মোমে গড়ার মত ছোট ছোট গোলাপী গোলাপগুলি সত্য সত্যই বাগানটাকে আলো করিয়া রহিয়াছে।

একধারে বিশেষ নামজাদা কলমের আমগাছে মুকুল দেখা দিয়াছে, ওদিকে সখের ঝিলে সাধের তরণী "পরিমল" ভাসিতেছে; বাবুরদল এতক্ষণ উহাতেই জল-বিহার করিতেছিলেন। এদিক সেদিকে দুচারিটা কণ্ঠিতিলকপরা উড়িষ্যাবাসী মালি ক্ষিপ্রহস্তে এগাছ ওগাছ হইতে ফুলপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বাবুদের জন্য তোড়া প্রস্তুত করিতেছিল। রাজাবাহাদুরের বন্ধুবর্গ অন্যমনস্কভাবে অলসকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন,—

হেলা ফেলা সারাবেলা
একি খেলা আপন মনে,—
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।

ফটকের বাহিরে একখানা মোটর গাড়ী ও হাতীর মত বড় কালো ঘোড়া যোতা একখানা

ঝক্‌মকে ল্যাণ্ডো গাড়ী ইঁহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাবুদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চামরঝুলান ঝুটাজরির চমকদার পোষাকপরা সহিস কোচম্যান, মায় যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গালপাট্টাওয়ালা, দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎ শমনসদৃশ, বাগানবাড়ীর দ্বারপালেরা আভূমি নত হইয়া সেলাম ঠুকিল।

তখন রাজা নরেশচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তাহলে নলিন্! আজ না হয় বাড়ীই ফেরা যাক্—সন্ধ্যেও হয়ে গেছে ; আর একদিন তখন তোমাদের 'সুষমাকুটীরের' ওদিকে বেড়িয়ে আসা যাবে, কি বলো হে ?"

নলিন্ বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল সেই সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোকটী ঈষৎ অভিমানভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছাড়াছাড়া কথায় জবাব দিলেন, "সে আপনার অভিরুচি। আমি আর তাতে কি বল্‌বো বলুন ? তবে দেখুন, সব বিষয়ের ত একটা সীমা আছে। আপনি যেন সেই সীমাটা না ছাড়িয়ে যান, এই টুকুই শুধু আমাদের মনে করিয়া দেওয়া।"—এই বলিয়া আর একজনের দিকে চাহিয়া নলিনবাবু নিজের যুক্তিটাকে আর একটুখানি জোর দিবার জন্যই যেন সাক্ষ্য মানিয়া কহিলেন,—"কি বল হে ননীবাবু ! অতটা বাড়াবাড়িই কি ভাল ?"

ননীবাবু সম্বোধিত হইয়া একটুখানি বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন, এই লোকটী নরেশচন্দ্রের ধাতুর সহিত আজীবন ধরিয়া বিশেষভাবেই পরিচিত ছিল। সকল বিষয়েরই চরমে গিয়া পৌঁছানই যে ওই মানুষটীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বা দোষ এ খবর সে জানিত, তাই ইহার বিপক্ষে মত দিতে গিয়াও তাহার বাধিল।

নরেশ একটু অসহিষ্ণুভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ভাবের উচ্ছ্বাসে সীমা যদি কোথাও ছাপিয়ে পড়ে আমি তাতেও কোন দোষ দেখিনে। মাপকাটি দিয়ে মেপে মেপে যে পথচলা, তারচেয়ে আমার পক্ষে অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁৎরে পার হওয়াও ঢের সহজ।"

কথার সুরে ও ভাবে অসন্তোষের আবেগ বুঝিয়া সহচরেরা নিজেদের পথ চিনিয়া লইল। ননী বলিল "আমারও সেই মত। আমাদের রাজার এখন 'সুষমাকুটীরের' চাইতে 'রাণীসদনে' হাজির হয়ে পড়া ঢের বেশী সঙ্গত।"

রাজার প্রবীণ বন্ধুটী এতক্ষণ স্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন ; এতক্ষণে নিজের আসরে নামিবার সময় আগত বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"তা বই কি ! নাতি আমার এখন ঘরে নূতন রাণী এনেছেন, কুটীরবাসী হতে গেলেন এখন কোন দুঃখে ! ওসব পচা পরামর্শ তুমি কানে তুলোনা হে ভায়া, চটপট গাড়ীতে উঠে গাড়ী ছুটিয়ে দিয়ে একেবারে সেই পদপল্লবে গিয়ে হাজির হওগে। যদি ইতিমধ্যে মানভঞ্জনের অবস্থা ঘটে উঠে থাকে, তাহ'লে সেই রাঙ্গা পা দুটি বুকে তুলে নিয়ে এম্‌নি করে গাইবে,—

'ভাঙ্গবো বাঁশি ত্যজবো প্রাণ,
রাধে, এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
নহে, এই পায়ের নুপুর বেঁধে গলে
আমি পশিব যমুনা জলে'—

"আরে দাদা, এ যে রীতিমত কেত্তন সুরু করে দিলে। তবে না হয় আর একটু বসে গানটার শেষ পর্য্যন্ত শোনাই যাক্।"

"ঠাকুদ্দা আমাদের যত বুড় হচ্চেন, ততই যেন ওঁর রসের ধারা প্রাণের মধ্য থেকে উথ্‌লে উঠে গড়িয়ে গড়িয়ে উপ্‌চে পড়চে।"

"ঠিক বলেচ দাদা ভাই! এরই জন্যেই না শিং ভেঙ্গে এই সকল বৎসবৃন্দের মধ্যে বিরাজ কর্‌চি, যৌবনের সে সহস্র বাতির মুখ থেকে একটু একটু ফিন্‌কিও যদি উড়ে এসে এই পোড়া শল্‌তেটায় কোন গতিকে ঠেকে যায়।"

উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যে শব্দবিরল কাননপথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণপরে নরেশচন্দ্র বলিলেন,—"কি গ্রহ! আজ কি এই খানেই রাত কাটাবেন নাকি?"

ঠাকুরদা আলস্যবিজড়িত ভঙ্গিতে কহিয়া উঠিলেন, "তা যদি বল্লে ভায়া, তবে বলি,—তোমার ঠান্‌দির স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় ঘরটান তো আমার ফুরিয়েই গেছে। আজ এই কুঞ্জবনটার মায়া যেন আমার কাট্‌তেই চাইচে না!"

"শূন্য কুঞ্জে শ্যাম সোঙরি লুটত লুটত রোয়ত রাই।"

"তাই নাকি? কিন্তু এখানে তো অপর্য্যাপ্ত ফুলের গন্ধ ও মলয় সমীরণ সেবন করেও তোমার ও রাক্ষুসে পেট ভরবে না দাদা। সেটার সম্বন্ধে—"

"আঃ পাগল! তোরা এখনও নেহাৎ নাবালক আছিস, দেখতে পাই! ওরে হরিধন ঘোষালকে কি তেমনিই কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ তোরা? এই ক্যাম্বিসের ব্যাগে যা ভরে নেওয়া গেছে, সে তোদের মত চারটে জোয়ানমর্দ্দর খোরাক। তার উপর এবেলা তোরা মুখ্যুরা যখন সরবতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলি, আমি সেই সুযোগে ওবেলার অবশিষ্ট তালশাঁস-সন্দেশগুলো আর গোলাপজলভরা রসগোল্লা গণ্ডা চারেক পার করে দিয়েছি।"

"শোন কথা! ঠাকুরদা বলে কিরে? এ কুম্ভকর্ণ দাদাটীকে ঘাড়ে নিয়ে পুষ্‌তে ভাই তোমাদের মত রাজারাজড়াদেরই সাজে। আমাদের মত হাল্কা কাঁধে—"

"ধ্যাঃ—আমাকে কি তেম্‌নি ছ্যাবলা পেয়েছিস যে আমি নিজের ভার সইবার মতন একটা আশ্রয়ও খুঁজে নিতে পারিনে! মাধবিকা সহকার তরু ব্যতীত অপর কাহাকেও আশ্রয় করে না—"

আবার একটা তরল হাস্যতরঙ্গ উত্থিত হইয়াই মধ্যপথে অকস্মাৎ কিসের একটা বাধায় চকিত হইয়া থামিয়া গেল।

ফটকের পাশেই যে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটি অনেকখানি স্থানে স্বায়ত্ত শাসন বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ হইতে একটা আকস্মিক ক্ষীণস্বর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, "অনাহারে প্রাণ যায়, যদি কেউ একটুখানি দয়া করেন—"

একসঙ্গে সবকয়টা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হইল। তা, ব্যাপার কিছুই অসাধারণ নয়। সদাসর্ব্বদাই যে রকম ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দীন ভিখারীকে ওই রকম জায়গাতেই দেখিতে পাওয়া সম্ভব, এও ঠিক সেই একই ব্যাপার। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়পরা একটা অনশনক্লিষ্ট কঙ্কাল-শীর্ণ ভিখারী পথিক পথের ধারে দারুণ নৈদাঘ রৌদ্রের তাপদাহ কথঞ্চিৎ নিবারণাশায় গাছের ছায়ার আশ্রয়ে পড়িয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে নিজের প্রবল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ধনিবৃন্দের প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের এক কণা মাত্র ভিক্ষা করিতেছে। এই তো জগৎ! সংসারের নিয়মই ত এই! সর্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজা সিংহাসনের পদতলে অনশনব্রত ভিখারীর ধূলিশয্যাব্রত আজ নূতন নয়। এ সংসারে জন্মিয়া এই দৃশ্যের মাঝখানেই মানুষের যে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। এ দৃশ্যে মানুষ অহরহই ত ডুবিয়া আছে। এর চেয়ে সহনীয় তাহার বলিতে গেলে আর কিছুই নাই। যে ঐশ্বর্য্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সে ভ্রমেও কখন মনে করে না যে তাহার সেই সম্মানের আসন কত দুঃখার্ত্তের মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া রচিত; আরও ভাবিয়া দেখে না যে, যে দীন দরিদ্রের বক্ষ আজ সামান্য কীটানুর মতই অনায়াসদর্পভরে নিজের মোটরের চাকার তলায় পিষিয়া দিয়া সে অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, তার সে দর্পও শুধুই সেই অবহেলিত নগণ্যেরই কৃপার দান। বস্তুতঃ, দরিদ্র বড় সহিষ্ণু, সে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ধনীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়; তাই না তারা তাদের এমন করিয়া দলিতে অবসর পায়। এরা যদি একবার নিজের শক্তি বুঝিয়া ধনীর অত্যাচারের প্রতিবিধান চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে মহামহৈশ্বর্য্যময় সিংহাসনও যে সেই দারিদ্র্যশক্তির পদতলে চূর্ণিত হইয়া ধূলিধূসর হয়, তাহারও ইতিহাসে প্রমাণাভাব নাই। তা যাক্ সে কথা,—সেই ভিখারীটার প্রতি নজর পড়িতেও একটা তাচ্ছল্যভরা অধরকুঞ্চনেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত, যদি না ঠিক সেই সময়েই রাজাবাবুর দ্বারবান ও পদাতিকদ্বয় রাজাবাবুকে সেই অভাগাটার দিকে চোখ ফিরাইতে হওয়ায় নিজেদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি বোধে উহার ক্ষালনার্থ সেই হতভাগ্য ভিখারীর দিকে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইত।

"এই বদ্‌মাস্! এই শালে! হিঁয়া কাহে বৈঠা হো! জলদি নিকালো হিঁয়াসে"—এবং ইহাতেও তাহাকে পলায়নপরাঙ্মুখ দেখিয়া দুইজনে তাহার দুইটা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টভাষায় "নিকালো শালে", "ভাগো হিঁয়াসে" "তু চোট্টা হায়", ইত্যাদি সম্ভাষণও চলিতে লাগিল।

লোকটা উঠিল না, পরন্তু নিঃশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়াই বড়লোকের নিমকহালাল ভৃত্যবর্গের বজ্রকঠিন হস্ত হইতে মুক্তি পাইল না।

" এঃ চোট্টা আদমি ঢং দেখাতে হো—"এই বলিয়া যদুনন্দন চৌবেজী নিজের সরল শাল-যষ্টিবৎ দেহখানি ঈষৎ বক্র করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইতে গিয়া সহসা পিছনে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোরকণ্ঠের সম্বোধনে বিস্ময়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল যে, সেই—" ওঝা, চৌবে, তফাৎ যাও" বলিয়া তাহাদের অক্ষুণ্ণ মহিমার খর্ব্বকারী, স্বয়ং তাহাদের রাজাবাবু! ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা শিকার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নরেশচন্দ্র সেই লাঞ্ছিত ভিখারীটার নিকটে আসিয়া ব্যগ্রকরুণকণ্ঠে বলিলেন "এরা তোমায় লাগিয়ে দিয়েছে কি? আহা, তোমার দুদিন খাওয়া হয়নি বল্‌ছিলে, এই নাও, কিছু দিচ্ছি।"

কোন সাড়া নাই, সন্ধ্যার ছায়ায় বৃক্ষপত্রের সমাবেশে ভাল করিয়া দেখা গেল না, তথাপি যতটুকু দেখা যায় তাহাতে বুঝা গেল যে, গাছের তলায় যে লোকটা পড়িয়া আছে, বক্ষে তাহার স্পন্দন নাই। নরেশচন্দ্রের সর্ব্বশরীরে একটা অতর্কিতভয়ের বেদনা তড়িৎ হানিয়া গেল,—এই মুষ্টিভিক্ষার কাঙ্গাল হতভাগ্যকে, মাত্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাওয়ার অপরাধে তাঁহারই অন্নপুষ্ট লোক দুইটা মারিয়া ফেলিল নাকি?

তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে তাহার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই তাঁহার অন্তরের সমস্ত মমতাসাগর এককালে বিমথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া যে মুখখানা চোখে পড়িল, তাহা তাঁহার শরীরে মনে ঈষৎ একটা অজ্ঞাত শিহরণ আনিয়া দিল।—কত ক্ষীণ, কত পাণ্ডুর এবং কি ভীষণই সে মুখ।—উঃ কি ভীষণ!—মানুষের যে তেমন মুখ হয়, তাহা যেন ইহার পূর্ব্বে ভাল করিয়া তাঁহার অনুভূতিই ছিল না। এক লহমার সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া সেখানার দিকে চাহিতে গভীর মমতা বেদনা এবং আতঙ্কের মিশ্রণে এই ভাবটাই তাঁহার মনে জাগিল। তারপর পরক্ষণেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান দ্বারবানদের সম্বোধন করিয়া "জল্‌দি পানি লে আও"—এই হুকুম দিয়া ততোধিক বিস্ময়স্তম্ভিত বন্ধুবর্গের দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন " করুণা, তুমি ত বেশ নাড়ী দেখতে পার, একবার এসতো ভাই, এর হাতটা দেখে যাও তো।" তাঁহার স্বরে তখন বিস্ময়ের লেশও বর্ত্তমান নাই।

করুণানিধান বাবু সঙ্কোচের সহিত কাছে আসিয়া বলিলেন "কে তার ঠিক নেই, কি রোগ টোগ আছে, কাপড় চোপড় যাচ্ছেতাই, ওকে ছোঁয়ানেপা করাটা কি ঠিক?"

নরেশচন্দ্র কহিলেন "তোমরা হাঁসপাতালের মড়া শুদ্ধ ঘাঁট। এ হয়ত এখনও জ্যান্ত মানুষ। একে ছুঁতে দোষ কি?"

করুণাবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে সসঙ্কোচে সেই ভিখারীটার হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "না আমরা ডাক্তার, আমাদের সবই করতে হয়; সে আমি বলছিনে, তোমার কথা বলছি।' হ্যাঁ,

এখনও বেঁচে আছে বটে ; তবে বড্ড দুর্ব্বল,—কিছু খেতে না পেলে বোধ হয় বেশীক্ষণ আর বাঁচতে পারবে না।”

সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত চৌবের নিকট হইতে জলের লোটাটা লইয়া, মূর্চ্ছিতের মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, নরেশ উহাকে আদেশ করিলেন, “চৌবেজি, বহুত জল্‌দি গরম দুধ লেআনে হোগা।”—হুকুম শুনিয়াই চৌবেজীর মনের উষ্মা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিল—“আরে মহারাজ, আপ হুকুম তো দে দিয়া—লেকিন হাম কাঁহাসে এত্তা জলদি গরম দুধ কা বন্‌বস্ করেঁ ? আপ্‌কা কল্‌কত্তা সহর হ্যায় কি যো যো—”

নরেশ বিরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেই করুণাবাবু কহিলেন “সত্যিতো এখানে এক্ষুণি দুধ পায় কোথায় ? তা কাজ নেই সে চেষ্টায়, আমার কাছে এক শিশি ‘ষ্টিমুলেণ্ট’ আছে, তাই থেকে ফোঁটা তিরিশ জল মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই বেঁচে যাবে ’খন।”

মূর্চ্ছাহত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পাশ ফিরিল, অল্পপরে চোখ মেলিল, এবং পদাতিকের আনিত গাড়ীর লণ্ঠনের তীব্র আলোকে স্বপ্নদৃষ্টের মতই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মুখের উপর নত হইয়া নরেশ ডাকিলেন,—“একটু বল পেলে কি ? কিছু ভাল বোধ হচ্ছে ?”

লোকটা ক্ষণকাল নির্ব্বাকবিস্ময়ে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল “হুঁ”।

ডাক্তার আবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—“বাপ্‌ ! মানুষের নাড়ী এত ক্ষীণও হয়। ঠিক যেন একগাছি চুলের খাইয়ের মত অতি ধীরে নড়ছে, আছে কি না আছে। এসো রাজা। ওহে, আজ রাতটা এই খানেই চুপ করে পড়ে থেকো,—দেখ চৌবেজি, কাল সকালে ওকে একটু দুধ টুধ খেতে দিতে পার্‌বে তো ? সকাল বেলা—এখন বল্‌ছি না।”

চৌবে অসন্তোষের মধ্যেও কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল “জি হুজুর !”

‘ব্যাস্, তা’ হলেই এক রকম চালিয়ে নেবে আর কি। এসো হে রাজা, রাত হয়ে যাচ্চে। আমাকে আজ আবার একবার বর্ম্মণদের ওখানে ৯টার সময় যেতেই হবে। কত হলো ? এঃ সাতটা পঁচিশ—এসো এসো।”

নরেশচন্দ্র বন্ধুর ব্যস্ততা গ্রাহ্য না করিয়া ভিখারীর সহিত কথা কহিয়া বলিলেন,—“দেখ, এই দারোয়ানগুলো বড় পাজী, ওরা আর একটু হলেই তো তোমায় মেরে ফেলেছিল, ওদের হাতে দেওয়া আর এই গাছ তলায় ফেলে দেওয়া একই কথা ; তুমি আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পার্‌বে ? তা’হলে দুচার দিন একটু খেয়ে দেয়ে জোর পেয়ে যেতে পার্‌বে ? দেখনা একটু চেষ্টা করে, যদি পারো।”

কথাটা শুনিয়া নরেশচন্দ্রের সঙ্গীদলের মধ্যে গভীর বিস্ময়ে একটা স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়া ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল ; আর সেই মুমূর্ষু

ভিখারী—সে যেন এই অপ্রত্যাশিত অযাচিত সম্মান সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হইয়া গিয়া তড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় নিজের সকল দুর্ব্বলতা এক মুহূর্ত্তে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া সচমকে উঠিয়া বসিল, এবং কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"আপনি কে মশাই? এত দয়া তো মানুষের দেখিনি, নিশ্চয়ই ভগবান নিজে ডেকে আপনাকে এ হতভাগ্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

নরেশ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান চৌবের দিকে ফিরিয়া আদেশ করিলেন,—"যদু-নন্দন, হাওয়াগাড়ী ইধার লেআনে কহো,—ইস্‌কো হুঁসিয়ার হোকে সাম্‌না আসনপর উঠায়ে দেও।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

রেবা তটের স্মৃতি*

মন পড়ে' আছে রেবাতটভূমে
বেতস-কুঞ্জ-তলে,
যেখানে তোমারে পেয়েছিনু বঁধু
মালতীর পরিমলে।
আজিকে তোমার সৌধসদনে
নিবিড় ললিত বাহুর বাঁধনে
সেই স্মৃতি আজো বুকে বহি', ভাসি
অকারণ আঁখি জলে।
সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার
সেই দুরু দুরু বুক,
বানীরবনের নিভৃত আঁধারে
ক্ষণিক মিলন সুখ।

* রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে,
সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জ্বলে,　　তোমার সাধের
জতুগৃহ তায় গলে।
নূপুর খুলিয়া　　নীলবাসে সেই—
টিপি টিপি আসা যাওয়া
বনমরমরে　　চমকিয়া উঠা,
ঠায় আশাপথ চাওয়া।
বিদায়ের কালে　　হৃদয় বিকল
আঁখি জলে লোণা চুম্বন রস,—
সব স্মৃতিগুলি　　ফুটে আছে বুকে
রক্তিম শতদলে॥
আছে বা কেমন　　রেবা পুলিনের
সেই তরুলতাগুলি!
হয়ত তাহারা　　নব অনুরাগে
আমাদেরে গেছে ভুলি।
জানে না হেথায় সোণার পিঁজরে
বনের পাখীটি ছটফট করে
পল্লবছায়ে　　নিভৃত কুলায়
স্মরিতেছে পলে পলে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পারাঞ্জপে—

'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে—

আইন আদালত

আইন-কানুন—ইংরেজ শাসনের আমলে যে ভাবে আইন-কানুন গড়া হয়, যে শৃঙ্খলায় আদালত বসিয়াছে ও বিচারের কাজ চলিতেছে, তাহা ভারতবর্ষে একেবারে নূতন সৃষ্টি। এই নূতন ধরণের বিধিব্যবস্থায় যে আমাদের অনেক সামাজিক সংস্কারের ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা যেন লোকে লক্ষ্য করিয়াও করে না ; তাই এদেশে সাহিত্যে এত বড় কাজের কথাটার আলোচনা হয় না। কখন কখন দু-একটা আইনের বিধান লইয়া দেশের লোকে তর্ক তুলিয়াছে যে, বিদেশীয়েরা এদেশের সামাজিক শাসনবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব চালাইবে কেন; সে আন্দোলন দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা অন্যান্য স্থলে যে ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব চালাইতে দিতেছি তাহা ধরিতে পারি নাই। আসল কথা এই যে, দেশের লোকে যে বিধি-ব্যবস্থা মাথায় পাতিয়া লইয়াছে, তাহারা তাহার প্রকৃতি ও গতি-রীতি বোঝে নাই। আইনের উৎপত্তির ইতিহাস ও প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যে ধারণা আছে, তাহাতে যে এদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সকল স্থলে মেলে না এবং এদেশের স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি যে ইংরেজের আইনের মত "বাঁধা ব্যবস্থা" বা codified law নহে, তাহা ইংরেজেরাও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই, আমরাও বুঝিয়া লই নাই। পূর্ব্বকালে, একালের বিধি ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া কি প্রাচীন যুগকে অসভ্যযুগ মনে করিতে হইবে? না, ভারতের সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতিটাকেই স্বতন্ত্র মনে করিতে হইবে? দেশের যথার্থ ইতিহাসের জন্য ইহার আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখন আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একালের আইন-আদালত তুলিয়া দিয়া, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতি চালাইলে, সামাজিক মুক্তি আসিবে, না, মৃত্যু আসিবে তাহাও ধীরভাবে আলোচনা করা চাই। বিশেষজ্ঞ লেখকেরা এই পত্রিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবেন। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, সমাজের হিতের জন্য নিম্নলিখিত কএকটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে :—(১) প্রাচীন কালে আইনের রচনা ও প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মৌলিক রীতি বা principle কি ছিল, আর একালে কি অবস্থায় ও কি ভাবে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; (২) প্রাচীন কালের অবস্থায় সামাজিক বিধি ও রাষ্ট্রীয় বিধির মধ্যে যে প্রভেদ ছিল ও মিলন ছিল, সেই প্রকারের প্রভেদ ও মিলন একালে রক্ষিত হইতে পারে কিনা ; (৩) যে ভাবে এখন আইন আদালতের কাজ চলিয়াছে, তাহা এখন কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিনা ; (৪) আইন সভা গুলিতে এখন যেভাবে আইন গড়া হয়, তাহার পরিবর্ত্তন চাই কিনা ; (৫) বড় বড় মামলা মোকদ্দমায় যে সকল কথার নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে বাধা পড়ে কিনা।

এবারে দৃষ্টান্ত স্থলে, পাঠকদিগকে 'চুক্তি'র জন্মের ইতিহাস দিতেছি।

চুক্তি-আইনের ইতিহাস—আমি তোমাকে একশত টাকা দিলাম, আর তুমি সেই টাকা লইয়া অঙ্গীকার করিলে যে, আগামী বৈশাখ মাসে, আমার দোকানে ২৫ মন চা'ল দিয়া যাইবে; এটা একটা চুক্তি। এই চুক্তিটি যত সহজ ও স্বাভাবিক মনে হউক না কেন উহার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। সমাজে কেমন করিয়া চুক্তির সৃষ্টি হইল, একথা এদেশের উকীলেরা মেন (Maine) সাহেবের বই-এ পড়েন; সে ইতিহাস রোমক সমাজে চুক্তির জন্মের ইতিহাস। ভারতবর্ষে চুক্তির জন্মের ইতিহাস অন্যবিধ বলিয়া মনে হয়।

পাকাপাকি চুক্তিতে দুই পক্ষকেই পরস্পরের প্রতি কিছু করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা থাকা চাই; একপক্ষ যদি খাঁটি নিজের ইচ্ছায় অপর পক্ষকে কিছু দিতে অঙ্গীকার করেন, তবে একালের আইনে তাহা চুক্তি হয় না। আমরা কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সত্যপালনের যে বিবরণ পাই, তাহাতে সকল সময়ে দুইপক্ষের দেনা-পাওনার কথা থাকে না, অথচ একজন যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন, সে 'সত্য' তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে, এইরূপ দেখিতে পাই। চুক্তির ইতিহাসের প্রথম মূল পাই এই সত্য-পালনে।

দেখিতে পাইতেছি যে, সত্যপালনে কেবল একপক্ষ দায়ী; যাঁহার জন্য সত্য পালিত হয়, তাঁহার কিছু করিবার থাকে না। একালের চুক্তি জিনিষটা এই যে, যদি তুমি আমার জন্য কিছু কর, তবে আমি তোমার জন্য কিছু করিব। উপকার পাইয়া হউক বা না পাইয়া হউক, উপকারের প্রত্যাশায় হউক অথবা আমার খামখেয়ালিতে হউক, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিলাম যে তোমাকে কিছু দিব, অথবা তোমার জন্য কিছু করিব, তখন আমাকে তাহা দিতে বা করিতেই হইবে, নচেৎ আমাকে সত্য-ভ্রষ্ট হইতে হয়।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি যে বর চাহেন তাহাই দিবেন। তাহার পর রামাভিষেকের পূর্ব্বাহ্নে কৈকেয়ীর কথায় রাজা দশরথ রামকে বনে দিয়া সত্যরক্ষা করিলেন। যদি একালের হাইকোর্টে কৈকেয়ী বাদিনী দশরথ প্রতিবাদী হইয়া মোকদ্দমা উঠিত, তাহা হইলে রাণী ঠাকুরাণীর মোকদ্দমা মায় খরচা ডিস্‌মিস্ হইয়া যাইত। প্রথম কথা উঠিত, যে কৈকেয়ীর প্রার্থনার বিষয় রাজা দশরথের জানা ছিল কিনা। দ্বিতীয় কথা, যাহা চাহিবে তাহা দিব এটা সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট কথা; কাজেই এ চুক্তি পালনের জন্য কেহ দায়ী নহে। দশরথ কৃতউপকারের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া চুক্তির আরম্ভটুকু বজায় রাখা যাইতে পারিলেও পারিত। রাম অস্থাবর পদার্থের মত যে কোন ভাবে কর্ত্তার আদেশে নিয়োজিত হইতে পারেন, একথা মানিয়া লইলেও এ চুক্তি রাজদ্বারে টিকিত না। হয়ত দশরথের উকীল ইহাও বলিতে পারিতেন যে, রুগ্নশয্যায়, দায়ে পড়িয়া যুবতী রমণীর কাছে যে অঙ্গীকার, তাহাতে একটুখানি অযথা আধিপত্যের চাপ আছে। যাহা বলা গেল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, একালে আইন-সঙ্গত চুক্তি হইতে গেলে, তাহাতে কতকগুলি বিষয় থাকা চাই। স্বচ্ছন্দচিত্তে, অপ্রতারিত ভাবে, প্রতিশ্রুতির বিষয় সম্বন্ধে

সন্দেহ বা দ্বিধা ভাব না থাকিয়া, কোনও কৃত উপকারের জন্য অথবা কোন উপকারের প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোন উপযুক্ত পণ প্রাপ্ত হওয়া গেলে, যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং সেই কার্য্য কোন প্রকার সামাজিক বা নৈতিক রীতি বা ব্যবহারের বিরোধী না হয়, তবেই আইনসঙ্গত চুক্তি হইতে পারে। সত্যপালনের মধ্যে ইহার একটিও নাই। দায়ে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে; কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে তাহা জাননা, নাইবা জানিলে, সত্যপালন করিতে হইবে। সেকালের সমাজের অবস্থা এমন ছিল যে, একজনের সত্যপালনে অন্য দশ জন সহায়তা করিতেন। রাজা দশরথ উত্তরাধিকারে জ্যেষ্ঠাধিক্রম ঘটাইলেন, কিন্তু পৌরজানপদেরা এ অবিধিতে কোন আপত্তি করিল না। দশরথ ইচ্ছা করিয়া যদি রামকে রাজ্য-হারা করিতেও পারিতেন, তবুও রাম রাজতক্ত ছাড়িয়া নিজের দেশেই থাকিতে পারিতেন, কিন্তু পিতার সত্য-পালন পূর্ণ করিবার জন্য বনে গেলেন। রামায়ণ রচনার যুগে যে এ রকমের সত্যপালন সমাজের সকল শ্রেণীতে আদৃত হইত না, তাহা রামের প্রতি এক ঋষির উক্তিতে পাওয়া যায় (আদি—১১৯); রাম সেই উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, সে প্রকারের নীতি, নাস্তিকদের নীতি।

সত্যপালন করিতে হইবে, যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাই করিতে হইবে, এই প্রকার আদর্শে, একটা অর্থ-শূন্য কথার লড়াইএরও সৃষ্টি হইয়াছিল। সত্যপালনের নামে যখন কথার আদর বাড়িয়া উঠিল, তখন অনেকে বাক্‌চাতুরী বলিয়া কঠোর সত্যপালন এড়াইবার পথ দেখিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, যে কঙ্কণাধিপতি কোন কবির শ্লোকে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি যাহা চাও তাহাই দিব। কবি সুযোগ পাইয়া বলিলেন, মহারাজ সত্য পালন করুন, আমাকে এই কঙ্কণরাজ্য দান করিতে হইবে। প্রার্থনা শুনিয়া রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রাণীর বুদ্ধি সহায়তায় একগাছি কঙ্কণ আনিয়া বলিলেন, তুমি কঙ্কণ চাহিয়াছিলে, এই কঙ্কণ লইয়া বিদায় হও। ভারতবর্ষেও হয়ত অনেক শাইলকের মাংস কাটিয়া লইবার প্রস্তাব, রক্তপাতের তর্কে উড়িয়া গিয়াছিল।

যখন সত্যপালন জিনিষটি কথার ফাঁদে পড়িল, তখন লোকে অঙ্গীকারটা একটু বাঁধাবাঁধি করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাঁধাবাঁধি করিবার প্রয়াস পাইলে, উভয় পক্ষেরই সতর্কতা উপস্থিত হয়। তখন আর প্রতিজ্ঞায় ততটা হঠকারিতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলে সত্যরক্ষা করিতেই হইবে। কোন বিশেষ কারণে তাহা প্রতিপাল্য নয় বলিয়া প্রদর্শন করিবার চেষ্টা ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিশেষ প্রস্ফুট হয় নাই। তখন পর্য্যন্তও নিতান্ত অজানা, অচেনা লোকদের সঙ্গে সামাজিক ঘেঁষাঘেঁষি জন্মে নাই, ও ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ জটিলতা হয় নাই।

একালের চুক্তির মধ্যে একটা বিশেষ কথা এই যে, একটা 'পণ' না থাকিলে চুক্তি সিদ্ধ

হয় না। তুমি আমার জন্য কিছু করিয়াছ বা করিবে, অথবা কিছু মূল্য দিবে, এমন একটা সর্ত্ত থাকা চাই। এ সমগ্র জিনিষটার নাম পণ। পণ না থাকিলে চুক্তি অসিদ্ধ একথা হিন্দুর আইনে ছিল না; তবে পরোক্ষভাবে সে কালের চুক্তিতেও পণ আসিয়া দেখা দিয়াছিল। পণ অর্থে প্রতিজ্ঞা, পণ অর্থে মূল্য; এই দুই অর্থই এক সঙ্গে চুক্তির পণে পাই। সেটি কেমন করিয়া ঘটিল, ও চুক্তিতে কেমন করিয়া পণ আসিয়া জুটিল, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি।

প্রথমে পণ শব্দের আদিম অর্থের বিচার করিব। অমরকোষকার বলেন "দুরোদরে দ্যূতকারে পণে দ্যূতে দুরোদরং।" এখানে দেখা যায় যে পণ কথাটি জুয়া খেলার মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। আমাদের চলিত কথায় যখন বলি, প্রাণপণে কাজ করিতেছি, তখনও প্রাণকে stake করিয়া অর্থাৎ বাজীতে ফেলিয়া কাজ করার অর্থই সূচিত হয়। আমার বিবেচনায় প্রতিজ্ঞায় পণ বা মূল্য জুয়া খেলায় আরব্ধ। সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা জানেন যে, বিরোধী দলগুলির সঙ্গে মিলন ঘটাইবার পথে, জুয়া খেলা এক সময়ে অনেক কাজ করিয়াছে। জুয়াখেলায় ধর্ম্মার্থতা নাই; যে যাহার চাতুরী লইয়া ভাগ্যপরীক্ষা করে। কাজেই এস্থানে "মূল্য" অধর্ম্ম বলিয়া মনে উদয় হয় না। কিন্তু খাঁটি রকমের সত্যপালন ধর্ম্মভাবের সহিত গাঁথা। বিক্রয় বন্ধকাদিও চুক্তি; কিন্তু আমি সেই বিশেষ চুক্তির কথা উল্লেখ করিতেছিনা। মৌলিক চুক্তির হিসাবে, প্রথমে জুয়াখেলা হইতেই হয়ত পণ উপস্থিত হইয়াছে। জুয়াখেলা দূষণীয় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে অবশ্যই আছে, কিন্তু wagering contract সম্পূর্ণ অসিদ্ধ, এ কথা নাই। বিলাতেও বড় ছিল না, কোন কোন বিষয়ে এখনও নাই। একটা প্রতিজ্ঞার মূলে এখন ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে, হারিয়া গেলে জেতাকে পণ দিতে হইবে, এবং জেতা যখন পণ লওয়া অধর্ম্ম মনে করিলেন না, তখন ধীরে ধীরে অন্য প্রতিজ্ঞায়ও পণ সহজে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। পণযুক্ত প্রতিজ্ঞা প্রথমে সত্যপালনের গৌরব লাঘবকারী বলিয়া হেয় ছিল।

সমাজ একটু জটিল হইবার পর নিয়ম হইয়াছিল যে, বিনা উদ্দেশ্যে দান করিলে, স্থাবর সম্পত্তির বেলায় দাতার উত্তরাধিকারীরা বাধ্য হইবেন না। এই প্রকারে সম্পত্তি নষ্ট করার বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যাদির অনেক নির্দ্দেশ আছে। এস্থলে প্রতিজ্ঞায় পণের অভাবের দোষ ধরা পড়িতেছে বটে, কিন্তু কখনও একমাত্র পণের অভাব বা স্বল্পতা, চুক্তির বাধ্য-বাধকতা নষ্ট করে নাই।

একালের এমন অনেক চুক্তি আছে যাহাতে পণ থাকিলেও চুক্তি সিদ্ধ হয় না। একজন দুশ্চরিত্রা যদি অসদনুষ্ঠানের হিসাবে কাহারও উপর প্রতিশ্রুত টাকার দাবী করে, অথবা কোন ঋণদাতা নাবালককে টাকা ধার দিয়া সেই টাকা ফিরাইয়া চায়, তবে একালের আদালতে ঐ দাবীগুলি অগ্রাহ্য হইবে; সে কালে এ সকল টাকা আদায়ে বাধা ছিল না। তবে কেহ যদি এমন কোন চুক্তি করিত যে, তাহার ফলে রাজা, গুরু ও পিতামাতার অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সে চুক্তি পালনে বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হইত না।

আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি

'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে—

পুরাতনী

রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা

সমালোচনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় তাহা ছিল না। ইংরাজের আমলে এবং ইংরাজী সমালোচনাপ্রণালীরই অনুকরণে বাঙ্গলাভাষায় উহার উদ্ভব হইয়াছে। অনেকেরই ধারণা যে, বঙ্কিম বাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা মাসিকপত্রের মারফতে বাঙ্গলা গ্রন্থাদির সমালোচনা-রীতির প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। বঙ্কিম বাবুর 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইবার প্রায় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক মাসিকপত্রে গ্রন্থ-সমালোচনা আরম্ভ করেন; এবং ইহার কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার "রহস্য-সন্দর্ভ" মাসিক পত্রেও কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার জের চালাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজেন্দ্রলালকেই আমরা বাঙ্গলাসাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া মনে করিতে পারি। এখন যাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের বড় বড় রথী ও মহারথী বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন স্বরচিত পুস্তকাদি সমালোচনার জন্য রাজেন্দ্রলালের নিকট পাঠাইতেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রঙ্গলাল, রামনারায়ণ ও বিহারী লাল প্রভৃতি অনেক বড় বড় লেখকেরই পুস্তকের সমালোচনা "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ও "রহস্য-সন্দর্ভে" দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের আদি সমালোচনা বলিয়া যে শুধু উল্লেখযোগ্য ও স্মরণযোগ্য, তাহা নহে। উহার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের যে বিচারশক্তি ও সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এখনও জানিবার যোগ্য।—তাহা 'বাসি' হইলেও এখনও পড়িতে মিষ্ট লাগে। কিন্তু "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' এখন দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য ঐ দুইখানি কাগজ হইতে সমালোচনার স্থলবিশেষ সঙ্কলন করিয়া 'বঙ্গবাণী'র পাঠকবর্গকে উপঢৌকন দিতেছে।

বঙ্গভাষা কেমন হওয়া উচিত :—

সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত কোন পুস্তক করিতে হইলে কলিকাতার ভাষাপেক্ষায় দেশের সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ ভাষার ব্যবহার করাই বিধেয় বোধে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহারই অবলম্বন করেন। ইহার অন্যথায় বাচনিক ভাষায় পুস্তক লিখিলে ত্বরায় এমত এক স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা, যাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র অবোধ্য হইবে। অপর, বঙ্গদেশের লোকেরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আপন আপন পল্লীর বাচনিক ভাষায় পুস্তক রচিলে বঙ্গদেশে যত জেলা আছে, তত সংখ্যক নূতন পুস্তক হইবে।

—বিবিধার্থসংগ্রহ,—৫ম বর্ষ।

বর্ণমালা হইতে বর্ণবর্জ্জন :—

ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে সম্প্রতি সকলেই প্রাচীন হিন্দু নাম শুনিলেই তাহার লোপ করতঃ নূতন সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন। সেই পরিবর্ত্তনের লালসায়···গ্রন্থকার বর্ণমালা হইতে কএকটি বর্ণের পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে অল্পমতিত্ব ভিন্ন কোন উৎকর্ষের লক্ষণ নাই। যদ্যপি বর্ণমালা হইতে ঋকার ও অন্তস্থ 'ব' কারের পরিত্যাগ করিলে বর্ণমালার লাঘব হয়, তাহা হইলে শ, ষ, ঙ, ঞ, ঋ, ৠ, ঌ, য়, প্রভৃতি বর্ণকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? ং, স, হ, র, ল, এবং অ বর্ণ দ্বারাই তাহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পাবে; অথচ বর্ণমালা হইতে ৮টি ব্যর্থ বর্ণ পরিত্যক্ত হয়! এ বিষয়ে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্গভাষার রচনা যাহাতে উত্তম হয়, এমত চেষ্টা করুন। চন্দ্রবিন্দু কি অনুস্বব, স্বর হইবে কি হল হইবে এবং তাহাব ত্যাগে বা গ্রহণে, বর্ণমালার দুই একটা বর্ণ বাড়াইলে বা কমাইলে, তাঁহাদেব কোন পৌরুষ প্রকাশিত হইবে না। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে সভ্য-সমাজে লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, পারসী প্রভৃতি যে কোন বর্ণমালা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত বর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহার পরিশোধনার্থে তাঁহাদের শ্রম করাব কোন প্রয়োজন নাই।

—বিবিধার্থসংগ্রহ,—৫ম বর্ষ।

সাহিত্য :—

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে। **প্রথমতঃ—** "ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য বাক্য"—অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; **দ্বিতীয়—"উদ্দেশ্য বাক্য"**—অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উদ্দেশ্যে প্রোক্ত বাক্য; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ-বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে, তাহার নাম 'সাহিত্য'—অর্থাৎ বাক্যবিষয়ক হিতকারী শাস্ত্র।

—বিবিধার্থসংগ্রহ,—৩য় বর্ষ।

নাটক ও নাটকীয় ভাষা :—

জীবন-যাত্রার সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের নাম নাটক; তাহাতে যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায় তদনুসারে নাটকের সাফল্য হয়; সাফল্যের অভাব হইলেই রসের হানি হয়; সুতরাং জীবন-যাত্রায় যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে তাহারই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ, বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কৌতুক, ব্যঙ্গ বা অদ্ভুতের বর্ণনস্থলে পদ্য-রচনায় হানি নাই; তত্তৎস্থানে কাব্য সম্ভবপর বটে। ফলতঃ নাট্যশালায় পয়ারাদিতে বীর রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় করিলে মাদৃশ অকিঞ্চিৎদিগেব বিবেচনায় সমুদায়ই পাঁচালির অনুকরণ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, অন্যান্য দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষার কবিগণ এতাদৃশ নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে সংস্কৃত কবিতা আমাদের পয়ারের তুল্য নহে; সুতরাং উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক কবিতা সকল মাত্রা-ছন্দে রচিত হয়। তাহাতে প্রতিপদের শেষে অক্ষরে অনুপ্রাসের প্রয়োজন রাখে না। এই প্রযুক্ত তৎপাঠে গাম্ভীর্য্যরসের প্রকাশ পায়। সংস্কৃতও অনুপ্রাসের দাস নহে। অতএব তৎপাঠেও পয়ারের ন্যায় প্রতি কথায় ঠনন্ ঠনন্ ঘণ্টাধ্বনি হয় না, সুতরাং তাহাও অনুশ্রাব্য নহে।

—বিবিধার্থসংগ্রহ,—৪র্থ বর্ষ।

ছন্দের কথা :—

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবন্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ, ভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ, মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয়, সুতরাং বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার-স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুলপিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে, যে বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত হইতে পারে না, যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে, তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ সকল গ্রহণ করা হইতেছে। অতএব দত্ত বাবু (মধুসূদন) বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিতাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর, অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বর অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্পমাত্র বুঝিতে পারে, তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগতভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে, পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর, অনেক সহৃদয় ব্যক্তি দীর্ঘ-কাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বরসমানতাপ্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বর-সাম্যত্বের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দঃ ব্যবহৃত করেন; তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনা-শক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারে না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা তত দূর দীর্ঘ করিতে পারেন, যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না।

অপর, ঐ নিগড় সত্ত্বে কবিতার ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙ্গালী কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভূত করিতে পারিতেন, এমত আর কোন কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগ-দ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ, ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে, সুমধুর কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ের বিবরণ মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটি অপরূপ উদাহরণ আছে। তাহার পাঠে আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে লিখিত আছে—

" অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপ-জ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙ্গালা ছন্দে তাহার সমাধা হয় না। ভারত সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার করণ সময়ে ছন্দের অনুরোধে—

" শুনলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥"

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দে ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন। বিদ্যা "মায়ের আগে" ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগকরণ সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রয়োগ্য। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন, তাহাহইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এ অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং দত্তজ বাঙ্গালাতে তাহার প্রচার করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন মানিতে হইবে।

—বিবিধার্থ-সংগ্রহ—৬ষ্ঠ বর্ষ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।
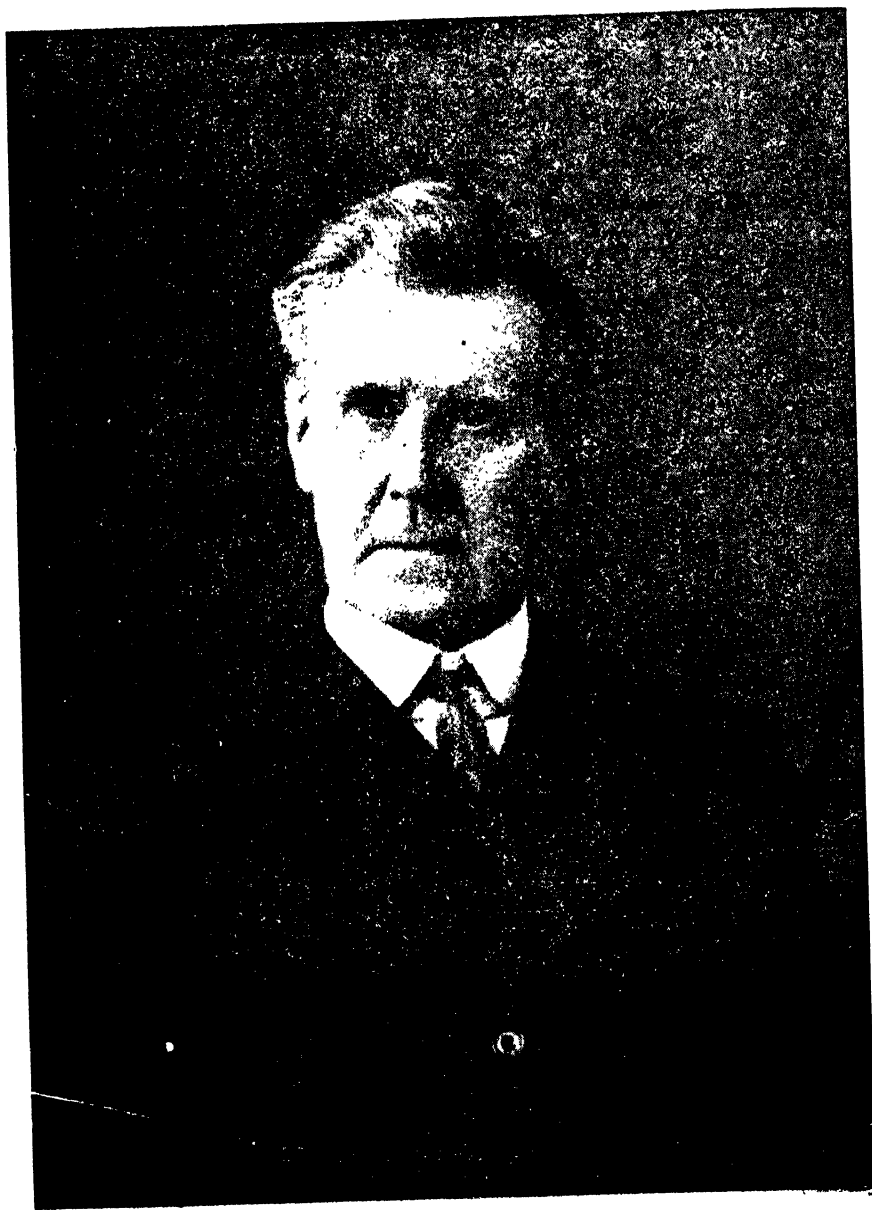
আচার্য্য হেন্‌রী ষ্টিফেন

'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে-

প্রতিধ্বনি

আনাতোল ফ্রাঁসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে

আনাতোল্ তিব (যিনি আনাতোল ফ্রাঁস নামে ফরাসী সাহিত্যে সুপরিচিত) বয়সে বৃদ্ধ; কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য তাঁহার মানসিক জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই বলিলেই হয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার লেখনীর পরিবর্ত্তে সৈনিকের তরবারি ফেরত চাহিয়াছিলেন। যখন ফ্রান্সের সামরিক বিভাগ ৭০ বৎসরের বৃদ্ধকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে উৎসুক দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত, তখন আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার দেশবাসীকে মনে করাইয়া দেন যে, তাঁহার এই ভাবটী নূতন নয়। আর একবার জর্ম্মান কামানের গোলা যখন তাঁহার মাথার উপর দিয়া ছুটিতেছিল তখন এক বন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ভার্জ্জিলের কবিতা পড়িতেছিলেন। তাঁহার জীবনের স্বপ্ন তাঁহার পুস্তকাগারের ভিতর আবদ্ধ থাকে না। যদিও ফ্রাঁস্ নিজে সে কথা স্বীকার করেন না; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আনাতোল্ ফ্রাঁস্ তাঁহার জীবনের গূঢ়তম প্রদেশটির উপর পরিহাসের একখানি ওড়না বিছাইয়া দিয়াছেন।
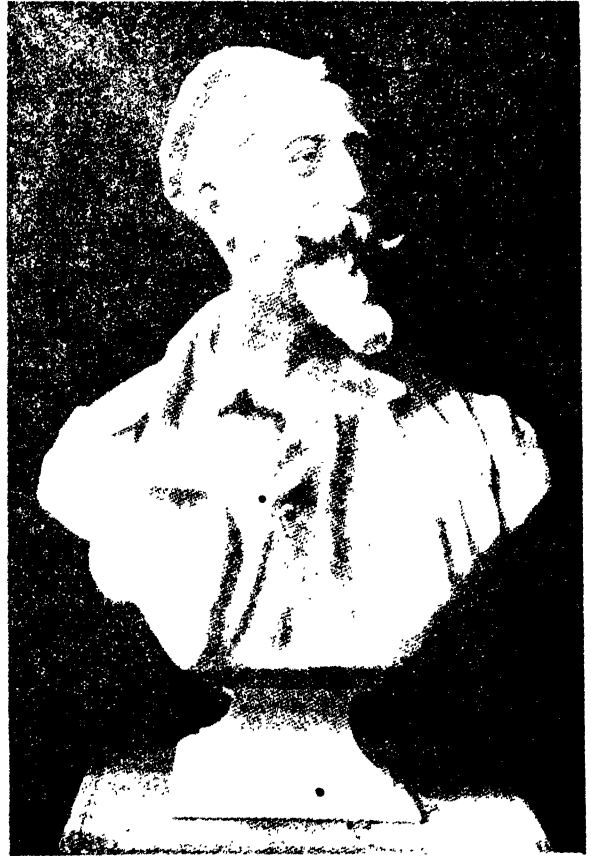
আনাতোল ফ্রাঁস্

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল আনাতোল ফ্রাঁস্ ৭৭ বৎসর পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তবে সাহিত্যজগৎ তাঁহাকে অনেক বিলম্বে চিনিয়াছেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা আজীবন নূতন ভাবেই চলিয়াছে। শৈশবে পিতার পুস্তকের দোকানে বড় বড় সাহিত্যিকের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া জগতের সাহিত্যের একটা অস্পষ্ট ছায়া তাঁহার চোখের সম্মুখে পড়ে। যৌবনে পলবুর্জ্জের সঙ্গে লুক্সেমবুর্গ

প্রাসাদের বাগানে তারার আলোতে "জগতের ভাঙ্গা গড়া" অনেকবার করিয়াছেন। তাহার পর দিন রাত বই পড়ার নেশায় সব ভুলিয়া গিয়াছেন। বাহিরে নাম জাহির করার অবসর হয় নাই। তাঁহার কথায় বই "পশ্চিমদেশীয় হাশীস্"। এই হাশীসের নেশায় যে স্বপ্ন তিনি এতকাল দেখিয়াছেন তাহা আজ সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জীবনের শেষধাপে পা দিবার পর পশ্চিমের সরস্বতী তাঁহার সোণার পদ্মের একটি পাঁপড়ি আনাতোল ফ্রাঁসের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

ফ্রাঁস্ যে এতকাল অন্ধকারে লুকাইয়াছিলেন তাহার কারণ তাঁহার সাহিত্যিক গুরু রেণাঁ ফরাসীয় মনোজগতে এতখানি আধিপত্য করিতেছিলেন যে রেণাঁকে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইলেও রেণাঁর জীবদ্দশায় সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার অবসর ফ্রাঁসের ছিল না। রেণাঁ তাঁহার বিদ্রূপের হাসির ধরণটি আনাতোল্ ফ্রাঁসকে শিখাইয়াছেন, কিন্তু শিষ্যের বিদ্যা যেন গুরুকে হার মানাইয়াছে। বাহ্যতঃ চিরকালই পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার আদান প্রদান চলিয়াছে। এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন—"আমি যেখানে আশৈশব বাস করিতেছি তাহার বিশেষত্ব এই যে সেটি একটি বইএর আড্ডা। সেইন্ নদীর ধারের পুরাতন বইএর দোকানগুলি আমার বড় আদরের জিনিষ।"

ফ্রাঁস্ চিরকালই বই লইয়া কাটাইতেছেন। কিন্তু এই বইএর নেশা তাঁহাকে একটি পুস্তকের কীটে পরিণত করে নাই। তিনি তাঁহার বিরাট পরিহাসরসে সমস্ত দিক সরস করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা তাঁহাকে "একপেশে" করে নাই। কোন্ জিনিষের দাম কত তাহা বুঝিতে তাঁহার কখনই দেরী হয় নাই। ছেলেবেলায় তাঁহার মা একবার বলিয়াছিলেন, 'তুমি বড় পুতুল নেবে বলিতেছ, কিন্তু তাহার যে অনেক দাম।' আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, " 'অনেক দামের' মানে তখন বুঝি নাই, এখনও বুঝি না, কি হয়ত খুব ভাল বুঝি বলিয়াই, টাকা কড়ির উপর লোভ নাই"। সত্য কথা, টাকার দাম ঠিক বুঝিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্য-রথী তাঁহার নোবেল্-পুরস্কার-লব্ধ সব টাকা রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য দান করিয়াছেন।

ফ্রাঁসের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শুদ্ধ সুনিপুণ বাক্য-শিল্পী নহেন। ইঁহার ব্যক্তিত্ব জিনিষটি অলোকসামান্য। এটি গ্রীক্, লাটিন ও হিব্রু সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। বিশ্বব্যাপী জীবনপ্রবাহ ইঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান। এই বিরাট চিন্তাভারগ্রস্ত মানুষটি কখনও পাণ্ডিত্যের অভিমান বহন করেন নাই। ইনি নিজেকে বিপ্লববাদী বলিয়া জানাইতে উৎসুক, কিন্তু ইহাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি মনুষ্যত্বের বিপুলগরিমা বিস্তৃত করিতে উন্মুক্ত। পরিহাস-হাসি-দীপ্ত উজ্জ্বল মুখের আবরণের অন্তরালে একজন চিন্তাশীল জীবনরহস্যবিদ্ শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়া জীবনের গূঢ়তম উদ্দেশ্য দেখাইতে সচেষ্ট। তাই আনাতোল্ ফ্রাঁস শুদ্ধ আজ একজন বড় সাহিত্যিক বলিয়াই খ্যাত নহেন, তিনি ফ্রান্সের "বিজয়োদ্ধত-ধ্বজপট" বীরদর্পে জগতের সম্মুখে ধরিয়া নিজের নামের সার্থকতা জানাইতেছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি

সার বিশ্বেশ্বরায়ার

'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে—

নূতন রোগ

এসিয়া মাইনরের এঙ্গোরায় নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। এই অচেনা রোগে ধরিলে মানুষ দুই ঘণ্টার মধ্যে অচেতন হইয়া পড়ে ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই নাকি এই রোগে এঙ্গোরায় বহু পরিবার একেবারে উজাড় হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে যুদ্ধের অপেক্ষা ভীষণ শত্রু দেখা দিতেছে। চিকিৎসকেরা এ রোগের নিদান জানেন না।

রক্তপরীক্ষায় রক্তের সম্পর্ক নির্ণয়

এল্‌বার্ট এব্রামস্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রক্তের সম্পর্ক ধরিবার একটা কল গড়িয়াছেন। অমুক ছেলে অমুক বাপের কি নয়, তাহা নাকি এই কলে রক্ত-বিন্দুর পরীক্ষায় ধরা পড়ে। বৈজ্ঞানিকটির পরীক্ষায় বিশ্বাস করিয়া একজন বিলাতী হাকিম একটি মোকদ্দমায়, অমুক অমুকের সন্তান বলিয়া রায় দিয়াছেন। রক্তের সম্পর্কের কথাটা চিরকালই সকল দেশে চলিয়া আসিতেছে; এখন যদি সত্য সত্যই রক্তের পরীক্ষায় সম্পর্ক ধরা যায়, তবে এই কলের সাহায্যে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে। এখন অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় কেবল ধরিতে পারা যায় যে, অমুক রক্ত মানুষের কি অন্য জন্তুর; হয়ত বা নূতন কলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এ রক্ত পুরুষের কি স্ত্রীর, এ জাতির লোকের কি সে জাতির লোকের। নৃ-তত্ত্বে মানুষের জাতি ও সম্প্রদায় ধরিবার পক্ষেও অনেক সুবিধা হইতে পারে।

কুলকরণীর কথা

অধ্যাপক কুলকরণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার ১৯শে জানুয়ারীর বক্তৃতাটি আমরা শুনিয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয়ের বয়স প্রায় ৫০ হইবে,—শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, পারাবৎশুভ্র একজোড়া গোঁপ দৃঢ়-সংকল্পব্যঞ্জক যুগ্মাধরের উপর বেশ সুখাসন করিয়া আছে। মাথায় মান্দ্রাজী টুপির জড়োয়া কাজের জমকালো রংএর সঙ্গে গোঁপ জোড়া কালো হইলে বেশী মানাইত।

মিঃ কুলকরণীর গলার স্বর বেশ ওজস্বী ও ভাবুকতাময়। তাঁহার বক্তৃতায় একটা জিনিষ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম;—তিনি শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত আধুনিক সাহিত্যই পড়িয়াছেন, কিন্তু ঘরের কথা লইয়াই ব্যস্ত। লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশগুলি ঘুরিয়া ইনি শিক্ষাপ্রণালী লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিতেছেন। আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায় বিলাতী কথাগুলি লইয়া সাধারণতঃ নাড়া-

চাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় বিলাতীশিক্ষা দেশীয় তত্ত্বের সমাধানে আরোপ করিয়াছেন এইজন্য তাঁহার বক্তৃতাটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ছেলেদের পোষাকের আঁটাআঁটিতে রক্তের চলাচল বাধা পায়, এজন্য পোষাক যত আল্গা হয় ততই ভাল, এই কথা বলিতে যাইয়া তিনি শকুন্তলার বল্কলবাসের বন্ধনাতে যে তাঁর পেলবকোমলদেহ পীড়িত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া বক্তব্যটি বেশ মুখরোচক করিয়াছিলেন। ছেলেদের বসিবার ভঙ্গী যে ঋজু হওয়া উচিত, বেদ হইতে তাহার উদাহরণ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার কথাগুলি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস হয় নাই, উহাতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি মধুর রসের সহিত বলা হইয়াছিল। মিস্ গাঙ্গুলী কিরূপে একটি পাড়া-কুঁদুলী মেয়েকে সংশোধন করিয়াছিলেন, সেই আখ্যানটি তিনি এমনই হৃদয়স্পর্শী করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহা শুনিতে যাইয়া অনেকের চোখে জল আসিয়াছিল। মান্দ্রাজী একটি দেশীয় শিক্ষালয়ের প্রণালী তিনি আলোকচিত্র দিয়া বড় সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই স্কুলের ঘরগুলি, ঐতিহাসিকতা-বিজড়িত,—একটির নাম "শিবাজী", একটির নাম "মীরা," একটির নাম "মৈত্রেয়ী", একটির নাম "চৈতন্য"। প্রতি ঘরে যে ছেলেরা পড়ে তারা সেই সেই বিশ্বশ্রুত নামের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়া মোটামুটি বিবরণগুলি শিখিয়া থাকে। তারপর যখন ছেলেরা লিখিতে পড়িতে শেখে, তখন তাহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে।

মিঃ কুলকরণী এক ঘণ্টা কাল আমাদিগকে মুগ্ধ ও ছবির ন্যায় নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার শ্রোতৃসংখ্যাও কম হয় নাই, সিনেট হলটি ভরিয়া গিয়াছিল, এবং তাহার জানালা ও দ্বারগুলি নরমুণ্ড দ্বারা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় তাঁহার পুস্তিকাগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদিত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া এই বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন, এ সম্বন্ধীয় সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন। ইনি এই দেশের উপযোগী করিয়া বাল্যশিক্ষার প্রস্তাবগুলি আনিয়াছেন; ইঁহার বইগুলি বঙ্গীয় সাধারণের পাঠ করা দরকার। তিনি তাঁহার সমস্ত কথার অনুকূলেই আলোকছবি দেখাইয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—সেই ছবিগুলির মধ্যে আমরা একটিতে বোলপুর শান্তি-নিকেতনের মহিলাগণের সংগীত শিক্ষার ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

উপসংহারে রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর কুলকরণীর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সভা সাঙ্গ করেন। আমাদের দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিদ্যার এরূপ যে হরগৌরীমিলন হইয়াছে এবং মিঃ কুল-করণীর মত কর্ম্মী দেখা দিয়াছে ইহা অতীব আনন্দের বিষয়।

রামপ্রসাদের মৃত্যু

কবিদের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই। টমাস ওটওয়ে তিনদিন উপবাস করিয়া একখানি রুটি পাইয়াছিলেন, হা হুতাশ করিয়া তাহা গিলিতে যাইয়া গলায় তাহা আটকাইয়া যায় এবং এই

অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণ যায়। কার্ক হোয়াইট অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ও কীট্‌স ২৪ বর্ষ বয়সে বিরুদ্ধ সমালোচনার বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমাদের কবি চণ্ডীদাসকে গৌড়ের বাদশাহ হাতীর উপর চড়াইয়া জহ্লাদ দ্বারা বেত্রাঘাত করাইতে করাইতে মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন করাইয়া প্রাণনাশ করেন। কিন্তু ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কি ভাবে মরিয়াছেন, তাহা কি আপনারা জানেন? কালীপূজার পর হালিসহরের গঙ্গায় কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়,—ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাংস বাজিতেছিল,—উদ্দাম ভক্তিতে সেই বিগ্রহের সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদ সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃষিজীবী

আমাদের জীর্ণ পল্লীর দিকে তাকিয়ে সব প্রথমে চোখে পড়ে কৃষিজীবীদের। তাদের অবস্থা ক্রমশই হীন হচ্চে, রোগে শোকে অনাহারে তাদের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেচে। এই নিয়ে আমরা আক্ষেপ করে থাকি। তারা "সাক্ষাৎ নারায়ণ" এমন কথাও বক্তৃতামঞ্চে শোনা যায়। কিন্তু তবু তাদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না,—কোনদিন ঘট্‌বে এখনও তার বিশেষ আয়োজন দেখা যায় না। সাক্ষাৎ নারায়ণ ক্ষুধিতই থেকে যায়, তার ছেলেপুলে রোগে মরে, তার ঘরে মা বোন্ স্ত্রী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যাও করে; আর ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে স্বয়ং নারায়ণও সেখানে বুঝি তিষ্টিতে পারেন না।

কৃষিজীবীদের সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবিনি এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই। এর কারণ কৃষিকর্ম্মের মর্য্যাদা এখনও আমরা বুঝিনি; আমরা রাতারাতি লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ কর্‌ব এই আশায় বাণিজ্যের দিকেই ঝোঁক দিয়েছি। ধূলি কাদায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে লক্ষ্মীঠাকুরাণী আমাদের অন্ন উৎপাদনের ভার নিয়েছেন, যাঁর আসন হলধরের পাশে, তাঁর কাজে সহায়তা করবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই,—পণ্য দ্রব্যের স্তূপের উপর সোণার আসনে উপবিষ্টা অলঙ্কৃতা লক্ষ্মীর পূজা আমাদের মনকে এমন করেই আকর্ষণ করেছে। চাষের কাজটাকে আমরা হেয় জ্ঞান করি, "চাষা" কথাটা গালিবাচক,—অজ্ঞ, নিরক্ষর ও অসভ্য এই অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়।

এর ফল হয়েছে যে কৃষকের ছেলে শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌লে, কৃষক ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। পাছে বংশগৌরবের হানি হয় এজন্য বারুইরা স্বীকার কর্‌তে চায় না যে, তাহাদের ব্যবসাই ছিল চাষবাস। কৈবর্ত্তেরা বল্‌ছে তারা মাহিষ্য—কেবট্ট জাতীয়েরা তাদের পূর্ব্বপুরুষ, এ কথা

ঐতিহাসিক সত্য হলেও স্বীকার কর্‌তে তাঁরা কুণ্ঠিত হন। বর্ত্তমান সভ্যতা বল্‌তে আমাদের মনে তার বিধিব্যবস্থা ও সংস্থানের যে চিত্র উদয় হয়, তার মধ্যে দেখ্‌তে পাই কৃষিজীবীর স্থান সবার শেষে, সে সভ্যতার অন্দরমহলে স্থান পায়নি। বিশ্ব মানবের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে সে কোনো প্রশস্ত অধিকার পেলে না ; এমন কি তার ন্যায্য অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হ'য়ে রইল। এর ফলে যেমন তার মনটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থেকে অচল হ'য়ে পড়্‌ল, আবার তার জীবিকার ক্ষেত্রেও সে উন্নতি করবার সুযোগ পেলে না। কিন্তু কৃষিজীবীকে এক ঘরে করে' রাখার দরুণ কি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, কি সমাজ সংস্থানে, বিরোধের অন্ত নেই—যাদের উপেক্ষা করা হ'য়েছিল আজ তারা সচেতন হ'য়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌চে।

এমন একদিন ছিল এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌ত ; স্বার্থের সংঘর্ষণে তাদের মধ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে ; যে পক্ষ দুর্ব্বল তাকে প্রবলের কাছে হার মেনে চল্‌তে হয়েছে। এ ব্যবস্থা আজও চল্‌চে, কিন্তু ব্যক্তির স্বতন্ত্র উৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষাকে আর চেপে রাখা যাচ্চে না। সমাজ যে বেড়ে উঠ্‌বে ও বড় হ'য়ে উঠ্‌বে (Social evolution) তার সে গতিকে আট্‌কাবে কে ? তাই ত আজ স্বাধীনতার দাবী সর্ব্বমানবের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত কর্‌বার আয়োজন করেছে।

তবে আমাদের দেশে এই চিন্তার ধারা এসে পৌঁছুলেও, তার প্রকাশ এখনও সুস্পষ্ট হয়নি। হ'লে তার চেহারা কেমন হবে বলা যায় না, কেননা আমাদের সমস্যা নানা কারণেই অত্যন্ত জটিল। সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীর অন্ত নেই ; বহু প্রকার কৃত্রিমতার বন্ধন, মিথ্যা আচার ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দেশের স্তরে স্তরে শক্তির মূল পর্য্যন্ত জীর্ণ করে' দেবার উপক্রম করেছে ; শাসন ও নিষেধের উপদ্রব, জনসাধারণের—বিশেষভাবে সমাজের নিম্নস্তরে—উপেক্ষিত দলের চিত্তকে ভয়যুক্ত করে' তাদের জীবনের পরিণতিকে বাধাগ্রস্ত কর্‌ছে। তাই তাদের সঙ্গতিলাভের পথ সঙ্কীর্ণ, তাদের কর্ম্মচেষ্টার বহিঃপ্রকাশে দৈন্যের এত অভাব, তাদের মন অসাড়, অশক্ত, অক্ষম।

এর প্রতীকার কেবল বাহিরের আয়োজনে সম্ভব নয়। বাহিরের বিধিব্যবস্থা ভাল হ'লে তাতে কিছু সুবিধা ঘট্‌তে পারে কিন্তু অন্তরাত্মাকে উদ্বুদ্ধ না করলে কোনো ব্যবস্থায় কল্যাণের যথার্থ প্রকাশ হ'তে পারে না। কৃষিজীবীর অন্তরকে খাটো রেখে তার দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন তাতে বিশেষ ফল নেই। যে উৎস থেকে মানুষ শক্তির প্রেরণা অনুভব করে, তা'ই যদি শুকিয়ে গেল তবে বাহিরের আয়োজন যতই বিপুল হোক্ না কেন, মানুষ কিছুতেই তার প্রতিষ্ঠা-ভূমি খুঁজে পাবে না। অতএব কৃষিজীবীর উন্নতি সাধনের জন্য যারা আজ উৎসাহী, তাদের প্রথম কাজ হবে তাকে সচেতন করা। তাকে উপেক্ষা করে আমরা যে ভুল করেছি, আজ তা' সংশোধন কর্‌তেই হবে। তাকে বল্‌তে হবে, সভ্যতার আসল ভিত্তিই হচ্চে তার ক্ষেত—যেখানে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে' ফসল উৎপন্ন করে।

আপনারা মনে কর্‌তে পারেন আমি কৃষিজীবীকে তার শক্তির পরিচয় জানিয়ে তাকে সচেতন কর্‌বার দিকে এত ঝোঁক দিচ্ছি কেন ? তার কারণ, জনশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ না হ'তে পারলে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়্‌বে কেমন করে ? রাষ্ট্রশক্তি ও তার আশ্রিত বহু প্রকার ব্যবস্থা সঙ্ঘবদ্ধ (organised) হ'য়ে আছে; সে ব্যূহ ভেদ কর্‌তে হ'লে জনশক্তিকেও দল বেঁধে দাঁড়াতে হবে—বিচ্ছিন্নভাবে থাক্‌লে এ কাজ সফল হবে না। অতএব মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ হওয়া চাই; যোগের ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের যথার্থ পরিচয় পাবে এবং সেই পরিচয়ই তাকে শক্তিমান করে তুল্‌বে। যাদের শক্তিমান করতে চাই, তাদের মন সচেতন না হ'লে এই যোগ ঘটবে কেমন করে ?

অনেকের মুখে শুনি চাষাদের উন্নতি সাধনের আদর্শ এত উচ্চ না হ'লেও চলে। তাঁরা মনে করেন মূল অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন না ক'রে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকাক্ষেত্রের কিছু সুবিধা কর্‌লেই সমস্যাটা আপাততঃ মিট্‌বে। অথচ এঁদেরই মুখে আজকাল ইংরেজী বুলি ডিমোক্রাসির কথা লেগেই আছে। ডিমোক্রাসির মানে জনসাধারণের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দেওয়া। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত একশ্রেণীর দ্বারা অন্য কোনো শ্রেণীর পীড়িত হ'বার সম্ভাবনা থাক্‌বে ততক্ষণ ডিমোক্রাসির সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ পাবে না। তা'ছাড়া, রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি নিয়ে যতই আন্দোলন ও আস্ফালন করি না কেন, অর্থনীতি ক্ষেত্রে তার প্রকাশ সত্য না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো দেশের কল্যাণ হ'তে পারে না। রাজনৈতিক অধিকার মানে যদি হয় কেবলমাত্র ভোট দেবার অধিকার, তবে তার নাম আর যাই হৌক্ ডিমোক্রাসি নয়। মানুষ চায় তার শক্তিকে অপ্রতিহত রেখে তার জীবনের পরিণতিকে বাধামুক্ত কর্‌তে। এইজন্য দেখতে পাই স্বাধীন জীবিকার সংস্থান যাদের আছে, তাদের মধ্যে স্বাধীনতার ভিত্তিটাও পাকা। স্বাধীনতা যদি কেবল মাত্র মনের একটা উচ্ছ্বাস বা ভাবমাত্র (Sentiment) হয় তবে তা'তে ফল ধরে না; চাই, এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সুখসমৃদ্ধি লাভের আয়োজন করা। আমাদের দেশে কৃষিজীবী ও শ্রমিকের জীবনে আজ যে দুর্গতি দেখ্‌তে পাই, রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে তার কোনো বিশেষ প্রতীকার যদি সম্ভব না হয়, তবে তাদের কাছে "স্বাধীনতা" "স্বরাজ" এসব কথা নিতান্ত অর্থহীন। এতকাল তাদের উপর রাজা, উজীর, জমিদার, নায়েব, মহাজন, ব্যবসাদার সকলে যে অত্যাচার করেছে ও এখনও কর্‌ছে তার মূল হচ্চে তাদের পরবশতা। পেটের ভাতের জন্য এরা পরাধীন, অতএব ভোট দেবার ক্ষমতা থাক্‌লেই তারা স্বাধীন হ'তে পারবে না। স্বাধীনতার পাকা বনিয়াদ হচ্চে প্রবলের কাছে মাথা না বিকিয়ে, তার অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য না হ'য়ে, জীবিকার সংস্থান করা। আজ যে সব ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত আছে, তা'তে কি এ সম্ভব ? প্রজার সঙ্গে জমিদারের, ছোট জোতদারের সঙ্গে বড় পত্তনিদারের, মহাজনের সঙ্গে শ্রমিকের, যে সম্বন্ধ আছে তা'তে আমি যে স্বাধীনতার কথা বল্‌ছি তা' দেশের লোক পাবে কি ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের কোন জমিদার কৃষিজীবীদের জন্য

কি করেছেন? আর একথাও কি অস্বীকার করা করা যায় যে, যতদিন এরা নিজেরা অন্ন উৎপাদন ক'রেও তু'মুঠো ভাতের জন্য জমিদারের কাছে অবমান ও অধীনতা স্বীকার করবে, ততদিন প্রজারা ত স্বাধীনতার অর্থই বুঝবে না, আর তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে জমিদারেরা ইচ্ছা করলেও স্বাধীনতা লাভ করতে পাবে না। এদেশের কৃষিজীবীরা ভূ-স্বামীদের হাতে উৎপীড়িত হয়েছে, একথা বল্‌লে অনেকে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, কিন্তু পল্লীসমাজের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্টই বোঝা যায় ভূ-স্বামীরা কৃষক সম্প্রদায়ের হিতসাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য ব্যস্ত, আর তাদের সাহায্য লাভ ক'রেই ত মহাজন, পাইকার, ফড়িয়া, আড়ৎদার, মুদী প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ কৃষক-পল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করে।

যাহ'ক্ আমি বল্‌ছিলাম যে জনশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ না হ'তে পারলে সমস্যার পূরণ হবে না। এমন একদিন ছিল যখন ছোট ছোট কৃষকপল্লীগুলি দলবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের জীবন যাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করেছে; তাদের গরু চরাবার মাঠ, কাঠ খড়ের জন্য বন, ক্ষেতে জল দেবার জন্য পুকুর বা কুঁয়ো সবই ছিল সাধারণের সম্পত্তি। এক এক পল্লীর চাষীরা সকলে দল বেঁধে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিত; আর এই সমবায় পদ্ধতিই ছিল পল্লী-সমাজের আসল ভিত্তি। ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, কোনো কোনো পল্লীতে এখনও কাজকর্ম্ম চলে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করে। বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বড় বড় কুঁয়ো থেকে ক্ষেতে জল সেচন করা হয়; কিন্তু ছোট ছোট জোতদারেরা ত প্রত্যেকে এক একটা কুঁয়ো খুঁড়িতে পারে না—তাই তারা সবাই মিলে টাকা তুলে কুঁয়ো খনন করায়; মেরামতের খরচ সবাই মিলেই দেয়; আর চব্বিশ ঘণ্টাই কুঁয়ো থেকে জল তোলা হচ্চে। প্রত্যেক অংশীদার প্রহর হিসেবে জল পায়। জমিতে জলসেচন করবার মরসুম এলে কুঁয়োর কাছে চালাঘরে অংশীদারদের বৈঠক বসে,—তারা গান বাজনা, গল্পগুজব নিয়ে মেতে থাকে, আর পালাক্রমে ক্ষেতে জল দেবার ব্যবস্থা করে। মান্দ্রাজে বড় বড় দীঘীর ব্যবহার সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা—পল্লীর প্রত্যেক কৃষিজীবীই দীঘীর জল তুলে জমিতে জল সেচন করতে পারে।

এই ব্যবস্থার ভিতরকার সত্যটি এই যে, কৃষিকর্ম্ম পরিচালনার জন্য যা' একান্ত আবশ্যক তা'র উপর কোনো ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্ব থাকবে না। ফসল উৎপন্ন করার পথগুলি ছোট বড় প্রত্যেক কৃষকের জন্য খোলা না থাকলে কৃষির উন্নতি হ'তে পারে না। যেখানেই এই পথ রুদ্ধ হ'য়েছে বা সুগম করা হয়নি সেখানেই কৃষির অবনতি ঘটেছে। যারা অর্থবান্ তারা ফসল জন্মাবার সব সুবিধাগুলি একচেটিয়া ক'রে নিয়ে এখানে সেখানে তু'একজন অনেক টাকা ঢেলে উন্নত উপায়ে চাষ করতে পারে, কিন্তু তা'তে দেশের লাভ খুবই অল্প। সমস্যাই হচ্চে, ছোট ছোট জোতদারের স্বার্থ বজায় রাখার পথ আবিষ্কার করা। অর্জ্জনের উপায় নিজেদের হাতে রাখ্‌তে পারলেই এদের দৈন্যদশা ঘুচ্‌বে। বাংলাদেশে কি দেখতে পাই? ছোট ছোট

জোতদারের জমি অপেক্ষাকৃত অর্থবান মহাজন, ফড়িয়া, মুদী, আড়ৎদার প্রভৃতি লোকের কবলগত হচ্চে—এম্‌নি ক'রে কৃষককুল লোপ পেতে বসেছে। জমি বিকিয়ে সে অপরের জমিতে মজুর খাটে; মজুরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে মাসের পর মাস বিনা কাজে ব'সে থাকে। এমন গৃহ-শিল্পের ব্যবস্থা নাই যা'তে হাত দিয়ে তাদের দু'পয়সা রোজগার হ'তে পারে।

এই দারিদ্র্যসমস্যার মূল অন্বেষণ কর্‌তে গিয়ে দেখা যায় যে, যার উপর ভর করে পল্লী-সমাজ গড়ে উঠেছিল তার সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরে যাচ্চে। প্রশস্ত ধনাগমের রাস্তা আবিষ্কার কর্‌বার জন্য বর্ত্তমান কালে মানুষের মনে যে ঝোঁক চেপেছে, যার পিছন ছুটে ছুটে মানুষ হয়রাণ হ'ল, সেই কল খানার চাপ গ্রামেও এসে পৌঁছচ্চে—তাই গ্রাম্য ব্যবস্থা উলোট্‌ পালোট্‌ হয়ে গেল।

আমি পূর্ব্বে বলেছি গ্রাম্য-ব্যবস্থার মূল কথাটি হচ্চে জোট বেঁধে কৃষি বা অর্থাগমের নানা কাজে হাত দেওয়া। প্রত্যেকে নিজের নিজের দায় বহন করার চেয়ে জোট বেঁধে কর্ম্মক্ষেত্র পরিচালনা করা শ্রেয়ঃ; আর এম্‌নি করে পরস্পরের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মে তা'র ফলে পল্লীর যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রাণ পায়, সমস্ত পল্লীকে শক্তিমান করে তোলে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ভাঙ্গল কল কারখানার যন্ত্রে, আর যারা সে-সব যন্ত্রের মালিক হ'য়ে এদেশে এসে বস্‌লেন তাদের বিধিব্যবস্থায়। এর উপর আবার জাতের উৎপাত ত লেগেই আছে—কর্ম্মবিভাগ থেকে যে সমাজ সংস্থানের উৎপত্তি, তাই সমাজের স্তরে স্তরে ভেদনীতি সৃষ্টি করল; "অস্পৃশ্যতার" অপরাধ এই পথ দিয়েই প্রবেশ লাভ ক'রে আজ আমাদের সমস্ত জাতিকে পৃথিবী থেকে এক-ঘরে করে রেখেছে! প্রাচীন পল্লীসমাজ (Ancient Rural Communities) বাহিরের চাপে ও ভিতরের দুর্ব্বলতায় ভাঙ্গতে সুরু হওয়ার পর থেকেই ছোট ছোট জোৎদার বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌ল। জোট বেঁধে প্রতিযোগীতার সঙ্গে লড়বার শক্তি তাদের রইল না—তাই ভারতীয় কৃষিজীবীর অবস্থা এমন শোচনীয়! সে এখন জমিদারের জমিতে চাষ করে; ফসলের কিছু অংশ সে পায় কিন্তু তা'তে তার পেট চলে না। এদিকে দলবদ্ধ হয়ে দারিদ্র্যসমস্যার পূরণের চেষ্টা নাই; পুরাতন ব্যবস্থার আশ্রয় থেকে সে বঞ্চিত, আর নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সে নিজের অবস্থার সামঞ্জস্য কর্‌তে পার্‌লনা! আয়র্ল্যাণ্ডের কবি এই (Æ) এদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে, সেইটে এখানে উদ্ধৃত করচি :—

"But when the State broke up the clan or communal system, the small farmer became a pathetic figure in the modern world. He was like a small cockleshell of a boat sudddenly cut adrift from an ocean liner and left powerless at the mercy of the waters."

ভাবার্থ—রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধিব্যবস্থা সঙ্ঘবদ্ধ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে দিলে কৃষিজীবী যেন দেশের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌ল। সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছোট

নৌকার অবস্থা যেমন হয়,—কলার খোলার মতন ঢেউয়ের ধাক্কা সইতে সইতে সে যেমন ভাসতে থাকে,—বর্ত্তমান কালের কলা ও বাণিজ্য আর শিল্পব্যবসায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবীর অবস্থা তেম্‌নি অসহায়।

আমাদের কৃষকদের জীবনযাত্রা ভাল ক'রে চোখে পড়লে একথা কতদূর সত্য বুঝ্‌তে পার্‌ব। তার ক্ষেতের ফসল কি দরে, কার কাছে, কখন বেচবে, সে-সব নির্দ্ধারণ করবার কর্ত্তা হচ্চেন পাইকার দালাল, মহাজন, জমিদারের গোমস্তা। সে কোন্ ফসল বেশী জন্মাবে তাও বাৎলে দেবে সহরের ব্যবসায়ীরা! তার আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় জিনিষপত্র গাঁয়ের হাট বাজারে নিয়ে এসে যেমন খুসি দরে বেচ্‌বে—বানিয়া, আড়ৎদার, মুদী। কৃষিজীবীর এই সব পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা তাকে বলে "তুমি বাপু, বেচাকেনার গোলমালে থেকোনা। লাঙ্গল ঠেলে মাঠে ফসল ফলানো হচ্চে তোমার কাজ—তোমার আর সব কাজ আমরা দেখ্‌ব।"

পরভোজীদের এই পরামর্শই হচ্চে কৃষককুলের সর্ব্বনাশের মূল। একথা বল্‌লে তারা ক্রুদ্ধ হন; বলেন চাষাকে টাকা কর্জ্জ দিয়ে, ধানের গোলা থেকে ধান কর্জ্জ দিয়ে, মুদীখানা থেকে বাকি-হিসাবে তৈজসপত্র সরবরাহ করে, তারা কত উপকার করেন তার হিসাব রাখে কে? সুধু তাই নয়, চাষার পাট, ধান, কলাই, তিসি, তিল তারা না হ'লে চাষী কি ভাল দরে বেচ্‌তে পার্‌ত?

ছেলেদের রূপকথায় পড়েছিলাম একদল হাতী বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখে, ঝোপের আড়াল থেকে দলে দলে বন্য মুর্গীর ছোট ছোট বাচ্চা বেরিয়ে আস্‌চে। মা-বাপহীন অনাথ বাচ্চাদের দেখে হাতীদের মায়া হ'ল, আর তখুনি তারা এদের উপর বসে প'ড়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগল, বাচ্চারা তাদের কোলে নিরাপদেই আছে। হাতীদের চাপে বাচ্চারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল, সে কথা ছোট ছেলেরাও কল্পনা কর্‌তে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষিপল্লীর অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা কি অস্বীকার কর্‌তে পারেন যে, অর্থবান্ জমিদার ও মহাজন তাদের দলবল নিয়ে নিঃসহায় কৃষিজীবীর উপর চেপে বসে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করছেন্? এই দুর্ব্বিহ ভার তারা ফেল্‌তেও পার্‌ছে না, সইতেও পার্‌ছে না। যতদিন এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে, ততদিন কৃষিজীবীর উন্নতি হবে না, আর কৃষিউন্নতির পথেও অন্তরায় ঘট্‌বে।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন ঘটাবে কে? আর তার জন্য কি করা প্রয়োজন? এই দুইটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা কর্‌লে পল্লীসংস্কার ও কৃষিউন্নতিসমস্যার পূরণ কি ভাবে হ'তে পারে, তা' আমাদের বুদ্ধিগোচর হবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিলাতি বিজ্ঞানের দেশী চাষ

একালে যে বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে, তাহার আবার দেশী, বিদেশী কি? আমাদের শরীরের তত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটার বিচার করিতেছি। কি ধাতুতে মানুষের শরীর গড়া, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রগুলি কি ভাবে কাজ করিয়া শরীরকে তাজা রাখে, অথবা কি নিয়মে ও পদ্ধতিতে শরীরের ক্ষয় হয়, এ সকল বিষয় চিরকাল সকল দেশের মানুষেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একালে ইউরোপে ঐ সকল তত্ত্বের যে রকম নিপুণ ও গভীর অনুসন্ধান চলিতেছে, এদেশে তাহা দেখা যায় না। কেন দেখা যায় না, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে নানা রকমের তর্ক উঠিবে ও সে তর্কে আসল কথাটা চাপা পড়িবে। অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, শরীরের তত্ত্ব হউক, বা জড়ের তত্ত্ব হউক, উহার বিস্তৃত অনুসন্ধান চলিতেছে বিদেশে; আর এদেশে অল্প-সংখ্যক কয়েকটি বিদ্যালয়ে উহারই আবৃত্তি ও আলোচনা চলিতেছে; মৌলিক অনুসন্ধান ও হইতেছে, তবে খুব অল্প। এই জন্যই বিজ্ঞানকে আমরা বিলাতী জিনিস বলি; ইহা অবশ্যই সত্য যে বিজ্ঞানের তথ্য যেখানেই আবিষ্কৃত হউক, উহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া ফেলিলে তাহা সকল দেশের লোকেরই নিজস্ব হইয়া পড়ে। আমরা বিস্তৃতভাবে বহুস্থানে ও বহুলোকে মিলিয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে, ঐ বিদ্যাটি বিলাতি হইয়া থাকিবে না।

এনড্রিয়াস্ বেসালিয়াস্

বিস্তৃত চর্চ্চার প্রথম বাধা এই যে, এ কাজের জন্য বিদেশী ভাষা শিখিতে হয় এবং বিদেশের বই পড়িতে হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম প্রবেশের উদ্যোগে দেশের ভাষায় বই লেখা চলে, কিন্তু প্রথম শিক্ষণায় বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া শিখাইবার শিক্ষকও এদেশে এখন যথেষ্ট পাওয়া যায় না। গ্রামের পাঠশালাগুলিতে বিজ্ঞানের বই পাঠ্য করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞানের ক খ শিক্ষা একেবারেই হইতেছেনা। টোলে যে রকম করিয়া ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি মুখস্থ করিবার

পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে সেই পদ্ধতিতেই পাঠশালার শিক্ষকেরা ছেলেদিগকে বিজ্ঞানের বই মুখস্থ করাইয়া থাকেন। উহাতে ফল হয় এই যে, বইগুলিতে যে তথ্যের কথা লেখা থাকে, সে গুলি গুরুর-বচনে-পাওয়া অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিতে হয়, কিন্তু নিজের পরীক্ষায় সত্যকে যাচাই করিয়া লওয়া হয় না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়িয়া দিলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না, কৌতূহল জাগে না, নূতন অনুসন্ধানে নূতন আবিষ্কার হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞান জিনিসটি কাবুলের শুক্না মেওয়ার মত আমদানি হয়, কিন্তু দেশের ক্ষেতে উহার চাষ হয় না। যদি ঠিকভাবে বিজ্ঞান পড়াইবার বন্দোবস্ত করিতে পারা না যায়, তবে পাঠশালায় বিজ্ঞানের বই চালাইলে মহাপাপ হইবে। বিজ্ঞানের শিক্ষক তৈয়ারি হইবার পূর্ব্বে পাঠশালায় এমন সাহিত্য চালাইবার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে বালকদের মনে এই ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে যে, তাহারা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া সত্য বলিয়া না বুঝিলে, কোন তত্ত্বকেই কাহারও আদেশে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে না। গোড়ায় এই শিক্ষা আসিলেই দেশের মাটিতে বিজ্ঞানের বীজ বুনিয়া দেওয়া হইবে, ও দেশে খাঁটি দেশী বিজ্ঞানের চাষ বাড়িবে।

গোড়ায় শরীরের তত্ত্বের কথা বলিয়াছি। ইউরোপে ঐ বিদ্যার যে ভাবে উন্নতি হইয়াছে, তাহার গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যে, অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র না মানাতেই ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে।

ইউরোপে দেহ-তত্ত্বের খাঁটি বৈজ্ঞানিক বই ছাপা হয় ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, ও সেই বই লিখিয়াছিলেন Andreas Vesalius। এই সময়ে একদিকে যেমন নানা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, তেমনই আবার প্রাচীন কালের সংস্কারের সঙ্গে নূতন যুগের সংস্কারের বিবাদ চলিতেছিল। স্পেন দেশ যতদিন মূরদের দখলে ছিল ততদিন সে দেশে নানা জ্ঞানের চর্চ্চা চলিতেছিল; কিন্তু এ সময়ে স্পেন দেশে খ্রীষ্টিয়ানি গোঁড়ামি এত বাড়িয়াছিল যে, বাইবেলে যে জ্ঞানের কথা নাই, অথবা যে তত্ত্ব বাইবেলের মতের বিরোধী, তাহা কেহ প্রকাশ করিতে পারিত না। জার্ম্মানিতে লুথর ধর্ম্মের নূতন সংস্কার করিয়া আন্দোলন তুলিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালিতে প্রাচীন সংস্কার লইয়া আলোচনা ও বিবাদ চলিতেছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে হাজার বারশত বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মপ্রচারকেরা কোন বিষয়েই নূতন জ্ঞানকে বাড়িতে দেন নাই; ধর্ম্মবিষয়ে কেহ তিল-মাত্র বাইবেলের বিরোধী কথা বলিলে দণ্ডিত হইত, এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে কয়েকখানি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লেখা গ্রন্থকে চরমজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইতে হইত। খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে গালেন (Galen) যাহা লিখিয়াছিলেন, শরীরের তত্ত্ববিষয়ে তাহাই সকলকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইত। পাদ্রী-সঙ্ঘের ক্ষমতা ছিল অসীম; এই সঙ্ঘের বা church-এর বিধান হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি শবচ্ছেদ করিতে পারিবে না, কারণ মানুষের শবচ্ছেদ পাদ্রীদের বিচারে পাপ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এ বাধা সত্ত্বেও জ্ঞানের কৌতূহলে কেহ কেহ মানুষের শবচ্ছেদ করিয়া গোপনে শরীরের তত্ত্ব শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের লেখা ভালভাবে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

আমরা যে বেসালিয়স্-এর কথা বলিয়াছি, ইঁহার জন্ম বেলজিয়ামে ও ইনি ফরাসী দেশে ১৭ বৎসর বয়সে ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করেন। বেসালিয়সের গুরু সিলবিয়স্ নিজে শবচ্ছেদ করিতেন না, কেবল গেলেনের বইয়ে যাহা আছে তাহা পড়াইয়া যাইতেন ; গেলেনের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই যদি শরীর পরীক্ষার প্রয়োজন হইত, তবে কুকুর বিড়াল কাটা হইত, কিন্তু ঐ মড়াগুলি কাটিত অশিক্ষিত নাপিতেরা। বেসালিয়স্ বাল্যকালেই নিজের হাতে নিজের বাড়ীতে মরা জন্তু কাটিতে শিখিয়াছিলেন, কাজেই ঐ কাজে তাঁহার কোন ঘৃণা ছিল না। তিনি সমাজের শাসন না মানিয়া, ও গুরুর শাসন না মানিয়া নিজে হাতে-কলমে বিড়াল কুকুর কাটিয়া পরীক্ষা করিতেন, ও মাঝেমাঝে নানা কৌশলে মানুষের শবচ্ছেদ করিবার সুবিধা করিয়া লইতেন। নিজের কৌতূহলে ও নিজের চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করিয়া অল্পবয়সেই তিনি ইটালিতে শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের সকল বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বেসালিয়স্ তাঁহার গ্রন্থে অতি সাহসের সঙ্গে গেলেনের ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন মানুষের পরীক্ষাকেই যে নিজে পরীক্ষা না করিয়া মানিয়া লওয়া উচিত নয়, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। যেখানে গেলেনের মত তিনি অশুদ্ধ মনে করেন নাই, সেখানেও তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, সেই মত গেলেনের নামের জোরে সত্য নয়, পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়াই সত্য। বেসালিয়স্ তাঁহার ছাত্রদিগকেও এই ভাবেই শিক্ষা দিয়া নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। গুরু ও শাস্ত্র ছাড়িয়া স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধানের এই যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার আর ধ্বংস হয় নাই।

বেসালিয়সের সময়ে সার্ভিটাস্ ও ফেলোপিয়াস্ (Servitus & Fallopius) ইটালিতে শারীর-বিদ্যার অনেক অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং সার্ভিটাস, শরীরে রক্তসংক্রমণপদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক গোড়ার কথা লিখিয়াছিলেন। অবাধ-প্রবাহিত বিশুদ্ধ বায়ু যেমন প্রাণকে উল্লসিত করে, এই পণ্ডিতদের স্বাধীন চিন্তাও তেমনি ইটালিতে নূতন উল্লাস ও উৎসাহ আনিয়াছিল। বেসালিয়সের ছাত্রদলের মধ্যে ফেব্রিসিয়স্ খুব প্রতিভাশালী ছিলেন। শরীরে রক্তসংক্রমণের পদ্ধতির প্রসঙ্গে তিনি যাহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, হয়ত তাহারই ভিত্তিতে সুপ্রসিদ্ধ হার্ভে তাঁহার অবিষ্কারটি করিয়া অমর হইয়াছেন। এই সময়ে ইটালি জ্ঞানের চর্চ্চায় বড়ই বিখ্যাত হইয়াছিল এবং ইংরেজ হার্ভে ইটালিতে শিক্ষা করিয়াই বড় হইয়াছিলেন। সাহিত্যাদি বিষয়েও যে ইটালির বিদ্যা ইংলণ্ডে সংক্রামিত হইয়া ইংলণ্ডকে বড় করিয়াছে, সে কথাও স্মরণ রাখা উচিত। বিদেশে গিয়া বিদ্যা শিখিলে মানুষের গা পচিয়া যায় না ; কারণ, জ্ঞান বিশ্বপীঠের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর দেওয়া বর। যেখানে জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ, যেখানে স্বদেশ বা বিদেশের বিচারে জ্ঞানকে জাতিভেদের গণ্ডীতে বাঁধা হয়, সেখানে অধঃপতন অনিবার্য্য।

শ্রীবিজলীবিহারী সরকার

ফাল্গুনে

ভারতবাসীরা কি এক 'নেশন' নয় ?

নেশন হইল বিদেশী শব্দ; সমাজতত্ত্ববিদেরা যে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা বলিতেছি। তাঁহারা বলেন যে, একটা 'দেশের' মধ্যে অনেক 'প্রদেশ' থাকিতে পারে এবং দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশটা যদি এমনভাবে অখণ্ড ও জমাট বাঁধা থাকে যে, সকল প্রদেশগুলি এক সঙ্গে না জুটিলে, কোন প্রকারে কোন একটা প্রদেশ তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলেই সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একই শাসনের মধ্যে পড়িলে একটি 'নেশন' হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথমে দেখিতে পাইতেছি যে, বিদেশের সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষ দেশটি একটা Geographical Unit—অর্থাৎ উহার কোন প্রদেশ অন্য প্রদেশকে ঠেলিয়া স্বাধীন হইতে পারে না; তাহার পরে দেখিতেছি যে, আমরা এখন সকলেই এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে, একই রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বাড়িতেছি। পূর্ব্বে কখনও পাকা রকমের একচ্ছত্র রাজত্ব না থাকিলেও প্রাচীন ভারতের লোকেরা এই দেশটিকে একটি অখণ্ড দেশ বলিয়াই ভাবিতেন—দেশের একত্বের এই অনুভূতি, ইংরেজের আমলেই নূতন করিয়া জন্মে নাই; তবুও কি কারণে এদেশে পূর্ব্বে একচ্ছত্র রাজত্ব হয় নাই, এখানে তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। প্রাচীন একত্বের অনুভূতির দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কূর্ম্মপুরাণে কূর্ম্মকে এমন ভাবে রাখা হইয়াছে, যাহাতে ভারতের সকল অংশই উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢাকা পড়ে; স্নানের মন্ত্রে সকলকেই প্রতিদিন, সিন্ধু হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত সকল দেশের নদীকে আপনার দেশের নদী বলিয়া স্মরণ করিতে হয়। তবে আমাদের প্রদেশে প্রদেশে অনেক বিষয়ে মিল নাই, এবং জাতিতে জাতিতে অনেক অমিল ও বিবাদ আছে; এই জন্য অনেকে ভারতবাসীদিগকে এক নেশন বা জাতিসঙ্ঘ বলিতে চাহেন না।

এক পরিবারের লোকের মধ্যে যদি প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব হয়, পুত্রেরা যদি পিতার অবাধ্য হয়, পুত্রদিগের মধ্যে যদি বিবাদ-বিসংবাদ চলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কথায় কথায় কলহ উপস্থিত হয়, তাহাহইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, ঐ পরিবারের লোকগুলি এক পরিবারের লোক নহে। আমাদের কপালের দোষে, বুদ্ধির দোষে ও আরও দশ রকমের দোষে যদি আমরা বুঝিতে না পারি যে, আমরা একে ঠেলিয়া অপরে বাড়িতে পারিব না, তাহা হইলে আমরা দোষ খণ্ডাইবার জন্য আয়োজন করিতে পারি, কিন্তু আমরা যে সকলে মিলিয়া এক জন-সঙ্ঘ নহি, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের অভাব জন-সঙ্ঘের একতার অর্থাৎ national unity নামক পদার্থের।

সকলের মধ্যে ধর্ম্মে ও ভাষায় মিল না থাকিলে যাঁহারা একটি জন-সঙ্ঘকে নেশন বলিতে চাহেন না, তাঁহাদের কথা এখন উপেক্ষা করিতে পারি। যতই সভ্যতা বাড়িবে, ততই সামাজিক বিচিত্রতা বাড়িবে; প্রত্যেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে সেইরূপ চিন্তার স্বাধীনতায় সমাজ ভাঙ্গিবে না। যে বড় রকমের স্বার্থ আমাদের ইহলোক-সাধনের সহায়, সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝিলেই জাতীয় বাঁধন শক্ত হইবে; পরলোকের তত্ত্ব লইয়া গোল বাঁধিবে না। তবে ধর্ম্মের নামে পরস্পরের অমিলনের অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে; সে জঞ্জাল উচ্চতম স্বার্থের তাড়নাতেই পুড়িয়া যাইবে। শিক্ষায় সুবুদ্ধি ফুটিলে কেহ আর উপযুক্ত লোকের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক পাতাইবার কালে খুঁজিবে না যে, সে ব্যক্তি কি খাদ্য খায়, অথবা দৃশ্যাতীত বিষয়ে তাহার বিশ্বাস কিরূপ।

সুইট্‌জারলণ্ডের মত ছোট দেশেও তিনটি ভাষা চলিতেছে, আর তাহাতে জাতি-সঙ্ঘ বাঁধিবার বাধা ঘটিতেছে না। রুসিয়া বাদ দিলে বাকি ইউরোপখণ্ড যত বড়, ভারতবর্ষ দেশটা তত বড়। এ হেন ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়াই বহুভাষা চলিবে। এই ভাষার ভেদ থাকিলেও, প্রাচীনকালে সারা ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইতে ছাড়ে নাই। এক স্বার্থের টানে ও এক লক্ষ্যে ছুটিলে, এ ভাষাভেদে গোল ঘটাইবে না; মিলন ঘটিলে যে আবার কি পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে একটা সাধারণ ব্যবহারের ভাষা গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাও কেহ জানে না। এখন আসা চাই,—যথার্থ স্বার্থ-বোধ, বুঝিয়া ফেলা চাই, যে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক প্রাণের মিলে হাতে হাত ধরিয়া না চলিলে উদ্ধারের উপায় নাই। জাতি-সঙ্ঘ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু মিলনের অভাবে সকলে বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। নেশন শব্দটিকে একটা 'জুজু'-র মত খাড়া করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন তাঁহারা হয় ভ্রান্ত, না হয় আমাদের শত্রু।

* * *

বিশ্ব-প্রীতির নূতন উদ্যোগ

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে অবসাদ আসিয়াছে ও নীতি-কুশলদের মনে হয়ত-বা একটু শ্মশান-বৈরাগ্য জমিয়াছে। নীতি-নিপুণেরা একটি মিলনের সূতায় ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানকে এমন ভাবে বাঁধিতে চাহিতেছেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে। জাপানের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখিতে পাই যে, ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের মিল নাই, বরং বিরোধের কারণ যথেষ্ট আছে; তবুও নীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সকলে একসঙ্গে মিলিয়া, বিশ্বময় একটা শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে। আশ্চর্য্য এই যে, এই বিশ্ব-প্রীতির নায়কেরাই বলেন, যে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্বার্থের নৈসর্গিক টান থাকিলেও ভারতে একজাতীয়ত্ব অসম্ভব।

যাহা হউক যাহারা পরের দেশ চুরি করিবার জন্য "মাস্‌তুতো ভাই" সাজিয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছিল, তাহাদের মিলন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর এবারে সাধুতে সাধুতে মিলিয়া "ভাই-ভাই" হইবার উদ্যোগ হইতেছে। মিলনের উদ্যোগে আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে যে বৈঠক বসিয়াছিল, সেখানে কিন্তু কোলাকুলি হইল যেন "শেয়ানায় শেয়ানায়"। সকলেই সাধু, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলিবেন না ; তবে ভবিষ্যতে ও যাহাতে কাহারও দুর্ম্মতি না ঘটে, তাহার জন্য সকল দেশেই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যুদ্ধের সরঞ্জাম কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ফ্রান্স কিন্তু প্রথমে পূরা মাত্রায় প্রস্তাবটি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। সে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া গলাগলি হইয়া চোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তবুও সে বলে যে, ইংলণ্ডের জাহাজের সংখ্যা যখন খুব বেশি রহিল, তখন জাহাজ ভাঙ্গার জন্য অনেক ডুবুরি নৌকা না রাখিলে তাহার চলিবে না। ফ্রান্স আরও বলিতেছে যে মহাযুদ্ধের সময় বেশিরভাগ ক্ষতি সহিয়াছে সে, আর যুদ্ধ-জয় হইয়াছে তাহারই বার-পণায়, অথচ জয়-লব্ধ দেশগুলির বিলি-বাটোয়ারার সময়, ইংলণ্ডই বড় বড় ভাগ পাইল। ইহার উপর আবার জার্ম্মানী ছল করিয়া দেউলিয়া সাজিয়া ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতেছে না, অথচ ইংলণ্ড এই প্রতারককে জব্দ করিতে অগ্রসর হইতেছে না। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ থাকিতেও ফরাসা রাষ্ট্র-সভার সভাপতি Briand ইংরেজ-মন্ত্রী Lloyd George-এর সঙ্গে আপোষ করিবার কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া দেশের লোকে Briand-এর উপর চটিয়াছে। Briand তাঁহার কাজে ইস্তাফা দিয়াছেন, ও যুদ্ধের দিনের নেতা Poincare সভাপতি হইয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে যুদ্ধের সময়কার রূপ বদলাইবার জন্য আরও "ঘষা-মাজা" চাই, এবং প্রীতি স্থাপনের জন্য আরও "ধরা-বাঁধা" চাই। তবে জানিনা, যে যতই ঘষা-মাজা যাউক না কেন, পীত-কৃষ্ণ শ্বেত হইবে কিনা, আর স্বার্থের বিরোধ থাকিলে ব্রজ বাঁধনের গ্রন্থিও ফস্কা হইবে কি না।

* * *

দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডে স্বরাজ

বহু শতাব্দীর অবিরাম আন্দোলনে ও উদ্যোগে দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডে স্বরাজ আসিয়াছে। উত্তর আয়ার্লণ্ডে আগেকার মত ইংরেজের প্রভাব ও শাসনই রহিয়া গেল ; উত্তরে দক্ষিণে কখনও মিল ঘটিবে কিনা, কে জানে। ইংরেজ শাসন উড়াইবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "সিন্‌ফিন্‌"-দের গুপ্তদল গঠিত হইয়াছিল, আর সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত উহারা কত মারামারি, কাটাকাটি না করিয়াছে! এবারে দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডে স্বরাজ দিয়া বৃটিশ পার্লেমেণ্ট বলিয়াছেন, শান্তিঃ শান্তিঃ। ফল ভবিষ্যতের হাতে। ইংরেজেরা এখন বলিতেছেন যে, জাতির উৎপত্তিগত, ভাষাগত ও ধর্ম্মগত যত প্রভেদ থাকুক না কেন, বোঝা-পড়া হইয়া গেল ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে,—শাদায়

শাদায়। ইংরেজদের বিশ্বাস যে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও যেমন মিলের অভাব হয় নাই, এবং দুঃখ-বিপদের দিনে পরস্পর পরস্পরকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছে, দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ডের বেলায়ও তাহাই ঘটিবে; প্রাচীন বিবাদের স্মৃতি লুপ্ত হইবে।

ইউরোপীয় মুরুব্বি

ইউরোপীয়দের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের হিতৈষী মুরুব্বিরূপে দেখা দেন, আর তাঁহারা একটা কিছু উপকার না করিয়া ছাড়েন না। এই মুরুব্বিরা যে পদ্ধতিতে আমাদের অন্নকষ্ট ঘুচাইতে চান, তাহার একটি মনোজ্ঞ ছবি আঁকিয়াছেন—অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়। ("কলিকাতা রিভিউ," ডিসেম্বর ১৯২১।) সতীশ বাবুর সুরচিত প্রবন্ধের সার মর্ম্মটুকু দিতেছি।

সুসভ্য মুরুব্বিরা ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমাদের খাই-খাই রবটা দুর্ভিক্ষের পীড়নে নয়,—ওটা বর্ব্বরের কাল্পনিক ক্ষুধার প্রাকৃতির চীৎকার। পশুদের মত বর্ব্বরেরা গোগ্রাসে অনেক খায়, ও পেট টৈটুম্বুর না হইলে ছাড়ে না; এমন করিয়া খাইলে পাকস্থলীটা অস্বাভাবিকরকমে আয়তনে বাড়ে, ও ক্ষুধা না হইলেও, পেট একটু খালি হইলেই, মানুষে খাই-খাই করিয়া চেঁচায়। ডাক্তারেরা যেন আমাদের টন্‌টনে পেট দেখিয়া ম্যালেরিয়ার ভুল না করেন। আসল কথা এই যে, আমরা কমসম করিয়া খাইতে শিখিলেই হাহাকার থাকিবে না ও দুর্ভিক্ষের বালাই দূর হইবে। ভাত খাওয়ার কুসংস্কার গেলেও দুর্ভিক্ষ কমিতে পারে; দুর্ভিক্ষের সময় কত লোক মরিল ও বাঁচিল, তাহার গণনা না করিয়া, যদি গো-সুমারি হয়, গাছ-সুমারি হয় ও মাছ-সুমারি হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দুধে, ফলে ও মাছে সারা দেশের লোকের পেট ভরিবে। রাজ-কোষে টাকার অভাব পূরাইবার জন্য মুরুব্বিদের উপদেশ এই যে, কেরানি ও মাস্টারদের বেতন কমই থাকা উচিত; কারণ; তাহাদের অভাব অল্প, আর অন্যদের মত তাহারা আন্দোলনের ঝড় তুলিবে না। তাহার পর যদি সুসভ্য জাতির কর্ম্মচারীরা ঐ উদ্বৃত্ত টাকাটা পান, তবে তাঁহারা ভাল ঘরে থাকিয়া, ভাল খাইয়া, পাখার বাতাসে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া, দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে পারেন। এই বর্ব্বর দেশের লোকেরা বেশি টাকা পাইলে বিলাসী হয় ও বিবাহে-শ্রাদ্ধে টাকা উড়ায়, আর বেশি খাইতে পাইলে অলস হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

* * *

ভাত-কাপড়ের শনি

কোথাকার শনি কোন্ রন্ধ্রে বসিয়া এ দেশের ভাত-কাপড় উড়াইয়া দিতেছে, তাহা না ধরিতে পারিলে, গ্রহ-শান্তির ব্যবস্থা হয় না। সেই জন্য সরকার বাহাদুরের নিয়োগে, শনি খুঁজিবার

কমিটি বসিয়াছে; এই অনুসন্ধানসভার নাম হইয়াছে, "ফিস্‌কল-কমিশন," ও উহার সভাপতি হইয়াছেন বোম্বাইএর শ্রীযুক্ত রহিমুৎ উল্লা সাহেব। বড় বড় সহরে ঘুরিয়া, বড় বড় লোকের এজাহারে সভার লোকেরা শনির গতিবিধি ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সমস্যা বড় কঠিন। দৈবের তাড়নায় যদি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে ফসল না হয়, ও দুর্ভিক্ষ আসে, তবে এ দেশের লোকে কপালের দোষ দিয়া মরিতে পারে; কিন্তু অজন্মা হইল না, অথচ দু-মুঠা খাইবার সামগ্রীর দাম অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গেল কেন? দেশের লোকের টাকা বাড়িয়া, যদি টাকা সস্তা হইয়া পড়িত, তবে খাদ্যের দাম বাড়িলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহা ত হয় নাই। দেশটা কি তবে বিদেশী বাণিজ্যের অন্তরটিপ্‌নিতে টিপুনি খাইয়া মরিতেছে না? ব্যবসা-বাণিজ্য না চলিলে দেশের সম্পদ বাড়ে না, তাহা জানি; কিন্তু দেশের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে সকল কড়া নিয়মে খাদ্য-সামগ্রীর রপ্তানি শাসিত হওয়া উচিত, তাহা কি হইতেছে? অবাধ বাণিজ্যে অন্য দেশের লোকেরা সুবিধা পাইবে, আর এদেশের লোকে মরিবে, এ ব্যবস্থা ত চলিতে পারে না। যদি প্রতি বৎসরের উৎপন্ন ফসলের হিসাবে, কড়া নিয়মে স্থির করিয়া দেওয়া হয় যে, কত পরিমাণের অধিক খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হইতে পারিবে না, তাহা হইলে অন্নসমস্যার কূল-কিনারা হয় কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞেরা ভাবিয়া দেখিবেন।

এক সময়ে এ দেশের তাঁতে যত কাপড় হইত, তাহাতেই দেশের লোকের চলিত; বিদেশেও এ দেশের কাপড় কাটিত। তাহার পর বিদেশের ব্যবসায়ের নীতিতে স্থির হইয়া গেল যে, এ দেশের তৈয়ারি মাল বিদেশের হাটে বিকাইতে গেলে অসম্ভব রকমে বেশী শুল্ক লাগিবে, আর কাঁচা মালগুলি অল্প শুল্কে বা বিনা শুল্কে বিদেশের লোকেরা কিনিতে পাবিবে। ফল হইল এই যে, অতি সস্তাদরে ভারতের পল্লীতে পল্লীতে বিদেশী কাপড় বিক্রয় হইতে লাগিল, আর দেশের তাঁতিরা, এঁড়ে গরু কিনিবার আগেই মরিল। আমরা সস্তার মজায় বিদেশের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হইলাম। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং ঐ যুদ্ধের পরে, যখন বিদেশের কাপড় এ দেশে বেশী আসিল না, তখন মহাজনেরা সুবিধা পাইয়া কাপড়ের এমন দাম বাড়াইল, যে দেশের "হরি" আর দেশের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিলেন না। দেশের কাপড়ের যন্ত্রের মুণ্ড বহুকাল পূর্ব্বেই শনিতে উড়াইয়া দিয়াছে; এখন সেই প্রাচীন ধড়ে প্রাণ আনা সম্ভব, না, নূতন করিয়া একটা তাজা শরীর গড়িতে হইবে?—পুরাকালের কলেই কাজ চলিবে, না, নূতন কল চাই?

আমরা যদি নিজের কাঁচা মাল নিজে ব্যবহার করিতে না পারি, অর্থাৎ দেশে যদি দেশের কাঁচা মাল না বিকায়, তবে রপ্তানির উপর শুল্ক চড়াইলেও প্রজাদের কোন উপকার হইবে না। বিদেশের স্বার্থ, যদি আমাদের স্বার্থকে বাড়িতে না দেয়, এবং আমাদের স্বার্থের বিচারে যদি আমদানি-রপ্তানি শাসিত না হয়, তবে কিছুতেই কিছু হইবে না। কাজেই দেখিতেছি যে, শনি এখন এমন দুর্লক্ষ্য রন্ধ্রে যে, তাহার প্রকোপ দূর হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিদেশ তাহার স্বার্থ

ছাড়িবে না, আর আমরাও স্বাধীন বাণিজ্য করিতে পাইব না ; এ অবস্থায় সকল ফিস্‌কলই নিস্ফল হইয়া যাইবে।

* * *

আইনে জাতিভেদ

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইলবার্ট বিলে অতি ক্ষুদ্র প্রভেদ ঘুচাইবার প্রস্তাবেই তুমুল আন্দোলনের ঝড় বহিয়াছিল। এখন ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তৃত্বে অনুসন্ধান চলিতেছে যে, ফৌজদারী আইনের বিচার পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের জন্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না। ইউরোপীয়েরা আপনাদের উচ্চতর সভ্যতার দম্ভে ভারতবাসীদের সামাজিক অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহলী হয়েন না ; অথচ তাঁহারা যে এ দেশের লোককে বিচার করিবার অনুপযোগী সে কথা কখন ওঠে নাই। অন্যপক্ষে, আবার আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা প্রাণপণে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী দাঁড়াদস্তুর শিখিয়া হাকিমি, ওকালতী প্রভৃতি কাজ করেন ; তবুও কেন কথা উঠিবে যে এদেশী হাকিমেরা বিদেশী অপরাধীদিগকে বিচার করিতে অনুপযুক্ত ? ইউরোপীয় অপরাধীরা এ দেশের উকীল, বারিষ্টার দিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাহাতে যদি তাঁহাদের অসুবিধা না ঘটে, তবে হাকিমদের বেলা অসুবিধা ঘটিবে কেন ? এখনকার স্বরাজের আন্দোলনের সময়ে সকল ইংরেজের মুখেই শুনিতে পাই যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ঘৃণা করেন না, বরং আপনার বলিয়াই ভাবেন। তাঁহারা মিথ্যাবাদী নহেন ; কাজেই বলিতে পারি যে, এবারে সাম্যবাদী ইংরেজের আইন হইতে উল্লিখিত প্রভেদটি তুলিয়া দেওয়া হইবে, এবং আইনের বিচারে জাতিভেদ রক্ষিত হইবে না।

* * *

ওড়িশার ভবিষ্যৎ

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় বেহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যে সকল প্রদেশে ওড়িয়া ভাষা চলে, সেগুলি একসঙ্গে আনিয়া একটি নূতন প্রদেশ গড়া উচিত ; সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ এলাকার গঞ্জামে উড়িয়া চলে, গঞ্জামের লোকেরা স্বীকৃত না হইলে, সে জেলাকে ওড়িশার সঙ্গে বাঁধা চলিবে না। খুব সম্ভব, গঞ্জামের ওড়িয়ারা তেলেগু প্রাধান্য এড়াইতে চাহিবে। সম্বলপুরের সঙ্গে ১৯০৫ পর্য্যন্ত যে সকল জমীদারী জোড়া ছিল, সেগুলি অবশ্যই মধ্য প্রদেশের কর্ত্তারা ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। ওড়িশা প্রদেশ এইরূপে বাড়িয়া উঠিলেও সেখানে একটা স্বতন্ত্র শাসন চলিতে পারে কি না, তাহা আয়ের দিক হইতে বিচারিত হইবে। এখনকার ওড়িশার দশ আনা অংশ ফিউডেটরী রাজাদের রাজত্ব ;

আর বালেশ্বর, কটক, পুরী, লইয়া যে একটি বিভাগ তাহার সঙ্গেই পশ্চিম প্রান্তের সম্বলপুর জেলা জোড়া আছে। পরিসরের হিসাবে কাজেই এই প্রদেশটি তেমন বড় নয়। এই বাধা গুলির কথা একদিকে, আর অন্যদিকে অতি বড় কথা হইতেছে উড়িশার উন্নতি। নগন্য হইয়া এক কোণায় পড়িয়া থাকিলে ওড়িশা প্রদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারিবে না। আমাদের মনে হয় বাঙ্গলার সঙ্গে যখন ওড়িশার মিল অধিক তখন বাঙ্গলার সঙ্গে রাখিয়াই তাহাদের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র দিলে ভাল হয়। যে প্রদেশের লোকদের সহিত আচার ব্যবহার ও ভাষায় তাহাদের কোনও মিল নাই— তাহাদের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ায় ওড়িয়াদের উন্নতির পথে বিশেষ বাধা হইতেছে।

মানুষগণ্তি

এবারকার মানুষ গণ্তির বিশেষ জ্ঞাতব্য বিবরণ গুলি পরে দেওয়া যাইবে। মোটামুটি জানা গিয়াছে, যে কলিকাতা সহরে লোক-সংখ্যা খুব বেশী বাড়িয়াছে আর অন্যান্য সহরেও কিছু কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু দেশের গ্রাম গুলিতে লোকসংখ্যা বড়ই কম পড়িয়াছে। কলিকাতার বেশীর ভাগ লোকসংখ্যা বাড়াইয়াছে অন্য প্রদেশেরও বিদেশের লোকেরা; কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে দিন দিন আমাদের গ্রাম গুলি উজাড় হইতেছে, ও বাঙ্গালী জাতি সংখ্যায় কমিতেছে। যমের হাত এড়াইবার জন্য, আমরা কি 'ব্যবস্থা' করিতে পারি, তাহাই কি সকল রাষ্ট্রনীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নীতি নয়? ম্যালেরিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা করা চাই-ই চাই, কিন্তু মশা মারিবার জন্য কামান দাগিবার আগে পেটের ভাতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, কারণ পেটে খাইলে মানুষে অনেক রোগের আক্রমন এড়াইতে পারে,—তাহাদের পিঠে অনেক সয়।

* * *

অসম্প্রদায়িক বিবাহ-বিধি

প্রচলিত নিয়মে হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ; যাহারা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, এইরূপ যে সকল 'অনার্য্য' জাতির লোক আছে, তাহাদের মধ্যেও আপনাদের সাম্প্রদায়িক সনাতন প্রথায় বিবাহ না হইলে, সে বিবাহ আইন-সিদ্ধ হয় না। স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ চলিতে পারে না; অসবর্ণে অথবা বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ হইতে হইলে, পাত্র-পাত্রীকে ১৮৭২ সনের তিন আইনের মতে এই কথা লেখাইয়া বিবাহ করিতে হয়, যে তাহারা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধর্ম্ম মানে না। কোন ধর্ম্মমত বা সমাজকে যাহারা অগ্রাহ্য করে না, তাহারা স্বাধীনভাবে রেজিষ্টারী করাইয়া যাহাতে বিবাহ করিতে পারে, এই মর্ম্মে কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু আইন সভায় এক বিল উপস্থাপিত করেন, আর সেই বিল সেবারে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। তাহার পর ঐ উদ্দেশ্যেই গুজরাতের পটেল মহাশয় আর এক বিল উপস্থাপিত করেন, এবং উহা লইয়া আন্দোলন চলিবার সময়েই প্রস্তাবক পটেল মহাশয় আইন-সভা পরিত্যাগ করেন। এবারে মধ্য-প্রদেশের বারিস্টার গৌর মহাশয় ঐ বিল নূতনভাবে পেশ করেন; দেশের লোকের মত-বিরোধ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বিল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। আইন সভায় ঐ বিলটি অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে। সমাজ অথবা সম্প্রদায় বিশেষের, নিয়মকে যাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে চাহেন তাঁহারা স্পস্ট কথায় বলিতে পারেন যে অমুক সমাজের নিয়ম বা ধর্ম্ম তাঁহারা মানেন না; এবং তাহাই বলিয়া ১৮৭২ সনের তিন আইনে বিবাহ চালাইতে পারেন। যাহা হউক এযাত্রা বিল্‌টি রদ্‌ হইল, ইহাই যথেস্ট।

* * *

ভারতে যুবরাজ।

যুবরাজ ভারতে আসিয়াছেন, বোম্বাই-এ বিষম দাঙ্গা ঘটিল,—মাদ্রাজেও অনেক হাঙ্গামা হইয়াছে। কলিকাতায়ও হরতাল হইয়াছিল বটে কিন্তু অভ্যর্থনার উৎসব নির্ব্বিবাদে মিটিয়াছে। এ উৎসবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডি, এল" উপাধি দিয়াছেন। উপাধি-দানের দরবারে ভাইসচান্‌সেলর সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহার পিতা ও পিতামহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ-জাতি যখন স্বাধীনতা দানে অকুন্ঠিত তখন তিনি যেন ভারতের নূতন আকাঙ্খা ও উদ্যোগের সহায় হয়েন।

এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কয়জন স্বনামধন্য পুরুষকে উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিতর ফরাসী দেশের আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি, ছাত্রপ্রাণ আচার্য্য হেন্‌রি ষ্টিফেন, মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান সার বিশ্বেশ্বরায়ার ও মাননীয় পারঞ্জপে মহোদয়ের প্রতিকৃতি প্রকাশ করা গেল।

* * *

প্রাচ্য-বিদ্যা-সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্‌সেলর শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম অধ্যাপনাবিভাগের সভাপতি; এই অধ্যাপনাবিভাগের পক্ষ হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে প্রাচ্য-বিদ্যা-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ২৮শে জানুয়ারি হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সমিতির

বৈঠক বসিয়াছিল ; এবং ভারতের বহুস্থান হইতে বড় বড় পণ্ডিতেরা আসিয়াছিলেন। সমিতির অধিবেশনে অনেক সুরচিত প্রবন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যায় পারদর্শী ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার সিলভ্যাঁ লেভি। লেভি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে সকলের মনেই ভারতের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। এক সময়ে টংকিং উপসাগর পর্য্যন্ত বহির্ভারতে, চীনরাজ্যের অংশ বিশেষে তুরস্কে, তাতারে ও তিব্বতে যে ভারতের প্রভুত্ব ও গৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে সকল কথা মনোজ্ঞ ভাবে তিনি বলিয়াছিলেন।

বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে একটি সুন্দর অভিভাষণে সমিতির কার্য্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস না জানিলে ও ভারতসভ্যতার প্রকৃতি না বুঝিতে পারিলে যে, এদেশের উন্নতি হইতে পারে না, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ও দেশের অন্যান্য পণ্ডিতেরা যে ঐ সকল তথ্য নির্দ্ধারণে অনেক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন এ সকল কথা তিনি বলিয়াছেন। তবে দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে অধ্যাত্মবাদে যে ভারতের প্রাধান্য, গৌরব ও বিশিষ্টতা তাহাই তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। একালের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আইনষ্টিন এর (Einstein) সিদ্ধান্ত যে প্রাচীন বেদান্তের মায়াবাদকে সমর্থন করে, ইহা অতি দক্ষতার সহিত সকলকে লর্ড বাহাদুর বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত শাসনকর্ত্তার শেষ মন্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ অধ্যাত্মতত্ত্ববিচারেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং সেই চর্চ্চাতেই এদেশ বিশেষভাবে নিয়োজিত হউক। আর ইউরোপীয়েরা তাহাদের উপযোগীতার হিসাবে, প্রাকৃতিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে নিযুক্ত থাকুক ; এইরূপে ক্ষমতার বিচারে শ্রমবিভাগ হইলে উভয় দেশ নাকি উভয়কে উপকৃত করিতে পারিবে।

অধ্যাত্মতত্ত্বে ভারতের বিশিষ্টতা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভারতবর্ষ অপটু ছিল না, এবং এখনও ভারতের লোকেরা ঐ কার্য্যে অপটু নহে। প্রাচীন কালের মত একালেও অল্প জন কয়েক লোক তাহাদের প্রাণের আকর্ষণে অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোককে ইহলোকসাধনবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। জড়ের বিশ্লেষণে না লাগিলে আমরা নিজের উদ্যোগে, শরীরের জন্য অতি আবশ্যকীয় অভাব গুলিও দূর করিতে পারিব না। এই শরীর রূপ জড় পিঞ্জরটাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, ইউরোপে অধ্যাত্মতত্ত্ব পৌঁছাইবার আগেই আমাদের আত্মা সেই পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলাইবে।

* * *

মিনিষ্টারের বেতন।

বঙ্গে রাজকোষের টাকার অভাব পুরাইবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের কাছে "ক্রন্দোলন" করিতে হইল, নূতন নূতন টেক্স ও বাটা বসাইবার উদ্যোগ করিতে হইল; এত করিয়াও প্রজা পালনের কাজে টাকায় কুলান হইবে কিনা সন্দেহ। ব্যবস্থাপক সভায় যে সমিনিষ্টার সকল সদস্যেরাই এই সন্দেহের কথা বলিয়াছেন। তবুও সদস্যদের অত্যধিক ভোটে স্থির হইল যে মিনিষ্টারেরা পুরা ৬৪০০০ করিয়াই বাৰ্ষিক বৃত্তি বা ভৃতি পাইবেন নহিলে নাকি তাঁহাদের মান বাড়ে না। বুঝিলাম, যে দরিদ্রের পেটের দায়ের চেয়েও ধনী মিনিষ্টারদের মানের দায় বেশী। এই মিনিষ্টারেরা ও অন্য সদস্যেরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহারা আড়ির দলের নেতাদের অপেক্ষায় বিজ্ঞতায় বড় ও হিতৈষণাতে দড়। তবে নিন্দিতদলের নেতাদের অপেক্ষা যাঁহারা অধিকতর ধনী যাঁহারা অক্লেশেই বিনা টাকায় কাজ করিতে পারেন, তাঁহারা ৬৪,০০০ এর স্থলে একটু কমেসমেও মাথা পাতিবেন না কেন? যে সদস্যেরা টাকা পান না, তাঁহারা কি বিজ্ঞের মত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ভোট দিয়াছিলেন? সুখাদ্য "মানের" গোড়ায় যাহা দিতে হয় মিনিষ্টারদের মানের গোড়ায় কি তাহাই পড়িল না? যে টাকা গরিবকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে হয়, তাহারই উপর এত দুর্জ্জয় লোভ কেন?

অনেকে তর্ক তুলিয়াছিলেন যে মিনিষ্টারদের বেতন তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা কম হইলে তাঁহাদের মানের হানি ও কাজের অসুবিধা ঘটিবে। কিন্তু যে ইংলণ্ডের শাসন পদ্ধতি এখন এ দেশে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, সে দেশে ত এরূপ কেহ ভয় করেন না বরং সেখানে সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী লয়েড জর্জ মহোদয় অন্য বড় রাজ কর্ম্মচারী অপেক্ষা কমই বেতন পান—সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রধান সচিবের পদ যে সর্ব্বোচ্চ তাহা আর বলিতে হইবে না—কিন্তু নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে অন্য বড় রাজকর্ম্মচারীর বেতনের অনুপাতে তাঁহার বেতন কত কম—

প্রধান অমাত্য	৫০,০০০৲	বাৎসরিক	
লর্ড চান্সলর	১০০,০০০৲	"	
আয়র্লণ্ডের লর্ড চান্সলর	৬০,০০০৲	"	
এটর্নি জেনারেল	৭০,০০০৲	"	[তাহা ছাড়া ব্যবসায়ের ফি]

১৯১৫ সনের তালিকা হইতে পাউণ্ডে ১০৲ হিসাবে ধরা গেল।

বাঙ্গালার সঙ্গে অন্য কয়েকটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রীরা কি বেতন লয়েন, তাহাও তুলনায় দেখুন—

ইংলণ্ড	৫০,০০০৲	নিউজিলণ্ড	১৩,০০০৲
দক্ষিণ আফ্রিকা	২৫,০০০৲	জাপান	২১,৬০০৲
কেনাডা	২৪,৫০০৲	বাঙ্গলা	৬৪,০০০৲

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটরীর পদ স্থায়ী অণ্ডার সেক্রেটারী অপেক্ষা উচ্চে—কিন্তু বেতন পান কম—

পার্লামেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটরী		১৫,০০০৲
স্থায়ী অণ্ডার সেক্রেটরী	প্রায়	২০,০০০৲

আরও দেখান যাইতে পারে ইংলণ্ডে মণ্টেগু মহোদয়ের সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কাজ করিয়া আসিতেছেন—তাঁহাদের বাৎসরিক বেতন মাত্র ১৮০০০৲। ইংলণ্ডে কাজ করিয়াছেন লর্ড সিংহ, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্র নাথ বসু, সার শঙ্করন নায়ার প্রভৃতি—আমাদের মন্ত্রীরা কি ইঁহাদের অপেক্ষা বড় ?

গর্ভনরের কাউন্সিলের মেম্বরদের ও বেতন খুব বেশী। আমাদের মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য নিজেরা কম মাহিনায় কাজ করিয়া তাঁহাদের দেখান যে দেশের লোকে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আমাদের মন্ত্রীরা যদি নিজেদের বেলায় অল্প একটুখানি স্বার্থত্যাগ করিতেন তাহা হইলে দেশের কাছে তাঁহাদের মান আরও বাড়িত এবং কাউন্সিলের মেম্বরদেরও বেতন কমাইবার উদ্যোগ করিতে পারিতেন।

* * *

বাঙ্গালা বজেটের কয়েকটি খবর

১৯২১—২২

বাঙ্গালার মোট রাজস্ব	৯,৭১,৮২,০০০৲
বাঙ্গলার মোট খরচ	১১,৮০,১৩,০০০৲
আয় অপেক্ষা বেশী খরচ	২,০৮,৩১,০০০৲

পুলিশের খরচ	১,৯০,৮৫,০০০৲
শিক্ষার খরচ দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষার ও সকল বিভাগের কর্ম্মচারীর বেতন সমেত	১,২৬,০৭,০০০৲
স্বাস্থ্য বিভাগের খরচ	১৯,৪৬,০০০৲
চিকিৎসা বিভাগের খরচ	৫২,২৪,০০০৲
কৃষি বিভাগের খরচ	২১,৪১,০০০৲

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১,২৮,০০০৲
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (নয় মাসে)	১১,৪৪,০০০৲

নূতন স্বায়ত্ব শাসনের খরচের বহর।

১৯২১-২২	সমিনিষ্টার গভর্ণরের কাউন্সিল	৫,০২,০০০৲
১৯২০-২১	গভর্ণরের কাউন্সিল (মিনিষ্টার বাদে) রিফর্ম্মের আগেকার।	২,৬৮,০০০৲
	রিফর্ম্মের বেশী খরচ	২,৩৪,০০০৲

১৯২১-২২	সাধারণ শাসন বিভাগ (রিফর্ম্মের সময়)	৩৭,১৯,০০০৲
১৯২০-২১	ঐ (রিফর্ম্মের আগে)	২৭,৯২,০০০৲
	রিফর্ম্মের জন্য বেশী খরচ	৯,২৭,০০০৲

দেখা যাইতেছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির খরচ অপেক্ষা শাসনের জন্য পুলিস প্রভৃতির খরচ অনেক বেশী। আমরা "প্রাণ রাখিতে-ই হ'তেছি প্রাণান্ত।"

* * *

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এখন রোগশয্যায়। তিনি আধি-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুস্থশরীরে ও প্রফুল্লমনে দেশের সেবা করুন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা। বিপিন বাবু "বঙ্গবাণী"র হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায়। এখনকার শারীরিক অবস্থায় তাঁহার পক্ষে একটু কথা কহা পর্য্যন্ত সুসাধ্য নহে, তবুও তিনি এই পত্রিকার প্রতি প্রাণের টানে, কএকটি কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই কথা কএকটির প্রতি অক্ষরে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্থির-প্রাণতা ও ভগবৎ-ভক্তি প্রস্ফুটিত। কথা কএকটি এই :—

"রোগ-শয্যা হইতে।

সত্য ও অসত্য দুইই অপূর্ণ। এজন্য আমাদের মনের সত্যাসত্য নিয়ে সাধুরা খামখা বিরোধ করেন না। ভগবান যদি এযাত্রা বাঁচাইয়া তুলেন, তাহা হইলে এই কথাটা সার করিব। ১লা জানুয়ারি ১৯২২।

আমরা যাহা সত্য মনে করি তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য বটে ; কিন্তু আমাদের সত্যাসত্য শেষ কথা নহে। শেষ কথা ভগবানের প্রকট ঐতিহাসিক ঘটনার বিধান। সে বিধান আমাদের ক্ষুদ্র মতামত উপেক্ষা করিয়া, আপনার অনাদিনির্দ্দিষ্টপথে আপনাকে পূর্ণ করে। ২রা জানুয়ারি ১৯২২।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল"
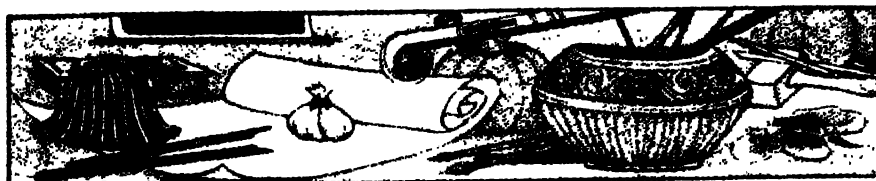
বঙ্গবাণী

C.Ray

ইংরাজ হাতে—শেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর সা।

চিত্র শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আবার তো'রা মানুষ হ।

১ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৮ [২য় সংখ্যা

বাংলার নবযুগের কথা

প্রথম কথা—বাংলার বৈশিষ্ট্য

(১)

বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত—বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলায় যে চিন্তা ও ভাবকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী—যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত—সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিস্পন্দ; ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছু দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙ্গালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীত্বের অভিমানে ফাঁপিয়া ওঠে, মারাঠা ও

পঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার নিজেকে সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কৈ? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে; এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

যাঁরা এভাবে ভারতের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাঁরা যেমন বাংলাকে চিনেন না, সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁরা এখনও য়ুরোপের ইতিহাসের মোহে পড়িয়া আছেন। য়ুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, ইঁহারা সেইভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই জয়যুক্ত হইতেছে। ইংরাজ কহেন ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, কিন্তু একটা মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পর্য্যায়ে আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংলণ্ড বা জর্ম্মানিকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা য়ুরোপকেই বসাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জর্ম্মানি আছে, রুষ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, গুজরাট আছে, পঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে, রাজপুতানা আছে, কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজ আছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, য়ুরোপে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, প্রকৃতি, এমন কি সমাজ-গঠন পর্য্যন্ত পরস্পর হইতে স্বল্পবিস্তর বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্ম্মের একটা ঐক্য আছে বটে; এরূপ ঐক্য য়ুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে য়ুরোপের সর্ব্বত্র একই খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রটেস্টেণ্ট, ক্যাথলিক গ্রীক চার্চ্চ বা রাসিয়ান চার্চ্চ এ সকলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মান্দ্রাজের স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব, এছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কম নহে— এ সকলের উল্লেখ করিয়া ইংরাজ কহেন, যাহাকে জাতি বা নেশন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসনশৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একখাতে ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রবাহকে চালাইয়া, ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম একটা জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন য়ুরোপের মত ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অজুহাতেই ইংরাজ এ পর্য্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্দ্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসনশৃঙ্খলকে সর্ব্বদাই নানাভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজ কহেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের দেশ যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ এক ভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপরে একই আচার-পদ্ধতি, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন ভারতে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেইদিন তোমাদের নেশনত্বের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে, সেদিন আমরা অম্লানবদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ ততদিন আমরা যদি তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া দেড়শত বৎসরে দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোনও প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

যাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া য়ুরোপের ছাঁচে ভারতের জাতীয়জীবন গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁরা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে য়ুরোপে যে আদর্শে আধুনিক জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের য়ুরোপবিদ্বেষ যতটাই প্রবল হউক না কেন, এই বিদ্বেষের ভিতব দিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা—'শত্রুভাবে' য়ুরোপকেই সাধন করিয়া য়ুরোপকেই পাইতেছেন। তাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্নটা সম্যক অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

(২)

কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে—যখন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য, ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোনও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া সেই সম্বন্ধের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই, ভারতের দেবতা **এক** নহেন **বহু**ও নহেন, কিন্তু **তিনি** সেই **একস্য** যাঁহার মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান ধর্ম্মের মতন ঠিক একটা ধর্ম্ম নহে; এ ধর্ম্মের কোনও এক অনন্যপন্থা, কোনও একটা সাধন, কোনও একটা মাত্র

প্রামাণ্য শাস্ত্র, কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের অবতার বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এ ধর্ম্মে বহু শাস্ত্র, সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত; বহু পন্থা, কিন্তু নদীসকল যেমন এক সাগরে যাইয়া পড়ে, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন পন্থা, যিনি "নৃণাম একো গন্তব্যঃ" তাঁহারই পদতলে গিয়া মিশিয়াছে। এ ধর্ম্মের বহু অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্যপ্রাধান্য রক্ষা করিয়া সেই একেরই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতারধারা সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এ ধর্ম্মে অসংখ্য গুরু, নিজ নিজ জীবনের প্রামাণ্য ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পথে মুমুক্ষু মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব একত্ব, এত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা, ব্যষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য এমনভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই না। আর সর্ব্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না; এই জন্য বারংবার মানুষ ধর্ম্মের এই কঠোর শাসনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব প্রকৃতির মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের শাসনে ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও, বৈষম্যের মধ্যেই সাম্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেমন ধর্ম্মে সেইরূপ সমাজে। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে আধুনিক মনুষ্যত্বের আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে অনেক কথা কহিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীনেরাও যে এই বর্ণাশ্রমকে ধর্ম্মের বা সমাজের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে জ্ঞানের পথ ও কর্ম্মের পথ—এই দুইটি প্রশস্ত পন্থা বিভাগ হইয়া, কেহ বা জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছেন। আর জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেন তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতেন। গীতাতে প্রথমে বর্ণাশ্রমের কর্ত্তব্যবিধান করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ইহাই শেষ কথা নহে; প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া গরু, হাতী, কুকুর, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই চক্ষে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের উপরেও কথা আছে; সে কথা

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

বর্ণাশ্রমাদি সকলপ্রকারের লোকধর্ম্ম উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ যে আমি, আমারই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে এই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগজনিত যে পাপ তাহা হইতে রক্ষা করিব।

সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কত ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, কত নূতন মতের প্রতিষ্ঠা, কত নূতন পন্থার প্রচার, কত নূতন সাধনের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে

সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া, একই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সমাজে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাহিরের বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়াও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। অথচ হিন্দুসমাজ বলিয়া যে বিরাট বস্তু তাহার অঙ্গহানি কেহ করে নাই, করিতে পারে নাই, কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ কাহাকেও একান্ত বর্জ্জন করে নাই, সকলকেই আপনার বিশাল অঙ্কে তাহাদের নিজ নিজ কোটে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রক্ষা করিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্ম্মে, সেইরূপ হিন্দুসমাজজীবনেও এই ভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া সমাজের সাধারণ একতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তখন রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনেও হিন্দুনীতিজ্ঞেরা এবং রাষ্ট্রপতিগণ এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজচক্রবর্ত্তীরা রোমান বা আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মত এক একটা বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই; কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলের অভিমতানুযায়ী তাঁহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়াধিকারীকে শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাকে আপনার সখা বা সামন্তরাজরূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র হিন্দুবৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্যের, স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির ও ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়া সমষ্টির ঘননিবিষ্টতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানেরা যখন এ দেশে আসিলেন তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতবাদের বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানসাধনার সার্ব্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে, •এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুরা অকুণ্ঠিতভাবে মুসলমানের দরগায় সিন্নি দিতেন এবং মুসলমানেরাও সরলভক্তিভরে হিন্দু দেবদেবীর নিকটে বলি আনিয়া দিতেন। মুসলমানযুগে এইরূপে হিন্দুমুসলমানের একটা সমন্বয়সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই, নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্ব্বজনীন সাধনে এবং মানবতার উদার ভূমিতে হিন্দুমুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়, এমনও বলা যায় না। আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাও এই আদর্শের অন্বেষণেই চলিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার, স্বাতন্ত্র্যের

সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমন্বয় সাধন হইতেছে। এই আদর্শের সন্ধান য়ুরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্যসাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই, আজ বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিতবস্তু, তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে চাহে।

(৩)

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনারও সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্ম্মে, বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলাতে, বাংলার সমাজজীবনে—সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে—অতিপুরাতন। যত দিন বাঙ্গালীর সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্ব্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টিসাধন করাই বর্ত্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্ত্তব্য। বাংলা পঞ্জাব বা মান্দ্রাজ, গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না, আর যাহার বিশ্বকে কিছু দেয় থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্নরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

(৪)

বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজই গড়িয়া তুলিয়াছে, ইংরাজের এ অভিমান ত আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এইরূপ একটা

সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেও যে এ সংস্কার নাই, এমন নহে। এসকল বাঙ্গালী সহসা প্রাচীনের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলার যে নূতন সাহিত্য ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে ইংরাজের অনুচিকীর্ষার ফল ভাবিয়া অত্যন্ত হেয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা কল্পনা করেন যে এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে। সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং এ বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন ?

কিন্তু বাংলা কি সত্যই ইংরাজী শিখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ? এই ইংরাজী-শিক্ষা ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা না হয় সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সে সাহিত্য ও সাধনা সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। অথচ, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য প্রদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সে ভাবে ত ফুটিয়া ওঠে নাই—এমনটা কেন হইল ? এ সমস্যার ত সমাধান করা চাই।

এই প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই আধুনিক বাংলার এই বিশেষত্ব কেবলই ইংরাজী শিক্ষার ফল নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতিঃ পড়িয়া সেই প্রাচীন প্রাণতাকে অভিনবভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, একথা মানিতেই হইবে, কিন্তু বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালীচরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই ; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তুটি—স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন কি সমাজের, কি ধর্ম্মের সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে ; প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্রবন্ধনকে সর্ব্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যেকালে পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দুসমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুসমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যবহারশাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, আমাদের দশশততম শকাব্দে ভট্টনারায়ণের বংশধর ব্যবহারবিদ্ ও স্মার্ত্তশিরোমণি জীমূতবাহন বাঙ্গালী হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দুসমাজেই প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন। মিতাক্ষরাতে ধনীর নিজের

ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগেতে ধনীকে তাঁহার মৃত্যুর পরে বা পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পর্কিত বা অসম্পর্কিত যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে। এ বিষয়ে কোনও প্রকারের বাঁধাবাঁধি নাই। জীমূতবাহন-ই যে ইহা নিজে সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না। সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতেছিল, তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূতবাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন দায়তত্ত্ব প্রচার করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগই কোনও কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া তোলেন। মিতাক্ষরা অনুসারে সম্পত্তি সমগ্র পরিবারেতে সমষ্টি-ভাবে আবদ্ধ থাকে ; পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দুর এ অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার হিন্দুসমাজে অর্থব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতাক্ষরার অধীন হিন্দুসমাজে হয় নাই। মেইন সাহেব কহেন যে বাংলা অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যপ্রধান দেশ ছিল বলিয়াই মিতাক্ষরার বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহার সহ্য হয় নাই। জীমূতবাহন কহিয়াছেন যে শত শাস্ত্রবচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার সনাতন স্বাধীনতাপ্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমানসভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক, কবীর প্রভৃতি যে সাধন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হিন্দুসাধনার অন্তর্গত হইলেও ঠিক সে সাধনার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে নাই। শিখেরা ত সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐ যুগেই মহাপ্রভু বাংলা দেশে যে যুগধর্ম্মের প্রচার করেন তাহাতে হিন্দু সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এক নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সে যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে বাঙ্গালী ধর্ম্মসাধনে, সিদ্ধান্তে, মতবাদে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় না। সাধক এবং সিদ্ধ পুরুষেরা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল সাধনের লোকেরা সমাজের মধ্যে থাকিয়াই আপনাদের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মজীবনে প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা আচার বিচারের বন্ধন মানিয়া চলেন নাই। সমাজও ইঁহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে। কুলগুরুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনের কথা আর কোথাও শুনি নাই। "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার" ইহার অনুরূপ কথা অন্যত্র নাই। আপাততঃ কথাটা কেমন কেমন শোনায় বটে—অনেকে ইহাকে মিথ্যাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বশ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা রহিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। বামাচারী তান্ত্রিকদিগের চক্রে কোনও

প্রকারের জাতিভেদ মানা হয় না। "প্রবর্ত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ"—ভৈরবী-চক্রে বসিলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের সমান হন; তখন চণ্ডালের মুখের অন্ন ব্রাহ্মণে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরী ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়ে ও সাধনমণ্ডলীতে জাতি বর্ণের বিচার হয় নাই। ইহা বাংলার বিশেষত্ব। এ সকলের দ্বারা স্বাধীনতা-স্পৃহা বাংলার প্রকৃতির ভিতরে কতটা যে বলবতী, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় দক্ষিণের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত সমগ্র হিন্দুসমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদ্‌গুরু আছেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান ব্যতীত "জগদ্‌গুরু" বলিয়া কোনও মানুষ বা মোহন্ত নাই। বাংলায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছেন, কিন্তু মান্দ্রাজ বা দাক্ষিণাত্যের মত সেরূপ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব নাই। বাংলায় চণ্ডালেরা মান্দ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের "পারিয়া"দিগের মত একান্তভাবে কখনও "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচিত হন নাই। "পারিয়ারা" হিন্দুর দেবমন্দিরের ছায়ার নিকটেও যাইতে পারেন না—মন্দিরসংলগ্ন জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী পথে বিচরণ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডালেরা পূজার সময় দেবতার ভোগ-আরতিকালে ঢোল বাজাইয়া থাকেন। মান্দ্রাজে "দৃষ্টিদোষ" মানা হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের খাদ্যের উপরে অব্রাহ্মণের চক্ষু পড়িলে তাহা অশুচি হইয়া যায়; বাংলায় "দৃষ্টিদোষ" বলিয়া কোনও দোষ নাই। এইরূপ কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্ম্মসাধনে বাংলার সাধনার মধ্যে বৌদ্ধযুগ হইতেই একটা অপূর্ব্ব স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়া আছে। ইহাই বাংলার প্রধান বিশেষত্ব।

বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেববাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সরস্বতী ইঁহাদের কাহারও বা দশ, কাহারও বা চারি হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ সকল যে অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি ইহা আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই হাতগুলি বাদ দিলে ইঁহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুর্গা ও সরস্বতীর মুখে, অণুতে অণুতে আমরা যে মাতৃ-অঙ্কে লালিত পালিত সেই সার্ব্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব, যেন ফাটিয়া পড়ে। দক্ষিণের হিন্দুরা হনুমানের ও গণপতির পূজা করেন। পশ্চিমেও মহাবীরের আরাধনা বহুলোকপ্রচলিত। কিন্তু বাংলার মূর্ত্তিপূজাতে কেবল মাত্র দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে গণেশের মূর্ত্তি থাকে। জনসাধারণের উপাস্যরূপে আর কোথাও গণপতির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত নহে, কেবল বাংলার বণিকসম্প্রদায় সিদ্ধিদাতারূপে গণেশের ছবি আপনাদের খাতার শিরোদেশে অঙ্কিত ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি ব্যবসায়স্থানের দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া থাকেন। এছাড়া বাংলার মূর্ত্তিপূজায় বা প্রচলিত দেবোপাসনায় অতিপ্রাকৃতের বা অতি-মানবতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

তারপর বাংলার অবতার-বাদ। অবতার-বাদকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গোড়ায় অতিপ্রাকৃতের ও অতিমানবতার প্রভাব স্বল্পবিস্তর ক্ষীণ হইয়া মানুষের আরাধ্য দেবতাকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম্মেও অবতারবাদের আশ্রয়ে পরমদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবত্বের ভূমিতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে এবং দাক্ষিণাত্যে এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনাধর্ম্মকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাংলায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে এই অবতারবাদ যে অদ্ভুত বিকাশলাভ করিয়াছে সেরূপ আর ভারতের অন্য কোথাও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এসকল কৃষ্ণোপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে নহে, কিন্তু "অবতারী"-রূপে—অর্থাৎ যাঁহা হইতে সকল অবতারপ্রবাহ প্রকাশিত হয় সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানরূপে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তিনি স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্ জীবগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন যে, যদুসম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহি, তিনি এই যদুসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদুসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি

—বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কদাপি অন্যত্র গমন করেন না। এই বৃন্দাবন তাঁহার চিদানন্দময় নিত্যধাম। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ বা ষড়ভূজ নহেন—তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভূজ। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলার বৈষ্ণবমহাজনেরা স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণমানবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবান নিরাকার নহেন, জড়াকারও নহেন, কিন্তু চিদাকার। তিনি বিদেহী নহেন, অপচয়-উপচয়-শীল জড়দেহধারীও নহেন, কিন্তু চিদ্দেহধারী, নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। তিনি অতীন্দ্রিয় বটেন অর্থাৎ প্রাকৃত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাই বলিয়া তিনি নিরীন্দ্রিয় নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়সম্পন্ন। তিনি নিঃসঙ্গ নহেন, কিন্তু তাঁহার নিত্যলীলা পরিজন ও পরিবার সঙ্গে নিত্যকালবিরাজিত। এইরূপে বাংলার বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণমানবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণ মনুষ্যত্বের ভূমিতে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক নিত্যমাধুর্য্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনন্তভাবে কত লীলা করিতেছেন ; কিন্তু

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।

এমন কথা ভারতের অন্যত্র কেন, জগতের আর কোথাও কেহ কহিয়াছেন বলিয়া জানিনা। এই সিদ্ধান্ত ও সাধনার বলেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষকে ডাকিয়া কহিয়াছেন,—

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কবি ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।"

(৫)

অতি সঙ্ক্ষেপে এবং সামান্যভাবেও বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও এই মানবতার আদর্শ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আছিল বলিয়াই, ইংরাজ যখন য়ুরোপের এই নূতন যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবতার সংবাদ লইয়া আমাদের নিকটে আসিল, আমাদের সেই লুপ্তস্মৃতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলায় যেভাবে ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যত্র যে সেভাবে হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাংলার পুরাগত সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নূতন হইলেও এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না বলিয়াই প্রাক্তনজন্য বিদ্যার মত ইহা আমাদের মধ্যে এমন অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই গোড়ার কথাটা না জানিলে ও ভাল করিয়া ধরিতে না পারিলে বাংলার নবযুগের কথা বলাও বৃথা শোনাও নিষ্ফল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বাস্তু

(চিত্র)

গলায় লাল গলাবন্ধ বাঁধিয়া রক্তবর্ণ গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্থূল যষ্টি হস্তে শ্রীযুক্ত কেনারাম মিত্র মহাশয় নিয়মিত উষাভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার চিরসাথী বন্ধুবর গোবর্দ্ধন চৌধুরী।

বাঙ্গালীপাড়ার সদর রাস্তার মোড় ফিরিতেই গঙ্গাস্নানার্থী পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভক্তিবিহ্বল কেনারাম ভূমিষ্ঠ হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সংকীর্ত্তন ও ভাগবতপাঠ বেশ সুশৃঙ্খলে চল্‌চে ত পণ্ডিত মশাই? আর ছেলেদের 'হিতসাধিনী' সভা? রঘুনাথগঞ্জের প্রকৃত উপকার আপনারাই কর্‌চেন। আপনারাই ধন্য!"

ভক্ত ব্রাহ্মণ সরল ভক্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন "সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা; আমরা অতি তুচ্ছ উপলক্ষ মাত্র।" হাসিয়া কেনারাম বলিলেন,—"ভগবান আর কে? আপনারাই ভগবান। ভক্তই ভগবান।" লজ্জিত পণ্ডিত মহাশয় "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আপনার গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন।

কেনারাম আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বারোয়ারির প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু দ্রুতপদে ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। দেখিয়া কেনারাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আরে গোপালবাবু যে! এত সকালে ব্যস্ত হ'য়ে চ'লেছেন কোথা?" গোপাল বাবু বলিলেন, "জঙ্গীপুরে একটা ভাল যাত্রার দল এসেছে, এবারকার বারোয়ারির জন্য তাদের বায়না ক'র্‌তে যাচ্চি। এবারে মহাজনদের ব'লে ক'য়ে রাজি করিয়েছি, কিছু বেশী চাঁদা পাওয়া যাবে। বারোয়ারিটা এবার একটু ধুমধাম ক'রে কর্ত্তে হবে। কি বলেন?" কেনারাম উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "এই ত চাই। আপনারা আছেন ব'লেই মার শ্রীচরণ বৎসরান্তে একবার দেখ্‌তে পাই। তা বেশ বেশ। তা মহাজনরা কে কি রকম দেবে ব'লেচে বলুন ত।"

গোপালবাবু বলিলেন, "সকলেই অন্যান্য বৎসরের চেয়ে কিছু কিছু বেশী দেবে বলেচে। তবে বড়দের মধ্যে হরসুখমল ১০০৲, লছমন দাস ৭৫৲, গোবর্দ্ধন দাস ৫০৲, বুলাকিলাল ৫০৲, চাটুর্য্যে কোম্পানি ৫০৲, গুরুদয়াল সা ৫০৲, রীতু তেওয়ারি ৫০৲ আর ঝড়িলাল ৫০৲। হরসুখ-মল ভরসা দিয়েচেন যে কাল একটা সভা ক'রে বাজারের কে কি দেবে সব ঠিকঠাক ক'রে

দেবেন। বাজার থেকে এবার অন্ততঃ ১৫০০৲ আদায় হবে; আরও এদিক ওদিক থেকে শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে। তা হ'লেই বেশ চ'লে যাবে—কি বলেন?"

"ওঃ বিলক্ষণ! তা হ'লে বায়নাটা ক'রে আসুন। দুরাত্রি যাত্রা হোক আর একরাত্রি থিয়েটার। এবার পূজোটা তাহ'লে বেশ আনন্দেই কাটানো যাবে! তাহ'লে যান আর দেরী ক'রবেন না! গাড়ীর সময় হ'য়ে এলো।" গোপালবাবু চলিয়া গেলেন। কেনারাম হাসিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন "কি বল বাবু সাহেব? তা'হলে পূজোটা এবার কাটাচ্চো ভাল।" গোবর্দ্ধন হাসিয়া কহিলেন "না আঁচালে বিশ্বাস নেই!" তারপর উভয় বন্ধুতে বারোয়ারি সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করিলেন। ফিরিবার সময় কেনারাম বলিলেন "চল বাবুসাহেব একবার থানাটা ঘুরে যাওয়া যাক্।" গোবর্দ্ধন বলিলেন, "সকাল বেলা থানায় কেন?" হাস্য করিয়া কেনারাম বলিলেন, "চলই না!—আছে একটু কাজ!" দুই বন্ধুতে থানার দিকে অগ্রসর হইলেন। থানার প্রবলপ্রতাপান্বিত দারোগা শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় নিয়োগী তখন বারান্দায় টেবিলের সম্মুখে বসিয়া "উপবাস ভঙ্গের" আয়োজন করিতেছিলেন।

বন্ধুদ্বয়কে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "আসুন আসুন! সুপ্রভাত!" উভয়ে উপবেশন করিলে দারোগা বাবু বলিলেন "একটু চা ইচ্ছে করুন!" "তা মন্দ কি? কি বল বাবুসাহেব?" গোবর্দ্ধন দন্তরাজি বিকশিত করিয়া সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বন্ধুবরকে সমর্থন করিলেন।

দারোগাবাবু দুইটী পাত্র পূর্ণ করিয়া উভয়ের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া চক্ষু টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু Prejudice আছে নাকি?" হাসিয়া কেনারাম বলিলেন "কিছু না—কিছু না 'পরান্নং দুর্লভং মন্যে'—কি বল বাবুসাহেব?" গোবর্দ্ধন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "তা বই কি! এতে আবার দোষ কি? 'আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জো সদা ভবেৎ।' মিয়াজান খানসামা আসিয়া তিন জনের সম্মুখে ডিম সিদ্ধ, মাখন, রুটি এবং গরম গরম কাটলেট স্থাপন করিল। পরমানন্দে পান ভোজন চলিতে লাগিল।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে একটি দীর্ঘ চুরুট মুখে দিয়া দারোগা বলিলেন "তারপর, কি মনে ক'রে কেনারাম বাবু?"

কেনারাম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বাজারের খবর কিছু রা'খচেন দারোগা বাবু? এদিকে যে মহা গোলযোগ!"

বিস্মিত দারোগা বলিলেন "কি রকম বলুন ত!"

কেনারাম বলিলেন, "স্কুলের যে নূতন পণ্ডিতমশাইটী এসেছেন তাঁর কিছু খবর রাখেন? পণ্ডিতটী যে একটী আসল "স্বদেশী"। ছেলেগুলির একেবারে মুণ্ডভক্ষণের যোগাড়ে আছেন যে—।"

"কোন্ পণ্ডিত ? গোস্বামী মশাই ? তাঁকে ত নিরীহ ভাল মানুষ ব'লেই জানি। দিনরাত পূজা, আহ্নিক, ভজন, কীর্ত্তন নিয়েই আছেন ব'লেই ত শুনতে পাই।"

"বাইরে তাই বটে। তবে একটু তলিয়ে দেখ্‌লে ব্যাপার বড় গুরুতর। সভায় যে রকম ভাবে গীতা ও চণ্ডীর ব্যাখ্যা বল্‌চে—কি বল বাপুসাহেব ?"

গোবর্দ্ধন ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আরে বাস্‌রে! ভয়ানক লোক! আণ্ডামানেও ওঁর জুড়ি মেলা ভার!" অপ্রসন্ন ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দারোগা বলিলেন "বটে ?"

গম্ভীর হইয়া কেনারাম বলিলেন "এক কাজ করুন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট ক'রে দিন। একজন C. I. D. Officer এসে ভাল ক'রে খোঁজ করুক। নইলে শেষটা আপনার একটা বদনাম হয়ে যেতে পারে। কি বল বাবুসাহেব ?"

গোবর্দ্ধন বলিলেন, "নিশ্চয়! এর এইবেলা প্রতীকার না কর্‌লে শেষে বড় ভয়ানক ব্যাপার হ'য়ে উঠবে।" দারোগা ভাবিতে লাগিলেন। কেনারাম বলিলেন—"সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব হবে না। আপনি লিখে দিন—আর বিলম্ব করবেন না।"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া দারোগা বলিলেন "Many thanks; আমি আজই লিখে দিচ্চি।"

দারোগার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বন্ধুদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন। দারোগা কেনারামকে চিনিতেন। রিপোর্ট করিতে বিলম্ব করিলে কেনারাম বেনামি পত্রের জোরে যে তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে ত্রুটী করিবেন না,—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি তখনই অপ্রসন্ন চিত্তে রিপোর্ট লিখিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

থানা হইতে বাহির হইয়া কেনারাম বলিলেন, "আর ত সহ্য হয় না। সংকীর্ত্তনের উৎপাতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ঘুমুবার যো নেই! এ বেটাকে বিদায় করতে না পারলে আর কল্যাণ নেই। আর দিনকতক চল্‌লে ছেলেগুলোকে পর্য্যন্ত মাটী করবে।"

গোবর্দ্ধন বন্ধুবরকে সমর্থন করিয়া বলিলেন "বাস্তবিক বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে। সংকীর্ত্তন, কথকতা এসব দুচার দিন হ'ল ব্যাস্। মাসাবধি ধরে এই উপদ্রব! আবার শুনচি সমস্ত কার্ত্তিক মাস এই ভাবেই চলবে!

কেনারাম হাসিয়া বলিলেন "আর বেশীদিন চালাতে হবে না। আজ যে ব্যবস্থা ক'রে আসা গেল, আর দিন পনেরোর মধ্যেই পণ্ডিতের লীলাখেলা সব শেষ হ'য়ে যাবে! এখন চল একবার বাজারটা ঘুরে যাওয়া যাক।" "বাজারে আবার কেন ?" "একবার বারোয়ারির ব্যাপারটা দেখবে না ?" বন্ধুদ্বয় বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

২

বাজারের প্রধান ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরসুখমল মারোয়াড়ি সবেমাত্র দোকান খুলিয়া চাকরকে দিয়া গঙ্গাজল ও ধুনা দেওয়াইতেছিলেন, সহসা অসময়ে বন্ধুযুগলকে আসিতে দেখিয়া হাসিয়া

তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন " আরে আসুন আসুন ! এত সকালে কি মনে করে ? চাঁদার জন্য নাকি ?" কেনারাম হাসিয়া বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ। এক রকম চাঁদার কথাই বটে, তবে আমরা চাঁদা নিতে আসিনি।"

হরসুখ জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার নাকি পূজায় খুব ধূমধাম হচ্চে ? গোপাল বাবু ধ'রেচেন এবার যাত্রা দিতে হবে। তা আমি ব'লে দিয়েচি যে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা বাজার থেকে ১৫০০৲ টাকা তুলে দেবো।"

কেনারাম বলিলেন "আপনাদের খুবই অনুগ্রহ। তবে আপনারাই সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেন, আপনাদেরও এ সব বিষয়ে একটু দেখা শোনা দরকার।" গোবর্দ্ধন বলিলেন " আপনারা বড় লোক, আপনাদের ২০০।১০০ তে কিছু আসে যায় না—কিন্তু আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। টাকাটা নয় ছয় হ'য়ে নষ্ট হয়ে যায়, এটা বড়ই দুঃখের কথা।" বিস্মিত হরসুখ বলিলেন "সে কি কথা ? গোপালবাবু হিসিবি লোক,—এই কথাই ত সকলের মুখে শুনতে পাই।" কেনারাম চক্ষু টিপিয়া একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন " হিসিবি, সন্দেহ কি ? কি বল বাবুমশাই ? " গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন "গোপালবাবুর নতুন বৈঠকখানা উঠ্‌চে দেখেচেন ?" হরসুখ বলিলেন, "সেত তাঁর শ্বশুরের টাকায়। গোপাল বাবুর শ্বশুর মারা যাবার সময় মেয়েকে দশহাজার টাকা দিয়ে গেছেন—সেদিন প্রমথবাবুর মুখে এই কথাই ত শুনলুম।" একটু চতুর হাস্য করিয়া কেনারাম বলিলেন "শ্বশুরই বটে। তবে সে শ্বশুর একজন নয়!" গোবর্দ্ধন উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "আমাদের এক একটা ওই রকম শ্বশুর থাকৃত—ত—কি বলেন বাবুমশাই ?

বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্ত্তায় হরসুখের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হইল। হরসুখ বলিলেন "তবে আপনারাই টাকাকড়ির ভার নেন না কেন ?"

গোবর্দ্ধন বলিলেন "তা হ'লে কি আর রক্ষে থাকৃবে মশাই ! চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে যে ! কারো বৈঠকখানা হ'চ্চে, কারো পরিবারের গহনা হ'চ্চে, কারো জামাইয়ের তত্ত্ব হ'চ্চে—ও ভীমরুলের চাকে হাত দিলে কি আর রক্ষে আছে মশাই !"

কেনারাম গম্ভীর হইয়া বলিলেন "শুধু কি তাই। বাবুদের যে রকম কাণ্ড তাতে ভদ্রলোকের ওতে থাকা পোষায় না। যারি খাবেন তারই অপমান করবেন—এগুলো আমাদের সহ্য হয় না।"

গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি বলিলেন " আর সে কথা বলবেন না মশাই। সাহেবরা বারোয়ারিতে প্রায় শতাবধি টাকা দেয়। তাই বল্‌লুম যে সাহেবদের আমোদের জন্য দুটো খেমটাওয়ালী আনাও আর এক ডজন whiskyর বন্দোবস্ত কর—তা বাবুরা চটেই লাল ! বল্‌লেন পূজোর জায়গায় ওসব বেলেল্লাগিরি চলবে না ! এতে কি আর মশাই ওর মধ্যে থাকতে ইচ্ছা হয় ?"

কেনারাম বলিলেন " আহা সাহেবদের বেলায় না হয় বেলেল্লাগিরি হ'ল, কিন্তু মারোয়াড়ি ভদ্রলোকদের বেলায় ? তাঁরা ত আর বেলেল্লাগিরি করেন না।" গোবর্দ্ধন বলিলেন "সে কথা

আর বলবেন না। বড় বড় মারোয়াড়ি বাবুদের ছেলেদের উঠিয়ে দিয়ে—তাদের জায়গায় কিনা—হরি টিকিট কালেক্টার, যাদব সিগন্যালার, মন্মথ টালিক্লার্ক—এদের আত্মীয়দের জায়গা ক'রে দেওয়া হ'ল!—যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই!"

কেনারাম বলিলেন "শুধু তাই? তার উপর গালাগালগুলো!"—গোবর্দ্ধন বলিলেন "সে কথা আর বলবেন না, শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।"

হরসুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "গালাগালটা কি রকম গোবর্দ্ধন বাবু?"

"আর বোলবেন না মশাই। মারোয়াড়ি আর হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকদের বাবুরা যা মুখে আসে তাই বলেন! তারা যেন টাকা দিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েচে! আরে ছি! ছি! দেখে শুনে আমরা ও সংস্রবই একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।"

উত্তেজিত হরসুখ বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা। এবার বাজার থেকে একটি পয়সা চাঁদা কি ক'রে আদায় হয় দেখে নেবো। হোক—যাত্রা!"

হরসুখকে অভিবাদন করিয়া বন্ধুদ্বয় উঠিয়া পড়িলেন। কিছুদূর আসিয়া কেনারাম উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "তা হ'লে মতি রায়ের যাত্রা এবার শুন্‌চো বাবুসাহেব?" হাসিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন "মোতি এবার ঝুটো হ'য়ে পড়লেন!"

৩

রায় মহাশয়ের বাহিরের ঘরে বারোয়ারির পাণ্ডাগণের সভা বসিয়াছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। পূজার আর দিন নাই, যাত্রার দল বায়না করা হইয়াছে অথচ অর্থের একান্ত অভাব। বাজারের মহাজনেরা এক পয়সা চাঁদা দিতেও অস্বীকৃত হইয়াছে। এখন উপায়? গোপালবাবু হিসাব পত্র তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "যাত্রার বায়না ছাড়িয়া দিয়া যাত্রা বন্ধ করিলেও যেমন করিয়া হ'ক এক হাজার টাকার প্রয়োজন। তাহার মধ্যে মোট পাঁচশত টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে। বাকি পাঁচশত কি করিয়া সংগ্রহ হইবে?" হরিবাবু বলিলেন "এ অবস্থায় আর উপায় কি? সব খরচ বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল মায়ের পূজাটি হোক্।" সরোজবাবু বলিলেন "সেটা ভাল হয় না। তাহ'লে বাজারে বড় বদনাম হ'য়ে যাবে। মহাজনেরা এক বছর চাঁদা না দিতেই পূজো বন্ধ হ'য়ে গেল এটা বড় লজ্জার কথা হবে।" প্রবীণ বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন "না না যেমন ক'রে হোক্ মানরক্ষা করা চাই। আমাদের সকলকে ডবল চাঁদা দিতে হবে।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ঠিক এই সময়ে সহসা বন্ধুসনাথ কেনারাম বাবু দ্বারপথে দর্শন দিলেন। "আসুন আসুন" বলিয়া রায় মহাশয় উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কেনারাম বলিলেন "আজ ব্যাপার কি রায়মশাই ? সকাল বেলাতেই এত লোক ! কিছু খাওয়া দাওয়া আছে নাকি ? যা হোক ঠিক সময়ে হাজির হ'য়ে প'ড়েছি। আমাদের ফাঁকি দেবার যোটি নেই। আমাদের মাথায় 'টনক নড়ে'—কি বল বাবুসাহেব ?" গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন "তা ঠিক।"

গোপালবাবুর দিকে চাহিয়া কেনারাম বলিলেন "তাহ'লে যাত্রা কদিন হ'চ্ছে গোপাল-বাবু ? দিন তিনেক না হ'লে সুবিধে হবে না। কি বলেন ?"

গোপালবাবু কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "যাত্রা আর হ'চ্চে কি ক'রে ? টাকা না হ'লে ত আর আমোদ হয় না !" বিস্মিত কেনারাম বলিলেন "সে কি ? সেদিন যে বল্‌লেন বাজার থেকেই দেড় হাজার টাকা চাঁদা উঠ্‌বে !"

সরোজবাবু বলিলেন "সে আর উঠ্‌লো কই মশাই। বাজার থেকে একটি পয়সাও আদায় হ'ল না।"

বিস্ময়ে অভিভূত কেনারাম বলিলেন "বলেন কি ? সব ঠিক ঠাক। বড় বড় মহাজনেরা কথা দিয়ে—শেষে এ রকমটা হ'ল কি ক'রে ?" সরোজবাবু বলিলেন "কি জানি মশাই কে মহাজনদের ব'লে দিয়েছে বারোয়ারি কমিটি টাকা চুরি করে—মহাজনদের গাল দেয়—ভদ্র-লোকদের অপমান করে।"

কেনারাম বলিলেন "অ্যাঁ ! বলেন কি ? এমন কুকর্ম্ম কে করলে ?" অন্তরাল হইতে কে একজন মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—"শ্রীশ্রীবাস্তু দেবতা এবং তদীয় বাহন শ্রীশ্রীঘুঘু!" সকলেই সকৌতুকে সেইদিকে চাহিলেন। কেনারাম ভুঁড়ি কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। গোবর্দ্ধন চেষ্টা করিয়াও তাহাতে ভাল করিয়া যোগ দিতে না পারিয়া আপনার সুপরিপুষ্ট উদরপ্রদেশে ঘন ঘন হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কেনারাম বলিলেন "যাক্ ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। এই দুর্ভিক্ষের দিনে আর যাত্রা টাত্রার দরকার নেই। এবার উত্তম করে কাঙ্গালীভোজনটী করান। চিড়ে মুড়কি নয়, এবার বেশ ক'রে ডাল, ভাত, তরকারি, দই, মিস্টান্ন এবং চারখানা ক'রে লুচি খাইয়ে দিন যে একটা কাজের মত কাজ হবে। মাও সন্তুষ্ট হ'বেন—লোকগুলোও একদিন পেট পুরে খেতে পাবে। এতে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করবো।"

কথাটা সকলেরই মনে লাগিল। থিয়েটারের এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কেনারাম বিনীতভাবে বলিলেন "কাঙ্গালী সংগ্রহের ভার রইল আমাদের উপর। আপনারা এক হাজার লোকের আয়োজন করে রাখবেন—ব্যাস্।"

নানা কথাবার্ত্তার পর সভা ভঙ্গ হইল।

একটু নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া কেনারাম বন্ধুবরকে বলিলেন, "তাহ'লে মহাষ্টমীর দিন কাঙ্গালীভোজন দেখতে আস্‌চ ত বাবুসাহেব ?" হাসিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন "এর ভিতরও কিছু আছে নাকি ?" মৃদু হাসিয়া কেনারাম বলিলেন "Watch the date !"

আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া বন্ধুদ্বয় দেখিলেন, স্কুলের সমস্ত ছাত্র দল বাঁধিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিতেছে। কেনারাম একজন ছাত্রকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে ব্যাপার কি ? কোথায় চ'লেছিস্ ?"

সে বলিল, "পণ্ডিতমশাই চ'লে যাচ্চেন তাই তাঁকে বিদায় দিতে যাচ্চি।"

"বলিস্ কিরে ? পণ্ডিতমশাই কোথায় যাচ্চেন ?" "একেবারে এখান থেকে চ'লে যাচ্চেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিয়েছেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলা ছেড়ে চ'লে যেতে।" "অ্যাঁ বলিস্ কি ? কি সর্ব্বনাশ !"

ছেলেরা চলিয়া গেল। কেনারাম বলিলেন, "চল বাবুসাহেব, পণ্ডিতমশায়কে বিদায়টা দিয়ে আসা যাক।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন "গোড়া কেটে আর আগায় জল কেন ?" কেনারাম বলিল "চল চল গাড়ীর সময় হ'য়ে এল।"

শুভ্র পট্টবস্ত্রপরিহিত প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সেই লোকারণ্য মধ্যে প্রদীপ্ত হোমাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। বালকেরা একে একে অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি লইতেছিল এবং তিনি প্রত্যেককে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। বালকদের বন্দনা সমাপ্ত হইলে কেনারাম অগ্রসর হইয়া করজোড়ে বলিলেন, "আমাদের একেবারে ছেড়ে চল্‌লেন পণ্ডিত-মশাই ?" পণ্ডিত বলিলেন "কি করি বলুন ? রাজার হুকুম।"

"আপনার মত মহাপুরুষের সঙ্গে কে এ রকম শত্রুতা করলে পণ্ডিতমশাই ?" "শত্রুতা ! শত্রু কে কার ? সবই ভগবানের ইচ্ছা।"

কেনারাম অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

ব্রাহ্মণের পুণ্যপ্রদীপ্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া গোবর্দ্ধনের কেমন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। সে আর সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস না করিয়া আলোকভীত পেচকের মত লোকারণ্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

বালকদের অস্ফুট আর্ত্তনাদের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গোবর্দ্ধন শুষ্কমুখে বলিল "কিন্তু কাজটা ভাল হ'ল না বাবুসাহেব। ব্রাহ্মণ লোকটা ভাল ছিল।"

কেনারাম হাসিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণ ত ভাল ছিল। কিন্তু সংকীর্ত্তনের চোটে যে কাণে

তালা ধ'রে যাবার যোগাড় হ'য়েছিল। যা হোক আচ্ছা চিঠিখানা লিখে C. I. D.র কাছে পাঠানো গিয়েছিল। একেবারে "পপাত চ মমার চ!"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল "মাথা বটে বাবা! পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয়।"

কেনারাম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "যা হোক আপাততঃ একটা কাজ ফতে করা গেল।"

৪

মহাষ্টমীর পর্ব্বদিন। অপরাহ্ণ হইয়া আসিতেছিল। স্তূপাকার অন্নব্যঞ্জন রৌদ্রতাপে শুকাইতেছিল। এখনও পর্য্যন্ত একজন কাঙ্গালীরও দেখা নাই!

গোপালবাবু, সরোজবাবু, শ্যামবাবু প্রভৃতি ব্যস্ত হইয়া ঘন ঘন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। অবশেষে আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া গোপালবাবু বলিলেন "এবারে ব্যাপার কি বলুন ত সরোজবাবু? অন্যান্য বারে বেলা ১০টা থেকে কাঙ্গালী আস্‌তে আরম্ভ করে, এবার এখন পর্য্যন্ত কার'ও দেখা নেই।"

সরোজবাবু বলিলেন "তাই ত! ভাল ক'রে খবর দেওয়া হ'য়েছিল ত?" "কি জানি মশাই, এবারে কেনারামবাবু আপনা হ'তে খবর দেবার ভার নিয়েছিলেন।" শ্যামবাবু বলিলেন "কেনারাম বাবু! তবেই হ'য়েচে! চলুন চলুন তাঁর একবার সন্ধান করা যাক্।"

গোপালবাবু বলিলেন "তাঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

শ্যামবাবু হাসিয়া বলিলেন "সে জন্য চিন্তা নেই। এসময়ে চাটুয্যে মশাইয়ের দরজায় তাঁর Evening duty; সে স্থান ছেড়ে এখন তাঁর কোথাও এক পা নড়বার যো নেই!" শ্রীযুক্ত দাশরথি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৃতীয় পক্ষে একটী সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিবার অল্পদিন পরেই দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে কেনারাম বাবু প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কেনারামবাবুর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা অভ্যাস ছিল। সুতরাং তিনি দয়া করিয়া এই বিপন্ন পরিবারের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইতে বধূঠাকুরাণীর প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে "ফিট" হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এ "ফিট" কেনারাম বাবু ভিন্ন আর কেহ ভাঙ্গাইতে পারিত না। সুতরাং এ সময়টা তাঁহাকে নিয়মিতভাবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহেই অবস্থান করিতে হইত।

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। শ্যামবাবু ও গোপাল বাবু ব্যস্তভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেনারাম বাবু কোথায় চাটুয্যে

মশাই ?” চট্টোপাধ্যায় বলিলেন “তিনি আজ বিশেষ প্রয়োজনে বেলা ১০টার গাড়ীতে কোথায় গেছেন, রাত্রি ৮টার আগে ফির্‌তে পার্‌বেন না ব’লে গেছেন।” শ্যামবাবু বলিলেন “এখন বুঝলেন ব্যাপার খানা গোপালবাবু!” গোপালবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন “এত বড় পাজি লোক ত কোথাও দেখিনি মশাই। গরীবদের পর্য্যন্ত তাদের মুখের অন্ন খেতে দিলে না!”

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন “কেন ? এবার যে শুন্‌লুম কাঙ্গালীভোজন মহাষ্টমীর দিন না হ’য়ে বিজয়াদশমীর দিন হবে।”

শ্যামবাবু বলিলেন “এইবার বুঝ্‌লেন ত! এখন চলুন জিনিষপত্রগুলোর কোন উপায় করা যাক্।”

তখন সকলে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া ভিখারী, মেথর, ডোম যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই ডাকিয়া অন্নব্যঞ্জনগুলির সদ্গতি করাইবার চেষ্টা করিলেন। তথাপি বিস্তর খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হইল। এজন্য সকলেই দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৮টার গাড়ীতে কেনারাম ষ্টেশনে পদার্পণ করিলেন। বন্ধুবর গোবর্দ্ধন তাঁহার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্ধুকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কেনারাম বলিলেন “কি বাবুমশাই ? কাঙ্গালীভোজন কেমন দেখলে ?”

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন, “তা বিলক্ষণ! গোপালবাবুদের ছুটাছুটি আর চেঁচামেচি যদি দেখ্‌তেন! কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলুন দেখি!”

হাসিয়া কেনারাম বলিলেন “ব্যাপার আর কি ? এবার এখানে মহাষ্টমীর দিন কাঙ্গালীভোজন না হ’য়ে বিজয়াদশমীর দিন হবে। আর মহাষ্টমীর দিন নূতনগঞ্জের বাবুদের বাড়ী খুব ধূমধামে কাঙ্গালীভোজন হবে। কাজেই সব কাঙ্গালী আজ নূতনগঞ্জে ছুটেচে!”

হাসিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন “আচ্ছা লোক যা হোক!” সেদিনকার ব্যাপার সম্বন্ধে সানন্দ আলোচনা করিতে করিতে দুই বন্ধু অগ্রসর হইলেন।

কেনারাম বলিলেন “একবার চাটুয্যেমশাইয়ের বাড়ীর খবরটা নিয়ে যাওয়া যাক্।”

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন “হাঁ আজকের ‘ফিটটা’ এখনো বাকি আছে বটে! আমি তা হ’লে এগুই!” সরকারী ডাক্তার রামবাবু এই সময়ে বারোয়ারিতলা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। কেনারামের সেদিনকার কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার অবিদিত ছিল না। পথিমধ্যে বন্ধুদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন “এটা কি রকম ভদ্রতা কেনারামবাবু ? গরীব দুঃখীদের তাদের মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত ক’রে তাদের সঙ্গে এই নিষ্ঠুর রসিকতা করাটা ?”

কেনারাম বাবু সহসা এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

রামবাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “আপনাদের মত লোকের মুখদর্শন করলেও

নরকস্থ হ'তে হয়। দেশে যে এত রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার—সে কেবল্ আপনাদের মত লোকের জন্য!—এত পাপ ধরিত্রী সহ্য করেন কি ক'রে!"

ইতিমধ্যে কেনারাম সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কুলোকে এই সব রটিয়েছে বুঝি? কাঙ্গালীরা অন্য জায়গায় লুচিমণ্ডা খাওয়ানর খবর পেয়ে এখানে যদি ডাল ভাত খেতে না আসে ত আমি কি কর্‌তে পারি বলুন?"

রামবাবু আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা না করিয়া "পাষণ্ড! নরাধম!" বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতবেগে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

রামবাবু চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আপনি এই সব কটু কথাগুলো চুপ ক'রে সহ্য কর্‌লেন? আমার এমন রাগ হ'য়েছিল—যে——"

কেনারাম হাসিয়া বলিলেন "ওঁরা হ'লেন মানী লোক। ওঁদের কি মানহানি কর্‌তে পারি? মাণিকপীর ব'লেচেন,—

"মানী লোকের রাখ্‌বা মান।
গরিব লোককে ক'র্‌বা দান"——

বুঝলে কিনা বাবুসাহেব?"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

তত্ত্ব-কথা

সৃষ্টি তখন টাট্‌কা কচি, জন্মেনিক মুনিঋষি,
দেবতাদের অল্প বয়স, আঠার বা উনিশ-ই।
লক্ষ্মী আছেন রান্নাঘরে, তৃপ্তি দিতে শ্রীনাথে,
সরস্বতী বাজাচ্ছিলেন প্রেমের দীপক বীণাতে;
বিষ্ণু হলেন ধ্যানে মগ্ন সন্দেহটির ভঞ্জনে,—
কিসে বেশী রসের মাত্রা,—গুঞ্জনে না ব্যঞ্জনে।

ঘন ঘন বাজ্‌ল বীণা পঞ্চবাণের অর্চ্চনে;
সম্বারটি প'ড়্‌ল ডালে, পাঁচফোড়নের তর্জ্জনে।
ছাপিয়ে ছন্দ রাঁধার গন্ধ বাতাসটুকু রসিল;
নাকের-ই ভিতর দিয়া মরমে সে পশিল।
সে দিন থেকে লক্ষ্মী হলেন সবার চেয়ে আদুরে;
গীতি-প্রীতির চেয়েও হ'ল নৈবিদ্যি স্বাদু রে।

ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে—

শিল্পের অধিকার

শিল্পলাভের পক্ষে আয়োজন কতটা দরকার, কেমন আয়োজনই বা দরকার, তার একটা আন্দাজ করে দেখা যাক। রোমের তুলনায় গ্রীস এতটুকু; শিল্পের দিক দিয়েও গ্রীস রোমের চেয়ে খুব যে বড়-করে আয়োজন করেছিল তাও নয়; শুধু গ্রীসের যতটুকু আয়োজন, সবটাই প্রায় শিল্পলাভের অনুকূল, আর রোমক শিল্পের জন্যে যে প্রকাণ্ড আয়োজনটা করা হয়েছিল তা অনেকটা আজ-কালের আমাদের আয়োজনের মতো—বিরাটভাবে শিল্পলাভের প্রতিকূল। গ্রীসরোমের কথা ছেড়ে দিই, আজকালের ইউরোপও কি আয়োজন করে বসেছে তাও দেখার দরকার নেই, আমাদের দেশেই যে এত বড় শিল্প এককালে ছিল, এখনো তার কিছু-কিছু চর্চ্চা অবশিষ্ট আছে, সেখানে কি আয়োজন নিয়ে কাজ চলছে দেখব। এ দেশে প্রায় সব তীর্থস্থানগুলোর লাগাও রকম-রকম কারিগরের এক-একটা পাড়া আছে। এই সহরের মধ্যেই এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়—কাঁসারিপাড়া, পোটোতলা, কুমরটুলি, বাক্সপটি ইত্যাদি। এই সব জায়গায় শিল্পী, কারিগর দুরকমেরই লোক আছে, যারা ওস্তাদ এক-এক বিষয়ে। ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছে, চেলারা যাচ্ছে সেখানে কাজ শিখতে—ঐসব পাড়ার ছোট-বড় নানা ছেলে! সেখানে ক্লাসরুম, টেবেল, চেয়ার, লাইব্রেরী, লেকচার হল কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা-পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে—পুরুষানুক্রমে আজ পর্য্যন্ত! ছোটবেলা থেকে ছেলেগুলো সেখানে দেখেছি কেউ পাথর, কেউ রংতুলি, কেউ বাটালি, কেউ হাতুড়ি—এমনি সব জিনিষ নিয়ে কেমন নিজের অজ্ঞাতসারে খেলতে-খেলতে artist, artisan কারিগর শিল্পী হয়ে উঠছে যেন মন্ত্র-বলে! খেলতে-খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক! পড়তে-পড়তে খাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে যেটা হয় সেটা নীরস জ্ঞান,—শুধু শিল্পের ইতিহাস, তত্ত্ব, প্রবন্ধ কিম্বা পোষ্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে এক-ভাবের শিল্পজ্ঞান একে লাভ করতে হলে নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার, লেকচারহল থেকে লেকচারের ম্যাজিক লণ্ঠনটি পর্য্যন্ত না হলে চলবেনা সেখানে। কিন্তু শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গিন চর্চ্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয়; রস, রসের স্ফূর্ত্তি—এসবের আয়োজন যে স্বতন্ত্র। 'অনন্যপরতন্ত্রা' শিল্প পাখীপড়ানর খাঁচা, কসলতের আখড়ার দিকেও তো সে এগোয় না; রসপরতন্ত্রতাই হলো তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র আয়োজন। শুধু এই নয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানুষ, মনও তাদের রকম-রকম, রসও বিচিত্র ধরণের, আয়োজনও হলো প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality যে আয়োজন করলে, আর-একজন সেই আয়োজনের অনুকরণে চল্লেই যে অনন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে ধরা দেবেন, তা নয়; তাঁর নিজের জন্যে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে। জাপানের শিল্প-আয়োজন আমাদের শিল্প-আয়োজন ইয়ুরোপের

শিল্প-আয়োজন সবগুলো দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে একরকম রস সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু সেটাতে শিল্পরসের আশা করাই ভুল। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্প-রসকে ধরবার যে আয়োজন করে নিলে সেইটেই হল ঠিক আয়োজন, তাতেই ঠিক জিনিষটি পাওয়া যায়; এছাড়া অনেকের জন্য একই প্রকারের বিরাট আয়োজন করে পাওয়া যায় সুকৌশলে প্রস্তুত করা সামগ্রী বা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালাই-করা কোনো-একটা আসল জিনিষের নকল মাত্র। Artistএর অন্তর্নিহিত অপরিমিত বা infinity, artistর স্বতন্ত্রতা individuality—এই সমস্তর নির্ম্মিতি নিয়ে যেটি এলো সেইটেই art, অন্যের নির্ম্মিতির ছাপ, এমন কি বিধাতারও নির্ম্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা বার হলো তা আসলের নকল বই আর তো কিছুই হলোনা। ভাল, মন্দ, অদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য্য এক রসের সৃষ্টি তো সেটি হলোনা। এইটুকুই যথার্থ পার্থক্য art-এ ও না-art-এ, কিন্তু এযে বড় ভয়ানক পার্থক্য—স্বর্গের সঙ্গে রসাতলের, আলোর সঙ্গে না-আলোর চেয়ে বেশি পার্থক্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য আছে, রসাতলের গাম্ভীর্য্য আছে, রহস্য আছে, আলোর তেজ, অন্ধকারের স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু art-এ না-art-এ তফাৎ হচ্ছে—একটায় সব রস সব প্রাণ রয়েছে, আর একটায় কিছুই নেই!

Artএর একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা--simplicity। অনাবশ্যক রং-তুলি, কলকারখানা, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি কাজল-লতা—এই আয়োজন করেই পূবের বড়-বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবির এর চেয়ে কমে চলে গেল—কাগজ আর কলম; কিম্বা তাও নয়—একতারা কি বাঁশী, অথবা তাও যাক্, শুধু গলার সুর। সহজকে ধরার সহজ ফাঁদ, এই ফাঁদ নিয়েই সবাই-তাঁরা চল্লেন—কেউ সোনারমৃগ, কেউ সোনার পদ্মের সন্ধানে। এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা—স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে; সাজ নেই, সরঞ্জাম নেই, সাথী-সহচর কেউ নেই! একা গিয়ে দাঁড়ালেম অপরিমিত রসসাগরের ধারে, মনের পাল সুবাতাসে ভরে উঠলো তো ঠিকানা পেয়ে গেলেম। রূপকথার সব রাজপুত্রের ইতিহাস যদি চর্চ্চা কর তো দেখবে—কেউ তাজি ঘোড়ায় চড়ে সন্ধানে বার হয়নি, এই যেমন-তেমন একটা ঘোড়া হলেই তারা খুসি! এও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার শিল্পের—এই যেমন-তেমনের উপরে সওয়ার হয়ে যেমনটি জগতে নেই, তাই গিয়ে আবিষ্কার করা! মাটির ঢেলা, পাথরের টুক্‌রো, সিঁদুর, কাজল—এরাই হয়ে উঠলো অসীম রস আর রহস্যের আধার!

রসের তৃষ্ণা, শিল্পের ইচ্ছা যার জাগ্‌বে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না;—যেমন করে হোক্ সে নিজের উপায় নিজেই করে নেবে; এ ছাড়া অন্য কথা নেই! একদিন কবীর দেখলেন একটা লোক নদী থেকে কেবলি জল আমদানি করছে—সহরের মধ্যে চামড়ার থলি ভরে-ভরে। সে লোকটার ভয় হয়েছে নদী কোন্ দিন শুকিয়ে যাবে!—মস্ত বড় এই পৃথিবী নীরস হয়ে উঠছে, তাই সে রস বেলাবার মতলব করেছে। কবীর লোকটাকে কাছে ডেকে উপদেশ দিলেন—

পানি পিয়াওত ক্যা ফিরো
ঘর ঘর সায়র বারি।
তৃষ্ণাবংত জো হোয়গা
পীবৈগা ঝখমারি।

এ আয়োজন কেন, ঘরে-ঘরে যখন রসের সাগর রয়েছে? তেষ্টা জাগুক্, ওরা আপনিই সেটা মেটাবার উপায় করে নেবে দায়ে ঠেকে।

মূল কথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা, শিল্পের ইচ্ছা হলো কিনা? উপযুক্ত আয়োজন হলো কিনা—শিল্পের জন্যে বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য্য তার প্রয়োগ-বিদ্যা তার খুটিনাটি উপদেশ আইন-কানুন সমস্তই এমন অপর্য্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে কোনো মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে। শিল্পকে, রসকে পাওয়ার জন্যে আয়োজনের এতটুকু অভাব যে আছে তা খুব একেবারে আদিম অবস্থাতে, আর সব দিক দিয়ে অসহায় অবস্থাতেও, মানুষ বলেনি; উল্টে বরং প্রয়োজন হলে আয়োজনের অভাব ঘটে না কোনোদিন—এইটেই তারা, হরিণের শিং, মাছের কাঁটার বাটালি, একটুখানি পাথরের ছুরি, একটুকরো গেরিমাটি, এই সব দিয়ে নানা কারুকার্য্য নানা শিল্প রচনা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে গেছে। এ না হলে হবে না, ও না হলে চলে না—শিল্পের দিক দিয়ে একথা বলে শুধু সে, যার শিল্প না হলেও জীবনটা চলছে কোনো রকমে। আদিম শিল্পীর সামনে শুধু তো বিশ্বজোড়া এই রসভাণ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্রীও নয়, ডিপ্লোমাও নয়, এমন কি তার নিজের জাতীয় শিল্পের Gallery পর্য্যন্ত নয়—কি উপায়ে তবে সে শিল্পকে অধিকার করলে? আমি অঙ্কন করছি, আমার নাতিটি পাশের ঘরে বসে অঙ্ক কস্‌ছে—এই ভাবে চলছে, হঠাৎ একদিন নাতি এসে বল্লেন—দাদামশায়, বেরাল না থাকলে তোমার মুস্কিল হতো, বেরালের রোঁয়ার তুলিও হতো না তোমার ছবিও হতো না। তর্ক সুরু হলো। ঘোড়ার লেজ কেটে তুলি হতো। ঘোড়া যদি না থাক্‌তো? পাখীর পালক ছিঁড়ে নিতেম। পাখী না পেলে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেম। টাক পড়ে গেলে? নাতির গালে আঙুলের ডগার খোঁচা দিয়ে বল্লেম—দশটা আঙুলের এই একটা নিয়ে। নাতি রাবণবধের উপক্রম করেন দেখে বল্লেম—তা হয় না, দেখছো এই ভোঁতা তুলি! বলে আমিও ঘুসি ওঠালেম। দাদামশাইয়ের আয়োজন দেখে নাতি হার মেনে সরে পড়লেন।

কাজের ঘানিতে জোতা রয়েছি, ঘানি পিষছি, কিন্তু স্নেহরস যা বার করছি, এক-ফোঁটাও তো আমার কাজে আসছে না। রসালাপের অবসরটুকু নেই, রসের তৃষ্ণা মেটানো, শিল্পলাভ—এসব তো পরের কথা!

কাজের জগতের মোটা-মোটা লোহার শিক-দেওয়া ভয়ঙ্কর অথচ সত্যিকার এই বেড়া

জাল এ শুধু আমাদেরই ধরে চাপন দিচ্ছে না, সব মানুষই এতে বাঁধা। আকের ছড় বোলে এর শিকগুলোকে ভুল করে দাঁত বসানো তো চলে না। কাজের মধ্যে যদি ধরা না দিই তো সংসার চলে না, আবার কাজেই গা ঢেলে দিই তো রস পাওয়া থাকে দূরে! এর উপায় কিছু আছে ?

রস পেতে চাই, তবে কি রসের মধ্যে নিজকে, নিজের সঙ্গে কাজকর্ম্ম সংসারটা ভাসিয়ে দেবো ? ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা মন, তবে কি ফুলের বাগিচাতেই গিয়ে বাস করবো—ধানের ক্ষেত, ধনের চিন্তা সব ছেড়ে ? কবীর বল্লেন, পাগল নাকি!

—'বাগো না জায়ে না জা,
তেরে কায়া মে গুলজার'

'আগে যেওনা বন্ধু, পুষ্পবন তোমার অন্তরেই বিদ্যমান!' কায়ার মধ্যে প্রাণ যে ধরা রয়েছে, বাইরে থাক্ না কাজের জঞ্জাল! খাঁচার মধ্যেই থেকে পাখী কি গায় না ? তাকে কি ফুলের বনেই যেতে হয় গান গাইতে ? যে ওস্তাদ সে ঘানি চলার তালে-তালেই গায়, নাই হলো আর কোনো সংগত সুযোগ।

"মৃগা পাশ কস্তুরী বাস
আপন খোঁজে খোঁজে ঘাস।"

কিন্তু কস্তুরীর ব্যবসা করতে গিয়ে দানাপানির উপায় ছাড়লে জীবনটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করা যাবে ? কোথায় থাকবে তখন রস, কোথায় বা শিল্প ? রস না থাক, জীবনটা তো রয়েছে অনেকখানি। আগে জীবন—সব রসের মূল যেটা, সেটা তো রক্ষে করা চাই। এর উপর আর কথা চলেনা। কিন্তু এইকালে সহরের বুকে দাঁড়িয়ে ঐ ফুটপাতের পাথরের চাপনে বাঁধা পড়ে শিরীষ গাছ, সেও যদি ফুল ফোটাতে পারে, তো মানুষে পারবেনা তেমন করে ফুটতেও—একি কখন সম্ভব ? চেরি ফুল যখন ফোটে তখন সারা জাপানের লোকের মন—সেও ফুটে উঠে, ছুটি নিয়ে ছুট দেয় সেদিকে সব কাজ ফেলে। কই তাতে তো তাদের কেউ আজ অকেজো বলতে সাহস করছেনা ? পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে। আমাদেরও তো আগে বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ ছিল, সে জন্যে সেকালে কাজেরও কামাই হয়নি, জীবনেরও কমতি ছিলনা, শিল্পেরও নয় শিল্পীরও নয়, রসেরও নয় রসিকেরও নয়। অলসস্য কুতো শিল্পং ? নিশ্চয় আমাদের এখনকার জীবনযাত্রায় কোথাও একটা কল বিগড়েছে যাতে করে জীবনটা বিশ্রী রকম খুঁড়িয়ে চলছে, শরীর খেটে মরছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে অবশ অলস! ম্যালেরিয়া-মশার সঙ্গে লক্ষ্মীপেঁচার ঝাঁক যদি আমাদের ঘরে এসে বাসা বাঁধতো, তবে শিল্পী হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হতো কিনা এপ্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার শোভা পায় না—পেঁচার পালকের গদীর উপর বসে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষী তো মানতে হয়। শিল্পী যা ছুঁয়ে দেয় তাই সোণা হয়ে যায়, অথচ সোণা দিয়ে বেচারা ছেলে-মেয়ের গা কোনো দিন ভরে দিতে পারলে না! তাজের পাথর যারা পালিস করলে—আয়নার মতো ঝকঝকে, দুধের মতো

সাদা করে, মুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্বুজটা গড়ে গেল যারা, দেওয়ালের গায়ে অমরদেশের পারিজাত-লতা চড়িয়ে দিয়ে গেল যে নিপুণ সব মালি, তারা রোজ-মজুরী কত পেয়েছিল? তা ছাড়া পুরো খেতে পায়নি বলে তাদের শিল্প কোথাও ম্লান হয়েছিল বলতে পারো? দশ এগারো বছর লেগেছিল তাজটা শেষ করতে; সবচেয়ে বেশী মাইনে যা দেওয়া হয়েছিল ওস্তাদদের, তা মাসে হাজার টাকার বেশী নয়—এর থেকে বাদসাহি আমলের উপরওয়ালাদের পেট ভরিয়ে কারিগরেরা রোজ পেয়েছিল কত, কসে দেখলেই ধরা পড়বে—শিল্পীর সঙ্গে ও শিল্পের সঙ্গে সম্পদের যোগাযোগটা। শিল্পী হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়া হওয়ার বেশী যোগ, চাকরী হওয়া না হওয়ার চেয়ে—আমিতো এইটেই দেখতে পাচ্ছি। জীবন রক্ষে করতে যেটা দরকার, জীবন সেটা ঘাড় ধরে আমাদের করিয়ে নেবেই, ছাড়বেনা, নিদারুণ তার পেষণপীড়ন। অতএব আফিস আদালত ছেড়ে সকলে রূপ ও রসের রাজত্বের দিকে সন্ন্যাস নিয়ে চট্‌পট বেরিয়ে পড়ার কুপরামর্শ তো কাউকে দেওয়া চলেনা, অথচ দেখি এই কলেপড়া জীবনযাত্রার মধ্যে একটুখানি রস একটু শিল্প-সৌন্দর্য্য না ঢোকাতে পারলেও তো বাঁচিনে। শুধু যে প্রাণ যায় তা নয়, শিল্পীবলে ভারতবাসীর যে মান ছিল তাও যায়। শিল্পী নীচ জাত হলেও সে শিল্পের পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে সকল সময়ে শিল্পী বিশুদ্ধ—এই কথা ভারতবর্ষের ঋষিরা বলে গেছেন, কিন্তু যেখানে এই শিল্প আজকালের-কলের-মানুষ আমাদের পরশ পাচ্ছে, সেইখানেই সে মলিন হচ্ছে—ফুল যেমন চট্‌কে যায় বেরসিকের হাতে পড়ে। এর উপায় কি?

কাজের বন্দীর রসের সঙ্গে পরিচয় পরিণয় ঘটবার কি আশা নেই? কেন থাকবে না? কাজ কর্ম্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি, শিল্পী, রসিক—এরা সব এই কাজের জগতের বাইরে একটা কোনো নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তাতো নয়। কিম্বা জীবন যাত্রার আকমাড়া কলটার কাছ থেকে চট্‌পট্ পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এঁদের কারু বড় একটা দেখা যাচ্ছেনা। তাঁরা তবে কি করে বেঁচে রয়েছেন? কবীরের কাজ ছিল সারাদিন তাঁত-বোনা; আফিসে বসে কলম-পেশায় কিম্বা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্তর সঙ্গে তার কমই তফাৎ। তাঁত-বোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হতো, আমাদেরও সংসার চালাতে হচ্চে কলম ঠেলে। রসের সম্পর্ক মাকু-ঠেলার সঙ্গে যত, কলম-ঠেলার সঙ্গেও তত, শুধু কবীর স্বাধীন জীবিকা দ্বারা অর্জ্জন করতেন টাকা, ইচ্ছাসুখে ঠেলতেন মাকু, আনন্দের সঙ্গে কাজ বাজিয়ে চলতেন, আর এখনকার আমরা কাজ বাজিয়ে-বাজিয়ে কুঁজো হয়ে পড়লেম তবু কাজি বলছে ঘাড়ে ধরে—বাজা বাজা আরো কাজ বাজা নাহলে বরখাস্ত। কবীরের তাঁত কবীরকে 'বরখাস্ত' এ কথা তো বলতে পারিনি। ঐ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাঁত বোনার রাস্তা তারি ধারে তাঁর কল্পবৃক্ষ ফুল ফুটিয়েছিল। এই ইচ্ছাসুখ-টুকুর মুক্তি কবি, শিল্পী, গাইয়ে, গুণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে—পয়সার সুখ নয়, কিম্বা কাজ ছেড়ে ভরপুর আরামও নয়।

কাজের-কলের-বন্দী-আমাদের সবদিক দিয়ে এই ইচ্ছাসুখের পথে যেখানে বাধা সেখানে নরক-যন্ত্রণা ভোগই করি, উপায় কি ? কিন্তু মন, সে তো এ বাধা মানবার পাত্রই নয়। জেলখানার দরজা মন্ত্র-বলে খুলে সে তো বেরিয়ে যেতে পারে একেবারে নাল আকাশেরও ওপারে! সে তো মৃত্যুর কবলে পড়েও রচনা করতে পারে অমৃতলোক! তবে কোথায় নিরাশা, কোথায় বাধা ? বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি কালিদাসকেও নিয়মিত হাজ্‌রে লেখাতে হতো, কিন্তু এত করে মেঘরাজ্যের তপোবনে তাঁর বিচরণের কোনো বাধাই তো হয়নি। কবি শিল্পী কেউ কাজের জগৎ ছেড়ে রসকলির তিলক টেনে অথবা জটাজুটে ছাই-ভস্মে একেবারে রসগঙ্গাধর সেজে কেবলি বৃন্দাবন আর গঙ্গাসাগরের দিকে পালিয়ে চলেছেন তাতো কোনো ইতিহাস বলেনা। মৃত্যু দিয়ে গড়া এই অমিরসের পেয়ালা, শুকনো চামড়ার কার্ব্বা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপ জল, কাজের সুতোয় গাঁথা পরিজাত ফুল—এই গুলোকে তাঁরা জীবনে অস্বীকার করে চলতে চেষ্টা করেননি, উল্টে বরং যারা কাজে নারাজ হয়ে একেবারেই বয়ে যাবার জন্যে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন 'জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরো'—আরে অবুঝ, ঠিক যেমন আছ তেমনই স্থির থাক। কথাই রয়েছে কারুকার্য্য। কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি, সমস্তই মেনে নিলে তবেতো সে শিল্পী। এই সহরের মধ্যে দাঁড়িয়েই কি আমরা বলতে পারি, রস কোথায়—তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথায়—তাকে দেখতে পাচ্ছিনে ? ইন্দ্রনীলমণির ঢাকন দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা, কালো-সাদা বাঁকা-সোজা রং-বেরং কারুকার্য্য দিয়ে নিবিড় করে সাজানো, এটি ধরা রয়েছে—তোমারো সামনে, তারও সামনে, আমারো সামনে, ওরও সামনে—বিশেষ করে কারু জন্যে তো এটা নয়—জায়গা বুঝেও তো এটা রাখা হয়নি—তবে দুঃখ কোন্‌খানে ?—ঢাকা খোলার বাধা কি ? কত শক্ত-শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এই কাজটাই কি খুব কঠিন আর দুঃসাধ্য হলো ? ঢাকা খোলার অবসর পেলেমনা—এইটেই হলো কি আসল কথা ? ধর অবসর পেলেম—পূর্ব্বপুরুষ খেটে-খুটে টাকা জমিয়ে গেল, পেটের ভাবনাও ভাবতে হলনা,—মেয়ের বিয়েও নয় চাকরিও নয়; কিম্বা আফিস-আদালত ইস্কুলগুলোর সঙ্গে একদম আড়ি ঘোষণা করে লম্বা ছুটি পাওয়া গেল—রসের পেয়ালাটার তলানি পর্য্যন্ত গিয়ে পোঁছবার। কিন্তু এত করে হলো কি ?—লাড্ডুর খদ্দের এত বেড়ে চল্লো যে দিল্লির বাদশার মেঠাইওয়ালাও ফতুর হবার জোগাড় হলো। অতএব বলতেই হয় অবসর ও অর্থের মাত্রার তারতম্যে রস পাওয়া না-পাওয়ার কম-বেশ ঘটছেনা, আমাদের ইচ্ছে না-ইচ্ছে, কি ইচ্ছে কেমন ইচ্ছে—এরি উপরে সব নির্ভর করছে, এই ইচ্ছেটাই যা পেতে চাই তাই পাওয়ায়; পথ দেখায় এই ইচ্ছে। নজর বিগড়ে গেছে আমাদের, না হলে শিল্পের আগাগোড়া—তার পাবার শুলুকসন্ধান সমস্তই চোখে পড়তো আমাদের। কি চোখে চাইলেম, কিসের পানে চাইলেম, চোখ কি দেখলে এবং মন কি চাইলে, চোখ কেমন করে দেখলে, মন কেমন ভাবে চাইলে, চোখ দেখলেই কিনা, মন চাইলেই কিনা—এরি উপরে পাওয়া, না-পাওয়া, কি পাওয়া, কেমন পাওয়া, সবই নির্ভর করছে।

কাজের উপরে জাতক্রোধ রক্ত-চক্ষু নিয়ে নয়, সহজ চোখ সহজ দৃষ্টি এবং সেটি নিজের, সহজ ইচ্ছা এবং আন্তরিক ইচ্ছা—এই নিয়ে নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা নবরসরুচিরা যিনি তাঁর সঙ্গে শুভ-দৃষ্টি করতে হয় সহজে। রসের পেয়ালার যদি নাগাল পাওয়া গেল তখন আর কিসের অপেক্ষা? যতটুকু অবসরই হোক না কেন তাই ভ'রিয়ে নিলেম রসে, যেমনই কাজ হোক না কেন তাই করে গেলেম—সুন্দর করে আনন্দের সঙ্গে; যা বল্লেম, কইলেম, লিখলেম, পড়লেম, শুনলেম, শোনালেম—সবার মধ্যে রস এলো সৌরভ এলো সুষমা দেখা দিলে;—শিল্প ও রস শুকশারীর মতো বক্ষপিঞ্জরে চিরকালের মতো এসে বাসা বাঁধলো। কি কবি, কি শিল্পী কিবা তুমি কিবা আমি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারু সঙ্গে ছিল না, একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এলো কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা। আমরা না জানতে মাতৃ-স্নেহে ভরে গেল আসবামাত্র সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের, তারপর থেকে সেই আমাদের ছোট পেয়ালা—তাকে ভরে দিতে কালে-কালে পলে-পলে দিনে-রাতে এক ঋতু থেকে আর এক ঋতু রসের ধারা ঝরেই চল্লো, তার তো বিরাম দেখা গেলনা;—শুধু কেউ ভরিয়ে নিয়ে বসে রইলেম নিজের পেয়ালা বেশ কাজের সামিগ্রি দিয়ে নিরেট করে, কেউ বা ভরলেম পরে সেটা নব-নব রসে প্রত্যেক বারেই পেয়ালাটাকে খালি করে-করে। এই কারণে আমরা মনে করি সৃষ্টিকর্ত্তা কোনো মানুষকে করে পাঠালেন রসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে পাঠালেন একেবারে নিঃস্ব করে। একি কখন হতে পারে? রসো বৈ সঃ বলে যাঁকে ঋষিরা ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক? রাজার মতো কাউকে দিলেন ক্ষমতা, কাউকে রাখলেন অক্ষম করে, শিল্পীর সেরা যিনি তাঁর কি এমন অনাসৃষ্টি কারখানা হবে?—কেউ পাবে সৃষ্টির রস, সৃষ্টির শিল্পের অধিকার, আর-একজন কিছুই পাবেনা? এত বড় ভুল কেবল সেই মানুষই করে যে নিজের দোষে নিজে বঞ্চিত হয়ে বিধাতাকে দেয় গঞ্জনা। সেই জন্যে কবীরের কাছে যখন একজন গিয়ে বল্লে—প্রাণ গেল রস পাচ্ছিনে, কোথা যাই? কি করি? কোন্ দিকের আকাশে সূর্য্য আলো দেয় সব চেয়ে বেশি, কোন্ সাগরের জল সব চেয়ে নীল পরিষ্কার অনিন্দ্যসুন্দর—সে কোন্ বনে বাসা বেঁধেছে, রস কোন্ পাতালে লুকিয়ে আছে, বলে দিন্—কি উপায় করি? কবীর অবাক হয়ে বল্লেন—

'পানী বিচমীন পিয়াসী,
মোহিঁ সুন্ সুন্ আওত হাঁসি!'

একএকবার ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হয় দরজাটা কোথায় হারিয়ে গেছে—উত্তরে কি দক্ষিণে কিছুই ঠিক পাওয়া যাচ্ছেনা; রসের মধ্যে ডুবে থেকে আমাদের রসের সন্ধান, আর শিল্পের হাটে বসে শিল্পলাভের উপায় নির্দ্ধারণ, এও কতকটা ঐরূপ।

পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের

এ সবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত তারি নির্ম্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে ; অখণ্ড রসের খণ্ডখণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলোর থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ! এর অধিকার পাওয়ার জন্যে কোনো আয়োজন কোনো শাস্ত্রচর্চ্চাই দরকার করে না। কাজের জগতের মাঝেই রস ঝরছে—আনন্দের ঝরণা, আলোর ঝোরা ; তার গতি ছন্দ সুর রূপ রং ভাব অনন্ত ; আর কোথায় যাবো—শিল্প শিখতে শিল্পকে জানতে? নীল আর সবুজ এমনি সাত রঙের সাতখানি পাতা, তারি মধ্যেই ধরা রয়েছে রসশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, কবিতা—সমস্তেরই মূলসূত্র ব্যাখ্যা সমস্তই! এমন চিত্রশালা যার ছবির শেষ নেই, এমন বাণী মন্দির যেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত পাগলাঝোরা ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশালা যেখানে সুরের নদী সমুদ্র বয়ে চলেছে অবিরাম, এর উপরে রসকে পাবার, শিল্পকে লাভ করবার, আর কি আয়োজন মাটির দেওয়ালের ঘরে করতে পারি? এর উপরে কিবা অভাব আমাদের জানাতে পারি? Artistর সেরা, কারিগরের সেরা—বিশ্বকর্ম্মার এই অযাচিত দান, এই নিয়েই তো বসে থাকা চলে ;—দেখ আর লেখ, শোনো আর বসে থাক!

আর তো কিছুর জন্যে চেষ্টা হয় না, ইচ্ছেও হয় না। এই অপ্রার্থিত অপর্য্যাপ্ত সৃষ্টি আর রস—একেই বুক পেতে নিয়ে সৃষ্টির যা কিছু—মানুষ থেকে সবাই—চুপচাপ বসে রইলো ঘাড় হেঁট করে রসের মধ্যে ডুবে, সেরা শিল্পীর এই কি হলো রচনার পরিপূর্ণতা—মুখবন্ধেই হলো রচনার শেষ? শিল্পীর রাজা যিনি শুধু একটা জগৎজোড়া চলায়মান বায়স্কোপের রচনা করেই খুসি হলেন, জীবজগৎটাকে সোণালী রূপালী মাছের মতো একটা আশ্চর্য্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প ইচ্ছার শেষ হয়ে গেল? চিত্রকর মানুষ তার টানা রূপগুলির টানে-টানে যেমন চিত্রকরের ঋণস্বীকার করে চলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রকরকেই আনন্দ দিতে-দিতে আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করে চলে, তেমনি ভাবেই তো এই বিরাট শিল্পরচনার সৃষ্টি হলো, তাইতো এর নাম হল অনাসৃষ্টি নয়,—সৃষ্টি। সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলোনা,—এইখানেই সেরা শিল্পীর গুণপনা মহাশিল্পে মহিমা প্রকাশ পেলে। শিল্পী দিলেন সৃষ্টিকে রূপ, সৃষ্টি দিয়ে চল্লো শিল্পীকে আপনার রূপ রস সমস্তই। ওদিক থেকে এলো ওদিকের সুর এদিক পানে, এদিক থেকে চল্লো এদিকের সুর ওদিকে, অপূর্ব্ব এক ছন্দ উঠলো জগৎ জুড়ে! আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম-বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ শোভার ঢেউ একেবারে আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকলো ; ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে ছেড়ে দিলে ; পাতার ঘরের এতটুকু পাখী সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিয়ে চেয়ে সেও বল্লে—আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার—নতুন-নতুন আলোর ফুল্‌কি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চল্লো, তারপর একদিন মানুষ এলো, সে বল্লে—কেবলি নেবো, কিছু দেবো না? দেবো—এমন জিনিষ যা নিয়তির নিয়মেরও

বাইরের সামগ্রী ; তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্ম্মিতি নির্ম্মাল্য ধর, এই বলে মানুষ নিয়মের বাইরে যে তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয়ঘোষণা করলে—

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতি ভারতীকবের্জয়তি" ॥

নিয়মের মধ্যে ধরা মানুষের চেষ্টা, নতুন বর্ণে নতুন-নতুন ছন্দে বহে চল্লো নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে ঠিক-ঠিকানার বাইরে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্ম্মিতি ;—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাণী

এস মা অমল কমল-বাসিনী
নারায়ণী বাণী, জননী,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সঙ্গীত সুধা
ধারায় ধুইয়া ধরণী।
এস মানবের ধ্যান-ধারণার তন্ত্রীতে,
এস কণ্ঠের মূক কুণ্ঠিত ইঙ্গিতে,
এস বিশ্বের শত শকুন্ত-সঙ্গীতে,
সত্য-শুভ্র-বরণী।
এস কল্যাণী মঙ্গল তব মূর্ত্তিতে,
উর উদাত্ত উদার অভয় উক্তিতে,
বাঁচাও অমৃতে, মৃত্যু-আহতে মূর্চ্ছিতে,
বিতরি নবীন জীবনী।
যদি এসেছ' ভারতী, করুণাময়ী মা প্রসন্না
তবে লহ' এ দাসের প্রণতি ভক্তি-নিষণ্ণা,
জাগো বর্ণ-আলোকে আলোকি এ চিত, বরেণ্যা,
চির অন্ধ-তামস-হরণী।
দাও রসনায় নব বাণী নব ভঙ্গীতে,
নবীন রাগিণী দাও এ কণ্ঠ-সঙ্গীতে,
দাও মা শক্তি, মৃত্যু-সাগর লঙ্ঘিতে
তোমার চরণ-তরণী।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হারানো খাতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

" ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আজি এসেছি তোমারই দেশে,
আমি, অতিথি তোমার দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।"

পরদিন প্রভাতকৃত্যের সমাধান্তে খবরের কাগজ হাতে লইবামাত্র গত রাত্রির সেই ভিখারী অতিথিটার ভীষণ মুখখানা অকস্মাৎ নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। মনে করিতেই সমস্ত শরীরটাই তাঁহার ঈষৎ যেন শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল; এবং নিরতিশয় লজ্জার সহিত মনে হইল যে, লোকে যে বলে তাঁর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি,—তা বড় মিথ্যাও নয়। সত্যই তো ওই রোগজীর্ণ ভয়ানকমূর্ত্তি ভিখারীটাকে যেমন তাঁহার দ্বারবানেরা অকারণ নিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার জন্য সেটাকে কিছু খাইতে দিয়া দুইটা টাকা দিয়া অথবা না হয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তো হইতে পারিত। তা নয়, একেবারে পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া সেটাকে নিজেদের সঙ্গে গাড়ী চড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসা হইল। গাড়ীতে আবার সে মূর্চ্ছিত হয়, ধরাধরি করিয়া নামাইয়া নীচের একটা ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়ান, ডাক্তার ডাকা, দুধ, বরফ, বলকারক ঔষধ এসব তখন না করিলেও কি আর চলিত না? এ লইয়া স্ত্রী একটুখানি চটিয়া উঠিলে তাঁহারও তাহার চেয়ে বেশী চটিয়া তাহাকে কটুবাক্যে তিরস্কার,—আবার তার পরই অর্দ্ধ রজনীব্যাপী চেষ্টায় মানভঞ্জন;—না,—এতসব না করিলেও চলিত।

কিন্তু তখন যেটা না করিলে চলিত,—সেটা যখন করা হইয়া গিয়াছে,—তখন আর মনে মনে লজ্জিত হইলেও চারা নাই। এখন ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে। লোকটাকে গাড়ী ডাকাইয়া সরকার মশাইকে সঙ্গে দিয়া হাঁসপাতালেই পাঠান যাক্। মধ্যে মধ্যে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিলে কিছু টাকা দিয়া দেওয়া যাইবে।

নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

রোগী তখনও বিছানায় পড়িয়াছিল। ঘরের সব দরজা জানালাই বন্ধ ছিল, নরেশচন্দ্র কাছাকাছি কাহাকেও না দেখিয়া, একহাতে নাকে সুগন্ধি রুমাল চাপিয়া স্বহস্তেই একটা জানালার কবাট মুক্ত করিয়া দিবা মাত্র প্রভাতসূর্য্যের এক ঝলক কনকরশ্মি অঞ্জলীভরা স্বর্ণরেণুর মতই সেই তাপিতের শীর্ণ এবং পাণ্ডু দেহের উপর যেন উপহাসের বক্র হাসির মতই ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সেই আলোর ঝিলিক যেন ওই বিশীর্ণ আড়ষ্ট শরীরটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া বলিতেছিল,—"এ ঘরে তুই কে'রে? এর মধ্যে তোকে মানায় না-কি?"

নরেশ ডাকিলেন, "কিরে, আজ কেমন আছিস্ ?" চমকিয়া চোক মেলিয়া চাহিতেই দুজনকার চোখেই দুরকমে বিস্ময়ের ঘন রেখা ফুটিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে প্রচুরতর করুণার সহিত আর যে ভাবটা অর্দ্ধ জাগ্রৎ হইল, সেটাকে ঈষৎ ঘৃণা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ভিখারীর একটীমাত্র দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নেত্রতারকায় নরেশের সুন্দর ও সুসজ্জমূর্ত্তি কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়েরই আলোক সম্পাত করিয়াছিল।

ভিখারীর মুখে ও সর্ব্বদেহে গভীর বসন্ত ক্ষত ; মুখের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ নেত্র, ললাট এবং গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ঐ অংশটী কোনরূপে অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে। জীবিত মনুষ্যের মধ্যে এমন দুরবস্থা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু—কিন্তু ওই সর্ব্বহারা ভীষণ অগ্নিদগ্ধ মুখমণ্ডলে আরও কি কিছুই দেখা যায় না ? যায়। যাহা দেখা যায় বুঝি সেইটে দেখাই আরও ভয়ানক। তাহা এই যে এ ব্যক্তির চিরদিনই এ অবস্থা ছিল না। একদিন সে যে মানুষের মধ্যে—শুধু তাই নয়, সুপুরুষের মধ্যেই গণ্য ছিল সেই সকরুণ সংবাদটুকু ওই দগ্ধ উপবন তুল্য মুখখানার আশে পাশে বেদনাব্যঞ্জিত ইঙ্গিতে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যে একটী চক্ষু আজও বর্ত্তমান আছে, সেটীকে বিশাল ও বুদ্ধিব্যঞ্জক বলা যায় ; মস্তকের বিরল কেশ কি সুন্দর কুঞ্চিত! দেহ যে একদিন সুপুস্ট এবং দীর্ঘায়ত ছিল, আজও তাহার করুণ ইতিহাস সেই অকালজরায় জর্জ্জরিত শরীরে স্পস্ট ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরিতে জগতের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট চারু-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ চোখে দেখিলে দর্শকের সমস্ত প্রাণটা মথিত করিয়া চক্ষে যেমন স্বতঃই জল আসে, বিধাতার এই উচ্চাদর্শে গঠিত মূর্ত্তির পরিণামফল দর্শনেও তেমনই করিয়া প্রাণ কাঁদিতে থাকে। নরেশচন্দ্রের কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। তাঁহার আপনাআপনি কেমন মনে হইল, আজ যে অবস্থার মধ্যে এ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতেছেন এ লোকের ঠিক সে অবস্থাপন্ন হইবার কথা নয়। এ যেন ইহার কোন্ অজ্ঞাত গুরুলঙ্ঘনজনিত পাপের ফলে, কোন অজানিত দুর্ব্বাসার অভিশাপে, দেবযোনি ছাড়িয়া একেবারে নক্রশরীর ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! 'বয়সই বা ইহার কি ? তাঁহার চেয়েও কম হওয়া বিচিত্র নহে। সহানুভূতি ও করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, " তোমার নামটা কি বল তো ?"

লোকটী একটু চিন্তিতভাবে নীরব রহিল, পরে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস মোচন করিয়া মৃদু ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর করিল,—" নিরঞ্জন।"

" নিরঞ্জন,—কি ? তোমরা ?"

লোকটী আবার ভাবিল ও পরিশেষে কহিল " বৈদ্য,—আমরা দাসগুপ্ত।"

" আমারও সেই রকমই একটা ধারণা হচ্ছিল ; তোমার অবস্থা হয়ত চিরদিন এরকম ছিল না। একদিন—উচ্চ সমাজেরই একজন ছিলে তুমি, না ?"

নিরঞ্জন একটুখানি যেন উত্তেজনার সহিত, ঈষৎ যেন ভীতির সঙ্গে, তাহার উপকারকের স্নেহ-

মণ্ডিত মুখের দিকে চকিত হইয়া চাহিল, ত্রস্তস্বরে কহিয়া উঠিল " না না, ওসব কিছু অনুমান করতে যাবেন না, আমি চিরভিখারী—আমার আবার কবে ভাল দিন ছিল; ওঃ! সে সব এ জন্মের নয়!"

নরেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। ইহার এই দগ্ধমরুর ন্যায় ভয়াবহ জীবনের মধ্যে যে তেমনই ভীষণ কোন একটা রহস্য নিহিত আছে, ইহা যেন তিনি স্পষ্টচক্ষেই দেখিতে পাইলেন। হয়ত কোন দৈব বিড়ম্বনা, হয়ত কোন হত্যাকাণ্ড, হয়ত বা রাজনৈতিক কোন কিছু—হ্যাঁ, তাওতো বিচিত্র নয়, নাইট্রিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিডের পরিণাম—থাক এসব অনুমানে কোনই ফল নাই, বৃথাই মস্তিষ্কশক্তির অপচয় মাত্র। যাই হোক, এ ব্যক্তি ভদ্রসন্তান, অদৃষ্টবিড়ম্বিত;—দৈবক্রমে তাঁহার দ্বারস্থ। থাক দুটো দিন এই আশ্রয়েই, কাজ কি ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া? ডাক্তার তো বলিল যে ইহার শরীরে রোগ বলিতে কিছুই নাই, সকল রোগের মূল কারণ যাহা, তাহারই প্রচুরতায়ই ইহার এমত অবস্থা, অর্থাৎ অনাহার ও অযত্নবশতঃ সমস্ত শরীরযন্ত্রেরই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। থাক দুদিন, হয় ত এজীবনে বেচারী অনেক দুঃখই পাইয়াছে। হয়ত দুটো দিন বিশ্রামের কাল এর আসিয়াছে, সেই জন্যই হয়ত আমার মনেও এমন করুণা আসিয়া পড়িতেছে,—

চাহিয়া দেখিলেন, ক্লান্তিভরে নিরঞ্জন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেওতো, কিছু
কম করে মোরে দাওনি।
—বাণী

কয়েকদিন নিরঞ্জন শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল; পারিবারিক চিকিৎসক যথারীতিতে দুই বেলাই দর্শন দিয়া যেমন গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী এবং তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের শারীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অকারণ জেরা করিয়া যান, সেইরূপ যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ দর্শন দিয়া দুবার ইহার ঘরটাকেও পায়ের ধুলায় বঞ্চিত করেন না। প্রথম দু' একদিন তেমন মন দিতে পারেন নাই এবং এই দীনহীনের একশেষ ভিক্ষুকটাকে হাঁসপাতালে পাঠানর জন্যও তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন; কিন্তু ইদানীং গৃহকর্ত্তার রুচিপ্রবৃত্তিঅনুযায়ী সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া উহার জন্য একটা টনিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দুবেলা আসিয়াই " কিরে একটু বল পাচ্ছিস্? আচ্ছা ওষুধটা যত্ন করে খেয়ে যাতো, দেখ্‌বি কিনা কি রকম কাজ করে। নির্ব্বাচনটা যা করেছি সে একেবারে এক্‌সেলেণ্ট!" ইত্যাদি দুটা কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া

খাইতেও ত্রুটি করেন না। ডাক্তারবাবুর এমন অসাধারণ ঔষধ সেবনান্তেও যে সে হতভাগ্য সারিয়া উঠিতে বিলম্ব করিয়া রাজবাড়ীর ভৃত্যবর্গের গলগ্রহ হইয়া রহিল, সে যে কেবল তাহার জুয়াচুরি বুদ্ধির খেলা, ইহাতে, বামুনঠাকুর, পেঁচোর মা বা হারাধন—ইহারা সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত সকল বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও এ বিষয়ে—সম্পূর্ণ একমত। আর ইহাদের নালিশ ফরিয়াদ শুনিতে শুনিতে এই দুর্ভাগ্য অতিথিটার প্রতি, এই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী যিনি—তাঁগার মনটাও বেশ ভাল ছিল না। গৃহিণীর নাম পরিমল, বয়স তাঁহার বাইশের উর্দ্ধে নয়; কাজেই সংসারের কুপোষ্য ইত্যাদির জন্য মাথা ঘামাইয়া, তাদের চিন্তায় সময় নষ্ট করা তাঁহার ভাললাগা খুবই সম্ভব নহে। তবে দরিদ্রের প্রতি কোন অযথা বিদ্বেষ তাঁহার পোষিত ছিল না, সেজন্য ওই অশক্ত ভিখারীটাকে বাড়ী হইতে এখনই দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবার কোন বিশেষ আগ্রহ যে তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন কথা বলা যায় না; তবে তিনি কি করিবেন,—বামুন ঠাকুরের দল যখন তখন ভিড় করিয়া আসিয়া রুষ্ট অসন্তোষের সহিত সমস্বরে গলা ছাড়িয়া জানাইয়া যায়, "এমন করিয়া তাহাদের 'পরে অবিচার হইতে থাকিলে তাহারা তেমন চাকরীর মুখে ' নুড়া ' জ্বালিয়া দিয়া যেদিকে দুচক্ষু যায় সেই দিকেই চলিয়া যাইবে। ' গতর ' সুখে থাকিলে চাকরীর নাকি এ সহরে অভাব আছে? তাহারা রাজবাড়ী জানিয়া কাজে বাহাল হইয়াছিল, ভিখারীর সেবা করা তাহাদের পেষা নয়। তা'ও কি একটা সোজাসুজি ভিখারী! না আছে না'বার চাড়, না আছে তার খাবার চাড়, ওমা, এমনতো কোথাও দেখা যায় না। তুই ভিখারী মানুষ; তোর আবার অত কেন? যা' পেলি হাঁসহাঁস করে' গিলে কুটে নিয়ে বর্ত্তে যা; তা নয়, পাতের ভাত পাতেই পড়ে থাকলো, উদ্ধমুখে হাঁ করে ঘরের কড়িকাঠপানেই তাকিয়ে রইলো, আবার মনে পড়িয়ে দিলে তবে খাবেন। অত কার গরজ রে বাপু? ওঁর কত কালের মা বোন পাশে বসে খাওয়াচ্ছে কি না!"

পেঁচোর মার গায়ের জ্বালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম যে দিন সে নিরঞ্জনকে দিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাইয়া লয়, তখন নিরঞ্জনের শরীর একান্ত দুর্ব্বলথাকাপ্রযুক্ত সে বাসন মাজিয়া উঠিয়াই পতনোন্মুখ হয়। কপালক্রমে কি না ঠিক সেই সময়টিতেই সেই স্থানে নরেশচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটিল! রাজাবাবুর ঘৃণাপিত্ত সবই গিয়াছে! ওই কদাকার মুখপোড়া হনুমানটাকে নিজে ধরিয়া ফেলিয়া, এতটুকু বিবেচনা না করিয়াই, নিরপরাধিনী পেঁচোর মাকে ' ন ভূত ন ভবিষ্যতি ' কি বকুনিটাই না বকিলেন! শেষে হুকুম দিয়া বলিলেন, ঐ পোড়ারমুখো যখন জাতে বদ্দি, তখন ওর এঁটোকাঁটা কায়েতবাড়ীর দাসীচাকরে কিসের জন্য ছুঁতে পারবে না? ও গুরুঠাকুরের মতন এবার থেকে বসে খাবে, আর ওর পাত কুড়োবে এই ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলো কাঙ্গালের কাঙ্গাল পেঁচোর মা। বিচারটা দশে পাঁচে দেখো একবার!

এই সব নানা কথা শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া একদিন সন্ত্বঃ নালিশের যন্ত্রণার

পরক্ষণেই স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরিমল তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, " অনেকদিন ত হয়ে গেল, এতদিনে অবশ্যই গায়ে জোর পেয়েছে, এইবার ওকে যেতে বল্লে হয় না ?"

নরেশ প্রথমতঃ কথাটার অর্থবোধ করিতে না পারায় জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই সহসা ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেই কহিয়া উঠিলেন, "কার কথা—নিরঞ্জনের কথা বল্‌চো ?" পরিমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছল্যস্বরে উত্তর করিল, "কি-রঞ্জন তা জানিনে, আমি ওই হাড়জ্বালানে ভিখিরিটার কথা বল্‌ছিলুম। ওর জ্বালায় বাড়ীর সব ঝি চাকরগুলোতো জ্বালাতন হয়ে ছেড়ে যেতে বসেছে।"

নরেশচন্দ্রের নেত্রে বিরক্তির ঘন ছায়া পড়িল। অসন্তোষের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাদের কি পাকাধানে ও মই দিচ্চে শুনি ?"

পরিমলও কিছু উষ্ণভাবে কহিল, "মই দিচ্চে কি কি করচে তা তারাই জানে। মোট কথা, তারা বলেচে যে ও যদি থাকে, তবে ও-ই থাক্, আমরা আর তাহলে কেউ এ বাড়ীতে চাকরী করতে থাকবো না। তা সেই কি ভাল, যে খামকা একটা যে-সে ভূতুড়ে লোকের জন্যে বাড়ী শুদ্ধ সব ঝি চাকর বামুন ছেড়ে চলে যাবে ?"

নরেশচন্দ্র প্রথমতঃ রাগ করিয়া বলিলেন " যায় যাগ্‌গে ! অমন সব হিংসুটে পাজীলোক-গুলো বাড়ী ছাড়লেই হাড়ে বাতাস লাগবে।"—পরক্ষণেই সেই বিদ্রোহী পরিজনবর্গের অগ্রবর্ত্তিনী-স্বরূপে গৃহিণীকে—"বেশ তবে ওকে নিয়েই থেকো" এই কথা মানভরে বলিয়া প্রস্থানোন্মুখী দেখিয়া সহসা বিরক্তি ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, ও তাঁহার চাবিশুদ্ধ আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে কহিলেন—

"এ কি ! তারা যায় যাবে, তা'বলে তুমিও যাচ্চ কি জন্যে ? তুমি ত আর পেঁচোর মা নও যে তোমায় তার এঁটো মাজতে হয়,—হারাধন নও যে তার বিছানা পেতে দাও,—তবে, তোমার অত চটবার কারণটা কি আমায় বলতো ?"

বস্তুতঃ হিসাবমত চটিবার তাঁর কোন কারণই ছিল না। কথাটা কানে গিয়া তাই পরিমলকে ঈষৎ লজ্জা দিল। সে দেখাইবার মত কোন যুক্তিও না পাইয়া শুধু একটুখানি অপ্রতিভের মৃদুহাস্য হাসিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল—

"ধেৎ,—আমি কেন চটবো ? আমার আবার এতে কি ? তবে অতগুলো লোক সর্ব্বদা ওর জন্য চটে রয়েচে, চলে যেতে চায়, তাই, না হলে—"

নরেশ কহিলেন " দাও না চলে যেতে, কেমন যায় দেখ না। কখনো যাবে না—কক্ষনো না ; সে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। এমন দিলদরিয়া মেজাজের গিন্নি আর পাবে কোথায় যে যাবে শুনি ? তা নয়, ওই যে একটা গরীব না খেটে দু মুটো ভাত খাচ্চে ; এইটেই হয়েছে ওদের সবাকার চক্ষুশূল,—তা আমি খুব জানি। যারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন আরও বেশী করে পরকে অভাবের মধ্যে দেখতে চায়। তাই বা বল্‌বো কি, আমার ভদ্রলোকবন্ধুরাই সেদিন ওই

আমারই চাকরের দুর্ব্যবহারে মূর্চ্ছিত, মরণাপন্ন লোকটাকে একটু যত্ন দেখানর জন্য আমার 'পরে এতই মর্ম্মান্তিক রকমে চটেছিলেন যে, দু'তিন দিন আমার সঙ্গে কেউ আর দেখা পর্য্যন্ত করেন নি, দেখা হলেও কথা কন্‌নি। অথচ স্বকর্ণেই সবাই ডাক্তারের মুখ থেকেই শুনেছিলেন যে একটু খাদ্য ও যত্ন না পেলে লোকটা খুব শীঘ্রই মারা পড়বে!" শুনিয়া পরিমলের মনের মধ্যটা যেন একটা অতিতীক্ষ্ণ লজ্জার কণ্টকে বিঁধিয়া উঠিল; ছি ছি, সেও তো প্রায় এই মমতাহীন ভদ্রাভদ্র লোকেদের সহিত একজোট হইয়া তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বসিয়াছিল! তাঁহার এই এতবড় করুণার সমুচিত গৌরব করা দূরে থাক, তাহাতে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে না করিয়া উল্টাইয়া তাঁহার কার্য্যকে বাড়াবাড়ি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, বাধা দিতে গিয়াছে, স্বামী বাধা মানেন নাই বলিয়া নিজেকে তাহাতে হতমান বোধে অভিমান করিয়াছে। মাগো! এমন নীচু মনটা তাহার কি করিয়া হইল? নিজের ইতিহাসখানা তখন মন হইতে মুছিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? যদি তাহার এই উচ্চহৃদয় স্বামীর মধ্যে এত বড় দরিদ্রপ্রীতি না থাকিত, তবে এই যে আজ রাণী পরিমলকুমারী মিত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া সহরের বুকের মাঝখানে হীরকদ্যুতির মতই ঝলমল করিতেছেন, এ কোথা হইতে হইত? আজ সে দরিদ্র ভিখারীর প্রতি স্বামীর অতটুকু সহৃদয়তাকে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া নাক সিঁটকাইতেছে, আর যেদিন সেই ব্যক্তি নিজের সামাজিক পদপ্রতিষ্ঠা, রূপ, যৌবন ও অতুল ঐশ্বর্য্য—জাগতিক এই সমস্ত অতুলৈশ্বর্য্যকে—তুচ্ছ করিয়া দিয়া, শত শত রাজা, জমিদার এবং বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর প্রলোভনীয় উপহারসমেত পরী, অপ্সরী মেয়েদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই ভিখারিণীকে নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার সেই অনন্যসাধারণ অদ্ভুত কার্য্যটাকে কতই না বাড়াবাড়ি বলিয়া কতলোকেই না ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল!—সেই কথা মনে করিতেই পরিমলের সমস্ত মুখখানা সহসা টক্‌টকে লাল হইয়া গিয়া গাল দুইটা তাহার গরম হইয়া উঠিল। স্বামীর একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া সে তাঁহার বুকের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া সলজ্জঅনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "বেশ করেছ ওকে এনেছ, তুমি কার মা কবে ভাল করে থাক! তা ওরা যদি চলে যায় যাগ্‌গে,—আমি সব কাজ করবো।"

নরেশ প্রীত হইয়া স্ত্রীর মুখখানা দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহচক্ষে চাহিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এই তো মানুষের মতন কথা! ভয় দেখিয়ে কেউ অন্যায় করিয়ে নেবে কেন?"

অন্য একসময় পরিমল স্বামীকে কাছে পাইয়া যেন নিজের পূর্ব্বকৃত অবহেলাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উঁহাকে একটুখানি খুসী করিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিরঞ্জন একটু সেরে উঠ্‌চে?"

নরেশ কহিলেন "হাঁ অনেকটা, তবে লোকটার স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে কি না, শীঘ্র যে বেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে সে আশা মোটেই নেই।"

পরিমল একটু সহানুভূতি দেখাইয়া আবার কহিল "ওরা বলে ওর মুখটা নাকি পুড়ে গেছে ? কি করে গেল—আহা !"

নরেশ কহিলেন, কি করে গেল সে কথা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেম, দেখলেম, ও ওসব বিষয়ে কিছু বল্‌তে চায় না। পূর্ব্বকথা কোন কিছু উঠে পড়্‌লেই একেবারে চুপ হয়ে যায়, কাজেই আমিও আর জান্‌বার জন্য বিশেষ চেষ্টাচরিত্র করিনি। যাই হোক, কোন রকম ভয়ানক দৈব দুর্ঘটনা যে ওর উপর দিয়ে ঘটে গেছে, আর তার ফলেই যে ওর আজ ওই ভিখারীর অবস্থা, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ! লোকটীকে আজ আমরা যা দেখ্‌ছি ও ঠিক তা নয় !"

পরি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল "সে আবার কি ?"

নরেশচন্দ্র ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন "সত্যি পরি, লোকটা মস্ত বড় বিদ্বান ছিল,—'ছিল' বল্‌চি তার কারণ, এখন ওর মাথাটা ঠিক সহজ অবস্থায় নেই,—কেমন যেন একটা টলমলে ভাব। বেশী দুর্ব্বলতা, কি বেশী শোক বা রোগ, অথবা ঐ আগুনে পোড়া,—এই রকম কোন কিছুতে ওর শরীরের সঙ্গে ভিতরটাকেও ঠিক অম্‌নি করেই দিয়েছে। যেমন শরীরেরও কোন কোন অংশে পূর্ব্বেকার সৌন্দর্য্য, ভগ্নস্তূপের অন্তরালে সূর্য্যরশ্মির মত উঁকি মারচে ;—মনের মধ্যেও ঠিক তেমনি অবস্থা ; সেখানেও অর্দ্ধসম্মোহ অর্দ্ধবিকলতার মধ্যে মধ্যে এমন একটা উচ্চশিক্ষার আভাষ দেখতে পাচ্চি যে, আমিতো আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কত সময় মনে হয় যেন কোন অভিশপ্ত ঋষি, কি রাজা, কি এমনিধারাই কোন একটা বড় লোক, ভাললোক, আজ দুর্দ্দশার চরমে পড়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে ; তাই ওকে সরিয়ে দিতে আমার মন সরে না।"

বলিতে বলিতে ভাবপ্রবণ নরেশচন্দ্রের সমস্ত মুখটা যেন চকচকে হইয়া উঠিল, দুই চোখে সহানুভূতির বাষ্প জমিয়া উঠিল, এবং কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বামীর এই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অকৃত্রিম করুণার উচ্ছ্বাসে পরিমলের মনের মধ্যেও একটা সহানুভূতির দমকা হাওয়া জোরে বহাইয়া দিল। শুনিতে শুনিতে সহসা তাহার সুকোমল নারীচিত্ত স্নেহে বিগলিত বিমথিত হইয়া তাহার দুই চোখ করুণার অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিল এবং কখন যে তাহা তাহার সুপুষ্ট গণ্ড বহিয়া সূত্রচ্ছিন্ন মুক্তার ন্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া তাহারই কোলের উপরে পড়িতে লাগিল, সে বিষয়ে তাহার কোন হিসাবই রহিল না। মনে মনে সে স্বামীর বিশ্বাসের সমর্থন করিয়া নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে, এবার হইতে সেও এই বিরাট গৃহপ্রবাসী পাণ্ডববৎ-অজ্ঞাতপরিচয় লোকটীর প্রতি অবিচার হইতে দিবে না, নিজেও করিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

দেবপূজারহস্য

(দেবতত্ত্ব)

দেবপূজা দ্বারা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি হয়—ইহাই প্রকৃত হিন্দুর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস শাস্ত্ররূপ দৃঢ় প্রমাণভিত্তির উপর সংস্থিত, শাস্ত্রের অনুকূল যুক্তিসমূহও এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া থাকে। এই দেবপূজার স্বরূপ কি, ইহার সাধনই বা কি, এবং ইহার অধিকারী কে, তাহাই অগ্রে বুঝিতে হইবে। তাহার পর, কি প্রকারে ইহা দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইতে পারে, তাহারও আলোচনা কর্ত্তব্য। তাই প্রথমে, দেবপূজার স্বরূপ কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

দেবপূজা এই পদটীর মধ্যে দুইটী শব্দ আছে। প্রথম দেব, দ্বিতীয় পূজা। অগ্রে দেব শব্দের কি অর্থ তাহাই দেখা যাক। 'দিব্' ধাতু হইতে 'দেব' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্ এই ধাতুর অর্থ 'প্রকাশ' এবং 'ক্রীড়া'। যিনি প্রকাশ পান বা যিনি ক্রীড়া করেন, তিনিই দেব শব্দের যোগলভ্য অর্থ,--আবার যাঁহা দ্বারা প্রকাশ হয়, তিনিও দেব শব্দের অর্থ হইতে পারেন। সুতরাং, ভক্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে যিনি প্রকাশ পান, অথবা যাঁহার প্রভাবে সাধনাপর মানব, সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই দেব বা দেবতা। এই স্বয়ং প্রকাশশীল ও সর্ব্বপ্রকাশহেতু দেবতা হিন্দুর একমাত্র উপাস্য। সকামের ত কথাই নাই নিষ্কাম উপাসকও এই সর্ব্বপ্রকাশহেতু প্রকাশশীল দেবতারই উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই উপনিষদ্ বলিতেছে—

তং হ দেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

সেই আত্মবুদ্ধিতে প্রকাশশীল দেবকে আমি মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিতেছি। সেই দেবতার প্রকাশেই যে সকল বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাও উপনিষদ্ বলিতেছে—

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

সেই প্রকাশময় দেবকে অবলম্বন করিয়াই সকল বস্তু প্রকাশ পায়, তাঁহারই প্রকাশের দ্বারা সকল বস্তুই বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি যে ক্রীড়ানিরত তাহাও স্পষ্ট করিয়া শ্রুতিই বলিতেছে—

বিশ্বেশ্বর নমস্তুভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ম্মকৃৎ।
বিশ্বভুগ্ বিশ্বমায়স্ত্বং বিশ্বক্রীড়ারতিঃ প্রভুঃ॥
(মৈত্রায়ণী উপনিষদ্)

সেই প্রকাশময় অখণ্ড অদ্বয় দেবের এই ক্রীড়া যে কিরূপ, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছে—

তস্মাদ্ একাকী নারমত সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তিনি (ব্রহ্ম) একাকী ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। এই কারণে তিনি দ্বিতীয়কে চাহিয়াছিলেন। ভাল না লাগিবারই ত কথা! সংসারে যাহা সুন্দর তাহাকে যদি কেহ না দেখে, যদি ভাল করিয়া আর একজন তাহার সেই সৌন্দর্য্যের অনুভব করিয়া তৃপ্ত না হয়, আর সেই তৃপ্তির পরিণতিতে সৌন্দর্য্যানুভবিতার নয়নের জল ভাবাবেশে উথলিয়া না উঠে, শরীরে কদম্ব কুসুমের ন্যায় সর্ব্বতঃসঞ্চারী রোমাঞ্চ উদিত না হয়, বর্ষার মারুতহিল্লোলে কদম্ব-যষ্টির ন্যায় সমগ্র দেহ কম্পিত হইয়া না উঠে, আর অভাবনীয় ভাবোদয়ে জড়ীভূত গদ্‌গদ কণ্ঠে সেই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিবর্ত্তস্বরূপ সৌন্দর্য্যস্তুতির অনাবিল গীতিলহরী খেলা না করে, তাহা হইলে সেই সুন্দরের সুন্দরতা যেন অপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না কি?—জড়াত্মক সৌন্দর্য্যরাজ্যেও এই স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না,—ঐ দেখ, শরতের পূর্ণ দীঘিকায় শত শত শতদল যখন ফুটিয়া উঠে, দিব্য সৌরভে যখন দিঙ্মণ্ডল ভরিয়া যায়, তখন সেই সৌরভময় অমল সৌন্দর্য্যের ভোগে বিভোর ভ্রমরকুল আকুল হইয়া ফুল্ল শতদলকুলের আশে পাশে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আপনা আপনিই তাহাদের কাকলীময় গুন্‌গুন্‌গানে তখন সেই স্থান মুখরিত হয়। বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে অমল ধবল দিব্য জ্যোৎস্নার অনুপম সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে কোকিলকুল পঞ্চমে তান ধরিয়া দেয়, অলিকুল চারিদিক্ হইতে গুন্‌গুন্‌রবে ভূমণ্ডল ভরিয়া দেয়, পাপিয়ার প্রাণস্পর্শিনী স্বর-লহরীমালায় দিগন্ত ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে, তাই বলি জড়জগতে ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যের যদি এই স্বভাব হয়, ভাব দেখি, তাহা হইলে সকল সৌন্দর্য্যনির্ঝরের যিনি অফুরন্ত ও অদ্বিতীয় আশ্রয়, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাইয়া শরতের পূর্ণশশী ভূমণ্ডলকে স্নিগ্ধসৌন্দর্য্যসাগরে ডুবাইয়া দেয়, ফুল্লপ্রসূনরাজি সৌরভভরে প্রাণ মাতাইয়া তুলে, কোকিল ভ্রমর ও পাপিয়াপ্রভৃতি শ্রুতিবিবরে সুধাময় স্বরলহরী ঢালিয়া দেয়, সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সুন্দরের সুন্দর, মধুরের মধুর, কোমলের কোমল, সর্ব্বরসময়, সর্ব্বগন্ধময়, সর্ব্বরূপময়, ও সর্ব্বরসময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আদিদেব নিজ অচিন্ত্য অনাবিল সৌন্দর্য্যের ভোক্তাকে না দেখিয়া যে তখন অরতিমান্ হইয়া উঠিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার বা অসম্ভব বলিয়া ভাবিবার কি হেতু আছে?

শাস্ত্র সেই দেবকে বিশ্বস্বরূপ ও বিশ্বাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এ সংসারের সকল বস্তুই যাঁহার উপর অধিষ্ঠিত, সকল পদার্থই যাঁহার সত্তায় সদ্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে,—যিনি অবিকারী হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সর্ববিধ বিকার বা কার্য্যসমূহের একমাত্র উপাদান, তাঁহাতে নিরূপম আত্মসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য দৃগ্‌দৃশ্য ভাবের বীজভূত এই অরতি বা ভাল না লাগা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা কে বলিতে পারে ? এই অরতিপরিহারের জন্যই সেই পরম দেবতার ইচ্ছা হইল যে আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব,

সেয়ং দেবতা ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়
সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।

(ছান্দোগ্য)

এই এক হইয়াও নিরুপম ও অসীম আত্মসৌন্দর্য্যের অনুভবের জন্য জীব ও জড়রূপে আবির্ভূত হইবার যে ইচ্ছা, তাহাই হইল সেই দেবতার—ক্রীড়া বা লীলা। ইহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আদিদেব আত্মরূপ দেখিবার জন্যই এইভাবে বহু হইতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার ত কোন প্রমাণ নাই। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাই বহু হইয়াছেন ইহাই উক্ত উপনিষদ্ হইতে বুঝা যাইতেছে। সেই বহু হইবার ইচ্ছা যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যনিধান আত্মরূপ দেখিবারই ইচ্ছা হইতে হইয়াছিল তাহাতে ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এই প্রকার শঙ্কারই নিরাকরণ করিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছে—

সৃষ্ট্বা পুরানি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাববোধধিষণং মুদমাপ দেবঃ।

(ভাগবত)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই দেব নিজ অনাদি শক্তি দ্বারা জীবভাবে বাসোপযোগী বিবিধ পুর অর্থাৎ শরীরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুর কিরূপ ? বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশুপক্ষী, মশক ও মৎস্য প্রভৃতি শরীরই সেই বিবিধ পুর হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল পুর নির্ম্মাণ করিয়াও তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যদেহরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, অন্য সকল প্রকার পুররূপ শরীরসমূহ হইতে মনুষ্যশরীররূপ পুরের এমন কি বিশিষ্টতা, যে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন ? তাহার উত্তর এই যে,. মানবেরই বুদ্ধিতে ব্রহ্মের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই রসরূপ পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে, এই কারণেই তিনি তাহা নির্ম্মাণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভাগবতের এই

শ্লোকটী স্পষ্টভাবে ইহাই বলিতেছে যে, ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যের পরিপূর্ণতা মনুষ্যদেহসৃষ্টি দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ মনুষ্যদেহে জীবরূপে প্রবিস্ট হইয়া তিনি নিজ বিভূতিময় অনুপম সৌন্দর্য্য ও মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হিন্দু সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি কি, তাহাও এই শ্লোকটীতে যেমন সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তেমন আর কোন আর্ষবাক্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মানবজন্মের সফলতা ভোগবিলাসের উপর—বা ভোগবিলাসের উপযোগী দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতিমূলক সভ্যতাবিস্তারের উপর—নির্ভর করে না, মানব ধনার্জ্জন করিয়া—ইন্দ্রিয়সামর্থ্যানুসারে সুখ ভোগ করিতে পারিলেই—মানব হয় না—আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সভ্যতানামক কৌশলের বলে বিভিন্ন জাতির মানবসমূহের মধ্যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই যে মানব, পূর্ণ মানব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহাও নহে, কিন্তু এই দেহ লাভ করিয়া মরণের পূর্ব্বে একবারও যদি আত্মার আত্মা সর্ব্বসৌন্দর্য্যলীলানিকেতন সেই ভূমা ব্রহ্মকে আত্মবুদ্ধিতে প্রতিফলিত করিয়া—হাসিতে হাসিতে শান্তভাবে এই সংসার হইতে চরম বিদায় গ্রহণ করিতে পারে, তবেই মানবের জন্ম সার্থক, শুধু তাহারই জন্ম যে সার্থক, তাহা নহে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা—
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।

সে যে কুলে জন্মে সেই কুল পবিত্র, তাহার জননী কৃতার্থা, তাহার জন্মে পৃথিবীও পুণ্যবতী হয়। তাই বলিতেছিলাম ভগবানের আত্মসৌন্দর্য্যের অনুভূতির জন্য এই বিশ্বসৃষ্টিই মায়া বা লীলা বা ক্রীড়া—তাই উপনিষদ্‌ও বলিতেছে—

অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

এই কারণে সেই মায়াময় এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে

সেই পরমেশ্বর মায়াসমূহের প্রভাবেই বহুরূপধারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।

ক্রীড়ন্ রমমাণঃ

তিনি ক্রীড়া করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

এই সকল উপনিষদ্ হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, যাঁহার জীব ও জগৎ এই দুই স্বরূপে পরিণত হইবার ইচ্ছাই ক্রীড়া বা লীলা, সুতরাং সেই প্রকাশাত্মা ও ক্রীড়নস্বভাব পরমাত্মাই দেব শব্দের প্রতিপাদ্য। ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকটী ভগবান্ বেদব্যাসেরই যে কল্পনাপ্রসূত তাহা নহে, উপনিষদেও এই বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে এবমেবৈষ
প্রজ্ঞ আত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ,
আলোমভ্য আনখেভ্যঃ তমেতমাত্মান
মেত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ
তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈ র্ভুঙ্‌ক্তে যথা বাস্বাঃ
শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈঃ আত্মভিঃ
ভুঙ্‌ক্তে। এবং বৈ তমাত্মানং এত আত্মানোভুঞ্জন্তি।

(কৌষীতকী উপনিষদ্)

বিশ্বম্ভর দেব এই ভাবে বিশ্বম্ভরকুলায়ে বাস করিতেছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ আত্মা এই রূপে শারীরাত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সেই বিশ্বম্ভর আত্মাকে শরীররূপী আত্মসমূহ অনুভব অর্থাৎ ভোগ করিয়া থাকে, যেমন শ্রেষ্ঠীকে তাহার আত্মীয়গণ ভোগ করিয়া থাকে। সে কিরূপ? যেমন শ্রেষ্ঠী আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করে, অর্থাৎ আত্মীয়গণ শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে এবং শ্রেষ্ঠীও আত্মীয়গণকে ভোগ করে, সেইরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ আত্মা এই সকল শরীরময় আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আবার শারীরাত্মগণও তাহাকে ভোগ করিয়া থাকে। এই যে পরস্পর ভোগ—ইহাই হইল সেই বিশ্বম্ভর পরমাত্মার বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই ভোগ যদি যথাবিধি বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলেই পরমাত্মার সৃষ্টি সফলতা প্রাপ্ত হয়, সেই ভোগের বিশুদ্ধি কি তাহা উপাসনাতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে যথাযথ ভাবে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই দেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, হিন্দুমাত্রেই তাঁহারই পূজা বা উপাসনা করিয়া থাকে। অথচ হিন্দুধর্ম্মে উপাস্য দেবতা তেত্রিশ কোটি বা অনন্ত ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এই আপাততঃ প্রতীত বিরোধটীর পরিহার কি তাহা না জানিলে, হিন্দুর দেবপূজা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না। সেই কারণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছে—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—

সেই আরাধ্য দেবতা অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব্ব জীবেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা। তিনি সকল বস্তুরই দ্রষ্টা এবং সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

থাকে। তিনি উদাসীন, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই একমাত্র সৎ। অথচ তিনি সর্ব্ব প্রাকৃতগুণ বিরহিত।' ইহাই হইল সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্য দেবতত্ত্ব। সুতরাং আমরা যে কেহ যে কোন ভাবে যে কোন দেবতার উপাসনা করি না কেন, সকলেই সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অদ্বিতীয় চৈতন্যজ্যোতিরই উপাসনা করি তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাসনার প্রকারভেদ থাকিলেও, নিজ নিজ সংস্কার ও ভাবিবার সামর্থ্যের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হইলেও, আমাদের সকলেরই উপাস্যবস্তু যে এক, তাহাই এই উপনিষদবাক্যটী নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন করিতেছে। সেই দেবই যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর রুচি, সংস্কার ও শুভাদৃষ্ট বিশেষের তারতম্যানুসারে নানারূপে আত্মাকে প্রবিভক্ত করিয়া নানা দেবপদবাচ্য হইয়া থাকেন, তাহাও উপনিষদ্ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে—

য একোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগা
দ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
মনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

(শ্বেতাশ্বতর)

যিনি এক ও বর্ণনাতীত, তিনি নানা শক্তি যোগে কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, বহু বর্ণনীয় রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তকালে প্রথমে বিশ্ববিলয়ের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করুন। কিরূপে বহু শক্তির সাহায্যে, তিনি নানা আকারযুক্ত হইয়া থাকেন তাহাই বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ বলিতেছে—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য
স্তদ্‌বায়ুস্তচ্চচন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম
তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।

সেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ দেবতাই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, প্রজাপতি, চন্দ্র, শুক্র, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদপুরুষ ও বরুণ হইয়া থাকেন। সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ্ বলিতেছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

তুমি স্ত্রী হও, আবার তুমিই পুরুষ হও, তুমিই কুমার হও, আবার তুমিই কুমারী হও, তুমিই

বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের দ্বারা পশুপক্ষী প্রভৃতি তাড়াইয়া থাক, আবার তুমিই বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

কোন উদ্দেশ্যবিশেষ সিদ্ধির জন্য তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। আবার সেই সেই দেবতার উপাসকরূপে তিনিই কুমার, কুমারী, যুবা, যুবতী, এবং বৃদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই ভাবে ভিন্নরূপে উপাস্য ও উপাসকের ভাবস্রোতে জগতকে প্লাবিত করিয়া ক্রীড়ানন্দ অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করাই যে সেই পরম দেবতার উদ্দেশ্য, তাহাই এই দুইটী মন্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে। কেবল যে বেদের উপনিষদ্‌ভাগে এই এক দেবতারই বহুভাবে প্রকাশের কথা লিখিত হইয়াছে তাহা নহে। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে এই ভাবের বর্ণনা অতি স্পষ্টভাবেই আছে তাহা দেখা যায় যথা—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

দেবতাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই এক সদ্‌বস্তু পরমেশ্বরকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাকেই স্বর্গীয় শোভন পক্ষশালী গরুত্মান্ আদিত্যরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন। সেই সদ্‌বস্তু পরমেশ্বরকেই তাঁহারা অগ্নি, যম ও বায়ুরূপে উপাসনা করিতে বলিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদেও দেখা যায়—

তদ্ যদিদমাহুরমুং যজ অমুং যজ ইত্যেকৈকং দেবং। এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিঃ এষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।

এই যে এক একটী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞিকগণ বলিয়া থাকেন যে ইঁহাকে পূজা কর, উঁহার উপাসনা কর, সেই সকল বিভিন্ন দেবতা সেই এক পরমদেবতারই বিসৃষ্টি, সেই একমাত্র পরম পুরুষরূপ দেবই সর্ব্বদেবস্বরূপ হইয়া থাকেন।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে পৃথক্ দেবতা বলিয়া উপাসিত হইলেও সমগ্র উপাসকগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তরাত্মা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ। তিনিই প্রকাশ ও প্রকাশয়িতা, এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি তাহার ক্রীড়ামাত্র।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

অন্নচিন্তা

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৩২৭ সালের চৈত্রসংখ্যা "নব্যভারত" পত্রিকায় "ভাতকাপড়ের শনি" শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধে আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব ও পল্লীসমাজের দুরবস্থার বিষয় যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি না পড়িলে শনির দৃষ্টি ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইবেই। পৃথিবীর ধনরত্নগর্ভা কোন দেশই শনির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, কিন্তু যাহারা সচেতন তাহাদের উপর দীর্ঘকাল ইহার প্রকোপ স্থায়ী হয় নাই। আমরা তিমির-অবগুণ্ঠনের মধ্যে বসিয়া বহুকাল কাটাইয়াছি, তাই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষের মতন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে অসংখ্য নরনারী এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করে, পেটের দায়ে ছেলেপুলে বিকাইয়া দেয়।

কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, আধুনিক কালের বড় নগরগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল আয়োজনের নমুনা দেখিয়া আমরা অনেকে মনে করিয়া বসি দেশের সমৃদ্ধি বাড়িতেছে। কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্য সরকারী নথীপত্রের ও অর্থনীতিশাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হয়। অবাধবাণিজ্যনীতির দ্বারা ইংরেজ আমাদের অগাধ টাকাকড়ি অর্জ্জন করিবার সুযোগ দিয়াছে; পশ্চিমের হাটে মালপত্তর বিকাইয়া আমরা কেহ কেহ ধনপতিও হইতেছি। অতএব সিদ্ধান্ত এই, ভাতকাপড়ের শনি আর নাই; ইংরেজশাসনে সে আর ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না।

আসল সত্যটি অনেকের চোখে পড়ে না। দেশের কতগুলি লোক অভুক্ত থাকে, শতকরা কতজন ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, তাহার খবর রাখে কে? যদি কেহ এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া শনির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তবুও 'খাই-দাই-তাস-পিটাই' শ্রেণীর লোকেরা কথাটা কানে তোলেন না। আর, সরকারপক্ষীয় মুরুব্বিরা বলেন ওসব কল্পনাপ্রিয় শিক্ষিত ভারতবাসীর কল্পনা মাত্র। দুঃখদারিদ্র্যের কথা সরকারের মজলিসে বলিতেন, মহাত্মা গোখ্‌লে; তিনি একবার ভারতবাসীর বাৎসরিক আয়ের কথা উত্থাপন করিলে সদর খাতাঞ্চী যে জবাবটা দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—মিষ্টার গোখ্‌লের মুখে কেবলই এক কথা, হাতে টাকা নাই, পেটে ভাত নাই, দেহে বস্ত্র নাই। এদিকে দেশের সমৃদ্ধি যে বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার হিসাব তিনি দেখেন না। জমির খাজনা, আব্‌কারীর ট্যাক্স, পোষ্টাফিসের আয় ক্রমশঃই ত বৃদ্ধি পাইতেছে। মেঘমুক্ত আকাশ, রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি ঝলমল করিতেছে;—এমন দিনে বৃষ্টি হইতেছে মনে করিয়া যদি কেহ ছাতা মাথায় দিয়া চলে, তাহাকে ত লোকে পাগল বলে।

এই সে-দিন খুলনায়—তার কিছুকাল পূর্ব্বে বাঁকুড়ায়—এমন করিয়া প্রতি বৎসরই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। খুলনা হইতে খবর আসিল অন্নবস্ত্রের কষ্টে লোক মরিতেছে,—দেশের ধনী ও সরকার খবরটা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। তারপর, যখন চীৎকার ও আর্ত্তনাদ কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাজস্বভাণ্ডার হইতে কিছু ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল মাত্র।

সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই একাদশীর পালা ও যমের খেলা চলিতেছে—যেন কেবল এই বোধ জন্মাইয়া দিবার জন্য যে, ভারতবর্ষে ভাতকাপড়ের শনি দুর্লক্ষ্য রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে—গৃহস্থ, সাবধান!

এমন দুরবস্থা ঘটিল কেন? পনরআনা লোক ইহার জবাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিবেন—"কর্ম্মফল", সংস্কৃত ভাষায় কেহ বলিবেন "নিয়তি"। কিন্তু এমন উত্তরে মনও বোঝে না, সমস্যাও জটিল হইতে থাকে। বিষয়টি একটু তলাইয়া বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

বিজয়বাবুর সিদ্ধান্ত এই "দেশের লোক একেবারে পঙ্গু হইয়াছে; উহারা নড়িতে চড়িতে না শিখিলে স্বরাজ আনিতে পারিবে না। আমাদের আজন্মের বাঁধন যে আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে ও দাসত্বের বুদ্ধিকে মধুর করিয়া দিয়াছে, তাহা না বুঝিলে সকল উৎসাহের কাজ পণ্ড হইবে। আমাদের ভাতকাপড়ের শনি, আমাদেরই শরীরের ও সমাজের কেন্দ্রে।"

আমি এই কথাটাই একটু ভাষান্তর করিয়া বলিতে চাই। শনির বিষদৃষ্টি পড়িলে দেশের লোক একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িতে লাগিল। উহারা খাইয়া পরিয়া মানুষের মতন নড়িতে চড়িতে পারিলে শনির শাসন বদ্ধমূল হইতে পারিবে না; অতএব বাঁধন আরো শক্ত করিয়া আঁটিয়া আমাদিগকে পরাধীনতায় এমনই বশ করিল যে দাসত্বের বুদ্ধিকে মধুর করিয়া দিল। ইহা আমরা জানিয়াও বুঝিলাম না—তাই আমাদের সকল কর্ম্ম-চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সকল উৎসাহের কাজ ইন্ধন না পাইয়া নিভিয়া যায়। আমাদের ভাতকাপড়ের উপর শনির বিষদৃষ্টি পড়িল বলিয়াই আমাদের শরীরের ও সমাজের কেন্দ্রে বিষ জমিয়া উঠিয়াছে; আর, এই বিষের ফলেই সমস্ত দেশ মৃতপ্রায়।

এত দেশ থাকিতে শনির দৃষ্টি ভারতবর্ষে পড়িয়া এত দীর্ঘকাল ইহার প্রকোপ স্থায়ী করিল কেমন করিয়া? এ-দেশের ধনরত্নের খবর পাইয়া গজনীর মামুদ আসিলেন, তারপর পাঠানেরা আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিল। সে রাজ্যে ঘুণ ধরিতে না ধরিতে মোগল আসিয়া স্থানাধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু এই বাহিরের উপদ্রব ত সমাজের কেন্দ্রে আঘাত করে নাই—পাঠান ও মোগল ধনদৌলত টাকাকড়ির লোভে রাজ্যশাসনের জাল বিস্তার করিলেও তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ অন্য সূত্রে গ্রথিত হইতেছিল, তাহারা ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া চিনিয়া লইল, এবং এই দেশেই তাহারা বসবাস করিয়া ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইবে এমন লক্ষণও দেখা দিল; কিন্তু, কাজটা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মোগলসাম্রাজ্যে ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে।

এদিকে রাজশক্তির বাহন ছিল মোগলেরা। ইহাদের উপর দেশের কর্ত্তৃত্বভার দিয়া

আমরা সামাজিক গণ্ডীর আশ্রয়ে দিন কাটাইতে লাগিলাম। মনে হইল, বাদশাহের আমলে দিন কাটিবে ভাল। আমরা নিশ্চিন্তমনে যাগযজ্ঞ ধর্ম্মানুষ্ঠান আচারবিচার লইয়া থাকিব, আর, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্যশাসন-বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান লইয়া মাথা ঘামাইবে মোগলেরা। এই নির্ভরশীলতার জন্য আমাদের সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শিথিলতা দেখা দিল—তারপর যখন সে আশ্রয় ভাঙ্গিয়া চলিল, তখন হাতের কাছে যাহাকে প্রবল বলিয়া ঠেকিল আমরা তাহাকেই রাজসিংহাসনে বসাইলাম। নিজেদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থার জন্য যাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দেশটাকে তুলিয়া দিয়া আমরা আবার নিশ্চিন্ত মনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গবেষণায় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার সংরক্ষণে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসিয়াছিল কয়েকটা কুঠী বসাইয়া ভারতবর্ষের মালপত্তর বিদেশে পাঠাইতে; ব্যবসাবাণিজ্য ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। তারপর, দেশের অসহায় অবস্থা দেখিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের মনে রাজা হইবার সখ জাগিয়া উঠিল।

এই কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে, মূলধন সত্তর হাজার পাউণ্ড। যে সব প্রদেশে মোগল রাজত্বের দখল পাকা, সেখানে ইঁহারা বড় বেশী গা ঘেঁষিলেন না। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের কেল্লাটা নিজেরাই নির্ম্মাণ করিলেন; দ্বিতীয় চার্লসের হাত হইতে বোম্বাই দ্বীপটা কিনিয়া লইলেন, ও ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে কারখানাও বসাইলেন। তারপর যখন খোঁজ পাইলেন ভারতবর্ষের শস্যভাণ্ডার বাংলা দেশ, আর সূক্ষ্ম কাপড়, উৎকৃষ্ট রেশম, কাপড় রং করিবার জন্য নীল এই সমস্তই পাওয়া যায় এই বাংলাদেশে, তখন ধীরে ধীরে তাঁহারা বাংলায় ব্যবসার ফাঁদ পাতিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী বসিল।

এদিকে য়ুরোপ হইতে যাহারা বাণিজ্যের সন্ধানে এসিয়ায় আসিয়া উপস্থিত, ফরাসীরা তন্মধ্যে একজন। কোম্পানী দেখিল এই উৎপাৎ দূর করিতে না পারিলে ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া গোল ঘটিতে পারে। ফরাসীদেশ তখন য়ুরোপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই অন্যান্য রাজশক্তি ইহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য লড়াইয়ের ষড়যন্ত্র করিল। ফল হইল এই, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষে কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার উপযুক্ত আর কেহ রহিল না; নিশ্চিন্তমনে কোম্পানী একচ্ছত্র বাণিজ্যের বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

বাংলাদেশে ভাতকাপড়ের শনি লাগিল ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে। তখন ছত্রভঙ্গ নবাবেরা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের হাতে একেবারে নিঃসহায় ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে; আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশটার উপর দিয়া দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া চলিল। কোম্পানীর কর্ত্তারা নবাবের ভাণ্ডার হইতে নানা উপায়ে নানা অজুহাতে টাকা আদায় করেন; নবাবের কর্ম্মচারীরা লণ্ডভণ্ড রাজত্বের সুযোগ পাইয়া লুট করে দেশবাসীকে। এমন করিয়া দেশের অর্থবলের যে হানি হইল, আজ পর্য্যন্ত সেই ক্ষতির পূরণ হইতে পারে নাই।

কোম্পানী ৭০,০০০ পাউণ্ড মূলধন লইয়া যে ব্যবসার পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কত লাভ করিয়াছিলেন সে হিসাবের খোঁজ রাখিনা, তবে ভারতজাত তৈজসপত্র বেচা-কেনা অপেক্ষা নির্বীর্য্য নবাবের বংশধরদের এখানে-সেখানে গদিতে বসাইবার ব্যবসাটায় বেশ মোটা লাভই হইয়াছিল। যথা ;—পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফরকে নবাব হইবার সেলামী দিতে হইল ১,২৩৮,৫৭৫ পাউণ্ড ; মীর কাশিমকে দিতে হইল ২০০,২৬৯ পাউণ্ড। ইহা ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে লড়াইয়ের খরচ হিসাবে তাহাকে ৫০,০০০ পাউণ্ড "দান" করিতে হইয়াছিল। মীরজাফরকে পুনর্ব্বার গদিতে বসাইয়া কোম্পানী পাইলেন ৫০০,১৬৫ পাউণ্ড ; আর নাজিমদ্দৌলাকে দিতে হইল ২৩০,৩৫৬ পাউণ্ড। অর্থাৎ আট বছরের মধ্যে সেলামীর পরিমাণ হইল ২,১৬৯,৬৬৫ পাউণ্ড ; ইহা ছাড়া লড়াইয়ের খরচ, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি বাবদ কোম্পানী ৩,৭৭০,৮৩৩ পাউণ্ড আদায় করিয়াছিলেন।

এমন করিয়া দেশের টাকা বাহিরে গিয়াছে। তারপর ব্যবসাবাণিজ্যের উপর শুল্ক, জমিজমার খাজনা প্রভৃতি নানা পথ দিয়া আমাদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গেল। ভাতকাপড়ের সংস্থান করিবার মূল শিকড়কে জখম করিয়া দিবার পর হইতেই আমাদের সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুকাইয়া মরিতেছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মতন দরিদ্র আর কোন সভ্যদেশ নাই। এত নিরক্ষরও আর কোথাও দেখা যায় না। কোথায় সকল সভ্যদেশেই জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, আর ভারতবর্ষে গত চল্লিশ বৎসরে ৫০,০০০,০০০ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র। স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের পথ দুর্গম ; দেশের শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। জোলা, তাঁতী, কামার এখন সহরের কলকারখানায় চাকুরী করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিতেছি পৃথিবীর সকল দেশেই কৃষিকর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে কিন্তু শস্যের ফলন (yield) ক্রমশঃ কমিতেছে ; কোন কোন অঞ্চলে চাষ উঠিয়াও যাইতেছে। চাষবাস করিয়া আর দুইবেলার অন্ন সংস্থান হইতেছে না। ফসল যাহা হয় তাহা বেচিয়াও যে টাকা আসে, তাহার উপর বহুসংখ্যক পরভোজীরা ভাগ বসায় বলিয়া চাষী বিশেষ কিছু পায় না। এই সমস্ত সমস্যার মূল হইল দেশের নিম্নস্তরে অর্থভাণ্ডার একবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সহরে বসিয়া ইহা কল্পনা করা একটু আয়াসসাধ্য, কিন্তু যাঁহারা পল্লীর সহিত পরিচিত তাঁহারা ত জানেন ভাতকাপড়ের শনি কোথায় লাগিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, অর্থদৈন্যের নিষ্পেষণে আমরা প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জীবন কংসকারাগারে পাথরচাপা হইয়া থাকিলে ভাতকাপড়ের শনির গ্রাস হইতে দেশকে উদ্ধার করিব কেমন করিয়া ? আমি দেশের যুবকদলকে বলিতেছি। তাহাদের মধ্য হইতে একদল প্রাণবন্ত সজীব কর্ম্মী না পাইলে ত গ্রহশান্তির ব্যবস্থা হইবে না। অতএব, "আমরা মরিতেছি," "আমাদের মারিতেছে," "আমাদের মারিওনা" কেবল এই আর্ত্তনাদ করিয়া

আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিব না। ভাতকাপড়ের শনি কোন্ পথ দিয়া কি ভাবে এমন করিয়া আমাদের ঘরেবাহিরে স্থানাধিকার করিল, আর কোন্ পথ দিয়া কি উপায়ে তাহাকে সাম্‌লাইতে হইবে, আজ তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। দেশের যুবকেরা এই বিষয় আলোচনা করুন; পৃথিবীতে যুগে যুগে কালে কালে যাহারা মুক্তির মন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সকল বন্ধন ছেদন করিবার শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করুন; ভাতকাপড়ে যে শনি লাগিয়াছে, আমাদের চিত্তে যেন তাহার ছোঁয়া না লাগে। ভাতকাপড়ের শনির গ্রাস হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে যে শক্তি চাই, যে জীবন চাই, আজ তাহা লাভ করিবার জন্য দেশের কর্ম্মিগণ প্রবৃত্ত না হইলে কিছুতেই এই নির্বীর্য্য দেশের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। আর যদি রাগে অথবা অভিমানে উত্তেজিত হইয়া দেশোদ্ধারের জন্য কেবলই চীৎকার করি, তবে ভাতকাপড়ের শনি আমাদের অস্থিকঙ্কালগুলিকেও একদিন পৃথিবী হইতে লোপ করিয়া দিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দরবেশ

বিশটি বছর আগেকার সেই
কোকিলের ডাক শোনা,
ফুরায়েছে আজি সেই মধু মাস,
রৌশনী-আনাগোনা।
কুহকী দু'পুরে পরীবালা সনে
বনে-বনে ফুল তোলা,
ঝরণা-চপল উপল-খণ্ডে
সুরে সুরে দিল্-ভোলা।
কল্পনা-রাণী যাদুকরী সম
আশার মুখস্ পরি'
নিমেষে-নূতন-রূপের-প্রবাহে
দিত পথ ভুল করি'।
জোয়ার জাগায়ে ধ্যানের সাগরে,
মম মনঃ-উর্ব্বশী
দিত হাতছানি,—দেওদার বনে
ইশারা করিত শশী।
চোখে চোখে সেই আলো-লুকোচুরী
খুসির খেয়াল শেষ,
দরদী দুনিয়া দাগ দিয়ে গেছে,
সাজায়েছে দরবেশ।
ওরে মুসাফীর, নেশায় ফকীর,
দ্বারের বাহির থেকে
চুপি চুপি ও সে বাঁশীর পিয়ার
কখন গেল রে ডেকে।
ব্যথার আগুনে গুমরি' গুমরি'
সোহাগের সে অগুরু
ছাই হয়ে গেছে,—দেখ হাত দিয়ে
এ বুকের দুরু দুরু।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

পরেশ-পাথর

(গল্প)

চন্দনপুর-গ্রামে যখন মহা হুলুস্থূল চলছে—সহর থেকে একদল টেরি-কাটা ছেলে এসে জুতো-জামা খুলে গ্রামের উন্নতি-সাধন করতে লেগে গেছে—কেউ কোদাল হাতে, কেউ কুড়ুল হাতে বন-জঙ্গল সাফ করতে, কেউ পাঠশালা খুলে ছেলে পড়াতে ; ঘরে-ঘরে যখন ঘর্ঘর চরকা চলছে, সেই সময় বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন গ্রামে পরেশনাথের আবির্ভাব হলো—হাতে-কাটা মোটা সুতোর ধুতি চাদর জামা টুপি পরা। পরেশ এই গ্রামেরই ছেলে। এতদিন সে গ্রাম ছেড়ে কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে নানারকম কথা শোনা গেছে। কেউ বলে চা-বাগানের আড়কাঠি তাকে কুলি কোরে চালান দিয়েছে ; কেউ বলে জাহাজের খালাসি হয়ে সে কাফ্রিদের দেশে চলে গেছে—সোণার খনি খুঁজতে ; কেউ বলে, কি একটা দলিল জাল করার জন্যে তার জেল হয়েছে। কিন্তু আজ সে সব কথা চাপা পড়ে গেল। গ্রামের লোক স্বদেশী কাজের উন্মাদনায় এত তন্ময় বিভোর যে সে সব খোঁজ নেবার কেউ কোনো তাগিদ অনুভব কর্‌লে না ; সবাই বলে উঠলো—"এস, পরেশ এস ! এম্‌নি কোরে কি মাতৃভূমিকে ভুলে থাকতে হয় ভাই ?" পরেশ সেই কথা শুনে অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসে সকলকে একে-একে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌তে লাগল—"আর কি ভাই, ভাইকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি ? মায়ের ডাক এসেছে যে !" বলেই সে গলা-ছেড়ে গেয়ে উঠলো—

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।"

গাইতে-গাইতে সুরের উৎসাহে দুই হাত তুলে তার নৃত্য আরম্ভ হলো। পরেশের সেই গান, সেই সুর, সেই নৃত্য এমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করলে যে সকলেরই মন তার দিকে টলে পড়ে একবাক্যে বলে উঠল, হাঁ, স্বদেশী কাজে এইবার একটা সত্যিকার উৎসাহী লোক পাওয়া গেল ! তখন পরেশকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হলো। কেউ বল্লে, দাদা, চরকাটা যাতে ভালো-রকম চলে তুমি তার একটা উপায় কর। কেউ বল্লে, ভাই, গ্রামে জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারের ভার তুমিই নাও। কেউ বল্লে, গ্রাম থেকে যাতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দূর হয়, তার ব্যবস্থা তোমার হাতেই আমরা দিলুম। পরেশ আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—"ভাই, তোমাদের সব অনুরোধই আমি মাথা পেতে নিলুম। তোমরা যে সৌভাগ্য আমায় দান কর্‌লে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তার যোগ্য যেন আমি হ'তে পারি।. কিন্তু ভাই, আমার একার দ্বারা কি হবে, কতটুকু হবে ? দেশমাতৃকার এই গুরুভার আমি একা এই দুর্ব্বলহস্তে কি কোরে বহন কর্‌ব—তোমরা সবাই যদি না আমার সহায় হও ? আমি

তো সামান্য; তোমাদের সকলকার শক্তিতে আমাকে শক্তিমান করে না তুল্লে আমার সাধ্য কতটুকু ভাই! তোমরাই সব—আমি উপলক্ষ মাত্র বৈ ত নয়!"

পরেশের এই বিনয়ে সবাই মনে-মনে খুসি হলো, এবং নিজেরা যে নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, সে জন্যে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব কর্‌লে। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো—"তার জন্যে ভেবোনা পরেশ! তোমার পাশে আমরা অচল, অটল হয়ে থাকব।"

পরেশ বল্লে—"ব্যস! আর কিছু চাই না; এস মায়ের নাম নিয়ে আমরা ভায়ে-ভায়ে আর-একবার কোলাকুলি করি।" এই বোলে সে উন্মাদের মতো এর কাছ থেকে ওর কাছে ছুটে-ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল।

গ্রামের লোক পরেশকে নেতৃত্ব দিয়ে মনের মধ্যে ভারি একটা সোয়াস্তি অনুভব কর্‌লে। এতদিন তাদের বুকের মধ্যে দেশ-সেবার একটা দারুণ আগ্রহ তাদের পীড়া দিচ্ছিল, কিন্তু কাজে অগ্রসর হবার মতো সাহস কেউই সঞ্চয় করে উঠতে পারছিল না, সবাই পরস্পরের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছিল—কেউ বলে উঠুক আমি এ ভার নিলুম! কিন্তু একথা কারুর মুখ দিয়ে বার হচ্ছিল না;—ভার নেওয়ার মধ্যে কি যেন একটা অজানা দায়িত্বের ভয় সকলের মন কুঁকড়ে দিচ্ছিল। সবাই কাজ করতে রাজি—প্রাণপণ কোরে, কিন্তু এগিয়ে সামনে দাঁড়াতে কারুরই পা উঠছিল না। তাই পরেশকে সাম্‌নে ঠেলে দিয়ে তারা যেন নিশ্চিন্ত হলো।

এই সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস ছেলেবেলা থেকেই পরেশের আছে। সেই জন্যে গ্রামে এককালে ছেলেদের মহলে সব বিষয়ে সে নেতৃত্ব করত। সেই ছেলের দলই তো এখন কর্ত্তার আসন দখল করেছে, কাজেই পরেশকে তার পুরানো সিংহাসনখানি খুঁজে বার করে নিতে বিশেষ আয়াস করতে হলো না। গ্রামে পদার্পণ করেই মুহূর্ত্তমধ্যে সে নিজ-রাজ্য জয় করে নিলে।

পরেশের ছেলেবেলাকার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এইটুকু জানা যায় যে, সে কখনো রীতিমত বিদ্যার চর্চ্চা করেনি বটে, কিন্তু তাই বলে বিধাতা তার বুদ্ধির ভাণ্ড এতটুকু অপূর্ণ রাখেন নি। এবং তার সাহসেরও অভাব ছিল না। দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় হলেও এই স্বাভাবিক সাহসের জোরে ছেলেবেলায় সে অনেক পালোয়ান ছেলেকে হটিয়ে দিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য করেছে;—তার মধ্যে বুদ্ধির প্যাঁচটাই ছিল প্রধান। দরকারের সময় এমন সব ন্যায়-অন্যায় নানারকম কৌশল সে আবিষ্কার করত যার জন্যে পাশের গ্রামের ছেলেরা মারামারিতে, দলাদলিতে, বারোয়ারিতে—কোনোখানেই পরেশের দলের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত না; বরাবর তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। ছেলেমানুষ পরেশ, হার যাতে না হয়, তার জন্যে এমন সব ফন্দি কর্‌ত, যা শুনে অন্য ছেলেরা শিউরে উঠতো। সে-সব কাজে জেলের ভয়, এমন কি ফাঁসির ভয়কেও পরেশ হাসিমুখে অগ্রাহ্য করত। সবাই তার সাহস দেখে অবাক হয়ে থাকৃতো, কেউ কিছু বলতে পারত না। কাজেই চন্দনপুরের মানসম্ভ্রমকে পরেশ যে দিন দিন প্রাণপণে বাড়িয়ে তুলেছে, এ-কথা ছেলেবুড়ো সবাইকে স্বীকার কর্‌তে হতো।

সেইজন্য পরেশের উপর তাদের একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস এতদিন পরে পরেশকে দেখ্‌বামাত্রই আবার জেগে উঠল, এবং তার গলায় বরমাল্য দিতে কারো কোনো কুণ্ঠা বোধ হলো না ; বরং সকলেরই মনে হলো আজকের এই স্বদেশীর দিনে চন্দনপুরের কর্ত্তব্যের দায় পরেশের জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল—এবং বরাবর যেমন, এখনও সে ঠিক-মুহূর্ত্তেই এসে হাজির হয়েছে। এতদিন যেন সে এর জন্যেই কোথাও গোপনে সাধনা করছিল।

ভীষণ ম্যালেরিয়ায় পরেশের বাপ এবং মা প্রায় একই সময়ে যখন পরলোকে গেলেন—তাঁদের একটিমাত্র ছেলেকে অসহায় রেখে, তার অল্পদিন পরেই হঠাৎ পরেশকে আর গ্রামে দেখতে পাওয়া গেল না। অনেকে বল্লেন, আহা বেচারা বাপ-মায়ের শোকে বিবাগী হয়ে গেল গা ! কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যখন জানা গেল যে গ্রামের একটি অবলাপ্রাণী তার মামার বাড়ী না আর-কোথায় ঠিক পরেশের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়েছে, তখন পরেশের বৈরাগ্যসম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ কর্‌তে লাগল। তারপর সেই প্রাণীটির পরমাত্মীয় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বিধিমত শাসনে গ্রামছাড়া করিয়ে চন্দনপুরের গৌরব ও সৌরভ দুই-ই অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কেবল সন্ধ্যার আসরটাকে মাঝে-মাঝে সরস করবার জন্যে পরেশের সঙ্গে যোগ কোরে তাদের কথাটা উত্থাপন করার দরকার মনে হতো ; সেই সঙ্গে লম্পট, কপট, শঠ—এমনি অনেকগুলো সংস্কৃত বিশেষণ পরেশের উপর ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ত। এখন সে-কথা কেউ বোধ হয় স্বীকার কর্‌বেন না। যখন সম্বাদ পাওয়া গেল পরেশ দলিল জাল কোরে জেলে গেছে, তখন সকলেই একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন যে জেলের আসামী পরেশকে আর গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু পরেশের অলক্ষ্যে যে রায় জারি হয়েছিল তার সাক্ষাতে সে রায় বহাল রাখবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। বরং পরেশকে পেয়ে সকলে এমন আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল যেন সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াতে সকলেই ভারি দুঃখিত ছিল। কেন না, তখন হঠাৎ মনে হতে লাগল পরেশের দুটো অপরাধের কোনটারই প্রমাণ তেমন বলবান নয়—দুটোই মিথ্যা কুৎসা হতে পারে। আর যদি তা নাই হয়, দুর্দ্দান্ত পরেশের মুখের উপর সে সম্বন্ধে কিছু বলবার মতো সাহস কার আছে ?

সে যাই হোক্‌, পরেশের যত দোষই থাক, এখন এই স্বদেশীর দিনে যখন পরেশের মতো সাহসী কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন—দেশমাতৃকার সেবার জন্য, তখন তাকে কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। দোষ না আছে কার ? বড়-বড় কর্ম্মিজীবনে দোষের অন্ত নেই, তাই বলে কি তাঁরা কোথাও অগ্রাহ্য হয়েছেন ?

কাজ আরম্ভ হলো। চরকার প্রচলন, জাতীয় বিদ্যালয়-উদ্‌ঘাটন, ম্যালেরিয়া-বিনাশন প্রভৃতি নানা প্রস্তাব হালদারদের চণ্ডীমণ্ডপে বারবার আলোচিত ও সমালোচিত হ'তে লাগলো। পরেশ খুব একটা বক্তৃতা করে বল্লে—"যতগুলি প্রস্তাব এসেছে সবগুলিই গ্রহণীয়—অবশ্য গ্রহণীয়। কিন্তু সেগুলি গ্রহণ করবার আগে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার রসদ সংগ্রহ করা চাই।"

নবীন বল্লে—"নিশ্চয়! তার জন্যে আমরা চাঁদা তুল্‌ব।" পরেশ বল্লে—"খুব ভালো কথা; কিন্তু এই দরিদ্র গ্রাম উপযুক্ত চাঁদা কি দিতে পারবে? গ্রাম এখন রোগে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ—নিজের দুবেলা আহার জোটাবার সামর্থ্য তার নাই; দান করতে পারে মানুষ তার অর্থের স্বচ্ছলতা থেকে নয়—তার বাহুল্য থেকে। আমাদের স্বচ্ছলতাই নেই, তো বাহুল্য পাব কোথায়?"

সবাই হতাশ হয়ে বল্লে—"তবে উপায়?"

পরেশ বল্লে—"হতাশ হয়ো না—এই বাহুল্য আমাদের অর্জ্জন করতে হবে—উপার্জ্জন করতে হবে। জগতের যত-কিছু বড় কাজ হয়েছে—বিদ্যার প্রসারই বল, স্বাস্থ্যই বল, বড়-বড় ইস্কুল, হাঁসপাতাল যাই বল—এই বাহুল্য থেকেই সম্ভব হয়েছে।"

কথাটায় অনেকেই দমে গেল। যারা ভেবেছিল দুখানা চাঁদার খাতা খুলে গ্রামের মধ্যে অতি সহজে খুব একটা কাজের সমারোহ লাগিয়ে দেবে তারা পরেশের এই উচ্চ ভাব ও ভাষাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে কেমন যেন একটু মুস্‌ড়ে পড়লো। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌লো—"আমরা সামান্য গ্রামবাসী, আমাদের সামান্য চেষ্টায় অতবড় একটা কার্য্য কি সমাধা হবে?"

পরেশ মস্ত একটা ঘুঁসি মাটির উপর ঠুকে বলে উঠলো "খুব হবে—যদি আমাদের সাহস থাকে। কাজ যতই শক্ত হোক—যতই গুরুতর হোক, সাহসের সামনে তাকে পদানত হতেই হবে।"

কথাটা ঠিক। এই সাহসের জোরেই পরেশ ছেলেবেলা কত যে অসাধ্য সাধন করেছে, তার ঠিক নেই। সেই সব কাহিনীগুলো সকলের একে-একে মনে পড়ে তাদের নিজেদের বুকের মধ্যে একটা সাহসের সঞ্চার হতে লাগলো। একা পরেশের উপর নির্ভর কোরে তারা ছেলেবেলায় কত বার তো সফলতা লাভ করেছে—এবারই বা কেন করবে না? এই ভাবতে ভাবতে তারা হৃত উৎসাহ যেন পুনরায় ফিরে পেয়ে বলে উঠলো—"বেশ, তুমি যদি সাহস কর, আমরা রাজি আছি। কি করতে হবে বল?"

পরেশ বল্লে—"টাকা সংগ্রহ করতে হবে—চাঁদা নয়, দান নয়, টাকার উপর সমস্ত আসক্তি রেখেই নিজেদের যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থকে এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে গ্রামের এক জায়গায় একত্র করতে হবে—তারপর সামান্য তৃণগুচ্ছের মতো এই যে একতা, এর শক্তি দ্বারা আমরা বাণিজ্য-ক্ষেত্রের মত্ত রাজহস্তীকে বন্ধন করে আনবো।"

সকলে পরেশের কথার অর্থগ্রহ করতে পার্‌লে কিনা বোঝা গেল না; কিন্তু ঐ যে মত্ত রাজহস্তীকে বন্ধন করা—ওটা যে খুব একটা মস্ত বড় সাফল্য, তার একটা গৌরব সকলকেই চঞ্চল করে তুল্লে। তারা সবাই ঘুঁসি পাকিয়ে বলে উঠলো—"এ কাজ করতেই হবে!"

পরেশ বল্লে—"ব্যস, তবে লেগে যাও কাজে। গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে তোমরা এই বাণী প্রচার কর্‌ যে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় ঘরে-ঘরে যে সঞ্চয় বাক্স-প্যাঁটরার অন্ধকার কোণে অকেজো হয়ে পড়ে আছে তা সকলে আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা তাকে শতগুণ সহস্রগুণ কোরে ফিরিয়ে

দেবো ; তারপর সেই বাহুল্য থেকে আমরা গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় খুলবো, হাঁসপাতাল তুলবো, পুকুর খুঁড়বো, চরকা চালাবো, কাপড়ের কল, তেলের কল, জলের কল—সব রকম কল-কারখানা চালাব—কি না করব ? গ্রামের এই গুপ্ত সঞ্চয় অনাদৃত পোড়ো জমির মতো অনুর্ব্বর হয়ে আছে—তাতে ব্যবসার চাষ লাগিয়ে আমরা সোণা ফলিয়ে দেবো। সেই সোণায় আমাদের গ্রাম দেখতে-দেখতে স্বর্ণমণ্ডিত হয়ে উঠবে—তার উজ্জ্বল আভা তরুণ অরুণ-কিরণকে পরাস্ত করবে।"

পরেশের কথা শুনতে-শুনতে শ্রোতাদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে একটা নবীন গর্ব্বের শিহরণ বহে যেতে লাগল। এই আখ্যাত চন্ননপুর গ্রামের নাম স্বদেশী পতাকার সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে—এ যেন সকলে স্বচক্ষে দেখতে লাগলো। সবাই পরেশের বাহবা দিয়ে উঠলো। বল্লে— "আশ্চর্য্য পরেশের বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা! এমন বক্তৃতা যে দিতে পারে সেই তো সত্যকার নেতা! ধন্য পরেশ! ধন্য এই চন্ননপুর গ্রাম, যিনি এই পরেশ-পাথরকে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন!"

যেমন এই পরেশ-পাথর কথাটি উচ্চারিত হওয়া অমনি শ্রোতাদের উত্তেজিত কল্পনার দ্বার যেন খুলে গেল। সবাই যেন চোখের সামনে দেখতে লাগলো—পরেশ যা স্পর্শ করছে সোণা হয়ে যাচ্ছে। তখন পরেশ যে একটু আগে বলেছিল চন্ননপুর-গ্রাম স্বর্ণমণ্ডিত হয়ে উঠবে সে-কথা আর উপমা বোলে কারো মনে হলো না—প্রত্যক্ষ সত্য বলে বিশ্বাস হতে লাগলো। তারা বলে উঠলো —"পরেশ, তোমায় আর-কিছু বলতে হবে না ভাই, আমরা সব বুঝেছি। এখন কেবল হুকুম কর—আমরা তা পালন করি।"

পরেশ মুখখানাকে অত্যন্ত কাঁচুমাচু কোরে বল্লে—"হুকুম করব—তোমাদের? সে কি ভাই! আমি যে তোমাদের দাস! আমি হুকুম করব কি? ঐ শোনো হুকুম আসছে—মায়ের! তাঁর হুকুম পালন কর।"

সবাই পরেশের ধন্য-ধন্য করতে লাগলো। সে মায়ের হুকুম--দেবীর স্বর্গীয় বাণী স্বকর্ণে শুনতে পাচ্চে—সে তো সিদ্ধ হয়ে গেছে! তখন সিদ্ধপুরুষের পায়ের ধূলো নেবার জন্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। ঠেলাঠেলিতে পরেশের ঠ্যাং খোঁড়া হবার যো হলো!

পরেশ বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে সবাইকে থামিয়ে বল্লে—"থাম, এখন অমন অধৈর্য্য হবার সময় নয়। এইবার আসল কাজের কথা পাড়া যাক। মায়ের নামে শপথ নিয়ে তোমরা এক সেবক-সঙ্ঘ গঠন কর। তারপর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে যার কাছে যা পাও—টাকাকড়ি সোণাদানা সংগ্রহ কোরে আমার কাছে এনে দাও। বল, এ দান নয়, এ ঋণ! এ ঋণ কোনো ব্যক্তিবিশেষ গ্রহণ করছেন না—এ ঋণ গ্রহণ করছেন আমাদের মাতৃভূমি। সামান্য কয়েকটামাত্র বীজ ঋণস্বরূপ গ্রহণ কোরে আমাদের মৃন্ময়ী মা যেমন তা লক্ষকোটিগুণ কোরে ফিরিয়ে দেন—যাতে আমাদের শস্যভাণ্ডার বছর-বছর উপ্‌চে ওঠে, এ ঋণও মাতৃভূমি তেমনি কোরে ফিরিয়ে দেবেন। একগুণ দিলে শতগুণ নয়, সহস্র গুণ ফিরে পাবে। যে এক টাকা দেবে, সে বছরের শেষে বারো টাকা, যে

একশত দেবে সে বারো শত টাকা ফিরে পাবে। এ অলীক স্বপ্ন-কথা নয়, এ বাস্তব সত্য। এর জন্য দায়ী রইলুম আমি—মায়ের সেবক শ্রীপরেশ নাথ সাহা।”

কুঞ্জ তেজারতির কাজ করত, সে এই অসম্ভব লাভের কথা শুনে তাড়াতাড়ি, মনে-মনে সুদ কসার হিসেব কোরে বল্লে—“পরেশ, এ তুমি কি বলছ? একি কখনো হয়? এক টাকায় বারো টাকা!”

পরেশ বল্লে—“অবিশ্বাস! অবিশ্বাস! হায় আমরা ভায়ে-ভায়ে বিশ্বাস হারিয়েছি বলেই তো আজ আমাদের এই দুরবস্থা! এই জন্যই তো আমাদের ব্যবসা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের ধন বিদেশী লুটে নিয়ে যাচ্ছে।”

সবাই বল্লে—“ঠিক!”

কুঞ্জ আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, সবাই হাঁ হাঁ কোরে উঠলো—“পাপিষ্ঠ, মায়ের নামে অবিশ্বাস!”

পরেশ বল্লে—“হাঁ, ঐ মায়ের নাম! ঐ পবিত্র নামের গুণেই একটাকা বারো টাকা কেন, বারোশত টাকা হয়ে উঠবে—যেমন ছোট্ট একটি পদ্মের কুঁড়ি দেখতে-দেখতে শতদল হয়ে ওঠে।”

পরেশের কথা-বলবার কি আশ্চর্য্য গুণ ছিল যাতে চোখের সামনে ছবি ফুটে উঠত। তার কথা শুনতে-শুনতে সবাই যেন দেখতে পেলে এক-একটি টাকা পদ্মের কুঁড়ির মতো শতদল বিস্তার কোরে ফুটে উঠছে। এক যে একশো হতে পারে—এ যেন চোখে-দেখা সত্যের মতো সকলের মনে হতে লাগল।

কিন্তু তবু সন্দেহ যায় না। কুঞ্জ চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলো—“কিন্তু কি কোরে হবে, সেটা বল্‌তে আপত্তি কি?”

প্রশ্নটা সমীচীন বটে, সেইজন্যে কেউ আর এবার কুঞ্জকে বাধা দিলে না। পরেশ যেন একটু চম্‌কে উঠলো। এ-প্রশ্নবাণ তার বুকের উপর এসে পড়তে পারে, এ আশঙ্কা তার হয়েছিল, কিন্তু তার আশা ছিল, এ-বাণ জনতার মুখ থেকেই ফিরে যাবে—তাকে কিছু করতে হবে না। কিন্তু যখন দেখলে কুঞ্জ কোনো বাধা পেলে না, সে যেন একটু হতাশ হলো। সবাইয়ের মুখের দিকে ফিরে-ফিরে সে একবার দেখে নিলে। তারপর একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। পরেশ কি বলে শোনবার জন্যে সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো।

পরেশ অত্যন্ত একটা দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লে—“আমি বলব না। মন্ত্রগুপ্তির রহস্য-ভেদ আমি কিছুতেই হতে দেব না। কারণ তাতে আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। বীজ মাটির মধ্যে গুপ্ত থাকে বলেই সে মহা মহীরুহ সৃজন করতে পারে,—ভারে-ভারে ফসল ফলাতে পারে। আমরা যদি আমাদের এই সংকল্পকে গোপনতার আড়ালে পুষ্ট হতে না দিই তাহ'লে আমাদের ভাগ্যে এক-কণা ফসলও ফলবে না।”

ঠিক ! ছেলেবেলা থেকে পরেশের স্বভাবই এই ! সে কখনো আগে থাকতে কিছু বলে না ; একেবারে কিস্তিমাৎ কোরে বসে ! কোথা দিয়ে কি যে কোরে বসলো আগে থাকতে কিছুতেই টের পাওয়া যায় না। তার দলের ছেলেরা শুধু যোগান দিত মাত্র, কিন্তু কেন যে কি করছে তা বুঝত না, শেষে তার ফল দেখে অবাক হয়ে যেত। সেইজন্য পরেশের এই গোপনতার উপর গ্রামের লোকের একটা বিশ্বাসও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজকে আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠলো। তারা আর কোনো প্রশ্ন করা আবশ্যক মনে করলে না।

নবীন বল্লে—"ব্যস! আর তর্কের দরকার নেই। কি করতে হবে শুধু তাই নির্দ্দেশ কর।"

পরেশ একটা লাল খেরো-মোড়া পুঁটুলি থেকে খানকতক হলদে তুলোট কাগজের খাতা বার কোরে সবাইয়ের সামনে তুলে ধরে বল্লে—"মায়ের নামের এই রসিদ-বই ! যে যা ঋণ দেবে, তার রসিদ এই খাতা থেকে মায়ের নির্ম্মাল্যস্বরূপ দেওয়া হবে। প্রত্যেক রসিদে ঋণের নিয়ম-কানুন লেখা আছে—সুদের তারিখটি পর্য্যন্ত ! কে আছ, এসো—মায়ের এই কাজের ভার নেবে !"

যেমন বলা অমনি একদল ছেলে হুড়মুড় কোরে পরেশের দিকে ছুটলো। পরেশ তাদের নাম একে-একে টুকে, তার পাশে কাকে কোন্ নম্বরের খাতা দেওয়া হলো তা লিখে-নিয়ে, রসিদ-বই বিলি করতে লাগলো। দেখতে-দেখতে বই ফুরিয়ে গেল। তখনো অনেক ছেলে বাকি, তারা হতাশদৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে চাইতে লাগলো। পরেশ বল্লে—"দুঃখ কোরোনা ভাই তোমরা ! মা তোমাদেরও সেবা গ্রহণ করবেন ! তোমরা আমার বাসায় সন্ধ্যার সময় এসো—কাজ দেবো।" যারা ঋণ তোলবার ভার নিয়েছিল তারা কি পদ্ধতিতে কাজ করবে তা ভালো কোরে বুঝিয়ে দিয়ে পরেশ সেদিনকার সভা ভঙ্গ করলে। ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে সেদিনকার মতো কাজ শেষ হলো।

* * *

মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই একমাস কাল গ্রামের ছেলেরা প্রাণপণে ঋণ তুলছে ;—খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, শোওয়া নেই, তারা গৃহস্থের ঘরে-ঘরে গিয়ে কোথাও লোভ দেখিয়ে, কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও ধর্ণা দিয়ে দু-আনা, চার-আনা, দুটাকা, দশটাকা যা পাচ্ছে জড়ো করে এনে পরেশকে দিচ্ছে। পরেশ বলছে, আরো চাই, আরো চাই ! তারা আবার ছুটছে। জোলা জেলে কামার কুমোর তাঁতি তেলি—এমন কি অন্ধ আতুর বৈষ্ণব ভিখারী ফকির কাউকে তারা বাদ দিচ্ছে না। যার কাছ থেকে যা পাচ্ছে এনে পরেশকে দিয়ে যাচ্ছে। সব-প্রথম যেদিন গ্রামের কানা-ভিখিরী নেত্য তার অনেক কষ্টে জমানো চার আনা পয়সা এই ঋণ-ভাণ্ডারে অর্পণ করলে, সে-দিন পরেশ বল্লে—"আজ ঘরে-ঘরে হুলুধ্বনি কর, শঙ্খ বাজাও।" সেই শঙ্খধ্বনিতে সেদিনকার আদায় অন্যদিনের প্রায় চতুর্গুণ হয়ে উঠলো। দাও দাও—এই কথা

শুন্‌তে-শুন্‌তে, এ দিচ্চে ও দিচ্চে—এই দেখতে-দেখতে যাদের দেবার ইচ্ছা ছিল না, তারাও কিছু-কিছু দিয়ে ফেল্লে। সংক্রামক ব্যাধির যেমন ছোঁয়াচ লাগে এই দেবার একটা ছোঁয়াচ দেখতে-দেখতে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়লো। পরেশ কোনো দিন শঙ্খধ্বনি, কোনো দিন হুলুধ্বনি, কোনো দিন নগর-সংকীর্ত্তন দিয়ে লোকের চোখে এমন একটা ধাঁধা, মনে এমন একটা নেশা লাগিয়ে দিলে যে কেউ আর ভাব্‌বার অবসরই পেলে না—কেন দিচ্চি? কাকে দিচ্চি? কি হবে?

কিন্তু এত কোরেও পরেশের মনের মতন টাকা উঠলো না। এমন কি সে যা আশা করেছিল, তার অর্দ্ধেকের কাছাকাছি এসেও পেঁ|ছল না; পাঁচ হাজারও পূর্ণ হলো না। এদিকে মাস প্রায় শেষ—প্রথম কিস্তি সুদের তারিখ কাছাকাছি হয়ে আসছে। সে সুদ দিতে গেলে তহবিল অনেকটা খালি হয়ে যায়। তা আবার পূর্ণ করা অসম্ভব!—বিশেষ যখন ছেলেদের উৎসাহ ক্রমেই কমে আসছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। এইবার জাল গুটোতে হবে। হঠাৎ এই বিশ্বাসের ব্যূহ ভেদ কোরে যদি কোনো রকমে একটু সন্দেহ প্রবেশ করে, তখন সাম্‌লানো দায় হবে!

ছেলেরা সেদিনকার আদায়ের হিসেব-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছে, একা পরেশ ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপের সাম্‌নে টাইম-টেবেল খুলে গাড়ির সময়, যাবার স্থান নির্ণয়, বেশ পরিবর্ত্তন এবং পুলিশের চোখে ধূলো দেবার নানা ফন্দি নিয়ে মাথা ঘামাচ্চে এমন সময় দরজার বাইরে কে ডাকলে—"বাবা পরেশ!" পরেশ চম্‌কে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো, মা কি ফিরে এলেন! পরেশ মন্ত্রচালিতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে দরজায় দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা! পরেশ অন্ধকারে চিন্‌তে না পেরে বল্লে—"কে?" বৃদ্ধা তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"চিন্‌তে পারছিস্ না বাবা!" অন্ধকারে তাঁকে চেনা গেল না বটে, কিন্তু তাঁর সেই গলার সুর পরেশের যেন চিরদিনের চেনা; সে-সুর চেনা-অচেনার সমস্ত বাধাকে ঠেলে একেবারে বুকের মধ্যে সিংহাসনে গিয়ে বসে। পরেশ বল্লে—"কে নতুন-পিসি? এস এস ঘরের মধ্যে এস।"

গ্রামের এই নতুন-পিসিটি কত কালের পুরোনো, কিন্তু চিরদিনই নতুন রয়ে গেলেন। ঘরে-ঘরে নতুন-নতুন অভ্যাগতের দল শিশুরা নতুন গলায় ডেকে-ডেকে এ পর্য্যন্ত পিসিমাকে পুরোনো হতেই দিলে না। এঁর স্নেহ আদর পায়নি বুড়ো থেকে ছেলের মধ্যে কেউ আছে কি না সন্দেহ। এঁকে না ভালবাসে এমন পাষণ্ড গ্রামে দুর্ল্লভ। পরেশ জানতো গ্রামের মধ্যে এখনো তার জন্যে যে একটি স্নেহের নীড় আছে সে এই পিসিমার বুকে! পিসিমাকে দেখে তার অন্তরের মধ্যে থেকে বহুদিনের সঞ্চিত একটি স্নেহ পাবার পিপাসা ঠেলে উঠতে লাগলো। সে পিসিমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে বল্লে—"পিসিমা, এই মাদুরে বোসো।" পিসিমা বসতেই সে ছেলেবেলার মতো পিসিমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। পিসিমা ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। ছেলেবেলায় দুরন্ত পরেশকে কেউ যখন বাগ মানাতে পারত না, পিসিমার চোখের একটিমাত্র প্রফুল্ল চাহনি তাকে ঠাণ্ডা করে দিত;—সে চাহনি পরেশ এখনো ভুলতে পারিনি। আজ তাঁর

কোলে শুয়ে সেই চাহনির স্পর্শ যেন সে বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগলো। সে হঠাৎ ধড়মড় কোরে উঠে বসলো। পিসিমা বল্লেন—"উঠলি কেন বাবা?" পরেশ কোনো উত্তর দিতে পারলে না। সে কেমন-একটা শূন্যদৃষ্টিতে পিসিমার পরিত্যক্ত কোলের পানে চেয়ে রইল, মনে হলো সে-ক্রোড় স্পর্শ করতে তার অন্তরাত্মা যেন ভয় পাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। একটা কোণে টিনের প্যাঁটরার মধ্যে দেশের নামে তোলা ঋণ-ভাণ্ডারের টাকাগুলো চাবি-বন্ধ ছিল। পরেশের মনে হতে লাগলো—ঐ প্যাঁটরাটাকে দুই হাতে তুলে রাত্রের অন্ধকারের একেবারে তলায় ছুঁড়ে ফেলে ছায়—দিনের আলোয় তাকে যেন আর সেটা দেখতে না হয়! পরেশ সে-প্রবৃত্তি দমন কোরে পিসিমার কাছে এসে বস্‌লো। পিসিমা বল্লেন--"পরেশ, তুই নাকি কি-একটা স্বদেশী কারখানা খুলেছিস যাতে একটাকা দিলে বারো-টাকা হয়?"

পরেশ হঠাৎ কেমন চম্‌কে উঠে বল্লে—"কে বল্লে?"

"কেন, সবাই বল্‌ছে!"

পরেশের মনে হতে লাগলো সে যদি কোনো-রকমে পিসিমার স্মৃতি থেকে ঐ কথাটাকে উপড়ে ফেল্‌তে পারে তাহ'লে সে বেঁচে যায়। সে অত্যন্ত একটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তোমার কাছ থেকে কেউ টাকা নিয়েছে নাকি?"

পিসিমা বল্লেন—"না বাবা! সেইজন্যই তো তোর কাছে এসেছি।"

পরেশ কেমন হতভম্ব হয়ে গেল।

পিসিমা বল্‌তে লাগলেন—"দেখ্ বাবা, আমার এই জমানো পাঁচটি টাকা আছে, তোর ঐ কলে ফেলে একে বাড়িয়ে দিতে হবে।"

পরেশ বলে উঠলো—"কেন পিসিমা, তোমার কি টাকার ভারি দরকার হয়েছে? কিছু চাই?"

"না বাবা!"

পরেশ জানত নিজের জন্যে পিসিমা এই 'না' ছাড়া যেন কখনো 'হাঁ' বলতে শেখেন নি। কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ পিসিমা? তিনি বলেন, বেশ আছি বাবা! দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি চিরদিনের দুঃখিনী এই পিসিমা কখনো 'বেশ' ছাড়া যেন বলতে জানেন না। হাজার কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখের সেই প্রসন্নতার হাসিটি ম্লান হতে কেউ কখনো দেখেনি।

পরেশ অধীর হয়ে বল্লে—"তবে কেন টাকা খাটাতে চাচ্চ পিসিমা?"

পিসিমা বল্লেন—"পাপ-মুখে বলতে নেই,—কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, দানধ্যান কর্‌ব।"

পরেশ বল্লে—"বেশ তো আমি তোমায় দিচ্ছি।"

পিসিমা বল্লে—"তুই কেন লোকসান কর্‌বি? আমার এ টাকা তো পড়ে আছে, কোনো কাজে লাগছে না, একে তোর ঐ কলে ফেলে বাড়িয়ে দে না!"

পরেশ দেখলে সে নিজের হাতে যে মিথ্যার মায়া-জাল বিস্তার করছে তার সর্ব্বনাশ থেকে পৃথিবীতে তার একমাত্র মমতার সামগ্রী যে পিসিমা তাঁকেও রক্ষা করা তারও সাধ্যে নেই। সে জানে, তার পিসিমার চিরজীবনের সম্বল ঐ পাঁচটি টাকা! কত দিনের অনাহারে থেকে এই পাঁচটি টাকা তাঁর সঞ্চিত হয়েছে। এ টাকা ফাঁকি দিয়ে সে কেমন কোরে নেবে? নিতে তার বুক যাবে ফেটে। তবু নিতে হবে, নইলে সমস্তই ফেঁশে যায়! এতদূর এগিয়ে আর ফেরা চলে না। তবু সে আর-একবার বল্লে—"ও টাকা তুমি রেখে দাও।"

পিসিমা অবাক হয়ে বল্লেন—"কেন?" হায়, এই কেনর উত্তর দেবার মতো শক্তি যদি তার থাকত! সে চারিদিক থেকে খুঁজে কোথা থেকেও সে-শক্তি সঞ্চয় করতে পার্‌লে না। সে হতাশ হয়ে বসে পড়লো। পিসিমা বল্লেন—"কেন, অমন করছিস বাবা? নে না আমার টাকা।" টাকা নেবার অনাসক্তি পরেশ জীবনে এই প্রথম অনুভব করলে। পিসিমাকে বলবার একটা কথাও তার মুখে জোগালো না। তার বক্তৃতা দেবার অমন মোহিনী শক্তি, ভাষার ছটা কোথায় যেন উড়ে গেল! সে নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। পিসিমা তখন তার হাতের মধ্যে টাকা পাঁচটা গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরেশ আর কিছু বলতে না পেরে শুধু বলে উঠলো—"একটা রসিদ নিয়ে যাও পিসিমা!"

পিসিমা বল্লেন—"তোর কাছ থেকে আবার রসিদ নেব কি? তুই কি আমায় ঠকাবি নাকি?" পিসিমার সেই বিশ্বাস-ভরা দৃষ্টির দিকে পরেশ তাকাতে পার্‌লে না।

পিসিমা ধীরে-ধীরে চলে গেলেন। পরেশ স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ বাহিরের শূন্যতাময় অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল, তার পর মাদুরের উপর মুখ-গুঁজড়ে শুয়ে পড়লো।

* * *

পরদিন সকালে পরেশকে গ্রামে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলের তখন হুঁশ্ হলো পরেশ কতকগুলো ফাঁকা কথার জাল বুনে তাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে। তখন আবার পরেশের সেই পুরোনো বিশেষণ—লম্পট, কপট, শঠ ইত্যাদি শব্দগুলো নানা মুখভঙ্গীর সঙ্গে মুখে-মুখে শাণিত হয়ে উঠলো। কেউ বল্লে, পুলিসে খবর দাও, কেউ বল্লে, ইষ্টিশনে-ইষ্টিশনে তার কর, কেউ বল্লে, চেহারার বর্ণনা দিয়ে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। যখন গ্রামময় এমনি হুলুস্থুল চল্‌ছে তখন ছেলেরা ছুটে এসে বল্লে—"দেখবে এসো কাণ্ডটা!" সবাই পরেশের ঘরে গিয়ে দেখলে, ঋণ-ভাণ্ডারের সেই প্যাঁটরাটা ঘরের এক-কোণে পড়ে রয়েছে, তার চাবি খোলা, কিন্তু ভিতরে থাকে-থাকে টাকা সাজানো, আর সব-উপরে একটা কাগজে মোড়া পাঁচটি টাকা, তাতে লাল পেন্সিলে লেখা—"পিসিমার ঋণ।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উদ্ভট-সাগর

(১)

গঙ্গাজলং শিরসি তে
হৈমবতী বামভাগসম্পন্না।
ভালে তুষারকিরণো
মমেহি গিরিশ ত্রিতাপতপ্তং হৃৎ ॥

(উদ্ভটসাগরস্থ)

নিবেদন করি আমি ওহে মহেশ্বর!
তব দুঃখ দেখি মোর ফাটিছে অন্তর।
শীতে কাঁপিতেছ সদা ছট্‌ফট্ করি',
এক-গঙ্গা-জল তব মাথার উপরি।
হিমালয়-কন্যা সেই দেবী ভগবতী
তোমার বামাঙ্গে সদা করেন বসতি।
তুষার-কিরণ সেই দেব নিশাকর
ধরিয়া রেখেছ নিজ ভালে নিরন্তর।
কৈলাস-গিরিতে বাস করি' সর্ব্বক্ষণ
পেয়েছ 'গিরিশ'-নাম,—জানে ত্রিভুবন।
তোমার শীতের কষ্ট বলিনু যখন,
আমার তাপের কষ্ট শুন হে এখন,—
অসহ্য ত্রিতাপ-জ্বালা হৃদয় ভিতরে
দিবানিশি জ্বলিতেছে ধক্ ধক্ ক'রে।
তোমার দুর্জ্জয় শীত, আমার উত্তাপ,
উভয়েই করিতেছি বাপ্ রে বাপ্।
ছাড়িয়া কৈলাস-গিরি শীঘ্রই এখন
আমার হৃদয়ে বাস কর সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়ে যদি রহ অবিরাম,
তুমিও আরাম পাবে, আমিও আরাম!

* * *

(২)

কোন কবি কৌশল-ক্রমে "ক"-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে দেবাধিদেব মহাদেবের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন :—

কল্পান্তক্রূরকেলিঃ ক্রতুকদনকরঃ কুন্দকর্পূরকান্তিঃ
ক্রীড়ন্ কৈলাসকূটে কলিতকুমুদিনীকামুকঃ কান্তকায়ঃ।
কঙ্কালক্রীড়নোৎকঃ কলিতকলকলঃ কালকালীকলত্রঃ
কালিন্দীকালকণ্ঠঃ কলয়তু কুশলং কোঽপি কাপালিকঃ কৌ॥

(ভল্লটস্য)

কল্পান্ত-কালেও কত কত ক্রূর কেলি,
ক্রতু-কালে কত কাণ্ড করেন কপালী।
কুন্দ-কর্পূরের কান্তি কিবা কলেবরে,
করেন কতই ক্রীড়া কৈলাস-কন্দরে।
কুমুদিনী-কান্তে কৃপা,—কি কব কাহায়,
কিবা কান্ত কমনীয় কপালীর কায়।
করিতে কঙ্কাল-কেলি কতই কুশল,
কল্লোলিনী করিতেছে কর্ণে কল কল।
কপালীর কাল কণ্ঠে কালিন্দী কালিমা,
কামিনী কালীর কিবা কহিব কান্তিমা।
কপালীর কৃপাময় কটাক্ষ কেবল
কল্যাণ-কামীর কুলে করুন কুশল!

* * *

(৩)

একটি চাতক-পক্ষী মৃতপ্রায় হইয়া ঊর্দ্ধমুখে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি সেই চাতককে একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিয়া জীবন সার্থক করিতে অনুরোধ করিলে চাতক-পক্ষী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নিম্ন-লিখিত শ্লোকে সেই চাতকের উক্তি ও প্রত্যুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। বংশের সুনাম-রক্ষা করাই সন্তানের উচিত,—ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

রে রে চাতক পাতিতোঽসি মরুতা গঙ্গাজলে চেত্তদা
পেয়ং নীরমশেষপাতকহরং কাশা পুনর্জীবনে।
মৈবং ব্রূহি লঘীয়সো যমভয়াদুদ্গ্রীবতামুজ্ঝতা
গঙ্গাম্ভঃ পিবতা ময়া নিজকুলে কিং স্থাপ্যতে দুর্যশঃ॥

কবি—রে চাতক! পড়িয়াছ যদি গঙ্গাজলে
বিন্দুমাত্র কর পান মরিবার কালে।
পাপ তাপ যম-ভয় থাকিবে না আর,
পক্ষি-জন্ম নাহি হবে,—পাইবে উদ্ধার!
চাতক—বারংবার একথাটা ব'লো না আমায়,
গঙ্গাজল খাই যদি,—কিবা ফল তায়?
মাথা হেঁট কেবা কোথা বংশে মোর করে?
তাই বলি কেন তুচ্ছ যম-ভয় তরে
গঙ্গাজল পান হেতু মাথা করি' হেঁট
ভরাইতে যাব আমি এই পোড়া পেট?
যে কুলে কলঙ্ক নাই, সদাই সুনাম,
সে কুলে রাখিয়া যাব কেন বা দুর্নাম?

* * *

(৪)

কথিত আছে যে, আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা মাতামহের শ্রাদ্ধোপলক্ষে হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে বিদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা ছিলেন। সিরাজ মুরশিদাবাদ-দরবারে কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! হিন্দুদিগের ন্যায় আমিও মাতামহের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিব। তোমরা সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া যেরূপে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণকে নিমন্ত্রণ কর, আমিও সেইরূপ করিব। অতএব এক মাসের মধ্যেই শ্লোক লিখিয়া আমার দরবারে আসিবে. এবং কত টাকা খরচ পড়িবে, তাহাও বলিবে।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র "যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা!" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। গুপ্তিপাড়া-নিবাসী ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন :—

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলীবর্দ্দীনবাবো বিবিধগুণযুতোঽল্লামুখঃ পশ্চিমাস্থঃ।
মর্ত্ত্যং দেহং জহৌ স্বং মুনসরমুলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা
যাচেঽহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনো শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

আলীবর্দ্দী-খাঁ নবাব বাঙ্গালার পতি,
মহা গুণবান্ বলি' ছিল তাঁর খ্যাতি।
খোদার শ্রীপাদ-পদ্মে মন সঁপে' দিয়া
পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া
'আল্লা' 'আল্লা' পুণ্য-নাম বলিতে বলিতে
দেহত্যাগ ক'রেছেন তিনি বিধিমতে।
শ্রাদ্ধের সময় তাঁর উপস্থিত প্রায়,
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণে করিব বিদায়।
তিনি মাতামহ,—আমি দৌহিত্র সিরাজ,
গল-লগ্নী-কৃত-বাসে এই ভিক্ষা আজ,—
কৃপা করি' মোর গৃহে করি' পদার্পণ
শুদ্ধ করি' দাও মোরে হে ব্রাহ্মণ-গণ!

* * *

(৫)

মানুষ মাতাল হইলে তাহার কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন :—

গচ্ছন্নেব পতন্ পতন্নপি হসন্ দোর্ভ্যাং ভজন্নম্বরং
ভ্রশ্যদ্বেষ্টনবন্ধনায় বিকলো ন স্যাৎ সমাপ্তিক্ষমঃ।
হস্তভ্রস্তমিতস্ততোঽপি মৃগয়ন্নগ্রে স্থিতং চাষকং
জীয়াদ্ ঘূর্ণদপূর্ণভানুনয়নো মাধ্বীকমত্তো জনঃ॥

(কবিচন্দ্রস্য)

যেতে যেতে পড়িতেছে মাটীর উপরে,
পড়িতেছে,—তবু মুখে হাসি নাহি ধরে!
খাড়া হ'য়ে আর নাহি দাঁড়াতে পারিয়া
আকাশ ধরিতে চায় দুই হাত দিয়া!
কাপড় খসিছে,—চেষ্টা পরিতে বিশেষ,
তথাপি কাপড় পরা নাহি হয় শেষ!
হাত হ'তে পড়িয়াছে সম্মুখে বোতল,
খুঁজিতে খুঁজিতে তবু হইবে পাগল!
সন্ধ্যা বা প্রভাত-কালে সূর্য্যের মতন
লাল লাল চক্ষুঃ দুটী ঘুরে অনুক্ষণ!
এহেন মাতাল বাবু সকল সময়
থাকুন নেশায় মত্ত,—জয় তাঁর জয়!

* * *

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

ছিটে-ফোঁটা

বিধান

দিলেন ব্যবস্থা আসি শেষে পুরোহিত—
'এ রোগের প্রায়শ্চিত্ত এখনি উচিত ;'
রোগী কহে 'প্রায়শ্চিত্ত করে কোন্ জন,
যার কোন আশা নাই নিকট মরণ।'
শিহরিয়া পুরোহিত ক'ন্ "যমদূত
সিঁড়িতে উঠিতে আমি দেখিনু অদ্ভুত।"
'সত্য না কি' কহে রোগী 'চেহারা কেমন ?'
'ঘোর কালো ভীষণ সে মোষের মতন।'
'বুঝিয়াছি' কহে রোগী হাসিয়া খেয়ালে
'দেখেছেন আপনারি ছায়া সে দেয়ালে।'

শ্রীরসময় লাহা

* * *

কবিতার প্রতি

তুমি ত চাও হাল্কা বাতাস, ফুলের গন্ধ কল-স্বর,
দুঃখ শোকের চোখের পাতায় মুক্তা-গাঁথা জলস্তর।
তোমার বাছাই জিনিষ্ বাছা, পাইনে খুঁজে প্রাণ ঘেঁটে।
বরং দিও কবির দলের খাতা থেকে নাম কেটে।
হাল্কা এবং পল্কা নিয়ে তল্পী বেঁধে চল্ব না।
দুঃখের মাঝে কিবা লাজে কর্ব রূপের কল্পনা।

রক্তে রাঙ্গা নিষ্ঠুরতা স্নিগ্ধ-রং-এ মাজ্‌তে চাও ?
মিষ্টরসের কড়া পাকে নুড়ির বড়া ভাজতে চাও ?
ভাঙ্‌ব পটোল, বল্‌ব ঝিঙ্গা—চল্‌বে না তা সুন্দরী !
দুঃখের সাজায় চেঁচাই কড়া, কোমলে না 'টুং' ধরি।
কাব্য কিগো নজর-বন্দী, ভেল্‌কিবাজির কারদানি ?
হয়ে সোজা, ভবের বোঝা বইতে পারাই মর্দানি।

কল্পনা চাই ? মাথা বাঁচাই, রাখতে সাঁচা প্রমাইটে।
প্রলাপ বাড়ে জ্বর-বিকারে, সারে সেটা ব্রোমাইডে।
চাও কি নাকি-সুরের ফাঁকি, গুঞ্জনে ও ঝঙ্কারে ?
বল্‌বে লোকে আমায় ন্যাকা এইটুকু যা শঙ্কা রে।
চাও কি অনুপ্রাসের রাশি, কাষ্ঠ-হাসির তীক্ষ্ণতায় ?
ক্ষমা কর ! বুড়া কবি, বাড়্‌ছে গভীর বিজ্ঞতায়।

* * *

পাঁচালি

নিজের চেয়ে পরই ভাল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে ;
বীরের চেয়ে ভীরু ভাল পরিহাসে ঘাঁটাতে ;
খাওয়ার চেয়ে উপোস ভাল ভোজের দিনে প্রভাতে ;
আস্ত থেকে ছেঁড়া ভাল—জুতা, দেশী-সভাতে ;
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘটে যদি বরাতে ;
বিয়ের চেয়ে শ্রাদ্ধ ভাল, বৃদ্ধ জনে তরাতে ;
পাওনা থেকে দেনা ভাল দাবী হলে তামাদি ;
চিন্তা হতে ধিনৃতা ভাল শিখে সা-রে-গা-মাদি ;
টাকার চেয়ে কড়ি ভাল দিতে দানে দক্ষিণায় ;
কর্ম্মী থেকে বক্তা ভাল,—মাথার উপর ঝক্কি নাই ;
ঘরের চেয়ে প্রবাস ভাল জুট্‌লে নিত্য আতিথ্য ;
গুরুর চেয়ে লঘু ভাল গড়তে মাসিক সাহিত্য ;
সোজার চেয়ে উল্টা ভাল, পদ্যে কথা জড়াতে ;
কহে নব দাশরথি, এই পাঁচালির ছড়াতে।

* * *

আমরাই

তরু-জীবনের সাধনার ফল আমরাই খাই লুট করে
ছোট বাছুরের মা'র দুধটুক্ তাও খাই মোরা পেট ভরে !
আমরাই হায় নিঃশেষপ্রায় করে দিচ্ছি পশু বংশকে
জলের মৎস্যে, ছাগের বৎসে, মুর্গী 'মাটন' হংসকে !
আমরাই ফের বিচারকর্ত্তা অত্যাচারী ও দাম্ভিকের
আমরাই ফের প্রগাঢ় ভক্ত শুদ্ধ, শান্ত আহ্নিকের !

" বনফুল "

* * *

নাকের বিচার

চোখেরে শাসায় কান করিব নালিশ
দেহের কাছেতে, নাক হইল সালিশ।
লাল হয়ে বলে কান, "এ কেমন ধারা
আঁধারে না খাটে চোখ, আমি খেটে সারা।
কি আলো কি আঁধারেতে খাড়া হয়ে রই
সাম্য-বিধান বিনা প্রাণ বাঁচে কই ?"

হাসিয়া কহিল নাক, "কও কার কাছে ?
তোমার খাটুনি তবু পদে কিছু আছে,
ঘুমাইলে দেহ, তুমি ছুটি পাও ভাই,
আমি শুধু একটানা শ্বাস টেনে যাই ;
কাজের সমতা যদি হেথা পেতে চাও
জবাব দিতেছি আমি—তোমরাও দাও।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

চড়ক

চড়ক গাছের ঘূর্ণী কলে বাঁধা পড়ে’ পীঠমোড়া,
(চাম্‌ড়া আছে বঁড়শি বেঁধা বাণে আছে জীব-ফোঁড়া)
চল্‌ছি ঘুরে বছর পারে ওলট্‌-পালট্‌ দোল খেয়ে,
খুব চড়্‌কে হাসি হেঁসে বোম্‌ ভোলানাথ বোল গেয়ে।
বছর ফুরায় ছাড়িয়ে বাধা, তাড়িয়ে ধাঁধা কুজ্‌ঝটি ;
“ দে পাক্‌—দে পাক্‌ ” হাঁক্‌ছে হেঁসে সন্ন্যাসী সে ধুর্জ্জটি

———

কাঁচড়াপাড়া—কবিকর্ণপুর

আমরা এখন পর্য্যন্ত ঘরের কথার অপেক্ষা বাহিরের কথারই বেশী আলোচনা করিয়া থাকি। স্বদেশের দিকে আজ বাঙ্গালীর একটা টান পড়িয়াছে। আমাদের উপেক্ষিত দোলমঞ্চ, পরিত্যক্ত তুলসীস্তূপের দিকে আজ একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। এমন দিনে যদি তাজমহল, অজন্তা ও মাদুরার মন্দির ভুলিয়া কিছুকালের জন্য আমাদের ছায়া-শীতল, আম-জাম-কাঁটালে ঘেরা বঙ্গীয় পল্লীর স্নেহপূর্ণ পরিত্যক্ত ছোট ছোট মন্দির ও দেবালয় গুলির প্রতি একটু মনঃসংযোগ করি তবে বোধ হয় তাহা সময়ের অনুপযোগী হইবে না। এই সকল ছোট ছোট মন্দির কোন ভুবনবিজয়ী শিল্পের আদর্শ না হইতে পারে, কোন পরাক্রান্ত সম্রাট্ অজস্র ধন-ভাণ্ডার ব্যয় করিয়া সেগুলি নির্ম্মাণ না করিতে পারেন, কিন্তু সেই সব ক্ষুদ্র দেবায়তনে যে মাটীর প্রদীপগুলি জ্বলিত, তাহার ঘিয়ের সল্তার একটা অব্যক্ত মোহ ও পবিত্রতা আছে। সেই স্মৃতি এখনও বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া বসে, এবং আরতির ঘণ্টা, শঙ্খ ও খঞ্জনীর নিনাদ মনে পড়িলে এখনও আমাদের প্রাণ পুলকোচ্ছ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে।

আমরা সেইরূপ অনেকগুলি দেবায়তন, ভক্ত এবং কবিদের বাসগৃহের আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছি। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পাগার পরিদর্শন করিয়া আশা করি বাঙ্গালী পাঠক এই গুলি দেখিয়া জুড়াইবেন,—যেমনভাবে তড়িৎ-পাখা নিষেবিত, মহার্ঘআস্‌বাবপূর্ণ বড় বড় আফিসগৃহে কাজ করিয়া আসিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোক সায়াহ্নে স্বীয় কুটিরে আরাম উপভোগ করিয়া থাকেন।

আমরা প্রথম কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ার কবিকর্ণপুরের বাড়ী ও তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণজির ছবি আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিব। শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত, কিন্তু বয়সে অনেক বড় ছিলেন। আপনারা হয়ত জানেন শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার সময় বাঙ্গালী ভক্তগণ মহাপ্রভুকে পুরীতে যাইয়া দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। শত শত বাঙ্গালী প্রভুর শ্রীমুখদর্শন অভিলাষে সে সময় পুরীতে যাত্রা করিতেন। এই দলকে লইয়া যাইবার ভার ছিল শিবানন্দ সেনের উপর। শিবানন্দ ধনাঢ্য ছিলেন, গরীব ভক্তদের পাথেয় তিনি নিজে বহন করিতেন। বাঙ্গালী যাত্রীদের সম্বন্ধে কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন থাকিলে তিনি শিবানন্দ সেনকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন। সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধন দাসের সঙ্গে শিবানন্দের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যেদিন কুমার রঘুনাথ দাস রাজপ্রাসাদের মায়া কাটাইয়া—আনন্দের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া—জীর্ণ চীর পরিধানপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন,—কোথায় গেলেন তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া পিতা গোবর্দ্ধন শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন,—সেদিন তিনি

শিবানন্দের নিকট সংবাদ জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। সপ্তগ্রামরাজপ্রাসাদ হইতে দশটি অশ্বারোহী দূত চিঠি লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় সেন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শিবানন্দ কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। কারণ রঘুনাথ পলাইবার পথে পিতৃ-বন্ধু শিবানন্দের এলাকা এড়াইয়া গিয়াছিলেন। শিবানন্দ একজন ভক্ত পদকর্ত্তা ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত কতকগুলি পদ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য, কবিত্ব প্রভৃতি সত্ত্বেও শিবানন্দের প্রসিদ্ধি হয়ত কালে লোপ পাইয়া যাইত। পদকল্পতরুর কয়েকটি পদের ভণিতার এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তমণ্ডলীর তালিকার এক কোণে হয়ত তিনি অবজ্ঞাতভাবে পড়িয়া থাকিতেন। কিন্তু ইনি ইঁহার পুত্রের প্রতিষ্ঠায় চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। গুণশীল পুত্রের নামে পরিচয় পিতার শ্লাঘার বিষয় বটে, এই শ্লাঘায় শিবানন্দের নাম চির-ভূষিত হইয়া থাকিবে।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশে কবিকর্ণপুর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইনি শিবানন্দের তৃতীয় পুত্র, ইঁহার নাম ছিল পরমানন্দ সেন, কবিকর্ণপুর ইঁহার উপাধি। শিবানন্দের তিন পুত্র, চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপুর)।

কবিকর্ণপুর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর যখন ৩।৪ বৎসর বয়স, তখনই শিবানন্দ চৈতন্যচরণরেণু মস্তকে লেপন করিবার মানসে শিশুকে পুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন! কথিত আছে তিন বৎসরের শিশু চৈতন্যদেবের বৃদ্ধাঙ্গুলি লেহন করিয়াছিল, ভক্তগণ বিশ্বাস করেন তাহাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি জন্মিয়াছিল।

এই অপূর্ব্ব প্রতিভাশীল বালক সাত বৎসর বয়সেই অলৌকিক কবিত্বের পরিচয় দিয়া এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন,

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষিরঞ্জনমুরসোমাহেন্দ্রমণিদাম বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি র্জয়তি।"

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দৃষ্ট হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের পর পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র উন্মনা হইয়া পড়েন। একদিন তিনি রাজপুরী হইতে রথযাত্রার উৎসব দেখিতেছিলেন, তখন নীলাচলনাথের রথধ্বজা নীলাকাশ ভেদ করিয়া উড়িতেছিল। নীলসিন্ধুর চলোর্ম্মির ন্যায় অসংখ্য যাত্রী ভিড় করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে অগ্রসর হইতেছিল। স্বয়ং দারুব্রহ্ম মণিমাণিক্যখচিত হইয়া অপূর্ব্বসৌষ্ঠবে ঝলমল করিতেছিলেন, চন্দনতরু-নিষেবিত স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ অপূর্ব্ব মাদকতায় মন আবিষ্ট করিতেছিল

—এই সময় অতি শোকার্ত্তস্বরে রাজা কর্ণপুরকে বলিলেন, "এই জনসঙ্ঘ, এই পরিমলবাহী স্নিগ্ধ অনিল, এই আকাশভেদী সুবর্ণজড়িত রথপতাকা, এমন কি বিশ্বত্রাতা দারুব্রহ্ম আজ আমার চিত্তে কোনরূপ আনন্দ দিতেছেন না, চৈতন্যের অভাবে এই পুরী-রাজ্য আমার চক্ষে শূন্যময় বোধ হইতেছে, তুমি তাঁহার প্রসঙ্গ লইয়া একখানি নাটিকা প্রণয়ন কর—সেই অভিনয় দর্শনে আমি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব।" ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনা সুরু হয় এবং ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

কবিকর্ণপুর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য এই দুই পুস্তকই সমাধা করেন। এই দুই পুস্তক প্রকাশের এক বৎসর পর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত দুইখানি গ্রন্থ ছাড়া কবিকর্ণপুর সংস্কৃতে আরও অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার অপরাপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ" "কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা" এবং "অলঙ্কারকৌস্তুভ" উল্লেখযোগ্য। তদ্‌রচিত কোন কোন পুস্তক হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর তাঁহার "পরমানন্দ" নামের ভণিতা দিয়া বাঙ্গলায় অনেক রাধাকৃষ্ণ লীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি পদকল্পতরুতে পাওয়া যাইবে। কবিকর্ণপুরের অনেক গ্রন্থ বহরমপুর হইতে স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ত্রিপুরারাজের ব্যয়ে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

এই পিতা-পুত্র কলিকাতার মাত্র ২৮ মাইল উত্তরে ষোড়শ শতাব্দীতে অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে গণ্য ছিলেন। কবিকর্ণপুরের খ্যাতি বঙ্গীয় কাব্যকিরীটের মধ্যমণির ন্যায়,—তাঁহার প্রতিভা শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। আলেকজাণ্ডারের রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কার করা অপেক্ষা এই কবির বাসভূমি ও গৃহের ভগ্নশেষ পরিদর্শন করা আমাদের ঘনিষ্টতর প্রিয়তর কর্ত্তব্য।

নানাগুল্মজড়িত জঙ্গলের মধ্যে এই দেখুন কবিকর্ণপুরের ভগ্ন গৃহ। আজ ৩৫০ বৎসরের কাল-স্রোত এই গৃহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু খিলানগুলির রমণীয়তা বিগতযৌবনা রূপসীর শ্রীর ন্যায় এখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

কবিকর্ণপুরের বাড়ীর একাংশ।

কিন্তু শিবানন্দ সেন স্থাপিত "কৃষ্ণরায়" বিগ্রহ প্রাচীনতর। শিবানন্দ সেনের অনেক কথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে। ইনি পুরীতে রঘুনাথ দাস কিরূপ কঠোর-ব্রত পালন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিতেছিলেন,—স্বরূপের নিকট কি কি ধর্ম্মতত্ব শিক্ষা করিতেছিলেন, মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে কি কি নীতি শিখাইয়াছিলেন, তাহা গোবর্দ্ধন দাসকে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণরায়ের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন কবিকর্ণপুরের বন্ধু যশোহরের প্রসিদ্ধ

সিংহাসনস্থ কৃষ্ণরায়জী।

রাজা বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়। সেই মন্দির কালে গঙ্গাগর্ভে গত হইলে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিক ও গৌরচরণ মল্লিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শিবানন্দ এই বিগ্রহের সেবাভার তাঁহার পুরোহিত শ্রীনাথ আচার্য্যকে দান করিয়া যান। তাঁহার বংশধরেরাই এখনও পর্য্যন্ত সেই সেবা চালাইয়া আসিতেছেন। এখন ইঁহার সেবাইৎ হরিদাস, ভূপাল, অতুল, শ্রীকৃষ্ণ, হরিচরণ, কানাইলাল প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

মন্দিরটি লম্বায় ৫১ ফিট, চওড়ায় ৩৩ ফিট, ভিত লম্বায় ৭৫ ফিট ও চওড়ায় ৫২ ফিট। শুধু দরজা ছাড়া ইহাতে কাঠের কাজ কোথাও নাই। প্রকাণ্ড খিলানগুলি ও ছাদে কড়ি বরগার সংশ্রব নাই, অথচ তাহা সুদৃঢ় ও সুন্দর। কালীঘাটের কালীমন্দির হইতে ইহা সুবৃহৎ এবং ইহার দৃশ্য অতি চমৎকার। এই মন্দিরসংলগ্ন অনেকগুলি বাটী আছে, তাহা

সিংহাসনবিরহিত কৃষ্ণরায়জী।

কৃষ্ণরায় বিগ্রহেরই সেবা-সংক্রান্ত। উপরে কৃষ্ণরায়ের ছবি দেওয়া গেল একখানি সিংহাসনারূঢ় যুগলমূর্ত্তি, আর একখানি সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তোলা হইয়াছে।

এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। প্রাচীনকালে "কৃষ্ণ" মূর্ত্তি এককই প্রতিষ্ঠিত হইতেন,—তখন অনেক প্রস্তরশিল্পী এদেশে ছিল। শৈবধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম "যুগলের" আরাধনা প্রবর্ত্তন করে। কিন্তু "যুগল পূজার" মহামহিম বিকাশ দেখাইয়াছিলেন বৈষ্ণবেরা পরবর্ত্তী যুগে। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তি—যুগল উপাসনা।
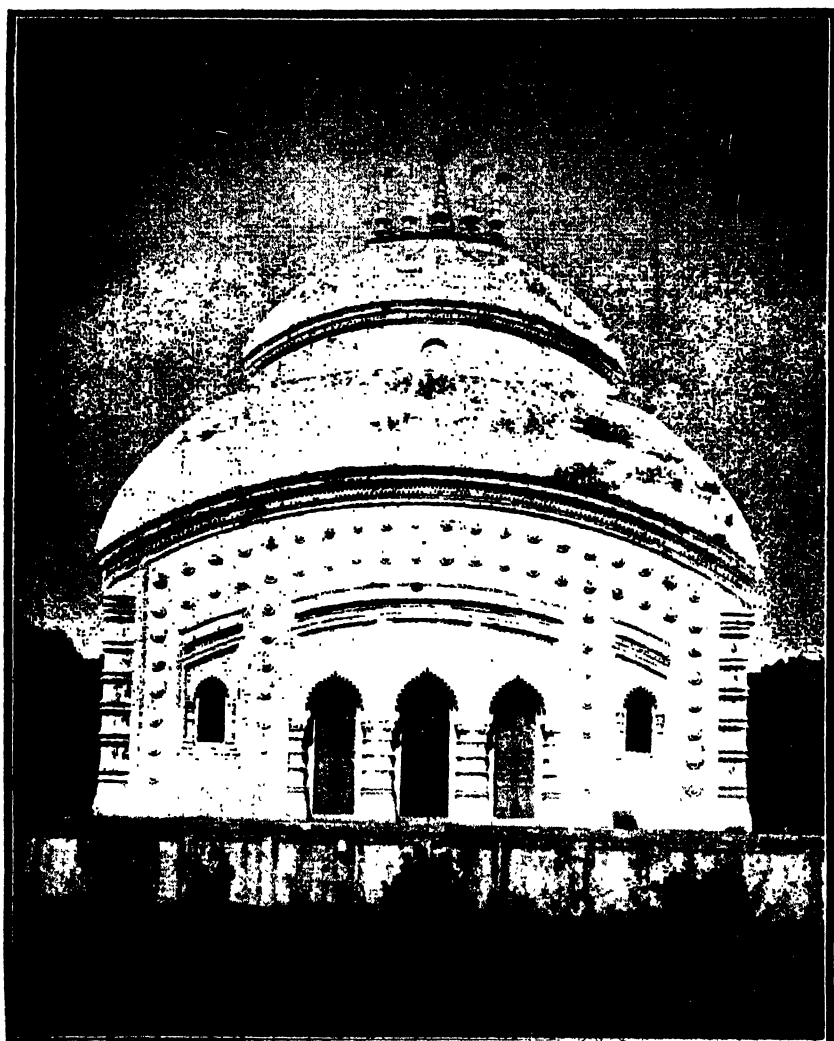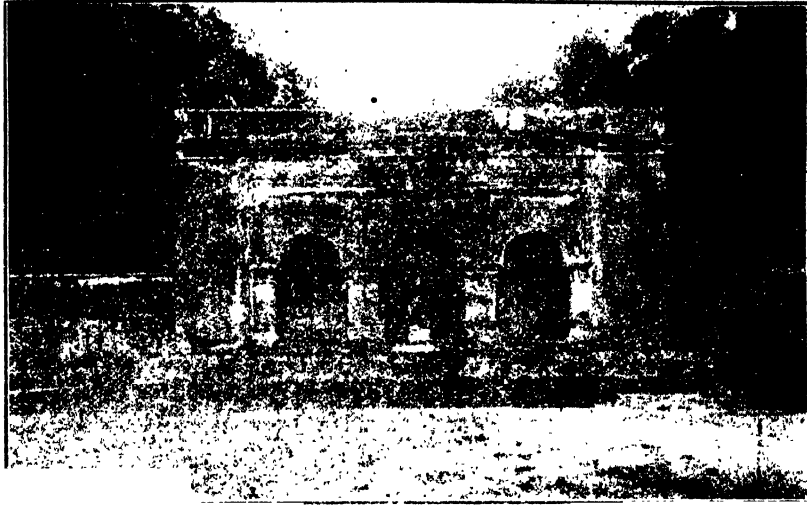
কৃষ্ণরায়জীর মন্দির

কৃষ্ণরায়জীর গেট।

কৃষ্ণরায়জীর দোলমঞ্চ।

কিন্তু যুগলের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় প্রস্তরশিল্প অত্যাচারের দরুণ লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন মন্দিরে প্রায়ই কৃষ্ণের প্রস্তরমূর্ত্তি ও পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত রাধার অষ্টধাতুর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাঁচড়াপাড়া গ্রামে আরও অনেক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই গ্রামের অদূরে হালিসহর, সেই খানে ঈশ্বরপুরী প্রভুর শ্রীপাট,—তথায় মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে একত্র অন্নাহার করিয়া ভক্তিতে সাশ্রুনেত্র হইয়াছিলেন। যে হালিসহর ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান বলিয়া তাহার মাটী মহাপ্রভু কোঁচায় বাঁধিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "এই পবিত্র মাটী—ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, ইহা আমার জীবন ও ধন
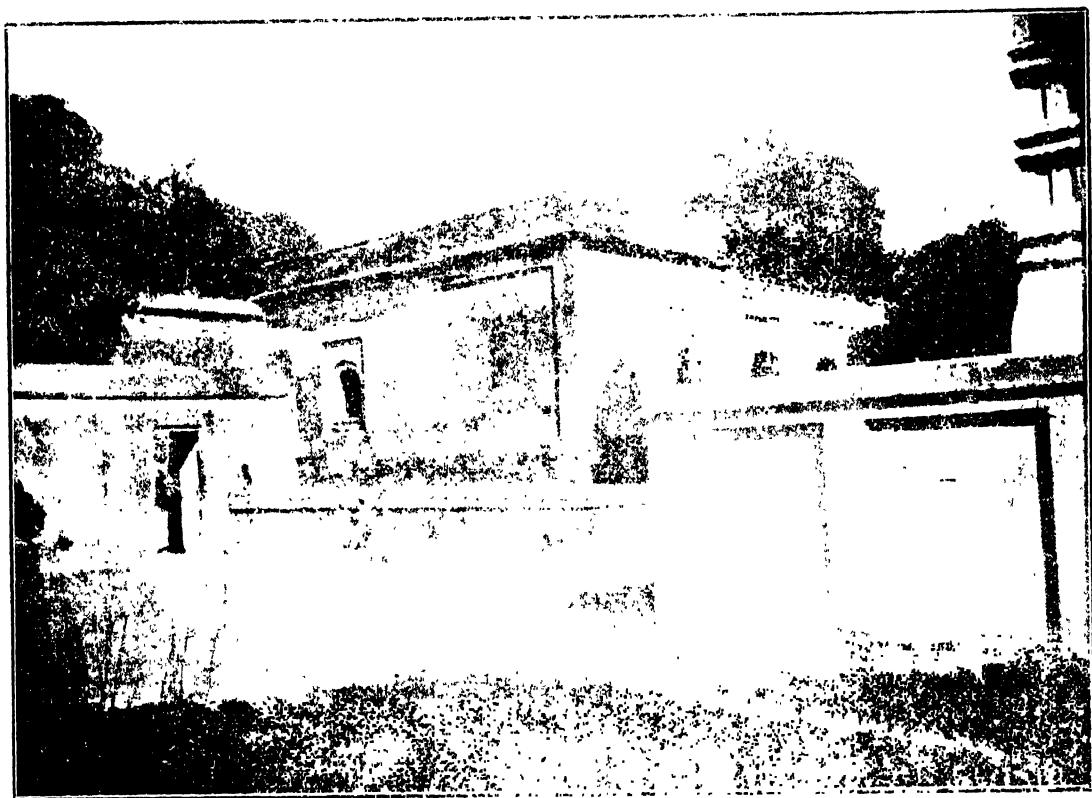
কৃষ্ণরায়জীর রান্নাবাটী।

সবার চাইতে মহার্ঘ।"—সেই মাটীর আমরা কি গৌরব করিয়াছি? সেই হালিসহরে রামপ্রসাদ কবি তাঁহার আকুল মাতৃসঙ্গীতে সমস্ত বঙ্গদেশের অশ্রু আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন দখল করিয়া ছিলেন। যে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সোণার গৌর ধূলায় লুটাইতেন—সেই শ্রীবাসের বাড়ীও কাঁচড়াপাড়ায় ছিল। আমরা ক্রমশঃ সেই সেই স্থান—যাহা বাঙ্গালী জাতির চক্ষে তীর্থের মত পবিত্র,—তাহা ছবির আকারে ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অপরাজিতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন ট্রেণ কলিকাতার নিকটে আসিয়াছে। আমি উঠিয়া মুখ প্রক্ষালিত করিয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ শিয়ালদহের বৃহৎ স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। টিকিট দিয়া আমি ব্যাগটা লইয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় পার্শ্বেই নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম, "আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন ?"

ফিরিয়া দেখিলাম—সেই কিশোরী!

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া একবার বলিতে ইচ্ছা হইল, "অপরিচিত ভদ্রলোককে এমন কথা বলেন, আপনি কিরূপ ভদ্রমহিলা ?" কিন্তু সে-কথা বলিলাম না। যে স্থানে আঘাত দিবার ক্ষমতা আমার নাই সে স্থানে আঘাত দিতে পারিবার ভাণ করা প্রতারণা, আর যে স্থানে আঘাত দিতে পারি সে স্থানে আঘাত না দেওয়াই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাহার সঙ্গে আসিয়াছেন ?"

কিশোরী উত্তর দিল, "তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

তখন ট্রেণযাত্রাকালে সেই যুবকের ট্রেণ হইতে নামিয়া যাওয়া আমার মনে পড়িল। সে-ই কিশোরীর সঙ্গে আসিয়াছিল—শেষকালে তাহার সাহসে আর কুলায় নাই—সে পলায়ন করিয়াছে—কিশোরীর বিপদের কথা না ভাবিয়া আপনাকে নিরাপদ করিয়াছে। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের ব্যবহার এইরূপই হয়—তাহারা আপনি পাছে বিপন্ন হয়, এই ভয়ে পরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু—? মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে বহু দুশ্চিন্তাচাঞ্চল্য উপলব্ধ হইল। ইহারা কাহারা—যুবক কিশোরীর কে—তাহারা কেন পলায়ন করিতেছিল—যুবক কেন শেষে চলিয়া গেল—কিশোরীর গতি কি হইবে—এ ব্যাপারে জড়িত হওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কি ?

ভাবিবার কথা বটে; কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ত ভাবিয়া এসব প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় না। আর যাহাই কেন হউক না—আশ্রয়প্রার্থিনী অসহায়া কিশোরীকে কেমন করিয়া সাহায্য করিতে অস্বীকার করিব ? তাহা করিলে ত আমি তাহাকে বিপদের প্রবাহেই ভাসাইয়া দিয়া যাইব। তাহা আমি পারিব না। কিশোরীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে উত্তরের জন্য

আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি সঙ্কোচহীন—সরলতাব্যঞ্জক। তাহার মুখভাবের কাতরতায় আমার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে চলুন। সঙ্গে জিনিষপত্র কি আছে ?"

কিশোরী যেন একটু নিশ্চিন্ত হইল ; বলিল, "জিনিষ কিছুই নাই।"

আমি অগ্রসর হইলাম—কিশোরী আমার অনুসরণ করিল।

যে স্থানে ভাড়াটিয়া গাড়ীর চালকগণ "এই যে বাবু!" "কোথায় যাইবেন ?" "সিকিন ক্লাস, বাবু!", প্রভৃতি কলরবে আরোহী আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তথায় আসিয়া আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া কিশোরীকে তাহাতে উঠিতে বলিলাম ও তাহার পর আপনি উঠিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

কিশোরী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে কি একটু স্থান হইবে না ?"

আমার বাড়ীতে স্থানের অভাব ছিল না—বরং বাহুল্যই ছিল। কিন্তু স্থানদানে আমার অনিচ্ছার যে কারণ ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কলিকাতায় আপনার আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ নাই ?"

"না।"

আমি যান-চালককে আমার বাড়ী যে পল্লীতে সেই পল্লীতে যাইতে বলিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম—এ কি হইল ? যে যুবক শৈশবাবধি মা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করে নাই সে তাহার মহিলাশূন্য গৃহে অপরিচিতা কিশোরীকে লইয়া যাইবার কল্পনায় কিরূপ বিব্রত হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

কিশোরী বোধ হয় আমার বিব্রতভাব লক্ষ্য করিয়াছিল ; আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি বিশেষ অসুবিধা হইবে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হইলে উপায় কি ?"

"যাহা হয় উপায় করিতেই হইবে। আপনাকে না পাইলেও ত আমাকে একটা উপায় করিতে হইত।"

"সেটা কি ?"

"তাহা জানি না। গাড়ী থামাইতে বলুন।"

"কেন ?"

"আমি নামিয়া যাই।"

আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "না। আপনি আমার বাড়ীতেই চলুন—তাহার পর যাহা হয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।"

কিশোরী আর কোন কথা বলিল না।

ঘর্ঘর শব্দে পাষাণপথ মুখরিত করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—বোধ হয় কিশোরীও ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কলিকাতায় আসিলেন কেন?"

কিশোরী উত্তর দিল, "সংসার দেখিতে।"

এমন বিস্ময়কর উত্তর পাইবার আশা আমি করি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাহার সঙ্গে আসিতেছিলেন সে কি আপনার আত্মীয়?"

"না?"

"তবে এমনভাবে কোন্ সাহসে বাড়ীর বাহির হইয়াছিলেন?"

"কেন?"

"বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ লাগিত?"

"আমি বিপদে পড়িয়াই বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম--বিপদ আমাকে তাড়াইয়া আনিয়াছিল।"

"কিন্তু যে গৃহে ছিলেন সে গৃহ ত আপনার আত্মীয়ের?"

"আত্মীয় কি শত্রু হয় না?"

"তবুও সে বিপদে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।"

"বিপদে মানুষ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারিলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।"

এই উত্তরে আমার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। জীবনে যে অভিজ্ঞতায় মানুষ এইরূপ মত গঠিত করিতে পারে এই কিশোরীর সে অভিজ্ঞতালাভের অবসর ঘটিল কবে—কেমন করিয়া? তাহার যে বয়স সে বয়সে বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে পুতুলখেলা ও "পুণ্যিপুকুর" ব্রত শেষ করিয়া কেবল সংসারে প্রবেশ করে—স্বামীর ভালবাসার আশায়—সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় সে জীবন সুখময়ই মনে করে—সংসারে দুঃখ কষ্টের কথা তাহার অভিজ্ঞতাবদ্ধ না হওয়ায় কল্পনাতেও থাকে না। সেই বয়সে সে নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়াছে। কেন ত্যাগ করিয়াছে সে রহস্য কে ভেদ করিবে? সে যে সধবা নহে তাহা তাহার সীমন্তে সিন্দূরের অভাবে প্রতিপন্ন হয়, আবার তাহার প্রকোষ্ঠস্থ শঙ্খালঙ্কার তাহার বৈধব্য-কল্পনার প্রতিবাদ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার পিতামাতা কোথায়?"

সে কোন কথা বলিল না—বলিতে পারিল না; কেবল অঙ্গুলি দিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল।

"ভাই ভগিনী?"

"কেহই নাই।"

"যে গৃহে আপনাকে দেখিয়াছিলাম সে গৃহ কাহার?"

কিশোরী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শত্রুর।"

রহস্য আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে রহস্য ভেদ করিবার জন্য আমার কৌতূহলও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার কথার ভাবে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিশোরীর দুঃখ যতই অধিক হউক না কেন, সে সে-দুঃখকথা অপরিচিত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করিতে চাহে না। সুতরাং আমি কৌতূহল দমন করিলাম।

গাড়ী আমার গৃহদ্বারে আসিলে আমি নামিয়া ডাকিলাম—"কুলদীপ"!—সেই আমার অন্ধের যষ্টি—পুরাতন ভৃত্য। মা'র মৃত্যুর পর হইতে সে-ই সংসারের সব ভার লইয়া—পাচক বহাল-বরখাস্তের অধিকারী হইয়া সংসার চালাইতেছিল। সে সময় সময় আমাকেও তিরস্কার করিত; সময় সময় তাহার ব্যবহারে আমার বিরক্তিও জন্মিত। কিন্তু আমি মনকে বুঝাইতাম, পুরাতন ভৃত্য অনেক দিন নিমক খাইয়াছে—তাই তাহার ব্যবহারে ও কথায় নিমকের একটু আতিশয্যে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিশেষ তাহাকে ছাড়িলে আমার সংসার চলে না। আমার ডাকে সে আজও বকিতে বকিতে আসিল, তিন দিন বলিয়া আমি পাঁচদিন করিয়াছি, সে কেবল দুর্ভাবনায় চঞ্চল হইয়াছে; এমন করিলে সে আর আমার কাছে থাকিবে না—বাড়ী চলিয়া যাইবে। সে মধ্যে মধ্যে এমন ভয় দেখাইত; কিন্তু "ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" কারণ, আমি জানিতাম তাহার বাড়ী ছিল না অথবা যদি থাকিয়া থাকে তবে বিশ বৎসর পূর্ব্বে, তাহার চিহ্ন বা তাহাতে তাহার অধিকার, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তিন দিনই হউক আর পাঁচ দিনই হউক, ফিরিয়া ত আসিয়াছি! কবে হয়ত যাইব আর ফিরিব না।" "অমন কথা বলিতে নাই" -বলিয়া সে আমার ব্যাগটি লইল এবং গাড়ীতে কিশোরীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে একবার তাহার দিকে—একবার আমার দিকে চাহিতে লাগিল।

আমি কিশোরীকে নামিতে বলিলাম। সে নামিয়া আসিল। আমি কুলদীপকে বলিলাম, "ব্যাগটা আমার ঘরে রাখিয়া ইহাকে মা'র ঘরে লইয়া যাও।"

আমি গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া যখন আমার ঘরে উপস্থিত হইলাম তখন কুলদীপ তথায় হাজির হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে?"

আমি বলিলাম, "সে সব পরে শুনিও, এখন আমার স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

আমার এ উত্তর তাহার মনের মত হইল না। সে বলিল "স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি বাজারে যাইব।"

"আচ্ছা যাও।"

প্রায় পনের মিনিট পরে কলতলায় যাইয়া দেখি, কুলদীপ পাচকের সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ভাবে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত। পাচকের সঙ্গে তাহার এমন সদ্ভাব পরিচয় সচরাচর দেখা যায় না। আমি বুঝিলাম, যতক্ষণ অপরিচিতার পরিচয় পাইয়া সে সন্তুষ্ট হইতে না পারিতেছে, ততক্ষণ সে

সেই কথারই আলোচনা করিবে। সেই জন্য অন্য লোকের অভাবে সে পাচকের সঙ্গে অকারণ মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া লইয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বাজারে যাইবার আয়োজন করিল।

স্নান করিয়া যাইয়া আমি ভাবিলাম; কিশোরীর সন্ধান লইতে হইবে। তখন মনে হইল তাহার ত বস্ত্রাদিও নাই! আমি একখানা কাপড় ও একখানা তোয়ালে লইয়া বাড়ীর ভিতরের অংশে প্রবেশ করিলাম। মা'র মৃত্যুর পর হইতে সে অংশে আমার বড় গতায়াত ছিল না—বাড়ীতে যতগুলা ঘর ততগুলার প্রয়োজন আমার ছিল না; কিন্তু বাড়ীটা এত বড়ও নহে—আর বাড়ীর ব্যবস্থাও এমন নহে যে খানিকটা রাখিয়া খানিকটা ভাড়া দিতে পারি।

যথাসম্ভব সবলে জুতার শব্দ করিতে করিতে আমি সেই অংশে প্রবেশ করিলাম। কিশোরী বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমি কাপড় ও তোয়ালে রেলিংএর উপর দিয়া বলিলাম, "চলুন স্নানের জায়গা দেখাইয়া দিব।"

সে আমার অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাটীতে কি কোন স্ত্রীলোক নাই?"

"না।"

"আপনার পিতামাতা কেহ নাই?"

"না। সে বিষয়ে আমি আপনারই মত দুর্ভাগ্য।"

কিশোরী বলিল, "আপনি আমাকে 'আপনি' বলিবেন না।"

"কি বলিয়া ডাকিব?"

"আমার নাম অপরাজিতা।"

যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই—বহুদিন হইতেই নাই—সে বাড়ীর অকৃতদার গৃহস্থ যুবকের পক্ষে অপরিচিতা কিশোরী অতিথির সৎকার ব্যবস্থা করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ আমাকে সেই দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি পদে পদে অসুবিধা ও ত্রুটি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু উপায় কি?

তাহার উপর আবার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। এই অপরিচিতার কথার ভাবে বোধ হইয়াছে, সে তাহার আত্মীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবে না, অথচ তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার কোন কল্পনাই নাই। আমি এখন কি করি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ত্তব্য কি ?

মধ্যাহ্নে আহারের পর আমি আমার ঘরে বসিয়া কয়দিনের লব্ধ অভিজ্ঞতার রোমন্থন করিতেছি, এমন সময় অপরাজিতা আসিয়া বলিল, "আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম।" আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাহার কথায় চমকিয়া উঠিলাম; তাহার পর তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম।

বসিয়া সে বলিল, "আমি আপনাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছি।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু যে অনিচ্ছায় বিপন্ন করে, সে সে ত্রুটি স্বীকার করিলে একটু বিব্রত হইতে হয়। আমি বলিলাম, "আর কিছুই নহে—আমার বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই—সেই বড় অসুবিধা। তোমারও বড় অসুবিধা হইতেছে।"

"অসুবিধাতেই আমি দীর্ঘকাল হইতে এত অভ্যস্ত যে, তাহাই আমার কাছে স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মনে হয়। আমার অসুবিধা নাই। অসুবিধায় আপনাকেই বড় কাতর দেখিতেছি।"

"বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক থাকিলে তোমার থাকাতে কোন অসুবিধাই হইত না।"

অপরাজিতা কি ভাবিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকিলে কেন নিঃসম্পর্কীয়া—বিপন্না—অপরিচিতার সে গৃহে থাকিতে নাই ?"

এ প্রশ্ন একান্তই অপ্রত্যাশিত। কেন থাকিতে নাই—তাহার বিচার আমি অপরাজিতার সঙ্গে কেমন করিয়া করিব ? শেষে ভাবিয়া আমি বলিলাম, "তাহা আমাদের সমাজে লোকাচার-বিরুদ্ধ।"

"তাহাই ত একমাত্র কারণ ?"

"হাঁ। কিন্তু মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার ফলেই লোকাচার প্রবর্ত্তিত হয়।"

"লোকাচার যখন মানুষই প্রবর্ত্তিত করে, তখন মানুষের পক্ষে লোকাচারের পরিবর্ত্তন করাই কি অসম্ভব ?"

"অসম্ভব নহে। কিন্তু অকারণে লোকাচার পরিবর্ত্তিত হইবে কেন ? মানুষকে যতদিন সমাজে থাকিতে হইবে—ততদিন সমাজের শাসন অকারণে অবহেলা হইতে বিরত থাকিতেই হইবে।"

"আপনার পক্ষে অবশ্যই এ পরিবর্ত্তন অকারণ।" সে ভাবিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর তোমার পক্ষে ?"

" আমার পক্ষে এই পরিবর্ত্তনই প্রয়োজন।"

" কেন ?"

" যতদিন উপযুক্ত আশ্রয় না পাওয়া যায়, ততদিন পথের অপেক্ষা বৃক্ষতলও ত ভাল।"

" অবশ্য। কিন্তু তুমি কোন্ আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছ জানিতে পারি কি ?"

" সে বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শই চাহিতেছি। আপনাকে বিপন্ন করিবার অধিকার বা অভিপ্রায় আমার নাই। আমার অবস্থা শুনিয়া আপনি আমাকে আমার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যে পরামর্শ দিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।"

তাহার পর সে সরলভাবে---নিঃসঙ্কোচে তাহার অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল। তাহার পিতা আমার পিতারই মত আত্মীয়দিগের দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সংসারে আপনার চেষ্টায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃহৎ ব্যবসা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সকল ব্যবসাই নদীর মত—যতদিন বহতা থাকে, ততদিন প্রচুর দান করে; কিন্তু একবার বন্ধ হইলে তাহার বক্ষ হইতে কেবল মৃত্যুর বিষই ব্যাপ্ত হইতে থাকে। আবার এক জাতীয় ব্যবসা আছে যাহা জলবুদ্বুদের মত—যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে ততক্ষণ দেখিতে সুন্দর—তাহার অঙ্গে রবিকরে ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকশিত হয়—পবন তাহাকে চঞ্চল করিয়া আন্দোলিত করে; কিন্তু সামান্য আঘাতে তাহার অস্তিত্বনাশ হয়—জলবুদ্বুদ জলে মিশাইয়া যায়। সে জাতীয় ব্যবসা এদেশে পূর্ব্বে বড় ছিল না—এখন অনেক হইয়াছে, তাহা জুয়াখেলারই প্রকারভেদ। যে একবার সে ব্যবসার নেশায় প্রবৃত্ত হয় তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। খোয়াড়ীর সময় মাত্রা চড়াইতে হয়—মাত্রা ক্রমে বাড়িয়াই যায়। অপরাজিতার পিতা সেইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন ব্যবসা ভালই চলিয়াছিল। তাহার পর বে-পড়তা পড়িল---লোকসান আরম্ভ হইল। একটা ধাক্কা না সামলাইতে আর একটা ধাক্কা আসিতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন—নূতন নূতন ব্যবসা জড়াইয়া কোনরূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না—বুদ্বুদ ফাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি জ্বরে কাতর হইলেন—উপসর্গ দেখিয়া চিকিৎসকগণ বুঝিলেন, ভয়—মস্তিষ্ক লইয়া। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিল; কিন্তু তাহাতে রোগ দূর হইল না—মৃত্যুকবল বিলম্বিত হইল। শেষে যখন মৃত্যু তাঁহার সকল দুশ্চিন্তার ও যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল, তখন তাহার পত্নী-পুত্রীর আর কোনই অবলম্বন বা সম্বল রহিল না। অপরাজিতার মাতা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যাঁহাদিগের সহিত মনান্তরের ফলে অপরাজিতার পিতা তাঁহাদের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে দুর্দ্দিনে অপরাজিতার ও তাহার মাতার ভার লইলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। সে ভার লইবার লোকের একান্তই অভাব ঘটিল। শেষে নানাস্থানে আশ্রয় চাহিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়া একস্থানে তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন। অপরাজিতার মাতার মাতুলালয় দূর পল্লীতে

—মাতুলের মৃত্যুর পর, যখন অপরাজিতার পিতার ব্যবসা ভাল চলিতেছিল, তখন মাতুলপুত্রেরা তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। স্বজনপ্রতিপালন করিবার জন্য অপরাজিতার পিতা তাঁহাদের একজনকে একটা কাজ দিয়াছিলেন—অচল জানিয়াও তাঁহাকে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তহবিল ভাঙ্গিয়া ভগ্নীপতির কিছু লোকসান করিয়া দিয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। এখন তিনিই অত্যন্ত উদারতা দেখাইয়া ভগিনীকে ও ভাগিনেয়ীকে স্থান দিলেন। মা'র সঙ্গে অপরাজিতা সেই গৃহে আসিল। পল্লীগ্রামের সঙ্গে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে তাহার সেই প্রথম পরিচয়। দুইটির কোনটিই তাহার ভাল লাগিল না। কিন্তু নিরুপায়ের উপায় কি? সে নূতন জীবনে অভ্যস্ত হইতে লাগিল—তাহার সরল হৃদয়ে নূতন অবস্থায় সন্তোষ সঞ্চার করিতে লাগিল। গৃহপালিত গাভী, কুকুর, পারাবত তাহার স্নেহলাভ করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সেও তাহাদের লইয়া সময় কাটাইত—দরিদ্র পরিবারে আশ্রিতাকে যে শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, তাহা করিয়া সে অবসরটুকু আনন্দে কাটাইত। কিন্তু আশ্রয়দাতার উদারতার ও দয়ার কারণ অধিক দিন প্রচ্ছন্ন রহিল না। অপরাজিতা সুন্দরী—বড় কুলীনের কন্যা। তাহার বিবাহ দিয়া তিনি "দাঁও মারিবার" চেষ্টায় ছিলেন। কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রামের দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিতে ব্যগ্র বৃদ্ধদিগের সহিত তিনি ভাগিনেয়ীর জন্য দর কসাকসি করিতেছিলেন। অপরাজিতার শিক্ষা ও সংস্কার সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের ছিল। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়ে পাঠ করিত—ইংরাজীতে, বাঙ্গালায়, সূচীশিল্পে ও সঙ্গীতে সে পরীক্ষায় তাহার সহপাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত—শিক্ষয়িত্রীদিগের প্রিয় ছিল। তাহার নূতন আশ্রয়ে তাহার সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মাতা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে যে ইংরাজী ও সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছে, সে কথা প্রকাশ পাইলে নিন্দা হইবে—এই পল্লীতে সেরূপ শিক্ষার প্রচলন নাই; সে যদি কোন বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া পড়িত তাহাতেও চারিদিকে বিদ্রূপ-গুঞ্জন শুনা যাইত—মামীদের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিত; আর শিক্ষিত সূচীশিল্পের পরাকাষ্ঠা কন্থায় কন্থার কাজেই প্রদর্শিত হইত। সে যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইতেছিল। দূরদর্শী দার্শনিকেরা বলেন, জগতে লব্ধশিক্ষা কখনই ব্যর্থ হয় না—জীবনের কোন না কোন কাজে তাহারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল প্রযুক্ত হয়—শিক্ষা স্বভাবের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক শিক্ষা ব্যর্থ হয়—সে জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। যে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত "ভবিতব্যং ভবত্যেব"-ভাবে মানুষ তাহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে অপরাজিতার তখনও সে ভাবের অধিকার জন্মে নাই। তাই সে যখন মনে করিত, সে কোথা হইতে কোথায় আসিল—তাহার পিতার সযত্ন-প্রদত্ত শিক্ষা কেমন করিয়া ব্যর্থ হইল—তখন সে দুঃখ অনুভব করিত। কিন্তু তাহার সে দুঃখের কথা জানিতে পারিলে তাহার মাতার দুঃখ দ্বিগুণ হয় বুঝিতে পারিয়া সে বড় দুঃখও অপ্রকাশিত রাখিতে শিখিত—চেষ্টা করিয়া

শিখিত। তাহার যে বয়স তাহাতে তাহার পক্ষে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আশার আদর্শের কল্পনা করাও বোধ হয় অসম্ভব ছিল না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে—আলোকে অন্ধকার সমাগমে—যখন সে আদর্শের কল্পনাও পরিবর্ত্তিত করা অনিবার্য্য হইয়াছিল সে যে তাহাতেও বেদনা অনুভব করিত তাহাও সহজেই মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল ব্যাপারেই একটা সীমা আছে। যখন সে জানিতে পারিল, মামাদের কাছে যে দন্তহীন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পলিতকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি আসিয়া হুক্কা টানিতে টানিতে কাসির শব্দে মণ্ডবঘর মুখর করিয়া তুলেন—তাঁহারা তাহারই করলাভের আশায় আসিয়া থাকেন এবং মামাদের সেই অভিপ্রায়ের সন্ধান পাইয়াই তাহার মাতা দুশ্চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃতা হইতেছেন তখন তাহার পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব রহিল না। সে একদিন মা'কে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। কন্যার প্রশ্নে মা'র হৃদয়ে দুঃসহ বেদনা উথলিয়া উঠিল। সেদিন রাত্রিতে মাতাপুত্রী কেবল কান্দিলেন। শোকে—দুঃখে—দুর্ভাবনায় মা'র শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দুঃখীর পক্ষে মৃত্যুর মত সুহৃদ আর নাই। শেষে সে আসিয়া মা'র সকল দুঃখ দূর করিয়া দিল। অপরাজিতা একা—সংসারে তাহার আর কেহই নাই—আছে কেবল দুঃখ। তবুও সে মা'র মৃত্যুতে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে একটু সুখ বোধ করিল—মা'র ত সকল দুঃখের অবসান হইল। মা'র মৃত্যুর পর মাস ফিরিতে না ফিরিতে তাহার বিবাহের জন্য মামাদের ব্যাকুলতা বিবর্দ্ধিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। এখন আর কাতরভাবে কান্দিয়া কন্যাকে অপাত্রে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। মামারা বলিতেন, এত বড় মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া সমাজে তাঁহাদের মুখ দেখান দায় হইয়া উঠিতেছে। মামীরা বলিলেন, যে আপদ এমন করিয়া বাপ মা "খাইল" তাহাকে ঘরে রাখিতে ভয় হয়। মামাদের কথায় অপরাজিতার বড় দুঃখ ছিল না—কিন্তু মামীদের কথায় তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইল। সে শুনিয়াছিল, তাহার পিতা নিঃসম্বল অবস্থায় বাহির হইয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, তিনি সংসার দেখিতে যাইতেছেন—দেখিবেন, তাঁহার স্থান হয় কি না। পিতার সেই কথা মনে করিয়া সাহস হইয়াছিল। পিতা পুরুষ—সে স্ত্রীলোক, পিতার শিক্ষা ও সংস্কার তাহার শিক্ষা ও সংস্কার হইতে স্বতন্ত্র—এসব কথা সে তখন ভাবিয়া দেখিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল, সংসারে তাহারও স্থান হইবে—সে এই শত্রুপুরী ত্যাগ করিবে। মন্মথ তাহার এক মামার শ্যালকপুত্র। গ্রামের বিদ্যালয়ে মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়া সে বিদ্যা-শিক্ষায় ইস্তফা দিয়াছিল—সে কেবল বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িত,—কারণ তাহাতে অতি অল্প আয়াসে সর্ব্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের ভান করা যায়,—আর বর্ণনা—ও বিশ্লেষণ বাদ দিয়া বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠ করিত। সে নারিকেল তৈলে সস্তা গন্ধতৈল মিশাইয়া লাল রং করিয়া মাখিত, কেশ বেশের পারিপাট্য সাধনে বিশেষ মনোযোগ দিত। সে মধ্যে মধ্যে পিসীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত—সেই গৃহে তাহার সঙ্গে অপরাজিতার সাক্ষাৎ। সে অপরাজিতার মাতার ও তাহার অবস্থান্তরে দুঃখ প্রকাশ করিত—আশার কথা বলিত। অপরাজিতা গৃহে

আসিবার পর হইতে পিসীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন হইত। কিন্তু সেদিকে কেহ বড় দৃষ্টি দেন নাই—কারণ অপরাজিতা সে সংসারের ভার মাত্র—আবর্জ্জনা বলিয়াই বিবেচিত হইত। মা'র মৃত্যুর পর একদিন কথায় কথায় অপরাজিতা তাহাকে বলিয়াছিল, এই সংসারে সে কি কোনরূপেই পরের গলগ্রহ না হইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না? উত্তরে মন্মথ বলিয়াছিল, "পারে"। তাহার পর হইতেই সে তাহার কল্পনাকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বাহিরে বিপুল বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার শত উপায় সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিত। বলিত, অপরাজিতা তাহার লব্ধ শিক্ষার দ্বারাই আত্মসমর্থন করিতে পারে। সব কথা অপরাজিতা যে বিশ্বাস করিত এমন নহে। কিন্তু যখন মামারা নগদ পাঁচশত টাকা লইয়া তাহার সঙ্গে খলিসাখালি সাকিনের বাষট্টিবর্ষবয়স্ক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ভাগিনেয়ী দিবার সব বন্দোবস্ত স্থির করিলেন তখন সে মন্মথকেই অবলম্বন করিয়া বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মন্মথের দয়ার কারণ কলুষিত কি না তাহা ভাবিবার সময় আর তখন রহিল না—থাকিলেও সে সংসারজ্ঞানহীন। মনে করিল, মানুষ ইচ্ছা করিলেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা আমার অজ্ঞাত নহে। নৌকাপথে রেলওয়ের ষ্টেশনে আসিয়া মন্মথের সাহসে আর কুলায় নাই—সে ট্রেণ ছাড়িবার সময় ট্রেণ হইতে নামিয়া পলাইয়াছে।

ইহাই তাহার জীবনের ইতিহাস—অবস্থার বিবরণ। সংসারে তাহার কোন আশ্রয় নাই—কোন অবলম্বন নাই। এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি?

এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? কিন্তু তাহার সব কথা শুনিয়া আমি এক বিষয়ে সঙ্কল্প স্থির করিলাম—উপযুক্ত আশ্রয় না পাওয়া পর্য্যন্ত সে আমার অনুপযুক্ত আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে না। আমি স্থিরভাবে স্থানের ও অর্থের অভাব না থাকিলেও তাহাকে আশ্রয়দানে আমার অনিচ্ছার কারণ বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। কারণ তিনটি—সন্দেহ, অপবাদের আশঙ্কা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব।

অপরাজিতার আত্মপরিচয়ে আমার মনে আর তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না—সে তাহার জীবনের সব কথা এমন সরলভাবে বিবৃত করিয়াছিল যে, আমি সব কথাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তাহার কথার ভাবেই আমি মনে করিয়াছিলাম, মিথ্যা তাহার পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ। হয় ত অত সহজে অপরিচিতাকে এমন ভাবে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিয়াছি, প্রথম বিশ্বাসই অনেক সময় অভ্রান্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। সন্দেহ দূর হইলেই আমার হৃদয়ে তাহার প্রতি করুণার আবির্ভাব হইল। এই বয়সে সে সংসারে কত দুঃখই পাইয়াছে। আজ যদি সে আমার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে কে বলিবে? যদি এমন দিনই ঘটে তবে সেজন্য আমি মানুষ—আমার কি মনে

কোন দায়িত্বই থাকিবে না ? মানুষের জীবনে অপরের উপকার করিবার অবসর সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, যে সে সুযোগ পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।

লোকাপবাদের জন্য আমার এমন কি আশঙ্কা থাকিতে পারে যে, আমি তাহার জন্য কর্ত্তব্যচ্যুত হইব ? যে অপবাদের মূলে সত্য না থাকে—তাহাকে মানুষ ভয় করিবে কেন ? লোকাচার মানুষই করে। আবার মানুষই তাহা ভাঙ্গিয়া থাকে। প্রথম যে লোকাচার ভাঙ্গে লোক তাহাকে "মন্দ" বলে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ রক্ষণশীল—তাহার কাছে যাহা নূতন তাহাই অপবিত্র। কিন্তু যখন দেখা যায় ভগ্নলোকাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নহে, তখন পরিবর্ত্তনকারী "মন্দ" হইতে "ভাল" হয়। জগতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। লোকাপবাদে আমার ভয় কি ? সংসারে অপরাজিতার যেমন কেহ নাই, আমারও তেমনই কেহ নাই। লোকাপবাদে আমার ভয় কি ?

ভয়—আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে। সেই অভাব অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করে—বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাওয়া অপেক্ষা বিপদের পথ ত্যাগ করাতেই সুবিধা। কিন্তু যে সাহসে তরুণ বয়সে অপরাজিতা মনে করিতে পারিয়াছে, বিপদে মানুষ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারিলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না, সে সাহস কি আমার পক্ষেই অকল্যাণকর হইবে ?

যাহাই হউক আমি অপরাজিতাকে—বিপন্নাকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিব না ; যতদিন তাহার উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া দিতে না পারিব, ততদিন সে আমার গৃহেই থাকিবে। আমি তাহাকে সেই কথা বলিলাম।

অপরাজিতা বলিল, "কিন্তু আমার জন্য আপনি অসুবিধা ভোগ করিবেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য।"

অপরাজিতা বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার টানা ভাসা চক্ষুতে সরলতা ব্যঞ্জক দৃষ্টি ফুটিয়া ছিল।

আমি বলিলাম, "সে সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—মানুষের বিপদে মানুষ সাহায্য করিবে, ইহাই নিয়ম। বিশেষ এ সংসারে তোমারও কেহ নাই, আমারও কেহ নাই। এ অবস্থায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিই স্বাভাবিক। আমরা সমাবস্থ, আমার দ্বারা তোমার যদি কোন উপকার হইতে পারে, আমি তাহা করিব। তাহাই আমার কর্ত্তব্য।"

অপরাজিতা কোন কথা বলিল না ; কিন্তু তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বরিশালের মাঝির গান

উজান সোতে গুণ টান্যা যাই বদ—র, বদ—র !
দড়ি ছেঁড়ে, নাও ঘোরে, বাবুর লাগে ডর।
ভয় না কর বাবু সাইব, বস্যা তামুক খাও,
ছইয়ের তলে চক্ষু বুজ্যা খানিক ঘুমাও ;
সাঁজ না হইতে নাও ছাড়্যা যাবা শ্বশুরবাড়ী ;
এত তটে তটে যাওনা, আর ত নাই পাড়ি।
জলে জলে নৌকা বাই, বিলে ধরি মাছ,
জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়া কাট্যা আনি গাছ ;
বাখরগঞ্জে বাড়ী আমার বড় গাঙ্গের ধারে ;
বনের বাঘ জলের কুমৈর ভয় বা করি কারে ?
মধ্য গাঙ্গে তুফান উঠে—মরজি দেবতার ;
মাঝি বসে হালটি চাপ্যা মাল্লা ঠেলে দাঁড় ;
ঢেউর তলে নাও নাচে, স্ত্রীলোক কান্দ্যা মরে ;
ঘুমের শিশু বুকের মাঝে শক্ত কর্যা ধরে।
বিধবা কয় জনম হৈলে মরণ আছেই আছে,
কিসের ক্ষেতি দুদিন আগে না হৈয়া দুদিন পাছে।
শক্ত হাতে দাঁড় ঠেলি গাঙ্গে দেই পাড়ি
জলের হ্যাশে বাড়ী আমার, জলের হ্যাশে বাড়ী।
মায়ের কোলে চড়্যা আমি ডোবায় দিছি ডুব,
দাদার লগে খালে নাম্যা সাঁতার শিখলাম খুব ;
বাপের নায়ে ফিরলাম কত দেশ দেশান্তর ;
ঝড়ে পড়লাম বার সাতেক, বদ—র বদ—র !
গৌর বরণ কালা হৈল ধলা হৈল কেশ ;
একটা আছে বড় পাড়ি, সকল পাড়ির শেষ।

শ্রীমতী কামিনী রায়

প্রতিধ্বনি

নদীয়ার টোল—একশত বৎসর পূর্ব্বে

মুসলমানশাসন সময়েও বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য, ধনীরা কিরূপ অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যয় করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। নালেন্দা, ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা এবং সুবর্ণবিহার প্রভৃতি সঙ্ঘরামের প্রস্তাব তুলিয়া কাজ নাই, সে ত বহুপূর্ব্বের কথা। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার ছোট ছোট প্রাদেশিক রাজারা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন তাহাই দেখাইতেছি। ১৭২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসের "কলিকাতা মাসিক রেজিষ্টার" (Calcutta Monthly Register) নামক পত্রিকায় নদীয়ার টোল সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"নদীয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব সর্ব্বত্র বিদিত; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত তিনটি টোল (College) আছে—নদীয়া, শান্তিপুর ও গোপালপাড়া—এই তিন স্থানেই তিনটি কলেজ অবস্থিত। এই কলেজগুলির যথেষ্ট অর্থ আছে, তাহাতে সর্ব্ববিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত তিন স্থানের আয়ে যখন অধ্যাপকগণের বেতনাদির অকুলান হয়, তখন রাজ-ভাণ্ডার এতদর্থে মুক্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপকগণের প্রত্যেকেই ত যথাযোগ্য বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তাঁহারা অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থা এরূপ প্রচুর, ও কলেজের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত এরূপ ব্যাপক যে, এখন একমাত্র নদীয়া কলেজেই এগারশত ছাত্র ও দেড়শত অধ্যাপক আছেন। পূর্ব্বে যত ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন, তাহা হইতে অবশ্য বর্ত্তমান সংখ্যা অতি অল্প। নবদ্বীপাধিপতি 'রুদ্রের' সময় এক নদীয়া টোলেই ৪০০০ ছাত্র এবং তদনুপাতে অধ্যাপকমণ্ডলী ছিলেন।

"নানাদেশ হইতে এই সকল টোলে যে ছাত্রগণ আসিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই পরিণতবয়স্ক। কারণ তাঁহারা অপরাপর বিদ্যালয়ে পড়া সাঙ্গ করিয়া এখানকার শিক্ষার যোগ্য হইয়া আসেন। নবদ্বীপে আসিয়াই তাঁহারা দর্শনাদি গুরুতর বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন। কিন্তু তথাপি অধ্যাপকগণ বলিয়া থাকেন যে; নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ করিতে হইলে, একজন শিক্ষিত ছাত্রকেও অন্ততঃ বিশ বৎসর তথাকার টোলে অধ্যয়ন করিতে হয়।

"যে কোন ছাত্র নবদ্বীপে সাহিত্যাদি বিষয় চর্চ্চা করিতে ইচ্ছুক হন, তিনিই নদীয়াতে বিনা খরচায় খাইতে পরিতে পান, তাহা ছাড়া রাজ-সংসার হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

"পণ্ডিতদিগের রীতি-অনুসারে প্রায় সমস্ত বিদ্যাই মুখস্থ করিতে হয়। এই ব্যাপারে সুবিধার

জন্য তাঁহাদের সমস্ত পুস্তক এমন কি অভিধান পর্য্যন্ত পদ্যে বিরচিত। কিন্তু এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা প্রাচীন বিদ্যালোচনায়ই পরিতৃপ্ত নহেন, পরন্তু যাঁহারা নূতন পুস্তক ও টিপ্পনী রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হন, তাঁহারা বিশেষরূপ পুরস্কৃত ও উৎসাহিত হইয়া থাকেন।

"এই সমস্ত টোল বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অধ্যাপনার রীতি এইরূপ :—দুইজন অধ্যাপক যে যে বিষয় ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইবে এমন কোন বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক উত্থাপন করেন। ছাত্রগণ সেই তর্কবিতর্কের যে অংশ বুঝিতে না পারেন, তাহা অধ্যাপকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বস্তুতঃ তাঁহারা এ বিষয়ে ছাত্রদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। যে ছাত্র একবারে নির্ব্বোধ সেও যদি বারংবার অধ্যাপককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যস্ত করিয়া তোলে—তবে অধ্যাপক ধীরতার সহিত তাহাকে উত্তর দিয়া থাকেন। ছাত্র নিতান্ত নির্ব্বোধ হইলেও যদি কোন অধ্যাপক তাহার প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সমস্ত অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি যৎপরোনাস্তি নিন্দিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায় একবারে বিমুখ হইয়া পড়েন।

"এই সমস্ত তর্কবিতর্কের সময় নদীয়ার রাজা প্রায়ই স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। কোন সাধারণ সভা উপলক্ষে এইরূপ বিচারে যাঁহারা অনন্যসাধারণ প্রতিভা বা শক্তির পরিচয় দেন, রাজা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। পূর্ব্বে এতদুপলক্ষে পাত্র ভরিয়া স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইত। এখন রাজা আর তাহা পারেন না। বিজয়ী অধ্যাপক এখন গরদের ধুতি ও কাঁসার পাত্র পাইয়া থাকেন। রাজার নিজহস্ত হইতে এই পুরস্কার লাভ করা তাঁহারা বিশেষ গৌরবের জিনিষ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ কোন সম্রাটদত্ত খেলাৎ তাঁহাদের নিকট এই সামান্য জিনিষগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে না। তাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়া ধন্য হইয়া যান। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই উদাসীনতা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।"

একশত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে উচ্চশিক্ষার এই সম্মান ও আদর ছিল। তাহার কিছুপূর্ব্বে এক নদীয়ার রাজা ৪০০০ ছাত্র ও প্রায় ৫০০ শত অধ্যাপকের পদোচিত সমস্ত ব্যয় ও পুরস্কারাদি নিজ সংসার হইতে প্রদান করিতেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এখন উচ্চশিক্ষার জন্য কি করিতেছেন? নবদ্বীপ যে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়াছিল তাহা কোন কোন বিষয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়াছে। এখন যে আমরা জ্ঞানের 'দেউটী' নিবাইয়া দিয়া দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদের বিশাল প্রকোষ্ঠগুলি আঁধার করিতে বসিয়াছি! এই মহাপাঠশালার দ্বার বন্ধ হইলে যে আমরা কোল ভীলে পরিণত হইব। শিক্ষার গৌরব নষ্ট হইলে বঙ্গদেশের মর্য্যাদা যে একবারে নষ্ট হইবে। বাঙ্গালীর ত গৌরব করিবার আর কিছু নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ধূমপানে চরিত্র পরীক্ষা—গ্রেটন হেল নামে একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষের সিগারেট কিংবা সিগার ধরিবার পদ্ধতিটা জানিতে পারিলেই তাহার চরিত্রের অনেক কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রায়ই বুড়া আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া সিগারেটের কিংবা সিগারের ডগার দিক্‌টা ধরেন, এবং হাত ঝুলাইয়া রাখেন; তাঁহারা ঠোঁট দিয়া সিগারেট স্পর্শ করেন না,—আঙ্গুলের উপর মুখ রাখিয়াই ধূমপান করেন; আবার এমনই ভাবে ধূমপান করেন, যেন, তিনি অন্য কোন একটা বিষয় ভাবিতেছেন।

স্ফূর্ত্তিবাজ, সৌভাগ্যবান, দ্রুত চিন্তাশীল, হাস্যরসিক ব্যক্তিরা প্রায়ই ডাহিন হাতের তর্জ্জনী ও মাঝের আঙ্গুল দিয়া সিগারেট ধরিয়া থাকেন। সিগারেট খাইবার সময় তাঁহারা অনেক সময়ই শূন্যের দিকে চাহিয়া নানা রকম তরল ভাবনায় বিভোর থাকেন। অবিশ্বাসী, চঞ্চল ও অসৎ ব্যক্তিরা প্রায়ই বুড়া আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর ডগা দিয়া সিগার কিংবা সিগারেটের মধ্য দিক্‌টা ধরেন, এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলি সমান্তরালভাবে রাখেন। এইরূপভাবে সিগারেট ধরাতে তাঁহাদের চরিত্রে ক্রোধ ও অবিশ্বাসের ভাব প্রবল বুঝায়।

স্থিরবুদ্ধি ও আত্ম-নির্ভরশীল ব্যক্তি ডাহিন হাতের বুড়াআঙ্গুল ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগে সিগার কিংবা সিগারেট নীচু করিয়া ধরেন এবং ধূমপান করিবার সময় হাতটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া রাখেন।

* * *

সাঙ্কেতিক লিখন—বিলাতে আজকাল সাঙ্কেতিক (Short-hand) অক্ষরে লিখিত উইলও আইনসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সেদিন প্রবেট কোর্টে একখানি সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত উইল পেশ করা হইয়াছিল, বিচারক সার হেন্‌রী ডিউক তাহা আইনসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা নাকি সাঙ্কেতিকভাবে লিখিত উইলের মধ্যে দ্বিতীয়।

* * *

দ্রুতলিখন—পৃথিবীর সকল দেশেই এখন বিষয়কর্ম্মে সাঙ্কেতিক লেখার প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই সাঙ্কেতিক লেখা (Short-hand) এবং টাইপ রাইটীং খুব চলিতেছে। কিন্তু এখনও লেখা তেমন তাড়াতাড়ি হয় না।

বিলাতে নাকি মিস্ মিলসেণ্ট ওডওয়ার্ড একজন বক্তার ২৩৫টি শব্দ একমিনিটে টাইপ করিয়াছিলেন। মিস্ ওডওয়ার্ড চোক বাঁধিয়া প্রথমে মিনিটে ১৭৩টি শব্দ টাইপ করিতে শিখেন। তিনি প্যারিস্ নগরে একটি প্রতিযোগিতার সময় পাঁচ মিনিটে ৩,৩৯৪টি ঘা (stroke) দিয়াছিলেন। ইনি খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করিবার সময় গল্পগুজবও ক ন। আমেরিকার বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় ইনি নিউ ইয়র্কে গিয়াছিলেন এবং সেখানে মিনিটে ১৪৩টি শব্দ টাইপ করেন।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সাঙ্কেতিকলেখক একজন আমেরিকাবাসী। তাঁহার নাম মিঃ নেথান বেরিন। তিনি ১৯১৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যে প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম সাঙ্কেতিক লেখক বলিয়া নাম কিনিয়াছেন। তখন তিনি মিনিটে ৩২২টি শব্দ লেখেন। তারপর আর একদিন এক স্কুলের বোর্ডের উপর মিনিটে ২৬০টি শব্দ লিখিয়াছিলেন।

* * *

বিবাহের আজগুবি প্রথা—নিউ হেব্রিডিসে মেলেকোনা একটি দ্বীপ। সেইখানে বিবাহিতা রমণীকে সম্মুখের দুইটি দাঁত তুলিয়া ফেলিতে হয়। গ্রামের একজন বৃদ্ধা ঐ দু'টি দাঁত তুলিয়া দেয়। আর একটি অদ্ভূত রীতি এই যে বালিকাদের মাথার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ছোটবেলা হইতেই তাহাদের মাথায় খুব শক্ত দড়ি কষিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। বালিকার মাথার উপর আগে একখানি ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া ঐ দড়ি বাঁধা হয়। যে বালিকার মাথা মোচাকৃতি হয় তাহার বর জুটিতে কোন অসুবিধা হয় না; মাথার আকার পরিবর্ত্তিত না হইলে মেয়েদের বিবাহ হয় না।

শ্রীবরদা দত্ত

* * *

বাত রোগে প্রবালের বালা—যাবা, সুমাত্রা, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে খুব প্রবাল বা পলা পাওয়া যায়। ঐ সকল অঞ্চলে বাতের রোগীরা এক রকম কাল প্রবালের বালা পরে; তাহাদের বিশ্বাস উহাতে বাত সারে। এই শ্রেণীর পলার সে অঞ্চলের নাম "আকার বাহার"। বিলাতের কয়েকখানি বিজ্ঞানের পত্রিকায় ডাক্তার পাউন্যাল (Pownall) লিখিয়াছেন যে, তিনি সাতচল্লিশ বৎসর সে দেশে আছেন, আর দেখিয়াছেন, যে যথার্থই ঐ পলার বালায় বাত ভাল হয়। বিলাতে ঐ পলার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে radio-activity বা অন্য কোন এমন গুণ নাই যাহা শরীরের ভিতরে কোন কাজ করিতে পারে। এইজন্য ঐ পণ্ডিতদের এখনও সন্দেহ যে, হয়ত বা পলার বালা সম্বন্ধে যাবা অঞ্চলে একটা কুসংস্কার আছে। এখনও পরীক্ষা চলিতেছে।

* * *

বিনা ইচ্ছায় হাত চালা—গত ডিসেম্বর মাসে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ (Strasbourg) নগরে হাত-চালার একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়াছে। একটা খালি ঘরের মধ্যে একজন মানুষকে যদি তিন দিকের দেয়াল হইতে বেশি দূরে দাঁড় করান যায়, আর সে তাহার পাশের দিকের একটি দেয়ালের ১৮ ইঞ্চি আন্দাজ দূরে থাকে, তবে তাহার হাত লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে পরীক্ষা করা যায়:— দেয়াল হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে যে হাতখানি রহিবে, সে হাতখানি একটুও শক্ত বা আড়ষ্ট না করিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে; একটু বাদে ঐ হাতখানি যথাসাধ্য শক্ত করিয়া ধীরে ধীরে (হাতের

উল্টা দিক দিয়া) হাতখানি দেয়ালে লাগাইতে হইবে ও যত জোরে পারা যায় তত জোরে দেয়ালকে ঠেলিতে হইবে; ১৫ সেকেণ্ড পর হাতখানি ঐরূপ শক্ত রাখিয়াই পাশে আনিয়া ঝুলাইতে হইবে ও পরে হাতখানিকে একেবারে ঢিলা দিতে হইবে; দেখা যাইবে যে লোকটির বিনা ইচ্ছায় হাতখানি উঁচু হইয়া উঠিবে, ও ভূমির সমান্তরাল হওয়া পর্য্যন্ত উঠিয়াই আবার পড়িয়া যাইবে। হাত উঠিবার সময় মানুষটির মনে হয়, কে যেন তাহার হাত টানিয়া তুলিতেছে। যাহাদিগকে লইয়া এই পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে এই পরীক্ষার বিষয় বা উদ্দেশ্যের কথা কিছুই বলা হয় নাই, কারণ ঐ কথা শুনিলে তাহাদের মনে অলক্ষ্যে হাত তুলিবার ইচ্ছা জন্মিতেও পারিত। আমাদের দেশে যে সকল নল চালা ও হাত চালা আছে, তাহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা যায় না কি ?

* * *

জাতিমিশ্রণে আমেরিকার ভবিষ্যৎ—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে নানা দেশের নানা জাতি মিলিয়াছে,—কেহ সেখানে বাড়ী ঘর করিয়াছে, কেহ বা বাসা বাঁধিয়াছে; আর ইহার ফলে জাতি-সঙ্কর ও বর্ণ-সঙ্কর হইতেছে। এই মিলনে ও রক্ত-মিশ্রণে যুক্তরাজ্যের উন্নতি হইবে না অমঙ্গল হইবে, তাহা অতি ধীরভাবে কয়েকজন সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বিচার করিতেছেন। এই পণ্ডিতদের মধ্যে Franz Boas খুব বিখ্যাত; একে ইনি নৃ-তত্ত্ব-বিশারদ তাহার উপর ইনি খাঁটি শাদা দলের লোক। কাজেই ইঁহার উত্তেজনাহীন নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সমালোচনা সকল শ্রেণীর কাছেই আদৃত হইতেছে। ইনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে কোথাও এমন জাতি নাই যাহাতে বহু-জাতি-মিশ্রণ ঘটে নাই; তাহার পর বিশেষ প্রমাণে দেখাইয়াছেন যে, ইউরোপের সকল প্রদেশেই বহু-জাতি-মিশ্রণ হইয়াছিল, তাহার পরই দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইউরোপের সকল প্রদেশের লোকের রক্ত-মিশ্রণে যে জাতি-সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জাতি-সঙ্ঘে জীবনীশক্তির বা সদ্‌গুণের বিকাশে বাধা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের বিভিন্ন রকমের শারীরিক ছাঁচ, বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে এক রকম ছাঁচে দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাও দেখান হইয়াছে।

ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে রক্ত-মিশ্রণে, জাতি-মিশ্রণ হয় বটে, কিন্তু বর্ণ-মিশ্রণ তেমন অধিক হয় না। কারণ পরস্পরের মধ্যে বর্ণ-ভেদ খুব অধিক নয়। যুক্ত-রাজ্যের অতি কঠিন সমস্যা আফ্রিকার নিগ্রো লইয়া। প্রথমে যখন আমেরিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশ হয়, তখন স্থানীয় Red Indianদের সঙ্গে অল্প রক্ত-মিশ্রণ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প বলিয়া হয়ত বা ঐ মিশ্রণের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। Boas দেখাইয়াছেন যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিগ্রোদের রক্ত-মিশ্রণে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের শরীরের ছাঁদ বদলাইয়াছে ও মানসিক শক্তিতেও তাহারা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা হীন নহে। এই মিশ্রিত 'মুলাত্তো'রা ইউরোপীয় সমাজে গৃহীত

হইলে যে ইউরোপীয় রক্তের লোকেদের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না তাহাও উক্ত পণ্ডিতটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষায় ও সভ্যতায় 'মুলাত্তো'দের সামাজিক ব্যবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইউরোপীয়ের বংশধরেরা উহাদের সঙ্গে মিলিলে, যে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং পরস্পরে মিলিতে মিলিতেই যে বর্ণ-বিদ্বেষ দূর হইবে, ইহাই Boasএর প্রতিপাদ্য বিষয়। পণ্ডিতদের ঠাণ্ডা মাথার বিচার যাহাই হউক যুক্ত-রাজ্যে বর্ণ-বিদ্বেষ অতি প্রবল; 'মুলাত্তো'দের অতি উন্নত ব্যক্তিরাও রেলগাড়ীতে পর্য্যন্ত শাদা লোকদের সহযাত্রী হইতে পারে না।

* * *

গ্রন্থি।

১

সেই গিয়েছে, দেখছি আহা জাল্‌নাতে
তাহার দেওয়া গিঁটুটী বাঁধা আলনাতে।
তাহার বোনা আসনখানি দুলছে গো,
দিবস নিশি তাহার কথাই তুলছে গো।
ওই যে ছবি তাহার হাতের অঙ্কিত,
ওই যে বীণা অঙ্গুলে তার ঝঙ্কৃত।
সেই গিয়েছে। নেয়নি কিছুই সঙ্গেতে,
বাঁধন তাহার জাগছে ধরার অঙ্গেতে।

২

তাহার হাতের টাঙ্গানো ওই হিন্দোলায়,
মা-হারা ওই খোঁকায় তাহার দিন দোলায়।
ফুলদানীতে তাহার গাছের পুষ্প গো,
ময়না তাহার আর কত কাল পুষ্‌বো গো!
ঘর যে আলো তাহার আঁখির দীপ্তিতে;
শয্যা সরস তাহার বুকের তৃপ্তিতে।
ভুল্‌বো আমি, ভুল্‌বো তারে কোন্ ছলে,
টান দিতেছে গাঁটছড়া এই অঞ্চলে।

৩

সে নয় কেবল, যে যায় জ্যোতিবর্ম্মে'তে
এমনি করে গিঁট রেখে যায় মর্ত্তেতে।
তাদের বাঁধন আর্দ্র হয়ে ক্রন্দনে
নিবিড় করে বাঁধলে ধরায় বন্ধনে।
গৃহের প্রতি তৈজসে ও আসবাবে
স্বরগবাসী নরের করের বাস পাবে।
মর্ত্ত স্বরগ বাঁধ্‌লে তারা ফুল ডোরে।
ধূলায় তাদের জয়পতাকা উড়লোরে।

৪

তাদের হাতেই আধেক গড়া এই ধরা,
এই জীবনের আধেক সুখই দেয় তারা।
দলিল, ছাড়, ও ফন্দীভরা সন্ধিতে,
আঁকড়ে তারা বাঁধলে ধরা গ্রন্থিতে।
মঠ দেউলে মিনার মহল মন্দিরে
গিঁট বেঁধে হায় করলে কালে বন্দীরে।
এই ধরণীর শ্যামাঞ্চল ওই মাঠজোড়া
প্রান্তে ঝোলে তাদের চেলীর গাঁটছড়া।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্য-বীথি

কবিতা, রবীন্দ্রনাথের মোহিনী কল্পনায় নিত্য নূতন হইয়া দেখা দিতেছে। তাঁহার হালের চিত্রগুলি শিশু-সৌন্দর্য্যের পটে আঁকা ; স্নেহ-বাৎসল্যের অতি স্নিগ্ধ আলোকের মধুর প্রভায়, দর্শকের চক্ষে পারাপারের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে। আমাদের সাহিত্য যদি একা রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তিতেই সমৃদ্ধ হইত, তবে আনন্দের মধ্যে বিষাদ অনুভব করিতাম। রবীন্দ্রনাথের মত কবি সকল দেশেই অল্প জন্মে ; আমরা যে অন্যান্য ভাল কবির রচনায় তৃপ্তি পাই, ইহা জাতীয় সাহিত্যের গৌরবের বিষয়। গত দু-এক মাসের মধ্যে যে সকল প্রাণস্পর্শী সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে দুইটি কবিতার নাম বলিব। মোস্‌লেম-ভারত পত্রে প্রকাশিত কবি নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী" অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ; কবিতাটি পড়িতে পড়িতে পাঠকের বুক ফুলিয়া ওঠে,—মাথা উঁচু হয়। শেষের দিকের কিয়দংশ পড়িলে সুইনবার্ণ রচিত Hertha মনে পড়ে, কিন্তু ঐ "হার্থা" অপেক্ষা "বিদ্রোহী" অনেক উচ্চে। "বিজলী"তে প্রকাশিত কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের "দ্বীপান্তরে" অতি প্রাণস্পর্শী রচনা। "ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ্গ, হেঁইয়া হো!" ধূয়াটির তালেতালে যে করুণ রসের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে, তাহা না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না ; মনে হয় যেন আমাদের চেতনা বেদনার ঘানিতে ঘুরিতেছে, কেহ যেন কর্কশহাতে প্রাণের সুতায় দড়ি পাকাইতেছে, আর বুকের উপরে কেহ যেন পাথর ভাঙ্গিতেছে।

* * *

গল্প-রচনার বান ডাকিয়াছে, কিন্তু বানের মুখে ভাল সামগ্রীর চেয়ে অসার জিনিষই অধিক ভাসিয়া আসিতেছে। কোন রকমে "এক যে রাজার" গল্প খাড়া করিয়া ঠাকুরমারা যেমন করিয়া শিশুদিগকে ঘুম পাড়ান, আমরাও সেই রকমে আসমানি প্রেমের গল্প রচিয়া পাঠকদের চিত্ত-বিনোদন করিতে চাই। প্রাণের স্পন্দন নাই, জীবন-রহস্য উদ্ভিন্ন হয় না, খাঁটি সমাজ-চিত্রে দেশকে চিনিতে পারা যায় না, কাব্য-শিল্পের চাতুরীতে জীবন-প্রদ সৌন্দর্য্যের দিকে চোখ পড়ে না,—কেবল গল্প পড়ার খাতিরেই গল্প পড়া-হয় ; এই হইল বেশির ভাগ গল্পের অবস্থা। জীবনের যথার্থ নিগূঢ় অভিজ্ঞতায় যদি লেখকদের মনে গল্প গজাইয়া না ওঠে, তাহা হইলে অসম্বদ্ধ রূপকথারই সৃষ্টি হইবে। যাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু উপাদান যোটে না, তাঁহারা যদি আমাদের সমাজ-সমস্যাদির কথা গল্পচ্ছলে লেখেন, তাহা হইলে সাহিত্যে বেশি জঞ্জাল বাড়ে না। খাঁটি খেয়ালের

অনেক মূল্য আছে, কিন্তু সে খেয়াল ধর-পাকড়ে আসে না। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের একটি রচনা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি যে, কাব্য জিনিষটা বাগানের ফুল, উহা ময়রার দোকানের ফরমাইসে গড়া জিনিষ নয়।

* * *

বিজ্ঞান-আলোচনার একটা ফেসান্ বা রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে, তাই সকল কাগজেই দু-চারিটি বিজ্ঞানের টুক্‌রা থাকে, কিন্তু হয় সেগুলি পাথরের টুক্‌রার মত শক্ত, আর না হয়ত, চৈত্রের নির্জ্জলা যবের ছাতুর মত গলাধঃকরণের অযোগ্য গুঁড়া। যাহাতে তথ্য অনুসন্ধানে কৌতূহল বাড়িতে পারে, সাধারণ লোকের মনে একটা আগ্রহ জন্মিতে পারে,—সে রকমের আলোচনা বড় হয় না। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের সঙ্গে যাঁহাদের একাসন, এ দেশের এমন কএকজন বৈজ্ঞানিকের নাম করিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা যেন বাঙ্গলার বড়মানুষের বাগানে পোঁতা চন্দনের গাছের মত; দেশের মাটিতে ঐ গাছ স্বতঃজাত হইবার মত হয় নাই। যে বিদ্যা না শিখিলে নিজেরা কল-কারখানা গড়িতে পারিব না, সে বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিলে, বৈজ্ঞানিক সংবাদ দেওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল কাজ করা হইবে। নিজে একটা কিছু সৃষ্টি করিতে পারিলেই মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দ জন্মে; শিশুদের খেলাধূলাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই ভেল্‌কি বাজির সংবাদের মত বৈজ্ঞানিক সংবাদ ছাপিয়া মানুষের মনকে স্তম্ভিত করিলে কোন ফল হইবে না; যাহাতে কৌতূহল জাগাইয়া নিজে কিছু সৃষ্টি করিবার দিকে মানুষের আগ্রহ বাড়ান যায়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাই করা উচিত।

* * *

ইতিহাস-আলোচনা করিবার দিকে লোকের উৎসাহ বাড়িয়াছে এবং প্রায় সকল কাগজেই অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থাকে। দেশে সমজদার পাঠক মেলেনা মনে করিয়া অনেক কৃতী লেখক এখনও ইংরেজীতেই মৌলিক আলোচনা করিয়া থাকেন; সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে একটুখানি স্রোত ফিরিয়াছে মনে হয়। দেশের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া না শিখিলে যে আমাদের একালের উন্নতিতে বাধা হইবে, তাহা অনেকেই বুঝিয়াছেন। এ সময়ে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমরা হিতৈষণার প্রেরণায় কল্পিত ইতিহাস রচনা না করি।

* * *

অর্থ-নীতি, কৃষি, শিল্প-প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় অনেক আলোচনা করিয়া থাকেন; আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে ইঁহারা দেশের ভাষায় সহজ কথায় এসকল বিষয়ের আলোচনা করুন। কপালের দোষ দিলেও

দুঃখ কষ্ট যায় না, চেঁচাইলেও যায় না। অবোধেরা যখন যাতনায় ধৈর্য্য হারাইয়া হাত পা ছোঁড়ে, তখন ঘরের অনেক প্রয়োজনের সামগ্রীও ভাঙ্গিয়া ফেলে,—তাহারা দুঃখের দিনে দুঃখকে বাড়াইয়াই চলে। বিভিন্ন দিকে মানুষে কি উপায়ে উপার্জ্জনের পন্থা পাইতে পারে, কি রকমের সহজ-সাধ্য উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে, তাহা না বুঝিলে ও না বুঝাইলে কিছুতেই চলিবে না। আমাদের সাহিত্যে দুঃখের কথা লইয়া কাঁদুনি আছে, উত্তেজনার বীর-রস আছে, কিন্তু যথার্থ উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য কোন আলোচনা নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য, যে যাহারা নিজের স্থিতির মন্ত্র পায় নাই, তাহারাই পরকে স্থিতি দিবার জন্য উদ্ভ্রান্ত উদ্যোগে উৎসাহী হইয়াছে। সকল কোলাহলকে উপেক্ষা করিয়া স্থিরপ্রাণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হউন।

* * *

রূপক

আলোক বলে স্বচ্ছ কর মুক্ত তোমার চিত্ত হে,
ধৌত কর অরুণ স্নানে অমল প্রাতে নিত্য হে!
বাতাস বলে বেগের দোলায় ওঠ্ না আসি সঞ্চরি,
মুগ্ধ কর সজীব শোভায় বল্‌ছে ফাগুন-মঞ্জরী!
মেঘের ভেলা দোদুল দুলে নীলিম-নভে সন্তরে,
প্রেম-তরণী ভাসাও সদা কল্পনারই অন্তরে!
পাখীর কূজন লুব্ধ করে ললিত মধুর সঙ্গীতে,
ভোরের হাসি বল্‌ছে নাচ’ নবীন-চেতন ভঙ্গীতে!

বল্‌ছে নদী বিহ্বল প্রাণে, আয়না বুকে উল্লাসি,
পর-পারের বিজন ঘাটের মাণিক দেব তল্লাসি!
বর্ষা ডুবায় অন্ধকারের নিতল ব্যাকুল ক্রন্দনে,
তড়িৎ বুলায় মুক্ত শরৎ আবেগ-বিপুল স্পন্দনে!
সাগর ডাকে বিরাট হতে, জলদ ডাকে গর্জ্জিয়া,
শক্তি তেজে মুক্তি লভ’ অধর্ম্মকেই বর্জ্জিয়া!
পুষ্প বলে ক্ষুদ্র হয়ে গন্ধ বিলাও বিশ্বাসে,
ধন্য কর আত্মা ধরার পুণ্য তোমার নিশ্বাসে!

শ্রীনীহারিকা দেবী

আইন-আদালত

শূদ্রের অবৈধপুত্রের ও দাসীপুত্রের অধিকার—হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারে শূদ্রের ঘরের অবৈধপুত্রের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাহা স্থির হইয়াছে, সকলেরই তাহা জানা উচিত। (কলিকাতা ল-রিপোর্ট, ৪৮ ভাগ ৮৪৩ পৃষ্ঠা)। রূপা দাসী নামে একটি স্ত্রীলোক বিধবা হইবার পর পঞ্চানন দাসের বাড়ীতে তাহার রক্ষিতা হইয়াছিল ; নিজের স্বামীর পক্ষ হইতে রূপার এক পুত্র ছিল, ও পঞ্চাননের রক্ষিতা হইয়া থাকিবার সময় তাহার একটি পুত্র হয়। পঞ্চাননের অন্য সন্তানাদি ছিল না ; সে মরিবার পর মোকদ্দমা ওঠে যে পঞ্চাননের রৈয়তী জমী রূপার গর্ভে জাত অবৈধপুত্রটি পাইবে কি না। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার অনুসারে শূদ্রের এইরূপ অবৈধপুত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭৫ সনের কলিকাতা হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমায় অবৈধপুত্রকে উত্তরাধিকারী করা হয় নাই বলিয়া, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য জজদের ফুলবেঞ্চ বা পুরা মজলিস্ বসিয়াছিল, ও এই বিচারের সময়ে চীফ্‌জষ্টিস্ ছিলেন শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দায়ভাগ ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থগুলি গভীরভাবে আলোচনা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, শূদ্রের ঘরে এরূপ অবৈধপুত্র সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইতে পারে। ১৮৭৫ সনের নিষ্পত্তিটিতে দায়ভাগের ব্যাখ্যায় যে গোল ঘটিয়াছিল, তাহা ঐ রায়ে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ও ভরত শিরোমণি মহাশয়ের দায়ভাগের সংস্করণ যে প্রামাণ্য তাহা বলা হইয়াছে ; রক্ষিতাটি পঞ্চাননের বাড়ীতে সম্পূর্ণ পঞ্চাননের রক্ষিতা হইয়াই ছিল, তাহা প্রমাণিত আছে। যে রক্ষিতাকে রাখিলে পরদার হয়, অথবা রক্ত সম্পর্কে অগম্যা-গমন হয়, সেখানে অবৈধপুত্রের কোন অধিকার জন্মে না। পঞ্চাননের যদি অন্য বৈধপুত্র থাকিত, তাহাহইলেও অবৈধপুত্র উত্তরাধিকারী হইত, কিন্তু ভাগ পাইত বৈধপুত্রের অর্দ্ধেক। জজ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত ফুল বেঞ্চের অন্য সকল জজই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রায়ে মত দিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য এই যে, যদিও শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যায় শূদ্রের অবৈধপুত্র উত্তরাধিকারী হয়, তবুও একশ বছর এ নিয়ম চলে নাই বলিয়া ঐ নিয়ম চালান উচিত নয়। চীফ্‌জষ্টিস্‌প্রমুখ অন্যান্য জজেরা বলিয়াছেন যে, যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা চালাইয়া ন্যায় বিচার করিলে ক্ষতি হইতে পারে না। যাহা হউক এখন আইন হইয়া গেল যে, এরূপ অবৈধপুত্র এবং দাসীপুত্র শূদ্রের ঘরে উত্তরাধিকারী।

* * *

মুসলমানের অবৈধপুত্র—মুসলমানের আইনের নিয়মে, পিতা যদি স্বীকার করেন, যে অমুক ব্যক্তি তাঁহার পুত্র, তবে আর কেহ সন্দেহ করিয়া, সেই পুত্রের বৈধতা অস্বীকার করিতে পারে না। এই সাধারণ নিয়মটির প্রসার কত দূর, তাহা সম্প্রতি প্রিভিকাউন্সিলে বিচারিত হইয়াছে। (কলিকাতা ল-রিপোর্ট ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৮৫৬)। বিবাহ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হয়, অথবা সন্তান জন্মে, তাহা হইলেই পিতার স্বীকারবাক্যে পুত্রের বৈধতা স্থির করা হয়। প্রিভি কাউন্সিলের চূড়ান্ত বিচার এই যে, যদি স্ত্রীলোকটি তাহার পুত্রের জন্ম-দাতার সহিত বিবাহিতা হইয়া না যায়, অথবা সে যদি পরদার হয়, অথবা রক্ত-সম্পর্কাদির হিসাবে বৈধ-স্ত্রী হইতে না পারে, তাহা হইলে পিতা স্বীকার করিয়া লইলেও পুত্রটি বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবে না। বিচারে একথাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যেখানে পিতা একজনকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সেখানে ধরিয়া লইতে হইবে যে উপযুক্ত স্ত্রীর গর্ভেই পুত্রের জন্ম হইয়াছে এবং যখনই হউক স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; পুত্রের মাতার সঙ্গে পুত্রের পিতার বিবাহ যে হয় নাই, অথবা স্ত্রীলোকটি যে অন্য কারণে বিবাহে উপযোগী ছিল না, ইহার প্রমাণের ভার বিরোধী পক্ষের উপর।

* * *

অসবর্ণ বিবাহ—বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দু-আইনে, অসবর্ণ বিবাহ কতদূর চলিতে পারে, তাহা সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারিত হইয়াছে। বিচারক ছিলেন চিফ্ জাষ্টিস্ স্যাণ্ডারসন এবং জজ রিচার্ডসন। (কলিকাতা ল-রিপোর্ট, ৪৮ ভাগ পৃঃ ৯২৬)।

দায় ভাগে আছে যে, কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে পারে না ; এই নির্দ্দেশে অসবর্ণ বিবাহকে অসিদ্ধ করা হইয়াছে, না কেবল শিষ্ট সমাজে কিরূপ বিবাহ হওয়া উচিত তাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক বিচারকদ্বয় মনে করেন যে, সাধারণভাবে সকল জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে পারুক আর নাই পারুক, শূদ্রদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ হইলে, সে বিবাহ আইনসিদ্ধ হইবে। যে মোকদ্দমায় এই কথা বিচারিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, একজন কায়স্থ একটি তাঁতির মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; বঙ্গের কায়স্থেরা হাইকোর্টের বিচারে চিরকালই শূদ্র বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন, আর তাঁতিরাও শূদ্র ; কাজেই এ বিবাহ শূদ্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় হইল বলিয়া আইনসিদ্ধ বিচারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের হাইকোর্টের বিচারে শূদ্রদের বিভিন্ন শাখায় বিবাহ অনেকদিন পূর্ব্বেই আইনসঙ্গত বিচারিত হইয়াছে এবং প্রিভিকাউন্সিলেও ঐ রায় বাহাল হইয়াছে।

* * *

ভাঙা-গড়া

[রচনা —————————— দরবেশ]

আমি গড়্ছি যত আপন মনে
প্রাণটি করে' পণ্,
তুমি এক নিমিষে দিচ্ছ ভেঙ্গে
সে সব আয়োজন।

এ-পারের এই বেলা ভূমে,
বালির ঘরে আছি ধুমে ;
কখন যদি দারুণ ঘুমে
হলেম অচেতন ;
জেগে দেখি ও-পার হ'তে,
এসেছিলে ঢেউয়ের রথে ;
ভাসিয়ে নিচ্ছ পিছল পথে
ঘরের সব বাঁধন।

তোমায় আমায় এম্নি করা,
চল্ছে কেবল ভাঙা-গড়া ;
ঢেউয়ের কোলে ভেসে পড়া—
হয় না তো সে মন্ ;
যুগ-যুগান্ত বালির ভূঁয়ে,
যাচ্ছ আমার নয়ন ছুঁয়ে ;
ভাব্ছি কবে পাব ঢেউয়ে
চরম জাগরণ !!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্র ভৈরবী—দ্রুত-কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
সণ্সা II { সসদা দা | পা ণদা I পা জ্ঞমপদণণা | দপা মপা |
আমি • গ•ড়্ ছি য ত• আ প••••ন্ ম • নে •

০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞজ্ঞা মা | মদণর্সা ণা I র্সা —ণর্সা | া র্সর্সা |
প্রাণ্ টি ক••• রে প •ণ্ • তু মি

০ ১ ২´ ৩
| দদা র্সর্ঋর্জ্ঞা | র্ঋা র্সা I পদা ণা | দমা মা |
এক্ নি • • মি ষে দিচ্ ছ ভে• ঙ্গে

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা মমা | জ্ঞমপদণর্সা ণর্সা I পণদপমজ্ঞা —ঋসা | া সণ্সা } II
সে সব্ আ•••••• য়ো• জ••••• •ন্ • "আমি•"

১ম অন্তরা

০ ১ ২´ ৩
II { সা সন্ঋা | সঋা —জ্ঞজ্ঞা I সঋজ্ঞমা মমা | জ্ঞমজ্ঞা মা
এ পা৹ ৹ রে৹ ৹ র্ এ ৹ ৹ ই বেলা ভূ ৹ ৹ মে

জ্ঞা মমা | দা দমা I জ্ঞমদা ণা | দণর্সা র্সণর্সা
বা লির্ ব রে৹ আ৹৹ ছি ধু ৹ ৹ মে ৹ ৹

২
র্সজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা | র্রা জ্ঞা I র্সঋা র্সঋজ্ঞা | ঋর্সা নর্সা |
কথ ন ৹ য দি দা ৹ রু ৹ ন্ ঘু ৹

০ ১ ২´ ৩
মা জ্ঞমদণণা | দনর্সা দঋা I ণর্সাঃ —ঃ | । । }
হ লে৹৹৹ম্ অ৹৹ চে৹ ত ৹ ন্ ৹ ৹

০ ১ ২ ৩
{ র্সঋা জ্ঞা | র্রা জ্ঞা I র্সা ঋজ্ঞজ্ঞঋা | নর্সা র্সা
জে৹ গে দে খি ও পা ৹ ৹ র্ হ ৹ তে

| দা ণা | র্সা ণা I পপা ণণা | দপদা পা } |
এ সে ছি লে ঢেউ য়ের্ র৹৹ থে

০ ১ ২´ ৩
| র্সা ণর্সঋঋা | র্সা দা I পা পদণণা | দা পা |
তা সি৹৹য়ে নি ছ পি ছ৹৹ল্ প থে

| জ্ঞা জ্ঞমজ্ঞজ্ঞা | মমা জ্ঞমপা I দণদপা —মজ্ঞমজ্ঞা | —ঋসা সণ্সা II
ঘ রে৹৹ র্ স ব্ বাঁ৹৹ ধ৹৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ন্ "আমি৹"

২য় অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II { জ্ঞা মমা | দা ণদণা I ণদণা র্সা | ণর্সা র্সা |
"তো মায় আ মা০য় এ০ম্ নি ক০ রা

০ ১ ২´ ৩
| র্সর্সা র্জ্ঞা | র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞর্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্মা | র্জ্ঞর্ঋা নর্সা |
চল্ ছে কে ০ ব ল্ ভাঁ ঙা গ ০ ড়া০

০ ১ ২ ৩
| ণ়ণ়া র্সর্জ্ঞর্জ্ঞা | র্ঋা র্জ্ঞা I র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞা | র্ঋা র্সা |
ঢেউ য়ে ০ র্ কো লে ভে সে ০ ০ প ড়া

০ ১ ২´ ৩´
| ণণা মা | জ্ঞমদণর্সা ণা I দণর্সা -া | া া } |
হয় না তো০০০০ সে ম০০ ন্ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| { র্সর্সা র্জ্ঞা | র্ঋা -র্জ্ঞর্জ্ঞা I র্সা র্সর্ঋর্ঋা | ণা র্সা |
যুগ্ যু গা ন্ ত বা লি ০ র্ ভুঁ য়ে

০ ১ ২´ ৩
| দা -ণণা | পা দমা I পা জ্ঞমা | ঋজ্ঞা ঋসা } |
যা চ্ ছ্ আ মার্ ন য় ন্ ছুঁ ০ য়ে ০

| ণ়ণ়া সঋা | জ্ঞা মা I পা দা | ণণা র্সা |
ভাব্ ছি০ ক বে পা ব ঢেউ য়ে

০ ১ ২´ ৩
| পা ণণা | দা পা I পণদমদপা -জ্ঞপমঋজ্ঞা | -ঋসা সণ়সা II II
চ রম্ জা গ র০০০০০ ০০০০০ ০ ণ্ "আমি০"

অশান্তির কারণ কি ?

আজ যে দেশময় একটা অশান্তির বন্যা আসিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অশান্তির কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুনের "বঙ্গবাণীতে" একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান সমস্যা সম্পূর্ণ অর্থনীতি-মূলক এবং লেখকের মতে এদেশের লোকের অন্নবস্ত্রের সুবিধা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

আমি অস্বীকার করি না যে, বর্ত্তমান অশান্তির অন্যতম কারণ অন্নবস্ত্রের অভাব। কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে ইহাই অশান্তির একমাত্র কারণ। পরলোকগত মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সময় হইতেই শুনা যাইতেছে যে, এদেশের অধিকাংশ লোকেরই একবেলামাত্র অন্ন জুটে। তার পর দুর্ভিক্ষ জিনিষটাও দেশে ঠিক নূতন বলা যায় না। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্নবস্ত্রের অভাবটা এক রকম আমাদের "গা-সওয়া" হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসীরা যাহাদের ভাগ্যে অন্নাহার দুর্লভ এবং যাহারা বৎসরের অধিকাংশ দিনই স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূলেই উদরপূর্ত্তি করে—তাহাদের ভিতর এই অশান্তির প্রবাহ অতি অল্প মাত্রাতেই দেখা যায়। অন্যদিকে ইহাও দেখিয়াছি যে, যে শ্রেণীর মধ্যে অন্নবস্ত্রাভাব নাই সেখানেও এই অশান্তি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। সুতরাং এই অশান্তির কারণ সম্পূর্ণ অর্থনীতিমূলক ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না।

দেশের লোকের মনে একটা চেতনা আসিয়াছে—একটা সম্পূর্ণ নূতন স্পন্দন দেখা গিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি সেই দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন কথা, যাহা মহাত্মা যীশু তাঁহার অনুচরগণকে বলিয়াছিলেন, যে মানুষ কেবলমাত্র অন্নের দ্বারা বাঁচিতে পারে না— শুধু অন্নপুষ্ট দেহকেই মানবজীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মানুষ যদি নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চায় তবে তাহার অন্নবস্ত্র ব্যতীত এমন অনেক বস্তুর ও বৃত্তির আবশ্যক যাহার একান্ত অভাব আমাদের মধ্যে আছে। সেই অভাবের তাড়না আজ আমাদের সুপ্ত হৃদয়ে চেতনা আনিয়াছে এবং বর্ত্তমান অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সেই অভাবগুলি কি তাহাই আমাদের বিবেচ্য। যাঁহারা অশান্তিমাত্রই মন্দ ও অশুভ মনে করেন আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমার মনে হয়, দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে শান্ত শূকর হওয়া অপেক্ষা অশান্ত প্লেটো হওয়াই ভাল—ইহাই কি ঠিক নহে ? সেইজন্যই আমি বর্ত্তমান অশান্তিকে বরণ করিয়া লই—কারণ ইহাই আমার ধ্রুববিশ্বাস যে, এই অশান্তিই আমাদের ভবিষ্যতে গভীর ও অব্যাহত শান্তির পথে লইয়া যাইবে। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত না নিজের অভাব অনুভব করিতে

পারে ততদিন পর্য্যন্ত সে অভাব দূঢ় করিবার জন্য আগ্রহ বা চেষ্টা করে না, এবং অভাব অনুভব করিলেও তাঁর কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন। আমাদের অশান্তির কারণ আমার মনে হয় মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক।

ইংরাজরাজ যে আমাদের বাহিরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক আলোয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজরাজের আমলে আমরা একটা জিনিষ যাহা হারাইতে বসিয়াছিলাম তাহা হইতেছে জাতীয় আত্ম-সম্মান। ছেলেবেলা হইতে জুজুর ভয়ের মত ইংরাজভয়ও আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়—এবং শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই সে বেশ অনুভব করিতে থাকে যে ইংরাজভয়টা ঠিক জুজুর ভয়ের মত অবাস্তব বা ভিত্তিহীন নয়। জাতীয় ইতিহাস বলিয়া তাহাকে যাহা পড়িতে দেওয়া হয় তাহা পড়িয়া তাহার একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাহার নিজস্ব যা কিছু অধিকাংশই মন্দ, আর দেশে যেটুকু ভাল আছে সেইটুকু শুধুই ইংরাজরাজের অনুকম্পায়। সে ঐ ইতিহাস পড়িয়া শেখে যে শিবাজি একজন পার্ব্বত্য তস্কর, আউরঙ্গজেব এক হিন্দু-বিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা, সিরাজদ্দৌলা এক নারকীয় কুক্কুর এবং সমস্ত বাঙ্গালী—যখন ইংরাজরাজ প্রথম এদেশে পদার্পণ করেন—শঠ ও মিথ্যাবাদী। তাইত আমরা দেখিয়াছি যে এদেশে এমন একটা যুগ গিয়াছে যখন দেশের ভাষায় কথা কহা, দেশের পরিচ্ছদ পরিধান করা, এমন কি দেশের ধর্ম্মে আস্থাবান হওয়াও অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। ফলতঃ ইংরাজ যে জাতীয়তা হিসাবে আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে একথাটা আমাদের নিয়তই মনে করিয়া দেওয়া হইত এবং এমনটি হইত সর্ব্বত্র—সে'টা রেলগাড়ীতেই হউক আর রাজকার্য্যেই হউক। ইলবার্ট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন—সে আজ অনেক কালের কথা—কিন্তু সেই আন্দোলনের পশ্চাতে যে মানসিকতা (mentality) বর্ত্তমান ছিল—আজও কি তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? Racial Distinction Committe'র সম্মুখে অনেক ইংরাজ যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা হইতেই ত ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। এইত সেদিন একজন শ্বেতকায় আদালতের সম্মুখে মুসলমানদিগকে "niggers" বলিয়া অভিহিত করিল। ডায়ার ও ও'ডায়ারের কথা না বলিলেও চলে কারণ সে কথা আজ ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ১৯১৯ সালের ভারত আইন সংস্কারে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, বোধ হয় সত্য সত্যই দেশে একটা নূতন যুগের সূচনা হইল—সত্য সত্যই বোধ হয় ইংরাজরাজ প্রভুর মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া বন্ধুমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে আশা যে আজ চিরবন্ধ্যার সন্তানলাভের আশার ন্যায় হৃদয়েই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই যে তিনটি প্রদেশের আইনসভা সরকারের প্রচণ্ডনীতির পরিহারপরামর্শ দিলেন তাহার ফল কি হইল? শুধুই অরণ্যে রোদন কি নয়?—তাহার উপরেও আবার ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্রের অভদ্রজনোচিত-ভাষায় গালাগালি। এই যে অর্থাভাবে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়—যাহা আজ ষাট বছরের উপর ধরিয়া দেশের লোককে মানুষ করিতেছে—বন্ধ হইবার মত

হইয়াছে তাহাতে ত ইংরাজ রাজের দৃষ্টি আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহাদের দৃষ্টি আছে শুধুই কি শাসন-যন্ত্রের উপর আর স্বজনপরিচালিত বিশ্ববিত্থালয়ের উপর? রোগে অনশনে লোক অর্দ্ধমৃত—কিন্তু তাহার শাসন ত চাই! সেই জন্যই আজ আমাদের দেশের অর্থ অধিকাংশই ব্যয়িত হইতেছে কড়া পাহারার বন্দোবস্তে—আর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগ পাইতেছে উচ্ছিষ্ট মুষ্টি-ভিক্ষা! তর্কের খাতিরে যদিই বা মানিয়া লই যে বর্ত্তমান অশান্তির কারণ শুধুই অন্নবস্ত্রের অভাব, তাহা হইলেও ত একথা অস্বীকার করিতে পারিব না যে এই অভাবের মূলকারণ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা। আমাদের ঠিক অভাব বা অভিযোগ কি, সরকারের মতে সে'টা আমরা ঠিক বুঝিনা—সে'টা বুঝেন ইংরাজসরকার! এই যে জাতিগত অহঙ্কার (Racial arrogance) যে অহঙ্কারে নিজের বুদ্ধিমত্তা অপর সকলের বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়—সেই অহঙ্কারই এই বর্ত্তমান অশান্তির মূল ও ভিত্তি। আজ আমরা সেই জাতীয় অহঙ্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছি—তাই এই সংঘর্ষ, তাই এই অশান্তি। বিশ্ববিত্থালয়ের মাননীয় ভাইসচ্যান্সেলর মহাশয় সেদিন যে কথা বলিয়াছিলেন—যে আমরা তোমাদের নিকট হইতে দাবী করি শুধু বিচার—অহঙ্কারবর্জ্জিত ন্যায়-বিচার—ইহার অল্পে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিবনা—সেই কথা আজ তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে সাড়া দিয়াছে, তাইত আজ আর তাহারা ক্রীড়নকে ভুলিতেছেনা। সেই জন্যই ত আজ আমরা বলিতেছি যে, "হে ইংরাজরাজ আমাদের অভাব আমরাই ভালরূপে বুঝি, আমাদের দেশের অর্থ আমাদের দেশের অভাব মোচনেই নিয়োজিত হউক আর সে বিষয়ে তোমরা আমাদেরই পরামর্শ মত কায কর। তোমার আমার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি কেবল বৈকালিক চা'পানের মজলিশে বা ভোজের সভায় হইবে না। সে প্রীতি ও সদ্ভাব শুধু সম্ভব হইবে যদি তুমি তোমার উচ্চ রাজাসন ছাড়িয়া আসিয়া আমাকে বন্ধু, সখা ও সহকর্ম্মী বলিয়া আলিঙ্গন কর।" ফলতঃ আজ আমাদের জাতীয় সম্মান-জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে, আমরা আসিয়া কাহারও হাতের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নহি; কারণ আজ আমরা বুঝিয়াছি যে মনুষ্যত্বের দাবীর হিসাবে আমরা কাহারও অপেক্ষা হীন নই—আমাদের একটা অতীত গৌরব আছে যাহাতে যে কোন জাতি স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান অশান্তির দ্বিতীয় কারণ হইতেছে সামাজিক। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনটা যতই তাড়াতাড়ি আগাইতে চাহিতেছে আমাদের সামাজিক জীবনটা ততই যেন পিছাইয়া পড়িতেছে—তাই আজ দেখিতেছি যে বিংশ শতাব্দীর লোক হইয়াও আমরা বাস করিতেছি সতের শতাব্দীর সমাজে। এই যে ভীষণ একটী অসামঞ্জস্য ইহা দূর করিবার জন্যও আমাদের বিশেষ আগ্রহ বা চেষ্টা দেখি না—আর যাঁহারা এ বিষয়ে একটু আগ্রহ বা চেষ্টা দেখান তাঁহারা সমাজের নিকট হইতে প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার ভাগটাই অধিক পান। এই প্রবন্ধে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেঅধিক কিছু বলা অসম্ভব তবে এইটুকু আমাকে বলিতেই হইবে যে, স্ত্রী-শিক্ষা ও

স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব, বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথা আমাদের সমাজকে নিরানন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। যে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু, যে সমাজে কন্যা জন্মিলে ক্রন্দনের রোল উঠে, যে সমাজে অকালবার্দ্ধক্য একটা নিয়মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে—সে সমাজের অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্য অর্থনীতিতে যাইবার আবশ্যক নাই—সেই অশান্তির কারণ সমাজনীতিতেই বা দুর্নীতিতেই পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য যে কতটা পরিমাণে আমাদের সামাজিক রীতিনীতির উপর নির্ভর করিতেছে তাহাও বিশেষ বিবেচ্য।

উপসংহারে শুধু এইটুকু বলিতেছি যে যতদিন আমাদের রাষ্ট্রীয়নীতির ও সমাজরীতির পরিবর্ত্তন না হইতেছে—ততদিন আমাদের "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া অরণ্যে রোদন করিতেই হইবে এবং অশান্তি রাক্ষসীও মৌরসী স্বত্বে আমাদের দেশ দখল করিয়া বিরাজমানা থাকিবে।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্রে

বিলাতের একটি শিল্পোন্নতি-সমিতি—বড় রকমের আপদ-বিপদের দিনে, আমাদের দেশে অনুসন্ধান-সভা বা কমিশন বসে বটে, কিন্তু গবেষণার ভারে কাজের কাজ তেমন জমেনা। মহাযুদ্ধের দুর্দ্দিনে, দেশের অভাব বুঝিয়া ইংলণ্ডে যে স্থায়ী অনুসন্ধান-সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, অল্পদিন পূর্ব্বে উহার ষষ্ঠবার্ষিক বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘ বসাইবার সময় দেড়কোটী টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া, উহার আটপৌরে নাম হইয়াছে দেড়ক্রোড়ী সমিতি, আর আসল নাম হইয়াছে সায়েণ্টফিক এণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (Scientific and Industrial Research)। ইহার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—(১) কয়েকজন লোক সারা বছর ধরিয়া দেখিয়া বেড়ান যে, কি উপায়ে, কি পদ্ধতিতে ও কত খরচে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্প-কাজ চলে ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলে; একই রকমের কাজ যদি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বা পদ্ধতিতে চলে, তাহা হইলে, সে সকল ব্যবস্থা তুলনায় সমালোচিত হয়। (২) যে সকল শিল্পাদির কাজে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত কল-কারখানার ব্যবহার আছে, সেখানে শ্রমজীবীদিগকে যথাসাধ্য ঐ কল-কারখানাগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য শিখাইয়া দেওয়া হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কাজের লোকেরা কল খাটাইবার সময়ে উহার দোষগুণ বিচার করিয়া যেন উন্নতিসাধনের প্রস্তাব করিতে পারে। (৩) বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পণ্ডিতদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও আপনাদের বৈজ্ঞানিক খেয়ালে কাজ করিবার জন্য সাহায্য করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রয়োজনের কথা মনে থাকিলে মানুষে নূতন তথ্য বাহির

করিতে পারেনা ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না ; খেয়ালে ও কৌতূহলে কাজ করিলেই প্রকৃতির রহস্য ধরা যায়, ও পরে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে ব্যবহারের কাজে লাগাইতে পারা যায়। (৪) বৈজ্ঞানিক কৌশলীরা নূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ধরিয়া পুরাতন পদ্ধতিগুলির সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন। (৫) সকল শ্রেণীর চাষা ও শ্রমজীবীকে সকল উৎপন্ন পদার্থের বাজার দর ও কাট্‌তির সম্ভাবনা জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে একটা কমিশন বসিয়াছিল, আর তাহার ফলেই এত খানি হইয়াছে।

* * *

ভারতে কমিশনের অবস্থা—আমাদের দেশে এখন কথায় কথায় কমিশন বসে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক কমিশন বসিয়াছে, কিন্তু কমিশনের নির্দ্দেশমত কাজ হইয়াছে বড়ই অল্প, আর রিপোর্টের পুঁথি বাড়িয়াছে বিস্তর। প্রথমে ত এ সকল কমিশনে খরচ হয় বড়ই বেশী। কারণ, এদেশের অবস্থা এ দেশের লোকে ভুল বুঝিয়া ফেলিবে ভাবিয়া, বিলাতের নিরপেক্ষ চিন্তাশীলেরা বহুব্যয়ে ভারতে আসিয়া কমিশনগুলিকে অলঙ্কৃত করেন ; তাহার পরে আবার কমিশনের নির্দ্দেশমত কাজ চালাইবার টাকার অভাব ঘটে। ইহার পরে যখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু কাজ করিবার সুবিধা ও অবসর হয়, তখন আবার শাসন পরিচালকেরা দেখিতে পান যে, রিপোর্ট পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং উহার কথাগুলি বাসি হইয়া গিয়াছে। বড় লোকের কথা বাসি হইলে কাজে লাগেনা ; কাজেই আবার নূতন কমিশন বসাইতে হয় এবং কমিশনের গতি পৌনঃপৌনিক দশমিকের মত বাড়িয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে হালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের কথা উল্লেখযোগ্য। দেশবিদেশ হইতে মেম্বর আসিলেন, দেশময় তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইলেন, বড় আফিস বসিল, এবং শেষে দুই বৎসর পরে অল্প বিস্তর রিপোর্ট বাহির হইল ; অনেক স্থানে এই রিপোর্ট পাঠান হইল, অনেক সভা-সমিতি ও বক্তৃতা হইয়া গেল, এবং গবর্ণমেণ্টেরও একটা লম্বা ইস্তাহার জারি হইল। আশা হইল, এবারে বুঝি কিছু হইবে। কিন্তু এ দেশী কমিশনের বলিয়াই নিয়ম বজায় রহিল। কমিশনের কাজ চলিয়াছিল ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত এবং সেদিন হইতে তিনটি নিষ্ফল বৎসর কাটিয়া গেল। দেশের শিক্ষাসচিব মহাশয় হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন। কারণ, শুধু মন্ত্রের বলে সে হাত চলে না,—টাকা চাই। একে ত প্রাদেশিক রাজকোষে টাকার অভাব, তাহার উপর ঢাকায় টাকা ঢালিয়া কিছু উপছাইলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে কিছু মিলিতে পারে।

* * *

দিল্লীতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়—কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ভারতে সর্ব্বসমেত পাঁচটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল। পুরাতন প্রতিষ্ঠান গুলি যে বেশ ভাল চলিতেছিল এমত নহে—তখনই কথা উঠিল, পুরাতন গুলির সংস্কার দরকার ও নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা করা চাই। কিছুদিন

পরে দেখা গেল যে, পুরাতনকে রক্ষা করিবার চেষ্টা অপেক্ষা নূতন কিছু করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী। পুরাতন, পুরাতন হইয়াই রহিল,— আর চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়িবার সঙ্কল্প ও উদ্যোগ চলিতে লাগিল। এক-একটি প্রাদেশিক বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাঙ্গিয়া প্রথমে পাটনায়, তাহার পর বর্ম্মায় ও তাহার পর ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় বসিল। এলাহাবাদ বা প্রয়াগের প্রতিষ্ঠানটি ত্রিধারায় বহিয়া লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ও আগ্রার দিকে ছুটিতেছে। এখন আবার দিল্লীতে আর একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প হইল। গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টার মূলে কি আছে বলা কঠিন। রাজকোষে সাধারণ ব্যয়ের মত টাকা নাই--একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভাল করিয়া চালাইবার টাকা দেওয়া শক্ত, অথচ নূতন নূতন উদ্যোগে টাকা খরচের ফর্দ্দ বাড়িতেছে।

গবর্ণমেণ্টের মাথায় কয়েক বৎসর হইতে ঢুকিয়াছে—দিল্লীকে ভারতের রাজধানীর উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবেই হইবে—যত টাকাই লাগুক না কেন—চিন্তা নাই। কোথায় দেশের কিরূপে শিল্পোন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, সাধারণকে শিক্ষা দান প্রভৃতি হইতে পারে, সেই বিষয়ের চিন্তা না করিয়া, বহুশতাব্দীর শ্মশানভূমি মৃত দিল্লীকে নূতন প্রাণ দিয়া সজীব করিবার বৃথা চেষ্টা হইতেছে। রাজধানীতুল্য সমৃদ্ধিশালী নগর তৈয়ারী করিবার কল্পনায় ইট্, কাঠ্, চূণ-সুরকির অভাব হইতেছে না, কিন্তু রাজধানী গড়িয়া তুলিতে হইলে, ইহাতেই কেবল হয় না। সেই জন্যই বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। কিন্তু এ উদ্যোগ মরুভূমির মধ্যে বাগান করার সখের মতই নিস্ফল হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি নূতনত্বে ও নিজের বিশিষ্টতায় ভূষিত হইত, এবং পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, লোকে তাহাই নূতন স্থানে পাইতে পারিত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে বা ঢাকায় নূতন ঠাট গড়িয়াই কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপককে টানিয়া লইয়া পুরাতন বিষয়েই শিক্ষাবিধান চলিল। আমরা জানিতে চাই, যে যাহা না খাইলে লোকে পছ্‌তাইবে, দিল্লীতে এমন নূতন লাড্ডুর ব্যবস্থা হইবে কি না।

একি শুধু অনবধানতা?—অনেকেই জানেন যে নানা কারণে অনেক বিচারের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাদি পরীক্ষার সময় পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তবু আশ্চর্য্য এই যে কেহ কেহ এই ডাহা অমূলক কথাটি রটাইয়াছেন যে, পরীক্ষার সময়ে ভাইস চানসেলারের একটি পুত্রের বয়স পরীক্ষা দেওয়ার উপযোগী করিবার জন্য এই কাজ করা হইয়াছে। কথাটা সাহিত্যিক কৌশলে সন্দেহের নাম দিয়া ছাপা হইয়াছে। সন্দেহের কথা মানুষে লেখে না বা লিখিবে না তাহা বলি না, কিন্তু যেখানে একটা সন্দেহের কথা তুলিলেই নিন্দা ও কলঙ্ক প্রচার হয়, সেখানে কি করা উচিত তাহাই বলিতেছি। কাহারও উপর আক্রোশ বা ক্রোধ থাকিলে ঘটে এই যে, তাহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু শুনিলেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে, ও অজ্ঞাতসারেও মানুষকে অন্যায় কাজ করিতে হয়। লোকে তখন বুঝিয়াও বুঝে না যে, সকল সময় সকল কথার প্রতিবাদ হইতে পারে না, এবং প্রতিবাদ হইলেও প্রচারিত কথা সম্বন্ধে দু-দশ জনের মনে খট্‌কাটা থাকিয়াই যায়। যাহাতে প্রতি ছোট কথায় বাদ প্রতিবাদ চালাইতে না হয়, তাহারই চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

* * *

বেহার-ওড়িশার আবগারী—আড়ির আন্দোলনে বেহার-ওড়িশা প্রদেশের আবগারী বিভাগের আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; ষ্টাম্পেও কমিয়াছে; তবে আবগারীর অনুপাতে অল্প। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ দুই বিভাগে ৪২০০০৲ টাকা কম পড়িয়াছে। এটা খুব বড় কথা, কারণ বেহার ও ওড়িশায় অনার্য্য জাতির লোকের বাস অধিক, ও তাহারা মদ খায় প্রচুর। ওরাঁও, কোল ও সাঁওতালেরা নিজেরা ঘরে ঘরে যে মদ প্রস্তুত করিয়া খায়, তাহার উপরে কোন কর ধার্য্য হয় না বলিলেই চলে; এই জাতীয় লোকদের মধ্যে মদ খাওয়া কমিয়াছে কিনা তাহা ঐ আয়ের হ্রাস দেখিয়া ধরা যায় না। খুব সম্ভব, হাড়িয়া ও বড়েং প্রভৃতির ব্যবহার কমে নাই। কারণ, সামাজিক সকল উৎসবে ও অনুষ্ঠানে উহার চির-প্রচলিত ব্যবহার আছে। অন্যান্য জাতির লোকের মধ্যে মদ, তাড়ী ও গাঁজার ব্যবহার অত্যন্ত কমিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। আলাদা হিসাব পাইলে দেখা যাইত, যে আফিং এর ব্যবহার কতখানি কমিয়াছে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে একটু একটু আফিং খাওয়াইবার প্রথা ঐ দেশে যেমন প্রচলিত ছিল, এখনও তেমনই আছে জানি।

* * *

সহরের উন্নতি বিধান—লর্ড কর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, কলিকাতাকে একটা সহরের মত সহর করিয়া গড়িবেন। কারণ, এই কলিকাতা ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্মৃতিক্ষেত্র; তাঁহার সাধ ছিল যে, মোগলের তাজমহলের মত এই কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দিরটিকে অক্ষয় ব্রিটিশ-কীর্ত্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; তবে তাঁহার সময়ে কলিকাতার উন্নতিবিধানে যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহারই অনুসরণে অনেক কাজ

হইয়াছে ও অনেক কাজ চলিতেছে। এখন প্রস্তাব চলিতেছে যে, একটা ভাল নক্‌সা করিয়া এই সহরটিকে একটি মনোহর শৃঙ্খলায় সাজাইতে হইবে ; এবারকার এই প্রস্তাবের নূতনত্ব এই যে, দেশের অন্য সহরগুলিকেও যথাসাধ্য সাজাইতে গুছাইতে.হইবে,—সকল সহরেরই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বাড়াইতে হইবে।

কথাটি ঠিক যে, কলিকাতা সহরটি কোন সুনির্দ্দিষ্ট নক্সা অনুসরণ করিয়া বাড়ে নাই,—লোকে যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছিল, সেই অনুসারেই ঘরবাড়ী করিয়াছিল। আর সেইজন্য নানা রকমের অসুবিধা ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষায় বাধা না ঘটাইয়া শীতপ্রধান দেশে বড় সহর করা যত সহজ গরম দেশে তত নয় ; বাড়ীর গায়ে গায়ে বাড়ী, অপ্রশস্ত গলি প্রভৃতি সকল দেশেই মন্দ, আর এই গরম দেশে উহা একেবারেই অসহ্য। গৃহস্থের বাসের পাড়ায়, যাহাদের থাকা উচিত নয়—তাহারা সেখানে আছে, বাসভবনের আশে পাশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের আড্ডা আছে, ও নানা রকমের কোলাহল ও চীৎকারের মজলিস আছে,—এগুলি শান্তি ও পবিত্রতার অন্তরায়। এ রকমের সকল অসুবিধাই দূর করা উচিত, কিন্তু যাঁহারা এদেশের সামাজিক অবস্থা জানেন না এবং ইউরোপীয় চশ্‌মার ভিতর দিয়া আমাদের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করেন, তাঁহাদের হাতে ভাঙ্গিবার ও গড়িবার ভার দিলে চলিবে না। দুইটি ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাহারা জেনানা পরদা রাখে, জাতিভেদ মানে, তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক, এবং আগে তাহারা আপনার লোকের পাড়া বা টোলা করিয়া সহরে বাস পাতিয়াছিল ; বাড়ী ভাঙ্গায় ও রাস্তা গড়ায় তাহারা যতটা বিক্ষিপ্ত না হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত ; এখনও অনেক স্থানে নিজেদের পাড়ায় মেয়েরা চলা-ফেরা করিতে পারেন ; যতই জেনানা পার্ক করা হউক (বড়লোক ছাড়া) কেহ সেখানে হাওয়া খাইতে যাইবেন না। ধরুন, কোন একটি পাড়ায় ধোবারা অনেক ঘর একসঙ্গে থাকে ; তাহাদের বসতবাড়ী উঠিয়া গেলে ক্ষতিপূরণের টাকা লইয়া যদি তাহাদিগকে এখানে সেখানে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাড়ী করিতে হয়, তবে সামাজিক জীবনের সুখ একেবারেই উঠিয়া যায় অর্থাৎ জীবন দুর্ব্বহ হয়। বিলাতে হইলে, এসকল পরিবর্ত্তনে ক্ষতি হইত না।

ভূমিসংগ্রহের আইনের ব্যবস্থায় এখন যে ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের টাকা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু লোকেদের উপকার হয় না, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে, কাজেই অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন, যে ভূমিসংগ্রহের ইস্তিহার ছাপিবার অনেক আগেই উদ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের নক্সা, পাড়ার লোকের হাতে পড়া উচিত। ইহাতে হয়ত অযথা কোলাহল একটু বাড়িতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কোন কোলাহলেই কাণ পাতেন না, তাঁহারা তাহাতে ভয় না করিয়া অসার সমালোচনা বাদ দিয়া সার সমালোচনাটুকু লইতে পারেন। প্রজারঞ্জনের কাজে সেটা মন্দ নয়।

* * *

বিলাতি শিল্পে বাঙ্গলার অনুকরণ—আমাদের একালের ইউরোপীয় হিতৈষীরা বলেন যে, বাঙ্গলায় তাঁত চালাইয়া পণ্ডশ্রম না করিয়া মান্‌চেষ্টারের কাপড় কিনিলে ভাল হয়, আর এদেশে পাটের চাষ চালাইলেই চলে ; কারণ, হিতৈষী অভিজ্ঞদের মতে যে দেশে যাহা ভাল হয় সেখানে তাহাই করা উচিত। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বিলাতে তাঁত বসিয়াছিল, খাঁটি বাঙ্গলার অনুকরণে। পুরাতন বিলাতি রিপোর্টে সেই বিবরণ সুস্পষ্ট আছে।—Transaction of the New England Cotton Manufactures' Association No 57, pp 185. বিলাতে যখন প্রথমে খুব ফলাও করিয়া তাঁত বসান হইল তখন এই কারণেই ইংলণ্ডের পশ্চিম ভাগকে তাঁতের কাজের উপযোগী মনে করা হইয়াছিল যে, সে অঞ্চলে বাঙ্গলা দেশের মত কতকটা স্যাঁতা বাতাস পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পশ্চিমে বাতাস সর্ব্বদাই স্যাঁতা, সেই বাতাসে তুলা ভাল থাকে, সূতা কড়া হয়না ও তাঁতের বুনন ভাল হয়,—ইহাই বাঙ্গলা দেশের অভিজ্ঞতায় বিলাতের তাঁতিরা বুঝিয়াছিল। এদেশের তাঁতিরা গর্ত্তের মধ্যে তাঁত বসাইয়া থাকে,—তাই বিলাতেও স্যাঁতাভাব রক্ষা করিবার জন্য মাটির তলায়, তাঁতের ঘর বসান হইয়াছিল। এ সকল কথা সত্ত্বেও এ যুগে শুনিতে পাই যে, বঙ্গদেশ তাঁতের অনুপযোগী। অনেকদিন হইতেই আমাদের তাঁতিরা তাঁত ছাড়িয়া হরিনাম ধরিয়াছে, এখন আর এই শেষ বৈষ্ণবকুলটি সহজে ছাড়িবেনা ; তবুও এ নিষ্ঠুর পরিহাস কেন ? দেশের লোকে আবার কিছু করিতে পারে করিবে ; আমাদের পক্ষেও আর বৃথায় সমালোচনার তুলা ধুনিয়া কোন লাভ নাই। বিলাতি রিপোর্টে গোটাকতক কথা যে ভাষায় লেখা আছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

To secure the precious humidity factories have even at times been built half underground emulating the example of the oriantal makers of Dacca Muslin or "wooven wind" who work sitting in holes in the ground so that their delicate fabrics may be rendered supple by the moisture of the earth...........Why were these mills all set up about the city of Manchester, why were they not placed where plenty of labour was at hand, viz in the S. & W.,......... ? Here along the west coast, where the warm moist Gulf Stream winds blow steadily landward is the most humid district in all England. In such an atmosphere the cotton fibre becomes naturally pliant and supple rendering the spinning of thead a comparatively simple task.

* * *

রুষের কপাল—রুষিয়া দেশটি আয়তনে অতি বৃহৎ ; সে জড়ের তুলনায় হিমালয় ও জীবের তুলনায় হাতী ; এত বড় শরীরটাকে সচল করিয়া কার্য্যক্ষম করা বড়ই কঠিন। ৮৬২ খৃষ্টাব্দে রুষ নামক জাতির দস্যু দলপতি রুরিক এ দেশের শাঁসাল ভাগটি দখল করিবার পর

দেশের রুষিয়া নাম হইয়াছিল। এই দেশের কপালে বিধাতা বুঝি শান্তি লিখেন নাই। বর্ব্বর রুরিকের ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী, খাঁটি ঐতিহাসিক নয়; কিন্তু রুরিকের পরে নাবালক আইগারের জননী রাণী ওল্‌গার কুকীর্ত্তি ঐতিহাসিক। ওল্‌গা যখন ৯০৬ খৃঃ অব্দে নানা দেশ লুট করিয়া কনস্তান্‌তিনোপ্‌লে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিলেন, সে দিন দেশের নদী প্রজাসাধারণের রক্তেমাংসে কলুষিত হইয়াছিল; যাহারা খৃষ্টীয়ান হইতে চাহে নাই তাহাদিগকে দলে দলে মারিয়া নদীতে ফেলা হইয়াছিল। আবার দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই দেশটি বিজয়ী চিঙ্গিস্‌খার সৈন্য-দলের পায়ের তলায় দলিত হইল। প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া তাতারের অধীনতায় রুষকে যে দুঃখ দারিদ্র্য সহিতে হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় মোটা মোটা বই লেখা হইয়াছে। তাতারের অধীনতা এড়াইয়া, ১৫ শতকের শেষভাগে যখন প্রথম স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হইল, তখনও প্রজাদের উপর রাজাদের অত্যাচারের শেষ হয় নাই। ১৯ শতকের প্রথম হইতে দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা বসিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা, দেশসংস্কারের পক্ষে নূতন কিছু বলিলেই, হয় নির্ব্বাসিত হইতেন, আর না হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেন। অত্যাচার ও অবিচারের পাপ হিমালয়ের মত উঁচু হইল, আট্‌লাণ্টিকের মত প্রসারিত হইল। বুঝি বা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার সঙ্কল্পে প্রসিদ্ধ লেনিন নিজের দেশের লোককে মারিয়া কাটিয়া রাজাহীন নূতন রাজ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। লেনিনের দলের লোকের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, মহাযুদ্ধের পরে সন্ধি হইয়া গেলে, রুষিয়াকে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার আওতায় পড়িতে হইবে, আর ঐ দেশের লোকেরা শিল্প-বাণিজ্যের আড্ডা খুলিয়া রুষিয়ার সম্পদে সমৃদ্ধ হইবে। এটা হয়ত বা বৃথা শঙ্কা। এখন কিন্তু সকলকে সমান অধিকার দিবার নামে যে অরাজকতা চলিয়াছে তাহা ভীষণ; যে প্রজাসাধারণকে অধিকার দিবার ধূয়া উঠিয়াছে, তাহারা ত অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মরিয়া শেষ হইতে বসিল। লেনিনকে কি শেষে শূন্য জনপদ দেখিয়া স্বর্গের দিকে মহাযাত্রা করিতে হইবে?

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়—দুয়া ও সুয়া—পুরাতনের প্রতি বিরাগ ও নূতনের প্রতি অনুরাগ, প্রেমের "মায়া"য় অর্থাৎ অবিদ্যায় যেমন হয়, বিদ্যার বেলাও তেমনই হয় দেখিতেছি। বাঙ্গালার শিক্ষা-সচিব, রাজার পক্ষ হইতে এ বৎসরের খরচের বার্ষিক বরাদ্দের কাগজ পেশ করিয়া বলিলেন, যে নূতন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় পাইবে নয় লক্ষ টাকা, আর প্রাচীন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় (তাহার পুরাতন বরাদ্দের একলক্ষ আটাশ হাজারের উপর) পাইবে রোক ১৩০০০৲ টাকা। টাকাটা ১৩০০০ না করিয়া ১২০০০ করিলেই ছিল ভাল, কারণ তের অঙ্কটা ইংরেজী সংস্কারে অমঙ্গল সূচনা করে, এবং মন্ত্রী এই অমঙ্গল চাহেন না। যাহাই হউক দুয়ায়, সুয়ায় এতটা অসম্ভব রকমের প্রভেদ দেখিয়া, ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন সদস্য এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। উত্তর দিতে গিয়া

মন্ত্রী মহাশয় সাটোপে এত খানি ভ্রূ কোঁচকাইলেন যে, কপালে নূতন মন্ত্রীত্বের ফোঁটা চচ্চড় করিয়া উঠিল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন যে নিগ্রহ ভোগের যোগ্য তাহা বুঝাইয়া বলিলেন,—সে বে-আদপ, মুখের উপর ঘোমটা না টানিয়া রাজ সরকারকে সোজা কথা শুনাইয়া দেয়, সে বেশী ফয়লাও করিয়া ঘর-সংসার পাতিয়া খরচ বাড়াইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্পষ্ট কথায় সরকার বাহাদুরকে তাঁহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া যে অপরাধ (অর্থাৎ মন্ত্রী ঠাকুরের ভাষায় Criminal) ইহাত সরকার বাহাদুর কখনও বলেন নাই; তবে মন্ত্রীর মেজাজ বেগড়ায় কেন? পরমহংসের উক্তি,—কালা-পেড়ে কাপড় পরিলেই গোঁপে চাড়া দিতে ইচ্ছা করে,—পায়া ভারি হইলেই জাঁক-জারি দেখাইবার সাধ জন্মে। তাহার পর কথা এই যে, পুরাতন যে তাহার ঘর-সংসার বাড়াইয়াছে, সে ত পদে পদে বড় রাজ সরকারের জ্ঞাতসারে, ও অনুমতি লইয়া। সকল বিষয়ে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করাই ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ; তবে সে কর্ত্তব্যের প্রসার বাড়াইয়া অপরাধ করিল কিরূপে? কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতি-বেশী কাজের জন্য যদি অধিক টাকা না দেওয়ার কথা হইত, তবে সে অধিক কাজের সার্থকতার স্বপক্ষে তর্ক করা যাইত; যদি ঢাকার ৫ মাইল সীমায় নিবদ্ধ ও অল্প-সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষাপীঠটি সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের শিক্ষা-পীঠের সমান সমান টাকা পাইত, তাহা হইলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "অত্যধিক বন্দোবস্তের" সমালোচনা চলিতে পারিত। সমান সমান হওয়া ত কলিকাতার পক্ষে একেবারেই দুরাশা; পুরাতন বরাদ্দ ও নূতন ১৩০০০্ টাকার দান মিলাইয়া কলিকাতা যাহা পাইল, তাহা যে নয়লক্ষ টাকার ষষ্ঠাংশেরও কম। পুরাতনের সার লইয়া নূতন গড়া হইয়াছে বলিয়া কি ঢাকার পক্ষ হইতে রাজকরের মত এই ষষ্ঠাংশের ব্যবস্থা হইল? এই তের হাজারও এবৎসরে নূতন দান নহে। অন্য অন্য বৎসর ইহা অন্যভাবে দেওয়া হইত;—এবৎসর ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে মাত্র। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাঁহারা অল্প বেতন পাইতেন, তাঁহাদিগকে দু-গুণ, তিন-গুণ টাকা দিয়া ঢাকায় লইয়া একই বিষয় পড়াইবার বন্দোবস্তটা বাজে খরচ হইল না, আর বাজে খরচের জন্য দোষী হইল, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি যেসব খবরের টুকরার উপরে তাঁহার তর্ক গড়িয়া লইয়াছেন যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা দিয়াছিলেন. না রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন? আর বিশ্ববিদ্যালকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার আগে সিনেটকে এবিষয়ে কি কিছু বলিয়াছিলেন? তিনি নিজেও ত সিনেটের একজন সভ্য সে হিসাবেও কি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য ছিল না?

দেশের যে কয়েকজন হিতৈষী-কুল-বৃষের কাছে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামটি "লাল নেকড়া"—যাঁহারা "গণ-তন্ত্রের" ধুয়া তুলিয়া মাথা নাড়া দেন, তাঁহারা ঢাকার কোন্ আন্‌কোরা তন্ত্রের অজুহাতে এই অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থন করিবেন? যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যথার্থ জাতীয়

শিক্ষার ও জাতীয়-জীবন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছে, তাহাকে অপরাধী করিয়া যাঁহারা স্বরাজ গড়িতে চাহেন তাঁহাদিগকে একটি প্রাচীন বচন স্মরণ করাইয়া নমস্কার করিতেছি ;

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবরে রক্ষা করীরদ্রুমে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু লীলারতিঃ
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়োঃ
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ।

দুঃখ এই যে যাঁহাদের যথার্থ হিতৈষণা আছে, তাঁহাদের অনেকেই ঢুকিয়াছেন আড়ির দলে।

* * *

রাষ্ট্রশাসনে টাকার অভাব—কামধেনু দুধ দেয় না শুনিলে, দেবতারা নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাইতেন, কিন্তু ভারত-শাসনের জন্য টাকা নাই শুনিয়া কাহারও বিস্ময়টুকুও জন্মে নাই। সকল প্রদেশের গবর্ণমেণ্টই বলিতেছেন যে, যাহা নিতান্ত না করিলে নয়, তাহা করিবার মত টাকাও রাজকোষে নাই ; তবুও মজা এই যে দিল্লীর খেয়ালের খাতায় অনেক টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং আমাদের এম-এল্-সি-গণ প্রাজ্ঞের মত স্বকার্য্যসাধনটি ভুলিতেছেন না। এম-এল্-সি দের পক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যখন গৌরবের "অনরেবল" নাম পাইলেন না, তখন পিঠের কষ্টটা পেটের পুষ্টিতে পোষাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মিনিষ্টারেরা যখন নিপুণ হিসাবে কড়া ক্রান্তি টুকু বুঝিয়া লইলেন, তখন এম-এল্-সি'র দল, দ্বিজেন্দ্রলালের বচন তুলিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারেন—"হরিনাম করে' হায়, দশজনে খায়, আমরাই কেন খাবনা।" শ্রীযুক্ত ফরেষ্টার এই প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে এম-এল্-সির দল জন-পিছু বৎসরে ৩০০০৲ করিয়া টাকা পাইবেন ; দাবী দেখিয়া ইহাদিগকে চূড়ান্ত "মডারেট" বলিয়া মনে হয় বটে। কটকের মিনিষ্টারটিকে কিন্তু দেখিতেছি পাল-ছাড়া ; ইনি বলেন যে, দেশের স্বায়ত্ব-শাসনের চালকেরা যদি বিনা টাকায় দেশের কাজ করিতে পারেন, তবে ঐ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় টাকা লইবেন কেন ? আমাদের কোন কোন এম-এল্-সি হয়ত বলিতেছেন,—হে মধুসূদন, এ কি শুনাইলে! ইঁহারা অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেই হয়ত বা আনন্দে গাহিয়াছিলেন ঃ—

অনরেবল্ ? জলের "বাবল্"! নয় সে কভু সাঁচা রে।
"এমেল্‌সি"-টে নয়কো শিটে ; শাঁসটি মিঠে মাঝারে।
করুক নিন্দা রুষ্টে-দুষ্টে, আষ্টে-পিষ্টে বাজারে ;
সুদ শুদ্ধ শোধটি নেব—চৌষট্টি হাজারে।

* * *

চাষীর শিক্ষা—যে কথার আলোচনা করিলে লোকে হিতৈষী ঠাওরায়, যে কথার গায়ে সাম্য-মৈত্রীর চটক আছে, তাহা লইয়া আলোচনা জমান সুখকর; তবে, ব্যবস্থাপক সভায় চাষীর শিক্ষার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, এখনও তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় নাই। এদেশের ভদ্রলোক শিক্ষক জুটাইয়া, এবং পাঠ্যপুস্তকের নির্ব্বাচন সমিতির নির্ব্বাচিত বই লইয়া, যদি চাষাকে চাষ শিখিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে পাঠশালা খোলার চেয়ে চাষ তোলার ব্যবস্থা করিলেই সকল ভাবনা চুকিয়া যায়। যাঁহারা কখনও চাষ করেন না,—কত ধানে কত চা'ল, জানেন না, তাঁহারা গুরুগিরি করিলে চাষীর কাশীপ্রাপ্তি হইবে। বিলাতের কৃষি কলেজের পাশকরা বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছি যে, এদেশের চাষারা চাষের বিদ্যা বেশ জানে, ও লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে, নূতন ফসলের জন্য অনায়াসে নূতন পদ্ধতিতেও কাজ করিতে পারে; তবে নূতন পদ্ধতির অর্থই নাকি টাকা, কাজেই সে পদ্ধতি লইয়া খোয়ালের খেলা খেলিতে পারে না। সরকারী আদর্শচাষের আড্ডায় অনেক টাকা খরচ করিয়া ভাল ফসল তৈয়ারী করা হয়; চাষারা জানে যে যত গুড়, তত মিষ্ট, কিন্তু তাহাদের গুড় যোটে না।

* * *

ইউরোপে শান্তি—রুষিয়ায় শান্তি নাই, কিন্তু বাদবাকি ইউরোপে কি শান্তি আসিয়াছে? ভীষণ যুদ্ধের ঝড় বহিয়া গেল, আর আমরা ভাবিলাম যে, এবার সকল বিদ্বেষের তাপ উপিয়া যাইবে; কিন্তু গেল না। শান্তির পুরোহিতেরা সভা করিলেন, বিশ্বপ্রীতির মন্ত্র উচ্চারিত হইল; সংবাদ পাওয়া গেল যে শান্তির বৃষ্টিধারা বহিতেছে; কিন্তু এই বৃষ্টিতে ভিজিয়াও অনেক স্থান হইতে বসুন্ধরার আর্ত্তনাদ শোনা গেল,—"অন্তরে দারুণ জ্বালা,—জ্বলে যায়, জ্বলে যায়।" তবে আয়ার্ল্যাণ্ডের জ্বালা হয়ত কমিয়াছে,—হয়ত অল্পদিনে সীমার বিবাদ মিটিবে ও বিরোধ-বিদ্বেষ চলিয়া যাইবে।

ঝড়ে যাহা ভাঙ্গিয়াছে, শান্তির জল-প্লাবনে তাহাতে নূতন রস সঞ্চারিত হইয়া নূতন জীবন অঙ্কুরিত হইবে ত? অষ্ট্রিয়ার রাজধানী, পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিল; এখন, সংস্কারের অভাবে অর্থাৎ অর্থের অত্যন্ত অভাবে সুন্দর এমারতগুলি ধসিয়া পড়িতেছে; ভিয়েনার চিকিৎসাবিদ্যালয় ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ছিল, সে প্রতিষ্ঠান মুমূর্ষু দশায় পড়িয়াছে; বিচ্ছিন্ন অষ্ট্রিয়া আর সবল হইতে পারিবে কি? জর্ম্মানি পাপ করিয়াছিল,—সে পাপের শাস্তি সে ভুগিতেছে; এখন রাইনসীমান্তে ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণেরা যে ভাবে বিচরণ করিতেছেন, তাহাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক হইবে মনে হয়। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা অপেক্ষা উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কি অধিকতর পুণ্যের কার্য্য নয়? বিশ্বের এই জ্ঞানের পীঠ হতশ্রী হইয়া পড়িলে, পৃথিবীরই দুঃখ বাড়িবে।

সুখের বিষয় যে ফরাসীদের ক্ষোভ একটু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়; সুবুদ্ধিতে সুচতুর

Lloyd George মহোদয় এবারে Poincaireএর কাণে কাণে কি মন্ত্র পড়িয়াছেন জানা নাই, কিন্তু যাহাই হউক ফরাসী দেশের উত্তেজনা কমিয়াছে। অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ত চির-প্রশান্ত হইতেই চলিল ; এবারে ভূমধ্য সাগরের কূলে কূলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেই পৃথিবী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

* * *

লর্ড লিটন—অল্প দিনেই আমাদের এই নূতন গবর্ণর বঙ্গের তক্তে বসিবেন। সাহিত্যে লিটন বংশের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, নূতন গবর্ণরের পিতামহ বুলুআর লিটনের কথাগ্রন্থ ও কবিতা অনেকেই পড়িয়াছিলেন, এবং শিক্ষিত লোকেরা নিশ্চয়ই জানেন যে ইঁহার পিতারও সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল। তবে আশা করি যে গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইঁহার পিতার ব্যঙ্গ রচনাটি সকলে ভুলিয়া যাইবেন। নূতন গবর্ণরের পিতা লিটন যে সময়ে ভারতের গবর্ণর-জেনারল ছিলেন, সেই সময়ে এই ভারতের মাটিতে আমাদের নূতন শাসনকর্ত্তা ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। বংশের গুণে নূতন লিটন বাহাদুর সুশিক্ষা বিস্তারের অনুরাগী, এবং এখনই বিলাতে কথা উঠিয়াছে যে, তিনি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা করিবেন। ইঁহার পিতা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লিটন, এদেশে আসিবার পূর্ব্বাহ্ণে ডিস্‌রেলিকে বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাহিত্যের আবহাওয়া ছাড়িয়া, ভারতবর্ষে প্রবাস করা তাঁহার পক্ষে বড় সুখকর হইবে না ; উত্তরে ডিস্‌রেলি বলিয়াছিলেন, যে অবসাদ আসিলেই, তিনি যেন তাঁহার কবিতার পাখায় ভর দিয়া একটু উর্দ্ধে ওড়েন। তিনি এদেশে কবিতার চর্চ্চা করিতেন কি না জানা নাই, তবে আমরা জানি যে, তিনি রাজনীতিজ্ঞের মত উর্দ্ধে উড়িয়া ভারত সীমান্তে আফ্‌গানিস্থানের প্রভুত্বের বহর দেখিয়া লইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের প্রতিষ্ঠায় ইনিই প্রথমে দিল্লীতে জাঁকাল দরবার করেন। নূতন গবর্ণরকে খুসী করিবার জন্য তাঁহার পিতামহের Rienzi খানি এখন বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিলে কেমন হয় ? এই গ্রন্থে সহৃদয় বুলুআর লিটন, ইটালীর দুর্দ্দশার দিনের কাহিনী লিখিয়াছিলেন।

* * *

সাহিত্য-সভা—মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে ইষ্টারের ছুটীতে, ১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইবে, এবং যাঁহারা ঐ অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পড়িতে চাহেন তাঁহারা যেন ১৫ই চৈত্রের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকটে লেখাগুলি পাঠাইয়া দেন।

উমার তপস্যা

বালকশিল্পী শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী।

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

১ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৯ [৩য় সংখ্যা

পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বল্‌লে, "বাহ্লীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বল্‌লে, "গান্ধার রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়চে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ আর ধরে না।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বল্‌লে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোর বেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মত তার বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্ত্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগ্‌ল, পুঁথি থেকে চোখ তুল্‌ল না।

রাজা বল্লে, "এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীপুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বল্‌লে, তুমি ত আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বল, বিবাহে তার মন নেই কেন?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "মহারাজ যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার কামনা সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড় বড় পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখ্‌লে। মাথা নেড়ে বল্‌লে, "পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইসারা মেলে না।"

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়্‌ল। তারা বল্‌লে, সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপই ঘুরলেম,—এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আনতে; মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েচি কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।

রাজা বল্‌লে, "ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "সেই যে আছে নবীন পাগ্‌লা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা ডাক তাকে।"

নবীন পাগ্‌লা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে?"

সে বল্‌লে, "সেখানে আমি ত সদাই যাওয়া আসা করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা?"

পাগলা বল্লে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বল্‌লে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কি উপায়ে?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগ্‌লামি, এ'কে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগ্‌লার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজ্‌ল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি,. আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, " কোথায় যাচ্চ ?"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে, " উদাস ঝোরা।" সেই ঝরনার তলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্‌লে, " আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে কাম্যক সরোবরের তীর বেয়ে চল্‌ল, পৌঁছল কাম্যক সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেচে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বল্‌লে, " তোমার ঐ কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে ?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী ? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্‌লে, " এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, " তুমি কোন্‌ পরী আমাকে সত্য করে' বল।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন মেঘের আচম্‌কা বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাসি, সে আর থাম্‌তে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাব্‌ল, " স্বপ্ন বুঝি ফল্‌ল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে, " এস।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠ্‌ল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি ?"

সে বল্‌লে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বল্‌লে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বল্‌লে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্মবেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই।"

পরীর মূর্ত্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির সুর এই ঝরনার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।"

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দ্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, "এ সব কেন ?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েচে; আর মনে পড়্‌ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনচে, আর গুন গুন করে গান গাইচে।

সে বল্‌লে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা,—ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দ্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "এ কেমনতর পরী ?"

রাজার মেয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, কি লজ্জা!"

মহিষীর দাসী বল্‌লে, "পরীর বেশটাই বা কি রকম ?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেচে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেচে,

আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মত।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠ্‌তে যায় রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই চোখ জলে ভেরে এলো।

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?"

সে বল্‌লে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তবে এইবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ গগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমিঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে' হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুক্‌ল, পরী বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণ, তার উপর শাদা কুন্দ ফুল রাশ করা; আর উপরে জান্‌লা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।

আর কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেচে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই?

রাজপুত্র বল্‌লে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তা'কে পাওয়া যায় না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঁধু কোথায় ?

আনন্দে ও বিষাদে আমরা প্রাচীন ভারতের কথা বলি ; আনন্দ প্রাচীনের গৌরব-স্মৃতিতে, আর বিষাদ একালের দুর্দ্দশায়। অমর কমলাকান্তের কাতরোক্তিতে আছে,—আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে। সে কি কেবল নিরাশার প্রলাপ ? বেদ আছে, বেদান্ত আছে, স্মৃতি আছে, পুরাণ আছে, জ্যোতিষ আছে, চিকিৎসা-শাস্ত্র আছে, কাব্য আছে; আছে বটে, তবুও বলি, যে প্রাচীন বঁধুও নাই, বৃন্দাবনও নাই। আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই যে, বহু শতাব্দীর বিপ্লবে প্রাচীনের সহিত আমাদের তাজা বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; একটা আকস্মিক ঝড়ের তাড়নায় আমরা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, আর প্রাচীনের কীর্ত্তি ভগ্ন-স্তূপের মত, জড়ের পাহাড়ের মত পড়িয়া আছে। কমলাকান্তের কথার অনুরূপে, ঐ প্রাচীন পর-পদ-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ না হউক, কিন্তু সে আমাদের পাল-ছাড়া রকমের বুদ্ধির তেজের প্রভাবে ভস্মীভূত না হইলেও দগ্ধপ্রায়। কথাটা বুঝিতে এখনও হয়ত বহু দিন লাগিবে যে, এযুগে যাঁহারা প্রাচীনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন ও যাঁহারা অন্যদিকে প্রাচীনকে পূজা করেন, উভয় শ্রেণীর লোকেরাই তুল্যভাবে প্রাচীনের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। একদল প্রাণশূন্য জড়স্তূপের কাছে জড়ীভূত হইয়া হাত জোড় করিয়া আছেন, আর, আর একদল উদ্ভ্রান্ত হইয়া আকাশে উড়িতেছেন।

প্রাচীন যায়,—কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না ; কিন্তু প্রাচীনের ভিত্তিতেই যে নূতন গড়িয়া উঠে, প্রাচীন যে রূপান্তরিত হইয়া নূতনের অঙ্গে অঙ্গে থাকে, প্রাচীনের সারভাগ যে নূতনের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ও বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ প্রাচীন-নবীনের অচ্ছেদ্য মিলনের নামই যে বিকাশ ও উন্নতি, তাহাও অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রাচীন নিরন্তরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছে যে, তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া জড়াইয়া ধরিলে, মৃত কঙ্কালরাশির স্তূপের নীচে চিরসমাধি হইবে। গাছের পুরাতন পাতা যখন পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে, তখন কেহ তাহাকে বোঁটায় আটকাইয়া রাখিতে পারে না ; সে পুরাতন পাতা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে, যে অসীম প্রাণের নিঃশ্বাসে সে খসিয়া পড়িতেছে, সেই নিঃশ্বাসেই নূতন কচি সবুজ পাতা গজাইতেছে। আমরা প্রাচীন ভিত্তির অন্তর্নিহিত প্রাণের যোগে, নূতন হইয়া বিকশিত হইতেছি, না বিচ্ছিন্ন হইয়া অতীতের মৃত কঙ্কালের মধ্যে বসিয়া আছি, তাহা অল্প পরীক্ষাতেই ধরা পড়িবে। যদি দেখিতে পাই, প্রাচীনের জ্ঞান, প্রাচীনের দর্শন প্রভৃতি আমাদের মধ্যে নূতন ও উন্নততর হইয়া বিকশিত হইতেছে না, কেবলই টীকা-টিপ্পনীর ও ব্যাখ্যার স্তূপ বাড়িতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে, আমরা প্রাচীনের সহিত প্রাণের সম্পর্ক হারাইয়াছি, ও জড়স্তূপের পূজা করিতেছি। আমাদের প্রাণের মন্দিরে প্রাচীন বঁধুও আর নাই, আর আমাদের বিচরণক্ষেত্র প্রাচীনের স্বাধীন লীলাভূমি বা বৃন্দাবনও নহে।

বিপ্লবের কথা বলিয়াছি, ঋতুর পর্য্যায়ে যেমন কাল-বৈশাখী আসে, শ্রাবণের ধারা বহে, তেমনই সমাজের আবর্ত্তনে ও বিকাশে বিপ্লব আসিবেই। অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, আরও বিপ্লব ঘটিবে। তবে যদি ঝড়েই সব ভাঙ্গিয়া যায়, জলপ্লাবনেই সব ডুবিয়া যায়,—ঝড়, জলপ্লাবনের পরে, সতেজ শ্যামলতায় শরতের নব সৌন্দর্য্য না ফুটিয়া উঠে, যদি শস্য-পুষ্ট বিশ্বে নব বসন্ত না শিহরিয়া উঠে, তাহা হইলে আর জীবনের নিদান বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

আমি জানি যে, এক শ্রেণীর লোক অতি দৃঢ়ভাবে আমাকে বলিবেন যে, প্রাচীনের জ্ঞান এত ভাল ও এমন সতেজ জীবনপ্রদ বীজে অঙ্কুরিত হইয়াছিল যে, উহার পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ অসম্ভব বলিয়াই, এখন কেবল টীকা ও ব্যাখ্যাই চলিতেছে; তাঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, যাঁহারা ঐ জ্ঞানকে সম্মান করেন না, তাঁহারাই উহার নূতন সংস্করণ ও নূতন বিকাশ চাহেন। প্রাচীনের প্রতি অসম্মানের অপরাধে কে যথার্থ অপরাধী, তাহার বিচার করা ভাল। যাহা সতেজ জীবন-প্রদ বীজ লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আর বাড়িতে পারিল না অথবা চিরদিনের মত বন্ধ্যা হইয়া রহিল বলিলে কি প্রাচীন পদার্থের মহিমার ব্যাখ্যা হয়? সতেজ গাছের যদি নূতন উন্নততর চারা জন্মিতে ও বাড়িতে পাইয়া না থাকে, তবে আমাদের মনের ভূমির উর্ব্বরতায় সন্দিহান হওয়া উচিত ছিল; আদিম জিনিসটাকে বিকাশের নিয়মের অতীত করিয়া দিলে, তাহাকে গুণহীন ও নির্বীর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ শ্রেণীর স্তুতিতে প্রাচীনকে সম্মান করা হয় না, বরং নিন্দা করা হয়।

প্রাচীনকে যাঁহারা অতি-মানুষের কীর্ত্তি মনে করেন, অথবা প্রাচীনতায় যাঁহারা দেবত্ব আরোপ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন হইতে বিচ্ছিন্ন; কারণ তাঁহারা নিজেরা অধম যুগের ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র। তাঁহারা প্রাচীনের লীলাভূমিকে আপনাদের লীলাক্ষেত্র বা বৃন্দাবন করিতে পারেন না। যে সত্যের প্রতিভায় প্রাচীনের জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়াছিল, আপনাদের জ্ঞানে, সেই সত্যের বা সেই বঁধুর প্রতিষ্ঠা বুঝিতে পারেন না; তাঁহাদের কাছে প্রাচীন বঁধুও নাই বৃন্দাবনও নাই। যাঁহারা প্রাচীনকে উপেক্ষা ও উপহাস করেন, তাঁহাদের কথা না বলিলেও চলে, যাঁহারা সত্য বুঝিবার শক্তিকে, বিনয়ে হউক অথবা মোহে হউক, মলিন করিয়াছেন, এবং হয় প্রাচীনের দোহাই দিয়া, আর না হয় বিদেশের গৌরবের দোহাই দিয়া চলেন, তাঁহারা সত্য-লাভে বঞ্চিত,—বঁধু হইতে বহুদূরে। সত্য যেখানে নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত নয়,—হয় মনুর নামের জোরে, না হয় স্পেন্সারের নামের জোরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সত্য নাই, সত্যের ছায়াও নাই; কেননা প্রতি মানুষের নিজের জ্ঞানের ও অনুভূতির আসনেই খাঁটি সত্য আসিয়া বসেন।

শোনাকথা মুখস্থ করিতে করিতে বহুদিন হইতেই এদেশের অনেক লোক প্রত্যক্ষ সত্যের সংশ্রব হারাইয়াছিল; তাই ধীরে ধীরে, এদেশের অধোগতি হইয়াছিল; একজন সত্য-সেবকের নিকটে যে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য দশজনে তাহা ধরিতে পারেন নাই। এইজন্যই অনেক

পূর্ব্বকাল হইতেই একজনের উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপে অন্য দশটি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে পারে নাই। এ বিষয়ের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

আর্য্যভট্ট যখন বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী বড় বড় পণ্ডিতেরাও সে সত্য ধরিতে পারেন নাই। যখন ঐ তথ্যের সমালোচনার কথা উঠিয়াছিল যে, পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া অগ্রসর হইলে, পাখীরা কেমন করিয়া বাসায় ফিরিতে পারে। তখন আর্য্যভট্টের জ্ঞানের মূল ধরিয়া বিচার করিলে, খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ভারতে নিউটন জন্মিত।

সারাসেনেরা "অরিজভট্"কে আলোচনা করিয়াছিল ও নূতন ইউরোপে যখন সারাসেনদের জ্ঞান সংক্রামিত হইয়াছিল, তখন অরিজভটের জ্ঞানের বীজটুকুও ইটালিতে উপ্ত হইতে ছাড়ে নাই, ও তাহার ফলেই ইটালি নূতন আবিষ্কারের গৌরব পাইল, আর আমরা কোন প্রকারে এই দেশের আদিম কথার বাসি সংস্করণটুকু একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে সারাসেনদের নিকট হইতে, ও পরে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে মান্‌চেস্‌টরজাত কাপড়ের মত লাভ করিলাম।

আর্য্য ভট্টকে এদেশের লোকে অবতার করে নাই, তাহা জানি; তবে বিশেষ কারণে খাঁটি অবতারের দৃষ্টান্ত না দিয়া, এই প্রসঙ্গেই একটু ইঙ্গিতে বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানীকে অবতার করিয়া তুলিলে, মানুষে কেমন করিয়া অবতারকেও জড়ে পরিণত করে, আর নিজেরাও জড়বুদ্ধি হয়। ইউরোপে যদি গালিলিও, নিউটন, ডারউইন প্রভৃতিকে অবতার করা হইত, অর্থাৎ যদি উঁহাদের প্রাণশূন্য মাটির মূর্ত্তির পূজা চলিত, তাহা হইলে স্তোত্র বাড়িত, টীকা বাড়িত, কিন্তু উঁহাদের প্রাণের যোগে নূতন প্রাণ জন্মিত না,—উঁহাদের তথ্যগুলি নিত্য নূতন হইয়া বাড়িয়া উঠিত না। মানুষে যেখানে নিজের আত্মার মাহাত্ম্য ভুলিয়া বিস্ময়ে একেবারে পরের পায়ের গোড়ায় মাথা লুটাইয়া পড়ে, সেখানে দাসবুদ্ধির জড়তায় একেবারে জড় হইয়া যায়,—কোন প্রাণের সাড়া পাইবার আর অধিকার থাকে না; সে বঁধু হইতে বহুদূরে দ্বীপান্তরিত হয়। বঁধু খুঁজিতে হইলে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে,—"মৃত অতীতের কঙ্কালে গড়া পাহাড়ে দেবতা নাই;" বুঝিয়া লইতে হইবে,—"মৃতের শ্মশানে প্রেতের নৃত্য,—বদ্ধ জলায় কীটের তীর্থ।" মানুষেরা তাহাদের কোন কুলতিলককে যদি অতি-মানুষ করিয়া তোলে, যদি তাঁহাকে ভগবানের অবতার করিয়া গড়ে, তবে জড়বুদ্ধিতে তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিতে পারে, কিন্তু অবতারের লীলাকে স্বয়ং ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া নিজেরা আদর্শের অনুরূপ কাজ করা অসম্ভব মনে করিবেই করিবে। এ বুদ্ধিতে মানুষেরা শ্যামকে শ্যাম করিয়া না রাখিয়া শ্যামকে হারায়, আর অক্ষমতায় মজিয়া আপনাদের কুলকেও হারায়।

অন্যদিকে আবার যাঁহারা প্রাচীন ভুলিয়া, প্রাচীনকে উপেক্ষা করিয়া, নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে কল্পনায় ভাবিতেছেন যে—"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা," তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের বুদ্ধির 'চান্দ্রমসী লেখা' কৃষ্ণপক্ষে। যাহা আমাদের মাটিতে উপ্ত হইয়া আমাদের জল বাতাসে

বাড়িতেছে না, তাহা বিদেশী গাছের ডাল জড়াইয়া অতি অল্পকাল পর্য্যন্তই নিজের বায়বীয় মূলকে তাজা রাখিতে পারে। এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যাঁহার জন্ম ও বর্দ্ধন, হাজার কৃত্রিম উপায়েও যিনি এদেশের মানুষের "অনুন্নত" ভাবের চাপ এড়াইয়া "আত্ম-রক্ষা" করিতে পারিবেন না, দেশের জল-বায়ু ভাল না হইলে যাঁহার সকল রকমের স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব, তিনি যখন আপনার জ্ঞানের দর্পে "উনবিংশ ও বিংশ" শতাব্দীর দাবী করেন, তখন মায়াবাদকেই সার মনে করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—"সংসারটা ফাঁকি রে, যেন ভোজের বাজী"। আমার কুঁড়েঘরে যেদিন অমাবস্যার রাত্রে প্রতিবেশী বড় মানুষের উৎসবের আলো পড়ে, সেদিন আমার তেলের খরচ কমে বটে। বিদেশের বিদ্যুতের আলোক নিবাইয়া দিলে,—বিদেশের শব্দ-কোষের গ্রন্থগুলি সরাইয়া ফেলিলে যে আমাদের রচিত অধিকাংশ সাহিত্য পড়া যায় না ও দুর্ব্বোধ্য হয়, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি ?

বসুন্ধরা বিষ্ণু-ক্রান্তা, তাহা জানি ; বিশ্ব-ব্যাপ্ত বিষ্ণু-মন্দিরে যে দেশের লোকেই জ্ঞানের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করুক, যে কেহই মানস-গৌরবের উপহার দিক্, তাহা যে সকল দেশেরই প্রাপ্য ও উপভোগ্য হয়, তাহাও জানি ; কিন্তু সে উৎসবকে যাহারা আপনাদের উৎসব করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহারা আপনাদের প্রাণের মধ্যে উৎসবের প্রাণকে আনিতে পারিবে না। আপনার মাটিতে আপনি বাড়িয়া উঠিতে না পারিলে, যে বিশ্ব-প্রাণতা একটা হাওয়ার কথায় দাঁড়ায়, সেকথা বিশেষ করিয়া অন্য প্রবন্ধে না লিখিলে চলিবে না। কি উপায়ে জাতীয় বিশেষত্বের ভূমিতে প্রাণ বাড়াইয়া বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শলাভ করিতে পারা যায়, তাহা স্বতন্ত্রভাবে পরে বিচারিত হইবে। এখানে এইটুকুই ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমরা দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রাণহারা ; প্রাচীনের উপেক্ষাতেও প্রাণ নাই, প্রাচীনের গৌরব গানেও প্রাণ নাই। আমাদের সকল প্রকারের দম্ভ ও দাপাদাপি যে একটা বিদেশী অনুকরণের ফলে, কৃত্রিম উত্তেজনায় ঘটিতেছে,—জমাট বাঁধা সমাজ-শরীরের প্রাণের অভিব্যক্তিতে ঘটিতেছে না, এটুকু গোড়ায় বুঝিয়া লইতে না পারিলে, সকল কল বিকল হইয়া যাইবে।

উৎকট আয়োজনে ও বিকট চীৎকারে আমরা অনেকবার অনেক অনুষ্ঠান করিয়াছি,—সাধনার ফল আমাদের হাতে পড়-পড় হইয়াছে মনে করিয়াছি, কিন্তু শেষটা সকল উদ্যোগই ফক্কিকারে দাঁড়াইয়াছে। দুঃখে ও যাতনায় ছট্‌ফটানি জন্মিবেই ; কিন্তু চঞ্চল বুদ্ধিতে যাহা-কিছু করিলেই দুঃখ যাতনা যায় না। ব্যগ্র ও উৎসাহী অবিবেচকেরা বুদ্ধির কথা শুনিলেই উহা অকর্ম্মা অলসের উক্তি মনে করেন। পথভ্রান্তেরা, খাঁটি পথ না দেখাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, ধীর উপদেষ্টার কথা উপেক্ষা করিবেনই করিবেন ; এই অবস্থাতেই বিশেষ প্রয়োজন যে, ধীরেরা আমাদের উত্তেজনার অস্বাভাবিকতা বুঝাইয়া দিবেন ; কোলাহলে যে স্থায়ী জীবন বাড়ে না,—হারাপ্রাণ

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেকথা কোলাহলপ্রিয়েরা না বুঝিলেও, একাজ করিতে হইবে। কাহারও নিন্দায় বা স্তুতিতে, ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

যথার্থই আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে বলিয়া, আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্ভ্রান্ত ও পথহারা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া, যাহা স্থিরপ্রাণতায়, নিঃস্বার্থত্যাগে ও গভীর অনুরাগে করিতেছি, তাহা পণ্ড হইয়া যাইতেছে ; আর আমাদের ব্যগ্র উৎসাহের উত্তেজনায়, কেবলই জ্বর-বিকারের তাপ লক্ষ্য করিতেছি। সকল অনুষ্ঠানের আগে সকলে খুঁজিয়া দেখ তোমাদের সুস্থ প্রাকৃতিক প্রাণ কোথায়, তোমাদের বঁধু কোথায়।

বাস্তু

(চিত্র)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সদস্য নির্ব্বাচনের দিন। মিউনিসিপাল আফিসে বেলা ১০টা হইতেই জনতার সমাবেশ আরম্ভ হইয়াছিল।

রামবাবুও সদস্যপদ-প্রার্থী ছিলেন। সহরে রামবাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তি। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন মুসলমান মৌলভি পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও কেবল স্বজাতিবৃন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয়েই একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

কেনারাম বাবু প্রত্যুষ হইতেই অযাচিতভাবে ছুটাছুটি করিয়া রামবাবুর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সেদিনকার অপমানের পরেও তাঁহার এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা ও পরিশ্রম দেখিয়া অনেককেই স্বীকার করিতে হইতেছিল, "আমরা কেনারাম বাবুকে যতটা মন্দ মনে করি বাস্তবিক ততটা নয়। তাঁর মধ্যে সদ্‌গুণও আছে।" নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছিল, সবন্ধু কেনারাম বাবু ফটকের নিকটে দাঁড়াইয়া "ভোটার"-দের পরিচালিত করিতেছিলেন। রামবাবুর বন্ধুবর্গ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া কক্ষমধ্যে অবস্থিত হইয়া নির্ব্বাচনব্যাপার পরিদর্শনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দলে দলে রামবাবুর ভোটারগণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

তাহার পরেই মৌলভি সাহেবের ভোট আরম্ভ হইল। মৌলভি সাহেবের ভোট শেষ হইতে বেলা ২টা বাজিয়া গেল। ইতিমধ্যে রামবাবুর ভোটারগণও দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু কেনারাম বাবুর সুকৌশলে তাহারা আর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল না। কেনারাম বাবু তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, রামবাবু ইতিপূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়া দিয়াছেন তাঁহার আর ভোটের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শুনিয়া তাহারা হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। কেনারাম বাবু এই সুসংবাদ প্রচারের জন্য পল্লীতে পল্লীতেও লোক পাঠাইয়া দিলেন। সুতরাং যাহারা তখনও ভোট দিতে আসে নাই তাহারাও আর আসিবার কোন প্রয়োজন মনে করিল না। ক্রমে ভোট দিবার নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইয়া আসিল, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রামবাবু বাহিরে আসিলেন। তখন আর একজন ভোটারও তথায় উপস্থিত ছিল না।

রামবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "কি রকম হ'ল? যে সব পাড়ায় সমস্ত ভোটাররা আমাকে ভোট দেবার কথা, তাদের একজনেরও দেখা নেই কেন?" শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কেনারাম বলিলেন "সে কি? আপনার ভোট এখনো ইউসুপের চেয়ে কম আছে নাকি?" রামবাবু বলিলেন "বিলক্ষণ কম। এখনো প্রায় ৫০ ভোটের তফাৎ!"

"অ্যাঁ! বলেন কি? কি সর্ব্বনাশ! তাহ'লে ত আর এখানে চুপ্ ক'রে থাকা চলেনা—!" বলিতে বলিতে কেনারাম দ্রুতপদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন। বন্ধুরাও ক্রমে ক্রমে নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যথাকালে নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশিত হইল। রামবাবু পরাজিত হইলেন।

গোবর্দ্ধন বলিলেন "আশ্চর্য্য মাথা মশাই আপনার! সময়ে সময়ে পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা করে!"

কেনারাম হাসিয়া বলিলেন "এ কলিকালে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষদের কি জয় হবার যো আছে বাবু মশাই? এটা যে 'পাষণ্ড—নরাধম'দের কাল! যা হ'ক রামবাবু বড় মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েচেন। অতবড় মানী লোকটার মানহানি হ'ল! চল একবার তাঁর বাসায় গিয়ে শোক-প্রকাশ ক'রে আসা যাক্। মহাপুরুষদের বিপদে চুপ ক'রে থাকাটা ভাল হয় না।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন "না মশাই। অত আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। তাদের কি এখনো এসব কথা জানতে বাকি আছে!"

উচ্চ হাস্য করিয়া কেনারাম বলিলেন "তোমার Moral Courage বড় কম বাবু মশাই!"

৬

রঘুনাথগঞ্জের সরকারি তহসিলদার হরিচরণ রায়ের গৃহে প্রভাতে চায়ের "অন্নসত্র" ছিল।

প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে যে কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেই চায়ের "উত্তপ্ত আপ্যায়ন" হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না।

চায়ের সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল ;—বিস্কুট, কেক, ডিম্ব, লুচি প্রভৃতিও অতিথিবৃন্দের রুচি-অনুসারে বিতরিত হইত।

কেনারাম এবং গোবর্দ্ধনও এই সভায় বিশিষ্ট সভ্যমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কেনারামের লুচি-সন্দেশের এবং স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যপীড়িত স্থূলোদর গোবর্দ্ধনের কুক্কুটডিম্বের প্রতি অধিকতর পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হইত।

এই জলযোগসভায় অনেক কাজের কথাও আলোচিত হইত। স্থানীয় মধ্য-ইংরাজি স্কুলটীকে উচ্চইংরাজি স্কুলে পরিণত করিবার জন্য হরিবাবু বহুদিন হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া এজন্য তিনি একটী ভাণ্ডারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদিন ভাণ্ডারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং অনেকেই মনে করিতেছিলেন যে এইবার কার্য্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আজ সেই জন্য চা পানের পর এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য একটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল।

সহরের মান্যগণ্য ভদ্রলোক প্রায় সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামবাবু বলিলেন "হরিবাবু নিঃস্বার্থভাবে এই মহৎ কার্য্যের জন্য অকাতরে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।"

কেনারাম চীৎকার করিয়া বলিলেন "এতে আর কথা কি আছে? এ রকম লোক কলিকালে দুর্লভ। হরিবাবু রঘুনাথগঞ্জে একটা কীর্ত্তি রাখলেন!" গোবর্দ্ধন ব্যস্তভাবে ধূমপান করিতে করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "ওঃ, হরিবাবু একজন মহাশয় লোক!"

বহুক্ষণ আলোচনার পর স্কুলকমিটি গঠিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিবাবু সেক্রেটারি এবং রামবাবু সহযোগী সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন; কেনারাম বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, গোপাল বাবু, সরোজ বাবু প্রভৃতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

কেনারাম উঠিয়া দাঁড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন "এরূপ মহৎ কার্য্যে আপনারা আমাকে দয়া করিয়া যে কাজের ভার দিবেন আমি তাহাই মাথা পাতিয়া লইব। যদি আপনারা আমায় স্কুল কম্পাউণ্ডে ঘাস ছুলিতে বলেন, সেও আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে। হরিবাবু আজ আপনাদের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইলেন, আমাদের সকলেরই যথাশক্তি সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উচ্চ স্কুলের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

নির্জ্জনপথে উপস্থিত হইয়া কেনারাম বন্ধুবরকে বলিলেন "কি বল বাবুসাহেব, তা হ'লে হরিবাবু রঘুনাথগঞ্জে একটা কীর্ত্তি রাখ্‌লেন। এখানে যে হাইস্কুল হবে একথা কেউ স্বপ্নেও

ভাবেনি কি বল ?” গোবর্দ্ধন বলিলেন “তাতে আর সন্দেহ কি ? হরিবাবু লোকটা অতি মহৎ লোক।” হাসিয়া কেনারাম বলিলেন “তাতে আর সন্দেহ আছে ? প্রত্যহ প্রাতঃকালে এতগুলি ভদ্রলোককে আপ্যায়িত করা কি যে-সে লোকের কাজ !

কেনারাম হাসিয়া উঠিলেন। গোবর্দ্ধনও হাসিয়া বলিলেন “আপনি নেহাৎ নেমকহারাম !” হাসিয়া কেনারাম বলিলেন সেটি বলবার যো নেই বাবুসাহেব, আমি চা, লুচি এবং মিষ্টান্ন ছাড়া কোন দিন নুনটুকু পর্য্যন্ত খাইনি !”

এক মাস যাইতে না যাইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত পড়িল যে হরিবাবু স্কুল-ফণ্ডের ছলনা করিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ঘুষ আদায় করিতেছেন। এবিষয়ে তদন্ত করা হউক। ফলে হরিবাবু অল্পদিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত হইলেন। অন্যান্য উদ্যোগিবৃন্দ ভীত ও বিরক্ত হইয়া স্কুলের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। উচ্চ স্কুলের আশা শূন্যে মিলাইল। শোকাভিভূত কেনারাম তিন দিন গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না !

৭

কেনারামের একটি পুত্র ডাক্তারি পড়িতেছিল। কেনারাম অতি সুকৌশলে তাহার বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কেনারামের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বেশ খ্যাতি ছিল। অনেকেই শুনিয়াছিল যে তিনি ৫০।৬০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, বিস্তর জমাজমি ও বাড়ীঘরের অধিকারী এবং কুলে শীলেও উন্নত। সুতরাং এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুশিক্ষিত পুত্রকে হস্তগত করিবার জন্য কন্যাপক্ষীয়েরা স্বভাবতঃই মধুলোলুপ মধুকরের ন্যায় সোৎসাহে কেনারামকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া কেনারাম এক সুকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক কন্যাকর্ত্তাকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র ডাক্তারি পাশ না করিলে তাহার বিবাহ দিতে পারিবেন না। তবে পূর্ব্ব হইতে তাহার শিক্ষার ব্যয়ের জন্য যিনি অর্থ সাহায্য করিবেন তাঁহার আবেদন তিনি নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করিবেন। তবে এই গোপন সাহায্যের কথা তিনি কোন প্রকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কারণ তিনি “পণ নিবারিণী সভায়” প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে, পুত্রের বিবাহে তিনি আদৌ পণ গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং অনেকেই গোপনে এবিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক প্রকার বিনাব্যয়েই কেনারামের পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

পুত্র বীরেশ্বর এইবার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ; সুতরাং আশামুগ্ধ কন্যাকর্ত্তারা

এইবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেনারাম সকলকেই মিষ্টবাক্যে আশ্বাস দিয়া পত্র দিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে সঙ্গোপনে এক বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

কেনারাম জানাইয়াছিলেন যে, পুত্রের বিলাত গিয়া আই, এম্, এস্, পরীক্ষা দিয়া আসার খরচ দিতে পারিলেই তাঁহার তথায় বিবাহ দিতে কোন আপত্তি হইবে না। ব্যবসায়ী তাহাতেই সম্মত হইলেন। সুদূর পল্লীভবনে গোপনে পুত্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এবং বিবাহের অল্পদিন পরেই পুত্রবর বিলাত যাত্রা করিলেন।

কিন্তু সংবাদ অধিক দিন গোপন রহিল না। প্রতারিত কন্যাপক্ষীয়গণ গর্জ্জন করিতে করিতে কেনারামকে আক্রমণ করিলেন। কেনারাম উচ্চতর চীৎকারে চারিদিক নিনাদিত করিয়া বলিলেন "হতভাগা—পাজি—সয়তান! দেখুন দেখি মশাই, ভেতরে ভেতরে এই ভয়ানক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে! আমি যদি এর বিন্দুবিসর্গ জানি! হতভাগা—পাজি—জোচ্চোর! আপনারা নালিশ ক'রে বেটাকে জেলে দিন। আজ থেকে আমি তাকে "ত্যজ্য পুত্তুর" করলুম! আর যদি কখনো সে ছেলের মুখদর্শন করি ত—"! কেনারাম ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া হতাশ কন্যাপক্ষীয়গণ নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

৮

কেনারাম সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণ তারিণী চক্রবর্ত্তীর দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহার বাটীখানির সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই বাড়ীখানি হস্তগত করিতে পারিলেই তাঁহার বাটীখানির চারি পার্শ্ব সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইত। কিন্তু হতভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার এই যুক্তিসঙ্গত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন "আপনারা বড় লোক, আপনারা একটার জায়গায় দশটা বাড়ী কর্‌তে পারেন। কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণ—এই বাস্তু ভিটাটুকু গেলে ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব বলুন।"

ব্রাহ্মণের এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য কেনারাম নানা উপায়ের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনটাতেই আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

এবার আশ্বিনের প্রথমেই মনে মনে একটা নূতন সংকল্প স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণের বাটীর জলনিকাশের পথ বন্ধ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

কেনারামের এবং তারিণী বাবুর বাটীর মধ্যে একটি জল-প্রণালী ছিল। কেনারাম মিস্ত্রী ডাকিয়া এই জল-প্রণালী বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ইহাতে আপত্তি করায় কেনারাম বলিলেন, "এ গলি আমার। আমি ইহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। তোমার ক্ষমতা থাকে আদালতে যাও। আদালত খোলা আছে।"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভগবান স্মরণ করিয়া নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেলেন। কেনারামের ও তারিণী বাবুর বাড়ীর সমস্ত অপরিষ্কৃত জল গলির মধ্যে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের জীর্ণমূল গৃহপ্রাচীর কবে ভূমিসাৎ হয় কেনারাম সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ-প্রাচীর জীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সহসা কেনারামের দেহ-প্রাচীর জীর্ণ হইয়া পড়িল। কেনারাম পূজার পূর্ব্বেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

জ্বর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং রোগ-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

কেনারাম বিকট আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন "রোগ অতি কঠিন,—টাইফয়েড"! ভীত কেনারাম চীৎকার করিয়া বলিলেন "দোহাই ডাক্তার বাবু, দোহাই আপনার—আমায় রক্ষা করুন।" ডাক্তার বলিলেন, "আপনার বাড়ী ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। টাইফয়েড হ'ল কেন? জলনিকাশের কোন ত্রুটি হয়নি ত?" কেনারামের তারিণী বাবুর জলনিকাশের পথ বন্ধ করাইয়া দেওয়ার কথা মনে পড়িল। কেনারাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আমি আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছি ডাক্তারবাবু!" পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এখনি যাও, রাজেন, মিস্ত্রি ডাকিয়ে গলির পাঁচিল ভাঙ্গিয়ে দাও।"

বৃত্তান্ত শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন "ছি ছি এমন কাজও করে। আপনি এত বুদ্ধিমান হ'য়ে এইটে বুঝতে পারলেন না কেনারাম বাবু?"

রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কেনারাম প্রলাপের ঘোরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ডাকো তারিণী চক্কোত্তিকে আমি তার পায়ে ধোরবো! দোহাই পণ্ডিত মশাই, পায়ের ধূলো দিন, পাপীকে নরকে ফেলবেন না! ডাকো রামবাবুকে আমায় চাবুক মারুক। রাজেন! সর্ব্বস্ব খরচ ক'রে কাঙ্গালী-ভোজন করাও। চাটুয্যে মশাইকে ডাকো আমায় জেলে দিক্, আমায় দিয়ে ঘানি টানাক! ওঃ—হোঃ—হোঃ! ও কে বাবুমশাই নাকি? বাঁদরের মুখোস প'রে লোক হাসিও না—স'রে পড়! স'রে পড়!"

তৃতীয় সপ্তাহে প্রলাপের ঘোর কাটিয়া গেলে কেনারাম গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া কাঁদিয়া

বলিলেন "আমায় কলকাতা পাঠিয়ে দাও বাবুমশাই। পয়সা খরচ হবে বলে ছেলেগুলো যেন অ-চিকিৎসায় মেরে না ফেলে! দোহাই আপনাদের! আমি আপনাদের সবারি পায়ে ধরচি—আমায় এযাত্রা রক্ষা করুন।" কেনারামের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতেই তাঁহার কলিকাতা যাওয়া স্থির হইল। তাঁহার দুই পুত্রের সঙ্গে গোবর্দ্ধনও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে কেনারাম কাঁদিয়া বলিলেন, "আমায় মাপ করবেন সবাই—আমি আর বুঝি ফিরবো না!" সকলেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আহা, সে কি কথা! আপনি শীঘ্রই ভাল হ'য়ে ফিরে আসবেন—চিন্তা কি?" কাতর কেনারাম কহিলেন, "আমার আসন্নকাল উপস্থিত—আর আমায় ফিরতে হবে না!" অন্তরাল হইতে কে বলিয়া উঠিল:—"আহা ভগবান তাই করুন। রঘুনাথগঞ্জ "বাস্তুর" হাত থেকে নিষ্কৃতি পাক্।"

সকলে অপ্রসন্নদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন। বাঁশি বাজাইয়া গাড়ী আপনার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল।

সমাপ্ত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

বাংলার নবযুগের কথা

দ্বিতীয় কথা—যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন

(১)

রাজা রামমোহন হইতেই বাংলার নবযুগের সূচনা. অনেকে একথা কহিয়া থাকেন। কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। রাজাই প্রথমে বাংলার সনাতন স্বাধীনতাপ্রবৃত্তি ও মানবতাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন। জীব যেমন জাগে ও ঘুমায়, সমাজও সেইরূপ এক একবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার লক্ষ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রাটা তমোগুণের প্রাবল্যহেতু আমাদিগকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। কোন জাতি যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন এই তমোগুণের দ্বারাই সে একান্ত অভিভূত হয়। আলস্য, অজ্ঞানতা, এ সকলই তমের লক্ষণ। তম-অভিভূত হইলে সমাজ যাহা চলিয়া আসিয়াছে

তাহাতেই গা ঢালিয়া দেয়। ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম উভয়ই তখন প্রাচীননেমিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কৈ? আমাদের সমাজও রাজা রামমোহনের সময়ে এই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে ধর্ম্মটাকে অন্তরের অনুভবের উপরে গড়িয়া না তুলিয়া বাহিরের আচার-বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পণ্ডিতেরা এবং জনসাধারণে মুখে ইহা মানিতেন, কিন্তু বেদ-অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; স্মৃতি এবং পুরাণই ধর্ম্মের প্রামাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এ সকল স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা আছে। এ সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া পুরাণের ও স্মৃতির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন ও মর্য্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা কেহই করিতেন না, নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেন মাত্র। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার হয় তাহা পড়িতে পড়িতে দেশের সেকালের লোক-চিন্তার ও লোক প্রবৃত্তির এই ছবিটাই চক্ষের উপরে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায় রাজা রামমোহন বাংলার সেই চিরপ্রাচীন ও চিরপরিচিত, কিন্তু সম্প্রতি-বিস্মৃত, স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্র জপিতে জপিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজার এই চৈতন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রেরণায় জাগে নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিচারে, কিম্বা তিনি যে বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রচার করেন তাহার ভূমিকায়, অথবা অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তিকায়, এমন কি, তাঁহার সামাজিক আলোচনাতেও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে রাজা সর্ব্বত্রই স্বজাতির পুরাগত শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপরেই আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়া দেয় নাই।

যে ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাশীস্ যুক্তিবাদের ছাপ পড়িয়াছিল। এই শিক্ষা যুক্তিকেই বস্তু-জ্ঞানের ও সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা বলিয়া আমাদের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশেরা প্রায় সকলেই এই যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এরূপ যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু যুক্তি এবং শাস্ত্রের পরস্পরের বিরোধ মিটাইয়া যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রার্থকে নিষ্কাশিত ও শাস্ত্রদ্বারা যুক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়ের সমন্বয়ের উপরে আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

শাস্ত্র ত কথা; কথা ত বস্তুর অর্থাৎ যাহা আছে বা হইয়াছে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; যাহা আছে বা হইয়াছে তাহা আছে কি নাই, হইয়াছিল কিনা, ইহার প্রমাণ মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভব। সুতরাং শাস্ত্রীয় কথার প্রামাণ্য প্রকৃত পক্ষে সে নিজে নয়; কিন্তু সাধকের অনুভূতি। যতক্ষণ না শাস্ত্রোপদেশ সাধকের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়া

ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ তাহার সত্য ও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, ততক্ষণ শাস্ত্র অজ্ঞাত-অর্থ ধ্বনির মত পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞিকেরা কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপ ঐন্দ্রজালিক ধ্বনির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ইহাই পূর্ব্ব-মীমাংসার মূল কথা। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান-সাধনের মূলভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ না বস্তুর অনুভব হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। কারণ "অনুভূতি পর্য্যন্তম্ জ্ঞানম্"—অনুভূতিতে যাহা শেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাই জ্ঞান। এইজন্যই জ্ঞানকাণ্ডের পথ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কেবল শ্রবণ নহে, শাস্ত্রের শব্দ শুনিলেই জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণের পরে মনন চাই। মনন অর্থে, বিচারপূর্ব্বক শ্রুত শাস্ত্রের বা উপদেশের অর্থের ধারণা লাভ করা। এখানেই জ্ঞান-সাধনে বিচারের প্রতিষ্ঠা হইল। বিচারের বাহন যুক্তি। সুতরাং জ্ঞানের পথে যে চলিবে সে যুক্তি ছাড়িয়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। এই বিচারের লক্ষ্য, শাস্ত্রে যাহা শোনা গেল, অনুভবেতে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা।

রাজা এই প্রাচীন পথ ধরিয়াই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মকে তাহার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজার যুক্তিবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে গড়িয়া উঠে নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ ধরিয়া য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসম্যক-দৃষ্টি নষ্ট করিতেই চাহিয়াছিলেন। রাজার বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তাদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা যে তাঁহাকে সংস্কার-ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে নাই, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ ইংরাজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বেই রাজা রামমোহন আপনার জীবনব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেরণা আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মোতাজোলা সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকমাত্র বলিলেও হয়। পাটনায় পারশী ও আরবী পড়িতে যাইয়া মুসলমানসাধনার সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেববাদ ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয়। তুফাতুলমহাউদ্দীন নামক পুস্তিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাটনা হইতে রাজা সংস্কৃত পড়িবার জন্য কাশীতে যান। এই খানেই উপনিষদ্ ও মীমাংসা শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার বহুদিন পরে রাজা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। রাজা বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার একজন আদি প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু তখনও য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ণ জ্যোতিঃ এদেশে ফুটিতে আরম্ভ করে নাই। রাজার অলোকসামান্য মনীষা তাহার কতকটা আভাষ পাইয়াছিল সত্য; লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজা নূতন করিয়া বাংলাদেশে আমাদিগের পুরাতন স্বাধীনতা ও মানবতার দুন্দুভিনাদ করিতে আরম্ভ করেন।

এ সকল তলাইয়া দেখিলে রাজা রামমোহন যে যুগের প্রবর্ত্তনা করেন, তাহাকে কিছুতেই ইংরাজযুগ বা ফেরঙ্গযুগ কহা যায় না। যে সূত্র অবলম্বনে রাজা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের জঞ্জাল কাটিতে আরম্ভ করেন সেই সূত্র অবলম্বনেই শ্রীরামপুরের পাদরীদের সঙ্গে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাঁহার Three Appeals to the Christian Public গ্রন্থে প্রচলিত খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মেরও জঞ্জাল কাটিতে চেষ্টা করেন। একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং অন্যদিকে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক পাদরী—এই উভয় দলের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা সত্য প্রতিষ্ঠার ও শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের যে সকল মূল সূত্র স্থাপন করেন তাহাতে কেবলই যে তাঁহার অলৌকিক মৌলিকতাই প্রমাণিত হয় তাহা নহে, কিন্তু রাজা ভারতের প্রাচীন সাধনা ও অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়াই যে এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এ সকল তলাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই রাজা রামমোহনকে পরবর্ত্তী ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীদিগের মতন বিদেশীয়ের অনুকরণশীল, বিদেশী প্রভাবের দ্বারা অভিভূত, আপনার স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানশূন্য, মামুলী ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারক বলিতে পারেন না। রাজা বর্ত্তমান যুগের যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একদিকে প্রাচীনের সূত্র দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে নিজের স্বজাতির সাধনার সনাতন কষ্ঠিপাথরে যুরোপের আগন্তুক সাধনাকে কষিয়া, উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ের উপরে এদেশে বর্ত্তমান নূতন যুগের নূতন সাধনার গোড়াপত্তন করিয়া যান। এই জন্যই রাজা রামমোহনকে বাংলার নবযুগের প্রবর্ত্তক বলিতেছি।

(২)

যে বেদশাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদই যে জগতের সনাতন সত্যকে মানবের অনুভবসাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই মনে হয় রাজা রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই কখানি উপনিষদেই মোটের উপরে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; শাস্ত্র প্রামাণ্যের উপরে করে নাই। অন্য পক্ষে 'কেন' উপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাষায় বেদাদি শাস্ত্রকে নিকৃষ্ট বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। সুতরাং, তত্ত্ববস্তুর প্রামাণ্য বেদ নহে, কিন্তু তাহা, যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। ব্রহ্মকে জানা যায় দুই উপায়ে,—এক, জগৎকার্য্য দেখিয়া; অপর, সমাধিযোগে। সৃষ্টি আলোচনা করিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপ কার্য্যের কর্ত্তারূপে দেখিতে পারা যায়। সাধারণের পক্ষে ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশস্ত পথ। বেদান্ত-সূত্র এই পথই প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতহঃ"—জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয় যাহা হইতে তাহাই ব্রহ্ম,—বেদান্ত এই বলিয়াই ব্রহ্ম মীমাংসায়

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপনিষদ্ কহিয়াছেন যে, সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং বুদ্ধি, ইহাই ব্রহ্ম-সাধনের পথ। ভৃগুবারুণী সংবাদে এই পথই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই ইহা দেখি যে যাহা ছিল না, তাহা হইল, যাহা হইল তাহা রহিল, আর যাহা রহিল তাহাও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই তিন অবস্থাকেই বেদান্ত জন্মাদি কহিয়াছেন। এই যে সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা, মন এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহার বিশ্লেষণ করিতে করিতেই বরুণপুত্র ভৃগু ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন।

একটু ভাবিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভৃগুবারুণী সংবাদে উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে পথে ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে। বরুণপুত্র ভৃগু ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সে বস্তু কি, যাহা হইতে জগতের জন্ম আদি হইতেছে তপস্যার দ্বারা তাহার সন্ধান করিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে অন্নই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই অন্নের সত্য অর্থাৎ অনুভবপ্রতিষ্ঠ অর্থ কেবল প্রাকৃত অন্ন বা খাদ্য নহে, কিন্তু, এই বিশ্বের প্রত্যক্ষ জড় উপাদান সমূহ। সূক্ষ্ম জড় হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই জড়ের দ্বারাই বিশ্বের স্থিতি, এই সূক্ষ্ম জড়েতেই বিশ্বের পরিণতি বা লয়, অন্নব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের ইহাই নিগূঢ় মর্ম্ম। এই সিদ্ধান্ত জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। আমাদিগকে বর্ত্তমানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে বরুণপুত্র ভৃগুর ন্যায় এই জড়বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল জড়কে গ্রহণ করে, জড়েতেই সঞ্চরণ করে, জড়কে পাইয়াই আনন্দ উপভোগ করে। এই জড়জগৎ একান্ত মিথ্যা নহে। এই জড়জগতেই আমরা ব্রহ্মকে বিশ্বের অনাদি আদি কারণরূপে, আদ্যাশক্তিরূপে, জগদম্বা রূপে, কারণজলে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের মূল অণ্ডরূপে, প্রত্যক্ষ করি। এই কারণব্রহ্মই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম বনিয়াদ। অন্নব্রহ্মকে প্রথমে না জানিয়া প্রকৃতপক্ষে একেবারে বিজ্ঞানব্রহ্মকে জানা যায় না।

কিন্তু, ভৃগু যেমন এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ, যাহার দ্বারাই অন্নের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, সেই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ জড়বিজ্ঞানের ভূমি হইতে উঠিয়া জীববিজ্ঞানের ভূমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভৃগু প্রাণব্রহ্মের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্রমে যে মনেতে প্রাণের প্রামাণ্য, সেই মনকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরেন। এ পথ মনোবিজ্ঞানের পথ। কিন্তু মন এবং তাহার অধীন জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল প্রকৃতপক্ষে বস্তুর খণ্ড জ্ঞানই লাভ করে, সমগ্র বস্তুকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া তাহার একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এই একত্ব অনুভব করা মনের অধিকারের বাহিরে। যে বৃত্তি দ্বারা আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে অখণ্ডবস্তুরূপে গাঁথিয়া তুলি, তাহার নাম বিজ্ঞান। ভৃগু, মনই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তের

অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, ক্রমে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই বিশ্ব-সমস্যার শেষ মীমাংসা হইল না। এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের অভিজ্ঞতার সকল প্রকোষ্ঠই খুলিতে পারি, কেবল একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ বিজ্ঞানের চাবি দিয়া খোলা যায় না। সেই প্রকোষ্ঠটি আনন্দের প্রকোষ্ঠ। এইরূপে পরিণামে জড় হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে ভৃগু ব্রহ্মানন্দের যে অভিজ্ঞতা, তাহাতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ভৃগুবারুণী সংবাদের ব্রহ্ম-সাধনের সঙ্কেতটী ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে এখানে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সঙ্গে ভারতের সনাতন ব্রহ্মসাধনার অদ্ভুত সম্মিলন ও সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগুর অন্নব্রহ্ম আধুনিক য়ুরোপের Physico-chemical group of the sciencesএর চরম সিদ্ধান্ত মাত্র। এই সংবাদের প্রাণব্রহ্ম য়ুরোপের Biological group of the sciencesএর চরম সিদ্ধান্তের নামান্তর মাত্র। সেইরূপ ভৃগুর মনোব্রহ্ম আধুনিক Psychological group of the sciencesএর শেষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভৃগুর বিজ্ঞান-ব্রহ্ম এবং আনন্দ-ব্রহ্ম আধুনিক সাধনার Philosophy এবং Artএর চরম সিদ্ধান্তেরই নামান্তর মাত্র। রাজা এসকল কথা কোথাও খুলিয়া বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু, একদিকে তাঁর বেদান্ত-শাস্ত্র প্রচার এবং অন্য দিকে এদেশে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা এ দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, এই সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বারংবার কহিয়াছেন, "ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তারূপে ভজনা কর, কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা মান।" তলাইয়া দেখিলে ইহাই ভৃগুবারুণী সংবাদের প্রথম শিক্ষা। বিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই জগৎ-কার্য্যের সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আর বিশ্ব-প্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে গেলেই জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির পরীক্ষিত পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই পথে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মিলন সহজ ও অবশ্যম্ভাবী। রাজার জীবনের সমগ্র চেষ্টা এই লক্ষ্য ধরিয়াই চলিয়াছিল। ভারতের মধ্য যুগের ঐকান্তিক অন্তর্ম্মুখীন ব্রহ্ম-সাধনকে মানুষের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়িয়া রাজা সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র করিতে চাহিয়াছেন।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে কোনও অতিপ্রাকৃতের কথা নাই, কোনও অলৌকিক ব্যাপার নাই, কোনও প্রকারের অনুভূতির অনধিগম্য শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উল্লেখ নাই। যাহা হইতে এই সকল ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা এই সকল ভূতগ্রাম জীবিত থাকিতেছে, যাহার প্রতি এই সকল ভূতগ্রাম গমন করিতেছে ও অন্তিমে যাহাতে প্রবেশ করিতেছে তাহাই ব্রহ্ম, বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য"-সূত্র এই শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজার উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রচারের মূল লক্ষ্যটি এখানেই ধরা পড়ে। এই ব্রহ্মই হিন্দুর সাধনায় জীবের একমাত্র সাধ্য। এই ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্যতিরেকে জীব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। দেবতারা পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লালায়িত; ব্রহ্মের নিকটে তাঁহারাও মুক্তিকামী হইয়া ব্রহ্মের ভজনা করেন।

শাস্ত্রপ্রমাণে এ সকল কথা দেখাইয়া রাজা বাংলার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকে ডাকিয়া এই ব্রহ্ম সাধনার পথ নির্দ্দেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃতেতেই আবদ্ধ ছিল, সুতরাং অতিশয় পণ্ডিত লোক ব্যতীত আর কেহই—কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য জাতি—এই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মুক্তি ত কেবল পণ্ডিতেরই সাধ্য নহে, জীবমাত্রেরই সাধ্য। মুক্তি-সাধনের অধিকার যেমন ব্রাহ্মণের, সেইরূপ চণ্ডালের, যেমন বিদ্বানের, সেইরূপ মূর্খের। মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিকে অতিশয় কঠিন যে সংস্কৃত ভাষা তাহার আবরণ দিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিলে চলিবে কেন? এসকল শাস্ত্র যাহাতে সকল লোকে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই রাজা এসকলের বাংলা অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বাংলার হিন্দু-সাধারণের স্বাধীন চিন্তা জাগাইয়া যাহাতে তাহারা বুঝিয়া শুনিয়া বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিয়া ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হয় তিনি তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

ইহা কেবল ধর্ম্মসংস্কার নহে। কিন্তু উপনিষদ্যাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজা বাংলা দেশে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে এক অভিনব চিন্তার খাত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আবার নূতন করিয়া ভগীরথের মতন বাঙ্গালীর মুক্তি কামনায় এক অভিনব জ্ঞানগঙ্গা ডাকিয়া আনিলেন। আমরা আজ বাংলার হিন্দু চিন্তা ও সাধনায় যে এক নূতন প্রাণতা ও সমন্বয় চেষ্টা দেখিতেছি তাহার মূল নির্ঝর রাজা রামমোহনের শাস্ত্র প্রচারে।

(৩)

রাজা কেবল স্বদেশবাসিগণের চিত্ত ও চিন্তাকেই অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাঁর শাণিত খড়্গ গিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে সকলের আগে তাহার ধর্ম্মকে স্বাধীন করিতে হয়। ধর্ম্মের এই স্বাধীনতা একভাবে এদেশে চিরদিনই ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতবাদ বা সিদ্ধান্ত বা সাধনের উপরে সমাজ কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ধর্ম্মসাধনে মানুষ যে পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণেই সমাজ আচারের ও কর্ম্মের বন্ধনে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ
তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।

—যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং যোগবলে সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমও হয়েন তথাপি চিন্তাতেও তিনি যেন লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করেন না। এই লৌকিকাচারই ধর্ম্মের শাসনদণ্ড হাতে লইয়া মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। শাস্ত্র ও উচ্চতর সাধনের কথা কেই বা জানিত! যদি ক্বচিৎ কেহ জানিতেন, তাহা জনমণ্ডলীকে জানাইবার চেষ্টা করিতেন না। সমাজের এই অবস্থায়

রাজা একদিকে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিসাধনকে জনসাধারণের অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেইরূপ অন্যদিকে তাহাদের আচার ব্যবহারকেও প্রচলিত সংস্কারের ও রীতিনীতির বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়া দেন। এবং যেমন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে সেইরূপ এ সকল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের বাহিরের কার্য্যেও তিনি একান্তভাবে য়ুরোপীয়দিগের মতন কেবলমাত্র যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন নাই, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে মিলাইয়া সমাজ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হয়েন।

রাজা দেশ প্রচলিত 'ছোঁৎমার্গের' পক্ষপাতী ছিলেন না, ইহাকে নষ্ট করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কহিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞান যে সাধন করিবে তাহার আবার শুচি অশুচি কি? যে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সাধন করিবে সে বাহিরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করিবে কেন? মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চমউল্লাসের ব্রহ্মসাধনের বিধানে এই 'ছোঁৎমার্গে'র নাম গন্ধও নাই। স্নাত হউক বা অস্নাতই হউক, শুচিই হউক বা অশুচিই হউক সকল অবস্থাতেই পরব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত। এইরূপে তিনি দেশবাসীর আচারকেও প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন।

(৪)

তারপর আরও খোলাখুলিভাবে রাজা মানুষের মানুষ বলিয়াই যে একটা অধিকার আছে, ধর্ম্মসাধনের বা সমাজশাসনের অজুহাতে কিছুতেই যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতেই রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেণ্টের ভারত-শাসন-সম্বন্ধীয় কমিটির নিকটে তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন। রাজার বিলাত প্রবাসকালে আরনল্ড নামে একজন ইংরাজ তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। আরনল্ডের কথায় জানা যায় যে রাজা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে ব্রিটিশের আধিপত্য থাকিবে, এইরূপ মনে করিতেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও শিল্পকলাদি শিক্ষা করিয়া নিজেদের দেশ শাসন ও সংরক্ষণের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরদিন বা সুদূর অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বিদেশীয়ের শাসনাধীনে বাস করিবে এ চিন্তা রাজার অসহ্য ছিল। অন্যদিকে তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান,

বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকুশলতাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সময়ে কোনও জাতি দুনিয়ার মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য ইংরাজ-শাসনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন। এইজন্যই ইংরাজ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুক ইহাতে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু অত বড় একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সার্ব্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্ত্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ যে সকল শাসন-সংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন।

(৫)

যেমন ধর্ম্মে ও সমাজসংস্কারে সেইরূপ রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রেও রাজা কেবল ভেদ বিরোধকেই জাগাইয়া তুলেন নাই, কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতের, শক্তির বা স্বার্থের একটা সমন্বয়ের পথ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের প্রয়োজন ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে যে স্বার্থের জাল পাতিয়াছিল, বিশ্বমানবের কল্যাণের মুখ চাহিয়া তাহাকে একদিন সেই জাল গুটাইতে হইবে এবং সেই বৃহত্তর স্বার্থের ভূমিতে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের ক্ষুদ্রতর স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইবে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা স্বদেশের এবং জগতের কল্যাণকামনায় এই শাসনের ভ্রম, ত্রুটি, অভাব এবং অভিযোগ যাহাতে দূর হইতে পারে পার্লামেণ্টের কমিটিকে সেই পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে এবং খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের সঙ্গে একাকী তিনি কি অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কতদিন ধরিয়া যে আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যার প্রাণে বলবতী সে সংগ্রামবিমুখ হইতে পারে না; মানুষের উপর মানুষ অযথা আধিপত্য করুক, রাজা ইহা সহিতে পারিতেন না। ইংরাজ পার্লামেণ্টে যখন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রিফর্ম্ম বিলের আলোচনা হয়, রাজা তখন বিলাতে। সে সময় তিনি তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পার্লামেণ্ট যদি এই পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য করে তাহাহইলে তাঁহার পক্ষে ইংলণ্ডে বাস করা অসাধ্য হইবে।

(৬)

রাজার এই মানবতা তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যেই ইহা

আছে। ভাগ্যবানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, অন্যে এই দেবদুর্লভ বস্তুকে অজ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃতির ভিতরে লুকাইয়া রাখে। রাজার অন্তর্নিহিত এই উদার মানবতার আদর্শ উপনিষদের শিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে আত্মাতে সকলকে দেখে, ও সকলের মধ্যে আত্মাকে দেখে, সে কি জাতিবর্ণের বিচার করিয়া মানুষে মানুষে কোনও কৃত্রিম ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? রাজা তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনার একটা অপূর্ব্ব শ্লোক তুলিয়া জীবের শিবত্ব প্রচার করিয়াছেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কহেন :—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ ॥

আমিই দেবতা, অন্য কেহ নই; আমিই ব্রহ্ম, শোকের ভোক্তা নহি; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন।

ইহাই মানবের মূল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ভূমিতেই জীব ও শিব এক। যেখানে মানুষ—তার জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, দেশ, যাই হউক না কেন—সেই যে শিবস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ আপনাকে আপনি জানে না বলিয়া এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানুষ দুঃখে ম্রিয়মান, শোকে মুহ্যমান, পাপে তাপে নিয়ত জর্জ্জরিত এবং আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া কল্পিতবন্ধনে পড়িয়া হাহাকার করে। এই জীবের শিবস্বরূপের সাক্ষাৎকার যে সাধক ঈষৎ পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তিনি যেখানে মানুষের মধ্যে আনন্দধারা প্রবাহিত সেখানেই অকুতোভয়ে আপনাকে ডুবাইয়া দেন, যেখানে মানুষের জ্ঞানচেষ্টা প্রকাশিত সেখানেই উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, যেখানেই মানুষ আপনার জীবনের বহিরঙ্গে নিজের নিত্যসিদ্ধ মুক্ত স্বভাব বা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই তিনি নিজের আরাধ্য দেবতার প্রকাশ দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন।

রাজা রামমোহনের মধ্যে ইহার অনেকটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজের ভোগবিলাস তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই, কিন্তু, সেই ভোগবিলাসের মধ্যে তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে আত্মা তাহার আনন্দ উপলব্ধির বহিঃচেষ্টা দেখিয়া সম্পূর্ণভাবে এ সকল ভোগবিলাসে যোগদান করিতেন। আর, ঠিক সেই হেতুতেই রাজা বিলাত যাইবার সমুদ্রপথে ফরাসী জাহাজের দেখা পাইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন।

রাজার এই মানবতার আদর্শকে ঠিক ফরাসী বিপ্লবের humanity'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফরাসী চিন্তায় humanity বা মানবতা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বৈষম্য আছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কৃত্রিম সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। সকল মানুষই শক্তিতে বা সাধনায় সমান, একথা সত্য নহে। আর মানুষের মধ্যে শক্তির ও সাধনার তারতম্য যখন আছে তখন সকলের সমান অধিকার, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ, যার যে কার্য্য

করিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই সে অধিকারও তাহার হয় না। হিন্দু চিরদিন মানুষের শক্তি সাধ্যের দ্বারাই তাহার অধিকার নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। এই অধিকারভেদ হিন্দু-সাধনার একটা প্রধান কথা। এই অধিকারী-ভেদের উপরেই হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর, এই বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াই হিন্দু আপনার ধর্ম্মের অপূর্ব্ব উদারতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রাজা এই অধিকারী-ভেদ মানিতেন এবং অধিকারী-ভেদ মানিয়াই তিনি বৈষম্যের মধ্যে দিয়া সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই একতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রামমোহনের পক্ষে য়ুরোপের নিরাকার বা একাকার মানবতার আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের মাদকতার উত্তেজনায় য়ুরোপ যে মানুষকে তার জন্ম, ধন, পদ বা অন্য কোনও উপাধির বিচার না করিয়া কেবল মানুষ বলিয়াই বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল ইহাতেই রাজার চিত্তকে আকর্ষণ করে। ইহার অন্তরালে তিনি আপনার স্বদেশের সনাতন আদর্শের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশে ব্রহ্ম-সাধনের ভিতর দিয়া যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই ভাবই য়ুরোপের এই সাম্যবাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা য়ুরোপের সাম্য, মৈত্রী এবং বিশ্বমানবতা বা humanityকে আপনার পরিচিত বৈদান্তিক সাধনের ভিতর দিয়াই দেখিয়াছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর মানবতার আদর্শ শূন্যগর্ভ এবং বস্তুতন্ত্রহীন ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানুষকে একাকার করিতে চাহেন নাই।

মানুষ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহে, সে সাকার। তার চিন্তা সাকার, ভাষার এবং জীবনের কর্ম্মে প্রকাশিত। তার ধর্ম্ম সাকার, অর্থাৎ বিশিষ্ট মতবাদ, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত ও বিশিষ্ট সাধনার পূজা পদ্ধতিতে গঠিত। তার সামাজিক সম্বন্ধগুলিও সাকার, বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানাদিরও ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে মানুষ বলিয়া একটা ভাববাচক শব্দ মাত্র প্রাপ্ত হই, কিন্তু মানুষ বস্তুটিকে ধরিতে ছুঁইতে পাই না। অথচ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সাধনার ভেদ বৈষম্যকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মনুষ্যত্বের এবং ধর্ম্মের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। রাজা য়ুরোপের এই বস্তুত্বহীন আদর্শ গ্রহণ করেন নাই।

(৭)

করেন নাই বলিয়াই রাজা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্মিলন এবং ক্রমে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্ম-সভার আদর্শের মধ্যে ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার সে আদর্শটি বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করিতে

যাইয়া রাজা ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন আমরা তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া য়ুরোপে যে ভাবে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে ভাবে একটা ঘননিবিষ্ট ভারতীয় Nation বা জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও সমীচীন হইত না। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে কেবল যে তাহাদেরই ক্ষতি হইবে এমন নহে, ইহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী বা বিশ্বমানব, ইংরাজীতে যাহাকে universal humanity কহে তাহারও সমূহ ক্ষতি হইবে। এই বিশ্বমানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মের মতন বিভিন্ন আধারের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত সত্য, শক্তি এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। বিশ্বমানব অঙ্গীস্বরূপ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই বিরাট পুরুষের অঙ্গ স্বরূপ। বিশ্বমানব কিংবা universal humanity এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Nation, এতদুভয়ের মধ্যে একটা জীবন্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। জীবের সকল অঙ্গ যদি নষ্ট হইয়া একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয়, তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে, সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকল যদি একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্বমানবও পঙ্গু হইয়া পড়িবেন। রাজা এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম্ম এবং সাধনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুকে তিনি হিন্দু রাখিয়াই বড় করিতে চাহিয়াছেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখীন করিতে চাহিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে এবং সাধনে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিয়াই সেই সকল সিদ্ধান্ত এবং সাধনের মধ্যে যে সনাতন সত্যের এবং কল্যাণের ধারা প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং সিদ্ধ মহাজনপরম্পরায় যে সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে উদার বিশ্বধর্ম্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্য এবং কল্যাণ যে আকারেই প্রকাশিত হউক না কেন, মূলে এক। সত্যে সত্যে এবং প্রকৃত কল্যাণের পথে কোনও ভেদ-বিরোধ নাই। যে ভেদ দেখিতে পাই তাহা কেবল ভাষাগত ও আকারগত, পুরাতন সংস্কারের আবরণে আবৃত বলিয়া। এ সকল বাহিরের ভেদ-বিরোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই সাধক সেই মহামিলনক্ষেত্রে উপনীত হন, যেখানে

'মিটে যায় সব ধন্দা
যাঁহা রাম রহিম এক বান্দা,
কাফেরে মুসলমানা।'

সেই মহা মিলনক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা ব্রহ্ম-সভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা দেখিলেন, ভারতবর্ষ আপনাদের বৈচিত্র্যে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন। এই ভারতে যাহা নাই জগতেও তাহা নাই বলিলে চলে। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি, বহু আচারপদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রাখিতেই হইবে। ভারতের লোক পুরাকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ, তাহারা ধর্ম্ম ছাড়িয়া যে কখনও একান্তভাবে আধুনিক য়ুরোপের Secularist দিগের মত নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে সপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুরাগকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণতা হারাইয়াছে, সেখানে তাহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে, যেখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে তাহাকে উদার করিতে হইবে, কিন্তু ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা ত দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়াও একটা ভারতীয় জাতি গঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্দুকে মুসলমান কিম্বা মুসলমানকে হিন্দু, অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়কে সেই সঙ্ঘভুক্ত করিয়া ভারতে একটা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে। যে উচ্চতর সাধনার ভূমিতে ভক্তসাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল ধর্ম্মের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেন সেই ভূমিতেও জনসাধারণকে লইয়া যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্যপক্ষে, এসকল ধর্ম্মের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সমাজের এবং সমষ্টিভূত ভারতীয় জাতীয় জীবনের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শের একটা নূতন জাতির পত্তন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এবং ভারতের জাতীয়তার মুল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশেই মনে হয় তিনি তাঁহার ব্রহ্ম-সভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; ব্রাহ্মসমাজ নামেও কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজের সিদ্ধান্তে ও সাধনে রাজা বৈদান্তিক হিন্দুই ছিলেন। পরমহংসাচার্য্য হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন। বাংলার তান্ত্রিকসাধন অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন। কিন্তু এই সাধনকে তিনি লোকসমাজে প্রচার করেন নাই। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন বেদান্তাদি শাস্ত্র; তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত; তিনি প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন-পথ অবলম্বন করিয়াই হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতাকে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্য্যেরা যে ভাবে শাস্ত্র ও সমাজধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়াই এগুলিকে নিজ নিজ সময়ের উপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা

পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত, ও সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজা রামমোহনও তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আধুনিক ভারতে সেই কাজটিই করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত রাণাডে কহিতেন, Raja Rammohan is one of the fathers of the great Hindu church. He is not the founder of a new religion.

(৮)

রাজা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেবল লোকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইবে বলিয়া নহে। এখানে তিনি যে প্রণালীতে জগতের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতার ভজনার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মসাধনের ক, খ বলিলেই চলে—অতিশয় বাল্যাবস্থার কথা। এইরূপ ভজনাতে সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মকে উপাসকের অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু গভীরতর ধর্ম্মজীবন এইরূপ একটা নির্ব্বিশেষ ভজনার দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রহ্মসভায় যে ভজনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎকর্ত্তাকে কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে, স্বরূপ লক্ষণের সাক্ষাৎকারের কোনও প্রকারের প্রয়াস হয় নাই। স্বরূপ উপাসনা নিম্নতম অধিকারীর জন্য নহে। যাঁহাদের সমাধির অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই কেবল স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন। কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ভজনা হয় তাহাতে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, ভক্তিরও সামান্য উন্মেষ সম্ভব, কিন্তু মুক্তিলাভ বা ভক্তিমার্গের উচ্চতর শিখরে আরোহণ কখনই সম্ভব হয় না। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভূতি ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হইতেই পারে না, আর এই ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতি স্বরূপ-উপাসনার অধিকারের কথা। তটস্থ লক্ষণার দ্বারা যে উপাসনা হয় তাহাতে এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ আদৌ সম্ভব নহে। ইহাই রাজার সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি যে একটা উচ্চতর সাধনাক্ষেত্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মসভার মূল লক্ষ্য ছিল—উচ্চতর ধর্ম্মসাধন নহে। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদাশীল করিয়া, ভারতের জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় দূর করাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা জানিতেন যে তাঁহার এই ব্রহ্মসভাতে কখনই জনসাধারণে আসিয়া যোগদান করিবে না। তিনি জানিতেন, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনায় স্বল্পবিস্তর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মহা মিলন-মন্দিরে আসিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানী সাধকেরা যদি এভাবে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত ও সাধনার কথা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে এ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সনাতন ও সার্ব্বজনীন সত্য আছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এ ভাবে হিন্দু দেখিবেন যে মুসলমানের মধ্যেও তাঁহার নিজের শাস্ত্র ও সাধনার অনেক সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানও দেখিবেন যে হিন্দুর সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্র ও সাধনার অনেক মিল আছে। সেইরূপ খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতিও অপরাপর ধর্ম্মে ও সাধনে নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আভাস পাইয়া সে সকল ধর্ম্মের প্রতি মর্য্যাদাশীল হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে ভেদ-বিরোধ তাহা বহিরঙ্গের, আচার-বিচারের, সাধনের অতি নিম্নস্তরের। ধর্ম্মবস্তু যখন অনুভবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে, এবং সাধক যখন সাধনার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন তখন এসকল ভেদ-বিরোধ তাঁহার দৃষ্টি হইতে আপনি ঝরিয়া পড়ে। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট্ ডীড্ পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ট্রাষ্ট্ ডীডের অন্য কোনও সমীচীন ব্যাখ্যা হয় না। আর এখানে এই ব্রহ্মসভাতে যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের চিন্তানায়ক এবং সাধকগণের একটা মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই সকল ধর্ম্মের জনসাধারণের মধ্যেও একে অন্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, অন্ততঃ পরস্পরের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রভেদ আছে সে সকল উদারভাবে গ্রহণ করিবার একটা শক্তি জন্মিত। এইরূপে ভারতে জনসমুদ্রের ধর্ম্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া, এসকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজা রামমোহন তাঁহার ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে রাজা ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার এই নবযুগে আমরা যে পূর্ণতর ও পূর্ণতম মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি, এবং যে মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই আমরা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা দিক দিয়া নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই আদর্শ সর্ব্বপ্রথমে রাজা রামমোহনের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই তাঁহাকে বাংলার এই নবযুগের যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া অভিবাদন করি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

অপরাজিতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সখা-সঙ্ঘ

আমাদের একটি সমিতি ছিল। শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায় আমি মা'র কাছেই লালিত পালিত। আমি যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকিতাম ততক্ষণই মা অস্থির থাকিতেন—কেবল আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন। তাহার পর আবার যে আমি বৈকালে খেলা করিতে যাইব—তাহা মা'র অভিপ্রেত ছিল না। বিশেষ মা'র ভয় ছিল, পাছে আমি দুরন্তপনা করিয়া খেলায় কোনরূপ আঘাত পাই—আর পাছে আমি কুসঙ্গে মিশি। কিন্তু মা বিশেষ বুঝিতেন, যে ছেলে সব সঙ্গীকে খেলা করিতে দেখে—যে বালসুলভ চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত খেলা করিতে ভালবাসে তাহাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিলে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। তাই মা আমাদের বাড়ীতেই আমার খেলার সাথীদিগের খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা খেলা করিতাম; মা আমাদের কাছে থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় আমাদের চাকর ছেলেদের বাড়ী বাড়ী রাখিয়া আসিত। আমি বড় হইলে—স্কুল হইতে কলেজে প্রবেশ করিলে—পুরাতন সঙ্গী কতক চলিয়া গেল, আবার নূতন সঙ্গীও আসিল। সেই সময় মিলন-ব্যবস্থা—সখাসঙ্ঘ নামে পরিচিত হইল। মার্ব্বল খেলার স্থান সাহিত্য আলোচনা দখল করিল—সম্মিলনে চা'র ব্যবস্থা হইল। তখন মা আর আমাদের কাছে থাকিতেন না; কিন্তু আমাদের খাবার প্রভৃতি যোগাইতেই ব্যস্ত হইতেন।

তবে সখাসঙ্ঘে কখনই অধিক সদস্য হয় নাই। আমি যেরূপে লালিতপালিত তাহাতে আমার চরিত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং আমার রুচিতে কতকগুলি নূতনত্ব সপ্রকাশ হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং আমার সঙ্গে সকলের ঘনিষ্ঠতা ঘটিতে পারিত না। যাহারা আমার মত ফুটবল খেলা দেখিত না, থিয়েটারে যাইত না, সাহিত্যালোচনায় আনন্দলাভ করিত, তাহারাই সখাসঙ্ঘে যোগ দিয়া টিকিয়া থাকিত; আর কেহ আসিলে দুই চারি দিনের মধ্যে বিরলদর্শন হইয়া শেষে অদৃশ্য হইত। সখাসঙ্ঘে আমরা—সখারা—সম্মিলিত হইয়া প্রধানতঃ সাহিত্যালোচনা করিতাম—সমালোচনার ছুরী দিয়া রচনা কাটিয়া তাহার স্বরূপ সন্ধান করিতাম; রচনাকে চিরিয়া যে তাহার সৌন্দর্য্য পাওয়া অসম্ভব তাহা বুঝিতাম না; বুঝিতাম না—রচনা ফুলেরই মত—তাহার কোমলতা, বর্ণ, সৌরভ, গঠন, সকলের সম্মিলনে তাহার সৌন্দর্য্য—তাহার দলগুলি ছিঁড়িয়া সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই সখাসঙ্ঘের সদস্য আমরা এদেশে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতাম ; মনে করিতাম— পরিবর্ত্তন ব্যতীত এ শিক্ষা কিছুতেই সমাজের উপযোগী হইবে না। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় তাহাকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহার ফলে সে আপনার সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্রতী হইবে, সামাজিক গুণের অনুশীলন করিবে। কোন দেশেই শিক্ষসমস্যার সমাধান হয় নাই—আর আমরা বিদেশী আদর্শই গ্রহণ করিয়াছি। এসব আলোচনা আমরা করিতাম।

এই সময়ে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইল। সে শিক্ষার আদর্শও বিদেশী—বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট শিক্ষায় ও তাহাতে বিশেষ প্রভেদ নাই—তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু আমরা মনে করিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আমাদের সাধ্যাতীত ; আর এই নব-প্রবর্ত্তিত জাতীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা আমাদের সাধ্যাতীত নাও হইতে পারে ; কারণ ইহা এখনও জমাট হয় নাই--নরম আছে ; বিশেষ ইহাকে ইচ্ছানুরূপ গড়িবার আশা করা যাইতে পারিবে। তাই আমরা এই শিক্ষার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। তখন বাঙ্গালার স্থানে স্থানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-গুলি স্থানীয় অবস্থার উপযোগী কিনা তাহা দেখিয়া একটা নূতন আদর্শ স্থির করিব মনে করিলাম।

সভ্যদিগের মধ্যে আমরাই উৎসাহ ও অবসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিশেষ নির্ব্বন্ধন আমি—আমাকে বিদেশে ঘুরিতে কেহ বারণ করিবার নাই। তাই আমার উপরই বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল।

আমার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পোষ্ট-কার্ডযোগে সদস্যদিগের গোচর করা হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতিহেতু প্রায় এক সপ্তাহ সঙ্ঘের অধিবেশন বন্ধ ছিল –আড্ডাধারীর অভাবে আড্ডা জমে নাই। তাহার পর আমি পরিদর্শন কার্য্যে গিয়াছিলাম। আমার বিবরণের ভিত্তির উপর সখা-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের বিরাট সৌধ রচিত হইবে। সুতরাং সকলেই সাগ্রহে আমার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় সঙ্ঘের বিরাট মজলিস বসিল—সভ্য সকলেই উপস্থিত—তাঁহাদের সঙ্গে দুই চারিজন "অসভ্যও" সমাগত। "বাজার চলতা" চীনে বাদামের তেল মিশান ঘৃতে ভাজা খাবার ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা উড়িয়া গেল, চ্যাচাড়ীর চেঙ্গারীতে মেদিনীপুরের শালপাতার উপর সাজান শুভ্র সন্দেশগুলা দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতেরই সমর্থন করিল—সংসারে সবই মায়া।

আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে—"কি দেখিলে ?"

দেখিয়াছিলাম অনেক জিনিষ—নূতন প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা হইতে জাতীয় বিদ্যালয়, এবং জাতীয় বিদ্যালয় হইতে অপরাজিতা পর্য্যন্ত অনেক নূতন দেখিবার জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছি। বন্ধুদিগের নিকট সব কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কেন না, আমার

অনুভূতির আনন্দের কথা বলিবার আর কেহ নাই। আমি পথের কথা হইতে আরম্ভ করিলাম।

লোকেশ আমার বাল্যবন্ধু—আমাকে বিশেষ জানিত। বিশেষ বেচারা সমস্তদিন আদালতে মক্কেলের আশায় বসিয়া থাকিয়া হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, "তুমি কি বিদ্যালয়গুলির বিবরণ লিখিয়াছ ?"

আমাদের সব কার্য্য "লেফেফাদোরস্ত"-ভাবে হইত—কার্য্য-বিবরণ লিখিয়া রাখা হইত। আমি উত্তর দিলাম, "না"।

সে ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। নিশীথের ঘাড়ে কবিতা-ভূত চাপিয়াছে। ও এখন গাছের পাতা, লতার ফুল, নদীর ঢেউ, পাখীর গান লইয়া "কাব্যি" করিবে,—কাজের কথা পাড়িবে না। আমি উহার স্বভাব জানি। আজ রাত্রিতে আসল কথা শুনিতে পাইবার আশা একদম দুরাশা। সুতরাং আমি প্রস্তাব করিতেছি, আজ এবিষয়ে আলোচনা বন্ধ থাকুক—আমরা সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া যে যাহার বাড়ী যাই। নিশীথকে দুই দিনের সময় দেওয়া হউক—এই দুই দিনের মধ্যে তাহাকে তাহার দৃষ্ট বিষয়ের বিবরণ লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে।"

একজন বলিল, "তবে আমাদের আজিকার এ আলোচনা অনিয়মিত—informal"

আর একজন বলিল, "হ্যাঁ,—এটা অনিয়মিত হইলেও ইহাতে সম্মিলনের আসল নিয়মটা রক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ খাবারের সরবরাহ যথারীতি হইয়াছে।"

লোকেশ বলিল, "আমরা সঙ্ঘের সংস্থাপক সদস্য—এ খাবারে অর্থাৎ কুলদীপের আনা বাজারের খাবারে আমাদের মন উঠে না।"

"কেন, তোমার কি ইহার মধ্যেই অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে ?"

"হয় নাই বটে, কিন্তু ঘন ঘন এইরূপ বাজারের খাবার উড়াইলে হইতেও বিশেষ বিলম্ব হইবে না। আমরা সংস্থাপক সদস্যগণ প্রধানতঃ মা'র হাতে-গড়া খাবারের লোভেই সঙ্ঘ সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। তোমরা যাহারা সে খাবারের আস্বাদ পাও নাই তাহাদিগকে তাহার স্বরূপ বুঝাইতে পারিব না।"

"তাই তুলনায় তোমার কাছে এ খাবার আরও খারাপ লাগে।"

"সেটা সম্ভব; কারণ,

> 'সুখের কথা স্মরণ করা
> ধরায় চরম দুখ।'

কোন য়ুরোপীয় কবি এমনই কথা বলিয়াছেন, কে বলিয়াছেন মনে নাই।"

আমি বলিলাম, "অর্থাৎ তুমি স্বীকার করিতেছ, তুমি আইনের চর্চ্চায় এমনই তন্ময় হইয়াছ

যে, একদিন যে টেনিসনের কবিতা তোমার কণ্ঠস্থ ছিল সেই টেনিসনের কবিতাও ভুলিতে পারিয়াছ! কিন্তু 'ভুলিলে কেমনে?' তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

লোকেশ উত্তর দিল, "আইনের চর্চ্চায় নহে—অন্নচিন্তায়। অন্নচিন্তায় মানুষের প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তন হয়—স্মৃতি-বিভ্রম ত তুচ্ছ কথা।"

একজন হাসিয়া বলিলেন, "সে কি কথা, লোকেশ বাবু? আমিত জানি, উকীলরা যে দিন অধিক আয় করেন লোককে বলিবার সময় সেই দিনের আয় দৈনিক আয় ধরিয়া বলেন—যেমন একদিন যদি ঘটনাক্রমে ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করেন, তবে বলেন—হিসাবে মাসিক আয় দেড় হাজার!"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

লোকেশ বলিল, "কিন্তু যেদিন ট্রামের ভাড়াটাও উঠেনা সেই দিনের 'আয়' ধরিয়া হিসাব করিলেই ভাল হয় না?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তেমন হিসাব কি কেহ করে?"

"করেনা আমরা মিথ্যার ভক্ত বলিয়া।"

"মানুষ কি মিথ্যার ভক্ত?"

"কেন—দেখ, আমরা মিথ্যা নিন্দায় বড়ই রাগ করি, কিন্তু প্রশংসা মিথ্যা হইলেও তাহাতে আনন্দানুভব করি। সুতরাং আমরা সত্যই ভালবাসি আর মিথ্যা ঘৃণা করি এমন কথা বলা যায় না।"

"তুমি যে দুনিয়ার মন্দ দিকটাই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ—ভাল দিকটা আর দেখিতে চাইতেছ না!"

"আমার মত অবস্থায় পড়িলে এমনই হয়। হৃদয়গগনে কল্পনার ইন্দ্রধনু যখন বাস্তবের মেঘে বিলীন হইয়া যায়—পুঞ্জীভূত অন্ধকারে কেবল দামিনীদীপ্তি বজ্রপাতের আশঙ্কাই জানায়, তখন আর কবিতার সময় থাকে না।"

"তুমি যে বেজায় নিরাশ হইয়াছ!"

"হতাশায় যখন জীবন তিক্ত হয় তখন এমনই হয়।"

"কিন্তু সাফল্য ত সংগ্রামসাপেক্ষ।"

"নিশ্চয়। কিন্তু সাফল্যই ভাল—সংগ্রামে কেবল কষ্ট। সে কষ্ট সহ্য করা যায়—যদি সাফল্যলাভের আশা প্রবল থাকে। যুদ্ধে জয় আরম্ভ হইলে যেমন যোদ্ধার উৎসাহ বাড়ে, পরাজয়ের পালা পড়িলে তেমনই অবসাদ আইসে। কাজ করিতে করিতে উৎসাহ জন্মে সত্য, কিন্তু সে কেবল যখন সাফল্য-সম্ভাবনা থাকে।"

"তোমার কি সাফল্য-সম্ভাবনা নাই, স্থির করিয়াছ?"

"তাহা স্থির করিলে জীবন-সংগ্রামে ভঙ্গ দিতাম। আশা আছে মনে করিয়াই কর্ত্তব্যবোধে কাজ করিতেছি ; কিন্তু জগতে কয়জনের আশা পূর্ণ হয় ?"

"আর যদি সাফল্যলাভ হয় ?"

"তখন দুনিয়াটাকে আর এমন দেখিব না ; তখন দেখিব সব হাওয়াই মলয় বাতাস, সব ফুলই পদ্ম, সব পাখীই কোকিল, সব খাদ্যই মিস্ট আর সব বন্ধুই নিশীথের মত প্রকৃত বন্ধু—আমার সুখে সুখী,—আমার দুঃখে দুঃখী,—আমাকে নিরাশ দেখিলে সত্য সত্যই দুশ্চিন্তায় চঞ্চল।"

তাহার পর লোকেশ বলিল, "কিন্তু সে সব আজিকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নহে। দরকার হয় একদিন সে সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ সভা ভঙ্গ করা হউক।"

সভা ভঙ্গ হইল। আমি একা বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সঙ্ঘের বন্ধুদিগের মধ্যে লোকেশই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রিয়। বাল্যকালে যখনও সংসারের অভিজ্ঞতায় মানুষের মনে আবিলতার সঞ্চার হয় না—যখন হৃদয়ে আশাই থাকে, হতাশা নিরাশার পথ গঠিত করে না—যখন স্নেহের পাত্র অল্প থাকে, গভীরতা অধিক হয় তখনই লোকেশের সঙ্গে আমার সখ্য। লোকেশ আমার মা'র স্নেহও পাইয়াছিল। সময় সময় আমার মনে হইত আমার বন্ধুবাহুল্যে তাহার মনে ঈর্ষার আভাস পাইতাম। আমার মত কবিতায় তাহার আনন্দ ছিল ; কতদিন দুইজন একখানা কবিতাপুস্তক লইয়া আর সব ভুলিয়া সেই কবিতারই আলোচনা করিয়াছি। আজ সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহার কি সত্য সত্যই এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? এই ভাব কি তাহার হৃদয়ে স্থায়ী হইয়া তাহার জীবন অন্ধকার করিবে, না ইহা শরতের মেঘের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া যাইবে ? সংসারের অভিজ্ঞতা কি মানুষকে এমনই করে ?

বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় কুলদীপ আসিয়া বলিল, "ঠাকুরকে খাবার দিতে বলি ?"

আমি উত্তর দিলাম "হাঁ"।

খাইতে বসিয়া অপরাজিতার কথা আমার মনে পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে মেয়েটির খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিস ?"

কুলদীপ অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ"। কিন্তু সেই "হাঁ"টির ভাবটা এইরূপ,—তুমি ত সংসারের সব খবরই রাখ ; তাই আমি তোমার বলিবার অপেক্ষায় যেন বসিয়া আছি। সব কাজ যেমন আমিই করিয়া থাকি, একাজও তেমনই করিয়াছি— সে জন্য তোমার কথার অপেক্ষায় থাকিলেই হইয়াছিল আর কি !

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিছানা দিয়াছিস্ ?"

উত্তর হইল, "সে সব ঠিক হইয়াছে।"

আমার মনে হইল, আমি যে তাহার কোন খোঁজই লই নাই, সব ভার ভৃত্যের উপর দিয়াছি—সেটা আমার প্রকৃতিরই পরিচায়ক হইলেও অপরাজিতা—অপরিচিতা—অনাথা—

অপরাজিতা সেটা সে ভাবে নাও ভাবিতে পারে। সে হয় ত মনে করিতেছে, আমি তাহার অবস্থার কথা জানিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতেছি—আমার এ ব্যবহার তাহাকে বুঝাইবার জন্য যে, সে আমার গৃহে সাদরে গৃহীত অতিথি নহে। তাই আহার শেষ করিয়া আঁচাইতে আঁচাইতে আমি কুলদীপকে বলিলাম,—"চল, একবার তাহার খবর লইয়া আসি।"

কুলদীপ বলিল,—"এতক্ষণ তাহার অর্দ্ধেক রাত্রি। পথের কষ্টের পর একটু বিশ্রাম দরকার বলিয়া আমি সন্ধ্যার পরই খাবার দিয়াছি।" অর্থাৎ যে হুঁসটা তোমার নাই—সেটা আমার বিলক্ষণ আছে।

তবুও আমি যখন বলিলাম, "আচ্ছা চল।" তখন সে আমার সঙ্গে হারিকেন লণ্ঠনটী লইয়া চলিল; কিন্তু যাইবার সময় আমার দিকে যেমন করিয়া চাহিল তাহাতে আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, আমার এই অনুসন্ধিৎসা তাহার কাছে ভাল লাগিল না।

আমি যাইয়া দেখিলাম, অপরাজিতা একখানা পুরাতন মাসিক পত্র লইয়া পড়িতেছে; আমাদের পদশব্দে মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহিল। আমি দেখিলাম, কুলদীপ তাহার শয্যাদির সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তাহার কার্য্যে ক্রুটী বাহির করা আমার সাধ্যাতীতই ছিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কোন অসুবিধা হয় নাই ত?"

সে বলিল, "না। বরং কুলদীপ আমার সুবিধার জন্য যাহা করিয়াছে তাহাতে আমি লজ্জিতা হইয়া উঠিতেছি।"

কুলদীপ সগর্ব্বে আমার দিকে চাহিল—দেখিলে; আমি যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক কি না?

আমি বিদায় লইয়া আপনার ঘরে আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদের একজন

শ্রান্তিবোধ যে হইতেছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না—অস্বীকার করিবার কারণও নাই। কিন্তু আমার স্বভাব এই যে, কোন কাজ ঘাড়ে পড়িলে বা হাতে লইয়া সেটা শেষ করিতে না পারিলে কিছুতেই স্বস্তি লাভ করিতে পারি না। তাই রাত্রিতে আহারাদির পর আসিয়া আমার কয়দিনের কাজের বিবরণ বিবৃত করিতে বসিলাম; যেন আমার সেই বিবরণ-রচনার উপরই একটা সাম্রাজ্যের না হউক একটা বিরাট অনুষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমার

এ ধারণাটা যে আমার কার্য্যের গুরুত্বে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল, এমন নহে; কারণ, অনেক সময় কাজটা শেষ করিয়া তাহা দেখিয়া আমি আপনিই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। স্বভাবের উত্তেজনায় ও তাড়নায় আমি বিবরণ লিখিতে লাগিলাম। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিলাম—লিখাটা ভাল হইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—রাত্রি প্রায় একটা। আমার শয়নের পক্ষে রাত্রি একটায় বড় বিলম্ব হয় নাই; মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত লিখা পড়া করাই আমার অভ্যাস। কিন্তু আজ মস্তকের এক প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল; অর্থাৎ শরীর অত্যাচারে কাতরতা প্রকাশ করিতেছিল। কাগজগুলি গুছাইয়া রাখিয়া—আলো নিবাইয়া যাইয়া শয়ন করিলাম।

কিন্তু শুইয়াই ঘুমাইতে পারিলাম না, অপরাজিতার সম্বন্ধে কি করা যায় ভাবিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রভাতে জাগিয়া যখন আবার সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম, তখনও কোনরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। শেষে--দেখা যাউক, কি হয়—মনে করিয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিলাম। গত রাত্রিতে অপরাজিতাকে একখানা মাসিক পত্র পড়িতে দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম—তাহার সময় কাটাইবার একটা পথ দেখিতে পাইয়াছি। চা পান করিয়া কতকগুলি মাসিক পত্র—খানকতক বাঙ্গালা পুস্তক বাছিয়া আলমারী হইতে বাহির করিয়া সেগুলা অপরাজিতাকে দিয়া আসিবার জন্য কুলদীপকে ডাকিলাম।

কুলদীপকে সে কথা বলিলে সে উত্তর দিল, "এখন এসব থাক। ততক্ষণ আমি একবার সংসার—ঘরগৃহস্থালী সাব্যস্ত করাইয়া লই। মেয়েরা নহিলে কি সে কায ভাল হয়!"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। গতকল্য অপরাজিতার প্রতি তাহার যে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিয়াছি, আজ কুলদীপের ব্যবহারে তাহার চিহ্নমাত্র নাই! কোন্ মন্ত্রে অপরাজিতা এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে? কুলদীপ যে মিষ্ট কথার দাস—তাহা জানিলেও তাহার এই পরিবর্ত্তনে আমি বিস্মিত হইলাম।

ততক্ষণে পাচক "ঠাকুর" কুলদীপের সন্ধানে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কেন না, ভাণ্ডারের চাবিতে কুলদীপ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার ছিল না। কুলদীপ ঠাকুরের সঙ্গে বকিতে বকিতে গেল—"কি যে চিনিয়াছেন, লিখা আর পড়া! ঘর সংসার নাই—দুনিয়া হাজুক মজুক সেদিকে দৃষ্টি নাই; খান কতক কেতাব আর কাগজ কালি কলম হইলেই আর কিছু চাই না। স্নান আহার কিছুই দরকার নাই—সে সকলের হুঁসও থাকে না! এই ত আর সব বাবুরা আসে, আমি ত সকলকেই জানি, আর কেহ ত এমন অজ্ঞান নহে। সকলেরই চাকরী আছে—কাজ আছে। এমন আর কেহই নহে। আমার যেমন—কর্ত্তাবাবুর নুন খাইয়াছি, মাঠাকরুণ শেষ সময়ও বলিয়া গিয়াছেন—'কুলদীপ, নিশীথকে দেখিস্'—সেই নিমকের খাতিরে আর মা'র সেই কথায় বদ্ধ হইয়া আছি। নহিলে—এ যেন পাগলাগারদে পাগল রাখা।"

কুলদীপের এমন বকুনিতে আমি অভ্যস্ত। তাহাতে সময় সময় একটু বিরক্ত হইতাম—কখন রাগ হইত না। বরং সময় সময় তাহার বকুনিতে দর্পণে প্রতিবিম্বের মত আপনার স্বভাবটীকে দেখিয়া আপনি হাসিতাম। যেদিন তাহার সমক্ষেই হাসিতাম সেদিন সে তাহাতে আরও চটিয়া যাইত আর চটিয়া বকুনির মাত্রা বাড়াইত। তবে তাহাতে তাহার কাযের ক্ষতি হইত না—কাজ করিতে করিতে বকার অভ্যাসটা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সুদীর্ঘ সকালটা আমি সখাসঙ্ঘের জন্য আমার পরিদর্শন ফল ও বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মত লিপিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত রহিলাম। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকে, তিনিও কখন এমন গবেষণা গৌরবময় ডেসপ্যাচ লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। লিখিয়া—কাটিয়া—নকল করিয়া আমি কাজটা শেষ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সুতরাং সকালে আর অপরাজিতার সংবাদ লইতে পারিলাম না। সংসারে আর কাহারও খোঁজ লইবার অভ্যাস আমার হয় নাই—আমার খোঁজই অন্য লোককে লইতে হইত। যতদিন মা বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন সেটা তাঁহার কায ছিল—তাহার পরে যেমন ভাবেই হউক কুলদীপ সে খোঁজ লইত। কাযেই আর কাহারও খোঁজ লইবার অভ্যাসটা আমার মনের মাটীতে অঙ্কুরিত হইতেই পায় নাই। বেলা দশটার সময় উঠিয়া দেখিলাম, কুলদীপ অপরাজিতাকে লইয়া যেরূপ সোৎসাহে "সংসার সাব্যস্ত" করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সংসারটাকে চিনিয়া উঠাই দায় হইবে। বাড়ীর সব ঘরের মধ্যে দুইটিতেই আমার দরকার ছিল—বসিবার ঘর আর শুইবার ঘর। পাশাপাশি সেই দুইটি ঘর কুলদীপ ও আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতাম—কিন্তু অন্য ঘরগুলি ব্যবহৃত হইত না; কুলদীপের চেষ্টায় সেগুলি আবর্জ্জনাস্তূপে পরিণত হইতে পায় নাই বটে, কিন্তু অন্য ব্যবহৃত ঘরের তুলনায় অনাদৃত—সুতরাং অপরিচ্ছন্নই ছিল। আজ সে সব ঘর ঝাড়িয়া, ধৌত করিয়া, মুছিয়া কুলদীপ বাড়ীখানাকে "ক্রিয়াবাড়ীর" রূপ দিতেছে। সে গোটা কয়েক কুলি আনিয়াছে—তাহারা জল আনিতেছে, ঝাঁট দিতেছে। কুলদীপ আর অপরাজিতা সব ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইতেছে। কাযের জিনিষে কয় বৎসরের ধূলি আর্দ্র বাতাসের আর্দ্রতা সঞ্চয় করিয়া জমাট বাঁধিয়াছে—ধাতব জিনিষ বিবর্ণ হইয়াছে—সে সব উভয়ে সংস্কৃত করিতেছে। সে কাযে অপরাজিতার উৎসাহ দেখিয়াই বুঝা গেল, সে কেবল কুলদীপের কথাতেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। বাস্তবিক এই "সংসার সাব্যস্ত" করিবার প্রস্তাবটা তাহার কি কুলদীপের সে বিষয়েই আমার সন্দেহ হইল।

অপরাজিতাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি কিছুই নাই। আমি সে সব আনিতে বাহির হইয়া যাইলাম; যখন ফিরিলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। তখনও "সংসার সাব্যস্ত" করা চলিতেছে। আমিই বলিলাম, আজিকার মত কাজ বন্ধ করা হউক। কুলদীপ অবশ্যই শ্রান্ত হইয়াছিল—তাই আমার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিল না। বিশেষ একদিনের কায যে যথেষ্ট হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কুলী কয়জনকে পয়সা দিবার জন্য

নিম্নতলে লইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, "মেয়েরাই হইল বাড়ীর লক্ষ্মী ; তাই ত যে বাড়ীতে মেয়েরা নাই তাহাকে লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী বলে। এই দুই দণ্ডে বাড়ীর যে চেহারা খুলিল—মা মরিবার পর হইতে এমন চেয়ারা খুলে নাই।" কথাটা আমার কাছে অন্ধকারে সহসা আলোক পাতের মত প্রতিভাত হইল। আমি ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম—সব যেন তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে—যেন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে সহসা—অতর্কিতভাবে আমার অন্ধকার গৃহে আলোকের ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার হইয়াছে। সত্য সত্যই কি যে গৃহে রমণীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টিনিপুণ করের স্পর্শ অনুভূত হয় না, সে গৃহ অন্ধের সহিত উপমিত হইতে পারে ?

হাত পা ধুইয়া আসিয়া কুলদীপ বলিল, "দিদিমণির জন্য খানকতক কাপড়, গামছা, জামা এসব ত আনিতে হয়।"

আমি বলিলাম, "তুই আজ যে ব্যস্ত ছিলি তো'কে আর বলি নাই ; আমি এই সে সব লইয়া আসিয়াছি।"

কুলদীপ পুলিন্দাটি খুলিয়া জিনিষগুলি দেখিয়া যে ভাবে আমার দিকে চাহিল, তাহাতে আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, আমার বুদ্ধির অভাবে আমার ভবিষ্যৎ দুর্গতির দুশ্চিন্তায় সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। সে বলিল, "তৈল, গামছা—কিছুই ত আনা হয় নাই।" বলিয়া সে সেই সব আনিতে বাহির হইয়া গেল ; যাইবার সময় অপরাজিতাকে বলিয়া গেল, "দিদিমণি, আমি তোমার স্নানের জিনিষ আনিতে যাই ; তুমি একবার রান্নাঘরে খোঁজ লও—রান্না কতদূর।"

মধ্যাহ্নে ঘরে বসিয়াছিলাম। হাতের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে ; শ্রমের পর একটু অবসাদ অনুভব যে না করিতেছিলাম, তাহা নহে। পরিদর্শনে বাহির হইবার পূর্ব্বে নানাদেশের শিশুপাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; জাতীয় শিক্ষার পত্তন পাকা করিতে হইলে পাঠ্য পুস্তকগুলি সর্ব্বতোভাবে জাতীয় অর্থাৎ জাতির সংস্কারের উপযোগী করিতে হইবে। তাই আমরা স্থির করিয়াছিলাম, আবশ্যক পুস্তক রচনা করিব। সে ভারও অবশ্য আমার উপর পড়িয়াছিল। যাহাতে ছেলেদের ঈগল পাখীর গল্প ও রবার্ট ব্রুসের কথা পাঠ করিয়া বিস্তার সহিত পরিচিত হইতে না হয়, পরন্তু তাহারা দেশের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারে, দেশের অনুকরণযোগ্য আদর্শের অনুসরণ করিতে শিখে তাহাই করিতে হইবে। আজ সে সব পুস্তক বাহির করিয়া বসিয়াছিলাম—কিন্তু কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেছিলাম না—মনের আগ্রহ দেহের অবসাদকে পরাভূত করিতে পারিতেছিল না।

বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আমার বসিবার ঘর হইতে সম্মুখে যে আলিসা দেখা যায় তাহার উপর বসিয়া শালিকা-দম্পতি মুখর দাম্পত্যকলহে ব্যাপৃত ছিল। আমি তাহাদের কলহ-প্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলাম। এমন সময় অপরাজিতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রথমেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কাজে বাধা পড়িল না ত ?"

আমি আলিসার উপর কলহরত শালিকাপাখী দেখাইয়া বলিলাম, "বর্ত্তমানে আমার কাজ, উহাদের কলহ লক্ষ্য করা—তোমার আগমনে তাহাতে বাধা পড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

"পাখীর কলহের কোন দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন ?"

"দার্শনিক তত্ত্বনির্ণয় আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

"কিন্তু আপনাকে দার্শনিক বলিয়াই বোধ হয়।"

"আকৃতিতে আর প্রকৃতিতে বিরোধ অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়; সুতরাং আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি বিচার করিলে ভ্রম করিবার সম্ভাবনা।"

"তবে কি আপনি পাখীর ঐ কলহের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবেন ?"

"সেটা বরং সম্ভব; কেন না মানুষের জীবন অনেক সময় পাখীর গতায়াতের সহিত তুলিত হইয়াছে। আর ধোপার 'বাস্‌নায় আগুন দিতে হইবে' শুনিয়া যেমন লালাবাবুর মনে বাসনায় অগ্নিযোগের সঙ্কল্প জাগিয়াছিল তেমনই পাখীর কলহ দেখিয়া আমার মনেও কলহ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প উদ্ভূত হইতে পারে।"

আমরা দুইজন যতক্ষণ কথার বিদ্রূপের তরবারীর খেলা খেলিতেছিলাম ততক্ষণে কিন্তু পাখী দুইটি কলহের পর শান্তি স্থাপিত করিয়া আহারের সন্ধানে গিয়াছিল।

অপরাজিতা বলিল,—"কুলদীপ আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে—আপনার লিখাপড়ার সময় বিরক্ত করিলে আপনি তপঃভঙ্গে বড় রাগ করেন।"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম,—"কুলদীপের পরম সৌভাগ্য আমার ললাটে অগ্নি নাই, নহিলে সে এতদিন শত শত বার ভস্মাবশেষ হইত; কারণ, ঐ সময়টি নহিলে তাহার বাজে কথা বলিবার অবসর হয় না।"

"সংসারের কথাটাই বুঝি বাজে কথা ?"

"আমার পক্ষে।"

"কিন্তু সংসারকে আপনি বরাবরই বাজে ভাবিলেন কেন ? কুলদীপ সেজন্য কত দুঃখ করিতেছিল।"

"উহার সব কথা শুনিতে হইলে জীবন ধারণ করাই দুষ্কর হয়।"

হাসিয়া অপরাজিতা বলিল, "তাই কি আপনি উহার কথা প্রায়ই কাণে তুলিতে চাহেন না ?"

"সে নালিশও বুঝি ইহার মধ্যে করিয়াছে ?"

অপরাজিতা হাসিল। আমি বুঝিলাম, কুলদীপ তাহাকে খুব "পাইয়া বসিয়াছে"; তাহাতে আমি মনে মনে খুব খুসী হইলাম; কারণ, আমার বিশেষ আশঙ্কা ছিল, অপারজিতার আবির্ভাবে কুলদীপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসন্তুষ্ট হইবে; কেননা তাহার বিশ্বাস—সে-ই অসহায় আমার

অভিভাবক, আমার স্বার্থ—সম্মান—সুনাম সকলের রক্ষক, আমার শুভাশুভের জন্য দায়ী। আর তাহাকে সন্তুষ্ট না করিয়া আমার সংসারে বাস—কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করারই মত অসম্ভব।

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সত্য সত্যই আপনি সংসার-বিরাগী কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি সংসার-বিরাগী হইলে কুলদীপ এ কাহার সংসার আগলাইয়া আছে?"

"তাহার কিন্তু বিশ্বাস—এ সংসার আগলান নহে, শ্মশান জাগান।"

"সে তাহাই বলে বটে। আসল কথাটা এই যে, আমি কখন সংসার পাতাইয়া—সংসারে জড়াইবার আগ্রহ অনুভব করি নাই। আর আমার বিশ্বাস, যাহার জন্য মানুষের আগ্রহ থাকে না, তাহা লইয়া সে মসগুল হইতে পারে না।"

"সকলে কি সব কাযে মসগুলই হয়?"

"নহিলে কর্ত্তব্য যখন ভার বোধ হয়—তখন সে ভার না বহিয়া ফেলিয়া পলায়নই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। এমন অনেক কাজ আমি ফেলিয়া পলাইয়াছি। সংসার লইয়া ত সে খেলা খেলিতে পারিব না; তাই দূর হইতেই নমস্কার করিয়া সরিয়াছি।"

"সেজন্য কখন কোন অভাবও অনুভব করেন না?"

"যে অভাব সময় সময় অনুভব করি, তাহা বাহিরের— অন্তরের অভাব নহে।"

"কিন্তু যদি কখন অন্তরের অভাব অনুভব করেন?"

"তখন সেই অভাবের উত্তেজনাই ত আমাকে সংসার পাতাইবে—সেজন্য কুলদীপের বিলাপের বা বন্ধুজনের বিদ্রূপের অপেক্ষা রাখিতে হইবে না।"

"কাল যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনার বন্ধু?"

"বন্ধু—কিন্তু যে অর্থে আজকাল বন্ধু ব্যবহৃত হয় তাহাই, অর্থাৎ পরিচিত—ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ।"

"কিন্তু সমপ্রাণ কি না সন্দেহ।"

"সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ।"

"তবে কোন্ বন্ধন আপনাদিগকে বদ্ধ রাখে—স্বার্থের সমতা ত নাই; তবে কি স্নেহের আতিশয্য আছে?"

"না।"—বলিয়া আমি সখাসঙ্ঘের উৎপত্তির ও স্থিতির কথা অপরাজিতাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে বিবরণ তাহার নিকট কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইতেছে মনে হইল।

আমার কথা শেষ হইলে সে বলিল, "দেখিতেছি, আপনিই একটা না একটা কায খুঁজিয়া লইয়া, সেই কাযে আপনার উৎসাহ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া সঙ্ঘের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। অপরের উৎসাহ কৃত্রিম। ইহাতে কি সঙ্ঘ স্থায়ী হইবে?"

"সে বিষয়ে আমারও যে সন্দেহ হয় না, এমন নহে। তবে সময় সময় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রক্রিয়ার ফলে মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার হয়।"

"আপাততঃ জাতীয় শিক্ষা লইয়াই আপনারা মাতিয়া উঠিয়াছেন; অর্থাৎ আপনি মাতিয়া আর সকলকে মাতাইবার চেষ্টা করিতেছেন।"

তাহার পর অপরাজিতা বলিল, "সখাসজ্বের সভ্য গ্রহণের কোন নিয়ম আছে কি?"

আমি বলিলাম, "নিয়মই অনিয়ম।"

"তবে আমাকে আপনাদের এক জন করিয়া লইবেন?"

"অনায়াসে।"

তাহার পর আমি বলিলাম, "কেবল একটা নিয়ম করিব।"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"সখাসজ্বের কোন সভ্য অপর কোন সভ্যকে 'আপনি' বলিতে পারিবে না—বন্ধুত্ব-জ্ঞাপক 'তুমি'ই বলিতে হইবে।"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, "বেশ নিয়ম।"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নব-বর্ষ

মরি বুড়ার রঙ্গ দেখে! নাই কি লজ্জা আদপে?
এলে তুমি ছেলে সেজে সঙ্গে নিয়ে মাধবে!
ভোল্ ফিরিয়ে সৃষ্টি কর,—নিত্য নূতন রহস্য!
কুঞ্জতলে যত কচি খোকা তোমার বয়স্য।
যতই ভুলাও, যতই খেলাও, মিলে দুটি সখাতে,
চিনি তোমায় হে বুড়া শিব, পার্‌বেনাক ঠকাতে।
মঞ্জু বনে সেই পুরাতন সঞ্জীবনী স্পর্শ রে।
গড় করিগো বুড়া ঠাকুর, তোমায় নব বৎসরে।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি *

'Those organs which guide an animal are under man's guidance and control.

—(*Gœthe*)

লক্ষ্য করবার জন্যেই হল চোখ, শব্দ ধরবার জন্যেই হল কান, হাত পা রসনা সবকটাই হল রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ ধরে বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্য। সজীব সব মানুষেরই বুদ্ধির চারিদিকে ইন্দ্রিয় সকলে নানা শক্তিশেল নিয়ে খবরদারি কাযে দিনরাত ব্যস্ত রইলো, এই হল স্বাভাবিক ব্যাপার; অথচ অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ, কিম্বা দশরথের শব্দভেদ এমনি নানা রকম ভেদবিদ্যার কৌশল শিক্‌রে পাখীথেকে আরম্ভ করে শিকারী মানুষে যখন লাভ করলো দেখলাম তখন সেই জীব অথবা মানুষ নিজের চোখ কান হাত পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে তুল্লে এই কথাই বলতে হয় আমাদের। ছেলেকে অক্ষর চেনাতে শেখালে, বই পড়তে শেখালে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায়—কি লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুষ কেবল অক্ষর পরিচয় করে চল্লো, আর যে অক্ষর গুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে রচনার নির্ম্মাণ কৌশল ও রস পর্য্যন্ত ধরতে লাগলো এদের তিন জনের দেখা শোনার মধ্যে অনেকখানি করে পার্থক্য যে আছে তা কে না বলবে। কাযেই দেখি—শিল্পই বল আর যাই বল কোন কিছুতে কুশল হয় না চোক হাত কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্য্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে—বিশেষ বিশেষ উপায় আর শিক্ষার রাস্তা ধরে। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে। ছবি কবিতা সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয়। কথাই আছে—'কবিতারসমাধুর্য্যম্ কবির্বেত্তি' ঠিক সুরে সুর মেলা চাই না হলে যন্ত্র বল্লে 'গা', কণ্ঠ বলে উঠলো 'ধা'!

জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এই জন্যেই কবিতা সঙ্গীত ছবি এ সবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ কানের সাধারণ দেখাশোনার চাল চলনের বিপর্য্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। মানুষের সৃষ্টি বুঝতে যদি এই নিয়ম হল তবে সৃষ্টিকর্ত্তার রচনাকে পুরো রকম বুঝে সুঝে উপভোগ করার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার যে অপেক্ষা রাখে তা বলাই বাহুল্য।

* কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী প্রফেসাররূপে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতা

"The scene which the light brings before our eyes is inexpressively great, but our seeing has not been as great as the scene presented to us ; we have not fully seen ! We have seen meer happenings, but not the deeper truth which is measureless joy"—*Rabindranath*

মোটামুটি দৃষ্টি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্য্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে, তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখা শোনার মধ্যে অদল বদল কিছু না কিছু ঘটাতেই হয়। শিক্‌রে পাখি কতবার তার শিকার হারায় তবে তার চোখ এবং ঠোঁট আর আঙ্গুলের নখরগুলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে মেঘের উপর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে, একেই বলে ধরার কায়দা, দেখার কায়দা। এই কায়দা ইন্দ্রিয়সকল লাভ করে অনেক দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে। চা খাবার সময় রুটির টুক্‌রো যখন ফেলে দেওয়া যায়, তখন দেখি কাকগুলো সবাই একই কায়দায় সেগুলো এসে ধরে—মাটীতে রুটি পড়েছে যখন, তখন, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ঠোঁটে করে সেটা টপ্ করে তুলে নেওয়াই দেখি সব কাকেরই দস্তুর; কিন্তু চিলগুলো সাঁ করে উড়ে এসে মাটিতে রুটি পৌঁছতে না পৌঁছতে লুফে নিয়ে পালায়। এই নতুন কায়দা আমার সাম্‌নে একটা কাককে দিনে দিনে অভ্যাস করে নিতে এই সেদিন দেখলেম এবং লক্ষ্যভেদ বিদ্যার দখলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কাকের দেখাশোনা চালচলন সমস্তই উল্টে-পাল্টে গেল তাও দেখলেম! শুধু ঐ একটুখানি শিক্ষা আর অভ্যাসের দরুণ কাকের মোটা দৃষ্টি বা স্বাভাবিক দৃষ্টি ও চালচলনের ওলট পালট যদি কাকটা না ঘটাতো তবে সব কাকেদের মধ্যে সে অর্জ্জুন হয়ে উঠতে পারতো না কিম্বা সময়ে সময়ে চিলটিকেও সে হারিয়ে দিতে পারতো না রুটির লক্ষ্যভেদের সভায় আন্দাজের পরীক্ষায়! কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য্য যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশো চার ভায়ের শুধু চোখই আছে,—দৃষ্টি আছে কেবল একমাত্র অর্জ্জুনের! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের দিন লক্ষ্যভেদের সময় অর্জ্জুনের এই দৃষ্টিরহস্যের হিসেব আরো পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা হয়েছিল। পৃথিবীর ধনুর্দ্ধর একত্র হল স্বয়ম্বরে—কৃপ কর্ণ নানা বীর কিন্তু লক্ষ্যভেদের বেলায় কারো চোখ দ্রৌপদীর রূপের প্রভা দেখলে, কারো দৃষ্টি নিজের গলার মণিহারের চমক্ লক্ষ্য করলে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের আসল সামগ্রী সেটা জলের তলায় ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন চক্রের প্রতিবিম্বের আড়ালে একটি বিন্দুর আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটার বিষয়ে একেবারেই রাজারা অন্ধ রইলেন, একা অর্জ্জুনের দৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করলে ও বিঁধলে, অস্থির হয়ে ভ্রমণ করছে এই দুটি মাত্র আমাদের চোখের দৃষ্টি একটু অন্ধকারে ঝাপসা দেখে, বেশী আলো পেলেও ঝলসে যাবার মতো হয়, দূরবীণ না হলে খুব দূরের জিনিষ দেখাই হয় না আমাদের! আবার যখন তিলকে দেখি তখন তালকে দেখিনা, তাল দেখতে গেলে তিল বাদ পড়ে যায়! তাছাড়া দৃষ্টি আমাদের

সামনেই চলে, পিটের দিকে যা ঘটেছে একেবারেই দেখা সম্ভব হয় না, যে চোখ এখন আছে তার দ্বারা। ঘড়ি যেমন শুধু ঘণ্টা প্রহর গুণে গুণে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেনা, গ্রীষ্মের দিন কি শীতের, অথবা দিন দুইপ্রহর কি রাত দুই প্রহর, এটা জানাবার সাধ্যই হয়না যেমন ঘড়ির—যতক্ষণ না ঘড়ির মধ্যে কোন একটা বিপর্য্যয় শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অদল-বদল না ঘটাতে পারলে চোখ আমাদের ওঠা-বসা চলা-ফেরা এমনি কতকগুলো নির্দ্দিস্ট কাযের সহায় হয়ে যান্ত্রিকভাবে খবরদারী করতেই নিযুক্ত থাকে! নিত্য চলাচলের পক্ষে যতখানি দরকার শুধু ততটুকু দেখাই, দিনরাতের মধ্যে বস্তু ও ঘটনা গুলোর মোটামুটি খবর পৌঁছে দেওয়াই হয় এদের কায—এই লোক অমুক, ও অমুক, নকিবের মতো এইটুকু ফুকরে যায় চোখ—অমুকের সম্বন্ধে তন্ন তন্ন খবর নেবার অথবা দেবার সময় নেই! একটা গাড়ি এল, চোখ কান চট্‌করে সেটা ধরলে—মোটামুটি গাড়ির শব্দ আর একটা আবছায়া, খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই! গলির মোড়ে একটা ভিড় জমেছে—তার মাঝে পাহারালার লাল পাগড়ীর লাল রংএর ঝাঁজটা মাত্র লক্ষ্য করেই চোখ—মায় যার চোখ তাকে নিয়ে—কোন গলি ঘুঁজি দিয়ে কেমন করে সে একেবারে গড়েরমাঠে হাজির হয় তার কোন হিসেব দিতে পারে না! খুব বাঁধা ও খুব প্রয়োজনীয় কাযের ভার নিয়ে দরওয়ান ব্যস্ত থাকে; অভ্যাগত লোককে দেউড়ি ছেড়ে দেবার সময় শুধু মানুষটা চেনা কি অচেনা, ছোকরা কি বুড়ো এমনি মোটামুটিভাবেই দেখে নিয়েই তার কায শেষ। ঘুমোচ্ছি এমন সময় ঘরে খট্ করে শব্দ হল, কি গায়ে কিছু স্পর্শ করলে, অমনি কান হাত পা ইত্যাদি চট্‌করে বুদ্ধিকে গিয়ে খবর দিলে—যন্ত্রের মতো সময় সময় জ্ঞান নেই! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিমেষে নিমেষে চোখ দেউড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর নোট্ দিচ্ছে মানুষকে—এ হল তা হল, এ গেল সে গেল, এটা দেখা যাচ্ছে, ওটার খবর এখনো আসেনি! নিত্য নৈমিত্তিক কাযের অনেকখানি এই রকম মোটামুটি যান্ত্রিক রকমের দৃষ্টি দিয়েই চোখ আমাদের সম্পন্ন করে যাচ্ছে, এছাড়া অনেকখানি কায একেবারে চোখে না দেখে হাত পা ও গায়ের পরশ এবং পরখ দিয়ে এবং চোখের একটু আর সব ইন্দ্রিয়র পরখের অনেকখানি মিলিয়ে করে চলেছি আমরা। জুতো পরায় জামা পরায়, চোখের পরখের চেয়ে গায়ের পরশ বেশি সাহায্য করে কোনটা আমার জুতো বা জামা চিনিয়ে দিতে। মানুষের নিত্য জীবন যাত্রার মধ্যে নিবিষ্টভাবে রয়ে-বসে দেখা এত অস্বাভাবিক আর বিরল যে কাযের মধ্যে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ানো, নয়নভরে কিছু দেখে নেওয়া, স্থির হয়ে কিছু উপভোগ করার সময় পায় না বল্লেই হয় সাড়ে পনেরো আনা লোকের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, এটা অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু অত্যন্ত সত্য ঘটনা। এমন ছাত্র নেই যে প্রতি সন্ধ্যায় গোলদিঘীর ধারে জমায়েৎ হয়ে দুচার ঘণ্টা না কাটায়, কিন্তু তাদের প্রশ্ন কর—গোলদিঘীটা গোল না চৌকো? হঠাৎ কেউ উত্তর দিতে পারবে না, গোলদিঘীর লোহার রেলিং ত্রিশূলের আকার না বর্শার ধরণ? একশর মধ্যে একজন

ছাত্র চট্‌করে বলতে পারে কি না সন্দেহ! একটা রেলিং আছে এইটুকুই টুকে আসছে চোখ মনের নোট্‌ বইখানায় যন্ত্রের মতন, রেলিংএর কারুকার্য্য গড়ন পেটন নিবিষ্ট হয়ে দেখার প্রয়োজন এবং অবসরের দরকারই বোধ করেনি চোখ! খুব ছোট থেকে খুব বড় বয়সেও আমাদের বুদ্ধির কোঠায় দর্শন স্পর্শন শ্রবণ এরা অহোরাত্র খবর পাঠাচ্ছে; বাইরের ঘটনা বাইরের বস্তুর পরিষ্কার একটি একটি চুম্বুক রিপোর্ট চট্‌পট্‌ বুদ্ধির ঘরে টেলিগ্রাম করাই এদের সাধারণ কায। রাত পোহালো চোখ ঝাঁপ খুলেই দেখলে আলো হয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার গেল বুদ্ধির কাছে—"রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ"। সকাল, এই বুদ্ধি অমনি জাগল মানুষের, দ্বিপ্রহরের রোদ চন্‌চনে হয়ে উঠলো অমনি স্পর্শন বুদ্ধির কাছে তার পাঠালে "ভানুতাপে তাপিত ধরণী"। মধ্যাহ্ন, বুদ্ধি উদয় হল মানুষের! এমনি অষ্টপ্রহর বুদ্ধির তাঁবেদারি করতেই কাট্‌ছে দিন দর্শনের স্পর্শনের শ্রবণের! একেবারে ঘড়িধরা এদের কায একটু এদিক ওদিক হলেই মুস্কিল—কুয়াশা বেশি হলে বাদলা ঘন হলে এই প্রহরীরা অনেক সময়ে ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে না সকাল কি সন্ধ্যে, টেলিগ্রাফে ভুল থেকে যায়, বিছানা ছাড়তে বেলা হয়, ভাত চড়তে তিনটে বাজে, এমনি নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নিত্য কাযে। তখন বার বার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতে হয় নয় তো জালনা খুলে বাইরে উঁকি দিতে হয় ক্রমান্বয়ে। শুনে দেখি চেয়ে দেখি অথবা পরশ করেই দেখি সাধারণ মানুষের জীবনে এই তিন দেখার সম্পর্ক হচ্ছে বস্তু জগতের যেগুলো সচরাচর ঘটনা এবং বাইরের যে মোটামুটি খবর তারি সঙ্গে। প্রহরীর কায খবরদারীর কায এর বেশি কায এদের দেওয়ার দরকারই হয় না জীবনে ইতর জীব থেকে মানুষ পর্য্যন্ত কারু, অতএব বলতেই হ'ল চোখ কান হাত এমনি সবার স্বাভাবিক কায ও অবস্থা হয় চট্‌পট্‌ দেখা শোনা ছোঁয়া ও জানা যান্ত্রিকভাবে। চোখে দেখলেম বাইরের পদার্থ তার রূপ রং ইত্যাদি, পাঁচ আঙ্গুলে পরশ করে দেখলেম সেগুলো; শুনে দেখলেম বাইরের খবরাখবর, এই ভাবে জগতের বস্তু ও ঘটনার বুদ্ধিটা বেড়ে চল্লো মানুষ থেকে ইতর জীব তাবতেরই। মুখ চোখ কান হাত পা সব দিয়ে জীব যেন পড়ে চল্লো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিম্বা জল পড়ে, হাত নাড়ে, খেলা করে, অথবা নূতন ঘটী, পুরাণ বাটী, কাল পাথর, সাদা কাপড়—শুধু চোখের পড়া। কিম্বা যেমন মেঘ ডাকে, অথবা কাক ডাকিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে, বেড়াল কাঁদিতেছে, মা বকিতেছে—শুধু শোনার পড়া অথবা যেমন—শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি, শক্ত লোহা—শুধু পরশ করার পাঠ। ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে এই উপায়ে সবাই পড়ে চলেছে শিশুশিক্ষা থেকে বোধোদয় পর্য্যন্ত, এর বেশি পড়া সাড়ে পনেরো আনা মানুষ দরকারই বোধ করে না সারা জীবনে। বস্তু ও ঘটনার মোটামুটি বুদ্ধি হলেই চলে যায় সুখে সচ্ছন্দে প্রায় সকলেরই সাধারণ জীবনযাত্রা এবং এই মোটামুটি বুদ্ধির উদ্রেক করে দেওয়ার কাযে লেগে থাকতে থাকতে দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের

শক্তিও এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোন কিছুর সূক্ষ্ম দিক বা গভীর দিকে যেতেই চায় না তারা শিল্প কার্য্য সঙ্গীত, এবং কোন বিষয়ে পটুতা হয় না হ'তে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ নানা ইন্দ্রিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার কতকটা অদল-বদল ঘটিয়ে না তোলা যায়। এমন কল সব আজ কাল তৈরী হয়েছে যা চোখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই দেখে ও ধরে নেয় সৃষ্টির সামগ্রী চট্ করে নিমেষ ফেলতে! স্পর্শ করে কল, স্পর্শ ক'রে শিউরে ওঠে দুলে ওঠে গরম ঠাণ্ডার ওজন-মাপে এবং পরশের তন্ন তন্ন হিসাব লিখে চলে, বাদলা হবে কি ঝড় উঠবে তা বাতাসের পরশ পেয়েই বলে দেয় কল, উত্তর মেরুতে ভূমিকম্প হলে তার হিসেব রাখে দক্ষিণ সাগরের পরপারে বসে কল, আবার কল সে শুনছে, যা শুনছে তা লিখছে, যা লিখছে তা শুনিয়ে দিচ্ছে সুর করে বক্তৃতা দিয়ে আবৃত্তি অভিনয় করে পর্য্যন্ত। কাপড় কাচ্ছে কল, কাপড় ভাঁজ করে কাঁথা সেলাই করছে, দ্রুত দৌড়চ্ছে কল, আকাশে উড়ছে কল! এতে করে মনে হয় এই সমস্ত কল মিলিয়ে একটা কলের পুতুল যদি কোন দিন ছবি মূর্ত্তি গান ইত্যাদি নানা জিনিষের সমালোচনা করতে এসে উপস্থিত হয় আমাদের মধ্যে তবে খুবই অদ্ভূত হবে সে ঘটনা কিন্তু আরো অদ্ভূত হবে কলের পুতুলের ছবি মূর্ত্তি গান কবিতা ইত্যাদির সমালোচনা। বস্তুতন্ত্রতা সেই কলের পুতুলে এত অভ্রান্ত রকমে থাকবে যে ছবি যদি প্রতিচ্ছবি, মূর্ত্তি যদি প্রতিমূর্ত্তি, গান যদি হরবোলার বুলি না হয় তো সে তখনি তার নিন্দা ও কঠিন সমালোচনা করে বসবে, কবিতা কল্পনা এসবকে সে বলবে পাগলামি এবং ঠিক এখন সাধারণ মানুষ আমরা যেমন শিল্পশালায় সঙ্গীতশালায় বা অভিনয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পকার্য্য যতটা মেলে ততটা তার বাহবা দিই, একটু বাস্তবিকতার ভ্রান্তি উৎপাদনের ব্যাঘাৎ হলে বলে বসি দূর ছাই, কলের পুতুলটিও ঠিক সেই ব্যবহারই করবে! সাধারণতঃ শরীর যন্ত্রগুলো আমাদের প্রবল বস্তুপরায়ণতা নিয়ে দেখতে শুনতে পরশ এবং পরখ করতেই পাকা হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারাজীবন বারে বারে একই জিনিষ দেখে শুনে পরশ করে পরখ করতে করতে কাজের দক্ষতা এমন বেড়ে যায় হাত পা চোখ কানের, যে মেকি টাকা ভেজাল ঘী পাকা ও কাঁচা সরেস ও নিরেস ছোঁয়া মাত্র দেখা মাত্র শোনা মাত্রই তারা ধরে দিতে পারে, কিন্তু এটুকু হয় শুধু আশপাশের বস্তুগুলোর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় বশতঃ। শরীর-যন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাযের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত বস্তু পরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করেই থেমে রইলো এই হলো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এগোতে পারি তার চরম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কায ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইলো, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধরতে পারলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তু-বুদ্ধি বা বাস্তব-বুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্য্যবোধ অথবা অর্থবোধ! মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থ-বুদ্ধির

সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিলছে তাদেরই খবর আমরা দিন রাত অভ্রান্তভাবে নিয়ে চল্লেম এই বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে! ময়রা যেন চমৎকার মিঠাই গড়ে চল্লো মিঠায়ের রসবোধ করার কোন অপেক্ষা না রেখেও! কিম্বা জহুরী রত্ন পরীক্ষায় এমন পাকা হয়ে উঠলো যে হাতে নিয়েই বলতে পারলে সামগ্রীটা কাচ কি হীরে, সরেশ কি নিরেস, অথবা শব্দে কান এত পরিষ্কার হল যে কোথা কোমল কোথা বা অতি কোমল পর্দ্দায় ঘা পড়ছে তা শোনামাত্র ধরে দিলে মানুষ। কিন্তু এই হলেই ময়রার জহুরীর ও কালোয়াতের রসবোধ সৌন্দর্য্য ও সুষমাবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে তা জোর করে বলা চলে না। বস্তু-জগতের সঙ্গে পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা, চাতুর্য্য, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাযের মানুষ করে দেয় এটা যেমন সত্যি আবার শুধু এই গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। সুরে কান হলেই যে মানুষ গান রচনা করতে পারে তা নয়, জহরৎ চিনলেই যে সবাই চমৎকার অলঙ্কার রচনা করতে পারে অথবা ভাল রসকরা গড়ে চল্লেই সে যে সৃষ্টির রসের রসিক হয়ে ওঠে তাও নয়। বহির্বাটীর রাস্তা ঘাট নিয়ম কানুন সমস্তই যেমন অন্দর মহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সদর দুয়ার দিয়ে বুদ্ধির কাছে পৌঁছচ্চে সৃষ্টির খবরাখবর, চলাচল কোলাহল করে, অবিরাম অস্থিরগতিতে সমস্তই সেখানে যাচ্ছে আসছে—কারো সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করার সময় সেখানে অল্পই মেলে! নিত্য দেখা শোনা দ্বারায় ভাল করে মুখচেনা ঘটলেও কিছুর সঙ্গে অবসর মতো রয়ে বসে রসের সম্পর্ক পাতানো সদর রাস্তা এবং সদর বাড়ীতে ক্বচিৎ সম্ভব হয়, এই কারণেই মানুষের ঘর, কাছারি ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর বৈঠকখানা, আফিস ঘর এমনি নানা কুঠরীতে ভাগ করা থাকে। অন্দরে অথবা বৈঠকখানার গানের ও নাচের মজলিসে প্রবেশ করতে হলে আফিসের চোগা চাপকান ছেড়ে যেমন উপস্থিত হতে হয় কাযের দৃষ্টি কাযের কথা মায় কাযকে পর্য্যন্ত কড়া পাহারায় বাইরে আটকে, তেমনি রসবোধের রাজত্বে ঢোকবার কালে নিত্যকার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের অনেকখানি পরিবর্ত্তন করে চলে মানুষ—এটা কেবল মানুষেই পারে ইতর জীব পারে না। কাযের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চেয়ে দেখা, শুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখার অভ্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান রসবোধ জন্মায়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, স্তোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। মানুষের শরীর যন্ত্রটাকে জীবনযাত্রার পথে নানা বিঘ্নবিপত্তি থেকে রক্ষা করে সচ্ছন্দে চালিয়ে নেবার কাযেই দক্ষ হয়ে উঠলো মানুষের ইন্দ্রিয় কটা নিজের নিজের পরিপূর্ণ শক্তি অনুসারে, দেখা শোনা ছোঁয়া ইত্যাদি নানা উপায়ে এইটুকুই হল। আর কাযভোলা দৃষ্টি সে হল অনন্যসাধারণ অস্বাভাবিক দৃষ্টি, শিশুকালের তরুণ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি শিল্পী দৃষ্টি। নিত্য কাযের ব্যাপার সরিয়ে একটা

জিনিষে গিয়ে মানুষের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ নিবিষ্ট হল নিবিড়ভাবে যখন তখনই মন পড়ল জিনিষে এবং মনে ধরা না ধরার কথা তখনই উঠলো। চোখ কান সমস্তকে কেবলি—পাতা পড়ে, জল নড়ে ইত্যাদি কাযের পড়া থেকে ছুটি দিয়ে সৃষ্টির জিনিষের ও ঘটনার দিকে ছেড়ে দেওয়া গেল এতে মানুষের পরশ ও পরখ করার একটা কৌতূহল দেখা দিলে। কাযের জগতের বাঁধাবাঁধি নিয়মে দেখা শোনা করতে অপটু থাকে শিশুকালে সব মানুষ স্বভাবতঃই, বাপ মাকে তারা কাজে খাটায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে, কাযেই সামান্য সামান্য জিনিষকেও বড় মানুষের চেয়ে বেশি কৌতূহলের সঙ্গে শিশুরা দেখবার শোনবার অবসর পায়, মন তাদের আকৃষ্ট হয় বস্তুর উপর ঘটনার দিকে অনেকখানি এবং মন তাদের খেলেও অনেকখানি অনেক জিনিষের সঙ্গে অনেক্ষণ ধরে অগাধ কৌতূহলে। শিশুকালের এই কৌতূহল দৃষ্টির কিছু কিছু রেশ্ মানুষের বয়সকালেও নানা জিনিষ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখা যায়—চন্দ্রোদয় সূর্য্যোদয় শুকতারা ফোটাফুল মেঘের ঘটা বিদ্যুৎ, কিম্বা এক টুকরো হীরে অদ্ভূত গড়নের ঢেলা, অথবা বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার কি কিছু অথবা অদ্ভূত একটা সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি নানা টুকিটাকি নিয়ে খুব বয়সেও মানুয অনেক সময়ে নাড়া-চাড়া করছে কৌতূহলের বশে দেখা যায়। দক্ষিণাবর্ত্ত শাঁখকে লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে খুব কাযের জিনিষ বলে দেখা আর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্মীপেঁচার একটা পালকের চিত্র বিচিত্র নক্সা দেখা অথবা লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা বোনা কিবা ঘড়ির ঘণ্টা শোনা ও নূপুরের ধ্বনি শোনায় প্রভেদ হচ্ছে ঐ কৌতূহলটি নিয়ে। তরুণ দৃষ্টিতে সৃষ্টির সামগ্রী কৌতুকে রহস্যে ভরা দেখায়, কাযের সংস্পর্শে বড় হতে হতে মানুষ যতই এগোতে থাকে ততই এই দৃষ্টির তারুণ্য সে হারাতে থাকে এবং শেষে এই সমস্ত বিশ্ব তারি সংসারের কাযে লাগবার জন্যে রয়েছে এমনো একটা বিশ্বাস সে করে ফেলে, বিশ্বে যেটাকে কাযের জিনিস বলে সে নিজে বোধ করে না সেটাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না, আর ছবি কবিতা প্রায় সবই বাজের কোঠায় ফেলে দিয়ে চলে মানুষ! স্ত্রীপুত্র পরিবার পাড়াপ্রতিবেশী এমন কি টেবেল চেয়ার গুলোকেও খালি প্রয়োজনের দেখা প্রয়োজনের সম্পর্ক নিয়ে উপভোগ করে চলেছে এমন শক্ত মানুষ বড় অল্প নাই একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেনা, কিন্তু সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় কানের কাছে ছেলেগুলো শুধু-শুধু হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে, কিম্বা ডিক্‌সনারির পাতাটা ছিড়ে নৌকা বানিয়ে বর্ষার দিনে জলে ভাসালে, অথবা দস্তুর মাফিক সাড়ে দশটায় ঘড়ির কাঁটা পৌঁছলেই ছেলে ইস্কুলের জন্যে তৈরি না হয়ে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লে, ছেলে কাযের ব্যাঘাত করলে অকেজো হয়ে রইলো কাযের জিনিষ নষ্ট করলে এমনি শিশু চরিত্রকে কাযের চশমা দিয়ে উল্টো বুঝে নিজের চোখ কান লাল করে না তোলে এমন মানুষ কমই দেখি। কাযের জগতে চলাচল করতে করতে এই অত্যন্ত কাযের পরকোলা এত শক্ত হয়ে আমাদের চোখে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখার উপরে বসে যায় যে মনে হয় চিরদিন এই ভাবে দেখে চলাই বুঝি সব মানুষেরই কায কিন্তু অত্যন্ত ছেলে মানুষ যারা তারা

আমাদের এই ধারণা উল্টে দিয়ে যায়, কবিরা উল্টে দিয়ে যায় শিল্পীরা উল্টে দিয়ে যায় আর ঠিক সেই মানুষ গুলিকেই আমরা বালক পাগল নির্ব্বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার দাবি সপ্রমাণ করে চলি। কিন্তু সৌন্দর্য্য ভরা, রসে ভরা, রংএ ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর করে রচনা করা এই স্থষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্বা নিয়ে বর্ত্তে থাকবে নয়ন ভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না পরশ করে পুলকিত হতে চাইবে না মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস, এ যিনি মানুষকে মন দিয়া স্থষ্টি করলেন তাঁর ইচ্ছে কখন হতে পারেনা। এবং এই কথাই সপ্রমাণ করতে প্রথমেই এল কায ভোলা কায ভোলানো শিশু খুব কাযের জগতে অফুরন্ত কৌতূহল অকারণ হাসি কান্না ইত্যাদি নিয়ে! সেই শিশু, কাযে কর্ম্মে দিন রাত ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগালো— মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো—তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলাঘর বাঁধলে—কল্পনা পক্ষিরাজের অতি অপূর্ব্ব আস্তানা, সেখানে কায হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠলো মস্ত কায। কিন্তু কাযের জগৎ সেই শিশুর উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, শিশুকাল যেমন শেষ হতে থাকলো অমনি কাযও কোন কোন শিশুকে আস্তে আস্তে আপনার গড়ের দিকে টেনে নিতে লাগলো, একটু একটু করে খেলাঘর ভেঙ্গে গেল এবং কচি ছেলেকে কাযের যন্ত্রতন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে। আবার কোন ছেলেকে কায তেমন করে জোরে ধরতে পারলেনা, কিম্বা কোন ছেলেটা কাযে পড়েও বাজের সাধনা অনেকখানি করে চল্লো তারাই কাযের চাবুক এড়িয়ে গিয়ে কিম্বা সরে গিয়ে হয়ে উঠলো ভাবুক, অদ্ভূত কৌশলে তারা তাদের চোখে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখা ইত্যাদি যে অত্যন্ত কাযের আফিস যোড়া তাদের পিঠে পক্ষিরাজের ডানা যুড়ে দিয়ে কায বাজাতে না গিয়ে, বাঁশি বাজাতে বেরিয়ে পড়লো জগতে। শিশুকালের হারানো চমৎকারিকাচ অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে সেইটে বার করে সাদা সিধে কাযের চেয়ে দেখা, শুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে কৌতুকে কৌতূহলে ভরে উঠলো স্থষ্টির সামগ্রী! যে সব ইন্দ্রিয় কেবলি হিসেবের কাযে পাহারার কাযে লেগেছিলো তারা হয়ে উঠলো কৌতূহলপরায়ণ এবং সন্ধানি, দিনের পর দিন বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উল্টে পাল্টে খেলতে আর দেখতে অথবা শুনতে লেগে গেল; শুধু জল নড়ে ফল পড়ে এ পড়ায় আর রুচি হল না, কেমন করে জল চলচে, কেমন করে ফুল ফুটছে ঝরছে, কিবা সুরে পাখি গাইছে, আকাশের তারা কেমন করে চাইছে ইত্যাদি কেমন তা জানার আগ্রহ এবং চেষ্টা জেগে উঠলো। সাদা সিধে রকমে বুদ্ধির চাষ করে চলাতেই চোখে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখা বন্ধ রইলোনা চঞ্চল দৃষ্টি এ-ফুলে ও-ফুলে এখনো উড়ে পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টির চঞ্চলতার মধ্যে এক একটা সম্ আর ফাক পড়তে লাগলো, প্রজাপতি যেন হঠাৎ ডানা দুখানা স্থির করে আলোর পরশ ফুলের পাপড়ির রং এবং

ফুলের ভিতরকার কথা ধরবার চেষ্টা করতে থাকলো! দর্শন স্পর্শন শ্রবণের যান্ত্রিকতা কতকটা দূর হয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা একটু যেন বিকশিত হল। যে সব শরীরযন্ত্রের কাযই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাহিরের প্রেরণায় চট্‌পট্‌ সাড়া দেওয়া নির্ব্বিচারে, অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের মুক্ত করে দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে সুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চল্লো বাহিরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌঁছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে! এ একটা মস্ত ওলটপালট ঘটলো, হাত পা চক্ষু কর্ণের কাযের স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক ধারার—উজান টান ধরলো যমুনায়। ফুলের পাতার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সাড়া ধরার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যে যন্ত্রটা, সেটা থেকে থেকে আনমনে যদি ফুলের এবং পাতার শোভা নিরীক্ষণ করতে আরম্ভ করে কায ভুলে, তবে নিশ্চয়ই সবাই বলবে যন্ত্রটা বিগড়েছে—যেভাবে দেখা যে ভাবে শোনা যন্ত্রটার উচিত ছিল তা করছেনা। কিন্তু যন্ত্রের ঐরূপ ব্যবহার দেখে একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর বিপর্য্যয় শক্তি যে যন্ত্রটা লাভ করেছে তা কারু অগোচর থাকবে না তেমনি ইন্দ্রিয় সকলের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে নিরুপণ ইচ্ছা নিবিষ্ট হবার চেষ্টা যারা ঘটায়, অভ্যাস শিক্ষা ও সাধনার দ্বারায় বলতেই হবে সেই সব মানুষের দেখা শোনা সমস্তই অনন্য-সাধারণ বা অসামান্য রকমের একটা শক্তি পেয়েছে। এই যে কৌতূহল-প্রবণতা, দরদ দিয়ে সব জিনিষ দেখার অভ্যাস, কাযের দেখার প্রায় বিপরীত উপায়ে সৃষ্টির জিনিষকে আলিঙ্গন করে পরখ করা, ছেলেবেলাকার হারিয়ে যাওয়া খেলাঘরের কাজ-ভোলা দৃষ্টি একে ফিরে পাওয়া দরকার কিনা, এ নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ দেখা যায় কিন্তু একদিনও মানুষ একটিবার সেই ছেলেবেলার দেখা শোনা খেলা ধূলোর মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেনা এমন ঘটনা মানুষে বিরল। চেষ্টা করলেই ছেলেবেলার সেই কাজভোলা হারানো দৃষ্টি যে ফিরে পাওয়া যায় তা নয়। নাসার ডগায় দৃষ্টি স্থির করলেও, চাঁদ তারা মেঘ অথবা সূর্য্যের দিকে উদয়াস্ত হাঁ করে চেয়ে থাকলেও অথবা খাঁচায় কোকিল পুষে তার গান দিন রাত শুনে এবং দক্ষিণ বাতাসকে চাদর উড়িয়ে ছুঁয়েও যোগীর এবং ভাবুকের দৃষ্টি পাচ্ছে না কত যে লোক তার ঠিকানা নেই। সখ করে নানা সৌখিন জিনিষের সাজসজ্জার দিকে অথবা বিচিত্রা এই বিশ্ব প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যের দিকে চাওয়া হল বিলাসীর চাওয়া, বেতাল পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতো, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাযের দেখা এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিম্বা কায-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা! এই ইন্দ্রিয়পরায়ণদৃষ্টি নিয়ে শয়ন-বিলাসী, ভোজন-বিলাসী দুটোতে মিলে বাসকসজ্জার কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে যা হতো তা এই—

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা
রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা।
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই ধারি
ডোল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি॥

ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ্ দানা
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥

চিনির পানা কর্পূর চন্দন কালাগুরু বিছানা বালিস লেপ তোষক ইত্যাদি দিয়ে যে ত্রিপদী চৌপদী, সে গুলো কবিতা কিম্বা ভাবের তিন পায়া চার পায়া টেবেল চৌকি বল্লেও বলা চলে। বিলাসীর দৃষ্টির সঙ্গে ভাবুকের দৃষ্টির কোনখানে যে তফাৎ তা স্পষ্ট ধরা যাবে দুই ভাবুকের লেখা বাসকসজ্জার বর্ণন দিয়ে, যথা—

অপরূপ রাইক রচিত
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত

ধুয়োতেই, ভাব সচকিত চাহনি নিভৃত নিকুঞ্জের অপরূপ শোভা মনকে দুলিয়ে দিলে আবার যেমন

আজ রচয়ে বাসক শেজ
মুনিগণ চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ভাঙ্গে তেজ
ফুলের অচির, ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর
ফুলের বালিস আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর।

বিলাসীর দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ভাল ভাল কাযের সাজ সরঞ্জাম যা টপ্ করে গিলে খেতে ইচ্ছে হয় তাই, আর ভাবুকের দৃষ্টিতে ধরা গেল সেই গুলো যাদের দিকে নয়ন ভরে দুদণ্ড চেয়ে দেখতে সাধ হয়। বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে স্বষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাযভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি স্বষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে। কাযেই ভাবুকের শোনা দেখা বলা কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভাবে দেখে শোনে দেখায় শোনায় যে কাযের মানুষের দেখা শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালী বা ছেলেমানুষির মতই লাগে। কাযের দৃষ্টি নিয়ে মানুষের মন কোন্‌খানে কি ভাবেই বা খেলা করছে, আর ভাবুকের দৃষ্টি নিয়েই বা মন কোথায় কি খেলছে কেমন করে দেখলেই দুয়ের তফাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে কাযের কাজির দেখা দিয়ে লেখা মনের খেলা ঘরের দৃশ্য—

মন খেলাওরে দাণ্ডা গুলি
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলী ধুলা ধুলী।

এইবার ভাবুকের দৃষ্টি কবির মনটিকে কোন কায ভোলা জগতের খেলা ঘরের ছুটির মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেল তারি দুটি গান—

"আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল-বাণী
আজ উদাসীর বাঁশীর সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।

কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা
বকুল তলায় কায ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে সব কথা ভাসিয়েছিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া।"

কাযের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে মনের মরুভূমির উপরে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে শ্যামল ছায়া নাম্‌লো জল ভরে এলো চোখের কোণে, কান শুনলে বাঁশীর সুরে উন্মনা হয়ে কায ভোলা মন বকুল তলার নিবিড় ছায়ায় খুঁজতে লাগলো ছেলেবেলার হারানো খেলার সাথীকে, আর গাইতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে—

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।

এমনিতরো ভাবুক দৃষ্টি নিয়ে সব মানুষের শিশুকাল সৃষ্টির যা কিছু আকাশের তারা থেকে মাটির ঢেলাটাকে পর্য্যন্ত একদিন দেখে চলেছিল কিন্তু অবোলা শিশুকাল আমাদের কেমন দেখলে কেমন শুনলে সেটা খুলে বলতে পারলে না এঁকে দেখাতে পারলে না! কবিতা ছবি ইত্যাদি লেখার কৌশল ভাষার খুঁটিনাটি ছন্দের হিসেব না জানার দরুণ শিশুকাল আমাদের কবির ভাষায় ছবির ভাষায় আপনাকে ব্যক্ত করতে পারলে না! শিশুর তরুণ দৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির সামগ্রীকে সখীভাবে খেলাবার সাথি বলে চেয়ে দেখবার শুনে দেখবার ছুঁয়ে দেখবার একটা আগ্রহ থাকে সেই একাগ্রতা দিয়ে দেখা শোনা ছোঁয়ার রসটা ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে মহানন্দে, কি সে আনন্দ ব্যক্ত করে কেবল অভিনয় ছাড়া আর কিছু দিয়ে এমন সাধ্য শিশুর পুঁজি নিয়ে

হয় না। শিশু যখন একটা কিছু ঘটনা বর্ণনা করে তখন তার মুখ চোখ হাত পা সমস্তই যেন ঘটনাটাকে মূর্ত্তি দিয়ে বাইরে হাজির করবার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করছে দেখা যায়, যেটা বড় হয়ে আমরা কবিতায় অথবা ছবিতে ব্যক্ত করি সেটা অভিনয় করে ব্যক্ত করা ছাড়া শিশুকাল আর কিছুই করতে পারে না ; এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে কেঁদে নেচে, কখন গলা জড়িয়ে কখন ধূলায় লুটিয়ে আধ আধ কথায় অতি মনোহর অতি চমৎকারী একটা নিজের অদ্ভূত রকমে সৃষ্টি করা ভাষায় শিশু আপনার দেখা শোনা সমস্তই ব্যক্ত করে চলে যে বড় হয়ে যারা আপনাদের দৃষ্টি শ্রবণ স্পর্শনের উপরে অত্যন্ত কাযের চশমা এঁটে দিয়েছে তাদের বোঝাই মুস্কিল হয় শিশুকাল অনাসৃষ্টি কি দেখছে, কিবা দেখাতে চাচ্চে, কি শুনছে কিবা শোনাচ্ছে! শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুনতে পারেন এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারলে না সেইটেই বলে যায় ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশু-কালের দিন রাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে সেই বেদনা ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন। খুব খানিকটা ন্যেকামোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলা কওয়া গুলোকে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য ফিরে পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা—শিশুকাল ন্যেকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না সে যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিককে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায় শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যক্ত করার সম্বল এত অল্প সে খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গী দিয়ে খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড় পোঁচড় নয় তো ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা লেখা ও কথা দিয়ে এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাৎ। দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি আর একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্য্যন্ত ধরা যায় না।

ন্যেকামো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধ-ভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙ্গাচোরা টানটোন আঁচড় পোঁচড় চুরি করে বসে বসে কেবলি শিশু কবিতা শিশু-ছবি লিখে চল্লেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাযগুলোও তার মন ভোলোনো হয় এভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না শিশুর বাপ মাকেও নয়। ছেলে ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমানুষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি—

ও পারেতে কাল রং, বৃষ্টি পরে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙ্গা টুক্ টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!

অজানা কবির গান ছেলেমানুষি মোটেই নয় এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়। আমাদের খুব জানা কবি এই সুরেই সুর মিলিয়ে বাঁধলেন, এরি মত সরল সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে আপনার কথা :—

ওই যে রাতের তারা
জানিস্ কি মা কারা?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা।

আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর পরে।

আমাদের তরুণ-চোখের নয়নতারা একদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে সে সব কথা ভেবেছিল কিন্তু যে ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেনি আমাদের শিশুকাল, এতকাল পরে সেই ভাবনা ফুটে উঠলো কবির ভাষায়।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সাধনা-কুঞ্জ"

"সাধনা-কুঞ্জ" কোথায় তোমার ওগো উদাসীন কবি!
নিত্য যেথায় গাহিছ নিজনে আঁকিছ করুণ ছবি!
মাথা রাখিবার নাহি ঠাঁই ভবে,
পথে পথে ফির আপন গৌরবে,—
"কুঞ্জ" তোমার বিরচিলে কবে
রহস্য বুঝি সবি!
"সাধনা-কুঞ্জ" কোথায় তোমার ওগো উদাসীন কবি!

সত্য সুহৃদ! যা' কহিলে তুমি জীর্ণ কুটীর (ও) নাই।
"সাধনা-কুঞ্জ" কোথায় আমার ভাবিতেছি আমি তাই!
মনে হয় মোর হৃদয়-গহন
যেথা ছিল শুধু কণ্টক-বন,
ফুলে ফুলে আজি সাজিল কেমন
কার পরশন পাই'!
"সাধনা-কুঞ্জ" সেই কি আমার ভাবিতেছি আমি তাই!

মানস-তটিনী বয়ে যায় সেথা 'কুলু' 'কুলু' 'কুলু' তানে !
তীরে তার বসি' কে ওই তাপসী মগ্ন মধুর গানে !
আপনার ভাবে আপনি বিভোর,
বুক ভেসে যায় নয়নের লোর,
দেখা দিয়ে হায়, প্রিয় মনচোর
লুকাল কি কোন্ খানে !
গানের লহরে বিরহ-রাগিনী জাগে তাই তার পানে !

হেন মনে লয় তমালকুঞ্জে যমুনা উজান বয় !
বিরহিনী রাধা একাকিনী বসি 'কানু' 'কানু' ফুকরয় ।
শ্যামের বাঁশরী কখন বাজিয়া
বুঝিবা কখন গিয়াছে থামিয়া,
রেশ্ টুকু তার মরমে জপিয়া
সকল বেদনা সয় !
পরাণের সুর আকাশে বাতাসে খুঁজিছে সে মধুময় !

সে সুরে মিলায়ে আপনার সুর পাখী আজি গাহে গান !
কাননে কাননে ফুটে ফুলকলি মাল্য করিতে দান !
সন্ধ্যা-উষার আঁচলের ছায়
রবি-শশী-তারা আঁখি মেলে চায়,
মৃদুল মলয় অমিয়া বিলায়
মাতায়ে ভুবন-প্রাণ !
উদার গগনে ভাসে মেঘমালা ছায়ালোকে করি স্নান !

"সাধনা-কুঞ্জ" কোথায় আমার, আমি উদাসীন কবি !
গোপন মরমে বারতা তাহার মুগ্ধ আজিকে লভি' !
বিস্মিত চিত অবাক্ হইয়া
আশৈশব মোর রয়েছে চাহিয়া,
কে তাপসী যাগ যেতেছে সাধিয়া
সঁপিয়া জীবন-হবিঃ !
আরতি-মন্ত্রে দীক্ষিত তার বুঝি এ ভিখারী কবি !

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কাশ্মীর-দৃশ্য

['কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে]
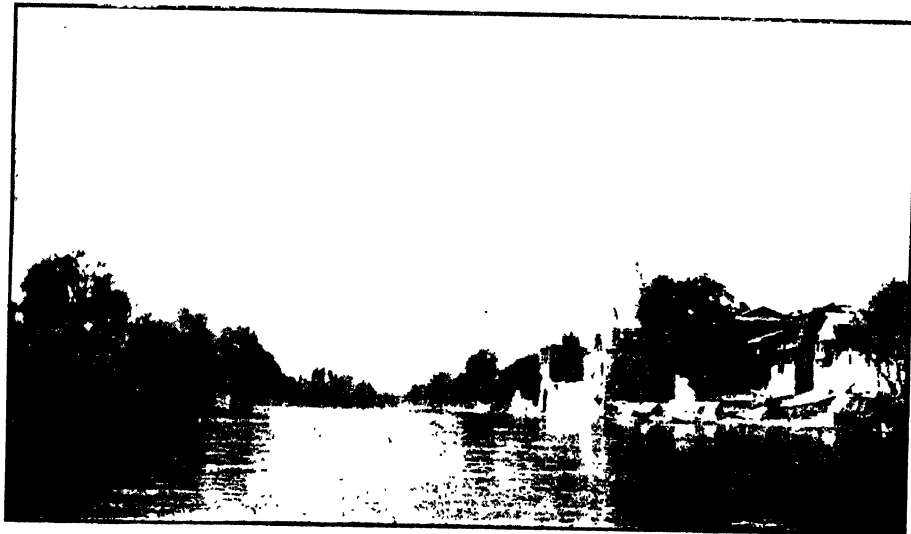
পঞ্চম সেতু, শ্রীনগর

শ্রীনগর প্রাসাদ

শ্রীনগরের দৃশ্য

গঞ্জবাজার, শ্রীনগর
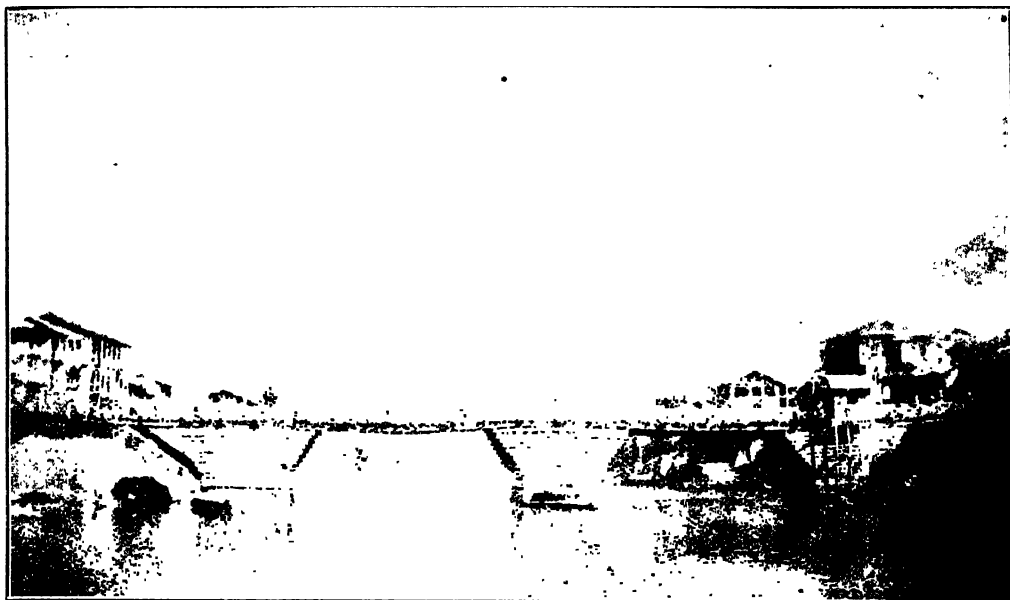
দ্বিতীয় সেতু, শ্রীনগর

হরিসিং বাগ, শ্রীনগর
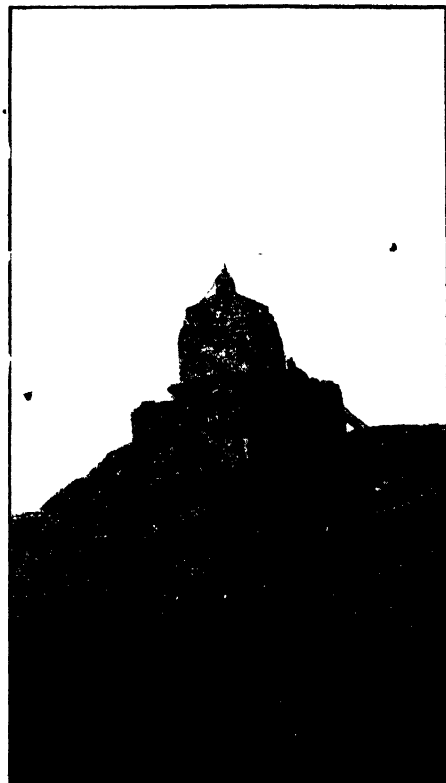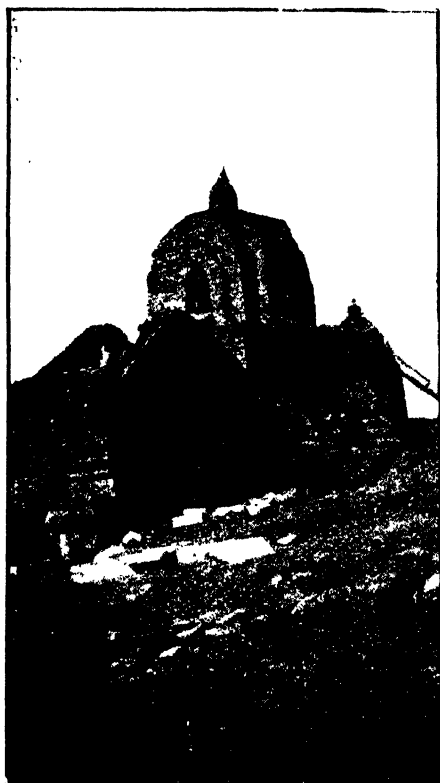
তক্তি স্থলেমান, শ্রীনগর

অন নাগ মন্দির

গিরিবর্ত্ম, ঝিলাম ভ্যালি রোড

হরিপর্বতোপরিস্থিত দুর্গ, শ্রীনগর

ঝিলাম নদীর উপরিস্থিত দড়ির পুল

লালমণ্ডি যাদুঘর, শ্রীনগর
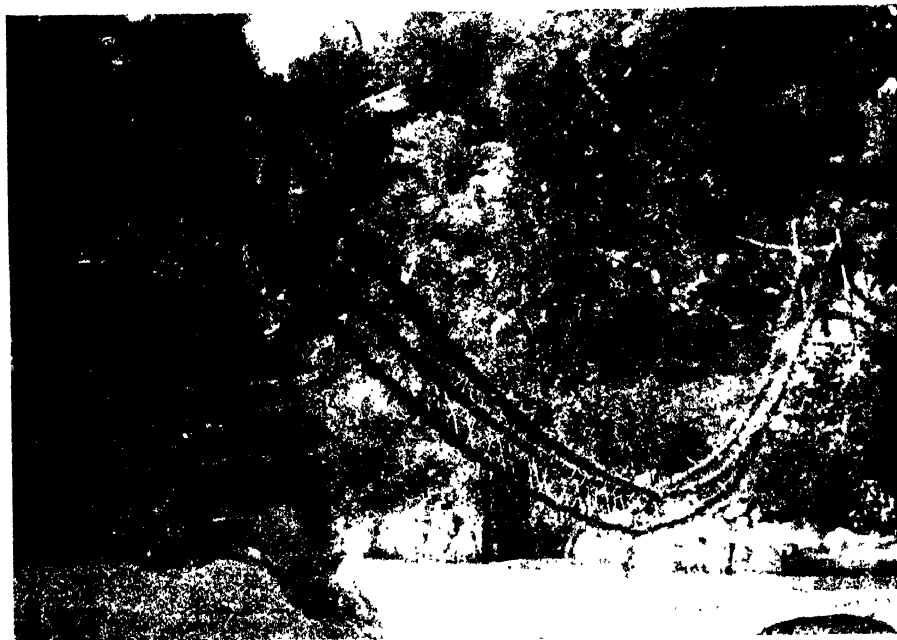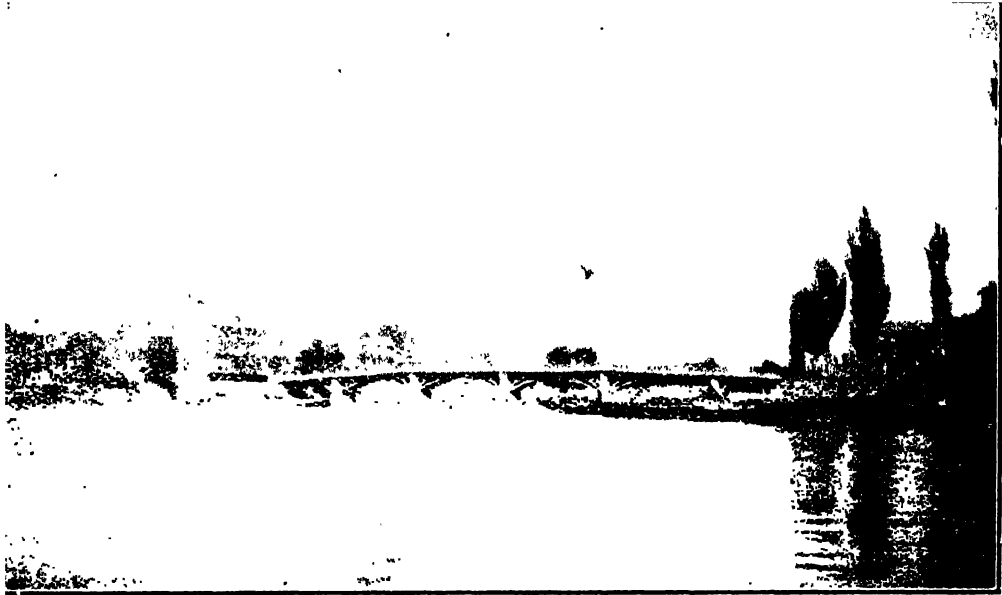
প্রথম সেতু, শ্রীনগর

অবন্তীপুর মন্দির উদ্ধারার্থে খনন

ঝিলাম নদী

গৃহত্যাগ

(১)

রজনীকান্তের বয়স যখন আটাশ, তাহার পত্নী সুধারাণীর বয়স তখন আঠারো। কিন্তু রজনীকান্ত যৌবনের এই ভরা জোয়ারে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত ভাসিয়া যায় নাই। বিবাহের পর তিন বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল তার—সুধারাণীর টানা চোখের বাঁকা চাওনি, সুন্দর মুখের সুকুমার জ্যোতিঃ, কিশোর প্রাণের অকৃত্রিম প্রীতি—এ সবের তখন একটা মোহময় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেল, রজনীর মস্তকের উপর সপুষ্প একটী টিকি, সকালে ছাদের উপর নির্জ্জনে গীতাপাঠ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-মন্ত্র-পাঠ, প্রভাতে গঙ্গাস্নান, আর সময়ে অসময়ে ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন। সুধারাণী বড় কৌতুকপ্রিয়া, সে একদিন তার সেলাই-এর কাঁচিখানি আনিয়া সেই টিকিটীর মুলোচ্ছেদে মনোনিবেশ করিয়াছে দেখিয়া, রজনী বলিল, 'দেখ, একালের মেয়েদের স্বামিভক্তি নেই। তা যদি থাকত, তাহলে তুমি ঐ সংহারমূর্ত্তিতে আমার কাছে আস্‌তে না। গীতায় ভগবান্ কি বলিয়াছেন শোন—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ। এখন এর মানেটা বোঝো।'

সুধারাণী ঘাড় বাঁকাইয়া আচল দুলাইয়া বলিল,—'আমার এখন গীতার মানে শোন্‌বারই ত সময়! একঘাট বাসন পড়ে আছে আমার।' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রজনী ভট্টাচার্য্যের ছেলে, সে কিছুদিন বাপের টোলে মুগ্ধবোধ পড়িয়াছিল। তার পিতার মৃত্যুর পর সে কয়েক ঘর যজমানের গুরুগিরি ও কয়েক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তরের খাজনার দ্বারা বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীর অন্নবস্ত্র যোগাইত। সুধারাণী জমিদারের ঘরের মেয়ে হইলে কি হয়, সে হাসিমুখে এই দুঃখের সংসারে সব কাজই করিয়া যাইত। বৃদ্ধা শাশুড়ী হৈমবতীর একটী লাল টুক্‌টুকে নাতির মুখ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে,—নাতির মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে জীবনে আর কি কাম্য থাকে? তাই হৈমবতী সেদিন মুখুর্য্যেদের মেজো বৌ-এর একটী লাল টুক্‌টুকে ছেলে হইয়াছে দেখিয়া আসিয়া সুধাকে বলিলেন, 'অমন কপাল কি আমার হবে, মা? আহা, আমার মাথায় যত চুল তত পরমায়ু হোক্ মা তোদের, এখন কোলে-কোঁচড়ে তোর একটা দেখে যেতে পারলেই আমার সুখ। এবার আমি মা ষষ্ঠীর পূজা দেবো, বউমা।' কিন্তু ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের পূজা তাঁহার সংবৎসরই চলিত, কবচ, মাদুলী, ঘুন্‌সী পরিয়া সুধা বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই সে আজ কাল ও-সব বালাই অঙ্গে ধারণ করিয়া নিজেকে ভার-ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিত না। সে শাশুড়ীকে বলিত, 'কেন, মা, আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার ভয় কি মা? তোমার সেবার

নিশ্চয়ই কোন ক্রুটী হয়—কি হয়েছে, বলনা মা!' হৈমবতী মুখে গুল্ দিয়া বলিতেন, 'দূর্ পাগলী, আমার আবার কি হবে! আহা, বাছা, তোমারও মনটা এই ভরা বয়েসে উড়ু-উড়ু করে, রজনীর মনেও সুখ নেই, তবু সংসারে একটী নূতন প্রাণী এলে তোমরা তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকিবে। আহা, ছেলেপুলে হতে কার না সাধ যায়, মা?'

কথাটা মিথ্যা নয়। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আঁধারে হাতে যখন কোনও কাজ থাকিত না, রজনী যখন ছাদের উপর পরমার্থ-চিন্তায় তৎপর, বৃদ্ধা শাশুড়ী যখন একমনে হরিনামের মালা জপিতেন, তখন সুধারাণী বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ঐ নির্ম্মল সুদূর আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। আকাশের ছোট বড় সব তারাগুলিই একে একে ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিত, সে ভাবিত—কোথাও যেন কি একটা নাই, তাহারি অভাবে সারা জীবনটা যেন বিষতিক্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে কে? কত দূরে সে? সে কবে আসিবে গো? তারই মত একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, লাল-টুকটুকে তারই মত মুখ, তারই মত সদাহাস্যময় ও কৌতুকপ্রিয়, চাঁপার কলির ন্যায় তারই মত হাতের কচি আঙ্গুলগুলি, তারই মত অপূর্ব্ব, কোমল, মোহময়—ওগো, তরুণ হৃদয়ের সব আশা আকাঙ্ক্ষা যে সেই অনাগত শিশুটীর জন্য দ্বারের পাশে তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে বসিয়া আছে! উঠানে রজনীগন্ধা, মল্লিকা, বেল, যূঁই, চাঁপা, হাস্না-হানা সন্ধ্যার শান্তপবন গন্ধাকুল করিয়া তুলিত,—আর সুধার বুভুক্ষিত বুকে অদৃশ্য শিশু-হস্তের একটি নিবিড়, স্নিগ্ধ, স্নেহময় স্পর্শ কল্পনাবলে সত্য বলিয়া মনে হইত;—সে ভাবিত, তাহারই ত যত দোষ, সে কেন ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করে না?

রজনীকান্ত বাস্তবিক সুধারাণীকে সর্ব্বস্ব দিয়াই ভালবাসিয়াছিল। রজনীকান্ত মাতৃভক্ত, কিন্তু জমীদার-শ্বশুর বলিয়া কখনো সে শ্বশুরবাড়ীর মুখাপেক্ষী হয় নাই। সুধারাণীও রজনীর দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দেখিয়া বিবাহ-রাত্রেই তাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। সেদিন সুধারাণীর বাল্যবন্ধু উষা তাহাকে চিঠি দিয়াছে, "ওলো সু, এমনি করেই কি ভুলতে হয়, লো? আমাদেরও কি ও রত্নটি নেই? যাহোক মেয়ে, বাপু, তুই—একবার কি বাপের বাড়ীর মুখও দেখতে ইচ্ছে করে না, ভাই? তোর সেই পাগ্‌লা চাঁদমুখখানি আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে—তা এখন সে মুখের মালিক রজনীবাবু। না ভাই, আর লিখতে পারছিনি, দুষ্টু খোকন সব নষ্ট করে দিলে।" সেই হিজিবিজি কালিঢালা চিঠিখানা পড়িয়া সুধার বাল্যবন্ধুকে মনে পড়িল, তারা ত সমবয়সী—তবে ভগবান্ তাহাকে সন্তান-রত্ন হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? রজনীকান্তের সাহচর্য্যে আসিয়া সে বাপের বাড়ীর কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছে,—সেই শিব-প্রশান্ত, ধ্যানস্কান্ত, জ্যোতির্ম্ময়, ত্যাগধর্ম্মী স্বামী,—তাহাকে ছাড়িয়া সুধার স্বর্গেও যাইতে ইচ্ছা নাই।

(২)

সেদিন সুধার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। হৈমবতীর একাদশী, কয়দিন হইল রজনী দূরগ্রামে

যজমান-বাড়ী গিয়াছে। সুধা দ্বিপ্রহরে নিজ কক্ষে শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল। শিয়রে স্নেহময়ী শাশুড়ী বধূর জ্বর-তপ্ত কপালে জলের পটী দিতেছিলেন। সুধাকে তিনি আপনার কন্যার মতই ভালবাসিতেন, কারণ তাহাকে যে ঠিক তাঁর মৃতা কন্যা লক্ষ্মীরই মত দেখিতে। সেই টানা চোখ—সেই ভোমরার মত কালো নিবিড় কেশ, সেই আরক্ত কপোল, সেই গড়ন, সেই হাসি, সেই সব! আজ রজনীর ফিরিবার কথা,—সুধা মনে করিতেছিল—এখনই যদি তার মরণ হয়, তাহা হইলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে না! সে শিহরিয়া উঠিল। হৈমবতী ভাবিতেছিলেন যে দুপুরের মধ্যে যদি রজনী না আসে, ত বিকালে সুধার বাপের বাড়ী সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। বধূকে এই কথা বলিতেই সে বলিল, 'না, মা, সেখানে এখন খবর দিবেন না, তাহলেই বাবা এসে নিয়ে যাবেন। এ সামান্য জ্বর কালই সেরে যাবে।' হৈমবতী সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'মা আমার, আমায় ছেড়ে কোথাও থাকতে চায় না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হও মা।'

বলিতে বলিতেই রজনীকান্ত চাদর গায়ে ধূলিমলিনবেশে যজমানবাড়ী হইতে ফিরিল। 'একি মা, কি ব্যাপার?' বলিয়া সে ব্যাগটী রাখিয়া চকিতেই সব বুঝিয়া লইল। মাতা বলিলেন, 'তুই বাবা একবার বউমাকে দেখ, দেখে যা হয় ব্যবস্থা কর। মা আমার জ্বরের ঘোরে অস্থির হয়ে পড়েছে।' তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রজনী দেখিল, সুধা এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সেই জ্বরের ঘোরেও তাহার মুখে সুন্দর হাসিটী ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে হাসি স্বর্গের আশীর্ব্বাদের মতই পবিত্র। সুধা বলিল, 'যাও, এইবার গীতাখানা নিয়ে এসো, আর সেই হরিনামের মালাটা।'

রজনী সুধার পাশে আসিয়া সস্নেহে তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, 'আবার দুষ্টুমি? এতক্ষণ যে হাসি ফোটেনি।' এই বলিয়া সে পত্নীর আরক্ত গণ্ডে চুম্বন করিল।

'আঃ, পেট ভরে গেল—সকাল থেকে ত পেটে কিছু পড়েনি। তাহলে মাকে ডাকি? যাও শীগ্‌গীর হাত-পা ধুয়ে খাওগে, নইলে আমি কিন্তু উঠে মাকে ডাকবো।'

'না, না, যাচ্ছি। বলি তোমার এরই মধ্যে কি হল? সারা পথটা তোমারি কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি।'

সেদিন রজনী সুধার শয্যার নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠে নাই। সারারাত তাহাকে পাখার হাওয়া করিয়াছে, সে সুধার কোনও নিষেধ শুনে নাই। সুধা মনে মনে স্বামীর গভীর ভালবাসা দেখিয়া অশেষ আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল।

আর আজ? আজ রজনী সুধার কাছে আসে না, সুধার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কয় না, সুধাকে দূরে দেখিতে পাইলেই অপরাধীর মত পলাইয়া যায়। সুধা যখন রজনীর কাছে যায়, তখন সে নানাকার্য্যের ছলে বাহিরে চলিয়া যায়। সে বাড়ীতে গেরুয়া পরে, নিজে হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া

খায়, পানের পরিবর্ত্তে হরিতকী খায়, রাত্রে সুধার কক্ষে না শুইয়া বাহিরের ঘরে কম্বল বিছাইয়া সারারাত মশককুলের সঙ্গে সংগ্রাম করে। সুধা ক্রমশঃ বুঝিল যে সে অপুত্রক বলিয়া স্বামী তাহাকে ঘৃণা করে, তাহারই ভাগ্যদোষে স্বামীর এই কঠোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় নিত্যকারের পূজা সারিয়া রজনী বাহিরে যাইতেছে, সুধা তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। 'শোনো, একটা কথা আছে।'

'কি কথা ? চট্ করে বলে ফেল।'

'সে চট্ করে বল্‌বার নয়।'

'আঃ, কি বিপদ! তুমি আমার সকল কাজেই বাধা দাও!'

'আচ্ছা, তবে থাক্, কাজ নেই, যাও।'

'না, না, বল, শুনে আসি।'

ঘরের মধ্যে আসিয়া সুধা রজনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আমায় কি তুমি তাহলে ত্যাগ করলে ?'

'গুরুজী কি বলেন, জান ত ? যোষিৎ, অর্থ, আর যশ—এ তিনের বাসনা থাক্‌তে কখনো সাধন ভজন হয় না। আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে সাধনা কর্‌তে দাও। সব মায়া—সব মায়া। গীতায় বল্‌ছেন—নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি যাতু—'

'আমি গীতা শোন্‌বার জন্যে ত তোমায় ডাকিনি। হঠাৎ এত সাধন ভজনে মন গেল যে ? কই, আগে ত ও-সব বালাই ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই আমায় ঘৃণা কর। তা আমি যদি তোমার পথের কাঁটাই হয়ে থাকি ত আমায় একেবারে দূর করে দাও না। আপদ-বালাই নিয়ে কি মানুষে ঘর করে ?'

'জয় গুরু! জয় গুরু! তুমি যে ধর্ম্মের তত্ত্বটাই বুঝলে না! আমি কি তোমায় কষ্টে রেখেছি ? কাম, ক্রোধ, ভয়,—এ তিন থাক্‌তে নয়। শোনো, গীতায় শ্রীভগবান্ কি বল্‌ছেন—বীতরাগো ভয়ক্রোধস্তন্নাম মুনিরু—'

'আবার ঐ হাড় জ্বালানো হালুম্-হুলুম! বলি, আগে ত তুমি অমন ছিলে না। তবে আমায় অসুখ থেকে সারারাত জেগে বাঁচালে কেন ? তোমাকেই যদি না পেলুম, ত আমার এ ছার দেহের সুখ কি হবে ? আমি তোমার মনের মত নয়, তা অনেকদিন জানি। তা না হয় মনের মত একটী জুটিয়ে নাও, আমি তার দাসী হয়ে থাক্‌বো।'

'ধর্ম্মের আলো তোমার মনে এখনো জ্বলেনি, তাই তুমি যা-তা বল্‌চ। আমায় ছাড়ো, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। জয় গুরু! জয় গুরু!' এই বলিয়া রজনী সুধার মুষ্টিবদ্ধ নিজ বস্ত্রপ্রান্ত বিচ্যুত করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঐ 'জয় গুরু!' শব্দের উদাত্ত ধ্বনিটা শুনিলেই সুধার বুকের ভিতর কেমন গুরু গুরু করিত, স্বামী এখন সারা দিন-রাত্রিই 'জয় গুরু' মন্ত্রোচ্চারণ

করিয়া নিজের অচলা গুরু-ভক্তির জয়-ডঙ্কা বাজাইতেছেন। হৈমবতী এই সব ব্যাপার দেখিয়া পুত্রকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন, 'হাঁরে, এসব ভণ্ডামি কেন? ওসব ত আমরা করবো। তোর কচি বয়েস, বউ সারাদিন কান্নাকাটি করে, তোর কি একটু মায়া নেই, বাছা?'

'মা, গীতা কি বলছেন জানো? মহামায়া দুরত্যপি—'

'সে কথা থাক, বলি, শিবতলায় যে সন্ন্যাসীটা এসেছে, তার কাছে অত যাতায়াত করিস্ কেন? ও একটা ভণ্ড, সারাদিন গাঁজা খায়, মেয়েদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে—ওসব পিশাচদের সঙ্গে মেশা কেন রে?'

'গুরুনিন্দা? আমার কাছে গুরুনিন্দা? তোমরা সকলে মিলে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেচ—আমার ধ্যানে বসবার যো নেই। থাক, আমি রাগ করবোনা—গীতায় শ্রীভগবান ক্রোধ বর্জ্জন করতে বলেছেন। আমি আমার পথ খুঁজে নোবো। জয় গুরু, জয় গুরু!'

সেদিন সন্ধ্যায় রজনীকান্ত আর গৃহে ফিরিল না।

(৩)

একদিন, দুইদিন, তিনদিন—এমনি করিয়া প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল, রজনীকান্তের আর দেখা নাই। পাড়ার সকলে বলিল, শিবতলার সেই সন্ন্যাসীটার সঙ্গে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বধূর মুখের দিকে চাহিয়া হৈমবতী কাঁদিতে পারিতেন না, তিনি পুত্রশোকে অধীর হইলে যুবতী বধূ কি করিবে? তিনি মনে করিতেন—রজনী একদিন নিশ্চয়ই ফিরিবে। ইতিমধ্যে সুধার বাবা তাহাকে একদিন লইতে আসিয়াছিলেন, তখন সুধা বলিয়াছিল 'না, বাবা, আমি এখন যাবোনা। হঠাৎ এসে যদি আমায় দেখতে না পান, ত কি মনে করবেন? আর শাশুড়ীর শোকতাপের শরীর, বয়েস হয়েছে, এমন অবস্থায় কি তাঁকে একলা ফেলে আমি যেতে পারি?' তাহার বাবা কন্যার এই দৃঢ়তা দেখিয়া আনন্দিতমনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত চলিয়া যাইবার পর হইতেই তাহাদের বড় অর্থকষ্ট হইয়াছিল, অথচ পিতার প্রদত্ত অর্থ সুধা হাসিমুখেই তাহার সমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিল, 'ছি, ছি, এতে যে অকল্যাণ হবে, বাবা!' ইহার পর তাহার বাবার মুখে আর কোনও কথা ফুটে নাই।

সুধা দিনরাত উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের দিকে, বাতায়নের বাহিরে, সুদীর্ঘ পথের পানে চাহিয়া থাকিত,—যদি সে আসে! সে কি তাহাকে ভুলিয়া চিরজীবন সাধনভজনে কাটাইতে পারিবে? যে তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারিত না, সে তাহার স্মৃতির গভীর লেখা একজন্মেই মুছিয়া ফেলিবে? তাহার নবোদ্ভিন্ন পদ্মকোরকের মত সুকুমার কিশোর চক্ষে সে একদিন প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বলিয়াছিল—'সুধা, সাধনভজন তুমিই আমার সব।' সে—সে কেমন করিয়া তাহাকে চিরজন্মের মতন ত্যাগ করিবে? যে কখনো পরনারীর দিকে মুখ তুলিয়া চায় নাই, সে কি কখনো

তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে? প্রাঙ্গনে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাইতে গিয়া এই সব কথা তাহার মনে হইত, বিপুল রাক্ষসের মত আসন্ন সন্ধ্যার নিবিড় আঁধার আকাশমণ্ডলে দুইখানা প্রকাণ্ড পাখা বিস্তার করিয়া নামিয়া আসিত, সুধা স্বামীর স্মৃতি-সুগন্ধ-পূর্ণ কক্ষটীতে আসিয়া গললগ্নবাসা হইয়া সন্ন্যাসী স্বামীর উদ্দেশে কহিত, 'ওগো, আমায় দেখা দিয়ে যাও—একবার তোমায় জন্মের মত দেখে নিই, তারপর তোমার যেখানে খুসী যেও—আমার আর কোনও আক্ষেপ থাকবে না।'

হৈমবতী ডাকিতেন, 'বউমা!' তিনি বধূকে একদণ্ডও চোখের আড়ালে করিতেন না। তরুণ মন—স্বামীবিরহে বিচলিত হইবারই সম্ভাবনা, তাই তাহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন। সুতরাং সুধা কাঁদিবারও সুযোগ পাইত না, তাহার হৃদয়ের সব অশ্রু হৈমবতীর স্নিগ্ধ স্নেহসিঞ্চিত হইয়া বুকের মধ্যে পাষাণ হইয়া জমিয়া গিয়াছিল; মনে হইত—একটু অবসর পাইলেই তাহা গোমুখী-নির্ঝরের মত অবিশ্রান্তবেগে বহিয়া চলিবে। সারাদিন সে সংসারের কাজেই ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে এমন কোন স্থান কি আছে যাহার সঙ্গে রজনীর কোন-না-কোন স্মৃতি বিজড়িত নাই? সেই ছোট ঘরে দেয়ালের গায়ে সুধার বন্ধুর উক্তিটী রূপোন্মত্ত রজনী লাল-নীল পেন্সিলে তাহারই উদ্দেশে লিখিয়াছিল—'পাগ্‌লা চাঁদ মুখখানি'; সেই টেবিল-চেয়ার, সেই শয্যা, সেই কাগজ-পত্র, সেই সব বন্ধু বান্ধবের গতায়াত ও কুশল প্রশ্ন, সেই প্রণয়-পত্র, কক্ষে কক্ষে বাতাসে-ভরা সেই মোহময় স্বর—এখনো যেন মনে হয়, কাণের কাছে আদরের 'সুধারাণী'-ডাকটী ক্ষীণ বাঁশীর শব্দের মত বাজিতেছে—এসবের হাত হইতে কেমন করিয়া সে এড়াইবে? মনে আছে—একদিন কি-একটা ঠাট্টা করিলে সে আদর করিয়া রজনীর গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করিয়াছিল; কিন্তু আদরের আঘাতটা মাত্রাতিশায়ী হইলেও রজনী সুধাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়াছিল। মনে আছে—সেই সপ্রেম গাঢ় পরিরম্ভন, গল্প করিতে করিতে সেই অবিদিতগতযামা রাত্রি! মনে আছে—তার বিশ্রী অভ্যাস, ঘুমন্ত অবস্থায় বকা! রজনী এজন্য যে-সব ঠাট্টা করিত, তাহাও সে ভুলে নাই। ভাবিতে ভাবিতে আর তাহার চোখের জল বাধা মানিতনা—সে কি সত্যই অনন্তের মাঝে ডুবিয়া গেল? সে কি আর আসিবেনা? তাহার তরুণ মন বলিত—'না, না, না, তা কি হয়?' এমন সময় হৈমবতী আবার ডাকিতেন—'বউমা!'

সুধারাণী ছুটিয়া শাশুড়ীর কাছে চলিয়া যাইত।

(৪)

বৈশাখের প্রখর রৌদ্র। সুধারাণী বাহিরের দেয়ালে ঘুঁটে দিতেছে। তাহার মাথার ঘোমটা একটু খসিয়া গিয়াছে, গাছকোমর করিয়া তাঁহার আঁচল কটিতটে বদ্ধ, বামহস্তে গোবরের তাল, ডান হস্তে ক্ষিপ্রতার সহিত সে ঘুঁটে দিয়া যাইতেছে। তাহার সুন্দর মুখখানি স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের আমগাছে দুষ্ট কোকিলটা ডাকিয়া ডাকিয়া কাণ ঝালাপালা করিয়া

দিতেছে। ও কি আর ডাকিবার যায়গা পাইল না? একটীবার থামিয়া সুধারাণী সেই আকণ্ঠ-নিঃসৃত, অনায়াসোচ্চারিত, স্বর-পর্য্যায়-উদ্‌গীত মনোমোহন সঙ্গীত শুনিল,—তখন তাহার সূক্ষ্মবসনোদ্ভিন্ন যৌবন-তারুণ্য দেখিতে আরও সুন্দর হইল, হঠাৎ তাহার অধরপ্রান্তে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মেঘান্তের সূর্য্যকিরণের মত চকিতেই মিলাইয়া গেল। এমন সময় সে চাহিয়া দেখিল—আম্রবৃক্ষের অন্তরালে কৃষ্ণকায়, জটাধারী, ত্রিশূলহস্ত, কৌপীনবাস এক শীর্ণ সন্ন্যাসী! সে সন্ত্রস্তমনে বসন সংযত করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিল। সন্ন্যাসী দেখিলেই আজকাল তার বড় কৌতূহল হইত, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর বউ সে—সে আর কি করিবে? আজ কিন্তু, এই সন্ন্যাসীটাকে সে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তবে বাড়ীর ভিতর গেল। হৈমবতী বলিলেন, 'ঢের হয়েছে মা, আজ আর কাজ নেই, এইবার তুমি স্নান করে এসে খেতে বসো।' 'হাঁ, মা, যাই'—এই বলিয়া সে কলসীকক্ষে ঘাটের দিকে চলিল। আম্রবৃক্ষতলের দিকে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও সে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার স্নান সারা হইল, সে সিক্তবসনে ভরা কলসীকক্ষে গুণ্ঠনবতী হইয়া উঠিয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখিল সেই সপ্রতিভ সন্ন্যাসীটা লুব্ধদৃষ্টিতে তার যৌবন-সন্নদ্ধ সিক্তবসনতরঙ্গায়িত বক্ষোদেশের পানে চাহিয়া আছে। সন্ন্যাসী তাহার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'এ বহুজী, মেরা ভুখ্ লাগে হো!'

'রসো, তোমার ভুখ্ লাগা বের কর্‌ছি'—সন্ন্যাসীকে শোনাইয়া শোনাইয়া এই কথা কয়টী বলিয়া সুধা দ্রুতচরণে বাড়ীর ভিতর গিয়া সন্ন্যাসী-সংক্রান্ত সব কথা হৈমবতীকে গিয়া বলিল।

হৈমবতী ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রকে চিনিতে পারিয়া তিনি একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।..................

* * * * * *

সেদিন রাত্রে প্রীতি ভোজের পর জটাধারী রজনীকান্ত সুধারাণীর কক্ষে আসিয়া তাহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিল।

'মনে করেছিলে—চিনতে পারবোনা? আমার সঙ্গে নষ্টামি? এ বহুজী মেরা ভুখ্ লাগে হো—বল, বল, আর একবার বল—'

'হাঁ, সুধারাণী, সত্যিই এখনো ক্ষিদে মেটেনি।'

'কেন, সে সন্নিসি তোমার ক্ষিদে মেটাতে পারলেনা? সাধন ভজন, যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, টিকি, হবিষ্যি, গীতা—দাও, সেই সবে মন দাও গে। ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়। আমাদের ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই, বাপু—আমাদের সঙ্গে তর্ক করে ফল কি?' এই বলিয়া সুধা অভিমানভরে আপনাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া লইল।

'সে বেটা ভণ্ড পরে বুঝলুম। আর দেখ, দিনকতক গয়া, কাশী, হরিদ্বার, বদরিকা বিনা খরচায় বেড়িয়ে আসা গেল। কিন্তু তোমার জন্য বড় মন কেমন করতো সুধা! এই দেখ, ভেবে

ভেবে কত রোগা হয়ে গেছি! তুমিও মুখ ফেরালে শেষে?' বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সুধা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, 'ওগো, তুমিও আমায় ভুল বুঝলে? এই যে আশার আলো হৃদয়ের অন্ধকারে জ্বালিয়ে আজ দীর্ঘ আট মাস পথ চেয়ে বসে আছি—'

'তবে আমার ক্ষুধা মেটাও—'

'দুষ্টু'—বলিয়া সুধা রজনীর ওষ্ঠতটে আপনার আরক্ত গণ্ড সংলগ্ন করিল।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

মধুমাসে

আহা—কি সুখে রয়েছ বঁধু মথুরাপুরে?
হেথা—মধুমাস এলো ফিরে গোকুল জুড়ে'।
হেথা—বকুল বনে
হের,—ব্যাকুলমনে
সখা,—উতলা দখিন বায়ু কাহারে ঢুঁড়ে॥

পুন—পিয়াল তলায় মৃগ এসেছে ফিরে
আর—দোয়েল ফিরেছে তার তমাল-নীড়ে।
শুক—শারিকা দুহুঁ
পুন—কূজিছে মুহু
বনে—কুহরি উঠেছে পিক করুণসুরে॥

অই—পাপিয়া ডাকিছে 'পিউ কাঁহা'রে বলি'
কারে—বনে বনে গুঞ্জনে খুঁজিছে অলি।
আজি—ফিরিয়া স্মর
হায়—হতাশ বড়,
তার—নিশিত কুসুম-শর কোথায় ছুঁড়ে?

নব—পলাশ জাগিয়া পুন আলসে ঢুলে,
রাঙা—অশোক সশোকপ্রাণ ঝরিছে মুলে,
চূত—মুকুল দলে
মধু—বৃথাই গলে।
বধূ—যমুনার ঘাট হ'তে কাঁদিয়া ঘুরে॥

হায়—আজি মধুমাসে বুঝি বরষা এলো,
ঐ—গোকুল অকালমেঘে ছেয়ে যে গেল,
রাঙা—আঁখির পুটে
মুহু—বিজুরী ছুটে
কালো—কাজর গলিয়া লোর আঝোরে ঝুরে॥

ওগো—আজি মধুঋতু শ্যাম, সফল কর'
বুকে,—চপল কিশোর, ব্যথা উপল হর'।
সেথা—কি মধু লভি'
বঁধু—ভুলিলে সবি?
হেন—মধুমাসে শুধু-শুধু থেকনা দূরে।

শ্রীকালিদাস রায়

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান*

শিক্ষা জাতীয় জীবন-বিকাশের প্রধান সহায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এই বিকাশের অনুকূল না হইলে জাতীয় জীবন সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র। শিক্ষার উৎপত্তি বিজ্ঞানে; বিজ্ঞানেই শিক্ষার পরিণতি।

বিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান বা অন্য কোন বিজ্ঞান প্রবন্ধের অন্তর্ভূত বিষয় নহে।

প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া মানুষ পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা ইয়ুরোপের অধিবাসিগণ বহুদিন হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন। জর্ম্মানি এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে জর্ম্মানির বিজ্ঞানলব্ধ বল ও কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর দেশ সমূহ এ সম্বন্ধে যাহার যাহা কিছু অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান বলিতে এখন যাহা আমরা বুঝি, তাহার বিশেষ আদর কোন কালেই ছিল না। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার একটা প্রবল চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার সম্যক প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল। তাহা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এত দৈন্য, এত দুরবস্থা।

এই চেষ্টার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান কঠিন অন্নবস্ত্রসমস্যাই প্রধানতঃ ইহার মূলে অবস্থিত। এতদিন পরে লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে চাকরি অথবা ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসা দ্বারা মুষ্টিমেয় মাত্র লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু উহা কোটী কোটী ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এখন আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ভারতবাসীর মরা বাঁচা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে বিষম অন্নবস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে কখন ছিল না। ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যসামগ্রী এদেশে অসম্ভব সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। সেয়ার মুতাক্ষরীণ গ্রন্থের অনুবাদক রেমণ্ড ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে কলিকাতাস্থিত উইলিয়ম্ আর্ম্ষ্ট্রং নামক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

তাহাতে জানা যায় যে নবাব মীর কাসিমের শাসনকালে টাকায় দেড় মণ গম, এক মণ পঁয়ত্রিশ সের চাউল, আধ মণ তেল এবং আট সের ঘৃত কলিকাতায় বিক্রীত হইত। *

অতদিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমরাই দেখিয়াছি যে খাদ্যসামগ্রী এরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল না। আমাদের বাল্যকালে দুই টাকা হইতে নয়সিকায় ভাল চাউল, সাড়ে বার টাকায় সরিষার তৈল, ত্রিশ টাকায় ভাল ঘি, দশ টাকায় পুকুরের রুই মাছ, সাড়ে চারি টাকায় ময়দা, আড়াই টাকায় দাইল এবং পাঁচ টাকায় খাঁটি দুগ্ধের মণ কলিকাতায় বিক্রীত হইত। পল্লীগ্রামে এ সকল জিনিসের দর আরো সস্তা ছিল। এখন কি কলিকাতায়, কি পল্লীগ্রামে, সর্ব্বত্রই এই সমস্ত সামগ্রীর মূল্য ৩।৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ সাধারণ লোকের আয় এই হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসা দ্বারা অল্পসংখ্যক লোকের আয় খুব বেশী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবিগণের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক হইলেও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হিসাবে টাকার মূল্যের হ্রাস এবং নানাকারণে তাহাদের ব্যয় অধিক হওয়ায় তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে নিষ্পীড়িত হইতেছে, ঋণের দায়ে তাহাদের মাথার চুল বিক্রী হইয়া যাইতেছে, মরণের পর তাহাদের পরিবারবর্গ পথে বসিতেছে।

বঙ্গদেশের জমীদারদিগের অবস্থাও সুবিধার নহে। অনেক জমীদারির আয় গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিতে কুলায় না। তাঁহারা অনেকেই ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত। দশশালা বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও তাঁহারা কেবল খাজনা আদায়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহার সুফল মোটেই লাভ করিতে পারেন নাই। জাত্যভিমান ও পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যদি তাঁহারা আধুনিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য যথোচিত উদ্যোগী হইতেন এবং প্রজাগণের উৎপন্ন যাবতীয় কৃষিজাত পদার্থের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিজেরা করিতেন, তাহা হইলে দেশজাত পণ্যের ব্যবসা, বিদেশী বা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের বণিকদিকের একচেটিয়া হইত না; তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রজাগণের গৃহে কমলা চিরদিন অচলা হইয়া থাকিতেন।

দ্রব্য সামগ্রীর মহার্ঘতা ভিন্ন অপর নানা কারণে আমাদের ব্যয় এক্ষণে অনেক বেশী হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অনুচিকীর্ষা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রভাবে আমরা অনেক নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ সকল অভাব অনেকস্থলে কৃত্রিম ও অনাবশ্যক হইলেও অভ্যাসের দোষে এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমরা সেগুলিকে প্রকৃত অভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং তাহার পূরণের জন্য আমাদিগকে অনেক অর্থ অযথা ব্যয় করিতে হয়।

* "It is certain also that when Mir Kasem Khan had brought his Government to bear, the country was well-cultivated (in comparison with the population), that we have seen in Calcutta sixty seers of wheat for a rupee, seventy-five of rice, twenty of oil and eight of Ghee."—*Modern Review, March, 1922, page 309.*

আমাদের দেশের লোক অনেক সময়ে বিস্তর ঋণ করিয়া বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। অনেকেই সেই ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ইহার ফলে আমরা অবশ্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচ সঙ্কুলান করিতে এবং অবশ্যপোষ্য দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে অধিকাংশ গৃহস্থ লোক তাহা বহন করিতে একেবারে অসমর্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য দেশে শিক্ষার ব্যয় আরো অনেক অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ সকল দেশ আমাদের দেশ অপেক্ষা এত অধিক সমৃদ্ধিশালী যে তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ের সহিত ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যয়ের তুলনাই হইতে পারে না। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে গড়ে একজন ইংলণ্ডবাসীর আয় একজন ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা দশগুণেরও অধিক।

অর্থাভাবে আমরা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারি না। প্রায় চারি কোটী ভারতবাসীর একবেলার অধিক অন্ন জোটে না। আরো অধিক সংখ্যক লোক কোন প্রকারে অতি কষ্টে দুই বেলা উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্য দিন দিন হীন হইতেছে, তাহাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং নানাবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কত লোক জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হইয়াছে এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের জাতির অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিতেছেন। ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশের কত জমি কর্ম্মীলোকের অভাবে আবাদশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রকোপে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের আয় দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে বিষম অশান্তি তাহার করাল প্রভাব দিন দিন বিস্তার করিতেছে, অন্নবস্ত্রের কষ্ট তাহার একমাত্র কারণ না হইলেও উহা যে একটী প্রধান কারণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মূলে অন্নবস্ত্রসমস্যা ভিন্ন রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে। আজ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের পবিত্র অঙ্গীকারপত্র যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ড ভারতবাসীকে বিশেষ অধিকার প্রদান করিলেও যতদিন তাহাদের এই ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হয়, ততদিন তাহাদের হৃদয় হইতে অসন্তোষের ভাব দূর হইবে না। তদুপরি জাত্যভিমান বশতঃ অনেকানেক ইউরোপীয়ের ভারতবাসীর

প্রতি সহানুভূতি, বিশ্বাস ও সৌজন্যের অভাব, কার্য্যস্থলে এবং রেলওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের পথে ভারতবাসীর প্রতি অভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি অপর কয়েকটী কারণেও শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেও ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল দোষ মনুষ্যের হৃদয়গত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত। অধিকাংশ মানবের পক্ষে এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা যদি আমাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে বিজিতদিগের সহিত ব্যবহারে আমরাও এই সকল দোষ পরিহার করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রজাকে রাজভক্ত করিতে হইলে এই সকল দোষের মধ্যে একটীও উপেক্ষার বিষয় নহে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত সাধারণ লোকে এখনো রাজনীতির জটিল জালের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বায়ত্ব-শাসন কাহাকে বলে এবং তাহা লাভ করিলে দেশের ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা বুঝিবার বা তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। বাস্তবিক ভারতীয় সাধারণ প্রজাগণ, কে দেশ শাসন করিতেছে, তাহার সংবাদ কখনই রাখিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের ভাত কাপড়ের দুঃখ যদি না থাকে এবং তাহাদের ধর্ম্মগত ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা চিরদিন স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া যে কোন রাজার অধীনে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমান অসন্তোষ অন্নবস্ত্র-সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কতকগুলি লোকের ভ্রান্ত উপদেশে ভুলিয়া তাহারা বুঝিয়াছে যে ইংরাজ-শাসন লোপ পাইয়া দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের অন্নবস্ত্রের কোন কষ্ট থাকিবে না এবং খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এই মিথ্যা আশা ও প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা দেশে অশান্তি বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। আজ যদি কোন উপায়ে চাউল ও কাপড়ের দর কমিয়া যায়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে জনসাধারণের মধ্যে এই অসন্তোষ ও উত্তেজনার বহ্নি এককালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এবং সরকার বাহাদুরের জয় গান করিয়া শান্তভাবে তাহারা পুনরায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে অন্নবস্ত্র-সমস্যার একটা সন্তোষকর ব্যবস্থা হইলে দেশের অশান্তি বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এই কঠিন সমস্যা পূরণের জন্য আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় একটা ঐন্দ্রজালিক উপায় আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে। এই সমস্যার পূরণ সময়সাপেক্ষ এবং ইহার পূরণের একমাত্র উপায়—দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রচার। ইহাই আমার বক্তব্য বিষয়। অদ্যকার অভিভাষণে এই কথা যথাসাধ্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন ভারতবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীকিানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমরা বাংলার ইতিহাসে পড়িয়াছি যে এ দেশে এক সময়ে এত শস্য উৎপন্ন হইত এবং খরচ বাদে এত শস্য দেশে উদ্বৃত্ত থাকিত যে এখানে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভূমির উর্ব্বরতার হ্রাস, ব্যাধির প্রকোপে কৃষকের সংখ্যার ন্যূনতা এবং তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তির হীনতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভ্রাট ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে এখন আর দেশে তত শস্য উৎপন্ন হয় না, এবং বিদেশে শস্যের অবাধ রপ্তানির হেতু উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, দেশের লোকের পেট ভরিবার মত শস্যও দেশে পাওয়া যায় না! এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অর্থনীতি রিসার্চ স্কলার ও ইউয়িং ক্রিশ্চান কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দয়াশঙ্কর দুবে এম্ এ মহাশয় জর্ণাল অব ইকনমিক নামক পত্রিকায় ভারতের অন্নসমস্যা (Indian Food Problem) সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ব্রিটিস্ শাসিত ভারতবর্ষের (দেশীয় রাজ্য বাদে) অধিবাসীগণের পেটভরিয়া খাইবার জন্য ন্যূনকল্পে বৎসরে কত শস্যের প্রয়োজন হয়, বিশেষ অনুসন্ধান ও নানা বিশ্বাস্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি তাহার নির্ণয় করিয়াছেন এবং বিবিধ সরকারি রিপোর্ট হইতে ব্রিটিস্ শাসিত ভারতে বৎসরে কত শস্য উৎপন্ন হয়, বিদেশে কত শস্যের রপ্তানি হয় এবং বিদেশ হইতে কি পরিমাণ শস্যেরই বা আমদানি হইয়া থাকে, তাহার একটী বিবরণী প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিস ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা সাড়ে চব্বিশ কোটী ছিল। ইহার মধ্যে ৮ কোটী ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের স্বচ্ছন্দে ভালরূপে আহার করিবার সুবিধা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের দেশজাত শস্য হইতে যথা প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের অসুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার গণনামতে ঐ বৎসর (ইংরাজাধীন) ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জন্য ১৭৩ কোটী ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে বৎসর ১৪৭ কোটী ৯৬ লক্ষ মণ মাত্র শস্য দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতবাসীর অবশ্য প্রয়োজনীয় শস্যের পরিমাণ অপেক্ষা ২৫ কোটী ৭৩ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্য কম ছিল। এইরূপে ১৯১১ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর যে পরিমাণ শস্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবাসীর আহারের জন্য ঐ ঐ বৎসর যে পরিমাণ শস্যের আবশ্যক ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই ২৫ হইতে ৩০ কোটী মণ শস্যের অকুলান হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে যথাপরিমাণ শস্যের অভাবে শতকরা ৬৪ জন লোক, স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার ও কার্য্যক্ষম থাকিবার জন্য তাহাদের প্রত্যহ যে পরিমাণ শস্যের অবশ্য প্রয়োজন, তাহা তাহারা পায় না, তাহা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ শস্য কম পাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"From the above study, we are forced to the conclusion that even in the best year from an agricultural point of view (*i. e.* 1916—17) and even with restricted exports of foodgrains to foreign countries due to the war, so many as 160 millions of people in that year were in a position to get only 79 per cent of the coarsest kind of foodgrains to maintain them in health and strength; and in a famine year (1913—14), the percentage fell to such a low figure as 62. Taking an average of all the seven years (1911—1917), it will be seen that 64·6 per cent of the population lives always on insufficient food, getting only about 73 per cent of the minimum requirement for maintaining efficieny. In other words, it clearly shows that two thirds of the population always get three-fourths of the amount of foodgrains they should have.'

"The above conclusions are in full accord with the experience of those who have carefully observed the conditions of the living of the Indian masses in their own villages; and they unmistakably show, as nothing else can, the urgent necessity of taking in hand, and in right earnest, the problem of agricultural improvement along right lines, to help the Indian cultivators to raise two blades of corn where one."—*A Study of the Indian Food Problem by Daya Sankar Duby, M. A.*

যতদিন ইহার প্রতিবাদ না হয়, ততদিন আমরা অধ্যাপক দুবে মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব।

এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন, সুসঙ্গত ও সময়োপযোগী। তিনি বলিয়াছেন যে, যেখানে কৃষকগণ এখন শস্যের একটী মাত্র শীষ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে, সেখানে যাহাতে দুইটী শীষ জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ ভিন্ন এ বিষয়ে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।

ভূমির উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিসাধন, বিভিন্ন প্রকার " সার " প্রস্তুত ও তৎপ্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, বীজের উন্নতি এবং বিবিধ ব্যাধি ও কীটাদি শত্রুর হস্ত হইতে শস্য ও বীজরক্ষা, ভূমিকর্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন, ক্ষেত্রে জল-সেচনের সুব্যবস্থা, পর্য্যায়রোপণ, অল্প জমিতে অধিক শস্যের উৎপাদন, নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বারা দেশজাত ফল শস্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রয়োজনীয় বিদেশী উদ্ভিদের প্রজনন ইত্যাদি কৃষি-সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। গতানুগতিক ভাবে কার্য্য করিলে আমরা এ বিষয়ে কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিব না।

যাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের কৃষকগণের কৃষিসম্বন্ধে শিক্ষা করিবার বিষয় কিছুই নাই, আমি তাঁহাদের মত ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে কৃষিকার্য্য করিয়া ভারতের বাহিরের অনেক দেশ অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহামতি বার্ক্ আমেরিকার পুনর্মিলনের আবশ্যকতা দেখাইয়া নূতন মহাদেশের কৃষিসম্পদের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"I now pass to the Colonies in another point of view, I mean their agriculture. This they have prosecuted with such vigour that, besides feeding plentifully their own growing multitude, they exported 20 millions tons of rice to the motherland. England was to have suffered from a desolating famine had not this child of her old age with a truly Roman charity, put her useful breast into the mouth of her exhausted parent." *Burke's Speech on the Reconciliation with America.*

এই উক্তির পর ১৪৭ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বার্কের সময়ে কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব বেশী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই সকল দেশের নিকট ভারতবর্ষের এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার যথেষ্ট অবসর আছে। অষ্ট্রেলিয়া পশুপালন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাংসের সরবরাহ করিতেছে। মাংসের জন্য তাহারা যত পশু মারিতেছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে পশু পালন করিয়া পশুর সংখ্যা তাহার দশগুণ বৃদ্ধি করিতেছে। আমেরিকার এত ফল ও শস্য উৎপন্ন হয় যে প্রয়োজন মত খাদ্য সামগ্রী দেশে রাখিয়া ঐ দেশ অর্দ্ধেক জগতের খাদ্যের অভাব মোচন করিতেছে। হলণ্ড, ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি দেশ বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে কৃষিকার্য্য ও গো পালন করিয়া কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি উৎপাদন সম্বন্ধে অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছে। আমরা এ সকল সংবাদ জানিয়াও যদি বলি যে ভারতবাসী কৃষকদিগের কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে জানিবার কিছুই নাই, চিরদিন যে প্রণালীতে তাহারা কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, তাহা হইলে আমাকে বলিতে হয় যে আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ এবং আমাদের উন্নতিশীল অন্যজাতির সমকক্ষ হওয়া, এখনও বহুদিন সাপেক্ষ।

বোম্বাইয়ের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার কীটীঙ্গ সাহেব সম্প্রতি এ দেশের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি লিখিয়াছেন যে যদিও বোম্বাই প্রদেশে বর্ত্তমান সময় বেশী জমি চাষ করা হইতেছে এবং ঐ দেশের প্রায় সমস্ত জমির উদ্ধার হইয়াছে, তথাপি কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বিঘা প্রতি কিছুমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালী সামান্যভাবেও প্রয়োগ করা গিয়াছে, সেই খানেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কিছু বেশী দেখা গিয়াছে। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"It is disappointing to have to record at the outset that no general or striking progress comparable with other lands, has occurred. Statistical information, for instance, does not prove that the out-turn of any particular crop per acre has increased by a definite percentage. On the other hand, a steady increase in cultivation has taken place during the last 30 years, until at present, there is no land fit for cultivation which is not occupied and the value of agricultural land has largely increased. So also has the value of the produce. More irrigation-wells are in use and rainfall is sometimes carefully caught. Yet it must be admitted that the existing methods of agriculture sometimes skilful, sometimes careless, usually unnecessarily laborious, show little change or progress."

"There are nevertheless certain improvements which have slowly and in some cases almost imperceptibly been adopted, instances being the introduction of iron ploughs in place of the old wooden ones and progress also in matters relating to seed, manure and the prevention of plant diseases. It may be pointed out that the progress here achieved has been due to the influence of scientific propaganda." *Agricultural Progress in India by G. Keatinge I. C. S, C. I. E.*

কৃষকগণকে "হাতে কলমে" উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিখাইতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" স্থাপন করিতে হইবে। সকল প্রদেশেই স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সাধারণ কৃষকগণ এই সকল স্থানে আসিতে সহজে স্বীকৃত হয় না এবং অনেক স্থানে তাহা সম্ভবপর নহে। তদুপরি এখানে খরচ বেশী হয় বলিয়া ঐ সকল প্রণালী অবলম্বন করা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। ৫।৭ খানি গ্রাম একত্র করিয়া তাহার মধ্যে যদি এক একখানি ছোট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা যায় এবং কৃষকদিগের অবস্থা বুঝিয়া অল্প খরচে তথায় হাতে কলমে উন্নত প্রণালীতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক কৃষকই ইহাদ্বারা লাভবান হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। নব প্রতিষ্ঠিত ভিলেজ্ ইউনিয়ন্ (Village Union) গুলি এই কার্য্যের ভার লইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। "সার", কৃষিযন্ত্র, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইতে যাহাতে কৃষকেরা সহজে ও অল্প খরচে পাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন; তাহা না হইলে তাহাদের শিক্ষা তাহারা কাজে লাগাইতে পারিবে না। বীরভূম জেলায় এই ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে এবং অল্পদিনের মধেই ইহার বিশেষ সুফল দেখা গিয়াছে। অন্যান্য জেলার লোকের বীরভূমের আদর্শ অবলম্বনপূর্ব্বক এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা যে গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা নহে; এ বিষয়ে দেশের জমিদারগণ প্রজাগণের প্রকৃত নেতাস্বরূপ। প্রজাদিগের শিক্ষা, সাংসারিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্রসম প্রজাগণের হিতার্থে যাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এতদিন তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। অনেক জমিদার জমিদারী ছাড়িয়া সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সহরে স্থায়িভাবে বাস করিয়া থাকেন; প্রজাদিগের অবস্থাও তাহাদের সুখ দুঃখের কথা স্বচক্ষে দেখিবার এবং স্বকর্ণে শুনিবার অবসর তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। আজ স্থানে স্থানে প্রজাগণ জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইতেছে, তাহার জন্য জমিদারগণই প্রধানতঃ দায়ী। এখনও যদি তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে বিরোধ দূর হইয়া উভয় পক্ষের এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়সমূহে কৃষিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ের নিকটে জমী লইয়া প্রত্যেক কৃষকবালককে উন্নত প্রণালীতে নিত্যব্যবহার্য্য ফসলের "পাঠ" হাতে কলমে শিখাইয়া দিতে হইবে এবং যাহারা তথায় ভাল ফসলের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগের জন্য যথোচিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটু চেষ্টা ও সামান্য অর্থ খরচ করিলেই পল্লীগ্রামের নিম্ন ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষা সুচারুরূপে প্রদত্ত হইতে পারে। বঙ্গদেশের অনেক প্রবেশিকা বিদ্যালয়ও এই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।

আজ কাল জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা (Vocational Education) সম্বন্ধে দেশের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সলার মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষাবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বাংলার সমগ্র প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের কমিটীর অধ্যক্ষগণের একটী সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা যে কেবল পুথিগত বিদ্যা হইতেছে এবং জীবন-সংগ্রামের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপায় হইতেছে না, সে বিষয়ে সমিতির সভাবৃন্দের মধ্যে মতভিন্নতা ছিল না। এই সমিতির সভাপতি সার আশুতোষ বলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা বালকদিগের মতিগতি কেবল চাকরির দিকেই ধাবিত হইতেছে। চাকরির বাজার যেরূপ, তাহাতে যাহারা এম্ এ পাশ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। বালকগণ স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, তাহা জানে না। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর প্রশস্ত পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের ছাত্রগণকে কেবল পণ্ডিত-মূর্খ করিলে চলিবে না ; লেখাপড়ার সহিত তাহাদিগকে হাতে কলমে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে। *

যে দুইটী প্রধান বিষয় এই সমিতিতে আলোচ্য ছিল, তাহার একটী—(১) প্রবেশিকা বিদ্যালয়সমূহে কোনরূপ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচলন—এবং অপরটী—(২) সাধারণ শিক্ষার সহিত কোন না কোনরূপ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। সমবেত সভ্যগণ সকলেই প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন না কোনরূপ শিক্ষাপ্রচলনের

* "What is the mental attitude of the students at the present moment ?—*Service* and nothing else. The market value for the Matriculation is Rs. 15 or 20, for the Intermediate Rs 25 or 30, for the B. A. Rs 40, for the M. A. Rs 50, 60 or 70. They are not able to take care of themselves. Education has been purely literary. It does not fit them even to get a "service". It is not a moment too early to give our students this composite training—*literary* plus *vocational*"—*Sir Asutosh Mookherjee's Speech on the 12th. June, 1921.*

পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৮৮৫ প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪৭১টী বিদ্যালয় এখনই কোন না কোনরূপ বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা প্রচলন করিতে প্রস্তুত; অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি অর্থের সুবিধা হইলেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ৮৮৫টী বিদ্যালয়ই অবিলম্বে সামর্থানুযায়ী কোন না কোনরূপ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই দুইটী বিষয় ছাড়া, (৩) ইংরাজী ভাষা ব্যতীত অপর সকল বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা ছাত্রের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া হওয়া সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হইয়াছিল। দুই চারিটী বিদ্যালয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে দেশের লোকে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছে এবং আমাদের দেশের ছাত্রগণের বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান-শিক্ষা যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে ছাত্রদিগের মধ্যেও বিদ্রোহভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে পল্লীগ্রামের অনেকানেক বিদ্যালয় কৃষি শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমাদিগের কর্ম্মজীবন নূতন পথে চালিত হইবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐকান্তিক চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা আবার মানুষ হইয়া উঠিতে পারিব।

কিন্তু কেবল সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আশানুরূপ ফললাভ হইবে না। এই শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক। পুণা, পুসা, সাবর প্রভৃতি স্থানে কৃষিশিক্ষার জন্য কয়েকটী কলেজ ও স্কুল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এত দিন এই সকল বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ সহজে প্রবেশ করিতে স্বীকার পাইত না। জাত্যভিমান্ ও বংশমর্য্যাদাবশতঃ উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকে বালকগণকে কৃষিশিক্ষার জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আপত্তি করিতেন। কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যবসা, কৃষি বা পরিশ্রমের কোন কাজ যে অসম্মানসূচক নহে, ইহা অনেক লোকের ধারণা হইয়াছে। জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যা যতই কঠিন হইতেছে, দেশের মধ্যে শিক্ষা যত অধিক পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে, এ সম্বন্ধে অভিমান ও কুসংস্কার লোকের হৃদয় হইতে দিন দিন ততই দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রে (Experimental Farm) ধান্য, ইক্ষু, তুলা, গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে এবং রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিবিধ 'সার' সংযোগে, যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা দেশের লোক যাহাতে বিস্তৃতভাবে জানিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করার বিশেষ আবশ্যক। আমাদের দেশে

এখন স্থানে স্থানে কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপলক্ষে দেশের ফসল, এবং কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পজাত পদার্থ এবং গো মহিষাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদিগের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ, বিবিধ কৃষিযন্ত্র, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি সাধারণের গোচর করিবার জন্য এই স্থানে আনয়ন করেন। লোক-শিক্ষার ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। সেদিন রাঁচিতে এইরূপ একটী কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিহার গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত কাঁকে কৃষিক্ষেত্র হইতে ইক্ষু, গম, তুলা, গুড় প্রভৃতি বিবিধ কৃষিজাত পদার্থ এবং উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত কৃষিযন্ত্র এইস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনেক কৃষককে কৃষিকার্য্য ও গো মহিষাদি পালনে দক্ষতা দেখাইবার জন্য বিস্তর নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। আমি এই প্রদর্শনীর কার্য্য দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। এই সকল স্থানে অনেক কৃষক একত্র সমবেত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্টের, দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে কৃষিশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে আয়ব্যয় তালিকা (Budget) সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণী পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্ব বৎসরে কৃষি-বিভাগের উন্নতির জন্য যে টাকা বজেটে মঞ্জুর ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা খরচ করেন নাই। ধান ও পাটের উৎকৃষ্ট বীজ কৃষকগণকে সরবরাহ করিবার জন্য বজেটে ৬৬০০০৲ টাকা এবং নূতন আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের বাবদে ৫০০০৲ টাকার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কৃষি বিভাগের মন্ত্রী সে টাকা ঐ বৎসরে একেবারেই খরচ করেন নাই। কেন যে খরচ করা হয় নাই, তাহার কারণ জানিতে পারা যায় নাই। ঐ বৎসরে ঐরূপ খরচের আবশ্যক ছিল না, এ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ এ সকল বিষয়ে আরও বেশী খরচের প্রয়োজন, ইহাই আমাদের ধারণা। এ সম্বন্ধে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য কর্ণেল পিউ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Under agricultural experiments, we gave Rs. 66000 to the Minister for provision of the distribution of improved paddy and jute seeds. Not a single pice seems to have been spent. We gave him at his special request Rs. 5000 for provision to the establishment of five new farms. Not that nothing has been done or spent, but the Minister seems to have abandoned the idea of having any more new farms, for he has asked for no provision in the Budget."—*Col. Pugh's speech reported in the Indian Daily News of the 27th. February 1922*

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির অধীনে এক একটি কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং কৃষি শিক্ষায় পারদর্শী ছাত্রগণের জন্য বি এস্‌সি, এম্ এস্‌সি প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কৃষি-বিদ্যার সহিত পশুপালন অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য গো-মহিষাদির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এদেশের অধিকাংশ স্থানেই এই সকল পশুদিগের শারীরিক দুরবস্থা ও জাতিগত অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বাহিরে অনেকানেক দেশের গোধন এদেশ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক। পশুদিগের শারীরিক দুরবস্থার প্রধান কারণ যে কৃষকদিগের দারিদ্র্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কারণও ইহার মূলে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। পশুপালন একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এ বিষয়ে যথারীতি শিক্ষা দিবার জন্য বিস্তর স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাহাদিগের আরোগ্যকল্পে এবং সুস্থতায় পশুগণকে ঐ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, আমাদের দেশের কৃষকগণ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে। সুতরাং কোনরূপ গোমড়ক উপস্থিত হইলে তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত ভেটেরিনারি স্কুল ও কলেজ দ্বারা এই বিপদ নিবারণকল্পে বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছে। পশু-চিকিৎসা শিখিবার স্কুল ও কলেজ আমাদের দেশে আরো বেশী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক লোক বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলে দরিদ্র ভারতবাসীর একমাত্র সম্বল গোধন অকালমৃত্যু এবং জাতিগত ও স্বাস্থ্যের অবনতি হইতে রক্ষা পাইবে।

গোজাতির জাতিগত উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, বংশবৃদ্ধি, তাহাদের খাদ্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় পালনের অন্তর্ভূক্ত এবং প্রত্যেকটীর উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই শিক্ষা দেশের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হওয়া অবশ্যক।

দুগ্ধ এবং দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতাদি ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। গোজাতির সংখ্যার হ্রাস, স্বাস্থ্যের অবনতি এবং অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান সময়ে দেশে দুগ্ধের বিশেষ অভাব হইয়াছে। সহর অঞ্চলে খাঁটী দুগ্ধ প্রায় মিলে না, মিলিলেও তাহা এত মহার্ঘ যে সামান্য অবস্থার লোক তাহা ক্রয় করিতে একেবারেই অসমর্থ। দুগ্ধের অভাবে আমাদের দেশের লোক দিন দিন স্বাস্থহীন হইতেছে। বড় বড় সহরে দুগ্ধের অভাবই শিশুদিগের অকালমৃত্যুর একটী অন্যতম কারণ। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর মজ্জাগত দৌর্ব্বল্যের কুফল জাতি-জীবনে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই একই কারণে দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ঘৃতাদি পদার্থ সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দুগ্ধ-সমস্যা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যৌথ কারবার রূপে দেশের নানা স্থানে ডেরি (Dairy) স্থাপিত না হইলে এ দেশে দুগ্ধ সমস্যার সন্তোষকর পূরণ সম্ভবপর নহে। দুগ্ধ কেবল খাটী হইলেই চলিবে না, উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অথাৎ সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আমি অন্য স্থানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

অন্যান্য দেশে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্য সমবায়প্রণালী মতে (Co-oprative System) সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। সমবায় প্রণালী মতে অল্প সুদে অর্থ সাহায্য করিয়া মহাজনের কবল হইতে শ্রমজীবি ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দেশে অনেক স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রণালী মত কার্য্য সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের সাধারণ লোক ইহার উপকারিতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে এবং ইহা অল্পদিন প্রতীত হইলেও বিশেষভাবে সুফল প্রসব করিয়াছে। কৃষি, প্রভৃতি কার্য্যে সমবায় প্রণালী আমাদের দেশে যাহাতে বিস্তৃতভাবে অবলম্বিত হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া ও সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য দেশে সমবায় প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার বিশেষ আবশ্যক।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীচুণীলাল বসু

হারানো খাতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি-ঝরি,—আঁখিজল,
—তীর্থরেণু

এর পর হইতে নিরঞ্জনের একটু একটু করিয়া কপাল ফিরিল। কর্ত্তার প্রিয়পাত্র হওয়ার অপরাধে সে বেচারার ঔষধ, পথ্য, সেবা কিছুই সমুচিতরূপ জুটিত না, এখন কর্ত্রীর স্নেহলাভ ঘটিয়া, তাঁহার খোঁজখবর লওয়ার গুণে সে বেচারা রাজভৃত্যবর্গের হাত এড়াইয়া কিছু কিছু সত্য সত্য ঔষধ-পথ্য লাভ করিতে থাকায় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সহজেই শরীরে বল পাইতে লাগিল। এমনই করিয়া কিছুদিন গেলে, একদিন নরেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বলিল, "এখন তো আমি সেরে উঠেছি, আজ্ঞা করেন তো এবার যাই।"

নরেশচন্দ্রের মুখে একটা সুগন্ধি সিগারে আগুন জ্বলিতেছিল, সজোরে সেটাতে একটা টান দিয়া, সেটাকে দুই অঙ্গুলি মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া, মুখ মধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি বাহিরে মিশাইয়া দিয়া, তিনি ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার

একটুখানি যে উষ্মা জাগিয়াছিল, তাহা ঐ নিষ্প্রভ মধ্যাহ্নসূর্য্যে ত্রিপাদগ্রাসী গ্রহণ লাগারই ন্যায় প্রভাহীন মুখখানার প্রতি চাহিতেই ক্ষণমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল ; তথাপি হয়ত একটু কঠিনস্বরেই বাহির হইয়া গেল,—“ কেন, এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই ? ”

কথাটা বোধ হয় শ্রোতার পক্ষে একটু বেশীই কঠিন হইয়া থাকিবে। কারণ, ইহা কাণে যাইবা-মাত্র সে যেন বেত্রাহতের মতই চম্‌কাইয়া এক পা পিছাইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দিবার শক্তিই বোধ করি তাহার রহিল না। স্বল্পপরে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া যখন কি বলিতে গেল, ততক্ষণে নরেশচন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজেই লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া উগাতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়াই সেটা শোধরাইয়া লইলেন। তিনি সদয়কণ্ঠেই কহিলেন “ আমার বাড়ীর চাকরগুলো বুঝি আবার তোমার সঙ্গে লাগতে আরম্ভ করেচে ? বদমায়েসের ধাড়ী সব !—”

নিরঞ্জন কহিল “তা'দের কোন দোষ নেই।—”

নরেশ কহিলেন, “তবে কা'দের আছে তাই শুনি।”

মৃদু অপরাধীভাবে নিরঞ্জন পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলা দুষ্কর বুঝিয়াও বলিয়া ফেলিল, “ চিরদিনই কি আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো ?”

নরেশ পুনশ্চ ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ তা হলে কি করবে শুনি ? ”

কি করিবে ? কই এ কথা তো নিরঞ্জন একবারটীও ভাবিবার আবশ্যক বোধ করে নাই ? কি করিবে ? কেমন করিয়া চলিবে ? এই যে সব অতি সহজ প্রশ্ন, সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ লোক-গুলার মনের ভিতর অহোরহঃই তোলাপাড়া চলিতেছে, এই লোকটীর মনের খাতার পাতা হইতে ঠিক ঐ কথাটাই যেন আজ বহুদিন যাবৎ নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছে। এই সোজা সরল প্রশ্নটাই যে সে নিজের মনের কাছে কোন মতে আর উত্থাপন করিতে পারে না,—এমনকি, অপরে করিলেও যেন কতকটা ভীত হয়। কিন্তু নরেশচন্দ্রের এই কথাটারই বলিবার ভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে সে যেন আজ একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল। যে কথার উত্তরের পুঁজি তাহার নাই, তাহারই জন্য বৃথা চেষ্টা সে করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেশচন্দ্র একটু শ্লেষের ভাবে কহিলেন ; “ আবার সেই রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে পড়ে মরবার প্রতীক্ষা করবে বোধ হয় ?”

তারপর ইহাতেও কোন উত্তর আদায় করিতে না পারিয়া একটু উত্তেজিত বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, “ বলি, পরের সাহায্য নিতে এতই যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা'হলে একটা চাকরী বাকরী করলেও তো হয়। ‘ গলগ্রহ’ হবার দরকারই বা হতে যায় কেন ?”—

নিরঞ্জন এবার কথা কহিল, বলিল,—“দু'একবার চাকরী করেছিলেম,—মধ্যে মধ্যে আমার মাথার ঠিক থাকে না কিনা, একবার সেই অবস্থায় যে আফিসে কাজ করতেম তার কি কাগজপত্র নাকি নষ্ট করে ফেলি, তাতেই তারা বিদায় করে দেয়। আরও একবার একটি উকিলের মুহুরীর

কাজ পেয়েছিলাম ; কিসে নষ্ট হয়—তা ঠিক মনে নেই,—হয়ত বেশী অসুখ করেছিল, কারণ যখন থেকে মনে আছে তখন আমি হাঁসপাতালে ছিলাম।"

এই উত্তর পাইয়া নরেশ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, তারপর হাত দিয়া অদূরবর্ত্তী বাগানের একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন "এসো, ঐখানে বসে একটু কথাবার্ত্তা কহা যাক্।"—এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে আসন লইয়া পুরাতন আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, "আচ্ছা শেষ চাকরী যে করেছিলে সে কতদিন হ'লো ?"

নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিয়া উঁহার কথার উত্তর দিল "একবৎসর পাঁচ মাস পূর্ব্বে।"

"এই একবৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে আর কোন কর্ম্ম কাজই করোনি ?"

নিরঞ্জন নিরুত্তর রহিল। পরে কহিল, "তিনমাস হাঁসপাতালে থাকিবার পর সেখান থেকে বেরিয়ে চেষ্টা অনেক করেছিলেম, আমার এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য, এ দেখে সহজে কেউ চাকরী দিতেই চায় না। ও দুটী যে পেয়েছিলেম সেও অনেক কষ্টে।"

নরেশচন্দ্রের পূর্ব্ব-বিরক্তির সবটাই যেন এক মুহূর্ত্তে ঘোরতর অনুতপ্ত লজ্জায় গলিয়া পড়িয়া জল হইয়া গেল, নিজের হাত দিয়া ক্ষতচিহ্নিত শীর্ণ একখানা হাত সযত্নে ধরিয়া স্নেহকরুণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আমি তোমায় যদি চাকরি দিই ? তা'হলে তো তুমি আর 'যাই যাই' করবে না ?"—তারপর তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া সোৎসাহে কহিলেন, "আর ইতস্ততঃ করো না ; সেই বেশ হবে, কেমন না ?"

নিরঞ্জন যুক্তকর নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়া গাঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ তাই যাওয়ার কথা তুলেছিলেম। আপনার সেবা চিরদিন ধরে আমার আপনা হ'তেই যে করতে চাওয়া উচিত ছিল।"

এই উত্তরে নরেশচন্দ্র একেবারে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই শিশুর মত সুউচ্চ হাস্য ধ্বনিতে, পার্শ্ববর্ত্তী ঝুমকালতার বিতানমধ্যে যে একটা পালিত হরিণ কচি ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিবিষ্ট ছিল সেটা চকিত হইয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। তিনি ইহা আমলেই না আনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "দেখ ভাই নিরঞ্জন! এখন ওসব ফ্যাসান উঠেছে বটে, আর অনেক গ্রাজুয়েট দোকানদার,—গ্রাজুয়েট কুলির কথাও শোনা গেছে ;—কিন্তু গ্রাজুয়েট সেবক নিয়ে আমি তো ভাই মারা যাব। না! ওসব সেবা টেবা নয়। তার চেয়েও একটা বড় শক্ত কাজে আমি তোমায় জুড়ে দেবো মনে করেছি। দেখ, তখন কিন্তু মনে মনে আমায় গাল দিওনা ভাই,—"

নিরঞ্জনের স্বাভাবিক ম্লান ও বিমর্ষ মুখে ঈষৎ হাসির তড়িৎ চমকিয়া গেল। সে কহিল, "আমায় আপনি যা করাবেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।"

নরেশচন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, "দেখা যাবে নিরু, সেখানে অনেক বড় বড় হাতি তলিয়ে গেছে। সে বড় বিষম ঠাঁই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবৈভব, হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে ;
কখন তোমার, কখন আমার স্থির নয় কারো ঘরে।

তীর্থরেণু

নিরঞ্জন এ বাড়ীতে থাকিয়া গেল। শুধু থাকাই নয়—বাড়ীর আশ্রিত হিসাবে নহে,—কর্ম্মচারী হিসাবে যে রহিল সে সংবাদটাও উহ্য রহিল না। তা এ সমাচারটা গোপন না থাকাই শুভফলপ্রদ হইয়াছিল। যতক্ষণ কপর্দ্দকহীন ভিখারী নিরঞ্জন এই সুবিপুল রাজবাটীর একটি প্রান্তে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, ততক্ষণই তাহার ঔষধপথ্য সেবার সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পাইয়াছে। কিন্তু এখন তো আর সেই দীনাতিদীনাবস্থা নিরঞ্জনের থাকিতেছে না, তাই সংসার ক্ষেত্রেও তাহার মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট হিসাবে স্থির হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে তেমন করিয়া অযত্ন অগ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা নিশ্চিত! কারণ এখন হইতে তাহার কাছে মাস কাবারে মাঝে মাঝে কিছু বখশিষ চাহিলে পাওয়া যাইতে না পারে এমনও নয়। আবশ্যক অনাবশ্যকে দু-এক টাকা কর্জ্জ লইয়া সুদ তো নয়ই, শোধও না দিলে চলিয়া যায়।—ইত্যাদিরূপ অনেক সুযোগ পাওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গতই বা এমন কি ? বামুন ঠাকুরের দল প্রথম এই খবরটা শুনিয়া দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে নাসিকা অনেক উচ্চে তুলিয়া প্রচলিত ছড়া কাটিয়া—'যত ছিল নেড়া-বুনে, সবাই হলো কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খন্তাল।'—ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গহাস্যে রান্না-মহলটা ফাটাইতে চাহিলেও—পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি মাথায় ঢুকিয়া শীঘ্রই তাহাদের পাকা মন্ত্রীর মত গম্ভীর করিয়া আনিল।

হারাধন বলিল, "তা যাই বল, আর যাই কও সর্ব্ব-ঠাকুর, মুখ পোড়াটা এদিকে লোকটা ভাল আছে, ওটাকে হাতে রাখতে পারলে মন্দ হ'তো না।"

অম্নি সকলকারই মাথায় চট্ করিয়া ফন্দিটা খাটিয়া গেল। সর্ব্ব-ঠাকুর হারাধনের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্‌রে হারু, পোড়ামুখোটা হাঁদা গোছের আছে, কে জানে ওটার অমন পাতা চাপা কপাল! ভিক্ষে করতে এসে যে সভাপণ্ডিত হয়ে বসবে তা'কি ছাই জানি, তাহলে কি গোড়া থেকে অমন করে তুচ্ছ করতে যাই ? আহাহা, বড় ভুলটাই হয়ে গেছেরে! এখন যে হাতে কামড়াতে ইচ্ছে করচে!"

হারাধন মুখ সিটকাইয়া কহিল, "বামনাই বুদ্ধি এম্‌নিই বটে! তুচ্ছু করেচি তো হয়েচে কি ? আজ থেকে অ-তুচ্ছ করতে লেগে যাওনা কেন! ওর যদি অত কথার হুঁস থাকবে, তাহলে পাতে বসে তিনটে বেরালে ভাগ বসায় ? দেখতে পাওনা কি রকম যেন আলাভোলা।"

সর্ব্ব-ঠাকুর নরসুন্দর-নন্দনের এ যুক্তিটাকেও সমীচীন বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সায় দিয়া

বলিয়া উঠিল, "তা বটে! তা হ্যাঁরে হারু, ও মানুষকে আবার রাজাবাবু কি চাকরী দেবে বল্ দেখি? ওই তো রূপ আর ওই তো বুদ্ধি!"

হারাধনের পূর্ব্বেই বাবুর খাস খানসামা ইহাদের চেয়ে পুরাতন দলের সাতকড়ের সেখানে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, এবং তাহার কাণেও সর্ব্ব-ঠাকুরের শেষ প্রশ্ন ও মন্তব্যটা প্রবেশ করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তীব্রব্যঙ্গে ইহার একটা উত্তরও দিয়া দিল, বলিল—"আমাদের রাজা সাহেবের ভাত পেটে পড়্লে, অনেকেরই পোড়া রূপ তাজা হয়ে ওঠে; সে তোরা না দেখে থাকিস্ না দেখ্তে পারিস্; এই সাতকড়ের সবই দেখা আছেরে! অনেক জানোয়ার আছে যারা উঁচুতে উঠ্তে পেলেও, তাদের নজর উপরের দিকে উঠতে চায় না। জানোনা, আমাদের মুনিবেরও যে ঠিক সেই দশা!"

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষরূপ গোপন ইঙ্গিত নিহিত ছিল, সে তত্ত্বের সন্ধান এ বাড়ীর চাকর দাসীদের কাহারও কাছেই অজ্ঞাত নয়, তা সে যতই নূতনআসা লোকই কেন হোক না। তা সেই কথাটা স্মরণ করিয়া সকলেই একটু একটু তামাসার হাসি হাসিয়া লইল। রান্নাঘরের ঝি পেঁচোর মা বলিল, "ঠিক বলেছিসরে সেতো! সত্যি— বলি, বড়লোক তুমি, বড়লোকের মতন রুচি হয় না কেন? এদিকে তো শুনেচি কত বড় বড় লোক রূপসী-রূপসী মেয়ে নিয়ে দোরে বসে সাধাসাধি করেছে, তা সে সব তখন চক্ষের কোণে তুল্লেওনা, একটা কোথাকার বাইজী না কি, মোছলমান না য়িহুদী তাকেই নিয়ে মাথার মণি করে রাখলে। তারই জন্যে ঘর বাড়ী, সোনাদানা, গাড়ী পাল্কি; তা সেও নয় বুঝলুম অনেক বড় লোকের ছেলের অমন হয়েই থাকে, তা ওতে তাদের অত কেউ দোষ ধরে না। হয় তাই নিয়েই থাক, না হয় ও যা আছে তা' আছে, ওর সঙ্গে একটা বড় জমিদার রাজা টাজার ঘর থেকে বউ করে নিয়ে আয় যে পাঁচজনে দেখে ধন্যি ধন্যি করুক। পাঁচটা তত্ত্ব তাবাস আসুক যাক্, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আনাগোনা করুক। আমরাও গরীব দুঃখী—দুটো পয়সার প্রত্যাশা করে না এসেছি এই বড় মানুষের দোরে, তা পাই না হয় টাকাটা সিকেটা! ওমা, এ কোথাকার একটা পথেকুড়ুনো মেয়ে ধরে এনে কি না তাকেই একেবারে রাজ্যিপাটে বসিয়ে দিলে! ঘুঁটেকুঁড়ুনী হলেন পাটরাণী। অবাক্ কাণ্ড!"

সকলেই মুখ মুচকিয়া হাসিল। সাতকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই আবার 'অবাক কাণ্ড'র দেখলি কিরে মাগি! যে অমন করে গালে হাত দিয়ে বস্লি? সে যদি কেউ দেখে থাকেতো সে এই ঘোষের পো সাতকড়ে। সে এক অজ পাড়াগাঁ, দিনের বেলা সেখাকার জঙ্গলে হুয়া হুয়া করে শেয়াল ডাকে, রাতের বেলা প্রাণটী হাতে নিয়ে পিদীমটী সামনে করে সারারাতটি জেগে কাটাতে হয়,—কি না কখন বাঘ এসে ঘাড়ের রক্ত না চুসে খেয়ে যায়! ভাঙ্গা চোরা দরজা গুলো ভররাত নেকড়ের বাচ্চারা এসে ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ করে নাড়া দিয়ে যাচ্চে। বাব্বাঃ! সে কি দেশ, না সে দেশে কোন ভদ্দর নোকের ছেলেয় পা দেয়? তা আমাদের বাবুর সকলি কি না বিপরীত কাণ্ড! ওনার বাপ পিতামহদেরও বোধ করি

ওঁরই মতন রুচিপ্রবৃত্তি ছিল, তাই সেই দেশে গেছলেন জায়গা জমি কিনতে। তা ভাই, তাই বা বল্‌বো কি বল্? শুনেচি—সেখানের একটা বুড় প্রজার মুখেই শোনা—ওঁর ঠাকুদ্দা নাকি বড্ডই গরীব ছিল, ওই অঞ্চলেরই কোন্ এক বড় লোকের বাড়ী নাকি সে গোমস্তাগিরি করে খেতো। তারপর ওরই হাত দিয়ে কি রকম করে গোলমাল হয়ে নাকি তাদের ওই সব জমিদারী লাটে চড়ে যায়, আর বেনামীতে ও নিজেই নাকি সেই সব কিনে নেয়। এত বড় অধর্ম্মে লোক ওরা!"

শ্রোতৃবৃন্দ মহোৎসাহে সাতকড়ির গল্প শুনিতেছিল। শ্রোতারদলের মধ্য হইতে পেঁচোর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তা হ্যাঁগা, ওদের সেই জমিদার মুনিবের কি হলো গা? তারা বোধ করি খুব গরাব হয়ে গেল? তাদের এখন কে আছে?"

"শোন একবার ন্যাকা মাগীর কথা! তাদের কে আছে, তারা কি খায়, গাছতলায় শুতো কি কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছিলে,—সে-সব ফিরিস্তি নাকি আমার কাছে তারা দাখিল করে দিয়ে গেছে! আমি তার কি জানি রে বাপু? গরীব তারা অবিশ্যি হলো বই কি! তবে খেতে না পেয়ে মরে গেল কি কম সম খেয়ে জ্যান্ত রইলো, সে ইতিহাসের পুঁথিটা আমার পড়া নেই। এদের কথটাই সেই 'শেয়াল রাজার' দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম তাই তোদের কাছে বল্লুম,—দেখিস্ যেন কারু কাছে গল্প করে বেড়াতে যাসনে সব ভাই! যে তোরা কাণপাতলা নোক বাপু, একটা কথাতো কারু পেটেই থাকেনা।—ওই যে ছোট দিকের একটা টান আছে না, তোরাও তো ঐ কথা বল্‌ছিলি? তা সেটা এলো কোত্থেকে, সেই কথাটাই তোদের জানিয়ে শুধু দিলুম, বুঝ্‌লি? কিন্তু খবরদার পাঁচকাণ যেন না হয়।

কথার সুরে এবং চাহনির মধ্য দিয়া মনিব বংশের হীন রুচি সম্বন্ধীয় অনেকখানি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া চারিদিকের হাস্য-কৌতুকের সহিত যোগ দিয়া উঠিয়াই সাতকড়ি তাহাদের শুনিবারও বটে, আবার নিজের বলিবার আগ্রহেও বটে পূর্ব্বকথিত কাহিনীর অকথিত অংশটা পুনরারম্ভ করিল; "হ্যাঁ তারপর, হ্যাঁ দেখগে কি বলেগে, বলছিলুম কি না—সেই তো দেশ, তা সে অঞ্চলে ওর ঠাকুদ্দা যখন জমিদার হয়, তখন ওদের আমদানি নাকি এর সিকির সিকিও ছিল না ও দিকটা তখন আরও বন বাদাড় ছিল কিনা, যাকে বলে অজ গঢ়বিজ বন। তা'ছাড়া বড় বড় জলা ছিল, খানিকটা নাকি নদীর গর্ভে ডুবে ছিল। ওদের কপালগুনো বড় জোরালো কিনা, হঠাৎ দুটো নদীর স্রোত ফিরে গেল,—একটা বেঁকে এসে ওদের জমিদারীর পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেল, তাতে নাকি একদিকে ঢের আবাদী জমির সৃষ্টি হলো, আর একদিকে বড় বড় সেগুন গাছের চালানের ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আর একটা নদীর জন্যেও কি সব সুযোগ পাওয়ায় জায়গায় জায়গায় বন আবাদ করে লোক বসিয়ে গাঁ সব তৈরি হলো, এমনি করে নাকি যেখানে দু'হাজার ছিল সেখানে ছত্রিশ হাজার টাকা আয় দাঁড়ালো। এমনি করে করে ক্রমেই আরও কত বেড়ে উঠেচে তা কে জানে? শুনতে পাই লাখ টাকার ঢের উপর। যাই হোক বেশীর ভাগ জমিদার নাকি

এই রকম, শুনেচি ওদের কেউ কেউ নাকি আগে ডাকাত পুষেচে, কেউ মনিব ঠকিয়েচে, কেউ কেউ সরকারকে বড় বড় রাজস্বলুঠের সাহায্য করে নিজেরা বড় হয়ে গেছে। তা এদেরই বা শুধু শুধু দুষ্‌লে হবে কেন? আবার সেদিন সরকার-মশাই বলছিল যে, এখন আবার অনেকে পুলিশে গোয়েন্দাগিরি করে, খুনীর হাতে খুন হয়ে বউ ছেলেকে জমিদার করেও নাকি দিয়ে যাচ্চে। সংসারে কত রকমই যে আছে।”

ইতিমধ্যে বাসনমাজা ঝি মোহিনীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, সে মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করিল “আহা! সাতকড়ি আমাদের কতই জানে!”

পেঁচোরমা এই আকস্মিক ‘গল্পভঙ্গে’ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া তাহার পেঁচার মত চোক দুইটা তেমনি করিয়াই পাকাইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল “ভদ্দর লোকের সঙ্গে সঙ্গে চারটে কালই দেশ বিদেশে ঘুরচে, না জান্‌বে কেন লা? নে'দাদা সাতু, তুই ওসব কথায় কাণ দিস্‌নে, বলে যা, যা বলছিলি। তারপর?—”

মোহিনী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার তুলিল “আ গেল যা, একটা কথা কয়েচি না মাগি অমনি আগুন-খাকীর মত যেন ছুটে মারতে এলো! বলি সাতকড়িকে বলেচি তো তোর অত গায়ের জ্বালা হলো কেন বল্‌তো? কেন তোর একলার সাতকড়ি নাকি যে কারু একটা ভালমন্দ কথা কইবার যো নেই, অম্‌নি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়?”

তখন আর যায় কোথা? রণহুঙ্কার দিয়া প্রায় “যুদ্ধং দেহি” ভাবে ফিরিয়া পেঁচার মা দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল “আমর মাগি! গতরের মাথা খেয়ে শুধু শুধু কিনা গায়ে পড়ে এলো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! আচ্ছা আয় তবে একবার ভাল করে দেখে নিচ্চি, কতবড় তুই আয় একবার আজ দেখচি তোকে—”

অদূর হইতে একটা হাঁক আসিল, “সাতকড়ি! রাজাবাবু তোমায় শীগ্‌গির করে ডাকচেন।” নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখটী করিয়া সাতকড়িও হাঁকিয়া উত্তর করিল, “আজ্ঞে এই যাচ্চি—” কোন্দল-পরায়ণাদের দিকে চাহিয়া একটু দুঃখিতভাবে কহিয়া গেল, “নিজেদের দোষেই তোরা গল্পটা শেষ করতে দিলি না, নাদি'গে যা, মরগে যা দুটাতে খাওয়া খাওয়ি করে, এর পর সাতদিন খোসামোদ না করি'য়ে তো আর বল্‌বো না।” এই বলিয়া সে প্রস্থিত হইল। পিছন হইতে কোপরুদ্ধঝঙ্কারে মোহিনী চেঁচাইয়া কহিল, “বল্‌বিনি তো সেই ভয়ে আমি মরে রইলুম আর কি! মহাভারত না ভাগবত যে সে না কাণে এলে নরকে পচে মরে থাকবো? খোসামোদ যে করতে জানে সে-ই ভাল করে করবে এখন; আমরা যদি খোসামোদ করা জানতুম রে, তা হলে তোর কেন, তোর মুনিবেরই করতুম। চারকাল ধরে না শীত, না গ্রীষ্মি বাসন মেজে মেজে মরতুম না রে!”

পেঁচোর মা দুই পাকান চোখে মোহিনীকে ভস্ম করিবার মত আগুন ভরিয়া খোঁপাখোলা এলোচুল আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দাঁত কিড়মিড় করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—“দেখ্‌ মোহী আবাগী!

অমন করে ভাল মানুষের পেছনে লাগিস্‌নে বল্‌চি! কেন আমি তোর বুকে কি ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি শুনি যে যখন তখন তুই আমায় ঠোক্কর মেরে কথা কোস্‌?”

নিরঞ্জনের চাকরী হইয়াছে সে খবর এবাড়ীর বাসিন্দারা এবং যাহারা এ সংসারের সহিত আসা যাওয়া করিত তাহারা সকলেই জানিল বটে; কিন্তু কি চাকরী যে তাহার হইল, সে খবরটায় যেমন তাহারা পাঁচজনে তেম্‌নি নিরঞ্জন নিজে শুদ্ধ অজ্ঞই রহিয়া গেল এবং তা অমন প্রায় দিন পনেরই এই অজ্ঞতার মধ্য দিয়াই কাটিল। চাকরী পাইয়া নিরঞ্জনের মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল কিন্তু ফলে দেখা গেল, চাকরীর মধ্যে যথাপূর্ব্বই সেই আশ্রয়দাতার বাড়ীর নীচের তলার একটী এই বিশেষ ঘরের মধ্যের বিছানাটায় পড়িয়া পড়িয়া অফুরন্ত দুঃখময় চিন্তা-স্রোতের মধ্যে ভাসিয়া যাওয়া অথবা সেই ঘরের কড়িকাঠ ক’খানার হিসাব রাখা,—এ ভিন্ন তো কই তাহার কর্ম্ম-জীবনের কোন সফলতাই দেখা দিল না। দু’চার দিন অপেক্ষা করিয়া একদিন নরেশচন্দ্রের নাগাল পাইয়া সে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় তো কোন কাজ দেওয়া হ’লোনা?”

নরেশ তখন কি কাজে তাঁহার স্বভাবজাত অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন; তাহাতেই মগ্ন থাকিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন “ব্যস্ত হয়ো না, দুদিনেই সংসারের কর্ম্ম-স্রোতে ভাঁটা পড়ে যাবে না, কাজ ঠিক থাকবে।”

নিরঞ্জন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিতে গিয়া আবার বন্ধ করিয়া ফেলিল। কি জানি বেশী পীড়ন করিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে হয়ত সেটা আদায় হওয়া অধিকতর দুর্ঘট হইয়া পড়াও নেহাৎ বিচিত্র নয়! বাবুর যে মেজাজের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে আর যতই ভাল জিনিষ থাক না কেন, একটা যে খেয়ালের খেলাও তার অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, সেটাও নিতান্ত অস্পষ্ট নহে। কেহ ‘হাঁ’ বলিলে তাহাকে প্রায়ই ‘না’ বলিতে বাধ্য করা হয়, অতএব যেখানে আগ্রহ অধিক সেখানে অনাগ্রহেই কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিছু সম্ভব বটে। সে নীরবে ফিরিতেছিল, নরেশ ডাকিলেন “ওহে নিরঞ্জন শোন, শোন,—” নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশ কহিলেন “আমার এই পিঁপ্‌ড়ের ঠ্যাং লেখাগুলোকে বুঝে নিয়ে এর একটা “ফেয়ার কপি” করতে পারবে?”

হারানিধি বা ওম্‌নি কিছু কুড়াইয়া পাইলে মানুষের মুখের যে ভাব হয়, ঠিক তেমনিতর হর্ষোৎফুল্লমুখে নিরঞ্জন তাহার স্বাভাবিক অবসাদপূর্ণ শিথিল গতিকে যৌবনোদ্যমপরিপূর্ণ আগ্রহ-চঞ্চল করিয়া একরকম ছোঁ মারিয়াই যেন নরেশের হাত হইতে সেই কোণ-গাঁথা ফুলস্কেপ কাগজগুলা কাড়িয়া লইয়া তদুপরি নিজের নিষ্প্রভনেত্রের ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে যে হস্তাক্ষর লিখিত ছিল, তাহাকে কদর্য্য বলিলেও খুব মিথ্যা কথা বলা হয় না। এ বিষয়ে নরেশের মন্তব্যটাকে ‘বিনয়’ বলিয়া ভ্রম করিবার কিছুমাত্র কারণই নাই। কিন্তু বহুকালের অনাবৃষ্টির পরে সামান্য এক পশলা জলেও যেমন প্রকৃতির সমস্ত ম্লানতা ধুইয়া গিয়া তাহা চিক্কণ ও শ্যামল দেখায়,

নিরঞ্জনেরও সেইরূপ কর্ম্মবন্ধনবিহীন ছন্নছাড়া জীবনের সমুদয় এলোমেলো গ্রন্থিগুলা যেন এতটুকু কাজের নাগাল পাওয়াতেই একটিক্ষণের ভিতরে সংযত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিল। সে আর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই একখানা চৌকি লইয়া বসিয়া সাদা কাগজ কয়খানা টানিয়া লইল।

সেদিন অপরাহ্নে পরিমল যখন তার বৈকালিক বেশভূষা সমাধা করিয়া আনিয়াছে, তেমন সময়ে তাহার নিজস্ব দাসী অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। পরিমল আসিয়া দেখিল নরেশ কয়েকখানা বই হাতে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। "কি এ গুলো? নতুন কোন বই বেরিয়েছে বুঝি? তা বাঁধানর এমন ছিরি কেন?" বলিয়া উহারই একখানা টানিয়া লইয়াই পরিমল ঠোঁট উল্টাইল "ওহরি! আবার এই মাথামুণ্ডু নিয়ে আসা হয়েছে? আমিতো বলেছি যে এসব আর আমার দ্বারা হচ্চে টচ্চে না। মাগো, বুড় হয়ে মর্তে যাচ্চি এখনও কিনা রয়েলরিডার নম্বর থার্ড পড়া!"

নরেশচন্দ্র হাসিলেন "ওরচেয়ে যে আর ওপোরে উঠতে পারলেনা সৈ! আমার কি সাধ যে চারকালধরেই তুমি কচি খুকির পড়া পড়ো? না, এবার এই 'রাজকীয় পঠনা'র গণ্ডী তোমায় পার হতে হবে, পরি!"

পরিমল বইখানা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর প্রশস্ত স্থূল স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া আবদার করিয়া বলিল "ও আমি আর পড়বোনা।"

"কেন পরি?"

"বুড় বয়েসে আর অত শেখা যায় না। দেখলে তো পারলুম না।"

নরেশ বলিলেন "দেখ, তা'যদি বলো, তাহলে আমি হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি যে, বুড় বয়েসে সামান্য একটু লেখাপড়া শেখা সে তো কিছুই নয়, একেবারে আগা থেকে 'পান্তলা' পর্য্যন্ত বিবি বনে যেতে পারা যায়।"

পরিমল স্বামীর কথায় হাসিয়া ফেলিল, তারপর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বিষণ্নস্বরে কহিল, "তারা বোধ হয় আমার মতন পাড়াগেঁয়ে গরীব ঘরের মেয়ে নয়, তাই পারে!"

নরেশ কহিলেন "তা'নয় পরি, ও তুমি এক্কেবারে ভুল করলে। অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে মেয়েরা আবার সহরে এলে যত বদ্ধ সহুরে হয়ে ওঠে, সহরের বুকের মধ্যে সাতপুরুষে বাস করে থেকেও তার সিকিটুকুও পারা যায় না। সংক্রামক রোগের মধ্যে সর্ব্বদা যারা বাস করে, তাদের চাইতে বাইরের লোকদেরই সংক্রামিত হওয়ার ভয় বেশী কিনা। যাক্ ও সব তর্কাতর্কি তুলে রেখে দাও, তোমায় আমি এম, এ, বি-এল পাশ করে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীর দরখাস্ত পাঠাতেও অনুরোধ করছিনে, আর বিলাত ঘুরতেও নিয়ে যাচ্চিনে;—মাত্র খামের উপর চিঠির ঠিকানাটা লেখা, বা ছোটছেলে মেয়েদের অক্ষর পরিচয়টা করাবার মতন পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত না রাখলে চলবে কেন বলতো? এতটুকু চাওয়ারও কি আমার যোগ্যতা নাই?"

পরিমলের গাল দুটি ঈষৎ একটু রাঙ্গা হইয়া আসিল, নতমুখে সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "চিঠি লেখবার তো আমার অনেক আছে। আর ছোটছেলে—তা যদি ঈশ্বর আমাদের দেন, যদি সেবারের মতন অমন বঞ্চিত করে না দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে দেন, তাদের শেখাবার লোকের এ বাড়ীতে কোন অভাব হবে না।"

"আহা ; ঐখানেই যে তোমাদের গলদ পরি ! মা বাপের কাছে শিক্ষা না পেলে সন্তানের যে প্রকৃত শিক্ষাই হতে পারে না। প্রথম থেকে মাইনে করা মাস্টার গবর্ণেসের ব্যবস্থার মতন ছোট ছেলেমেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা আর কিছু নেই। বিদ্যালাভটা একেবারেই তাতে তাদের পক্ষে বিস্বাদ হয়ে যায়। মায়ের আদরের সঙ্গে মিশিয়ে অতি সহজ খেলার মত যেটা শিখে ফেলে, একজন অপরিচিতের শাসন গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কি সে বস্তু পেতে পারে তারা কখনও ?"

পরিমল কিছু ক্ষুণ্নচিত্তে জবাব দিল, "একটু আধটু শিখ্‌ছি তো, কিন্তু ও ইংরেজী বইটই আমার পড়তে মোটে সুবিধে হয় না। মনেই থাকে না ছাই। হ্যাঁগা, আজ আমায় পার্সী থিয়েটারে নিয়ে যাবে ?"

নরেশ স্ত্রীটীকে একটু সন্তুস্ট করিয়া কাজ আদায় করাই সুযুক্তি বোধে সেদিন ঐ পর্য্যন্তই থামিয়া গিয়া জবাব দিলেন, "বেশতো, যেও।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়

কথা উঠিয়াছে যে, ভাইস্-চান্‌সেলার শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দোষে—অর্থাৎ তাঁহার পরিচালনার দোষে বিশ্ব-বিদ্যালয়টি দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। এ গুজবের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা পরিচালনার দোষে উড়িয়া গিয়াছে, এবং আয়ের অন্য যে পথ ছিল তাহাও সেই দোষে বন্ধ হইয়াছে। এটা যে অতি বড় মিথ্যা কথা, আর এই মিথ্যা কথাটা যে রকম ভাবে রটিয়াছে, তাহা অল্প কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াই বুঝাইয়া দিতেছি। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল কথা নিতান্ত খাঁটি ও সকলেই জানে, তাহা উপেক্ষা করিয়া অথবা ঢাকা-চাপা দিয়া এই অসত্য গুজব রটান হইয়াছে।

আগে আগে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ ছিল, কেবল ছাত্র পরীক্ষা করা, আর ছাত্রেরা উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের জন্য তক্‌মা বিলি করা। এই পুরাতন পদ্ধতির একটু পরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বে ও অধ্যাপনায় এম্. এ. প্রভৃতি পড়া চালাইবার নূতন ব্যবস্থা করিবার পক্ষে সার আশুতোষ নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী। তিনি দায়ী, কারণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ খুলিয়া নূতন রকমে পড়াইবার পদ্ধতিটা তাঁহার উদ্ভাবিত; তবে এই পদ্ধতিটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত সকলেই নিগূঢ়ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরীক্ষার পর সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে উহাকে উপযোগী ও হিতকর মনে করিয়া চালাইয়াছেন। পদ্ধতিটি কি অবস্থায় জন্মিয়াছিল ও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

সার আশুতোষ দেখিয়াছিলেন যে, যাহারা আইন পড়িয়া উকীল হইতে চায় অথবা খানিকটা ইংরাজী বিদ্যার জোরে, নানা দিকে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতে চায়, তাহাদের পক্ষে বি. এ. পাশ করিলেই যথেষ্ট হয়; আর যাহারা এম্. এ. প্রভৃতি পড়িয়া গুণী ও জ্ঞানী হইতে চায়, তাহাদের শিক্ষার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইতিহাস, দর্শন-শাস্ত্র, অর্থ-নীতি, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি পড়িয়া যাহারা সমাজের নেতা হইয়া বসিবেন,—যাহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্র পড়িয়া উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার বেলায় তেমন করিয়া উপাধির ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। যে সময়ে অল্প কয়েকটি কলেজে এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই সার আশুতোষ ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মন্দিরে এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; যে সকল ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ভাল মনে করিয়াছিল, তাহারা সেখানে গিয়া জুটিয়াছিল, এবং অধ্যাপনার গুণেই ছাত্রসংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সময়ে দেশের অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমালোচনা করিতেছিলেন যে, এম. এ. প্রভৃতি পরীক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতেই থাকিবে, না অন্যান্য কলেজেও থাকিতে পারে। এখানেও বলিয়া রাখি যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে যে আইন পাশ হইয়াছিল, তাহাতে এম্. এ. প্রভৃতি পড়াইবার ভার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপরে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই সার আশুতোষ উল্লিখিত শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা হউক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মন্দিরে যখন ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া গেল, এবং একটা উপায় নির্দ্ধারণের কথা উঠিল তখন ১৯১৬ খৃঃ অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে সকল বিষয় বিচারের জন্য এক কমিটি বসিয়াছিল। বলিয়া রাখি যে, এ সময়ে ভাইস্-চ্যানসেলার ছিলেন, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমিটিতে সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন সার আশুতোষ এবং সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক হ্যামিল্টন, অধ্যাপক হাও-এল্‌স্, সার হেন্‌রি হেডেন, মিঃ হর্ণেল (তখনকার ডিরেক্টার) ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ (এখনকার ডিরেক্টর) মিঃ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ।

এই কমিটির সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষার পড়া চলা উচিত ও পড়াইবার জন্য

অধিক ব্যয়ে উন্নততর ব্যবস্থা করা উচিত। তখন গবর্ণর জেনারেল ছিলেন চেম্‌সফোর্ড এবং শিক্ষা-সচিব ছিলেন শ্রীযুক্ত শঙ্করন্ নায়ার। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্ট মঞ্জুর করিয়া সিনেটকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। তখন সেনেটের অনুমোদনে এবং বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের পূর্ণ অভিমতিতে পোস্ট-গ্রেজুয়েট শ্রেণীগুলি খোলা হইয়াছিল। অন্য কোন কলেজে পোষ্ট-গ্রেজুয়েট শিক্ষা দেওয়া হইতে পারিবে না, ও নূতন পদ্ধতিতেই ঐ শিক্ষা চলিবে এই মর্ম্মে ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন পাশ করিলেন এবং সেই আইন প্রচারিত হইল ১৯১৭ সালের ২৬শে জুন তারিখে। দেখা গেল যে, এই নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সার আশুতোষের বুদ্ধিই দায়ী, তবে এই পদ্ধতিটি প্রচলিত হইয়াছিল দেশের সকল সুবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যপরায়ণ নেতাদের নিগূঢ় পরীক্ষায় ও বিচারে। শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে গবর্ণর হইবার পর তিনিও এই শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী মনে করিয়া উহার সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার পর আবার ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে শিক্ষা বিষয়ে, বড় বড় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আনাইয়া যে কমিশন বসাইয়াছিলেন, সেই কমিশনের রিপোর্টেও এই পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের আদর্শকে রক্ষা করিয়া ভাল করিয়া কাজ চালাইবার সুপারিশ হইয়া গিয়াছে। যাদুকর সার আশুতোষ যদি উল্লিখিত সকল ব্যক্তির চোখেই ধূলা দিয়া ভেল্কী খেলাইয়া থাকেন, তবে সে যাদুমন্ত্রকে নিন্দা করিতে গেলে দু তিন জন সমালোচক বাদে পৃথিবী শুদ্ধ সকলকে বোকা বানাইতে হয়।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে যতগুলি শাখার বিস্তার করা হইয়াছে, যে ব্যয়ে যতগুলি অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই যে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে ও সমর্থনে হইয়াছে, তাহা নিতান্ত জানা কথা হইলেও সে বিষয়ে দু'একজন পায়াভারী সমালোচকের অযথা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে; সে মন্তব্য যে অসার ও মিথ্যা, তাহা জানাইবার জন্য গত মার্চ্চ মাসের কন্‌ভোকেশনে গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারে প্রতিপদে সকল কার্য্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই উক্তিটির আলোচনায় বিখ্যাত "ক্যাপিট্যাল" পত্রের প্রথিতনামা লেখক "ডিঢার" বলিয়াছেন যে, কয়েকজন "হেঁজি পেঁজি" লোক মিছাই বিদ্বেষ বুদ্ধিতেই ভাইস্-চানসেলারের দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ডিঢারের উক্তি তাঁহার নিজের ভাষাতেই পাঠকেরা পড়িয়া দেখুন :—

At the Convocation of the Calcutta University on Saturday (18th. March, 1922) Lord Ronaldshay, Chancellor delivered an eulogium of Sir Asutosh Mukherji, the broad-fronted Cæsar of the Indian University world, whom spiteful pigmies are now attacking with poisoned arrows. "Far more than any other individual" said his Excellency "Sir Asutosh Mukherji has been responsible for converting the Calcutta University from a mere examining board into an active centre of teaching and research." A true tribute spoken in good time.

পাঠকেরা এখন ভাবিতে পারেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসারের সহায়, তখন টাকাকড়ি দিবার বেলায় এত বিভ্রাট ঘটিল কেন ? সেটা সমস্যাই বটে। সুশিক্ষার জন্য যাহা করা হইয়াছে, তাহা না করিলে চলে না,—পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ যদি রাখিতে হয় তবে উহাকে অতি সংক্ষিপ্ত করিয়া রাখা আর না রাখা দুই-ই সমান ; এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে কার্পণ্য করিলেন কেন ? উহার আংশিক উত্তর হয়ত এই যে, ঢাকায় বহুব্যয়সাধ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় বসান হইয়াছে ; তাহাকে টাকা দিবার পরই কলিকাতা কিছু পাইতে পারে। এ উত্তরের প্রত্যুত্তর নাই। সেনেট অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, হয়ত বা "গৌরী সেন" প্রয়োজনের টাকা দিবেন না, তাই তিন বৎসর পূর্ব্বেই ছাত্রদের ফিস্ হইতে টাকা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; সে প্রস্তাব মঞ্জুর হইলে বার্ষিক ১।৷০ লক্ষ টাকা হিসাবে এত দিন ৪।৷০ লক্ষ তহবিলে আসিত ; কিন্তু সরকার বাহাদুর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এমন করিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া মইখানি সরাইবার ফলে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় উদ্ধারের একমাত্র উপায় দেশের বদান্য ধনীদের সাহায্য ; কিন্তু গজে গজে মুক্তা ফলে না,—তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের মত মহাত্মা সহজে মেলে না। কেবল মেলে কয়েকজন অকর্ম্মের কর্ম্মা, বিদ্বেষ-পরায়ণ সমালোচক,—যাঁহারা হিতৈষণার নামে নিজেদের বাহাদুরী দেখাইয়া সুখী। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি অবিচার করিতেছেন, তাঁহারাই দেশের শত্রু।

এবারে ব্যবস্থাপক সভায় কথা উঠিয়াছিল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় নাকি বিজ্ঞান কলেজের জন্য কিছু করেন নাই, আর সেই সভার দু'এক জন সদস্যের নাকি বিজ্ঞানের জন্য প্রাণ কাঁদে। কথাটি বুঝিয়া লইতেছি। সার আশুতোষের উদ্যোগে নূতন পদ্ধতিতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, দুইজন চিরস্মরণীয় মহাত্মা মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ পদ্ধতির শিক্ষায় দেশের কল্যাণ হইবে ; তাই তাঁহারা ছত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা করাইলেন। সার তারকনাথ ও সার রাসবিহারী তাঁহাদের টাকা দানের সময়ে এই নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের টাকায় ভারতবর্ষীয় কৃতী অধ্যাপকেরাই রক্ষিত হইবেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সর্ত্তই বিজ্ঞান কলেজের কাল হইয়াছে,—এবং উহার জন্যই হয়ত বা উচ্চ পদস্থদের যথার্থ সহানুভূতি জন্মে নাই। যাহা হউক ঐ কলেজের একটু হিসাব দিতেছি।

১৯১২ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে মোট খরচ হইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা। ঐ ১৬ লক্ষের মধ্যে সার তারকনাথের টাকার সুদ—২ লক্ষ ৫৬ হাজার ও সার রাসবিহারীর টাকার সুদ ৩ লক্ষ ১১ হাজার ; গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২ হাজারের হিসাবে নয় বৎসরে দিয়াছেন ১ লক্ষ ৮ হাজার ; আর বাদ বাকী ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে।

তবুও কথা উঠিল যে বিশ্ব-বিদ্যালয় কিছু করে নাই,—এবং জন দুই সদস্যের চোখের জলে ব্যবস্থাপক সভা ভাসিয়া গেল।

গবর্ণমেণ্ট যে বিভাগের জন্য যত টাকা দিয়াছেন, তাহা ত ব্যবস্থাপক সভায় ঢ্যাঁড়া পিটাইয়া প্রচার করা হইয়াছে; কাজেই তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন যে, টাকাটা পুরামাত্রায় দিবার তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু টাকায় কুলাইল না। কথাটা এই দাঁড়ায়, যে অবিবেচকের মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজের প্রসার বাড়ান হয় নাই বটে, তবে দৈবের তাড়নায় টাকার খাঁকৃতি হইয়াছে বলিয়া এতটা গোল ঘটিল। এ প্রসঙ্গে কিন্তু একটি কথা দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন যে, গবর্ণমেণ্ট টাকা দিয়া উঠিতে পারেন নাই বটে, তবে হয়ত বা অজ্ঞাতসারেই কিছু লাভ করিতে পারিয়াছেন। বিষয়টি এই :—

প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জন্য প্রত্যেকে ১২০০৲ টাকা ভাতা পান; কিন্তু তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া সে টাকাটা তাঁহাদের নিজের লইবার অধিকার নাই; তাঁহাদের নামে প্রাপ্য সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট নিজে আত্মসাৎ করেন। নিয়ম অনুসারে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকেরা যখন টাকা লইতে পারেন না, তখন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টাকাটা প্রফেসারদের নামের হিসাবে গবর্ণমেণ্ট নিজে আত্মসাৎ করেন কেন? কয়েকজন প্রফেসারও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নামের হিসাবের টাকা তাঁহাদের বিভাগেই ব্যয়িত হউক—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করেন নাই। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট একদিকে যত টাকা দেওয়া উচিত ছিল, তাহা দিলেন না অথবা দিতে পারিলেন না, আর অন্যদিকে ১৯১৭ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত লইয়াছেন একলক্ষ টাকার কিছু উপর। গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন তাঁহারাত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মাহিনার টাকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে জমা করেন। কিন্তু সে টাকা বাদ দিলেও গবর্ণমেণ্ট নিট লাভ করিয়াছেন প্রায় ৩২ হাজার টাকা। মোট কথা পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলাতে গবর্ণমেণ্টের একটি আয়ের পথ হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর লাভ করিতেছেন সাহায্য বাড়ান ত দূরের কথা।

নিন্দা শুনিতে মানুষে ভালবাসে ও নিন্দার কথাটা ছাপার অক্ষরে পাইলে খুব সহজেই বিশ্বাস করে; সেই সুবিধা ধরিয়া যাঁহারা এরূপ অবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর মনের ঝাল ঝাড়েন তাঁহারাই হইলেন স্বদেশহিতৈষী! ইঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অনেক দিন ধরিয়া এই নিন্দাপ্রচারের ব্রতে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন; ইঁহাদের বিশ্বাস যে বারে বারে বলিলে লোকের মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার উপর অভক্তি জন্মিবেই। দৈবে এই হিতৈষিদলের কেহ কেহ ভূমিতে না গড়াইয়া উঁচু মাচায় উঠিয়াছেন, আর সেই গৌরবের সুবিধায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়পরিচালনার প্রকৃত দোষ ধরা খুব কঠিন দেখিয়া নিন্দুকেরা গোড়ায় সুর

তুলিয়াছিলেন যে, অধ্যাপনার জন্য অনেক বেশি টাকায় অযোগ্য লোক রাখা হয়। ইঁহারা ঠারে ঠোরে যাঁহাদিগকে অযোগ্য বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদেরই অনেকে অনেক অধিক বেতনে লক্ষ্ণৌ এবং ঢাকাতে নিযুক্ত হইলেন তখন নিরন্তর গালি দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন যে অধ্যাপকেরা অতি নীচ প্রকৃতির খোসামুদের দল। কাজের পরিচালনার প্রসঙ্গে এই অবান্তর কথা কেন? অন্যকে নীচ ও ঘৃণ্য বলিয়া ভাবিলে ধর্ম্মাত্মা সমালোচকদের হয়ত অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হয়; অথবা হয়ত মিষ্ট কথায় সার আশুতোষের চিত্ত কলুষিত হইতেছে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মারা কড়া কথায় তাঁহার নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। কটুতা-প্রিয় সমালোচকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যে তাঁহারা 'ডিচার' এর রচিত প্রশস্তি পড়িয়া তাঁহাকে ডালি ভরিয়া কেক্ ও চিংড়ি কাট্‌লেট্ পাঠাইয়াছেন কি না?

নব বর্ষের প্রতি

ঝঙ্কারো বীণা হে নব বর্ষ, ধেয়ানী কবি,
বস' বেদী-পীঠে, মধুচ্ছন্দা — হে গৌরবী।
অগুরুর ধূমে ধ্রুব তারকার দীপিকা ধরে'
কর সারদার মঙ্গলারতি বিরাট্ স্বরে।
বিষুব-সাগর-পদ্মে গাঁথিয়া সুরভী-মালা
কর' আনন্দী ললিত কলার যজ্ঞশালা।

রসনায় তব করুন্ বসতি বাগীশ্বরী,
বাণী-নারায়ণী-ভুবন-জয়িনী-শুভঙ্করী,
পরমা ঋদ্ধি, নিখিলের তপো-অভীপ্সিতা,
অদ্‌ভুত-লীলা, সত্য-ত্রেতার দীপান্বিতা,—
কর' শাশ্বত-স্তোত্র-রচনা—ধন্য সুর,
মহান্ মন্ত্রে জাগাও মন্দ্র নীলাম্বুর।

যাহা ভূমা, যাহা অপৌরুষেয় বাগ্-বিভূতি,
পূর্ণ-গীতিকা-পৌরাণী-শিখা-অনাদি দ্যুতি,—
অশেষ-অসীমে অপরূপ হাসি জাগরণীর,—
নন্দিয়া তোল' বোধন-রাগিনী আগমনীর;
অপরাজিতা সে গীতার ভারতী অমর শ্লোক
তুলিয়াছ যার দীপ্ত শেখর 'লোক-অলোক'।

বাজাও হে গুণী উদাত্ত সাম, উদার তান,
সাধন-প্রভাতে করিব বরণ ভরিয়া প্রাণ;
নব বৈদিক উষার উদয়ে ঋষির ঋক্
বহাক্ অমৃত-অলকনন্দা প্লাবিয়া দিক্।
ভ্রমি' কবিতার 'নমেরু'র বন-বনান্তর
অন্তরাত্মা জপিবে মন্ত্র নিরন্তর।

চেতনার এই চিত্রিত-দীপ-ছটার শেষে,
চির-বরণ্যে ঋত্বিক যাঁরা জ্যোতির দেশে,—
অক্ষয় মধু-পারাবার-কূলে সন্ধি-বেলা
স্তিমিত যাঁদের মহাজীবনের ঢেউএর খেলা,
গিয়াছেন যাঁরা মৃত্যুর তমঃ উত্তরিয়া,
মুক্ত-ত্রিবেণী গিয়াছে যাঁদের 'অমৃতে' নিয়া।

তাঁহাদেরি সুরে কণ্ঠ মিলায়ে গাহগো জয়,
গাহ নব রাগ—নব যতি-নব-ছন্দোময়;
স্ফূর্ত্তি-মানস-পুণ্ডরীকের পুণ্য-দলে
ভরি' অঞ্জলি এস বরদার চরণ-তলে;
তরুণ-শকল-ইন্দু-কান্তি জ্ঞান-দেবীর
নিরমাল্যের ফুল-চন্দনে লুটাও শির।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতনী

'শকুন্তলা'র চিত্র-প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন "নারায়ণ" পত্রে কালিদাসের কাব্য-নাটকাদির আলোচনা করিতেছিলেন, সে আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা;—সেই সময় একদিন কথা-প্রসঙ্গে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন,—"শাস্ত্রী মশায়ের লেখা আমার খুব ভাল লাগে। সম্প্রতি তিনি 'কালিদাসের মেয়ে দেখান' নাম দিয়ে 'নারায়ণে' যে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি আপনি পড়েছেন কি?—বড় চমৎকার লেখা! শকুন্তলা নাটক হ'তে মেয়ে দেখানোর যে ছবি তিনি এতে দেখিয়েছেন, সে ছবি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও আমি দেখিনি।"—এ কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—"কালিদাস সম্বন্ধে শাস্ত্রী মশায় যা' লিখ্‌ছেন, তা' চমৎকার হচ্চে, সন্দেহ নেই। তবে শকুন্তলা হ'তে মেয়ে দেখানোর ছবি যে তিনিই আমাদের প্রথম দেখালেন, একথা স্বীকার করি না। যতটুকু জানি, তা'তে মনে হয়, বাঙ্গলা ভাষায় এই ছবি যদি কেউ প্রথম এঁকে থাকেন, তবে তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার। ১২৯৩ সালের 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' মাসিক কাগজে তিনি কালিদাসের শুধু কনে দেখান নয়, সেই সঙ্গে বর দেখানোর চিত্রটুকুও ভাষার তুলিকায় যে রকম ফুটিয়ে দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা দেখিতে পাই না।" ইহা শুনিয়া দাশ মহাশয় সে লেখাটি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' তখন আমার কাছে না থাকায়, আমি তাঁহাকে তাহা দেখাইতে পারি নাই। তারপর আরও দুই চারিজন বড় লেখকের সহিত এই প্রসঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সরকার মহাশয়ের এই লেখাটির সহিত তাঁহাদেরও পরিচয় নাই। যাহা হোক, সেই 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' কাগজখানি সম্প্রতি আমার হাতে আসিয়াছে। এই সুযোগে তাই পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য সরকার মহাশয়ের সেই লেখার প্রথমাংশটুকু 'বঙ্গবাণীর' পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম।

কনে দেখান

কালিদাসের শকুন্তলার বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে, পাঠকের ও মহাকবির অবমাননা হয়; তবে পার্শ্বস্থ চিত্রের ভাষ্যরূপে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। শকুন্তলার প্রথমাঙ্ক—স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বিবাহিত রাজা দুষ্মন্তের আবার বিবাহের জন্য ঘটকালি। ঘটকালির প্রধান কার্য্য—দোজবরে বরকে বয়স্থা 'কনে' ভাল করিয়া দেখান। এক এক দিন বৈকালে আকাশে সোণামাখা রৌদ্র হয়, গাছে পালায় সোণামাখা হাসি ভাসিতে থাকে—মেয়ে ছেলে বলে, এই 'কনে দেখানর বেলা' হইয়াছে। কালিদাস অতি অপূর্ব্ব কৌশলে, এইরূপ হাসিভরা 'কনে দেখানর বেলা' সৃষ্টি করিয়া, তেমনই হাসিভরা, ফুলভরা, সোহাগভরা কনে দেখানর মজলিস্ করিয়া—তবে বরের সম্মুখে কনে বাহির করিয়াছেন। স্থান—মালিনীতীরস্থ শান্তিময়—কণ্বমুনির আশ্রম। কাল—বসন্তমুখ।

নবমালিকা এই সবে মাত্র মুঞ্জরিয়াছে, সহকারে নব কিসলয় এই উদ্ভূত হইয়াছে; ভ্রমরের গুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে পঞ্চম স্বরের সুর অল্প অল্প লাগিতেছে। এই মোহকর 'কনে দেখান' সময়ে—কুমারী শকুন্তলা—সখীগণ সঙ্গে বৃক্ষ-বাটিকায় ছোট ছোট কলসী লইয়া জলসেক করিতেছেন। যেমন সময়, যেমন স্থান, তেমনই সুকুমার কার্য্যেও ইঁহারা ব্যাপৃতা। তিন জন সমবয়সীতে সময়োচিত কথাবার্ত্তাই হইতেছে;—

শকুন্তলাকে এক জন সখী বলিল,—"ওলো! ভাল করিয়া জল দে লো, জল দে— ওর ফুল ফুটিলেই, তোর ফুল ফুটিবে।" শকুন্তলা, একটু হাসিয়া—বলিলেন, "তোমরা তামাসা করিবে বলিয়া আমি কি জল দিব না, নাকি?—আমি যে একে বড় ভালবাসি।"—তোমরা এমন করে কনে দেখান আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

কনে ত বাহির করা হইয়াছে, এখন বর কোথায়? বর, বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত হইয়া সকলই দেখিতেছেন, সকলই শুনিতেছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবা মাত্রই তাঁহার বাহুস্পন্দন হইয়াছিল। তাহাতে বিবাহের সম্ভাবনা বুঝায়—সেই জন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন যে,—"এমন আশ্রমে এ আবার কি? এখানে আবার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়?"—আবার ভাবিলেন, "ভবিতব্য কোথায় বা না ফলে?"

ইহার পরেই সম্মুখে কন্যা-সজ্জা বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন,—তখন ভবিতব্য বলবান বলিয়া বোধ হইল। এই কনে দেখান দৃশ্যই প্রথমে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

বরকন্যার পূর্ব্বালাপ

আমরা প্রথম দৃশ্যে কালিদাসের কনে-দেখানর কথা বলিয়াছি, এবার কোর্টশিপ্ বা বরকন্যার পূর্ব্বালাপের পরিচয় দিব। পাঠকের অবশ্য স্মরণ আছে, রাজা দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সখীগণসহ শকুন্তলার পুষ্প-বাটিকায় জল-সেচন দেখিতেছিলেন, এবং তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এমন সময়ে একটা দুষ্ট মধুকর শকুন্তলাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। শকুন্তলা সখীদের বলিলেন, "ওলো! তোরা দেখ্না ভাই— এই ভোমরাটা যে আমাকে একেবারে মেরে ফেল্লে!" সখীরা দেখিল, শকুন্তলা একটা ভ্রমর তাড়াইতে পারে না —বলিল, "আমরা কি করিব ভাই! তুমি রাজাকে ডাক, অমন বিপদ হইতে যদি রাজা রক্ষা করিতে পারেন তবেই তোমার নিস্তার!" রাজা দেখিলেন যে ঋষিকন্যাদের সম্মুখে আসিবার তাঁহার বেশ সুযোগ হইয়াছে— আবার ভ্রমরা শকুন্তলার মুখের কাছে বোঁ বোঁ করিতে লাগিল!—শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন "রক্ষা কর! রক্ষা কর!"—রাজা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আ! কে মুগ্ধা ঋষি-কন্যাদের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে রে?—সে কি জানে না—যে দুষ্টের দমনকর্ত্তা পুরুবংশীয়েরা পৃথিবী শাসন করিতেছেন!"

আপনারা পূর্ব্বে কনে দেখানর কৌশল দেখিয়াছেন—এখন একবার কনের কাছে বর দেখানর ঘটা দেখুন! আর্ত্তের পরিত্রাতা-মূর্ত্তিতে রাজা দুষ্মন্ত আপনার ভাবী মহিষীর সম্মুখে সহসা আবির্ভূত। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি জ্বল জ্বল করিতেছে। ঋষি কন্যারা সন্ত্রস্তা হইলেন—সখীরা বলিলেন "না মহাশয়! এমন কিছু নয়—এই একটা দুষ্ট মধুকর আমাদের এই প্রিয় সখীকে বড় ব্যাকুল করিয়াছিল!" রাজা শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অয়ি তপোবর্দ্ধতে! কেমন গো ধর্ম্মকার্য্য বেশ হইতেছে ত?" দুষ্মন্তের ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি শকুন্তলাকে অভিভূত করিয়াছে, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—অনসূয়া তাঁহার হইয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সম্প্রতি অতিথি বিশেষের আগমনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আরও সুবিধা হইল। এস্থলে, অনসূয়া, শকুন্তলা কর্ত্তৃক নবমল্লিকায় একান্তমনে জলসেচন তাহার প্রধান তপস্যা মনে করিয়া, অতিথি বিশেষের সমাগম সেই তপস্যার অনুকূল—সে যাহা খুঁজিতেছিল,

তাহাই পাইয়াছে—এরূপ শ্লেষ করিয়াছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না—সে রহস্য-কথা কালিদাস জানেন আর শকুন্তলা বুঝিয়াছিলেন।

অনসূয়া ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে রাজাকে বসিতে বলিলেন। রাজা আপনি বসিলেন, তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন—সকলেই বসিলেন।

দুষ্মন্ত ক্রমে শকুন্তলার পরিচয় পাইলেন। বলিলেন, "বুঝিলাম ইনি অপ্সরাসম্ভবা—তাইতই ভাবিতেছিলাম, বলি, এমন প্রভা-তরল জ্যোতি ভূমি হইতে উঠিবে কেন?" পরে বলিলেন, "তবে কি মহর্ষি ইঁহাকে তপশ্চারণে রাখিবেন?" প্রিয়ম্বদা বলিল "না, অনুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিবেন।" রাজা মনে মনে বলিলেন "হৃদয় আশ্বস্ত হও—যাহা অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহা স্পর্শ-শীতল রত্ন।"

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শকুন্তলার সহিত রাজার একটিও কথা হইল না। মনের কথা মাটির আওয়াজে মিটে না। শেষে একটা মত্তহস্তী তপোবনের বিঘ্ন করাতে সকলকে আপন আপন স্থানে যাইতে হইল। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন—শকুন্তলা সর্ব্ব পশ্চাতে।—যাইতে যাইতে শকুন্তল বলিলেন "ওলো অনসূয়া! একটু দাঁড়ানা ভাই। আমার পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটেছে, কুরুবক-শাখায় আঁচল আটকাইয়া গিয়াছে—ছাড়াইয়া নি—একটু দাঁড়ানা ভাই, এই বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে দেখিতে লাগিলেন—রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন——" সকলেই গেল, তবে আমিও যাই।" ইহাই আমাদের চিত্র।

—শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি, ১২৯৩ সাল

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

প্রতিধ্বনি

হিংস্র কে?—যাহা খাদ্য,—যাহা না খাইলে প্রাণ থাকে না, তাহা যে খায় তাহাকে হিংস্র বলিবে কেন? ভালুকেরা নিরামিষভোজী, অথচ বৃথা ক্রোধে মানুষ মারিয়া ফেলে; এ অন্যায় না করিলে মানুষেরা ভালুক মারিত না। বাঁদরেরা যাহা খায়না তাহাও বাঁদুরে খেয়ালে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া শেষ করে, এবং মানুষকেও আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারে। নিরামিষাশী ষাঁড়েরাও ভীষণ শিং নাড়া দিয়া বেড়ায়। নিরামিষভোজীদের অন্যায় ক্রোধ ও অসংযমের এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। বাঘেরা যাহা খায় তাহাই ধরে,—অন্য কিছুর উপর উৎপাত করে না। ইঁদুরেরা তাহাদের গা ঘেঁষিয়া উচ্ছিষ্ট খাইয়া যায়—বাঘেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। নিরামিষ পদার্থ দিয়াই নেশার জিনিষের সৃষ্টি হয়, এবং পেটে নিরামিষ পদার্থই মাদক হইয়া থাকে। যাহাই হউক মানুষকে যাহারা মারে তাহাকেই আমরা হিংস্র বলি,—দোষ গুণের বিচার করিয়া বলি না।

* * *

বৈজ্ঞানিক লোয়েব—এ যুগে যাঁহারা জীব-বিজ্ঞানের নূতন তথ্য বাহির করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের জ্যাকেস লোয়েব (Jacques Loeb)

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই অসাধারণ জ্ঞানীর সহিত সকলেরই পরিচয় থাকা উচিত কিন্তু ইঁহার আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানের কয়েকটা মোটা কথাই লেখা চলে। (১) অনেক পতঙ্গ আলোকের দিকে ছুটিয়া যায় ও আগুনে পুড়িয়া মরে; ইনি দেখাইয়াছেন যে পতঙ্গদের পাখার কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়াতেই সেটা ঘটে, এবং যখন তিনি পতঙ্গের পাখায় ঐ রাসায়নিক ক্রিয়া বদলাইয়া দিয়াছেন, তখন আর তাহারা আলোকের দিকে ছুটিয়া মরিতে যায় না। জীবের মধ্যে যে তাহাদের শারীরিক পদার্থের রসায়নিক ক্রিয়ার ফল, তাহা অনেকখানি প্রমাণিত হইয়াছে: (২) অনেক "ইচ্ছা-শক্তি" জীবের ডিম, শরীরের মধ্যেই পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই বাহির করিয়া লইয়া, ইনি নানা রাসায়নের সাহায্যে সে গুলিকে পরিপক্ক করিয়া তুলিয়া জীবন্ত জীবের বিকাশ করিয়া দিয়াছেন, এবং অনেক জীবের শরীরের মধ্যে রসায়নবিশেষ প্রবেশ করাইয়া স্ত্রী-জীব গুলিকে পুরুষ করিয়া দিয়াছেন। (৩) জীবের ডিমে রাসায়নিক ক্রিয়া ওলট-পালট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হাতের যায়গায় মাথা গজাইয়াছে, মাথার যায়গায় হাত গজাইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যথার্থ জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিনা বলিয়া, জড়ের পরিবর্ত্তনে জীবনের বিকাশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। এই সকল পণ্ডিতদের অনুসন্ধানে জড়ের মহিমা দিন-দিন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

* * *

পৃথিবী ও সাগরের সম্পর্ক—পৃথিবীর স্থল ভাগটা অর্থাৎ উহার কঠিন খোসাটা আগে জন্মিয়াছিল ও তাহার অনেকযুগ পরে সাগরের বা জলের জন্ম। এ বিষয়ে কিন্তু সাধারণ লোকের বড়ই উল্টা ধারণা আছে। পৃথিবীর খোসাটার অনেক স্থানে নানা কারণে যে সকল বড় বড় গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল সেই গর্ত্তগুলি ভরিয়া যখন জল দাঁড়াইল, তখন সেই জল হইল সাগর। পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্র জন্মের পরে অথবা সমুদ্রের পেটে জন্মে নাই। জল জন্মিবার পর জল-স্থলের মিলনেই হয়ত প্রথমে জীব অথবা জীবনের উদ্ভব হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, সাগরের জলেই প্রথমে জীবের জন্ম হইয়াছিল।

* * *

বুড়ার নব যৌবন—চিরযৌবন মানুষের চিরদিনের আশার স্বপ্ন। বালকেরা তাড়াতাড়ি যুবা হইতে চায়, আর বুড়ারা যযাতির মত যৌবন ফিরাইয়া আনিতে চায়। ডাক্তার ষ্টাইনাক্, ইঁদুরের উপর চিকিৎসা চালাইয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে নিতান্ত পক্ষে দশ বৎসরের জন্য জরা তাড়াইয়া যৌবন ফিরাইতে পারা যায়। জর্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে এই চিকিৎসার বহু পরীক্ষা হইয়াছে, আর পরীক্ষক ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, নূতন চিকিৎসা কৌশলে বুড়ারা নব যৌবন পাইতে পারিবে। মরণ পর্য্যন্ত বুড়ারা যদি ভীমরথা এড়াইতে পারে, তবে ভোগের যৌবন লাভের চেয়ে সুখকর হইতে পারে।

* * *

যুগ ধর্ম্ম

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—পুত্রে পিণ্ড প্রয়োজন ;
সে সব এখন কথার কথা শাস্ত্রের বৃথা আস্ফালন।

এখন আমরা সে সব বিধি, সে সব বিচার ছেড়ে দিয়ে,
শুধু বিলাস সম্ভোগ তরে আন্‌চি মনের মতন প্রিয়ে।
চক্ষে এখন সোণার চশমা, কারণ দৃষ্টি বড়ই সূক্ষ্ম,
পাশ্চাত্যেরই অনুকৃতি কর্‌লেই ঘোচে সর্ব্ব দুঃখ।
রূপের দিকেই খুল্‌বে নজর রূপের তৃষায় ফাট্‌চে প্রাণ,
ধর্ম্মভীরুর সম্পদ লোটে পুরুষকারে বুদ্ধিমান।
আত্মত্যাগের অর্থ এখন, স্বার্থসিদ্ধি ষোল আনা ;
পরার্থেই এ 'মোটর' চড়া পরার্থেই এ আর্য্যয়ানা।
এ সাহেবি আর্য্য সাজায় দেশাত্মবোধ জ্বল্‌চে রেগে
ভাইদের আতুর ফতুর করে উঠ্‌চে চতুর প্রচুরবেগে।
দেশের ছেলে দিশেহারা একূল ওকূল দুকূল ভ্রষ্ট
বিদ্যা যে চাই অর্থকরী অর্থ নইলে জীবন নষ্ট।
মাটিতে আর নাইক শিকড়, বাড়ছে সবাই টবের তরু,
হন্যের মতন ছুট্‌ছে বেগে দড়ি ছেড়া বাঁধা গরু।
'ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ' মন্ত্রদ্রষ্টা মুনির কথা ;
ঋণের পূজায় চল্‌ছে জগৎ রাজ্য ভোগ আর সুসভ্যতা।
শাকান্ন আর পায়না খেতে অঋণী কি অপ্রবাসী,
ঘরের অন্ন নিঃশেষে শেষ কর্‌ছে জাহাজ সর্ব্বগ্রাসী।
সেকালের সব মেয়েদের কাজ পুরুষেরা নিচ্চেন হাতে,—
ঘর ঘর ঘর চর্‌কা ঘুরাও থাক্‌বে সুখে দুধে ভাতে।
দেশোদ্ধারে মহিলারা যাচ্চেন হেসে কারাগার,
রাজা প্রজার ভঙ্গী দেখে ভক্তি এখন পগার পার।
পায়ে মাথায় এক হয়েছে বুঝবে কে আর ইহার মর্ম্ম ;
কাণ্ডারী যে ছাড়ে বা হাল ধন্য বটে যুগধর্ম্ম।
হুজুগবশে আসল ছেড়ে চালিও না আর নকল ভেল ;
মাথাটি বেশ ঠাণ্ডা করে' যে যার চর্‌কায় দাওগে তেল।

শ্রীরসময় লাহা

বিপদবারণ

শিল্পী—শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাস

মহাভারতের অর্থনীতি

নূতন বৎসরে আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মহাভারতের কথা শুনাইতে আদেশ করিয়াছেন। "যা' নেই ভারতে, তা' নেই ভারতে।" অর্থাৎ, যাহা মহাভারতে নাই, তাহা ভারতবর্ষে নাই। সুতরাং আপনাদিগকে মহাভারতের কোন্ কথা ছাড়িয়া, কোন্ কথা বলিব তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তথাপি, আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমানে অর্থনীতির আলোচনা লইয়া যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে মহাভারতে এই বিষয়ের কিরূপ আলোচনা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে দু'একটী কথা বলিলে, বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মহাভারত ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বলা সুকঠিন; আমি অদ্য সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহি না। খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যে ইহার রচনা হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। এবং ইহাও ঠিক যে, পঞ্চনদে আর্য্যগণের বসতির কিছু দীর্ঘকালই পরে ইহা রচিত হইয়াছিল।

আমার মনে হয় যে, মহাভারতীয় যুগে তৎকালীন অধিবাসীদের অনেকাংশে বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর আমরা অর্থের প্রতি এরূপ আসক্তি দেখিতে পাই না। প্রকৃত পক্ষে, ধর্ম্ম এবং অর্থকে প্রায় একাসনেই স্থাপিত করা হইয়াছে। নারদ যুধিষ্ঠিরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ একই সময়ে চিন্তা করেন কিনা? রাত্রির শেষ ভাগে নরপতি ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় মনে করেন ত? (সভা—৫, ৮৫।৮৬)। প্রধান পাণ্ডব অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৃদ্ধগণের নিকট ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন কি না? (সভা, ঐ ১১৬)। নারদ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার আয়ের অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ দ্বারা ব্যয়ের পূরণ হইয়া থাকে ত?" (সভা ঐ ১৬)। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অর্থ শব্দে সে সময়ে (রামায়ণেও এই অর্থ দৃষ্ট হয়) অশ্ব, গাভী, শিল্পজাত এবং ভূমিজ দ্রব্য অন্তর্ভূত হইত। বর্ত্তমান কালে অর্থ বলিলে যে দ্রব্য বিনিময় হইতে পারে তাহাই বুঝায়, কেবল প্রচলিত মুদ্রা বুঝায় না। মহাভারত-যুগেও অর্থ অর্থে অনেক পরিমাণে সেই কথাই বুঝাইত।

মহাভারতীয়যুগে, সাধারণতঃ, কৃষিকার্য্যকে কথঞ্চিৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও, নরপতি কৃষির উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। তাই নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার রাজ্যের কৃষকেরা ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যকতা নাই ত? কৃষিজীবীদিগের কাজ ও অন্নের হানি হয় না ত?" (সভা)। রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত কৃষির একান্ত আবশ্যকতা বলিয়াই মুনিপ্রবর নরপতিকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া কৃষিজীবীকে

সানুগ্রহ মনে ঋণদান কর ত ? তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদান এই চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা সচ্চরিত্র মানবগণ কর্ত্তৃক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতা হয় ত ? শৌর্য্য ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন 'পঞ্চব্যক্তি পৌরপালন, দুর্গপালন, বণিক্‌পালন, কৃষিপর্য্যবেক্ষণ ও দুষ্টলোকের শাসন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার জনপদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন ত ?" (সভা)। এইজন্যই শান্তিপর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন যে, "কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ পীড়িত হইলে রাজা নিন্দনীয় হইয়া থাকেন।" তাই তিনি পুনরপি উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, "রাজ্যস্থ কৃষিজীবিগণ যেন রাজ্যপরিত্যাগ না করে।" (শান্তি)।

বণিক্‌-পালনও রাজার অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। বণিক্‌গণ যথাযথ শুল্ক প্রদান করিতেন বটে, কিন্তু রাজধানী ও রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহারা নিরাপদে থাকিতে পারিতেন ; পথিমধ্যে যাহাতে তাঁহারা কোনরূপ বিপদে না পড়েন তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। (সভা)। পিতামহ ভীষ্ম শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, "যে সকল বণিক্ তোমার রাজ্যে পণ্যাদি ক্রয় করে এবং যাহাদিগকে বনে বা অগম্য জনপদে বিশ্রাম বা নিদ্রা যাইতে হয়, তাহারা যেন অতিরিক্ত শুল্কভারে কদাপি প্রপীড়িত না হয়।"

মহাভারতীয় যুগে জাতিভেদ যথাযথরূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চারিবর্ণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাভারতে অনেকস্থলে উপদেশ দৃষ্ট হয়। অর্থনীতি হিসাবে বৈশ্যের কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং আমরা এই স্থলে উহাই উদ্ধৃত করিব। "বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং অনুরাগ-সহকারে পিতার ন্যায় পশুগণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতীয় জা ও বৈশ্যগণকে পশুসকল প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং বৈশ্য তদনুসারে পশুরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেই সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে, এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। যে বৈশ্য ছয়টী ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতনরূপে একটী ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে। প্রত্যেক গো-রক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতনরূপে একটা গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ ও ক্ষুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ অংশ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবাৎসরিক বেতন। বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেনা এবং তাহারা সম্মত থাকিলে অপর কোন বর্ণেরই পশু রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।" (শান্তি)। অন্যত্র দেখিতে পাই যে, বৈশ্য ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিবার সময় যথাযথ তুলাদণ্ড ব্যবহার করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারত পাঠে মনে হয় যে, বর্ণসঙ্কর সেই সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কোন কোন ব্যবসায় বংশপরাক্রমিক হইয়া আসিতেছিল।

সমুদ্রগামী বণিকের ব্যবসায় নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, মহাভারত-যুগে আমরা কয়েকস্থলে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ পাই। সভাপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সর্ব্বকনিষ্ট পাণ্ডব সহদেব দ্বীপমধ্যস্থ ম্লেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। জতুগৃহ হইতে রক্ষার্থ বিদুর, কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য যন্ত্রচালিত নৌকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সভাপর্ব্বে দুইস্থলে (৬৫।২১, ৭২।৩) সমুদ্রের সহিত দুঃখরাশির তুলনা করা হইয়াছে। দ্রোণপর্ব্বে সমুদ্রে পরিত্যক্ত জাহাজের নাবিকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ণপর্ব্বেও এবম্প্রকার ঘটনার কথা বলা হইয়াছে। শল্যপর্ব্বের ৩।৫ এও এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বে সমুদ্রগামী বাণিজ্যের কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহাভারতে উল্লিখিত সমুদ্রমন্থনের বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে, দেবতা ও অসুরের বিবাদ সম্পর্কে সম্ভবতঃ আর্য্য ও অনার্য্যের সমুদ্রের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের কথাই বলা হইয়াছে।

অর্থনীতির দিক হইতে মহাভারত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, যুধিষ্টিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে যে সকল পণ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পণ্য সমুহের নাম, বর্ণনা ও তাহারা যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাদের তালিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কাম্বোজের পশুগণের চর্ম্ম, শিল্পজ ও ভূমিজ নানারূপ পণ্য, গান্ধার প্রেরিত হরিণ চর্ম্ম ও অশ্ব, প্রাগ্‌জ্যোতিষের হস্তিদন্তনির্ম্মিত এবং হীরকখচিত তরবারী, পার্ব্বত্যজাতিসমূহপ্রেরিত শ্বেত-চামর এবং মধু, কিরাতগণ-আনীত চন্দন, মুসব্বর এবং মূল্যবান চর্ম্ম, মগধবাসিগণ প্রেরিত হস্তী এবং সুবর্ণখচিত আস্তরণ, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহের মণি, মুক্তা, "চীন" দেশে প্রস্তুত কম্বল এবং বস্ত্র, চোলদেশীয় মুক্তা—সকল প্রকার দ্রবই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শোভা পাইয়াছিল।

অর্থনীতি এবং অর্থশাস্ত্র, উভয় দিক হইতেই মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব একটী অবশ্য পঠনীয় অধ্যায়। জানিনা, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায়, একস্থানে এই দুই বিষয় সম্বন্ধীয় এত কথা আর আছে কি না। রাজার কর্ত্তব্য, রাজনীতি সম্বন্ধীয় গভীর উপদেশাবলী আর কুত্রাপি এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা মহাভারতোক্ত রাজকর গ্রহণের প্রথা প্রথমে আলোচনা করিব।

মহাভারতকার বলিয়াছেন, "যেমন বৎস সকল মাতৃস্তনবিচ্ছিন্ন না করিয়া স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং অলিকুল পাদপকে পীড়িত না করিয়া মধু পান করে, রাজা তদ্রূপ রাষ্ট্র হইতে ধনদোহন করিবেন। ব্যাঘ্রী যেরূপ পুত্রগণকে সম্যকরূপে দংশন করতঃ পীড়িত না করিয়া হরণ করে এবং জলৌকা যেমন মৃদুভাবে রুধির পান করে, নরপতি তদ্রূপ রাজ্যভোগ করিবেন। যেমন তীক্ষ্ণতুণ্ড মুষিক অতীক্ষ্ণ উপায় দ্বারা নিদ্রিত মানবের পদতলস্থ মাংস এইরূপে ভক্ষণ করে যে, তাহাতে শয়ান ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বেদনা বশতঃ ঈষৎ পাদসঞ্চালন হইলেও, তাহাকে ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে হয় না, মহীপতিও সেইরূপ রাজ্য ভোগ করিবেন। প্রজাপাল মহীপতিও প্রথমতঃ প্রজাগণের নিকট অল্প অল্প কর আদায় করিয়া বর্দ্ধিত করতঃ পর পর বর্ষে অধিক করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন"। (শান্তি ৮৮)।

শান্তিপর্ব্বের ১৩৯ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা প্রজার এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করিবেন। অন্যত্র দেখিতে পাই যে, "নৃপতি, গণনায় অধিক না হয় এইরূপে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রূপ বলি, শাস্ত্রানুসারে অপরাধিগণের দণ্ড এবং পথমধ্যে বণিক্‌গণকে রক্ষা করিয়া যে বেতন প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারাই ধনসঞ্চয় করিবেন। নৃপতি এইরূপে ধান্যাদির ষষ্ঠাংশরূপ কর গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন, পরন্তু যদ্যপি তাহাতে তাহাদের বার্ষিক আহারযোগ্য ধান্যাদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আহারের উপায় করিয়া দিবেন।" (শান্তি, ৭১)। করগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে যাহাতে রাজাপ্রজা উভয়েরই উপকার হয় তজ্জন্যই রাজা কর গ্রহণ করিবেন। (শান্তি ৮৮)। বস্তুতঃ, মহাভারতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে রাজার প্রজাবর্গ সর্ব্বদা করভারে প্রপীড়িত, সে রাজা নিশ্চিতই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। (শান্তি—১৪৯)।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স্‌ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার আলোচনা না করিয়া পারিতেছিনা। অধ্যাপক প্রবর Journal of the American Oriental Societyর ত্রয়োদশ বৎসরের সংখ্যায় এই সম্বন্ধে একটী অতি সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মহাভারতে রাজা এক ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণে আদিষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য এ কর কিছু বেশী নহে। বিপদের সময় তিনি ইহাপেক্ষা অধিক কর গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যে পরিমাণে কর গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে প্রজাদিগকে নিরুপদ্রব না রাখিলে তিনি প্রজাবর্গের পাপের জন্য দায়ী হইবেন। ইহার সমালোচনা কালে তিনি বলিয়াছেন যে, এরূপ উপদেশ ফলবাদের হেতুতেই দেওয়া হইয়াছে—কার্য্যকরী উদ্দেশ্যে এরূপ বলা হয় নাই। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে "মহাভারতেরই অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে যাহাতে তাঁহার বাৎসরিক ব্যয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিক না হয় তজ্জন্য রাজাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, যদি তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ব্যয় করিতে হয় তবে তিনি যেন প্রয়োজনানুযায়ী কর বৃদ্ধি করেন, যাহাতে আয় ব্যয় অপেক্ষা সকল অবস্থাতেই বেশী হয়।"

অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স্‌ আরও বলিয়াছেন যে, "মহাভারতকারের মতে করগ্রহণ ব্যতীত রাজ্য চলিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ তিনি এই কথারই অবতারণা করিয়াছেন। নরপতির রাজ্য, সৈন্য, সুখ, ধর্ম্ম সবই অর্থের উপরেই নির্ভর করে, একথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বসন যেরূপ নারীর অনাবৃততা ঢাকিয়া দেয়, তদ্রূপ অর্থও নরপতির পাপ আবৃত রাখে। সাধারণতঃ, অত্যধিক কর গ্রহণ করিতে রাজা নিষিদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহার রাজকোষ যেন পরিপূর্ণ থাকে। রাজকোষ পরিপূর্ণ রাখিবার জন্য যদি করবৃদ্ধি করিতে হয়, তাহাতে যেন তিনি দ্বিধা না করেন। অর্থই সর্ব্বপ্রধান বস্তু—দরিদ্রতা পাপ।"

বস্তুতঃ ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

সকল বিষয় সম্বন্ধেই নানারূপ ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণ বিক্ষিপ্ত পদ গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছা অর্থ করেন। অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স্‌ সুপণ্ডিত, ভারতীয় শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তথাপি, তাঁহার ন্যায় সুধীও অর্থগ্রহণে ভ্রমপ্রকাশ করেন। আমরা তাঁহার যে প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি সেই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, পুরোহিত, যোদ্ধা, সাধারণ ব্যক্তি, বর্ব্বর, উচ্চনীচ সকলেই স্বেচ্ছানুসারে নরপতিকে কর প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত শান্তিপর্ব্বে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, নরপতি যেন কদাপি অশক্ত ব্যক্তির উপর কর গ্রহণ না করেন; তিনি যেন শাস্ত্রানুসারে কর নির্দ্ধারণ করেন। অধিকন্তু, কোন রাজকর্ম্মচারী করসংগ্রহে প্রজা পীড়ন করিলে, নরপতি যেন অবশ্য অবশ্য তাহাকে পদচ্যুত করেন, ইহাও পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাই।

বস্তুতঃ পক্ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বৃত্তান্তসমূহ আলোচনা করিতে হইলে একটী বিষয় অনুক্ষণ মনে করা কর্ত্তব্য—শাস্ত্রাদেশ। শাস্ত্রে কথিত আছে, লোভবশতঃ বা অন্যায়াচারণ পূর্ব্বক নরপতি যেন কদাপি নিজ কোষপূরণে ইচ্ছুক না হয়েন। নরপতি ধর্ম্মাচরণ করিলে স্বর্গগামী হইবেন, নতুবা তাঁহাকে নরকে যাইতে হইবে, একথা কেহ বিস্মৃত হইতেন না। যে নরপতি শাস্ত্রাদেশ বিস্মৃত হইয়া করের জন্য প্রজাপীড়ন করে সে নিজ আত্মাকে নরকগামী করে,—এ উপদেশ তৎকালীন রাজন্যবর্গ কদাচিৎ বিস্মৃত হইতেন। শাস্ত্রাদেশ সহজে কেহ অমান্য করিতেন না, করিতে সাহসীও হইতেন না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

শ্রীবাস—ঈশ্বরগুপ্ত

কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীবাসের বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়; শ্রীবাস ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। একদা চৈতন্য-প্রভু বলিয়াছিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মীরও যদি ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের পরিবারবর্গ দরিদ্র হইবেন না; সেই আশীর্ব্বাণীর শেষ আলো-শিখা শ্রীবাসের পতনোম্মুখ বাড়ীর চূড়া হইতে যেন এখনও বিকীর্ণ হইতেছে। এই শ্রীবাস অল্পবয়সে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু এক সন্ন্যাসী এক দিবস প্রাতে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিয়া যান, "শ্রীবাস, এক বৎসরের মধ্যে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।" শ্রীবাস এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সংসারে আসক্তি-বিহীন হইয়া ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে ইঁহাদের প্রকাণ্ড বাটী ছিল, একদা সেই বাটীর আঙ্গিনা গৌরলীলার প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল,—এই আঙ্গিনায় অন্তরঙ্গ পবিবারগণের সঙ্গে গৌর নৃত্য

ও কীর্ত্তন করিতেন। কত রাত্রি যে সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে পোহাইয়া যাইত তাহার অবধি নাই। গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের পর একদিন শেষ রাত্রে শ্রীবাস-পত্নী মালিনী বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, কে যেন সেই আঙ্গিনায় পড়িয়া লুটাপুটি করিয়া অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছেন, কাছে আসিয়া দেখেন সোণার গৌরাঙ্গকে হারাইয়া শচীমাতা বিনিদ্রচক্ষে সেই আঙ্গিনার ধূলি আলিঙ্গন করিয়া জুড়াইতে আসিয়াছেন, কারণ এই আঙ্গিনায়ই তো গোরা লুটিয়া পড়িয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেন। তখন মালিনী শচীমায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরের সন্ন্যাসের পরে শ্রীবাস ফুলের সাজি লইয়া স্বীয় বাগানে দেবপূজার জন্য কুন্দ ফুল তুলিতে যাইয়া গোরাকে স্মরণ করিয়া সাজি ফেলিয়া কাঁদিতে বসিতেন এবং গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া গৌর-

শ্রীবাসের বাটী—কাঁচড়াপাড়া।

বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, পূজা আহ্নিক ও স্নানাহারের কথা ভুলিয়া যাইতেন, সূর্য্যকে পশ্চিমের পাটে অস্তগামী হইতে দেখিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চক্ষের অফুরন্ত অশ্রুস্রোত ডান হাতে মুছিতে থাকিতেন। পুরীতে যাইয়া প্রাণের গোরার কীর্ত্তনে শ্রীবাস এমনই মাতিয়া যাইতেন যে ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার কাছে যাইবার আগ্রহে তিনি রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের গায়ের উপর দুইবার পড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী হরিচন্দন তাঁহাকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করাতে শ্রীবাস তাঁহার গণ্ডে চড় মারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র ক্রুদ্ধ মন্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"এঁর উপর রাগ ক'রোনা, মন্ত্রী, ইনি প্রভুর প্রতি এত অনুরাগী যে আমরা ইহার পায়ের ধূলি লইবার যোগ্য নহি।" সেই শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত নবদ্বীপের আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভশায়ী, কিন্তু সেই ভক্তচূড়ামণির এই ভগ্ন আবাসখানির সঙ্গে কত ভক্তির স্মৃতি জড়িত আছে, তাহা বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠনিরত ব্যক্তি মাত্রেরই

মানস-পটে উদিত হইবে। লতাগুল্মজড়িত পতিত ও পতনোন্মুখ গৃহগুলি বাঙ্গালীর কাছে দেব-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র।

এইবার হালিসহরে আসুন। বঙ্গদেশের এই গ্রামগুলি ঐতিহাসিকের উপেক্ষার জিনিষ নহে; আশে পাশে সমস্তই প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন; এই হালিসহর ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম স্থান, তাঁহার সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অপেক্ষা আর বড় নাম কাহারও ছিল না, তাঁহার রসিকতায় বঙ্গীয় জীবন এক সময়ে সরস, মধুর হইয়াছিল। তিনিই বঙ্গের পল্লীগুলি ঘুরিয়া প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নতুবা বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের একটা দিক এখনও পর্য্যন্ত আঁধার হইয়া থাকিত,—ভারতচন্দ্র, রামবসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতাম না। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর ও গুড়গুড়ি ভট্টাচার্য্যের লড়াই এক সময় এমন জমিয়া গিয়াছিল যে বঙ্গীয় উচ্চ সমাজকে তাহা বহুদিন

ঈশ্বরগুপ্তের ভিটা—হালিসহর।

সরগরম রাখিয়াছিল, তাহার কাব্যাংশ ও অশ্লীলাংশ দুইই তখন মিলিয়া কর্দ্দমাক্ত বন্যার জলের ন্যায় বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বিদেশী ভদ্রলোকগণ সেই পাঁকের দুর্গন্ধ বরদাস্ত করিয়া না পারিয়া লং সাহেবকে মুখপাত্র করিয়া অশ্লীল রচনা দণ্ডনীয় করিবার বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারে আরজী পেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে বাঙ্গালীরা জানিতেন, ঈশ্বর চন্দ্রের প্রতিভার নিকট অগ্রসর হইতে পারে এমন মনস্বী বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন নাই; কোন আশ্চর্য্য-গঠন মন্দির যেমন আস্তর ও কারুকার্য্যবিহীন হইয়া পুরাতন শ্রীর কঙ্কালের মত পড়িয়া থাকে, আজ ঈশ্বর গুপ্তের বঙ্গ-বিজয়ী প্রতিভাশ্রী তেমনই হীনশ্রী হইয়া গিয়াছে। সেই পরিহাস আমাদের ঠাকুরদাদাদের প্রীতিকর ছিল। তাঁহার রচনা-ভঙ্গী এক সময়ে অভিনব ছিল, এজন্য এতটা আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে—সেই প্রাচীন রসের ধারা আমাদের কাছে কতকটা বিরস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাসত্বেও যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, সেই যুগের উপর তাঁহার প্রতিভার

প্রবল ছাপ রাখিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার অঙ্গুলী-অঙ্কিত জয়-চিহ্ন কপালে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই দেখুন তাঁহার ভিটার অবস্থা, এই সাহিত্যরাজের সিংহাসনের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্যই নাই,—এই ভিটা সিন্দুরহীন রমণীললাটের ন্যায় কি আমাদের নিকট একান্ত শ্রীহীন মনে হয় না? কে আসিবে এস, ফুলের অর্ঘ্য দিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া, মেলা বসাইয়া এই জায়গাটুকুর উপর মর্য্যাদা দেখাইয়া যাও। তোমাদের ঘরের ইতিহাস লক্ষ্মী যে বাঙ্গলার কোণে কোণে অশ্রু বিসর্জ্জন

ঈশ্বরগুপ্তের সহচর—উমেশ পরামাণিক।

করিতেছেন, সে অশ্রু মুছাইবার লোক কোথায়? এই শূন্য ভিটা, এই জঙ্গল আমাদের প্রাচীনের প্রতি অকৃতজ্ঞতা-সূচক, আমাদের গৌরবের কলঙ্ক, যাঁহাদের আমরা পূজা করিব তাঁহাদের যে আমরা চিনি না, সেই অজ্ঞতার অপযশ, আর কি বলিব?

এইস্থানে উমেশচন্দ্র পরামাণিক নামে এক ব্যক্তি বাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন, তখন ইঁহার বয়স ছিল উনিশ। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৪৭। উমেশ পরামাণিকের বয়স এখন ৯২, তাঁহার ফটো দেওয়া গেল।

উমেশচন্দ্র, গুপ্ত কবির সঙ্গে ঠিক একত্র খেলা ধূলা করেন নাই সত্য, কিন্তু যে মজলিসে প্রবীণ কবি বসিতেন তাহার একপার্শ্বে বসিয়া পরামাণিক মহাশয় কিশোরে ও নব-জীবনে তাঁহার আলাপ ও কৌতুকে নীরবে যোগদান করিয়াছেন। গুপ্ত কবির এই প্রতিবেশীটির নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরামাণিক মহাশয় ৫২ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার পাঠশালায় ৩০।৪০ টি ছাত্র,—গ্রামের সকলেই কোন না কোন সময়ে পরামাণিক মহাশয়ের

করধৃত বেত্র দর্শনে ভীত হইয়াছেন। ৯২ বৎসর বয়সেও ইঁহাকে চশমা নিতে হয় নাই এবং ইনি রোজ ৩।৪ মাইল হাঁটিয়া বেড়ান। দন্তপংক্তি এখনও শ্রেণীবদ্ধ, কালের কুঠার এখনও তাহাদের মূলোচ্ছেদ বা শিথিল করিতে পারে নাই; সাদা চুলের প্রাচুর্য্য হইলেও কালো চুল বিরল নহে। ইনি একটা ছড়া জানেন, তাহা এ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই—উহা গুপ্ত কবির বাল্য-রচনা। ছড়াটি এই —

হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, যত সব ঘোর পাষণ্ড
কর্ম্ম কাণ্ডে দিয়া বিসর্জ্জন।
বলেন 'মরা গরুর কাটি ঘাস', ব'লে করেন উপহাস
ভাবেন আমি বড় বিচক্ষণ।
প'ড়ে—পাতা দুই ইংরেজী বই, সদা ঐ কথা কই
বাঙ্গলা কথা কন্ না আর মুখে।
বসেন না ব্যতীত চেয়ার, সদাই মুখে ড্যাম শূয়ার
সভ্য হন সহরেতে থেকে।
হয় যদি যথার্থ বিদ্যে তা হ'লে তার মনোমধ্যে
কুসংস্কার কদাপি থাকেনা।
অল্প বিদ্যা হ'লে পরে, অত্যন্ত যাতনা বাড়ে
অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পা দেন না।
আহার করেন পায়ে জুতো, পৈতাকে বলেন সামান্য সুতো,
* * * * *
ভাবেন আমি জ্ঞানে পরিপক্ক, বাপের সঙ্গে নাই সম্পর্ক
* * লয়ে করেন কাল যাপন।
বাবুর কালিয়া কোপ্তা তৈরী হ'ল, বাবুর্চ্চিতে লয়ে এল
খেতে বসেন এয়ার ছত্রিশ জেতে
এখন হয়েচে চাল, লাগেনা দিশী ভাল
আসনে বসেন না ভোজন কর্‌তে
বলেন ব্যঞ্জনেতে খাম্‌চে খাম্‌চে, পরিশ্রমে গা ঘাম্‌চে
চাম্‌চে হলে সুবিধা হয় খেতে।"

এই ছড়ার আরও অনেকটা আছে, তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ দেখিবেন দাশরথীর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবনিন্দাসূচক ছড়াটি যাহাতে—"গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে" প্রভৃতি কথা আছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্তের এই ছড়াটির প্রতিধ্বনির মত। বাল্যবয়সে যখন গুপ্ত কবি এই ছড়া লিখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার তেমন হাত পাকে নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আইন আদালত

রেলযাত্রীর অবশ্য জ্ঞাতব্য—রেলের গার্ড প্রভৃতি সাধারণ কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস (কাজেই সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস,) যে যদি গাড়ীতে আগুন লাগে, ডাকাত ঢোকে অথবা ঐ রকমের দুর্ঘটনা ঘটে, তবেই এলার্ম বেল (বিপদের ঘণ্টা) টানিয়া গাড়ী থামান যাইতে পারে, নহিলে ঘণ্টা টানিলে দণ্ড হয়। সম্প্রতি ঈশ্বরদাসের মোকদ্দমায় পাটনা হাইকোর্টে স্থির হইয়াছে যে, অন্য রকমের বে-আইনী ঘটনাতেও যাত্রীরা ঘণ্টার শিকল টানিতে পারেন। ঈশ্বরদাস যে গাড়ীতে ছিল, তাহাতে ২৭ জনের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; একটা ষ্টেশনে বেশী লোক ঢুকিতেই ঈশ্বরদাস গার্ডকে তাহা জানাইল কিন্তু প্রতিকার পাইল না। কামরাতে লোক হইয়াছিল ৭০ জন। গাড়ী চলিবার পর ঈশ্বরদাস শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইল, আর সেই অপরাধে ধানবাদের হাকিম তাহাকে দণ্ডিত করিলেন। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ ঈশ্বরদাসকে মুক্তি দিয়া তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন যে, রেলের আইন ভঙ্গ করিয়া অধিক লোক গাড়ীতে আসায় যাত্রীদের যে অসুবিধা হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের জন্য শিকল টানায় অপরাধ হয় নাই; বরং ঈশ্বরদাস ধন্যবাদের পাত্র। এই বিচারের মর্ম্মটি সকল রেল ষ্টেশনে প্রচারিত হওয়া উচিত। —(কলিকাতা উইকলি নোট্‌স্ ১৯২২ ; উপপৃষ্ঠা ৬৫)।

* * *

বহুপতিত্বের অপরাধ—একজন হিন্দুর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নয় বৎসরের মেয়েকে লইয়া বাপের বাড়ী যায়, ও সেখানে অনেক টাকার লোভে তাহার মেয়েটিকে চল্লিশ বছরের একটি দুষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহ দেয়। কন্যাদানে কর্ত্তৃত্ব হইতেছে পিতার। মেয়েটির পিতা এই বিবাহের সংবাদ পাইয়াই মেয়েকে আপনার দখলে আনে, ও ভাল বর স্থির করিয়া তাহাকে আবার বিবাহ দেয়। আগেকার বুড়া বর তখন সেই মেয়ের বাপ ও নূতন বরকে বহুপতিত্ব অপরাধের সাহায্যকারী বলিয়া নালিশ করে ও বিচারে তাহাদের দণ্ড হয়। পঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারক জজেরা বলিয়াছেন যে, হয়ত বা কন্যার পিতা প্রথম বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়া বিচার করাইয়া লইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন কন্যার মাতা অন্যায়রূপে বিবাহ দিলেও ঐ বিবাহকে উপযুক্ত বিবাহ বলিয়াই ধরিতে হইবে; কাজেই পতি থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণের অপরাধ হইয়াছে।—(২ লাহোর, ২৮৮)। উইক্‌লি নোট্‌স্ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে কন্যার পিতার অপরাধ হওয়ায় আমাদের সমাজই দায়ী, এবং যাহাতে বর্ণিত অবস্থায় প্রথম বিবাহ একেবারেই বিবাহ নহে বলিয়া হিন্দু সমাজ প্রচার করেন তিনি তাহারই উদ্যোগ করিতে বলেন।

* * *

উকিলের ফিস্—এই বিষয়ে সম্প্রতি মান্দ্রাজ হাইকোর্টে যাহা বিচারিত হইয়াছে তাহা সকলের জানা উচিত।—(ল-রিপোর্ট, ৪৪ মান্দ্রাজ, ৯০৮)। একজন মক্কেল উকিলকে যত টাকা ফিস্ দিবে বলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ না দেওয়ায় উকিলটী যথাসময়ে আদালতে কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য উকিল নিযুক্ত করিবার পক্ষে মক্কেলকে অনুমতি দেন নাই; মক্কেলটি অন্য উকিল নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাইবার সময়ে হাইকোর্টে তর্ক ওঠে যে, প্রথম উকিলের টাকা শোধ না দিয়া সে কাজ চালাইতে পারে কিনা। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রথম নিযুক্ত উকিল তাঁহার প্রাপ্য টাকার জন্য নালিশ করিতে পারিতেন অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু মক্কেলকে উপযুক্ত সময়ে নোটিশ না দিয়া, যথাসময়ে মক্কেলের কাজ ছাড়িয়া দিতে পারেন না, অথবা অন্য উকিলকে কাজ করিতে দিতে বাধা জন্মাইতে পারেন না। অবশ্য বারিষ্টার হইলে তিনি ফিসের জন্য নালিশ করিতে পারেন না এবং উকিলদের মত বারিষ্টার সলিসিটারের কাজও করিতে পারেন না। কাজেই এই রায়টি উকিলদের সম্বন্ধেই খাটে।

* * *

বিলাতি আইনের অযথা প্রসার— কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচার অনুসারে (২৪ উইক্‌লি নোট্‌স্ ৯৮২ পৃ) দণ্ড বিধির মানহানি অপরাধের ধারাটি কোন অংশে অসম্পূর্ণ নয়; কিন্তু মান্দ্রাজের বিচারে (৪৪ মান্দ্রাজ, ৯১৩) ঐ ধারাটি অসম্পুর্ণ, এবং সেই জন্য ইংলণ্ডের "কমন-ল" অবলম্বনে উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মান্দ্রাজের বিচারের এই কথাটুকুতে বিশেষ কিছু আইনবিভ্রাট ঘটেনা; কিন্তু রায়ের এই মন্তব্যটিতে গোল উঠিতেছে যে যেখানেই এ দেশের আইননির্দ্দিষ্ট বিধান পাওয়া যায় না সেখানেই বিলাতি "কমন-ল" ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। এ দেশের প্রেসিডেন্সী সহর গুলিতে অনেক ইউরোপীয়ের বাস এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের বড় বড় আড্ডা আছে; হয়ত সেই জন্যই ঐ সকল সহরে "কমন-ল" প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র উহার প্রসার বড় বিপজ্জনক। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উল্লিখিত মন্তব্যটি কোন্ কোন্ স্থলে চলিবে, অথবা চলিবেনা তাহা অন্য একটি মোকদ্দমায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

* * *

হিন্দু আইনে শাস্ত্র ও প্রথা—যাঁহারা হিন্দু-আইনে শাসিত, তাঁহারা যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশের বিরোধী প্রথা-পদ্ধতিতে শাসিত হইতে পারেন তাহা অনেক মোকদ্দমায় বিচারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের একটি আপিলের বিচারে সম্প্রতি প্রিভিকাউন্সিলে এই নিয়মই সমর্থিত হইয়াছে।(উইকলি নোটস্ ১৯২২-পৃঃ; ৫৩)। হিন্দু-আইনে ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত পুত্রেরা

সকলে মিলিয়া সমান ভাগে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় ; মান্দ্রাজে চেটি (শ্রেষ্ঠী), সম্প্রদায়ে এই প্রথা আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির পত্নীদের সংখ্যা অনুসারে সম্পত্তির ভাগ হইবে, এবং পুত্রেরা যে যাহার মাতাকে ধরিয়া ভাগ পাইবেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও সম্প্রদায়ে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি আছে, সেগুলি সযত্নে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হওয়া উচিত, কারণ মোকদ্দমার বিচারের সময় সকলেই উপযুক্ত সাক্ষী আনিয়া আপনাদের বিশেষ প্রথাগুলি প্রমাণিত করিতে পারেন না। মধ্য-প্রদেশে এবং ওড়িশার সম্বলপুরে অনেক অনার্য্য জাতীয় লোকের মোকদ্দমায় উকিল ও হাকিমেরা "হিন্দু-ল" চালাইয়াছেন, আর বিচারিতেরা অবাক হইয়া উল্টা ব্যবস্থা মানিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের লোকেরা জাতিগত অথবা সম্প্রদায়গত নিয়মগুলি সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।

বৈশাখে

মাহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড—মাহাত্মা গান্ধী জানিতেন এবং অনেকবার একথা বলিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে কারাদণ্ডভোগ অপরিহার্য্য। তিনি নিজে বিচক্ষণ আইনজ্ঞ; বিচারের সময়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বিচারককে বলিয়াছিলেন যে, প্রচলিত আইনের বাঁধা নিয়মে তাঁহাকে দণ্ডিত করাই বিচারপতির কর্ত্তব্য। তিনি এ সকল কথা বলিবার সময়ে তিলমাত্রও "ত্যক্ত জীবিতের" জাঁক দেখাইবার জন্য কিছু বলেন নাই। যাঁহারা তাঁহার শাসন-সংস্কার-পদ্ধতির বিরোধী, তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদাই বিনীতভাবে, অথচ দৃঢ়তার সহিত আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়াছেন; যখন-ই কোন বিষয়ে ভুল বা ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়াছেন, তখনই তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বিচারক তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়াছেন; সকলেই করিবেন। তিনি স্বার্থ-ত্যাগী, সত্য-নিষ্ঠ, কর্ম্ম-প্রাণ, সাধু-চরিত্র ও নির্ভীক দেশ-হিতৈষী। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তিনি যেরূপ ভাবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তেমনটি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * *

অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজে সরকারী সাহায্য—বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডের বড় বড় ধনী লোকেরা ও রাজারা টাকার উপর টাকা ঢালিয়া অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বিশ্ব-

বিদ্যালয় দুইটিকে চিরস্থায়ী পাকা ভিত্তির উপর বসাইয়াছেন। যদি নূতন প্রসার না বাড়াইয়া মামুলি ধরণে কাজ চলে, তবে, বিদ্যা-পীঠ দুইটির "ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি''র আয়ে যথেষ্ট কুলাইতে পারে; তবুও মহাযুদ্ধের দুর্দ্দিনে অবস্থা একটু অসচ্ছল হওয়ায়, বিশ্ব-বিদ্যালয় দুইটির অনুরোধে কমিশন বসিয়াছিল। ঐ কমিশন সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে ঐ পাকা ভিত্তিতে স্থিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দুইটিকে বার্ষিক পোনের লক্ষ করিয়া টাকা সাধারণ ব্যয়ের জন্য দেওয়া হউক, এবং লাইব্রেরী বাড়াইবার জন্য এক লক্ষ করিয়া টাকা দেওয়া হউক। নূতন যুগের উপযোগী করিয়া নূতন নূতন ভাবে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া, এই টাকা বাড়াইবার সুপারিশ হইয়াছে। বিলাতের পার্লেমেণ্ট যদি আমাদের দেশের আইন-সভার মত বিদ্যার সমজদার হইত তবে এই টাকার টানা-টানির দিনে এক কড়া কড়িও দান করিত না, বরং ঠিক বলিত যে, এ সময়ে পুরাতন নাড়িয়া চাড়িয়াই থাকা ভাল, নূতন প্রসার বাড়াইলে, সে কাজটি "ক্রিমিনাল" বা অপরাধজনক হইবে। জ্ঞানের উন্নতিতেই যে দেশের উন্নতি, আর উহার পথে বাধা দেওয়াই যে অপরাধজনক, ইহাই বিলাতি পার্লেমেণ্টের ধারণা। যে পার্লেমেণ্ট অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন,—যাহার গায়ে মেকি ক্ষমতার গন্ধটুকুও নাই, সে যে কেন বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ধমক দিয়া হিসাব চাহিল না, ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন প্রসারের আয়োজন সমালোচনা করিল না, তাহা এই গরম দেশে বসিয়া ভাবা দুঃসাধ্য।

* * *

পেটের চিন্তা ও উচ্চ-শিক্ষা—অনেকে বলেন যে, এই পেটের চিন্তার দুর্দ্দিনে, উচ্চ-শিক্ষার খেয়াল ছাড়িতে হইবে, এবং যে সকল উপায়ে ও কল-কারখানায় কিছু উপার্জ্জনের সুবিধা হয়, তাহাই ধরিতে হইবে। ইঁহারা বোঝেন না যে, উপায় উদ্ভাবন করিবার ও কল-কারখানা গড়িবার সূক্ষ্ম বিদ্যাটুকু আয়ত্ত না হইলে, উপায় ও কল-কারখানা আপনি আসিয়া দেখা দেয় না। নিজেরা কল গড়িবার বিদ্যা না শিখিয়া যদি ধার করিয়া কল-কারখানার আমদানী করা যায় তবে সে কল-কারখানাগুলি আমাদের হাতে সনাতন লাঙ্গল ও ঢেঁকি প্রভৃতির মতই হইবে,—উহাদের কোন উন্নতি হইবে না এবং কাজেই প্রতিযোগিতায় আমরা হটিতেই থাকিব। যাঁহারা কল-কারখানা ধারণা করিয়া কেবল সেগুলি প্রস্তুত করিবার ব্যবহারিক বিদ্যাটুকুই শিখিতে বলেন,—অর্থাৎ যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা ও বিজ্ঞানের মন্দিরকে উপেক্ষা করিয়া "টেকনিকাল" শিক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতে বলেন, তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষার যথার্থ মর্য্যাদা বুঝেন না। গাছে না উঠিয়া এক কাঁদি পাড়িবার আশা দুরাশা মাত্র। নূতন নূতন কল সৃষ্টি করিবার বিদ্যা না জন্মিলে অনুকরণ করিয়া গোটা কতক কল গড়িতে শিখিলেও সে কলগুলি চিরদিনের মত ঢেঁকি ও লাঙ্গল হইবে।

যাহারা বলেন যে আবশ্যকের উপকরণ আবিষ্কারের জন্য কেবল বিজ্ঞান শিক্ষাই চলুক,—সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও ভ্রান্ত। মানসিক উন্নতির প্রকৃতি

জানিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁহারা কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা করেন না, তাঁহাদের মনে সেই সরসতা ও কল্পনার প্রসার দেখা যায় না, যাহাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সময় তাঁহাদের মনে নূতন নূতন তথ্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। ইতিহাস ও সমাজ-তত্ত্ব না জানিলে যে সমাজ রক্ষা করিবার ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিবার পথ পাওয়া যায় না, এবং কেবলই আন্দোলন বাড়াইয়া অনেক সময়েই সংস্কারের নামে ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করা হয়, তাহা অস্বীকৃত হইতে পারিবে না। মানসিক শক্তিকে জাগাইবার জন্য কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, সে কথা না জানিয়াই অনেক লোকে শিক্ষা পরিচালনার দোষ ধরিতে বসেন, এবং নিজেদের টাকা ও পদের জোরে সকল সুপন্থাকে "নাকচ্" করিতে চাহেন। ধর্ম্মে বল, অর্থে বল, পেটের চিন্তায় বল,—জীবনের সকল বিভাগের সকল কাজেই সুপ্রাচীন ঋষি বচনটির পূর্ণ মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবার নয়; আমাদের ভাষায় সেই প্রাচীন বচনটি ঠিক এই:—**জ্ঞানেই মুক্তি**। জ্ঞানকে উপেক্ষা করিলে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো বাঁধা হইবে।

* * *

ছাত্র-সমাজে পলিটিক্‌স্—যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষার বিরোধী, অথবা স্কুল-কলেজি শিক্ষার সুফলে অবিশ্বাসী, তাঁহাদের উদ্দেশে এই মন্তব্য লিখিত নয়। যাঁহারা চট্ করিয়া একটা উপার্জ্জনের উপায় করিতে চাহেন, অথবা লেখাপড়া না করিয়া অল্প বয়সেই দেশ-সেবার কাজে লাগা ভাল মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন তর্ক নাই। এখন সময় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে দেখিয়া পাঠার্থীদের উদ্দেশে এই মন্তব্যটুকু লেখা গেল। ছাত্রজীবনে যাঁহারা নানা আন্দোলনে পড়েন, তাঁহাদিগকে এদেশের অতি প্রাচীন একটি প্রবচন স্মরণ করাইয়া দিতেছি:—"অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা"। ধীরতা ছাড়িয়া উত্তেজিত মাথায় ও উদ্বিগ্নমনে যে শিক্ষালাভ অসম্ভব, তাহা বুঝাইবার জন্য মনস্তত্ত্বের দোহাই না দিলেও চলে। রাজ-নীতি বল, পলিটিক্‌স্ বল, সেবা-ব্রতের মহিমা বল, অথবা আর যাহাই বল, সকল বিষয়ই ছাত্রদের শিক্ষণীয়; স্থির মাথায়, অবিচলিত মনে, ও গভীরভাবে সকল বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে, এবং সুশিক্ষার পর নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কাজে লাগিতে হইবে। দু-এক বৎসরের জন্য কেন, দু-এক মাসের জন্যও চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইয়া কোন আন্দোলনে বা চীৎকারে জুটিতে নাই; একবার চিত্তের বিক্ষেপ ঘটিলে, জ্ঞানের সাধনা অসম্ভব হইবে। যাঁহারা স্থির মনে, চারিদিক ভাবিয়া, কোন কথার বিচার করিতে না শেখেন, এবং চট্ করিয়া কোন বিষয়ে উত্তেজিত হয়েন, তাঁহাদের অভ্যাস এমন বিগ্‌ড়াইয়া যায় যে, হঠকারিতাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষণ হয়, এবং চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পায়।

* * *

বিদেশের আবহাওয়া—এখনও ইউরোপের সন্ধি-পূজায় অনেক স্বার্থের পাঁটা বলি না পড়িলে, পূজার শেষের অকপট কোলাকুলির দিন আসিবে না। জেনোয়া নগরে জয়ী ও পরাজিতেরা এক আসরে বসিয়া স্থায়ী শান্তির কি ব্যবস্থা করিয়া উঠিবেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইবে। কথা হইতেছে যে, গ্রীক্ ও তুর্কীরা তাঁহাদের কলহ-বিবাদ এখন ধামাচাপা রাখিবেন আর থ্রেস্ ও এসিয়া মাইনরে তাঁহাদের অধিকারের দাবী মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তুর্কীদের মধ্যে কথা উঠিয়াছে যে, আদ্রিয়ানোপ্‌ল ও গালিপলি গ্রীকের দখলে থাকিলে, তাহাদের স্বাধীন স্থিতির সুখ উঠিয়া যাইবে। আদ্রিয়ানোপ্‌ল্ তুর্কীদের ধর্ম্মজীবন ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য রকমে গাঁথা আছে, তাই তাঁহারা ঐ স্থান ছাড়িতে চাহেন না। গালিপলির নাম পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে; মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ ও ফরাসীরা এই স্থানটি দুর্ভেদ্য বলিয়া খুব গোলে পড়িয়াছিলেন; এখন সেই গালিপলি ইউরোপীয়দের কর্ত্তৃত্বে রাখিবার কথা উঠিয়াছে দেখিয়া তুর্কীদের মন উদ্বিগ্ন।

জর্ম্মানি, কি ভাবে তাহার বাকী ক্ষতিপূরণের টাকা দিবে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র কি ভাবে তাহাদের বাণিজ্য চলিতে পারিবে, তাহাও এইবার নিষ্পত্তি হইবার কথা। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের নায়ক বলিয়াছেন যে মহাযুদ্ধ থামাইতে তাঁহাদিগকে অনেক ব্যয় করিতে হইয়াছে; সকলে যখন টাকা পাইতেছে, তখন যুক্তরাজ্যকেও টাকা দেওয়া উচিত। এ দাবীতে ফরাসীকে একটু দমিতে হইয়াছে, এবং ইংরাজেরাও একটু বিস্মিত হইয়াছেন; পরের দাবী বুঝিবার সময় হয়ত বা নিজেদের কড়া দাবী একটু মোলায়েম হইতে পারে। বিজিতেরা মনের বেদনা মনে চাপিয়া জেনোয়ার সভায় আসিতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতাশালীরা বড় বড় ভাগের লোভ ছাড়িতে পারিবেন কিনা সন্দেহ; হয়ত বা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে যে, "আজ হতে হ'ল ভাগ সমান সমান।" তাহা হইলে হয়ত সন্ধির গাঁথা সমস্বরে গীত হইবে, এবং কাহার অধিক বীরদর্পে মহাযুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে স্বীকৃত হইলে ক্ষতি হইবে না।

দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ড স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু উত্তর আয়ার্লাণ্ডের সঙ্গে মন কসা-কসি ঘোচে নাই। পরস্পরে কিছু কিছু বিবাদ চলিতেই থাকিবে, এবং বিবাদ করিতে করিতে বিদ্বেষের গ্লানি মিটিবে ও ভবিষ্যতে সদ্ভাব হইবে ইহাই অনেকের বিশ্বাস। ইহাই হয়ত ঠিক, কিন্তু শান্তিধাম এখনও যেন রক্ত-নদীর পরপারে।

ইউরোপের অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক ঠাটের সঙ্গে রুশিয়ার নূতন ঠাটের কোন মিল নাই; তবুও রাজ-শাসিত ও ধনী-শাসিত দেশের সঙ্গে একাসনে না বসিলে তাহার শান্তি-রক্ষা হয় না। রুশিয়ার নূতন ঠাটের অধিনায়ক বলিয়াছেন যে, পাপ-নীতি ওয়ালাদের সঙ্গে তাঁহারা এখন বিশেষ প্রয়োজনে মিলিতে পারেন, তবে রুশিয়া যে অন্য কোন দেশ অপেক্ষা মানে ও গৌরবে ছোট নহে তাহা জেনোয়ার বৈঠকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্য দিকে আবার সকল দেশে

কানা-ঘুসা চলিতেছে, যে রুশিয়া নাকি সৈন্যবল সাজাইয়া প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ করিতেছে। রুশিয়ার নেতা লেনিন এখন সন্ন্যাস রোগে শয্যাগত ; কাজেই কি' হইবে, কে জানে ? জেনোয়ার নিমন্ত্রণে সকলে আঁচাইয়া ওঠা পর্য্যন্ত কিছু বিশ্বাস নাই।

* * *

রেশমের চাষ—ব্যবস্থাপক সভার কৃষি-শিল্পাদি বিভাগের সচিব নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী, বাঙ্গলার রেশমের চাষের উন্নতির দিকে মন দিয়াছেন। রেশমের চাষ সম্বন্ধে সরকারী একটা বিভাগ আছে, আর উহার পরিচালনায় অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় যে সময়ে ঐ বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, তখন অনেক ভাল কাজের প্রস্তাব ও উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক, কাজের কাজ বড় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বহরমপুরের গরদওয়ালাদের যাহাতে ভাল করিয়া মজুরি পোষায় তাহার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বে-সরকারি যত্ন করিয়াছিলেন ; মধ্যবর্ত্তী ইংরেজ দোকানদারেরা যাহাতে মোটা লাভটা একেবারে সরু করিয়া দিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সাক্ষাৎ ভাবে বিলাতে মাল চালানের বন্দোবস্ত করাইয়া দিয়াছিলেন ; মধ্যবর্ত্তী দোকানদারেরা তখন জোট বাঁধিয়া এমন একটা কৌশলের খেলা খেলিয়াছিল যে, কারিগরেরা এ দেশের মধ্যবর্ত্তীদের কাছে বেচিলে যাহা পাইত, বিলাতে মাল বেচিয়া প্রায় তাহার বার ভাগের এক ভাগ পাইয়াছিল। গরদওয়ালাদের কপালে যখন এইরূপে গর্দা মিলিল, তখন তাহারা আবার মধ্যবর্ত্তীদের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের কাছেই মাল বেচিবার বন্দোবস্ত করিল। রেশমের চাষ বাড়িলে যদি দেশে উহার পুরা কাটতির সম্ভাবনা থাকে, এবং এদেশেই ভাল করিয়া কাটতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে,—অর্থাৎ রেশম বিভাগের বন্দোবস্তে বিদেশে চালান করিবার ব্যবস্থা করিতে না হয় তবেই শিল্পীদের পরিশ্রম পোষাইতে পারে। যে দেশের লোকে নিজেরা স্বাধীন বাণিজ্য করিতে পারে না সে দেশে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া যায়,—শিল্পীদের পেট ভরে না। সাধারণ মজুরি করিয়া যাহা পাওয়া যায়, "পলু" পুষিয়া রেশমের বাসা বেচিয়া তাহার অর্দ্ধেক লাভও হয়না বলিয়া সম্বলপুর অঞ্চলের গণ্ডা জাতির লোকেরা এ ব্যবসা প্রায় তুলিয়া দিয়াছে। শিল্পীদের যদি লাভের আশা না বাড়ে তবে চাষ বাড়িতে পারিবেন। সস্তায় না কাটিলে এ গরিব দেশে মাল বেশী বিক্রী হইবে না ; বিদেশে বেচিয়া বেশি লাভ করিতে পারিলেই এদেশে সস্তায় বিক্রী করা সম্ভব হয় ; নবাব বাহাদুর যদি বিদেশের হাটের একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই রেশমের চাষ বাড়িতে পারে,—নচেৎ নহে।

* * *

পাটের চাষ—সরকারী কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষেরা বুঝাইতেছেন যে পাটের চাষ করিলে বাঙ্গলার চাষার খুব লাভ হইবে। যে ফসল বিদেশের হাটে বেচিতে না পারিলে একেবারে গুদাম জাত করিতে হয়, চাষারা সহসা তাহার লোভে পড়িতে চায় না; মহাযুদ্ধের দিনে তাহাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের নূতন রকমের অভিজ্ঞতা জন্মিবারই কথা। তবে কিনা উপস্থিত লোভ বড় লোভ; আর পেটের দায় বড় দায়। জলে দাঁড়াইয়া পাট তৈরী করিতে গিয়া চাষারা রুগ্ন হইয়া মরে এবং জলে পাট পচাইলে দেশে নানা রোগের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জীবন ধারণের মায়ায় লোকে জীবন নাশের কথাটি ঠিক ভুলিয়া যায়।

* * *

আমাদের গবর্ণর—ভারত-যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে সুপ্রসিদ্ধ মিসেস ফসেট প্রমুখ মহিলারা লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে মনে করাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি নারীর অধিকার স্থাপনের দলে থাকিয়া অনেক কাজ করিয়াছেন, আর বঙ্গদেশেও নারীর অধিকার লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছে। আমাদের গবর্ণর এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার একটি কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। তিনি বলিয়াছিলেন, যে তিনি নিজে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নারীদের অধিকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন,—কাজেই তিনি, অন্যের অপেক্ষা ভারত গবর্ণমেণ্টের সমালোচকদের কথা অধিকতর সহানুভূতিতে বুঝিতে পারিবেন। ইনি যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* * *

ভারত সচিব—শ্রীযুক্ত মণ্টেগু সাহেবের বিদায়ের পর ভাইকাউণ্ট পীল ভারত সচিব হইলেন। অনেককে সাধা হইয়াছিল, কিন্তু পার্লেমেণ্টের অবস্থার অস্থায়িত্ব দেখিয়া তাঁহারা এ পদ গ্রহণ করেন নাই। পীল মহোদয় মহাযুদ্ধের দিনে বিলাতের ডেলি-টেলিগ্রাফ পত্রের সংবাদদাতা ছিলেন এবং কিছুদিন সমর সচিবের আণ্ডার সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টের রচিত ভারত-শাসন-নীতিকে পালন করিয়াই সকলকে কায করিতে হইবে, কাযেই বিলাতবাসী ভারত সচিবের জীবনের নিগূঢ় কথা খুব খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া না জানিলে বিশেষ ক্ষতি নাই।

* * *

ভারতের অনার্য্য জাতি—যাঁহারা আর্য্যের গণ্ডীর মধ্যে আছেন, অথবা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা খাঁটি অনার্য্যের সংখ্যা কম নয়। খাঁটি অনার্য্যদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আর্য্যের গণ্ডীভুক্ত লোকদের, এবং আপনাদের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য অনার্য্য সম্প্রদায়ের

লোকদের জলটুকুও স্পর্শ করে না। অতি দরিদ্র মুণ্ডা অথবা শবর অথবা কন্দ, কিছুতেই আমাদের গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল খাইবে না। যাহাদের মধ্যে নর-বলি আছে, এখনও তাহারা শত্রু জাতির লোককে অর্থাৎ হিন্দুকে ধরিয়া লইয়া গোপনে বলি দেয়। আমরা উদারতা দেখাইয়া তাহাদের হাতে খাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহারা সৌহার্দ্দ্য বাড়াইয়া আমাদের ঘরে খাইতে আসিবে না। আমাদের গণ্ডীর মধ্যের কোন অস্পৃশ্য জাতি, যদি নিজের ইচ্ছায় জাতির বাঁধন ছাড়িয়া অন্যের সঙ্গে মিশিতে যায়, তবে সে ভিন্ন কথা; নহিলে একজন ব্রাহ্মণ যদি উদারতা দেখাইয়া নমঃশূদ্রের হাতে কিছু খান, তবে সেই নমঃশূদ্র ঐ ব্রাহ্মণটিকে পতিত মনে করিবে, ও তাহার হাতের জলটুকুও খাইবে না। যাঁহারা ছুঁৎ তুলিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ছবির অন্য দিক্‌টি দেখেন না। কেবল "উঁচু" নীচু হইলেই "নীচু" উঁচু হইবে না।

* * *

ধর্ম্ম-ঘটে অধর্ম্ম—যাহারা খাটিয়া খায়, তাহারা উপযুক্ত মজুরির দাবী করিতে পারে; ধনী কর্ত্তারা খাটিবার লোককে ফাঁকি দিয়া নিজেদের স্বার্থ-সাধন করিতে বসিলে কাজের লোকেরা অবশ্যই ধর্ম্ম-ঘট করিয়া আপনাদের দাবী হাঁসিল করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের ধর্ম্ম-ঘট ওয়ালারা স্থানে স্থানে যে ভীষণ নৃশংস আচরণ করিতেছে, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গত মাসের মডার্ণ রিবিউ পত্রে সুবুদ্ধি ও সহৃদয় এনড্রুজ্ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্ম-ঘটের যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে অনেক স্থলে কর্ম্মীদিগকে অযথা উত্তেজিত করিয়া মরণের দিকে টানা হয়। রেলের ধর্ম্ম-ঘট ওয়ালারা যে অনেকবার যাত্রীদের গাড়ী ধ্বংশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা কয়েকবার উচ্চপদস্থ যাত্রীদের মুখে শোনা গিয়াছিল। এবারে কর্মাতার ও মধুপুরের মধ্যবর্ত্তী একটি পুলের উপরকার রেলের লাইন এরূপভাবে ধর্ম্ম-ঘট ওয়ালারা ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে পাঞ্জাব মেলের দুই দিকের দুইখানি গাড়ী একেবারে ভীষণ কলিশনে ধ্বংশ হইতে পারে। দৈবে কলিকাতার দিকে আসিবার গাড়ীখানি বাঁচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পঞ্জাব যাত্রার গাড়ীখানি পুলের নীচে পড়িয়া অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে। নিরপরাধ ও বিশ্রব্ধ আরোহীদিগকে প্রাণে মারিয়া পৈশাচিক লীলা করিলে যে ধর্ম্ম-ঘট ওয়ালাদের কোন স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে না, তাহা নিশ্চিত; তবুও যে নৃশংসতা করিতেছে সে কেবল গোঁয়ারদের খুন চড়িয়াছে বলিয়া।

* * *

দেশের টাকার অপব্যয়—প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া পাহাড়ে যাইবার ব্যবস্থায় যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা হাতে থাকিলে কত কাজ কুলাইয়া যাইত। কিন্তু বড় বড় রাজপুরুষেরা বলেন, যে মাঝে মাঝে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া না লইলে চলে না, কেন না এদেশ বড় গরম। এই

গরম দেশে আসিয়া কাজ করিতে হইবে বলিয়াই, যখন তাঁহাদের বেতন ও ভাতা অত্যধিক করা হয়, তখন আর গরমের কথা উঠে কেন? পাহাড়ে না গেলে যদি না চলে, তবে ভারতের আব-হাওয়ার অজুহাতে যতটা বেশী টাকা দেওয়া হয়, তাহা কাটিয়া লওয়া উচিত; তাহাতেও প্রচুর টাকা বাঁচিতে পারে।

* * *

আমরা জানি না,—জানিবার অধিকারও নাই, যে দেশরক্ষায় কত সৈন্য চাই ও তাহাতে কত খরচ পড়ে। আমাদের বিদ্যা মৌর্য্য-যুগের হিসাব পড়া পর্য্যন্ত। এবারে কিন্তু যুদ্ধ-নীতিতে অভিজ্ঞ অনেক ইংরেজই বলিতেছেন যে, রেলের লাইন বুকে পাতিয়া খাইবারপাস, যে টাকা খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা নিতান্ত অন্যায়। এই রেলে বহুকোটী টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু তাহাতে নাকি সীমারক্ষার কাজে অধিক সুবিধা ঘটিবে না। আমরা যুদ্ধ-নীতি বুঝি না, কিন্তু নীতি-কুশলদের মধ্যেই যখন মতভেদ আছে, এবং এ বৎসর যখন কোন বিদেশীর আক্রমণের ভয় নাই, তখন এই নিতান্ত টানাটানির দুর্দ্দিনে ঐ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করা কি বন্ধ রাখিলে চলে না?

* * *

পণ্ডিতা রমা-বাই-এর মৃত্যু—৪৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৮-এ যেদিন এই বিদুষী নারী ইহাঁর ভ্রাতার সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন, সেদিনের কথা এখনও হয়ত অনেকে ভুলেন নাই। তখন তিনি কুমারী, বয়স ছিল ১৭।১৮; সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত খানি তাঁহার মুখস্থ ছিল, আর পাদ-পূরণ করিয়া অতি দ্রুত সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এই বিদ্যার পরীক্ষার জন্য এবং বিশেষ ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য দেশের নানাস্থানে সভা হইয়াছিল। নদীয়ার পণ্ডিত-দিগকে লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে যে সভা হইয়াছিল এবং সেখানকার কলেজের ঘরে তিনি যে সংস্কৃতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এই মন্তব্যলেখকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল আছে। উহার এক বৎসর পরেই সিলেটের এক উকীলের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়, আর তাহার দুই বৎসর পরেই ইনি বিধবা হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতী সমাজের কর্ম্মশীলতা দেখিয়া তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং হয়ত সেই আকর্ষণেই খৃষ্টধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে ও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরিয়া বোম্বাইয়ের কেল গাঁয়ে সারদা-সদন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে সকল শ্রেণীর অনাথাদিগের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। খুব সম্ভব তিনি এখন ৬২ বৎসর বয়সে গত ৫ই এপ্রিল বুধবারে জীবন-লীলা শেষ করিলেম।
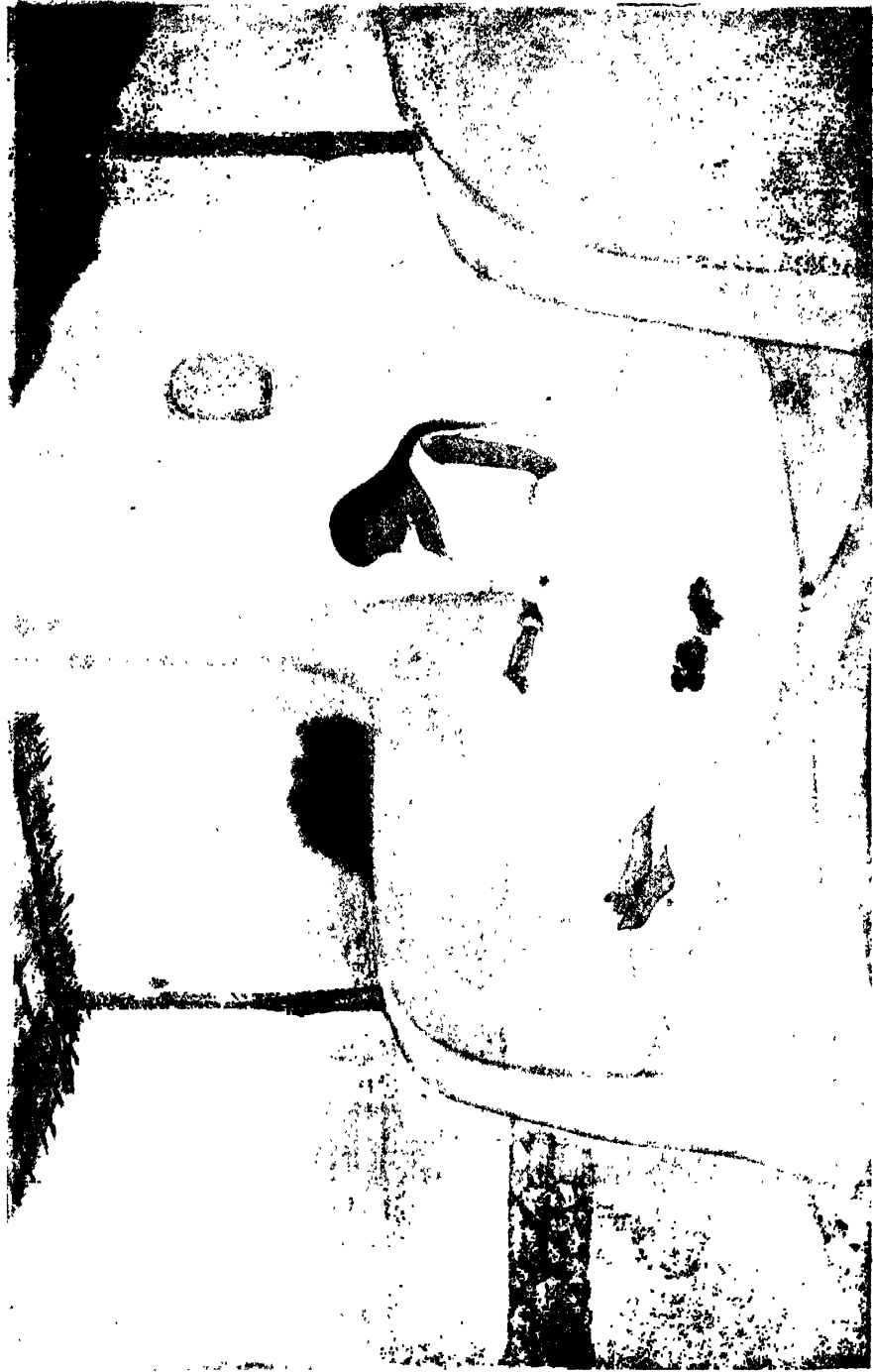
"আবার তো'রা মানুষ হ।"

১ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [৪র্থ সংখ্যা

রাজপূজা

রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে,
পরশে তাহার শিলা পায় প্রাণ কাঞ্চন প্রায় স্ফুরে!
মঞ্চের পরে বসি' তন্ময় মূর্ত্তি-মেখলা গড়ে,
তার প্রতিভায় পৃথিবীর গায় স্বর্গের ছায়া পড়ে!
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ঈশান রূপ ধরে ধ্যানে তার
প্রাণের নিভৃত ভরি' তারি যত দেবতার অবতার।
পুষ্পিয়া ওঠে কঠিন পাষাণ পরশ তাহার লভি'
শিল্পীর রাজা গুণী গুণরাজ স্ফটিক শিলার কবি।
অমৃতকুণ্ডে ডুবায়ে সে বুঝি ছেদনী-হাতুড়ি ধরে,
অরূপের রূপ দেয় অনায়াসে অলখ্-দেবের বরে।
তার নির্ম্মাণ সৃজন সমান, বিস্ময় লাগে ভারি,
চমৎকারের মহলের চাবি জিম্মায় আছে তারি।
শিলার স্বর্গে বসি' মশ্‌গুল্ যশের মালা সে গাঁথে
শিষ্য একাকী পিছনে দাঁড়ায়ে পাণ-বাটা লয়ে হাতে।

আর কারো নাই প্রবেশাধিকার তার সে কর্ম্মশালে
স্তম্ভারণ্যে তপোবন রচি' প্রাণের আরতি ঢালে।
ছেনী দিয়ে কাটে সারাবেলা খাটে, স্বপ্নাবিষ্ট জাগি',
মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া পিছে তাম্বূল লয় মাগি'
ফিরে তাকাবার অবসর নাই ; দীর্ঘ দিবস ধরি'
আদ্‌রার গায়ে আদর মাখায়ে রচে স্বর্গের পরী !
সহসা কি করি' হাতের হাতুড়ি ঠিকরি পড়িল নীচে,
দোস্‌রা হাতুড়ি নিতে তাড়াতাড়ি শিল্পী চাহিল পিছে।
পিছে চেয়ে গুণী ওঠে চমকিয়া বিস্ময়ে আঁখি থির
তারি ডিবা হাতে কাঞ্চী-নরেশ দাঁড়ায়ে মুকুট-শির !
"একি ! মহারাজ !" কয় গুণরাজ "অপরাধ হয় মোর,
দিন্ মোরে দিন্,......প্রভুরে কি সাজে ?"......রাজা কন্ "দিন ভোর
এমনি দাঁড়ায়ে আছি ডিবা হাতে, জোগায়েছি তাম্বূল,
দেখিতে তোমার সৃজন-কর্ম্ম, পাথরে ফোটানো ফুল,
তন্ময় তুমি পাও নাই টের, কখন এসেছি আমি,
মোর ইঙ্গিতে কখন যে তব শিষ্য গিয়েছে নামি' ;
কাজের ব্যাঘাত পাছে ঘটে ভেবে ডিবাটি লইয়া চাহি
শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে করঙ্ক-বাহী।"
রাজার বচন শুনি' লজ্জায় গুণী কহে জানু পাতি'
"মার্জ্জনা কর দাসেরে, হে প্রভু, কাজের নেশায় মাতি
অজানিতে আজ ঘটায়েছে দাস রাজার অমর্য্যাদা,
সাজা দিন্ মোরে।" রাজা কন্, "গুণী, তব গুণে আমি বাঁধা,
ওঠ গুণরাজ ! আমি পাই লাজ, তোমারে কি দিব সাজা
বিধির সৃজন-বিভূতি-ভূষিত তুমি সে প্রকৃত রাজা।
মরণ-হরণ কীর্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী,
আমি প্রভু শুধু নিজের রাজ্যে, বাহিরে প্রভুতা নাহি।
রাজপূজা তব ভুবন জুড়িয়া, প্রভাব দুর্নিবার,
রাজাধিরাজেরও ভক্তি-অর্ঘ্যে, গুণী, তব অধিকার।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মার্কিণে চারিমাস

(১)

মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা, কিন্তু বছর গণিলে, ঠিক বাইশ বৎসর হইল, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাই। ইংলণ্ডে পরলোকগত কেইন (W. S. Caine) সাহেবের সঙ্গে মাদকতা-নিবারণী-সভা-সমিতিতে আমাকে বিস্তর বক্তৃতা করিতে হয়। এই সূত্রে নিউইয়র্কের National Temperance Society'র কর্তৃপক্ষীয়দের নিকটে কেইন সাহেব আমার কথা তোলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণেই তাঁহাদের হইয়া মাদকতা নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিবার জন্য আমি আমেরিকা যাত্রা করি। খরচপত্রের সকলভার তাঁহারাই লয়েন।

(২)

লিভারপুল হইতে জাহাজে চাপিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করি। বহুবার কালাপানি পার হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গে আমার বনাবনি হইল না। গল্প শুনিয়াছি যে একটি ইংরাজ স্ত্রীলোক সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিয়া জাহাজের টিকেট কিনিলেই বমি করিতে আরম্ভ করিতেন। আমি ঠিক ততটা পরিমাণে বমির ভয়েতে ভীত নই বটে, কিন্তু সমুদ্রে একটু ঢেউ উঠিলেই আমাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে। ভারত হইতে বিলাতের পথে গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগর এবং শীতকালে ভারতমহাসাগর প্রায়ই খুব শান্ত থাকে। এমন কি দেখিলে মনে হয়, যেন ডিঙ্গা নৌকায় তাহার বুকের উপরে বেড়াইতে পারা যায়। কিন্তু বিলাত হইতে আমেরিকার পথে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এরূপ প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ মূর্ত্তি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। বিশেষতঃ শীতকাল সে দেশে আমাদের বর্ষাকালেরই মতন,—ঝড় ঝাপটা লাগিয়াই আছে। আর যখন ঝড় ঝাপটা থাকে না, তখনও সমুদ্র কি ক্ষোভে যেন অনবরত বিক্ষুব্ধ হইয়া রহে! আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯০০ খৃঃ অঃ) অপরাহ্নে লিভারপুল বন্দরে জাহাজে চাপি। লিভারপুলের নদী হইতে সমুদ্রের মোহানা খুব বেশী দূর নহে। কিন্তু সমুদ্রে পড়িবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে এবং আমিও ঘুমাইয়া পড়ি। মধ্যরাত্রে জাগিয়া মনে হইল যেন জাহাজ আর চলিতেছে না। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম, তাহাই সত্য। লণ্ডনের ডাক লইবার জন্য জাহাজ আয়র্লণ্ডের Queen's Town বন্দরে নোঙর করিয়া আছে। ডাক লইতে প্রায় মধ্যাহ্ন হইয়া গেল। মধ্যাহ্নে ভোজন শেষ করিয়া ডেকে আসিয়া দেখিলাম জাহাজ নোঙর তুলিয়া মহাসাগর পাড়ি দিতে সুরু করিয়াছে। প্রবল বাতাস জাহাজের গতিবেগকে আশ্রয় করিয়া

প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। শীতকাল। আমি অত্যন্ত শীত-কাতর। তথাপি সমুদ্রপীড়ার ভয়ে উপরের ডেকের এক-কোণে যাইয়া আরাম-চৌকি খানা লইয়া ওভারকোর্ট ও কম্বল মুড়ি দিয়া বসিলাম। উত্তাল তরঙ্গমালা কাটিয়া নাচিতে নাচিতে জাহাজখানি চলিল। প্রথম প্রথম এই দোল বেশ ভালই লাগিল। মনে ভরসা হইল, বুঝিবা এবার সমুদ্রপীড়াকে ফাঁকি দিলাম। ক্রমে চক্ষু মুদিয়া আসিল, একটু তন্দ্রাবেশ হইল। এমন সময় মনে হইল, হঠাৎ কে যেন জুতার ঠোক্কর দিয়া আমার আরাম-চৌকি খানা নাড়িয়া আমাকে বিদ্রুপ করিয়া চলিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম জনমানব কেহ নিকটে নাই। বুঝিলাম এ লীলা মানবের নহে,—সাগরের। তখন ঢেউয়ে জাহাজে খুব মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আমার ভিতরেও তোলপাড় আরম্ভ হইল। মাতালের মত কম্বলখানা বগলে করিয়া টলিতে টলিতে নিজের ক্যাবিনের দিকে ছুটিলাম। ডেক জনশূন্য, কেবল ক্বচিৎ দু'একটী যাত্রী একটু পাচারি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর জাহাজের কর্ম্মচারীরা নিজেদের যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে চলাফেরা করিতেছেন। আমার তখন এমন অবস্থা যে কম্বলখানি লইয়াও চলা দুষ্কর হইয়াছে। একজন ইংরাজ খান্‌সামাকে পথে পাইয়া বলিলাম, 'আমাকে একটু ধরিয়া লইয়া চল।' সে আমার ঘরের খান্‌সামা ছিল না, সুতরাং আমার কথায় কাণ না দিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। তখন মনের যে কি অবস্থা হইল, বোঝা সহজ বলা কঠিন। সংসারটা কি এতই নিষ্ঠুর! অসহায় বিপন্নের দিকে কেহ মুখ তুলিয়া চায় না!

ডাঙ্গার নাগাল পাইয়া এই দিনের অবস্থা মনে করিয়া অন্যভাব হইয়াছিল। সমুদ্রপীড়া আর হিষ্টিরিয়া প্রায় একজাতীয় রোগ। এ রোগে রোগীকে তোয়াজ করিলে চলে না। তাহাকে নিজের শরীর মনের জোরের উপরেই ভর করিয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ হাজার হাজার যাত্রী লইয়া যে জাহাজ সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া যাতায়াত করে তাহার কর্ম্মচারীদিগকে কলের পুতুলের মত চলিতে হয়। কেহ নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কর্ম্ম করিতে গেলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া গুরুতর বিপদ ডাকিয়া আনিবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এই খান্‌সামাটি যে কাজে যাইতেছিল তাহা ফেলিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিতে পারিল না, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তবে আমার মনে হইয়াছিল যে আমি কালা বলিয়াই কি এ তাচ্ছল্য করিল? স্বদেশে যাহাদের বিধাতৃদত্ত বর্ণের জন্য ঘাটে বাটে কত লাঞ্ছনা সহিতে হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক। যাহাহউক তখন কিন্তু মনে বড় লাগিয়াছিল, আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

কোনও রকমে নিজের ঘরে যাইয়া এই যে শয্যাগ্রহণ করিলাম নিউইয়র্কের মাটির গন্ধ পাইবার পূর্ব্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আর এই আটদিন ধরিয়া আমার ঘরের ইংরাজ খান্‌সামাটি একটি বারও আমার সেবা শুশ্রূষায় তাচ্ছল্য করে নাই। প্রতিদিন পাঁচ বেলা আমার বিছানাতেই আমার খাবার আনিয়া যোগাইয়াছে। যাহা মুখরোচক এবং যাহা

খাইলে বমনের উদ্রেক হইবে না, এমন সকল খাদ্য বাছিয়া বাছিয়া যত্ন করিয়া আমার জন্য লইয়া আসিত। মাঝে মাঝে আমাকে বলিত, 'তুমি এই ঘরের বদ্ধ হাওয়াতে পড়িয়া থাকিলে কিছুতেই সুস্থ বোধ করিতে পারিবে না। চল, আমি তোমাকে উপরে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি। সেখানে আরামচৌকিতে যাইয়া শুইলে সমুদ্রপীড়ার উদ্বেগ আর থাকিবে না।' কিন্তু আমার সাহস হইত না।

এইজন্য আমার সহযাত্রীদের সঙ্গে কিছুই আলাপ পরিচয় হয় নাই। আমার ক্যাবিনে আর একটিমাত্র যাত্রী ছিলেন বলিয় মনে পড়ে। কিন্তু তিনি গভীররাত্রে আসিয়া এখানে কেবল ঘুমাইতেন মাত্র। দিনের বেলায় কাপড়চোপড় বদলাইবার জন্য দু'একবার দু-পাঁচ মিনিটের জন্য আসিতেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্গেও কোনও খোসগল্প করা সম্ভব হয় নাই। এইরূপে Queens' Town হইতে New York পর্য্যন্ত আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে আমি একরূপ নিঃসঙ্গ বন্দীর মতনই কাটাইয়াছিলাম। আমার এমন অবস্থা ছিল না যে চোখ খুলিয়া বই পড়ি। তখন আর করিব কি, যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতাম ততক্ষণ দেশে আত্মীয়-স্বজনেরা কি করিতেছেন তাহারই মানসপট আঁকিয়া কাল কাটাইতাম।

এ সময়ের একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দের যশঃ তখন আমেরিকা ছাইয়া পড়িয়াছে। অনেক মার্কিণ স্ত্রীপুরুষে তাঁহার বেদান্তের শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। কেহ বা তাঁহার শিষ্যত্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। এসকল লোকে ভারতের প্রাচীন সাধনার প্রতি সরল শ্রদ্ধালু হইয়া ভারতবর্ষের লোকদিগকেও তাহাদের গুরুধামের লোক ভাবিয়া অত্যন্ত স্নেহমর্য্যাদার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাহাজ যেদিন নিউইয়র্ক পৌঁছিবার কথা তাহার দুইদিন পূর্ব্বে আমি আমার ক্যাবিনে শুইয়াই ইহার একটা বিশেষ পরিচয় পাইলাম। একদিন প্রাতঃকালে আমার ক্যাবিনের খান্‌সামা এক থালা বাদাম, কিস্‌মিস, পেস্তা, আঙুর, মনাক্কা এবং মনে হয় যেন গোটা দুই তিন আপেলও আনিয়া আমাকে দিল। জাহাজের একটি মহিলাযাত্রী এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন কহিল। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে বিবেকানন্দকে তিনি গুরুর মতন ভক্তি করেন। এই বিবেকানন্দের একজন স্বদেশী এই জাহাজে আছেন শুনিয়া অবধি তিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি ক্যাবিন ছাড়িয়া উপরের ডেকে একটিবারও যান নাই বলিয়া, এই মহিলার এই বাসনা তৃপ্ত হয় নাই। তবে তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এই সামান্য ফল পাঠাইয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উপহার গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া খান্‌সামা কহিল যে ভদ্র মহিলাটি আমাকে একবার ক্যাবিনের দরজা দিয়া হাতখানা বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেখিতে চান, আমার হাতেই তাঁহার উপহার পৌঁছিয়াছে কি না। এবারে বুঝিলাম যে এখনও দুনিয়ায় শ্বেতেতর বর্ণের মর্য্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হয়

নাই। দুঃখের বিষয় জাহাজ যখন নিউইয়র্কে গিয়া নোঙর করিল, তখন সে হুড়াহুড়ির ভিতরে মহিলাটির সন্ধান করিতে পারিলাম না। তিনিও আর আমার খোঁজ করিয়া লইলেন না। কিন্তু এই পথের পরিচয়-অপরিচয়ের ভিতরে যে একটা মিষ্টত্ব পাইয়াছিলাম তাহার স্বাদ আমার মার্কিণ-প্রবাসের স্মৃতির সঙ্গে আজিও জড়াইয়া আছে।

মার্কিণের মাটিতে পা দিয়াই দেখিলাম, মার্কিণীয়দিগের অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম। বিষয়টি অতি সামান্য, কিন্তু তার নিগূঢ় মর্ম্ম অতি বড়। মার্কিণে অবাধ বাণিজ্য নাই। বিদেশ হইতে যাহাই আসুক না কেন শুল্ক না দিয়া বন্দরের বাহিরে যাইতে পারে না। আমার বাক্সে অনেকগুলি বই ছিল। অধিকাংশই বাংলা এবং সংস্কৃত। সরকারী কর্ম্মচারী আমার তল্পিতল্পা পরীক্ষা করিয়া এই বইগুলির মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ, নিউইয়র্ক গবর্ণমেণ্ট বইয়ের উপরে শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন, আমাকে সে শুল্ক দিতে হইবে। আমি বলিলাম, 'এসকল বইত আমার নিজের ব্যবহারের, বেচিবার জন্য আনি নাই, ইহার জন্য আবার মাশুল দিব কেন?' তিনি কহিলেন, 'সকল বইয়েয় জন্যই মাশুল দিতে হয়।' আমি তখন কহিলাম, 'I thought America was a civilised country, but I find I was mistaken. Nowhere in civilisation are books meant for personal use of students, scholars, lecturers, or preachers taxed in this way. অর্থাৎ আমি ভাবিয়াছিলাম আমেরিকা একটা সুসভ্য দেশ, কিন্তু এখন দেখিতেছি সে ভাবনা আমার ভুল ছিল। কোনও সভ্যদেশে ছাত্র, শিক্ষক, বক্তা বা উপদেষ্টার নিজের ব্যবহারের পুস্তকের উপরে মাশুল লওয়া হয় বলিয়া জানি না।' আমার কথায় এই রাজকর্ম্মচারীর গভীব স্বদেশাভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি আর একটি মাত্র বাক্য ব্যয় না করিয়া আমার যাবতীয় 'সামান' বিনা মাশুলে হাসিতে হাসিতে ছাড়িয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম, ইংরাজ কি এ অবস্থায় টাকার লোভটা ছাড়িতে পারিত?

(৩)

নিউইয়র্কের National Temperance Society একটা Family Hotelএ (পারিবারিক হোটেল) আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পারিবারিক হোটেল বস্তুটি মার্কিণ সভ্যতার নিজের স্মৃষ্টি। মনে হয় যেন ফরাসীস্ রাজধানী প্যারিসে Family Pension বলিয়া কতকগুলি হোটেল আছে। আমেরিকার ফ্যামেলি হোটেলগুলি প্যারিসের অনুকরণে জন্মিয়াছে কিনা জানি না। এই পারিবারিক হোটেলগুলির বিশেষত্ব এই যে, এখানে বহু ভদ্রলোকে সস্ত্রীক সন্তানসন্ততি লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করেন। ইঁহাদের অন্য ঘরবাড়ী নাই, নিজেরা সংসার পাতিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে গেলে যে ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, তাহাও ভাল লাগে না; চাকর চাকরাণী লইয়া খটাখটি দিনরাতই লাগিয়া থাকে, সকল সময় পাওয়াও যায় না, তখন ধোওয়া-মোছা

রান্না-বান্না সকল গৃহকর্ম্মই গৃহিণীকে করিতে হয় ; মনোবৃত্তির, রঞ্জিনীবৃত্তির এবং সামাজিক লোক-লৌকিকতার অনুশীলনের অবসর থাকে না, এইজন্য মার্কিণের অনেক মধ্যবিত্ত লোকে এখন আর নিজেরা ঘর বাঁধিয়া, সংসার পাতিয়া, স্বতন্ত্র হইয়া বাস করেন না,—এই সকল পারিবারিক বা ফ্যামেলি হোটেলে নিজেদের প্রয়োজনমত দুইটা তিনটা বা চারিটা ঘর লইয়া বাস করেন। ঘরের হেফাজত, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, এসকলের ভার হোটেলের অধ্যক্ষ ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপরে থাকে। ইঁহারা হোটেলের খানাঘরেই সচরাচর আসিয়া আহার করেন বটে, কিন্তু নিজেদের একএকটা নির্দ্দিষ্ট টেবিল থাকে। এক পরিবারের লোকেরা এই ভাবে একটা টেবিলেই বসিয়া আহার করেন এবং ইচ্ছামত তাঁহাদের নিজেদের টেবিলেই বন্ধুবান্ধব ও অতিথিঅভ্যাগতদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন ; কখনও বা ইচ্ছা হইলে বাহির হইতে বিশেষ বিশেষ খাদ্য আনাইয়া লয়েন। এসকল পারিবারিক হোটেলের সৃষ্টি হইয়াছে অবধি মার্কিণ পুরুষেরা একদিকে যেমন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অর্থ উপার্জ্জনেই ব্যস্ত রহেন, সেইরূপ অন্য দিকে তাঁহাদের গৃহিণীরা গৃহকর্ম্মের নিরবচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিবসের অধিকাংশ সময়ই জ্ঞানালোচনায়, ললিতকলার অনুশীলনে, সমাজহিতব্রতে অতিবাহিত করেন। ফলে ইহা দাঁড়াইয়াছে যে, মার্কিণ রমণীরা একটা উদার সাধনার অধিকারী হইয়া কোনও কোনও দিকে নারী-চরিত্রের অসাধারণ বিকাশ সাধন করিতে পারিয়াছেন। আমি চারিমাসকাল মাত্রই মার্কিণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু এই স্বল্প সময়ের ভিতরেই আমেরিকার নারীচরিত্রের এই বিশেষত্বটি প্রত্যক্ষ করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম।

আমার মনে হয় যেদিন আমি নিউইয়র্কে পৌঁছি, সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। জাহাজখানা ভোরবেলায়ই নিউইয়র্ক বন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রীদের তীরে নামিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়। আমি যখন আমার হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বোধ হয় বেলা প্রায় একটা। হোটেলের অধ্যক্ষ আমাকে 'স্বাগতম্' বলিতে আসিয়াই কহিলেন যে তাঁর হোটেলের একজন বহুদিনের বাসিন্দা যখন আমার জাহাজ আসিবার সম্বাদ পাইয়াছেন তখন হইতেই আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকটি ব্যবসায়ে কোম্পানীর কাগজের দালাল। ঘটনাবশে আযৌবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া তখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনে একবার একটা রসলীলার সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু সে নাটকের অভিনয় প্রস্তাবনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই থামিয়া যায়। সেই হইতে ইনি সেই স্মৃতিকে বুকে ধরিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে দিন কাটাইতেছেন। এসকল কথা ক্রমে আমি জানিতে পাই। ইঁহার ইতিহাসটি উপন্যাসের মত শোনায়। ইনি নিজে যেমন এক আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া এই কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আর একজনও তাঁহার জন্য 'যোগিনী' সাজিয়াই জীবন কাটাইতে ছিলেন। আর আমাদের নিকটে সকলের অপেক্ষা অদ্ভুত কথা এই যে এই যোগিনীও এই হোটেলেই

দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের রস বা যৌন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু একটা অদ্ভুত সখ্য এবং সাহচর্য্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। রমণীটি অন্তরের সমুদয় স্নেহ দিয়া পুরুষটিকে ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি নিজে কোনও অভাব অনুভব করিবার পূর্ব্ব হইতেই সে অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। মাধুর্য্যের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আপনার প্রকৃতিনিহিত মাতৃস্নেহ যেন এই রমণীর অন্তঃস্থল হইতে প্রবাহিত হইয়া এই পুরুষের সেবা-যত্ন করিত। ইহার বিনিময়ে পুরুষ আর কি দিবে, কি-ই বা দিতে পারে? যে বস্তু সে দিতে পারে তাহা এক্ষেত্রে অদেয় ছিল, সুতরাং এই অতুল স্নেহের বিনিময়ে এই ভদ্রলোক এই রমণীকে সাধারণ সখ্য মাত্র দান করিয়াছিলেন। মার্কিণের এ বস্তুকে ঠিক আমাদের সখ্য শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। মার্কিণীয়েরা নিজে এবস্তুর একটা নামকরণ করিয়াছে। মার্কিণের ইংরাজী কোষে ইহাকে Camaraderie (ক্যামেরেডারি) কহে। ইংরাজীতে যাহাকে Comradeship কহে তাহা Camaraderieর কাছাকাছি যায় বটে, কিন্তু সকলটা প্রকাশ করে না। ভাইয়ে ভাইয়ে, সমবয়স্ক বন্ধুতে বন্ধুতে যে সাহচর্য্য ও অনাবিল এবং নিস্তরঙ্গ স্নেহ মমতার সম্বন্ধ অনেক সময় গড়িয়া ওঠে, এই ক্যামেরেডারি বস্তুটা তাহাই। ইহার মধ্যে জৈন ধর্ম্মের সন্দেহলেশমাত্র নাই। এ বস্তুটি অদ্ভুত। বিশুদ্ধচরিত্র স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে এরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আমাদের ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ত্রী-স্বাধীনতা যে ইংরাজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেই ইংরাজ পর্য্যন্ত চক্ষে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। এই ভদ্রলোকের এই রস-কাহিনী ক্রমে ক্রমে আমার শ্রুতিগোচর হয়। প্রথম যেদিন তিনি আমার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন সেদিন আমি ইহার কিছুই সন্ধান পাই নাই।

(৪)

হোটেলের অধ্যক্ষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি আগে আমার নিজের ঘরে যাইব না এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করিব?

হোটেলের পাঠাগারে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার সম্মতি পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তখনই আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। পাঠাগারে যাইয়া দেখিলাম, একটি লম্বাচওড়া লোক সেখানে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছেন। তাঁহার চেহারাতে ইংরাজের জাতীয় ছাপ মারা রহিয়াছে। বিদেশীয়ের সঙ্গে আদানপ্রদানে স্থানবিশেষে ইংরাজের চেহারাতে যে রক্তমিশ্রণ-জনিত একটা সুষ্ঠুভাব ও কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই ভদ্রলোকের চেহারায় তাহার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর মাথা বড়, মুখ অনেকটা গোল, চিবুক স্থূল এবং নাসিকা যেন বিধাতা কুঁদিবার অবসর পান নাই, কেবল আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে খুব চৌকশ কিম্বা রসপিয়াসু বলিয়া কল্পনা করাও যাইত না। যেমন মুখ তেমনি দেহযষ্টি—

স্থূল। দেখিয়া আমার বিশেষ কোনও ভাব বা ভক্তির উদয় হইল না। তিনি আমাকে দেখিয়াই আসন ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সেই স্থূল ও আয়ত করযুগলের ভিতরে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া এমন আবেগে আমার করমর্দ্দন করিলেন যে আমি ভাবিলাম হাতখানা আবার দেশে কাজের উপযোগী রাখিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিব কিনা। আর এইভাবে আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে কহিলেন, "You come from a great country, sir. You are destined to be the teachers of the world. But you cannot fulfil this destiny until you are able to look the world horizontally into the face."

কথাগুলি শুনিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসে আমার সমস্ত প্রকৃতি যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। বিধাতাপুরুষ যে ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতের আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছেন, আমার কাছে ইহা নূতন কথা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি ভাবিয়াছি, প্রাচীন জগতের সভ্যতা এবং সাধনা, সেকালের বিশ্ববিশ্রুত জাতি সকল, কেহবা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়াছে, কেহবা নামশেষমাত্র হইয়া আছে; রোম, গ্রীস, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর—ইহাদের প্রাচীন গৌররের কাহিনী খোলামখুচিতে বা সযত্নে রক্ষিত মৃতদেহের সাজসজ্জায় বা কীটদষ্ট পুস্তকের পৃষ্ঠায় আজ রহিয়াছে, চলন্ত, জীবন্ত মানবচরিত্রে কোথাও আজ তাহার বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না; ভারতই কেবল আধুনিকতার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত আপনার অমর প্রাচীনতাকে বুকে ধরিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা সকলেই মরিয়াছে, ভারত এখনও মরে নাই। আর মরে নাই এই জন্য যে এখনও তাহার বিশ্বকে দিবার কিছু আছে। বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপতি ও বিশ্বপিতা যাকেই যাহা দিন না কেন কেবল তাহার নিজের ভোগের জন্য দেন না। প্রত্যেক দানের সঙ্গে তাঁহার অনাহত বাণী প্রচারিত হয়—

সকলে বাঁটিয়া খাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
সাবধান! কেহ যেন না হয় বঞ্চিৎ।

আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস ও রোম তখনই জগতের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের জন্য সরিয়া গেল যখন তাহাদের শ্রেষ্ঠতম সাধনা বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে এই জন্য যে বিশ্বমানব আজিও ভারতের সনাতন সাধনার বিশেষত্বটি আয়ত্ত করিয়া ওঠে নাই। প্রথম যৌবন হইতেই এ সকল কথা ভাবিয়াছি লিখিয়াছি ও বলিয়াছি। সুতরাং মার্কিণ বন্ধু যে কথাটা কহিলেন,—you are destined to be the teachers of the world—তাহা আমার কাণে নূতন ঠেকিল না,—কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই যখন বলিলেন যে But you cannot fulfil this destiny until you are able to look the world horizontally into the face অর্থাৎ তোমরা যতদিন না জগতের অন্যান্য জাতি সকলের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াইয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়াছ, ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা

তোমাদের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে না। কথাগুলি আমার প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন খোঁচাইয়া নাড়িয়া দিল। আর নিউইয়র্কের এই হোটেলের পাঠাগারে এই মার্কিণ বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্দ্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই মাঘের অপরাহ্নে আমার অন্তরে আমার নূতন সত্য স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই আমি বুঝিলাম কেবল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই ভারতবর্ষ আধুনিক জগতে যে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বাঁচিয়া আছে, তাহা সফল হইবে না। যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ জাতি সকলের মাঝখানে স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদের যাহা দিবার আছে, জগতের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে না।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

—আচার্য্যের প্রতি যার শ্রদ্ধা নাই সে কখনও সেই আচার্য্যের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। জগতের প্রভুরা নিজেদের দাসের নিকট হইতে সাধারণতঃ কোনও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ যতদিন য়ুরোপের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার রত্ন-ভাণ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়া নিবার চেষ্টা করিবে, সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এই কথাটা এমন সোজাসুজি ভাবে আগে কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতালাভ, এ কথাটা সমুদয় জ্ঞান এবং সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই। মার্কিণ-প্রবাসের এইটিই হইল আমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভের বিষয়।

(৫)

স্বামী বিবেকানন্দ যে সকল শিষ্য এবং সহচর লাভ করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি তাঁহাদের দলভুক্ত ছিলেন না। ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি গোঁড়া খৃষ্টীয়ান ছিলেন। আধুনিক চিন্তা যাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছে এবং যাঁহারা বর্ত্তমান পাশ্চাত্যসভ্যতা ও সাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধা হইয়া একটা নূতন সাধনার সন্ধানে বিপথে অপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এই ভদ্রলোক তাঁহাদেরও দলভুক্ত ছিলেন না। আধুনিক পাশ্চাত্যসাধনা যে পূর্ণাঙ্গ নহে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কিছুই ভাল নাই অথবা থাকিলেও তাহা অশেষ আবর্জ্জনাতে আবৃত, এরূপও তাঁর ধারণা ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া যখন আমি নিউইয়র্কের চারিদিকে প্রচলিত খৃষ্টীয়ান মতবাদের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন তিনি আমার উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাকে বারম্বার কহিতেন, 'আমাদের ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? তোমার কাজ এখানে নয়, স্বদেশে যাইয়া স্বজাতির স্বাধীনতা লাভের উপায় কর। তাহার পূর্ব্বে

জগতের স্বাধীনজাতির লোকেরা শ্রদ্ধাবান হইয়া তোমার কথা শুনিবে না এবং নিষ্ঠাসহকারে তোমার উপদেশও প্রতিপালন করিতে যাইবে না।' তাঁহার নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, প্রকৃতি, ধারণা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক দিয়া না দেখিলে তিনি যে প্রাণস্পর্শী কথায় আমার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ সম্ভব হইবে না। ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ময় ভুখাঁ হুঁ

কেন ভারতবর্ষের মতন দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটে, আমরা দুর্ভিক্ষে কেন মরি, কেন দারিদ্র্য দেশের হৃদ্‌পিণ্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া রক্ত শোষণ করিতেছে, বারংবার এই প্রশ্ন মনে জাগে। তারপর সমস্যা একটু তলাইয়া দেখি, আমাদের ঘরে বাহিরে ভাত কাপড়ের শনি।

দেশটা কৃষিপ্রধান—অধিকাংশ লোক মাটির বুক আঁকড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে। ইহাদের জীবন যাত্রা জটিল নহে—দুই মুঠা ভাত দুইখানি কাপড় পাইলেই তাহারা খুসি; অথচ, দেখিতেছি তাহাদের অদৃষ্টে ইহাও জুটিতেছেনা। এমন করিয়া দেশের পোড়া কপাল পুড়িল কেন?

সেদিন সংবাদ পত্রে পড়িলাম পাবনা জেলার অন্তর্গত মাণিকদিয়া গ্রামে একজন মুসলমান পেটের জ্বালায় পাগল হইয়া নিজের স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করিয়াছে। সহরে বসিয়া আমরা গ্রামের খবর পাই না—মফঃস্বলের কাগজপত্রে ক্ষুধার তাড়নায় কেহ গুরুতর একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেই ঘটনাটি প্রকাশ হয়; প্রতিদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কতলোক দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে কে তাহার খবর লয়? বাঁকুড়া, খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলায় বস্ত্রাভাবে অনেক গ্রামবাসী আত্মহত্যা করিয়াছে ইহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রতি বৎসরই দেশের কোনো না কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যতই বৃদ্ধি হউক না কেন রাজস্ব ভাণ্ডারে টাকা যতই উদ্বৃত্ত থাকুক না কেন, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই যে কৃষিজীবীদের দৈন্যভার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। যে ফসল ফলায় তাহার মুখে অন্ন জোটেনা, আর এই ফসলের কেনা বেচা লইয়া দালাল, মহাজন, রপ্তানির সওদাগর ধনী হইয়া উঠে, এমন অসামঞ্জস্য ব্যবস্থা ঘটে কেন, আজ ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের কথা তুলিলে অনেকে তর্ক করেন যে, ইহার জন্য পনের আনা দোষী দেশটার খামখেয়ালী ঋতু। বৃষ্টির পরিমাণ কোথাও কম, কোথাও বেশী, কখন আগে, কখন পিছে।

মন্‌সুনের গতিবিধি অনিশ্চিত বলিয়াই চাষবাসের গোলযোগ ঘটে ; আর ফসল না জন্মিলে স্বভাবতঃই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার সমাধান করিয়াছে ও করিবে। বিজ্ঞানের কাছে এই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই সকল সভ্যদেশে ইহার স্থান সকলের উপরে। মানুষের কাছে আজ যে কোনো কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে, তাহার সমাধানের নিমিত্ত মানুষ বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে পাশ্চাত্যদেশের সকল অনুষ্ঠানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প, সেখানে শস্য জমিতেছে কেমন করিয়া? এল্‌জিরিয়া ফরাসীদের হাতে আসিলে, মরুভূমিপ্রায় ক্ষেত শস্যে শ্যামল হইয়া উঠিল কি উপায়ে? জর্ম্মাণির অনুর্ব্বর জমিতে প্রচুর শস্য জন্মে কোন্ দেবতার বরে?

অতএব ঋতুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলে চলিবে না। একথা বুঝিতে হইবে "There are no barren lands ; the earth is worth what man is worth" অর্থাৎ অনুর্ব্বর জমি বলিয়া কিছু নাই ; মানুষের মূল্যই মাটিকে মূল্য দান করে। বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্বের আসল কথাই এই। ডেনমার্ক য়ুরোপীয় প্রবল শক্তির কাছে হার মানিয়া রাজ্যের উৎকৃষ্টাংশটুকু খোয়াইল বটে, কিন্তু যেটুকু হাতে থাকিল, তাহার উপর সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া ডেনমার্ক কেবল নিজের খোরাক নহে, আজ য়ুরোপের অনেক দেশে উদ্‌বৃত্ত আহার্য্য রপ্তানি করিতে পারিতেছে। বেল্‌জিয়ম দেশটি ছোট, প্রতি বর্গমাইলে তাহার জনসংখ্যা ৫৮৯ জন ; কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত ইহাদের অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। জাপান বাড়্‌তি জনসংখ্যার খোরাকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল বলিয়া আজ জাপানের ক্ষেতে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর ফসল ফলিতেছে। আমরা যে এখনও কৃষিসমস্যা লইয়া মাথা ঘামাই নাই তাহার প্রমাণ বাংলাদেশে কৃষিশিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা নাই ; কোথাও এই সমস্যা লইয়া যথাযথরূপে অনুসন্ধান করা হইতেছে না। এ দিকে শস্যের ফলন বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ কমিতেছে ; জমির আয় হইতে কৃষকের সংসার আর চলে না। ছোট ছোট জোতদারেরা প্রায় সমস্তই খোয়াইয়া মহাজনের হাতে গিয়া পড়িতেছে। তারপর, দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে নানা ব্যাধি আসিয়া পল্লীগুলিকে শ্রীহীন করিয়া তুলিলেও আমরা ঠাওর করিতে পারিতেছি না ভাত কাপড়ের শনি কেমন করিয়া নাগরিক সমৃদ্ধির অন্তরালে বসিয়া দেশের মেরুদণ্ডটা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এদিকে সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডারের মালিকেরা সহরে ব্যবসা বাণিজ্যের এমন ফাঁদ পাতিল যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থেরা একে একে পল্লী ছাড়িয়া চলিল, ধনবানের ব্যবসা-চক্রের মধ্যে পাক খাইয়া ধনী হইবার সখ মিটাইতে। এমন করিয়া পরভোজীর দল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর যে কৃষকেরা রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় লইয়া ফসল জন্মায়, যে তাঁতিরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কাপড় বোনে, তাহাদের ঘরে ভাত নাই, পরণে বস্ত্র

নাই। দেশের ধনী মহাজন ও জমিদারেরা এই সত্য স্বীকার করিতে চান্ না; যাঁহারা করেন, কিছু ভিক্ষা দান করিয়া মনে করেন দরিদ্র প্রজার জন্য যথেষ্ট করিলেন! কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, ইহারা ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু 'ফেলিয়া দেন্, কখন কখন নাচ গান করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করেন, কিন্তু এমন করিয়া ত সমস্যার সমাধান হয় না। দেশের বারো আনা নরনারীর ক্ষীণকণ্ঠ হইতে এই কান্নাই উঠিতে থাকে "ময় ভূখাঁ হুঁ।"

নিরালয়ে বসিয়া ভারতবর্ষের কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতেছি এমন সময় গ্রামের ডাকহরকরা শম্ভু আসিয়া ঐ তারিখের সংবাদ পত্রখানি হাতে দিয়া গেল। মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম দিল্লীর রাজ মজলিসে সদর খাতাঞ্চি নূতন কর সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। লবণ, চিনি, দিয়াশলাই, ডাকমাশুল যাহা কিছু দেশের নিত্য আবশ্যকীয় সামগ্রী তাহার দাম আরো বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। রাজস্ব ভাণ্ডারে টাকা চাই, নানা কারণে রাজ্যরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব নূতন কর বসাইয়া আয় বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। এসিয়া ভূখণ্ডে নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছে; য়ুরোপের কাছে নিজেদের জাতীয় জীবনের মর্য্যাদা বিকাইয়া দিতে কেহ আর রাজি হইতেছে না। অতএব এতকাল যেমন ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহা এখন না চলিতেও পারে। এই আশঙ্কা আছে বলিয়াই হয়ত সৈন্যবিভাগের ব্যয় বাড়াইয়া নূতন করের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের উপর যাহাদের আস্থা, যাহারা এই শক্তির সাহায্যে নিম্নের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী, তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হয়।

১৮৮৪-'৮৫ সালে সৈন্যবিভাগের ব্যয় ছিল ১৬.৯৬ কোটি টাকা। আজ সদর খাতাঞ্চি চাহিতেছেন ৬২ কোটি। সেই লর্ড মেওর আমলে, তারপর ১৮৭৯ সালের সৈন্যবিভাগীয় কমিশনে আমরা শুনিয়া আসিতেছি ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন। লর্ড মেওর আমলে গভর্ণমেণ্ট বলিলেন " We cannot think that it is right to compel the people of this country to contribute one farthing more to military expenditure than the safety and defence of the country absolutely demand." ভাবার্থ:—ভারতবর্ষ রক্ষার নিমিত্ত যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত সিকি পয়সা মাত্র সৈন্যবিভাগের ব্যয়ের নিমিত্ত ভারতবাসীর কাছ হইতে আদায় করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিনা।

কিন্তু তখনকার অবস্থার সঙ্গে এখন প্রভেদ অনেক। আসল কথাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন স্যর এড্মণ্ড এলেস্—লর্ড কর্জ্জনের আমলে। তিনি বলিলেন "It is, I think, undoubted that the Indian Army in the future must be a manufactor in the maintenance

of the balance of power in Asia ; it is impossible to regard it any longer as a local militia for purely local defence and maintenance of order." ভাবার্থ ঃ—এসিয়ার বিভিন্ন রাজ্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার ভার পড়িবে ভারতবর্ষেরই সৈন্যসামন্তের উপর। কেবল মহাশক্তি রক্ষা করিবার ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্য সৈন্যসমিতির আয়োজন, ইহা মনে করা বাতুলতা। অতএব এই কথাটা মানিয়া লওয়া ভাল যে বৃটিশ সাম্রাজের সম্মুখে বৃহত্তর সমস্যা উপস্থিত হইলে বা হইবার আশঙ্কা থাকিলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু করিবার অবসর না ঘটিতেও পারে। এসিয়ার Balance of Power বজায় রাখিবার দায়িত্ব নাকি ভারতবর্ষের ; যদি এই তুলাদণ্ডের দিকে মন দিতে গিয়া অপর সকল কাজ পড়িয়া থাকে, থাকুক।

এই অবস্থায় আমরা কি করিতে পারি? রাজস্ব ভাণ্ডার হইতে কবে অর্থ সাহায্য পাইব এই আশায় বসিয়া দিন গুণিলে দুঃখের দিন ফুরাইবে না। যাহাদের হাতে রাজশক্তি চালনার ভার, তাহারা ত বলেন গরীবদের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। একজন সেদিন রাজমজলিসে নূতন করের প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলিলেন, ১৯১৯ সালের দুর্ভিক্ষের ধাক্কা দেশ যখন সাম্‌লাইতে পারিয়াছে তখন এই কথাই প্রমাণ হয় যে দেশের অর্থশক্তি রীতিমতই বাড়িয়াছে। দেশের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের মুখে এমন কথাই শুনিতে হইবে।

যাহা হউক, অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিতে হইবে আমাদের নিজেদের। দেশের ধনী-সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি না দিলে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইবে। সমস্তদেশে আজ যে অশান্তির লক্ষণ দেখা গিয়াছে, বলপ্রয়োগে তাহা প্রশমিত হইবার নহে। পুলিসের লাঠি, সৈন্যবিভাগের কামান ও ম্যাক্‌সিম্ বন্দুক দিয়া ক্ষুধিতের কান্না থামান যাইবে না। শুনিয়াছি, রুষসম্রাটের হুকুম ছিল যে "Hunger" কথাটি কেহ বক্তৃতায় বা প্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিবেনা ; কিন্তু সম্রাট যে বিপদ বলপ্রয়োগে ঠেকাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ত ক্রমশঃই ঘনাইয়া উঠিল। অন্নবস্ত্রের অভাব উপেক্ষা করিয়া আমরা কিছুতেই দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারিব না। শক্তিমদমত্ত রাজপুরুষেরা ইহা যদি বিশ্বাস না করেন, দেশের ধনীসম্প্রদায় যেন স্মরণ রাখেন অন্নবস্ত্রের অভাব আমাদের "গা-সওয়া" হইলেও আজ সমস্ত দেশের কান্না "ময় ভূখাঁ হুঁ"।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অপরাজিতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহকর্ম্মী

পরদিন মধ্যাহ্নের মধ্যেই "সংসার সাব্যস্ত" করা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, সংসারে কর্ত্তৃত্বের যে অধিকার কুলদীপ কৃপণের ধনের মত সযত্নে আগলাইয়াছে—যাহা লইয়া সে অনেক তাড়াইয়াছে—সেই অধিকার সে স্বেচ্ছায় অপরাজিতাকে দিতে লাগিল। যে অধিকার অনায়াসলব্ধ তাহার প্রতি অধিকারীর না কি বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকে না; অধিকার কষ্টলব্ধ না হইলে আদরের হয় না। সে কথাটা সত্য কিনা, ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ত দেখিয়াছি অনেক স্থলে স্বেচ্ছায় ও সাদরে প্রদত্ত অধিকারে যে সুখ কষ্টলব্ধ অধিকারে সে সুখ নাই। ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ—এসব যদি কষ্ট করিয়া লাভ করিতে হয় তবে সে সব লাভ করা না করা সমান। বরং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া উপভোগ করিতে না পারিলেই জীবন দুঃখময় হয়।

সেদিন আমি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু কাযটা অগ্রসর হইতেছিল না। শিশুর মানসিক বৃত্তিবিকাশ সম্বন্ধে এখনও নানা মুনির নানা মত—কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই—সকলেই অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন। কাযেই কোন দুইজন এক প্রণালীর সমর্থন করেন না। নানা জনের নানা মতের অরণ্যে আমি প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। তাই আমার রচনাও অগ্রসর হইতেছিল না। সেই "বাঁশবনে ডোম কানা" অবস্থায় আমি কাগজ কেতাব ছড়াইয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, বাহিরে সোণালী রৌদ্র তখন দীপ্ত শ্বেতে পরিণত হইয়াছে—রৌদ্রের তেজে আকাশের নীলিমাও যেন বিবর্ণ—ফ্যাকাশে হইয়াছে; আমার বারান্দায় অনেক টবেই গাছ মরিয়া গিয়াছে, যে দুই একটা আছে—তাহারা উত্তাপের আতিশয্যে যেন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়াছে—পত্রগুলি মূলের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। সেই সময় অপরাজিতা আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাযে ব্যস্ত?"

আমি বলিলাম, "কাযে নহে, কায করিবার চেষ্টায়।"

"একি? এত কেতাব খুলিয়া বসিয়াছেন—এক সঙ্গে কি সব পড়িবেন!"

"কোন্ খানা পড়িব, তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না"—বলিয়া আমি আমার কাযের বিষয় অপরাজিতাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সব শুনিয়া সে বলিল, "যখন সব পথই পণ্ডিত-প্রদর্শিত, তখন পথ না হয় যে কোন একটা লইবেন; কিন্তু পথ লইলেইত হইবে না।"

"কেন?"

"পথটাকে যে পথিকের উপযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা খালি পায় পথ অতিক্রম করে, তাহাদের পক্ষে কঙ্করময় পথ অনেক সময় ক্লেশদায়ক—কাঁচা রাস্তাই ভাল। লিখিবেন, বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য, লিখাটা তাহাদের উপযোগী করিতে হইবে।"

"সেই ভাবনাই ভাবিতেছি।"

"ভাবিয়া কূল কিনারা পাইবেন কি? অভিজ্ঞতার অভাব সব সময় কল্পনায় পূর্ণ করা যায় না। ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কতটুকু?"

"আপনার শৈশবে যতটুকু হইয়াছিল।"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, "সেটুকু অনেকদিন বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জিত হইয়াছে।"

"তাহার উদ্ধারের কি আর উপায় নাই?"

"না।"

"তবেই ত নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।"

"কিন্তু গড়িবার কৌশলই যে শিক্ষাসাপেক্ষ, আর সে শিক্ষা অভিজ্ঞতা ব্যতীত হয় না।"

"বরং যাহাদের বিদ্যা অল্প তাহারা চেষ্টা করিলে ভাল হইবার সম্ভাবনা।"

"অর্থাৎ বিদ্যার বোঝা কতকটা কমাইতে পারিলে, হইতে পারে।"

অপরাজিতার কথায় আমার কাছে একটা অস্পষ্ট জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি যে নানা প্রণালীর মধ্যে একটী বাছিয়া লইতে পারিতেছিলাম না—এ কাযে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না—তাহার কারণ আমি এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম, শারীরিক জড়তা তাহার কারণ নহে—নিশ্চয়তা যে মানসিক শক্তি সঞ্চালিত করে তাহার অভাবেই আমি কায করিতে পারিতেছিলাম না। কায করিবার জন্য আমার আগ্রহের ও আকুলতার অভাব ছিল না; কিন্তু আমি, সন্তরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জলে পড়িলে যেমন কেবল হাঁকু পাঁকুই করে, তেমনই করিতেছিলাম।

অপরাজিতা ততক্ষণ এক একখানি বই লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। সে যে কেবল ছবি দেখিতেছিল, এমন বোধ হইল না। তাই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ইংরাজী জান?"

অপরাজিতা বলিল, "হাঁ কি না—যাহাই বলি, মিথ্যা বলা হইবে।"

"কেন?"

"আমি যেটুকু ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি ইংরাজী জানি বলা চলে না। বিশেষ

এতদিনে তাহার অনেকটাই ভুলিয়া যাইবার কথা,"—তাহার কথায় একটু বিষণ্ণভাব ছিল। বোধ হয় তাহার পিতার কথা তাহার মনে পড়িল ; আর তাহাকে কেমন করিয়া পরে শিক্ষা গোপন করিতে হইয়াছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িল।

আমি বলিলাম, "এসব তুমি পড়িতে পারিতেছ ?"

অপরাজিতা বলিল, "পারিতেছি।"

"ভাল—তুমি একবার এ বহিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ—তোমার মতে কোন্ প্রণালী আমাদের ছেলেদের উপযোগী মনে হয়।"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, "প্রকাণ্ড পণ্ডিতের মত লইবেন বটে !"

"তুমিইত বলিয়াছ, এক্ষেত্রে পণ্ডিতই মূর্খ; অর্থাৎ বিদ্যার ভারবাহী ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

অপরাজিতা বহিগুলা দেখিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শিক্ষয়িত্রীর কাছে তোমার পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

তাহার নয়নে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু সে দীপ্তি দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "সে যে হয়, পরে হইবে।" অপরাজিতা তখনও আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই ; ঘটনার একটী তরঙ্গ তাহাকে যে স্থানে আনিয়াছে, আর একটী তরঙ্গ যে তাহাকে সে স্থান হইতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে না, তাহা কে বলিবে ? আমার এ গৃহ তাহার পক্ষে সংসারের পথে পান্থশালা ব্যতীত ত আর কিছুই নহে—এ স্থানে তাহার স্থায়ী আশ্রয় প্রাপ্তির ত কোন সম্ভাবনাই নাই। আমি আপনিই তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিয়াছি। তাহার পর আমার এই প্রস্তাব যে নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ততারই পরিচায়ক তাহা বুঝিয়া আমারই হাসি পাইতে লাগিল। আমি কথাটা আবার বলিলাম, "তাহাতে তোমার সময় কাটাইবার একটা উপায়ও হইবে।"

অপরাজিতা বেদনা-ব্যঞ্জক ভাবে বলিল, "সময় কাটিয়া যায়—সে কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না।"

"তবে সুখে আর দুঃখে।"

"সেটা মানুষের জীবনের যে ঘটনাপরম্পরার উপর নির্ভর করে, তাহাদের গতির বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা কি আমাদের সাধ্যাতীত নহে ?"

"অদৃষ্টবাদেও কি পুরুষকারের স্থান নাই ?"

"দেখুন, আমি যে বলিয়াছিলাম, আপনাকে দার্শনিক বলিয়াই বোধ হয়, সে অনুমান মিথ্যা নহে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ কি দর্শনের কথা ?"

"আমাদের কাছে ও সবই সমান।"

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। অপরাজিতা উঠিল; বলিল, "সখা-সঙ্ঘের সদস্যগণ আজ আসিবেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ। ভাল কথা, তুমি সখা-সঙ্ঘের সেই প্রথম নিয়ম মানিতেছ না।"

"ওঃ তাও বটে! তবে ত সন্ধ্যার সময় আর তোমার এ বইগুলা দেখা হইবে না; তখন আমি দেখিব।"

"আচ্ছা।"

তাহার পর আমি বলিলাম, "তুমিত সঙ্ঘের নূতন সদস্য, তুমি আজ উপস্থিত থাকিবে ত ?"

"না।"

"কেন ?"

"আমি কি অন্তরালে থাকিয়া সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করিতে—তোমাদের সহকর্ম্মী হইতে পারি না ?"

"পারিতে পার; কিন্তু এখন ত মহিলারা সঙ্কোচ ত্যাগ করিতেই ব্যস্ত। তাঁহারাও সর্ব্ববিষয়েই পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে চাহেন।"

অপরাজিতা এ কথায় বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাহা হইলে তাঁহারা ত সমাজ ও সংসার বিশৃঙ্খলই করিতে ব্যস্ত।

তাহার পর সে বলিল, "সঙ্ঘের পক্ষেও নূতন প্রবেশপ্রার্থীর সমক্ষে সব কথার আলোচনা করা ভাল নহে।"

"আমাদের ত গোপন করিবার কিছুই নাই।"

"না থাকিলেও যখন একটা উদ্দেশ্য লইয়া আপনারা কায করিতেছেন, তখন সহকর্ম্মী লইবার সময় বাছিয়া লওয়া—প্রার্থীকে পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে সদস্যের অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত।"

এ কথাটার গুরুত্ব আমি সেদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই; কিন্তু তাহার পর সমস্ত জীবন তাহা অনুভব করিয়াছি। চক্ষুতে বালুকা কণা পতিত হইলে যেমন অহরহঃ যাতনায় তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় আমার জীবনে তেমনই অহরহঃ আমার এই ভ্রমজনিত যাতনা অনুভূত হইয়াছে। জীবন থাকিতে সে অনুভূতির বিরাম নাই।

অপরাজিতা চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই কুলদীপ আমার ঘরে আসিলে আমি তাহাকে বহিগুলা দিয়া বলিলাম, "এ গুলা অপরাজিতাকে দিস্।" কুলদীপ সেগুলা লইয়া গেল বটে, কিন্তু নিতান্তই বেজার

ভাবে গেল। শুনিয়াছি সেগুলি অপরাজিতাকে দিয়া বলিয়াছিল, "দিদিমণি, তুমি এসব পড়িও না। বেশী লেখাপড়া পুরুষের পক্ষেও ভাল নহে। দেখ, বাবু ত এমন লেখাপড়া জানিতেন.না, তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা দাদাবাবু রাখিয়া খাইতে পারিলেই মঙ্গল। অথচ দাদাবাবু ত বিদ্যার জাহাজ লিখাপড়া লইয়াই আছেন। কোন জিনিষেরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে।" কুলদীপ আমার সম্বন্ধে যে সব মত প্রকাশ করিত সে সব অপ্রিয় হইলেও সে সকলে তাহার যে মানবচরিত্রজ্ঞতা প্রকাশ পাইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্য সত্যই জাহাজ যেমন মাল বহে—তাহাতে তাহার কোন উপকার হয় না, আমিও তেমনই বিদ্যার ভার বহন করিয়াছি—ভার বহনের শ্রমমাত্র ভোগ করিয়াছি, আপনার বা পরের কোন উপকারই সংসাধিত করিতে পারি নাই। আমার সম্বন্ধে কবি পোপের সেই কথাই প্রযোজ্য—"The bookful blockhead improfitably read."

সন্ধ্যার সময় সখাসঙ্ঘের সদস্য সমাগম হইল। আমি আমার লিখিত বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলাম, আর লোকেশ সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ-সমালোচনা করিয়া যাইতে লাগিল। আজ তাহার আবার স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেদিন তাহার ভাবান্তরের কারণ উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। লোকেশের পত্নীপ্রেম অত্যন্ত প্রবল ছিল। আর প্রেম অত্যন্ত প্রবল হইলে কাহারও কাহারও যাহা হয়, তাহার তাহাই হইয়াছিল—সে স্ত্রীর কাছে সর্ব্বদাই যে ব্যবহার পাইবার আশা করিত তাহাও অত্যন্ত অধিক; আশা পূর্ণ হইতে বিঘ্ন ঘটিলেই সে অধীর ও অসন্তুষ্ট হইত; ফলে সময়ে সময়ে দম্পতি কলহ হইত। তখন সে একান্ত বিষণ্ণ হইত—জগতে আর কিছুই ভাল লাগিত না। কিন্তু সে ভাব আবার কলহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচিয়া যাইত—পদভারনত দুর্ব্বাদল যেমন পদ অন্তর্হিত হইতে না হইতেই আবার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় সে আবার তেমনই স্বাভাবিক প্রফুল্লভাবফুল্ল হইত।

আজ তাহার ভাব দেখিয়া একজন সদস্য বলিলেন,—"লোকেশ আজ নিশ্চয় মোটা মক্কেল জবাই করিয়াছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"না। আমি লোকেশের সেদিনের ভাবান্তরের কারণ বলিতে পারি।"

লোকেশ বলিল,—"চুপ! ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট করিওনা। সখা-সঙ্ঘের সম্পাদক যদি গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিতে না পারেন, তবে আমার প্রস্তাব—তাঁহাকে পদচ্যুত করা হউক।"

তাহার পর আমি আবার বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলাম।

পাঠ শেষ হইতে না হইতেই কুলদীপ খাবার লইয়া হাজির হইল। আজ কিন্তু চেঙ্গারিতে—ঠোঙ্গায় বাজারের খাবার নহে—রেকাবে সজ্জিত ঘরের খাবার। ব্যাপারটা আমি বুঝিলাম। এই জন্যই অপরাজিতা সখা-সঙ্ঘের সদস্যদিগের আসিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল; তাহাতে

আর কুলদীপে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়া অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিয়াছে। যে সব বাসনে কুলদীপ কাহাকেও হাত দিতে দিত না সে সব আজ বাহির হইয়াছে।

কুলদীপ এক দফা রেকাব নামাইয়া দিয়া আর এক দফা আনিতে যাইলে লোকেশ আমাকে বলিল,—“কিহে নিশীথ, তোমার যে দেখিতেছি, অবস্থা ফিরিয়াছে! ব্যাপার কি? লক্ষ্মীছাড়ার ত এমন লক্ষ্মীশ্রী ভাল নহে!”

তখন আমি অপরাজিতার কথা বলিলাম; কিন্তু তাহার মুখে তাহার যে কথা শুনিয়াছিলাম নিষ্প্রয়োজন বোধে সে সব না বলিয়া শিয়ালদহে সঙ্গিহীন অবস্থায় আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিলাম।

কথা শেষ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ব্যাপারটা ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে হয় না?”

একাধিক কণ্ঠে উত্তর হইল “নিশ্চয়।”

আমার এই কথা শুনিয়া আর কাহার কিরূপ ভাব হইয়াছিল, লক্ষ্য করি নাই; আমার কথা যে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম, লোকেশের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখ “কাল বৈশাখী”র মত অন্ধকার।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে যে গল্পগুজব হইতেছিল লোকেশ তাহাতে যোগ দিল না—তাহার সরস টিপ্পনীর মসল্লার অভাবে কথোপকথন কেমন স্বাদহীন মনে হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সে প্রস্তাব করিল, “আজ নিশীথকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হউক। রবিবারের পূর্ব্বে আমার আর সময় নাই, সুতরাং তাহার মধ্যে আর সভা না হইলেই ভাল হয়।”

সকলেই “তথাস্তু” বলিলেন।

যাইবার সময় লোকেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কল্য সকালে তুমি বাড়ীতেই থাকিবে ত?”

আমি উত্তর দিলাম,—“হাঁ।”

“আমি আসিব। কায আছে।”

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাযের চশমা পরানো দৃষ্টি যেটা বড় হয়ে অবধি মানুষ দর্শন স্পর্শন শ্রবণের উপরে লাগিয়ে চলাফেরা করছে সেটার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে চল্লে তারাগুলো মিট্‌মিটে আলো কিম্বা খুব মস্ত মস্ত পৃথিবীর মতনও দেখায় কিন্তু আকাশের তারার মাটিতে নেমে আসা দেখা অথবা আকাশে বসে তারাগুলো যে কথা ভাবছে সেটা শুনিয়ে দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না উক্ত চশমা দিয়ে দেখে। ভাবুক যাঁরা সচরাচর যান্ত্রিক দৃষ্টি যাঁদের নয় তাঁদেরই পক্ষে সহজ হয় শিশুদের মতো হৃদয় দিয়ে আত্মীয়ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বিশ্বের গোপন কথা বলা আর গদ্যময় কাযের সাধারণ চশমা দিয়েই দেখলেম অথচ দেখতে চাইলেম ভাবুকের মতো গাঁথতে চাইলেম পদ্য—কিন্তু পদ্য কেন, ভাল একটা গদ্যও রচা গেল না সেই যান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে—কল্পনা ভাবুকতা এ সবের বদলে সাধারণ কথা এবং কাযের কথাই সেখানে বিকট ছাঁদে আমাদের সামনে হাজির হল যথা—

> মন্ত্রী রূপে চারিদিকে যত তারাগণ
> ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন।
> শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত
> দেখিলেই মনোপদ্ম হয় প্রফুল্লিত।

চাঁদকে ঘিরে তারাগুলো যখন সারারাত কি যেন মন্ত্রণা করছিল নিশ্চয়ই এই কবিতার কবি সেই সময় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিলেন, নয় তো খুব কাযের চশমা পরে মকদ্দমার নথি পড়ছিলেন। সুতরাং মনোপদ্ম যাতে প্রফুল্লিত হয় এমন একটা সামিগ্রী তিনি দিয়ে যেতে পারলেন না কিম্বা ধরতেও পারলেন না চোখ কান হাত পা কিছু দিয়েই।

"ভোলা" "বাঁকা" হিন্দুস্থানিতে এদুটোর অর্থ সুশ্রী, আবার কুব্‌জা ও বাঁকা শ্যামও বাঁকা, একজন সুন্দর বাঁকা একজন যৎকুচ্ছিত বাঁকা, তেমনি একথা যদি কেউ বোঝেন যে সব জিনিষকে সোজাসুজি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে না দেখে বাঁকা রকম করে দেখলেই কিম্বা উল্টো পাল্টা করে দেখালেই নিজের দৃষ্টির মধ্যে এবং নিজের বলা কওয়া লেখা ইত্যাদির মধ্যে ভাবুকতা রস সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভরে উঠবে কানায় কানায় তবে তার মতন ভুল আর কিছু হবে না।

ভাবুকের কায-ভোলা দৃষ্টি অত্যন্ত কাযের সামগ্রী ধানক্ষেতটা ঠিক কাযের মানুষ হিসেবে না দেখলেও ক্ষেত ও মাঠের সৌন্দর্য্য যে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে তার কাছে ধরা পড়ে এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখা মাঠের বর্ণনা ও ছবি খুব কাযের চশমা দিয়ে দেখা ও দেখানো মাঠের রূপটার চেয়ে মনোরম পরিষ্কার হয়ে যে ফুটে ওঠে ভাবুকের লেখায় বর্ণে বর্ণে তা এই কাযের চশমা আর ভাবের চশমা দিয়ে দেখা ক্ষেত আর মাঠের দুটি বর্ণনা থেকে পরিষ্কার ধরা যাবে।

প্রথম কাযের চশমা দিয়ে দেখা মাঠ বর্ণন, মাষ্টার মশায় যেন উপদেশ দিলেন শিশু যে মাঠে ছুটাছুটিই করতে চায় তাকে—

হে বালক! মাঠে গিয়ে দেখে এস তুমি
কত কষ্টে চাষা লোক চষিতেছে ভূমি ॥
পরিপাটি করে মাটি হ'য়ে সাবধান
তবে তায় শস্য হয়—ছোলা মুগ ধান ॥

এই কাযের দৃষ্টি দিয়ে মাঠকে তো দেখাই গেল না, শস্য কেমন করে হয় মাটি পরিপাটি হয় কিসে তাও দেখলেম না মাঠটি পরিপাটিরূপে বর্ণন ও দর্শন কি করে হয় তা জানতে কাযেই ভাবুকের কাছে দৌড়োতেই হল আমাদের। সেখানে গিয়ে শস্য ক্ষেত্রের এক অপরূপ রূপ দেখলেম :—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারঃ

কিম্বা যেমন—

পরিণত-বহুশালি-ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা
সততমতিমাণজ্ঞক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ॥

নিছক কাযের দৃষ্টি দিয়ে কাযের মানুষের কাছে মাঠখানা কৃষি তত্ত্বের ও নীতি শাস্ত্রের বইয়ের পাতার মতোই দেখালো, মাঠের সবুজ প্রসার কেমন করে গ্রামের কোন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা দেখলে ভাবুক। কাযের দৃষ্টি দেখলে মুগ মুসুরি ছোলা কলা ধান ফলানো হচ্ছে মাঠের পাট করে, কিন্তু ধান পেকে কোথায় সোণার মতো ঝক্‌ছে, লোধ্র গাছ গ্রামের ধারে কোথায় ফুল ফুটিয়েছে, রাঙ্গা, সবুজ, নানা বর্ণের শস্য, শিশিরে নুয়ে পড়া পদ্মফুল এসব কিছু ধরতে পার্‌লেনা অত্যন্ত কাযের কাজি দৃষ্টিটা, অথচ মাঠের ছবি যথার্থ যদি দিতে হয় কি দেখতে হয় মাঠ কেমন করে চষা হয় এটা দেখানোর চেয়ে মাঠে কোথায় কি রং লেগেছে ফুল ফুটেছে ইত্যাদি নানা হিসেব না নিলে তো চলেনা সে হিসেবে ভাবুক দৃষ্টি ঠিক দেখার মতো দেখাই দেখলে বলতে হবে।

কাযের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামিগ্রী স্পর্শ করে। কাযের মানুষ দেখে কেম্বিসটা পর্দ্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়। সাদা পাথর, কাযের দৃষ্টি বলে সেটা পুড়িয়ে চুণ করে ফেল, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্ত্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক। নির্ম্মম স্বার্থদৃষ্টি কাযের চোখ নিয়েই সাধারণ মানুষ নিজের মুঠোয় ফুটন্ত ফুল গুলোর গলা চেপে ধরে বলির পাঁঠার মতো সেগুলোকে বাগানের

বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পূজোর ঘরের দিকের চলে, আর ভাবুক যে দৃষ্টি নিয়ে ফুলের দিকে চায় তাতে স্বার্থের ভার এত অল্প যে প্রজাপতি কি মৌমাছির পাতলা ডানার অত্যন্ত লঘু অতি কোমল পরশও তার কাছে হার মানে। অতি মাত্রায় সাধারণ অত্যন্ত কাযের দৃষ্টি সেটা ফুলের গুচ্ছকে পরকালের পথ পরিষ্কারের ঝাঁটা বলেই দেখছে, ছেলেবেলার কৌতূহল দৃষ্টি যেটা রাঙ্গা ফুলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ডাকাতের মতো বাগান থেকে বাগানের শোভাকে লুটে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে, কিম্বা বিলাসের দৃষ্টি যেটা ফুল গুলোর বুকে সূঁচ বিঁধে বিঁধে ফুলের ফুলশয্যা রচনা করে তার উপরে লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন করে ফুলের শোভা মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে এদের চেয়ে ভাবুকের দৃষ্টি কতখানি নিঃস্বার্থ নির্ম্মল অথচ আশ্চর্য্যরকম ঘনিষ্টভাবে ফুলকে দেখলে, ভাবুকের লেখাতেই ধরা রয়েছে—

চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস
　　তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস।
খোজ করত বহু বার বার
　　তন বন ফুল্যো ভার ভার॥
　　　　　　কবীর

কবি কালিদাস এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্মন্ত রাজাকে দেখালেন শকুন্তলার রূপ—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ···মধুনবমনাস্বাদিতরসম্ !

কিন্তু রাজার বিদুষকের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা পেটের মতনই মোটা ছিল কাযেই রাজার কাছে শকুন্তলার বর্ণন শুনে সে পিণ্ডি খেজুর আর তেঁতুলের উপমা রাজাকে শোনাতে বসে গেল! রাজা বিদুষককে ধমকে বল্লেন—

অনবাপ্ত চক্ষুঃ ফলোঽসি, যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্॥

তুমি দর্শনীয় বস্তুর যেটি দেখবার যোগ্য সেইটি যখন দেখতে পেলে না তখন তুমি বিফলই চক্ষু পেয়েছো!

রাবণটার চেয়ে দেখা, শুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখা সমস্তই রামের দেখার চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল—

কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটা বদন
রাক্ষসের রাজা সেই লঙ্কার রাবণ
ত্রিভুবন তাহার ভয়েতে কম্পবান
মনুষ্য রামেরে সেটা করে কীট জ্ঞান।

রাবণের দশটা মাথার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর রকম বস্তুগত বুদ্ধিই দিনরাত প্রবেশ করতো তার দশ দিকে বিস্তৃত দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির রাস্তা ধরে ভাবলেও অবাক হতে হয়, কিন্তু সীতার পণ ভাঙ্গা সুসাধ্য হল বালক রামের কুড়ি হাত রাবণের নয় কেননা ধনুক ভঙ্গের সময় রামের মনটি রামের হাতের পরশে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, আর রাবণের মন নিশ্চয় সীতার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়েছিল, ধনুক তোলা ধনুক ভাঙ্গা যে কটা আঙ্গুলে হতে পারে তাদের ডগাতেও পৌঁছয়নি সময় মতো।

দিন রাতের মধ্যে যে সব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিম্বা আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাযে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না দেখে থাকতে পারে না—হঠাৎ পূব কি পশ্চিম আকাশ রঙ্গে রাঙ্গা হয়ে উঠলো দৃষ্টির সঙ্গে মন তখনি যুক্ত হয়ে দেখে কি হল, পাড়ায় ট্রামের ঘণ্টার টুং টাংএর উপরে হঠাৎ কোন সকালে বাঁশীর সুর বাজলে মন বলে ওঠে কি শুনি, হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস ঘরের ঝাঁপটা নাড়িয়ে দিলে মন যেন ঘুম ভেঙ্গে চমকে বলে শীত গেল নাকি দেখি! পাড়ার যে ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দুএকদিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটার দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে, কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর গোড়া দিয়ে শোভা যাত্রা করে যখন চলে তখন নয়ন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে, আর সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয় হঠাৎ। তাং রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্তো, নার্য্যোনজগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি তথাপি শেষেন্দ্রিয় বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মানা চক্ষুরৈব প্রবিষ্টা। যা হঠাৎ এল তার দিকে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে থেকে জাগে আমাদের সকলেরই, কিন্তু বাইরে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতূহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্ব জগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে, লেখার ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে, কাযেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমা খানি।

এমন মানুষ নেই যার শ্রবণের সঙ্গে ছুটির ঘণ্টা আর কাযে যাবার ঘণ্টার ছেলে বেলা থেকেই বিশেষ যোগাযোগ আছে, কিন্তু সচরাচর এত কাযের ভিড়ে মানুষকে ঘিরে থাকে যে ভাবুক মন দিয়ে এই ঘণ্টা শুনে যতক্ষণ না বলে দেন ঘণ্টা দুটো কি বলে ততক্ষণ ঘণ্টাটা শোনাই আমাদের হয়নি যথার্থভাবে একথা বলা যায়। সবারই কানে আসে সন্ধ্যাপূজোর শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যায় আঁধার করা ছবি চোখে পড়ে সবারই কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যা রাগের সঙ্গে মিলিয়ে সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে একটি অপরূপ রূপ ধরিয়ে যখন ভাবুক মানুষ আমাদের শুনিয়ে দিলেন

দেখিয়ে দিলেন কেবল তখনই তো সন্ধ্যা সন্ধ্যাপূজা এমন কি সন্ধ্যাকালের এই পৃথিবীকে যথার্থভাবে দেখতে শুনতে পেলেম আমরা—

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা, সন্ধ্যা হল বুকে ধর
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর॥

ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধার মাঝে হোক্‌না জড়॥

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা।

আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি!
আমার বলে যাহা আছে, মা
তোমার করে সকল হর।

বুক সন্ধ্যার বুকের স্পন্দন অনুভব করলে, নয়নের দৃষ্টি অতল কালোর স্নেহভরা পরশ নিবিড় করে উপভোগ করলে, ফিরে এলো নতুন করে তরুণ দৃষ্টির করুণ চাহনি নতুন করে জাগলো প্রাণভরে শুনে নেবার গেয়ে ওঠবার ইচ্ছা, সারা সংসারে ছড়ানো জীবনের দিনগুলো সাঁঝের আঁধারের মধ্যে দিয়ে মিল্লো এসে একেবারে সন্ধ্যা তারার কোলের কাছটিতে রহস্য নিকেতনে, আলো আর কালোর ছন্দে প্রাণকে দুলিয়ে দিলে, রাতের সুরে গিয়ে মিল্লো দিনের সুর, আঁধারে গিয়ে মিশলো—আলো। একেবারে ঢেলে দেওয়া গেল সব স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে গভীর রিক্ততার প্রশান্ত আলিঙ্গনে। সন্ধ্যা কতদিন ধরে যার সঙ্গে দেখা শোনা হয়ে আসছে তাকে এমন করে দেখা কজন দেখলে? নিত্য সন্ধ্যার হাওয়াটা গড়ের মাঠে গিয়ে খেয়ে এসে এবং পূজো বাড়িতে গিয়ে শাঁখঘণ্টা শুনে এসে আমরা পুঁথিগত ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্র গুলোর চেয়ে একটুও অধিক দেখতে শুনতে পেলেম না কিন্তু কবীর তিনি দুছত্রে সমস্ত সন্ধ্যার প্রাণটি এক মুহূর্তে টেনে আনলেন আমাদের দিকে—

সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে
চকরী দীন্‌হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো
জঁহা রৈন ন হোয়॥

এ কোন্ অগম্য দেশের খবর এসে পৌঁছল। রাত্রির পরপারে যুগল তারার রাজত্বে যাবার সকরুণ ডাক, ভীরু-পাখীর গলার সুর ধরে এ কোন চিরমিলনের বাণী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছল—যারা দেখেও দেখছেনা শুনেও শুনছেনা ধরেও ধরতে পারছেনা তাদের কাছে!

যে চোখের দেখায়—সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির কালিমা শুধু আমাদের শঙ্কা আর সংশয় বুদ্ধিই জাগিয়ে তোলে, ভাবুকের দেখা কি সেই চলতি চোখ দিয়ে দেখা না তেমন শোনা দিয়ে তেমন পরখ দিয়ে চেয়ে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখা। এ সে ভাবুকের কবির শিল্পীর সেই দিব্য দৃষ্টি যা অন্ধকারে আলো দেখলে, দুঃখের পরশেও আনন্দ পেলে, অসীম স্তব্ধতার ভিতরে সন্ধান পেয়ে গেল সুরের—

তিঁমির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন অসেঁ
পশ্চিম দিগকী খিড়কী খোলো
ডুবহু প্রেম গগন মেঁ
চেত-সংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহ যা তনমেঁ॥
সংখ ঘণ্টা সহ নাই বাজে
শোভা সিন্ধু মহল মেঁ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আঁধারের প্রেম তনু মনকে আবৃত করলে, আলো যে দিকে অস্ত যাচ্ছে সেই দুয়ার খোলো, এই সন্ধ্যাকাশের মত বিস্তৃত অন্ধকারের প্রেমে নিমগ্ন হও, চিত্ত শতদল পান করুক রাত্রির রস, মনে লাগুক মনে ধরুক অতল কালোর প্রেম লহরী, সীমাহীন গভীরে বাজ্‌তে থাক আরতির শঙ্খঘণ্টা, মিলনের বাঁশি, আঁধার সমুদ্রে ফুটে উঠুক অপরূপ রূপ!

এ যে হৃদয় এসে মিলতে চাইলো নূতনতরো দেখা শোনা ছোঁয়া দিয়ে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে! আগে আসছিল মানুষের বাইরেটা তার বুদ্ধির গোচরে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যন্ত্রে ধরা, এখন চল্লো মানুষের অন্তরটা বাইরের সঙ্গে মিলতে হাতে হাতে চোখে চোখে গলায় গলায়—বাইরের আসা এবং বেরিয়ে যাওয়া এরি ছন্দ আবিষ্কৃত হ'ল ভাবুক মানুষের জীবনে! অভিনিবেশ করে বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনার কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় শক্তি সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে তুল্লেন যে মুহূর্ত্তে ভাবুক—সৌন্দর্য্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিষ ভরে উঠলো, জগৎ এক

অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়ালো মানুষের মনের দুয়ারে, বারমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব করলে মানুষ যেটা সে কিছুতে পেতে পারতো না যদি সে ইন্দ্রিয় সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মন্ত্রীর কায দিয়ে বসিয়ে রাখতো বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা কওয়া হাঁক ডাক করেই বসে রইলো না সে গেয়ে উঠলো, হাতের আঙ্গুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করেই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সুঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, বীণা যন্ত্রের উপরে সুর ধরতে লাগলো হাত আঙ্গুলের আগা, শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিচরণ করতে থাকলো আঙ্গুলের পরশ গুন্ গুন্ স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে চল্লো হাত কান শুনতে লাগলো প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ! সরু সুঁচের, সোনার সুতোর, রংএ ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে তালে তালে চল্লো অঙ্গুল, হাতুড়ি বাটালীর ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করতে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত কাযের ভিড় থেকে মানুষের চোখ হাত সেই সঙ্গে মনও ছুটী পেয়ে খেলাবার ও ডানা মেলাবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুল্লেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান মানুষ এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে স্রস্টা রয়েছেন গোপনে!

"যথাদর্শে তথাত্মনি যথাপ্সুপরিব তথা গন্ধর্ব্ব লোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়া-তপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্ব্ব-লোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে সমস্তই দিব্য দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মত করে শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা এবং এরও ওপরে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিয়ে গাইয়ে চলেছেন তাঁকে পর্য্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে, দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল তার পর এল দেখানোর পালা! মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী

হয়ে বসলো! এই দৃষ্টি বলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগলো যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে অসুন্দরকে সুন্দর করে অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রং দিয়ে চল্লো মানুষ—

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে!"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুভদৃষ্টি

একখানা ছবি আঁকা শেষ না করেই তুলিটা একপাশে ফেলে অরুণ উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গিয়ে জানলার ধারে থেমে সামনের বাড়ীটার দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল। জীর্ণ বাড়ীটার ভগ্নপ্রায় ইট আর খসে-পড়া চূণবালির ভিতর থেকে সে কোন ভাব সংগ্রহের চেষ্টায় ছিল না নিশ্চয়, কিন্তু হঠাৎ পাশের জানালায় চোখ পড়াতে সে যেন আর চোখ ফেরাতে পারল না। একটি মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে জানালার গরাদ দুটি দুহাতে ধরে তার দিকে চেয়ে আছে, তার চোখে একটা ব্যাকুলতার সঙ্গে একটু ভীত চকিত ভাব জড়ান। অরুণের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে সাধারণ মেয়েদের মত ছুটে পালাল না, একটু চম্‌কে একটা গরাদ ছেড়ে দিয়ে ঈষৎ সরে গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার অরুণের চোখের ওপরেই নিবদ্ধ রইল। তার চোখের চঞ্চলতাটুকু স্থির হয়ে গেল, সেখানে জেগে রইল শুধু একটি মৌন-মুগ্ধ-দৃষ্টি,—কেবল একটি নিমেষ! তার পরেই তার সর্ব্বশরীরে যেন লজ্জার আভাস ফুটে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে নিল, আর ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে দরজার কাছে ডাক শোনা গেল—"শোভা,"—সে "যাই" বলেই স্বপ্নের মত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। অরুণ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরে এসে অসমাপ্ত ছবিখানার সাম্‌নে বস্‌ল। অস্তরবির বিদায়রশ্মি ছবিখানার ওপর পড়ে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করছিল সেদিকে তার চোখ গেল না।

সে সেদিনকার মত কাজের কথা মন থেকে বিদায় দিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। আজ সন্ধ্যায় কারও বাড়ী যেতে ইচ্ছা করল না, সে সোজা গঙ্গার ধারে চলে গেল। সেখানে বসেও নদীর শোভা না দেখে কল্পনায় শোভার সেই দৃষ্টিটুকু ধ্যান করতে লাগল। এমন চোখ সে কখনও

দেখেছে বলে মনে হল না, চোখের মধ্যে সমস্ত প্রাণ যে এমন করে ধরা দেয়, এমন করে রূপ ধরে বেরিয়ে আসে এও তার জানা ছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে অনেক মেয়ে তার দিকে অনেকবার চেয়েছে, তা নিয়ে অরুণের গর্ব্ব বড় কম ছিল না। তার চিত্র বিদ্যার খ্যাতির চেয়ে সে তার এই হৃদয়জয়ের ক্ষমতার খ্যাতিকে একটুও নীচে স্থান দিত না। নিজেও সে অনেকবার কত সুন্দরীর রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়েছে, খেলার ছলে হয়ত দুচারবার কারও কাছে ধরাও দিয়েছে, কিন্তু সে সুধু খেলাই ছিল, মনের মধ্যে তার জন্য কোন দাগ বসে নি। নিজের চপলতার জন্য কখনও অনুতাপের ছায়াও তার মনে এক ফোঁটা অন্ধকার সৃজন করতে পারে নি। আজ এই অপরিচিতার দৃষ্টি তাকে কিন্তু বাস্তবিকই বিহ্বল করে তুলেছিল। তার মনে হল, অনেক দিন থেকে এই ভাঙ্গাবাড়ীতে লোক সমাগম হয়েছে, কিন্তু সে একদিনও চেয়ে দেখে নি, ওখানে কারা এসেছে। মনে ভারি দুঃখ হল যে আগেই কেন ঐ মেয়েটিকে দেখবার সুযোগ পায় নি। 'শোভা' নামটিও তাকে চমৎকার মানিয়েছে।

গঙ্গার হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হলে অরুণ ভাবল, শোভার প্রতি তার আকর্ষণ, শুধু সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্রকর কিম্বা কবির আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া মেয়েটি এমন কিছু সুন্দরীও নয়; তার সেই পৃথিবীর বেদনা-জড়করা কালো চোখের গভীরতা আর মুখের কমনীয় ভাবটুকু ছাড়া খুঁটিয়ে দেখতে গেলে আর বিশেষ কিছু নেই। অরুণ বাড়ী ফিরবার পথে ভাবতে লাগ্‌ল শোভার একখানা ছবি আঁকবে। পোড়োবাড়ার ভাঙ্গা জানালায় একটি তরুণী, যেন জরাজীর্ণ দেহের মধ্যে চির-নবীন একটি প্রাণের আভাস, কিংবা সহরের সৌন্দর্য্যহীন বাড়ীগুলির ওপর গোধূলির মৃদু আলোক-সম্পাত,—নানারকম রূপক ভাবতে ভাবতে মনে হল,—না এসব নয়, গোধূলি লগ্নে বিয়ের কনে তার চিরবাঞ্ছিতের দিকে লজ্জিত চোখ দুটি তুলে চেয়েছে,—এই আঁকতে পারলেই ঠিক জিনিষটা ফোটান হবে। ছবিটার নাম তখনই ঠিক কর্‌ল—"শুভদৃষ্টি"। শোভা যে তাকে ভালবেসেছে, তাতে অরুণের সন্দেহ ছিল না। আরও অনেকবার এ রকম জ্ঞানে তার মনে যে নিছক অহঙ্কারের ভাব আস্‌ত, এবার সেটুকু ছাড়া আরও একটা কিসের আনন্দে ও ব্যাকুলতায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

বাড়ীর গলির মোড়ে ঢুক্‌তেই মহাকোলাহল শুনে অরুণ চম্‌কে চেয়ে দেখে শোভাদের বাড়ীখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে, লোকে লোকারণ্য, ফায়ার ব্রিগেডের লোক আগুন নিভোতে চেষ্টা কর্‌ছে। অরুণ ছুটে এগিয়ে যেতেই তার ছোট ভাইকে দেখ্‌তে পেল। সে বল্‌ল, "ঠিক্ সময় ফায়ার ব্রিগেডের দল এসে না পড়লে আমাদের বাড়ীতেও আগুন ধরে যেত। একটি মেয়ে ভয়ানক পুড়ে গেছে, তাকে তার বাড়ীর লোকের সঙ্গে হাঁসপাতালে পাঠান হয়েছে।" অরুণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কে, কে, শোভা?" তার ভাই বল্‌লে,—"তা ত জানি না।" পাশেই ফুট্‌পাথের ওপর যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি হতাশভাবে বসেছিলেন, তিনি বল্‌লেন,—"হাঁ, আমার মেয়ে

শোভা। জানি না সে এতক্ষণ বেঁচে আছে কিনা। তার মা আর ভাইরা সঙ্গে গেছে, আমি জিনিষ আগ্‌লাতে বসে আছি। হা ভগবান!" কান্নার চেয়ে করুণ স্বরে কথা ক'টি বলে ভদ্রলোক চোখ ঢাক্‌লেন। অরুণ দেখ্‌ল কয়েকটা ভাঙ্গা বাক্স ইত্যাদি রাস্তার ওপরেই ছড়ান রয়েছে। সে ভদ্রলোকটিকে বল্‌ল, "জিনিষগুলো আপাততঃ আমাদের বাড়ীতে তুলে রেখে, চলুন আপনাকে নিয়ে হাঁসপাতালে যাই।" শোভার বাবা রাজি হলেন, আগুনও ততক্ষণ নিভে গেছে। গাড়ী জুড়তে বলে অরুণ জিনিষ-গুলো বাড়ীতে তুলিয়ে রাখছে, হঠাৎ একটা কাপড়ের বাক্স থেকে একখানা খাতা ছট্‌কে এসে বাইরে পড়ল। সেটা তুলে রাখতে গিয়ে অরুণ দেখ্‌ল কালো মলাটের উপর শাদা অক্ষরে লেখা "শোভা"। খুল্‌তেই কয়েক জায়গায় তার নিজের নাম দেখ্‌তে পেল। আর কিছু না ভেবেই খাতাখানা সে বাক্‌সে না রেখে নিজের দেরাজে বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। হাঁসপাতালে গিয়ে দেখে শোভা তখনও অজ্ঞান, তার মা কাঁদ্‌ছেন, ভাইগুলি চুপচাপ্‌ দাঁড়িয়ে আছে। শোভার জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তার হাঁসপাতালে থাকাই ঠিক্‌ হল, তার মা কাছে থাক্‌বেন। বাবা আর ভাইরা কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করাতে শোভার বাবা বল্‌লেন, গাছতলা ছাড়া তাঁদের আশ্রয় নেই। পাড়াগাঁর মানুষ সহরে কাউকেও বড় চেনেন না, মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় কল্‌কাতায় এসেছিলেন, সস্তা বলে ভাঙ্গা বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলেন। নিজেদের গাঁয়ে মেয়ের পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না বলে এক আত্মীয়ের পরামর্শে সহরে এসেছেন, তা এখানেও শুধু রূপেগুণে মেয়ে বিকোচ্ছে না। সে বড়মানুষ আত্মীয়টিও গরমের ছুটীতে সিমলা গেছেন, তাঁর বাড়ী তালাচাবি বন্ধ। অরুণ দ্বিধা না করেই বল্‌ল,—"আপনারা যতদিন ইচ্ছা আমার ওখানে থাক্‌তে পারেন। শোভা ভাল হয়ে উঠলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।" শোভার বাবার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল, তিনি আর কোন কথা না বলে ছেলেদের নিয়ে অরুণের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অরুণের বাড়ীর লোকেরা এতে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল না, তবে খামখেয়ালী ছেলের ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া তাঁদের অভ্যাস ছিল না বলেই চুপ করে রইলেন।

রাত্রে অরুণ ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শোভার খাতাখানা বার করে পড়তে বস্‌ল। অনধিকারচর্চ্চা বলে তার একবারও মনে হল না। প্রথম কয়েকপাতায় তার পাড়াগাঁর জীবনের ছোট খাট দুচারটি কথা, অধিকাংশই নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকা আর তাই নিয়ে পাড়াপড়শীদের ঠাট্টা-তামাসার বিবরণ। সেই বছরের ১লা বৈশাখ থেকে খাতার লেখা আরম্ভ হয়েছে। বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে তারা কল্‌কাতায় এসেছে। সেইখানটায় লেখা আছে, "উঃ এই বাড়ীটা দেখেই আমার কান্না পাচ্ছে। এর চেয়ে আমাদের সে ভাঙ্গাকুঁড়ে ভাল ছিল। পাশের প্রকাণ্ড বড় বাড়ীটার কাছে এই রকম একটা বাড়ী কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছি। এখানকার লোকগুলোই বা কি! এত কাছাকাছি দুটো বাড়ী, অথচ ওবাড়ীর লোকেরা একবার ভুলেও আমাদের দিকে দেখে না। আমাদের গাঁয়ে হলে এতক্ষণ কত ভাব হয়ে যেত। সেখানে 'বিয়ে না হওয়া ধেড়ে আইবুড়ো

মেয়ে,' 'লেখাপড়া শেখা মেম্', এসব যদিও শুন্তে ভারি খারাপ লাগত, তবু প্রাণটা এমন খাঁচার পাখীর মত ছটফট করত না। এখানে নাকি লেখাপড়া জানা মেয়ের আদর, তাই বাবা বিয়ে দিতে নিয়ে এলেন। মাঝে মাঝে বরের দল দেখ্‌তে আসে কত নাড়াচাড়া কত পরীক্ষা, তারপর সেই রূপোর টাকার সোণার কাঠির স্পর্শের অভাবে সবাই বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। কারও প্রাণ জেগে ওঠে না, কেউ আমায় চায় না। শরীর মনের ওপর এমন অপমানের ধাক্কা আর যে সয় না। কেন বাবা গরীব হয়েও আমায় এত যত্ন করে লেখাপড়া শেখালেন, কেনই বা দাদারা এই অবজ্ঞাতা নারীর দেশে বোন্‌টিকে আদর দিয়ে তার আত্মশক্তি আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান ফুটিয়ে তুল্‌লেন! এতখানি করেও ত সমাজের ভয়ে তেমনি আমাকে আর দশজনের মত গরু ভেড়া বেচার সমান করে তুলেছেন।"

অরুণ দূরে আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার খাতার পাতা উল্‌টে চলল্। আর এক জায়গায় পড়ল,—"মেজদাদা এসে বল্‌লেন 'জানিস্ শোভা পাশের বড় বাড়ীটা কার?' আমি তখন মাসিকপত্র থেকে সংগৃহীত খানকয়েক আমার অতিপ্রিয় ছবি নিয়ে দেখ্‌ছিলাম,—মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার?' মেজদা বলিলেন, 'যার আঁকা ছবি দেখ্‌ছিস্ বসে বসে, সে ঐ বাড়ীতে থাকে। আমি আজ খোঁজ নিয়ে জানলাম।' 'সত্যি?' বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেজদা বল্‌লেন, 'ওরা বেজায় বড় মানুষ তা নইলে একদিন ভাব করে ফেলতাম। তোর মত ভক্তের খোঁজ পেলে অরুণ হয়ত একখানা ছবিই উপহার দিয়ে ফেল্‌ত। কি বলিস্?' মেজদা চলে গেলেন; আমি তখন থেকে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে সব ঘরগুলো থেকে বাড়ীটা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। অরুণ কে, কোথায় থাকে, কিছুই জান্‌তাম না। মাসিকপত্রে তার খ্যাতির কথা পড়তাম, তার আঁকা ছবি দেখ্‌তাম, আর অবাক হয়ে ভাবতাম কেমন করে তুলির টানে এমন জীবন্ত ছবি ফোটে। দিন পনের হয়ে গেল এখানে আছি, অথচ জানি না সে এখানে। যাক্ একদিন তাকে দেখ্‌তে হবে ত। এমন ছবি যে আঁকে সে কেমন না দেখ্‌লে চল্‌ছে না।"

বিপুল আগ্রহে অরুণ পরের পাতা উল্‌টিয়ে দেখ্‌ল, লেখা আছে:—"আজ তাকে দেখেছি। যে ঘরে একদিনও আমরা কেউ যাই না সবচেয়ে অন্ধকার আর সেঁতসেঁতে বলে, সেই ঘরের জানালায় সকালে দাঁড়িয়ে দেখি একজন তার ঘরের সব জানালাগুলি খুলে দিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি আঁক্‌ছে। ঘরের চারিদিকে অনেক ছবি ছড়ান, দেয়ালে খানকতক টাঙ্গান, তারি মাঝখানে বসে অরুণ ছবি আঁক্‌ছে। আমার কল্পনাও হার মেনে গেল, এত সুন্দর সে! তার তন্ময় হয়ে ছবি আঁকা, আমিও তন্ময় হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ মনে হল যদি আমায় কেউ এভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে তো কি ভাববে। তখন চলে এলাম। কিন্তু সারাদিন আজ ঘুরে ফিরে চুরি করে ঐ জানালাটির কাছে কতবার দাঁড়িয়েছি, তার ঠিক নেই। সমস্ত বুকের ভিতর এ যে

কিসের ঢেউ উঠ্‌ছে জানি না, এ যেন সম্পূর্ণ নূতন এক অনুভূতি। একটা মানুষকে দেখার এ কি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা।"

এই পর্য্যন্ত পড়ে অরুণ চোখ বুঁজ্‌ল, তার বুকের তটে যেন আর একটি প্রাণের ঢেউ এসে লাগ্‌ল। মিনিট কয়েক চোখ বুঁজে সে শোভাকে ভেবে নিলে, আবার পড়তে আরম্ভ করল:—"বেশ কাজ হয়েছে আমার। দিনের মধ্যে সহস্রবার অরুণকে দেখ্‌তে ছোটা। কবে যে ধরা পড়ে যাব এই ভয়ে মরি। কখনও দেখ্‌তে পাই, কখনও দেখ্‌তে পাই না। সকাল বেলাটি কিন্তু তাকে ছবি আঁক্‌তে দেখা যাবেই। আবার সকাল বেলাই আমার ঘরের কাজ কর্ম্ম থাকে। কাল ত মার কাছে বকুনি খেলাম কাজে অবহেলা হয়েছে বলে। গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরে ছাড়া বিয়ে হবার আশা নেই, তার কি কাজে হেলা চলে? চুপ্ করে শুনলাম, কিন্তু এই চোখের নেশা ঘুচ্‌বে না জানি। আবার ফাঁকতালে কখন জানালার ধারে চলে এলাম। আচ্ছা, অরুণ কেন একবারও এদিকে তাকায় না? ভারি ইচ্ছা করে আমার একবার ঐ চোখের ওপর আমার চোখ রেখে প্রাণ ভরে তার দৃষ্টি-সুধা পান করে নিই। অরুণের চোখ শুধু ছবির ওপর থাকে, নয়ত একেবারে ঘর বাড়ী পেরিয়ে সারা আকাশ ঘুরে আসে। এক আধবার অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে চেয়ে আবার কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে, আমার অস্তিত্বও জান্‌তে পারে না বলে মনে হয়, কিন্তু সেই একপলক চাওয়ার সাম্‌নে আমি সুখে শিউরে উঠি। মনে মনে বলি, 'হে চিরবাঞ্ছিত! চোখের সাম্‌নে একবারটি দাঁড়াও। যে দৃষ্টিতে শরীর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দপ্রবাহ ছুটে যায়, সেই দৃষ্টি আমার চোখে স্থির রেখে অপলক নয়নে চেয়ে থাকো।' তা কি কখনও হবে? আমার সমগ্র প্রাণ চোখে এসে বাসা বেঁধে অরুণকে দেখে, অথচ এ আকুলতা তাকে চঞ্চল করে আমার দিকে ফেরায় না। আশ্চর্য্য!"

শেষের পাতাটিতে সেই দিনকার ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে:—"এইমাত্র আমাদের শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। আমার সঙ্গে অরুণের চোখাচোখি হওয়াতে অরুণও কেন অমন করে চেয়ে রইল? শুধু চাউনিতে কি আছে জানি না। আমি যেন নড়বারও ক্ষমতা হারিয়েছিলাম। নিজের বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ নিজেই শুন্‌তে পাচ্ছিলাম, লজ্জায় শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছিল, তবু প্রাণভরে সেই পাগলকরা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মার ডাক শুনে চমক্ ভেঙ্গে সরে এলাম। অরুণ কি মনে করল কিছু জানি না। তবু আমার প্রাণ সুখে ভরে উঠেছে। যা চেয়েছিলাম তা ত পেয়েছি। এর বাড়া আর কিছু পাবার আশা ত রাখি নি।"

পড়া শেষ হয়ে গেল। অরুণ সারারাত ঘুমোতে পারল না। ছাতে এসে মাদুর বিছিয়ে জেগে পড়ে রইল। তারার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগ্‌ল, এমন করে চেয়েছিল বলেই শোভা তাকে জয় করেছে। অজেয় সে, অন্যের প্রাণ নিয়ে খেলা করেছে, এ অহঙ্কারের জন্য আজ

তার অনুতাপ হল। সে বুঝল নিজেকে না হারালে বুঝি সুখ নেই। তাই শোভার কাছে তার প্রাণের পরাজয় তাকে লজ্জা না দিয়ে আনন্দই দিল।

সকালে উঠেই অরুণ শোভাকে দেখ্‌তে হাঁসপাতালে গেল। ডাক্তারের কাছে শুনল আগুনের ঝাঁঝে শোভার চোখেরই বিশেষ অনিষ্ট হয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে বটে, কিন্তু দৃষ্টি ফিরে দেওয়া যাবে না। অরুণের কাছে হঠাৎ যেন সকালের সোণার আলো কালিমাখা হয়ে গেল। ডাক্তার তার মুখ দেখে কি সান্ত্বনার কথা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, অরুণ না শুনেই, শোভাকেও না দেখে বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন থেকে অরুণ একদিনও হাঁসপাতালে শোভাকে দেখ্‌তে যায় নি। যে দিন শোভা সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরল, সেদিন অরুণদের বাড়ীতেই রইল। তারপর দিন তাদের সবাইর গ্রামে ফিরে যাবার কথা। সন্ধ্যাবেলা অরুণ শোভার ঘরে ঢুকে দেখ্‌ল মায়ের কোলে মাথা রেখে শোভা শুয়ে আছে। শোভার মা অরুণকে দেখেই বল্‌লেন, "বাবা, তোমার দয়ার কথা কখনও ভুল্‌ব না। এই অভাগীকে নিয়ে ফিরে চল্‌লাম। তুমি হয়ত ভুলে যাবে, কিন্তু আমরা তোমায় ভুল্‌তে পারব না।" শোভা অরুণের পায়ের শব্দে উঠে বসেছিল। অরুণ কাছে এসে শোভার মাকে বল্‌ল, "মা, আপনার কাছে আজ আপনার মেয়েটিকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। ওকে না হলে এ জীবনে আমার জীবন-সঙ্গিনী জুট্‌বে না। আমার বাড়ীর লোকেরা খুব গোলমাল করবেন, তবু আমায় এ থেকে টলাতে পারবেন না। শুধু আপনাদের মতের অপেক্ষায় আছি।" এক নিঃশ্বাসে সবটা বলে অরুণ শোভার দিকে চেয়ে রইল। দেখ্‌ল সে কাঁপ্‌ছে। শোভার মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন, "বাবা, শোভার অনেক তপস্যার ফলে তার এই সৌভাগ্য। কিন্তু ভেবে দেখো, দয়ার খাতিরে এত বড় বোঝা তুলে শেষে অনুতাপ করো না।" অরুণ বল্‌ল, "দয়া আমার দিক্ থেকে নয়, আপনারা দয়া করে অনুমতি দিন্।" শোভার মা উঠে এসে অরুণের মাথায় হাত রাখ্‌লেন। আশীর্ব্বাদের কথা মুখ ফুটে বেরুল না, মনেই উচ্চারিত হল। তিনি স্বামীকে সংবাদ দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অরুণ শোভার শীর্ণ হাতখানি ধরে কাছে টেনে বল্‌ল, "শোভা, তুমি আমারই, কেমন? আমাদের শুভদৃষ্টিও ত হয়ে গেছে।" শোভা অসহ্য সুখের ভারে নত হয়ে অরুণের বুকে মাথা রেখে যেন শ্রান্তি দূর করতে চাইল। অরুণ তাকে বুকে চেপে ধরতেই তার দৃষ্টিহীন চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

শ্রীসুনীতি দেবী

বাংলার নবযুগের কথা

তৃতীয় কথা—

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

(১)

রাজা রামমোহন বাংলার এই নবযুগের প্রবর্ত্তক হইলেও তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত হইতে অনেকদিন লাগে। এমন কি তাঁহার গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছিল। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার কতকগুলি উদ্ধার হইয়াছে বটে; কিন্তু রাজার সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজার আদর্শটী বহুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধরিতে পারেন নাই। এখনও পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। রাজা সমসাময়িক সমাজের জড়তা নষ্ট করিবার জন্য একটা বিরোধের সৃষ্টি করেন, ইহা সত্য। এইরূপ বিরোধের ভিতর দিয়াই লোক-চিন্তা ও লোক-চরিত্রকে তমঃ-প্রধান অবস্থা হইতে রজঃ-প্রধান অবস্থায় ঠেলিয়া তুলিতে হয়। যাহা বর্ত্তমান, তাহাকেই সনাতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া, ইহা তামসিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। তামসিক অবস্থায় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কিছুই লোকের অনুভবে বা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। এই তামসিকতাকে দূর করিবার জন্যই রাজা দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্মকে লোকের অনুভবের উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আর এটী করিতে যাইয়া তিনি অনুভব-প্রতিষ্ঠ যে বেদান্ত-বিদ্যা, তাহার সঙ্গে প্রচলিত গতানুগতিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিরোধ দেখাইয়া সমাজে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। এই সংগ্রামে রাজা দুইটী অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, এক শাস্ত্র, অপর যুক্তি; কিন্তু যুক্তি ছাড়িয়া শাস্ত্র, কিম্বা শাস্ত্র ছাড়িয়া যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। ইহার ফলে রাজা যে আদর্শটা প্রচার করেন, তাহাতে দেশে কেবল বিরোধ জাগাইতেই চাহে নাই, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরোধকে নিঃশেষ নিরস্ত করিয়া পূর্ব্ব-পক্ষ ও উত্তর-পক্ষ উভয়কেই একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা সম্যক সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দেশের জনসাধারণের ত কথাই নাই, যাঁহারা রাজার জ্ঞান-ভাণ্ডারের দায়াধিকারের দাবী করিয়া দেশের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত রাজার এই আদর্শটীকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিলেন না। ধরিবার তখন সময়ও আসে নাই। রাজা আপনার অসাধারণ মনীষা-প্রভাবে অনাগত ভবিষ্যতের জটিল সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়া আগে হইতেই তাহার মীমাংসার পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিত দেশের লোকের ছিল না। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সে সকল সমস্যা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হইয়া না উঠিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসার পথও লোকে খুঁজিতে যায় নাই। ইহাও কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।

(২)

রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি এযুগে সত্যভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা লইয়া আধুনিক সভ্য-সমাজের মাঝখানে যাইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; আর কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতবর্ষ যখন বড় ছিল, তখনও সে কূপমণ্ডুক ছিল না। বিশ্বের সঙ্গে তাহার তখন জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল। অন্যান্য জাতিকে তখন সে আপনার যাহা ভাল তাহা দিয়াছে ; আর অপর জাতির নিকট হইতেও যাহা তাহাদের ভাল এবং নিজের প্রয়োজনীয় নিঃসঙ্কোচে তাহা লইয়াছে। বিশ্বের জীবন-ধারা ও জ্ঞান-ধারা হইতে তখন ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যেদিন হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, সেদিন হইতেই ভারতের সভ্যতা এবং সাধনা সঙ্কীর্ণ-খাতে আবদ্ধ হইয়া আপনার শক্তি ও সত্য হারাইতে লাগিল।

ভারতবর্ষকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে সকলের আগে তাহাকে এই বদ্ধ কূপ হইতে বাহির করা আবশ্যক। এই কারণেই রাজা ইংরাজীশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেও আর দুনিয়াকে নিজের দৃষ্টির বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। যেদিন ইংরাজ মোগলের হস্তচ্যুত রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, সেদিন হইতেই ভারতীয় সভ্যতা এবং সাধনার মধ্যযুগের বদ্ধজলের বাঁধ ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষকে এখন আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার স্রোতের মাঝখানে যাইয়া পড়িতেই হইবে। এই বানচালের মুখে ভারতের সর্ব্বস্ব যাহাতে না ভাসিয়া যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে। জলপড়া বা ধূলাপড়া দিয়া এই বন্যাকে আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। যে শক্তি ইহাকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তিকে হস্তামলকবৎ আপনার আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। যাদুমন্ত্রে জড়বিজ্ঞানের শক্তিকে ঠেলিয়া রাখা যায় না। পুরাতন যুগে জীমূতবাহন কহিয়াছিলেন যে শত শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও বস্তুর প্রকৃতি নষ্ট করা যায় না। রাজা রামমোহনও তাহাই কহিলেন। মন্ত্রের দ্বারা যন্ত্রকে ঠেলিয়া রাখা যায় না। শ্রুতি দ্বারা যুক্তিকে কখনই কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। মন্ত্রের একটা স্থান ও অধিকার থাকিতে পারে। সে স্থান মানুষের মনে। সে অধিকার নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। যন্ত্রেরও একটা স্থান এবং অধিকার আছে, তাহা বাহিরে—মনের ভিতরে নহে। সে স্থান ও অধিকার নির্দ্ধারণ করে জড়বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের দ্বারা জড়বিজ্ঞানের কাজ হইবে না। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও মনোবিজ্ঞানের কাজ হইতে পারে না। ইহারা যখন পরস্পরের সত্য অধিকারটা স্বীকার করিয়া লয়, তখনই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সন্ধির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এটী স্বীকার না করিয়া মন্ত্র যদি যন্ত্রকে উড়াইয়া দিতে যায়, পরিণামে সে আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া যন্ত্রকেই বাড়াইয়া

তুলে, নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ শ্রুতি দ্বারা যুক্তিকেও কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না। শ্রুতি বা শাস্ত্র যদি যুক্তির অধিকার অস্বীকার করিয়া তাহাকে পিষিয়া মারিতে বা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার ফলে শাস্ত্রই মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পরিণামে যুক্তির হাতে মারা পড়ে। দুনিয়ার ইতিহাস বারে বারে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। রাজা এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতের মধ্যযুগের মন্ত্রমুগ্ধ ও শাস্ত্রবদ্ধ সাধনা ও শিক্ষাকে নিজের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আধুনিক য়ুরোপের যন্ত্রবহুল এবং যুক্তিপ্রধান সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা সমীচীন সমন্বয়ের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু তখনও য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবটা দেশের লোকে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে নাই। যে শক্তি তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও তাহারা তাহার দুর্দ্ধর্ষতা উপলব্ধি করে নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে যে একটা সন্ধি করা আবশ্যক, ইহাও লোকে বুঝিল না; বুঝিল না বলিয়াই তাহারা রাজার সম্যক দৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহার পথ ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল না। বিরোধটা তখনও পাকিয়া উঠে নাই বলিয়াই দূরদৃষ্টিহীন সমাজ রাজার শিক্ষা-দীক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজা যাহা না দেখিয়াও আসিতেছে ইহা বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজীশিক্ষা-প্রভাবে তাহা যখন উজ্জ্বল হইয়া চক্ষুগোচর হইল, তখন লোকে রাজাকে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বদেশকে ভুলিয়া একেবারেই নূতন বিদেশী শিক্ষা ও সাধনার হাতে আত্মসমর্পন করিতে লাগিলেন।

(৩)

ইংরাজ বণিক-কোম্পানী এদেশের টাকা লুটিতেই আসিয়াছিল, রাজ্য-শাসনের দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিতে আসে নাই। যখন বিধি-চক্রে মোগলের মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল এবং ইংরাজ তাহা হাতের নিকটে পাইয়া মাথায় তুলিয়া লইল, তখনও তাহার বণিক্-বৃত্তি নষ্ট হয় নাই। প্রজার কল্যাণের জন্য কি করা প্রয়োজন এ প্রশ্নটা তাহার মনে জাগে নাই। তবে "চাচা আপনা বাঁচা"— আজি পর্য্যন্ত ইহাই রাষ্ট্রনীতির সার্ব্বজনীন মূলসূত্র হইয়া রহিয়াছে। ভারতের ইংরাজ বণিক্‌রাজও এই সূত্র অবলম্বনেই চলিতে লাগিল। তখনও তাহার রাজগীর বুনিয়াদ পাকা হয় নাই। এই বিশাল জন-সমুদ্রের মাঝখানে কি করিয়া সে আপনার পদ ও প্রাণ বাঁচাইবে, এ ভাবনা তখন তার অন্তরে দিবানিশি জাগিয়াছিল। প্রজা-বিদ্রোহের বিভীষিকা তাহাকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিত। অতএব কি জানি প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইংরাজ প্রথমে কিছুতেই এদেশে ইংরাজী-শিক্ষা প্রচলিত করিতে চাহে নাই। পাদ্রী কেরী যখন কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলায় ভদ্র বাঙ্গালী বালকদিগের জন্য একটা ইংরাজী স্কুল খোলেন, তখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে কেরীকে অল্পদিনের মধ্যেই এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে

হইয়াছিল। পরে যখন ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেরী এবং মার্শম্যান্ এদেশে একটা কলেজ খুলিতে চাহেন, তখনও ইংরাজ বণিক্-রাজের রাজ্যে ইহার স্থান হইল না। কলিকাতার নিকটে শ্রীরামপুরে দিনেমার রাজার জায়গাতে যাইয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীরামপুরের কলেজের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রচলনের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আদিতে কোনও চেষ্টাই করেন নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন। * তাঁহারা হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ও পার্শী মাদ্রাসাই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়া বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত করে, তখনও গভর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। দেশের লোকেরাই কোনও কোনও সদাশয় ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বহুদিন পরেও সরকার এদেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, কিম্বা আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে ব্রতী হইবেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তখন এ বিষয়ে দুইটা মত প্রবল হইয়া উঠে। একদল বলেন, হিন্দু ও মুসলমানকে তাহাদের নিজেদের বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হউক। য়ুরোপের নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির আমদানী করিতে গেলে ইহাদের পুরাতন সংস্কারে আঘাত লাগিয়া দেশে ঘোরতর অশান্তির সূত্রপাত হইতে পারে; সুতরাং সে পথ নিরাপদ নহে। আর একদল কহেন যে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সাধনা প্রচার করাই কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা ও সাধনা ব্যতীত দেশীয় লোকের জ্ঞান উন্নত এবং চিন্তা উদার হইতে পারে না। আর আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া এদেশের লোক যদি ক্রমে আমাদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতেই চাহে, তাহাতেই বা কি আসিয়া যাইবে? আমরা একটা প্রাচীন সভ্য জাতিকে অসহায় ও পতিত অবস্থায় পাইয়া যদি হাত ধরিয়া তুলিয়া পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন করিয়া দিতে পারি, ইহা অপেক্ষা আমাদের গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে? লর্ড মেকলে এই শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দলকে Orientalists কহিত। শেষোক্ত দলের Anglicists নামকরণ হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া এই দুই দলের মধ্যে এদেশের শিক্ষা-নীতি লইয়া বিরোধ চলে। পরিণামে ১৮৩৩ ইংরাজীতে মেকলের দল বা Anglicistsরাই জয়লাভ করেন। তখন হইতে ইংরাজ বণিক্-সরকার সরকারী খরচে ও সরকারের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন তখন বিলাতে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে

* ১৮১৪ সালে কাশীরাম ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গভর্ণমেণ্টকে শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন।—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পৃঃ ৮৫।

তিনি লাট আমহার্ষ্টকে যে শিক্ষানীতির সমর্থন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, নয় বৎসরের বাদানুবাদের পরে সেই নীতিই গৃহীত হইল।

রাজা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বেই কিন্তু তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বণিক্ রাজসরকারের এই ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কলিকাতার দেশনায়কেরা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজেদের সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কলিকাতা সমাজে এই নূতন শিক্ষার ফলে একটা প্রবল ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের বান ডাকিয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রাচীন বেদান্তাদি প্রচার করিয়া প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে যে বিরোধ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে বিরোধটা সত্বরই আর একদিক দিয়া পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরোধটা পাকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা যে সমন্বয়ের পথটা দেখাইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লোকে পাইল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ঢেউ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবারেই স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়া দিল। আর ইহার মূল কারণ ছিল—এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার অতিশয় বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা। ইহাই বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত চিরন্তন কিন্তু সম্প্রতি বিস্মৃত স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে জাগাইয়া কস্তুরী-মৃগকে যেমন নিজের নাভিগন্ধে মাতাইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া থাকে, বাঙ্গালীকেও সেইরূপ নিজের আদর্শের গন্ধেই য়ুরোপের দিকে ছুটাইয়া দিল।

(৪)

মেকলের কথার অমর্য্যাদা না করিয়াও ইংরাজ বণিক-কোম্পানী যে পতিত ভারতবর্ষের উদ্ধার কল্পেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছিল, একথাটা একেবারে বিশ্বাস নাও করা যাইতে পারে। কারণ এই শিক্ষা প্রচলিত না করিলে ইংরাজের পক্ষে এই বিশাল দেশকে এত সহজে শাসন করা কখনই সম্ভব হইত না। ইংরাজ যতদিন কেবল ব্যবসা বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল, ততদিন এই প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। মোগলের রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াও কিছুকাল ধরিয়া ইংরাজ বণিক-কোম্পানী রাজকার্য্য অপেক্ষা নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বিলাতের সাধারণ ইংরাজ-সমাজের চক্ষু ভারতবর্ষের উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। শিক্ষিত ইংরাজেরা তখন ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য স্বল্পবিস্তর ব্যগ্র হইয়া উঠেন। পার্লিয়ামেণ্টে লাট হেষ্টিংস্ অসহায় ভারতবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে ভারতশাসন সম্বন্ধে ইংরাজ শাসক সমাজ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তখন হইতে কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নহে, কিন্তু সুশাসনও

এদেশের নূতন ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। সকল ইংরাজই ভারতবর্ষের টাকা লুঠিতে চাহে নাই। অনেক ইংরাজ সরলভাবেই ভারতবর্ষে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্বদেশের আইনকানুন অনুযায়ী যাহাতে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়, ইহা চাহিয়াছিলেন। ইহাই ক্রমে ভারত-শাসনের আদর্শ হইয়া উঠে। এই আদর্শে রাজ্য শাসন করিতে হইলে দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং পতিত ভারতের উদ্ধার কল্পেই যে ইংরাজ এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করিতে অগ্রসর হয়, একথা আংশিক সত্য হইলেও ষোল আনা সত্য নাও হইতে পারে। তারপর আরও কথা আছে। দূরদর্শী ইংরাজ মনীষীরা ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই বিপুল জনসমুদ্রকে বহুদিন নিজেদের শাসনাধীনে রাখা সম্ভব হইবে না। লাঠির জোরে মাটি জয় হইয়াছে বটে, এখন যদি নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে এদেশের লোকের চিত্তকে না জয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুশক্তি কিছুতেই বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। দেশের লোকে তখন ইংরাজকে ম্লেচ্ছ মনে করিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত। যাহারা কোম্পানীর আফিসে বা আদালতে কিম্বা ইংরাজ সওদাগরদিগের দপ্তরে কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত তাহারা পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে সেই আফিসের পোষাকশুদ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান না করিয়া বাড়ীতে ঢুকিত না। যে প্রজারা রাজাকে এইরূপ 'অস্পৃশ্য' মনে করে তাহারা কখনই বেশীদিন তাহার শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। এ অবস্থায় এদেশে যতদিন না ভদ্রসমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা ও সাধনার বিস্তারের ফলে এমন একদল লোকের সৃষ্টি হইবে যাহারা দেশের নূতন রাজপুরুষদিগের রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সভ্যতা ও সাধনাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বরণ করিয়া লইবে ততদিন এই বিদেশীয় শাসন কিছুতেই বদ্ধমূল হইতে পারিবে না। এই দিক দিয়া বিচার করিয়াও এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ইংরাজের রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মেকলে প্রভৃতি নীতিজ্ঞেরা একথাটা যে ভাল করিয়া বুঝেন নাই, এরূপ কল্পনা করাও কঠিন। বিশেষতঃ ইঁহাদের প্রতিপক্ষীয়েরা যখন রাজ্যরক্ষার জন্যই এদেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইয়া প্রাচীন সংস্কৃত, পার্শী এবং আরবীই শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন এই দিক দিয়া যে কথাটার বিচার হয় নাই, এরূপ অনুমানও করা যায় না। সুতরাং কেবল আমাদের উদ্ধার কল্পেই নহে, কিন্তু নিজেদের রাজ্যে শাসন সংরক্ষণের সুবিধা করিবার জন্যও যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

(৫)

তবে মেকলে প্রভৃতি যে যুগের লোক ছিলেন সে যুগটাই য়ুরোপে এক অভিনব স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। যে আদর্শের ইঙ্গিতে ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হয়,

সেই আদর্শ তখন য়ুরোপের মনীষী সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত ইংরাজেরাও তখন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং বিশ্বমানবতা বা humanityর আহ্বানে অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এদেশে যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ তখন আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই এই আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেকলে যে সরলভাবেই ভারতবর্ষের উদ্ধার কল্পে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একথাও অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। অধিকাংশ সময়েই মানুষ কেবল একটা লক্ষ্য ধরিয়াই কাজ করে না। নানা ভাবের প্রেরণা মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে। স্বার্থ ও পরার্থ অনেক সময়ে উভয়ে এমন জড়াজড়ি করিয়া থাকে যে কোথায় স্বার্থ আর কোথায় পরার্থ, ইহা নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না, সম্ভবই হয় কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। নিজদের স্বার্থসাধন এবং আমাদের কল্যাণবিধান, এই দুই উদ্দেশ্যেই ইংরাজ এদেশে য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রাজপুরুষদিগের অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, এদেশে প্রথমে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তাঁহারা সকলেই ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং বিশ্বমানবতা, ইহাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান শিক্ষক ছিলেন—ডিরোজিও। ডিরোজিও ফরাসী-বিপ্লবের স্বাধীনতা এবং মানবতার ভাবে ভরপুর ছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইংরাজীতে যাহাকে Rationalism এবং Individualism কহে, ফরাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল, তাহারই উপরে ডিরোজিওর মানস-জীবন এবং চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মদ খাইয়া যেমন মানুষ মাতাল হয়, ডিরোজিও সেইরূপ দিবানিশি এ সকল ভাবের ঘোরে যেন মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। যাঁহারা হিন্দু কলেজে তাঁহার নিকটে লেখাপড়া শিখিতে গেলেন, তাঁহারা অল্পকালের মধ্যেই ডিরোজিওর অসাধারণ প্রতিভা এবং উদার মানবতার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের জীবনেরও মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন আদর্শের প্রেরণায় ইঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মের এবং সমাজের সকল বন্ধনকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় ইংরাজীনবীশদিগের প্রথম দলের মধ্যে একটা তীব্র ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল।

(৬)

ডিরোজীও জাতিতে পর্ত্তুগীজ ছিলেন। তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এদেশে আসিয়া এখানেই কোনও বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ডিরোজিও কলিকাতার ইটালী পদ্মপুকুরের নিকট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ডিরোজীও কলিকাতাতেই ধর্ম্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন।

ড্রামণ্ড ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এরূপ শুনা যায় যে ধর্ম্মবিষয়ে আত্মীয়-স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে ড্রামণ্ড চিরদিনের মত তাঁহার জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন-চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছিল।" ড্রামণ্ডের প্রতিভার সংস্পর্শ পাইয়া ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। ডিরোজিও কবি এবং দার্শনিক হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিও ইংরাজী ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ইংরাজী এবং নীতিবিজ্ঞান বা Moral Philosophy পড়াইতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে যুরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজী দার্শনিক চিন্তায় ডেভিড্ হিউমের খুব প্রভাব ছিল। হিউমের দর্শন অতীন্দ্রিয়জ্ঞান এবং সত্যকে অসিদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। হিউমই ইংলণ্ডে আধুনিক দার্শনিক যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রধান গুরু ছিলেন। হিউমের দার্শনিক চিন্তা ডিরোজিওর শিক্ষার আশ্রয়ে তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। ডিরোজিও কেবল কলেজে পড়াইয়াই ছাত্রদিগের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ শেষ করিতেন না। কলেজের বাহিরে তাঁহাদিগকে লইয়া সাহিত্য, দর্শনাদির আলোচনা করিতেন। এই সকল আলোচনার জন্য একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ডিরোজিও এই সভার সভাপতি ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টি এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে উহার অধিবেশনে এক একদিন ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী Col. Benson পরবর্ত্তী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল Col. Beatson, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।"

ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন, তখন হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলেজের আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এই সভার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে—

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume were widely diffused and warmly patronised.........The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the

couses of such a state ; and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people."—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ—পৃঃ ১১০।)

ডিরোজিওর এই সকল শিক্ষার ফলে প্রাচীন সমাজে এবং পরিবারে জ্যেষ্ঠগণের সঙ্গে নব্যযুবকদিগের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে,—"ছেলেরা উপনয়ন কালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমরের ইলিয়ড হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কহেন যে,—"সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহা অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত মস্তক, ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য—'আমরা গরু খাইগো,' 'আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপরে উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত,—এই দেখ, মুসলমানের জল মুখে দিতেছি—এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টীকা মুখে দিত।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকে এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থে এই ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজ-দ্রোহিতার বহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলার ইংরাজীনবীশেরা প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া য়ুরোপের ছাঁচে নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কতটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই দুখানি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৭)

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা Rationalismএর উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরাজনবীশদিগের এই সমাজ-ও-ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহিয়াছিল। এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা তখনও ভাল করিয়া য়ুরোপীয় চিন্তাতেই ফুটিয়া উঠে নাই। আমাদের নব্যশিক্ষিত ইংরাজনবীশেরা যে এই অপূর্ণতা ধরিতে পারেন নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই সত্যের বা বস্তুর একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। তখনও এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হয় নাই। যে পথে ভৃগুবারুণী সম্বাদে বরুণ পুত্র ভৃগু অন্ন-ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত হইতে মনোব্রহ্মে এবং মনোব্রহ্ম সিদ্ধান্ত হইতে বিজ্ঞানব্রহ্মে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সে পথের সন্ধান আমাদের ইংরাজীনবীশেরা জানিতেন না। য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাতে হিউমের

পরে বার্কলে, বার্কলের পরে কাণ্ট, এবং কাণ্টের পরে হেগেল, ও হেগেলের পরে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের অপূর্ণতা দেখিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চিন্তাধারাও য়ুরোপেই তখন ফুটিয়া উঠে নাই, এদেশে আসিয়া পৌঁছিবে কিরূপে? অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের মূলভিত্তি প্রত্যক্ষ। আমাদের প্রাচীনেরাও এই সকল যুক্তিবাদীর মতন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা মানুষের অভিজ্ঞতার সমক্ষে এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় ইন্দ্রিয়রাজ্য বা বিষয় রাজ্য ছাড়াও আর একটা বিশাল অতীন্দ্রিয় রাজ্য বা অধ্যাত্ম রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এই বাহিরের বিষয়জগতে বস্তুর বা সত্যের প্রমাণ। আবার ঐ বিষয়-রাজ্যের অতীতে অথচ ইহার সঙ্গেই একরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অথচ প্রচ্ছন্নরূপে জড়াজড়ি করিয়া যে অতীন্দ্রিয় রাজ্য আছে, সে রাজ্যে বস্তুর বা সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নহে, কতকটা অনুমান বা উপমান – ইংরাজী ন্যায়ের পরিভাষায় যাহাকে Induction কহিতে পারা যায়। কিন্তু এই Induction বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা মাত্রই প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার অকাট্য প্রমাণ দান করিতে পারে না। সে প্রমাণ দেয় অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কিম্বা আমাদের প্রাচীন বেদান্তের পরিভাষায় অপরোধ অনুভূতি। আমাদের প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন যে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন বহির্বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপই সকল-ইন্দ্রিয়-চেষ্টা বিরোধ করিতে পারিলে আত্মা সমাধি নামক অবস্থা লাভ করে। আর সেই সমাধির অবস্থাতে যোগী বা সাধক অতীন্দ্রিয় সত্যের অপরোধ অনুভব লাভ করিতে পারেন। সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বটে। আমাদের প্রাচীন প্রমাণ-শাস্ত্রে শব্দ-প্রমাণের যে উল্লেখ আছে তাহা এই অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা অপরোধ অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণের দ্বারা মানুষের সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা হয় না দেখিয়া, Intuition বা আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় লইয়াছিল। এই Intuition বা আত্মপ্রত্যয়বাদই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদের সাংঘাতিক আঘাত হইতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আস্তিক্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমাদের নূতন ইংরাজীনবীশেরাও কেহ কেহ এই পথেই নাস্তিক্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে মোটের উপরে দুইটা দল গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। একদল প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইয়া নাস্তিক্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইঁহারা ঈশ্বর মানিতেন না, পরকাল মানিতেন না, ধর্ম্মের শাসন স্বীকার করিতেন না, কেবল লোকশ্রেয়ঃ অর্থাৎ জনসাধারণের যাহাতে কল্যাণ হয় এবং যাহা তাহাদের সুখসমৃদ্ধি সাধন করে, ইহাকেই সমাজ-নীতির মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকের সুখসমৃদ্ধি নষ্ট করে, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা দ্বারা ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধি তাহাই ধর্ম্ম, ইহাই ইঁহাদের চরিত্রের বুনীয়াদ হইয়া উঠে। ইঁহারা প্রচলিত এবং প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন

না মানিয়াও মোটের উপরে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। ৺হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে—

"The conduct of the students out of the college was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeed the *college boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy.'"

আর একদল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াও সকল ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইলেন না। ইঁহাদের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি বিদ্যমান ছিল। যুক্তি যাহাই বলুক না কেন, ইঁহাদের মন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, পরলোক নাই, ধর্ম্ম নাই, এসকল কথা কিছুতেই বেদবাক্যরূপে মানিয়া লইতে পারিত না। ইঁহাদের প্রকৃতিনিহিত এই আস্তিক্যবুদ্ধি বাহিরের তর্কযুক্তিকে কাটিতে না পারিলেও ঠেলিয়া রাখিত। ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু অনেকেই অন্তরে অন্তরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ প্রভেদ এই যে খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মতন কঠোর আচারবদ্ধ নহে। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে কিছু কিছু আচারবদ্ধতা দেখা যায় বটে, ক্যাথলিক সঙ্ঘে হিন্দুধর্ম্মের মতন ব্রত উপবাসাদির বিধান আছে। প্রটেস্টেণ্ট খৃষ্টানদিগের মধ্যে এগুলি নাই বলিলেই চলে। আমাদের ইংরাজীনবীশেরা খৃষ্টধর্ম্মের প্রটেষ্টেণ্ট শাখার সঙ্গেই যাহা কিছু পরিচয় লাভ করেন। ক্যাথলিক শাখার সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। আর হইলেও ক্যাথলিক সাধনে প্রটেষ্টেণ্ট সাধনের মতন যুক্তির এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। এ বিষয়ে ক্যাথলিক সমাজ কতকটা আমাদের তদানীন্তন হিন্দুসমাজের মতনই ছিল। যুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের শাসন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে যুক্তির এবং বহুল পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা Individualism এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয়ানেরা আপ্তবাক্য or Revelation স্বীকার করেন বটে। বাইবেলই তাঁহাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক সাধক নিজ নিজ যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা এই আপ্তবাক্যের বা শাস্ত্রবাক্যের অর্থ এবং অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন, এ বিষয়ে অন্য কাহারও অধিকার নাই। ইহাকেই মার্টিন

লুথার Right of Private Judgment নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অধিকার প্রত্যেকের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের একমাত্র বিচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ভাবে প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের—Rationalism এবং Individualismএর—কতকটা স্থান আছে। ভারতের প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা স্থান আছে। গতানুগতিক ধর্ম্মের সাধনে কেহ ইহার সন্ধান লইত না। সুতরাং এসকল কথা তখন লোকে জানিত না এবং বুঝিত না। এইজন্যই আমাদের যে সকল ইংরাজীনবীশেরা এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে অযৌক্তিক এবং মানবের স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে খৃস্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এতটা পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দুসমাজ তাহাতে ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। একদিকে যখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তখন রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে কলিকাতার হিন্দুগণ সম্মিলিত হইয়া এই নূতন ভাব-তরঙ্গের মুখে গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল ছিল। ইঁহারা বিষয়বুদ্ধির প্রেরণায় নূতন ইংরাজ রাজের সরকারে এবং সওদাগরদিগের আফিসে জীবিকা উপার্জ্জনের লোভে নিজেদের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষার স্রোত বন্ধ করিবার সাহস ইঁহাদের হইল না। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দু কলেজের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুতরাং এই নূতন বিদ্রোহের বান তিনি নিজে খাল কাটিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন, ইহা বলা যাইতে পারে। যখন এই বানচালের মুখে তাঁহার ধর্ম্ম এবং সমাজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখনও তিনি ইংরাজী শিক্ষার উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইলেন না। কি করিয়া ছেলেরা ইংরাজীও শিখিবে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার শাস্ত্র-সাহিত্যও অধ্যয়ন করিবে, অথচ ইহার যে অপরিহার্য্য পরিণাম যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, তাহার হাতও এড়াইয়া থাকিবে, এই অসাধ্য সাধনায় হিন্দুসমাজের নেতৃগণ প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা শাস্ত্র ও কিম্বদন্তীর দোহাই দিয়া কিম্বা সমাজ শাসনের ভয় দেখাইয়া নূতন ভাবের ও আদর্শের মদে মাতোয়ারা যুবকের দলের—সমাজ এবং ধর্ম্মদ্রোহিতাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে খৃস্টধর্ম্মের বিভীষিকা জাগিয়া হিন্দুসমাজের বিষম আতঙ্ক উপস্থিত করিল। কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর সুপণ্ডিত ও সদ্বিদ্বান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন প্রকাশ্যভাবে খৃস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, সেদিন কলিকাতার হিন্দুসমাজের

নেতৃগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে কৃষ্ণমোহন যে পথ দেখাইয়াছেন, ইংরাজীনবীশ ভদ্রসন্তানেরা দলে দলে সে পথ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিবে। ভদ্রসমাজের বংশধরেরা যদি এইরূপে খৃষ্টীয়ান হইয়া যায় তবে ক্রমে গোটা দেশটাই খৃষ্টীয়ান হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা ক্রমে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই আসন্ন বিপদে উদ্ধার করিবে কে? ইহা ভাবিয়া ইঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক দায়াধিকারের দাবী করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাতে নবচেতনা সঞ্চার করিয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের উপরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের এই কাহিনী ভগবৎকৃপা লাভ করিলে আগামী বারে বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

হারানো খাতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়
তার সনে যদি তোমার মনের নাহি থাকে পরিচয়
আচরণ তার বিচার করিতে যেওনা যেওনা তবে,
তুমি যাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে,
হয়ত সে রণে তুমি হেরে যেতে, সে তবু হয়েছে জয়ী,
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি।

—তীর্থরেণু

দু'চারজন বন্ধু আসিয়া একটা পুরাতন দাবী দিয়া সেদিন নরেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ওহে রাজা! তুমি এতবড় ফাঁকিবাজ্ হয়ে উঠ্‌লে কেমন করেই বলোতো?"

নরেশ তাদের দাবী বুঝিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকিয়া চাপা বিরক্তিতে মন্দ হাস্যের মধ্যে জবাব দিল, "কেন, চা দিতে বল্‌তে দেরী হয়েছে বুঝি? ওরে হারাধন!—"

নলিনবিহারী নামে নরেশের এটর্ণী বন্ধুটী মুখ বিকৃত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, "এইও! এক্কেবারেই বোকা বোনো না! তত নির্ব্বোধ তুমি তা' ব'লে নও। চায়ের তেষ্টা

আর সরভাজা রাজভোগের ক্ষিধে নিয়েই আমরা রাজদরবারে ভোজের আরজি পেস করাতে আসিনি হে ! যে কথা দিয়েছিলে সেটা রাখ্ছো কবে তাই বলো দেখিনি শুনি ?"

নরেশ যেন একেবারে আসমান হইতে পড়িয়াই দুচোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিয়া উঠিলেন,— "কথা দিয়েছিলুম ; অথচ রাখিনি—এমন তো কিছুই আমার মনে পড়ে না ! "জোচ্চোর", "গাধা" প্রভৃতি অনেক মিষ্টি মিষ্টি বচন তো আমায় শোনালে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে দুটো আইস্ক্রিম্ আর খান দুচ্চার করে ছানার জিলিপি খেয়ে যাও দিকিন, রাণী সাহেবার খাস তৈরি। খাসা হয়েছে।—"

হারাধন হাজির ছিল, বাবুদের জন্য জলখাবাবের ফরমায়েসের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিধনঠাকুর্দ্দা ডাকিয়া বলিলেন, "বিশুকে আমার হুঁকোটা ফিরিয়ে এক ছিলিম দিয়ে যেতে বলে যাস্ বাবা।"

নলিন নরেশের বাক্চাতুর্য্যে কিছুমাত্র ভুলে নাই, বিরক্ত হইয়া বলিল, "সুয়োরাণীর খাস মহল তোমার খাসা রকম বজায় থাক, আমাদের তার ভাগ চাইনে ভাই ! দুয়োর দুয়ারটা এখনও যে অত করে চেপে রেখে কেনই দিয়েছ, সেইটে শুধু আমাদের মতন বোকাদের বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে। এদিকে তো খবর পাচ্ছি যে মধুবাসর সম্পন্ন করা অবধি এই তিন বৎসরে দুঃখিনী দুয়োরাণী একেবারেই চক্ষুঃশূল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখ দর্শনও নাকি আর করা হয় না,—অথচ তাঁকেও দেবে না নরলোকের মুখ দেখতে। এতো তোমার বিষম জুলুম দেখতে পাই ! সে হচ্চে না ; আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে খোসামোদ করচি, একটি দিনের জন্যও যদি অপ্সরীর গলার একটা গানও শোনাতে তাহ'লেও নয় বোঝা যেত যে কথার কিছু ঠিক আছে. আরে চোঃ !"

ননীবাবু নলিনকে চোখ টিপিয়া নিজেই তার হইয়া দরবার করিতে আসিল,—"আঃ থামো না নলিন ! অত ব্যস্ত কেন ? আমার ছাত্রীর গান শোনবার জন্যে তুমি অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়েছ বটে ; তা সুবিধে হলেই রাজা তোমায় কি আর না শোনাবেন ? সত্যি রাজা ! অত করে যে সুষমাকে আমরা শেখালুম, তা সে যদি এমন করে সব ছেড়েই দেয়, তাহ'লে অনর্থকই উভয়তঃ এতটা পরিশ্রম করে কি ফলটা হলো বল তো ? আগেকার মতন কখন-সখন,—এই আমাদের ক'জনার মধ্যেই সে যদি একটু আধটু গাইতে টাইতে নাই পেলে, তাহলে তারই বা ভাল লাগে কি করে ? এই তিনটে বছর তো আমি বা ঠাকুরর্দ্দা পর্য্যন্ত তার ওখানে গেলে ঢুকতে পাইনে। তা ভাই, ছেলে মানুষের প্রতি এতটা কড়াক্কড়ি কি করাই উচিত ?"

ঠাকুর্দ্দা হুঁকায় মুখ দিয়া টানিতে টানিতে একবারটী মুখ তুলিয়া ছোট্ট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে মানুষের পক্ষে বাঁধনটা বড্ড বেশী কড়া হয়ে পড়েছে বই কি। অল্প একটু ঢিলে দিলে হয় ভাল—অ—ল্প একটু।"

নরেশ এবার তাহার ব্যথিত বিশাল চক্ষু উত্তোলনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সহচরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিয়া উঠিলেন :—"আপনিও যোগ দিলেন ?—

তাহার কণ্ঠে অবিচারিতের সুদৃঢ় অভিমান ব্যক্ত হইল।

হরিধন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া গুন্ গুন্ করিয়া বলিলেন,—"না দাদা ভাই ! তা' আমি বলিনি, সুষমা যে কত ভাল মেয়ে সে আমি জানি বই কি ! তবে কিনা,—তবে কিনা এতটা বিদ্যে শিখেছে ;—এই তোমারই বন্ধুবান্ধবের কাছে তোমারই সাক্ষাতে বসে দুটো গেয়ে শোনালে দোষটা কি ? সেই কথাই আমি বলেছি ভাই ! ওরা যে আমায় শুদ্ধ খেয়ে ফেলে। বলে তুমি তার ওস্তাদ্, তোমার কি তার উপর কোনই দাবী দাওয়া নেই ? তা' আমি আর কি বলবো দাদু ! তাই—"

নরেশ বন্ধুদের দিকে সোজা চাহিয়া জবাব দিল,—"আপনি সাফ বলবেন যে তা' আপনার নেই,—তা' হ'লে আপনাকে আর কেউ জ্বালাবে না।"

শুনিয়া তবুও নলিন মুখরভাবে কহিয়া উঠিল,—"'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমজালে,'—তা' হ'লে তাকে বিদায় দিলেই পারো। আমাদের ঘরে তো আর নূতনের আমদানী হয়নি।"

নরেশের দুই চোখ রাঙ্গা হইয়া তার কপালের শিরা সাপের মত ফুলিয়া উঠিল। তার সমস্ত শরীরেই যেন একটা প্রবল রকমের টান পড়িয়া তাহার দুই হাতের মুঠা কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল ;—কিন্তু তার পরও যখন সে অচল অটল হইয়া নিজের আসনেই বসিয়া রহিল, তখন দেখা গেল, মনের মধ্যের একটা অদম্য উত্তেজনার স্রোতকে সংহত করিয়া রাখিতে, তাহাকে তার সঘনে কম্পিত বিবর্ণ অধরকে দাঁত দিয়া চাপিতে হইয়াছে।

বন্ধুবরেরা পরস্পরে দৃষ্টির ইঙ্গিতে পরস্পরকে নিজেদের হতাশার খরবটা দিয়া চুকিল ; কিন্তু একান্ত লোভাতুর নলিনবিহারীর এততেও মন মানিল না, সে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিয়া ফেলিল—"তাহ'লে আমাদের গান শোনানোর আশা যে দিয়ে আসছিলে সেটা শুধু ছেলে ভুলোনর মতন সম্পূর্ণ—"

নরেশ ইহার পাদ পূরণ করিলেন—"অলীক।"

"তা হ'লে আশা পূর্ণ হবে না ?"

নরেশ চোখের দৃষ্টি তার সাম্‌নাসাম্‌নি সোজাদিকে ঠিক্ রাখিয়া শান্তভাবে উত্তর করিল—"না"

"গোড়া থেকে বল্লেই হতো।"

"বলেছিলুম অনেকবার, তোমরা সেকথা শোন কই ?"

"তুমি বলেছিলে,—সে আমাদের সাম্‌নে গাইবে না। কিন্তু ডাক্তার, ননী—এরা বল্লে যে, তুমি হুকুম কল্লেই সে গাইতে পথ পাবে না। সে তোমায় যমের মতন ভয় করে।"

"আমি বল্‌বো না।"

"এ সোজা কথা।"

বন্ধুরা বিদায় লইবার পূর্ব্বে আর একটা খোঁচা দিয়া গেল।

"ওহে রাজা! তোমার সেই জাম্বুবান মন্ত্রীটী গেল কোথায়? শুন্‌ছিলুম সে নাকি তোমার বাড়ীতেই রয়েছে।"

নরেশ কহিলেন,—"আছে বই কি; তাকে যে আমি চাকরী দিয়ে রেখেছি। খাসা ছেলে সে!"

সব ক'জনেরই চোখে মুখে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি উথলিয়া উঠিল।

"কোন্ কাজে বাহাল হলেন, বাছাধন?"

নরেশ ভর্ৎসনার ভাবে চোক ফিরাইয়া অথচ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আমার স্ত্রীর মাষ্টার করে দিচ্ছি যে তাকে।"

"তাহ'লে তো কায়েমী বন্দোবস্তই হয়েছে! কিন্তু দেখ' ভাই! ছেলে মানুষ যেন অন্ধকারে ও শ্রীমূর্ত্তি দেখে আৎকে না ওঠেন।"

বন্ধুরা বিদায় হইলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মন লইয়া নরেশ স্ত্রীর খোঁজে উপরে উঠিলেন। তাহাদের বিদ্বিষ্ট ও বিদ্রূপবাক্যই তাঁহার উভয় সঙ্কল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিল।

পরিমল তখন চুল-বাঁধুনীর কাছে পরিপাটী সিঁথিপাটী কাটিয়া কেশ রচনা করাইতেছিল। আশে পাশে আয়না, চিরুণী, গন্ধ তৈল, ভিজা গামছা, আরও কত কি ছড়ান। পিছনে বসিয়া সোণার তাগা পরা, হাতখালি, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা আন্নাকালী সাতগুছির চ্যাটা বিনাইতে বিনাইতে বাগবাজারের রায়েদের বাড়ীর বৌ-ঝিয়েদের সৌখীনত্বের শত শত উদাহরণ জমা করিয়া দিতেছিল। পরিমল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রশ্ন করিতেছিল; যেমন,—হ্যাঁগা, তাদের বৌরা বিকেল বেলায় বারমাসই বেনারসী বোম্বাই সাড়ী এই সব পরে থাকে? কোন দিনই বাদ দেয় না?"

আন্নাকালী বলিল, "না ভাই, তারা ওসব রোজই পরে। তা' পরবে না কেন বলো, পয়সা তো আর তাদের কম নেই। লোকদের যেমন আটপৌরে কলের সাড়ী কেনা হয়; তেমনি তাদের যে গাদা করে করে ওই সবই কেনা হয়ে থাকে ভাই! তা' তুমিও কেন পরো না বৌদি! তোমারও তো রাজার ঐশ্বর্য্য, কিসেরই বা অভাবটা?"

পরিমলের কাঁচা মনে এই সকল অনাস্বাদিত সুখের প্রবাহ প্রলোভনের জাল বিস্তার করিতেছিল। তথাপি সে ঈষৎ বিজড়িতভাবে কহিল, "আমার কি ওসব পরে থাকলে মানায়? লোকে হয় তো হাসবে, বল্‌বে 'কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোবার সাধ!'"

প্রসাধনকারিণী অবাক্ হইবার অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, হাসবে না, বলে ইয়ে করবে! কেন? তুমি কি সেওড়া গাছের পেত্নী নাকি যে তোমার কিচ্ছুই মানায় না? রংটাই

তোমার যা শাম্‌লা। মুখের কাট টাট্‌ কেমন দিব্যি! চুলটী পিট ঝাঁপা, মুখখানিও তো তোমার খাসা দেখি ভাই! তা' ভাই, বলবোই বা কি! পয়সা হলেই তো আর রূপ কিনে আনা যায় না। বড় বড় লোকের ঘরে কটাই বা সুন্দর আছে? যত সব দেখবে সবার অঙ্গেই প্রায় ধার করা রূপ,—সাবানে-পাউডারে, বিলিতি-রং, খড়ির গুঁড়ো, সুর্‌মা, ভুরু আঁকবার পেন্‌সিলের টানে—আর হীরে মতি জরি সিলিক, তার উপরে ইলেকট্রিকের আলো আছে। তুমিও ভাই দেখ না, আমার হাতে যখন পড়েছ, দু'মাসের মধ্যে গৌরবর্ণ না করে কি ছাড়বো তোমায়! ওই আপ্‌টানটী ভাই! কিন্তু দু'বেলা ভাল করে লাগানো চাই। তোমার ও সাবান ফাবানের শুধু কর্ম্ম নয়—"

অন্নদা দাসী আসিয়া খবর দিল, রাজাবাবু শীগ্‌গির করে একবার আপনারে ডাক্‌ছেন।—

দুই দিকে দুইটা বিনুনী ঝুলাইয়া অসমাপ্ত বেশ-ভূষায় পরিমল স্বামিসন্দর্শনে ছুটিল। মন অবশ্য এই অ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখা দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিল বইকি। আর একটু পরে আসিলেই যে বেশ হইত!

নরেশ বেশী কিছু ভূমিকা না করিয়াই সোজা কথায় বলিয়া গেলেন, "দেখ পরি! মিসেস্‌ বসুর কাছে পড়া শোনা তোমার তেমন তো কিছুই এগুচ্ছে না, তাই ভাব্‌ছি তাঁর বদলে যদি একজন মাষ্টার ঠিক করা যায় তো কেমন হয়?"

পরিমল তার বিনুনী শুদ্ধ মাথাটী সবেগে নাড়া দিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "একটুও ভাল হয় না। কেন, মিসেস্‌ বসু তোমার কি কর্‌লেন শুনি?"

নরেশ হাসিয়া কহিলেন,—"ভয়ে কবো না নির্ভয়ে?"

"তা নির্ভয়েই বল্‌তে পারো।"

"তিনি আমার পাড়াগাঁয়ের নিরাড়ম্বর সাদাসিদে পরিমলকে সহরের 'ডানা কাটা' পরীদের পাশে দাঁড় করাবার বন্দোবস্তে আছেন,—এভিন্ন আর কিছুই নয়।"

পরিমল বেণী দুলাইয়া বাঁকা চোখে অভিমানের বাণ হানিল,—"ডানাকাটা পরী আমি যদি হতে পারতুম, তাহ'লে কিনা ওই সব খোঁটা আমায় দিতে পারতে? কি করেছি বাপু? ভাল ভাল সাড়ী, জ্যাকেট গহনাপত্র আমায় কিনে দাও কেন? না দিলে তো আর আমি পর্‌তুম না।"

নরেশ তার নাকটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল,—"আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করলেই পারো। যাক্‌ ওসব কথা নয়।—তুমি জানো লেখাপড়া শেখাটা আমার পছন্দ। শুধু বিলিতি বিবিদের বেশভূষাকেই অনুকরণ করলে চল্‌বে নাতো; তাদের সদ্‌গুণগুলিও নিতে হবে। তা' ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিনকালে মূর্খ থাক্‌তেন না। বই পড়া কম থাক্‌লেও, মৌখিকও দৃষ্টান্তের শিক্ষা অপর্য্যাপ্তই ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সবই ত্যাগ করচো, শিখে

নিচ্চো শুধু বিলিতি বিলাস সুখ টুকুই। তা করোনা, বড় আশা করে তোমায় নিয়েছি যে আমার সন্তানেরা যেন নিখুঁত মা পায়, তাদের তা দিও, পরি!"

পরিমল মুখটা খুবই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

নরেশ আবার বলিলেন,—"যাহোক্, আমি যা বল্‌তে এসেছি সেটা শুনে নাও; নিরঞ্জন তো কাজের জন্য বড় ব্যস্ত করচে। তারই কাছে যদি তুমি খানিকটা করে পড়ো মন্দ হয় না। ভারি ভদ্রলোক। লেখা পড়াও বোধ হয় জানে এক রকম।—"

পরিমল ঘোরতর অপছন্দের সঙ্গে প্রবল বেগে আপত্তি তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাধা দিল। "ওই মুখ পোড়াটার কাছে আমায় পড়তে হবে! কক্ষোনো না, কক্ষোনো না।—ওর কাছে আমি কিছুতেই পড়বো না। মাগো! ওটা বাঁদর কি মানুষ তারই যে ঠিক নেই।"

একটা প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাস নরেশের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া দিয়া বহিয়া গেল। আরক্ত মুখে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"পরি, ওকথা মুখ দিয়ে বল্‌তে তোমার লজ্জা হলো না? কেমন করে বল্‌লে তুমি? এই তোমার 'পরে আমার ভবিষ্য বংশের জন্যে আমার উচ্চ আশা পোষণ কর্‌তে হয়েছে! যাকে আজ অত ঘৃণা দেখালে, কেমন করে জান্‌লে যে সেই লোক একদিন খুবই সুপুরুষ ছিল না? তোমাদের মতন রূপযৌবনগর্ব্বিতা সুন্দরীদের কারুকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েই যে ওর ওদশা হয় নি, তাই কি তুমি জোর করে কিছু বল্‌তে পার? ওরই কাছে তোমায় পড়'তে হবে।—কাঁদ্‌ছো, কান্নায় শুধু অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।......"

বন্ধুদের ব্যবহারে পূর্ব্বাবধিই যে বিরক্তি মনের মধ্যে এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় সংঘর্ষে তাহা বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়া, অসন্তোষের কালিমাচ্ছন্ন ললাট ও গম্ভীর মুখ লইয়া নরেশচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখনও এখনও মন সে নামে শিহরে কেন?

—অশ্রুমতী

সেই নকল করা কাগজ ক'খানি হাতে করিয়া নিরঞ্জন যখন নরেশচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁহার পাঠাগারের দ্বার দেশ হইতে গৃহোদ্যানের সবুজ ঘাসওয়ালা জমির ধার পর্য্যন্ত পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহাকে যেন কোন নূতন মানুষ বলিয়াই ভ্রম হইতে পারিত। বাহিরের চেহারা অবশ্য বদলাইয়া যাইবার কোনই উপায় ছিল না, মুখের একটা দিক গভীর ক্ষত চিহ্নে প্রায়

গহ্বরের মতই গভীর হইয়া গিয়াছে, সেদিকের রংটাও যেন কালির মত কালো, বাকী সবটুকুও বসন্ত ক্ষতের হস্তে এমনই নির্ম্মমভাবে অত্যাচারিত, যে সেখানে নাক চোখ প্রভৃতি আর যে কিছু আছে, তাও ঠাহর করিয়া বুঝিতে হয়।—বদলাইয়া গিয়াছিল তাহার ভিতরটা। প্রসন্ন স্মিতহাস্যে সমস্ত মুখখানা তাহার যেন বৈশাখী ঝড়ের শেষে চাঁদের আলোর রেখাটুকুর মতই স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। মূর্চ্ছাতুর অন্তরের সমুদয় নিদ্রিত বৃত্তিগুলি সহসা যেন কার যাদুযষ্ঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত আনন্দে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, "তবে তো আমরা মরি নাই রে, মরি নাই!"

নরেশ ঘোর অসন্তুষ্টমনে নীচে নামিয়া আসিতেই নিরঞ্জনের হাতের বাণ্ডিলটার উপর নজর পড়িয়া গেল।—

"কি, পেরে উঠলে না বোধ হয়? সেতো আমি তোমায় গোড়াগুড়িই বলে দিয়েছি"——বলিতে বলিতেই তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। মনটা তাঁহার প্রথম দফায় বন্ধুবর্গ ও দ্বিতীয় দফে স্ত্রীর উপর বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই উভয় মনোবাদের প্রধানতম ও মূলাভূত নিরঞ্জনকেও বেশ মধুর মনে হইল না।

কিন্তু নিরঞ্জন বেচারা সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া, সে নিজের মনের গভীর আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া একমুখ হাসির সহিত কথা কহিয়া উঠিল; বলিল—"পারবো না কেন? আপনার লেখা তা'বলে অতদূর মন্দ নয়।" এই বলিয়া সে অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা কয়েকখানি কোণগাঁথা কাগজ নরেশচন্দ্রের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সেই লেখাটার উপর নজর পড়িতেই নরেশচন্দ্র যেন আকস্মিক দণ্ডাহতের মতন চমকাইয়া উঠিলেন। এ লেখা!—একি তাঁহার পরিচিত?—বড় পরিচিত নয় কি? দুই মুহূর্ত্তেরও অধিককাল স্তব্ধ বিস্মিত দুই নেত্র স্থির করিয়া তিনি সেই কাগজগুলার উপর চাহিয়া রহিলেন। এ লেখা কা'র? কোন পুরাতন দিনের সুখ-স্মৃতি জালে জড়িত হইয়া এর প্রত্যেকটী অক্ষরের ছবি তাঁহার মনোদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু এ যাহার প্রতিবিম্ব, তার আসল রূপটুকু কোথায়? কা'র হস্তাক্ষর এ? এত পরিচিত, এত আপনার বলিয়া যাহাকে দেখিয়া চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ জলধিবৎ অন্তর তাঁহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে সে কা'র হাতের লেখা?—কিছুই স্মরণে আসিল না।

মুখ তুলিতেই একটি সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল। নরেশের দৃষ্টি গম্ভীর এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কই, না, এ মুখ, এ যে তাঁহার চিরদিনেরই অচেনা। অন্তরের কোণে কানাচে খুঁজিয়া কোথাও তো এর ছায়াটুকুও ভাসিয়া থাকিতে দেখা গেল না! তবে এই হাতেরই লেখা এমন পরিচিত সন্দেহ হয় কিসে? শুধুই এটা অমূলক সংশয়ই নয় কি? না এর ভিত্তিমূল কোথাও কোন গভীর গহ্বরে নিহিত আছে? কিছুক্ষণ চিন্তাকুল অস্বস্তচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে হালছাড়াভাবে নরেশচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-দৃষ্টির আঘাতে বিপন্নপ্রায় নিরঞ্জনের

মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার তাহারই হস্তাক্ষরযুক্ত কাগজখানা দেখিলেন। তারপর হঠাৎ অসাধ্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহজভাব অবলম্বন করিয়াই সপ্রশংস ও সস্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন, "বাঃ! বাঃ! ভারি সুন্দর তো হে, তোমার হাতের লেখাটী! আমার সেই কাগের ছানা বকের ছানাগুলি যেন মন্ত্রপূত হয়ে নূতন জন্মলাভ করেছে দেখছি যে!"

নিরঞ্জন সপ্রীত-সলজ্জহাস্যে দৃষ্টি নামাইয়া কুণ্ঠিত-বিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কি কপি করবার আছে?"

নরেশ তাহার আগ্রহে অকস্মাৎ অত্যধিক উৎসাহিত হইয়াই উঠিলেন,—"কপি করবার সাধ যদি তোমার এতেও না মিটে থাকে নিরঞ্জন, তাহ'লে ভাই তোমার কাছে কি কৃতজ্ঞই যে হয়ে থাকবে ঐ "কর্ণধার" প্রেসের কম্পোজিটারের দল, সে আর তোমায় কি বলবো! আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও না হয়ে উপায়ই নেই। যেহেতু ওদের কাছে গাল খেতে খেতে আমি দিনের মধ্যে কতবারই যে বিষম লেগে মরি। তার ওপরেও আবার আমায় দেখতে পেলেই ম্যানেজার মশাই ভীষণ তাড়া করে আসেন। প্রুফ দেখা,—সেও একটা মহামারী ব্যাপার; নিজের লেখা,—সে কি ছাই নিজেই বুঝতে পারি? সাধ করে কি আর এর আর এক রকমের ভয় ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে রবিবাবু বলেছেন,—

"অনেক লেখার অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করবো মোচন,
আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।"

কিন্তু সে তবুও বরং পদে আছে, নিজের লেখার প্রুফ তার চেয়েও যে ঢের বেশী শক্ত, সে হয়ত তাঁদের জানা নেই।"—বলিয়াই নরেশচন্দ্র হো হো করিয়া প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া ফেলিলেন;

নিরঞ্জন বলিল "তা'বলে আপনার হস্তাক্ষর অত কদর্য্য নয়; যাই হোক্ যখনই দরকার হবে আমাকে আপনার লেখা দেবেন; 'ফেয়ার' করে দেবো—"

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "নিরঞ্জন! তুমি ইংরেজীও বেশ জানো, না? ওকি চুপ করে থাকলে কেন? বলোনা ভাই, ক্ষতি কি তাতে? আমি দেখেছি সে দিন তুমি লাইব্রেরী ঘরে বসে একটা কালো চামড়াবাঁধা বই পড়ছিলে, সে বইটা হয় ডিকেন্সের কোন নভেল, কিম্বা বায়রণের কিছু।"

নিরঞ্জন তাহার নত মুখখানা চকিতে তুলিয়া চাহিল। তাহার সে মুখে যেন রক্তের চিহ্ন ছিল না। ম্লান ও শুভ্র অধর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত ব্যথিত বেদনায় আর্ত্তচোখে চাহিয়া থাকিয়া পরিশেষে সে যেন অস্ফুট বিলাপের ভাষায় কহিয়া উঠিল,—"কি জানি, কেন আবার ওই সব জন্মান্তরের স্মৃতিগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে! মনে করেছিলুম, সবই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু ভয় করচে তা বোধ হয় যায়নি—যায়নি—উঃ!—"

বলিয়াই সে এমন করিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিয়া পাশের দেওয়ালে দেহের ভর রাখিল, যে নরেশের বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে আর কিছুই বাকি থাকিল না যে, পূর্ব্বস্মৃতির মত জ্বালাময় এ লোকটীর কাছে তার সেই মুমূর্ষু নিঃসহায় অবস্থাটাও নয়। এইটেকেই সে যেন সব চেয়ে এড়াইয়া চলিতে চাহে বলিয়াই নিজেকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল সম্বন্ধ হইতে উপড়াইয়া লইয়া একেবারে রাস্তার ড্রেনের ধারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! উঃ, না জানি কি সে ভীষণ অতীত স্মৃতি, যার এমন দহনশীলতা!

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

জয়ার প্রতি উমা*

কৃত্তিপট যে এত মনোরম
আগে তা' বুঝিনি সই,
ফণী ফণিনীর ফোঁস ফোঁসানিতে
আর শঙ্কিত নই।
খুলে'নে লো জয়া গজমতি মালা
খুলে'নে কনক মাণিকের বালা
সাজেনা আমায়, অক্ষ বলয়
পন্নগহার বই!

বিনোদ কবরী বিনাস্ নে সই,
চাই না চিকন ঘটা—
তৈল বিন্দু দিস্‌নাক শিরে
রুখু চুলে হোক জটা,
আল্‌তা কাজল রুচেনাক আর
চাহিনা উশীর চন্দন সার।
দে'লো দে মাথায়ে শ্মশান ভস্ম
মুঠো মুঠো এনে ঐ।

ধুতুরা ফুলের অবতংসটি
রচে' দে আমার কানে
মণ্ডিত কর কটিতট মহা-
শঙ্খ-মেখলা দানে।
বৃষভ-ককুদে উপাধান করি
যাপিব লো সই সুখশর্ব্বরী।
করোটি মুণ্ডে প্রেত তাণ্ডবে
আর চণ্ডিমা কই?

প্রভুর ভূষণে ভীষণ বলিয়া
সবে করে পরিহার,
আছে কিবা শিব- সীমন্তিনীর
তা' হতে কান্ত আর?
প্রেম করিয়াছে বড় সুমধুর
সব রুদ্রতা পরাণ বঁধুর,
প্রিয়ের যা প্রিয় বহি' দেহে তাই
আজিকে ধন্য হই॥

শ্রীকালিদাস রায়

* ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শিল্পিরাজ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিবসীমন্তিনী"—চিত্রদর্শনে।

স্বাগতম্

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(থিয়েটারী ছন্দ)

১

প্রথম অঙ্ক—উঠলো পট।
নদীর তীর,—কক্ষে ঘট
সুন্দরী, ন্যায় সে জল।
হুহুঙ্কার—ঐ মোগল!
"ওরে পিশাচ"—ধর-পাকড়্!
নায়ক ধায়,—"মার্ চাপড়,
ভাগ্ ডাকাত!"—(হাততালি,
ভীষণ গোল, ঘোর গালি!)
নায়িকা চায়, মূর্চ্ছা যায়,
জল চোখে—বীর লুকায়!

২

উঠলো পট—অঙ্ক আর।
—কৈ? সে কৈ? কৈ আমার?—
গান করুণ, মন অবশ,
চোখ সজল, মুখ বিরস—
প্রাণ পাগল, ঘর শ্মশান—
জোর প্রবোধ,—কোরাস্ গান্!
বন-পথে ঐ দেখি—
ঐ লুকায়—হায় সখি!
পতন মূর্চ্ছা,—উন্মাদী—
হায় বিধি,—আজ বাদী!

৩

তিনের অঙ্ক জম্‌জমাট
মোগলদল সাজলো ঠাট্!
খোঁজ্ রে খোঁজ্, চাই যে শোধ—
ফাঁড়্ পাহাড়, দুর্গ রোধ্,
ভাঙ্গ্ ফটক,—লুট-তরাজ,
হান্ কামান্, দিল-দরাজ!
তাগ্ রে তীর, কাট্ রে ট্রেঞ্চ,—
—হই মোগল, নই বা ফ্রেঞ্চ,
তাই বা কি! জম্ নাটক—
ক্রুদ্ধ যুদ্ধে নাই আটক!

৪

চারের অঙ্ক। উঠ্‌লো 'শিন্'—
রাজ-সভায় নাচ ঝিনিন্!
গান চলে, প্রাণ মাতায়,—
দূত-প্রবেশ, দিল্ তাতায়!
সাজ্ রে সাজ্—নাচ থামে।—
ঝন্-ঝনন্, ডান-বামে!
ঘোড়-সওয়ার, কুচ কাওয়াজ—
'রাজার জয়'—ঘোর আওয়াজ!

৫

গেল, গেল,—না, না, জিৎ সে ঠিক!
ভীষণ যুদ্ধ, অন্ধ দিক!
ঝন্ ঝনন্, ঝন্ ঝনন্—
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে সৈন্যগণ।
খাড়া অসি হান্, মোগল, হান্—
ভূমে লুটায় বক্ষে বাণ!
রাজা অবাক্! কে? মারিল কে?
আসে উন্মাদী, ধনু-হাতে।
"তুমি!"…"রাজা তুমি!"—আলিঙ্গন—
নায়ক-নায়িকা-মধু-মিলন!

* * * *

ওল্টায় পট,—দুরুম্ দুম্!
আলোয়-আলোয় বাস্ কি ধূম!
ফুলের আসনে রাজা ও রাণী—
নাচের-গানের কি কারদানি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লীর প্রাচীন কীর্ত্তি

('কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে)

প্রাচীন হস্তিনাপুর (দুর্গ)
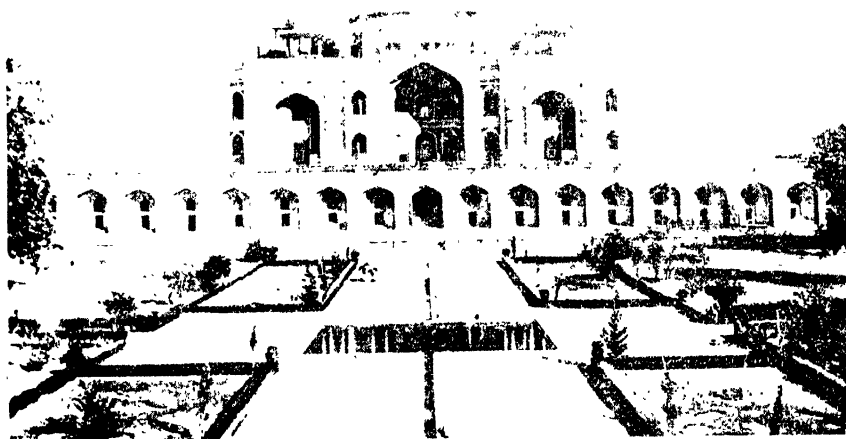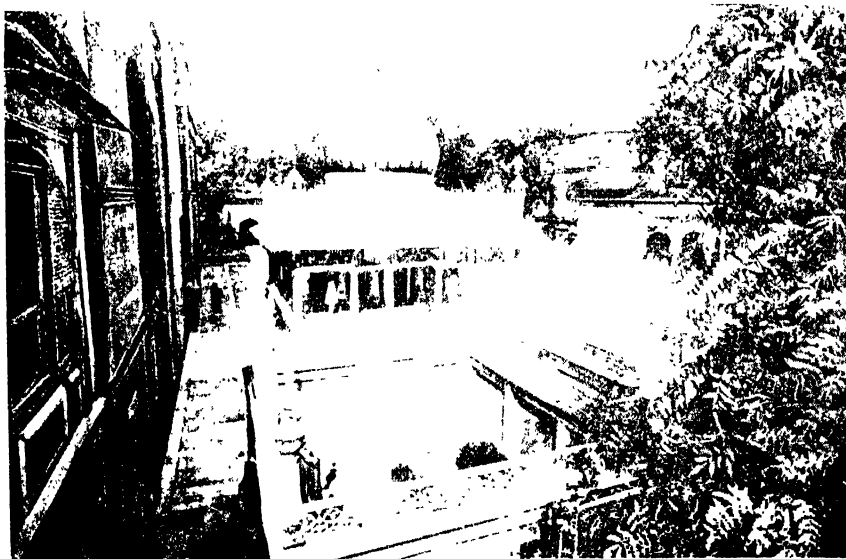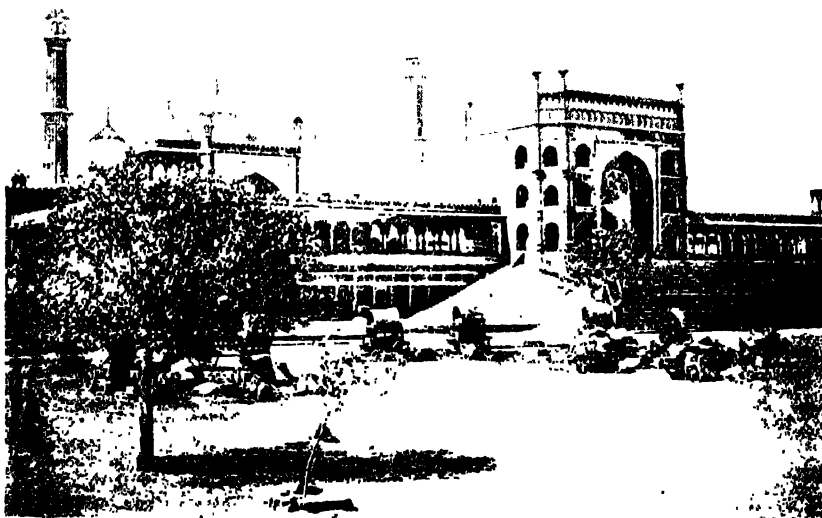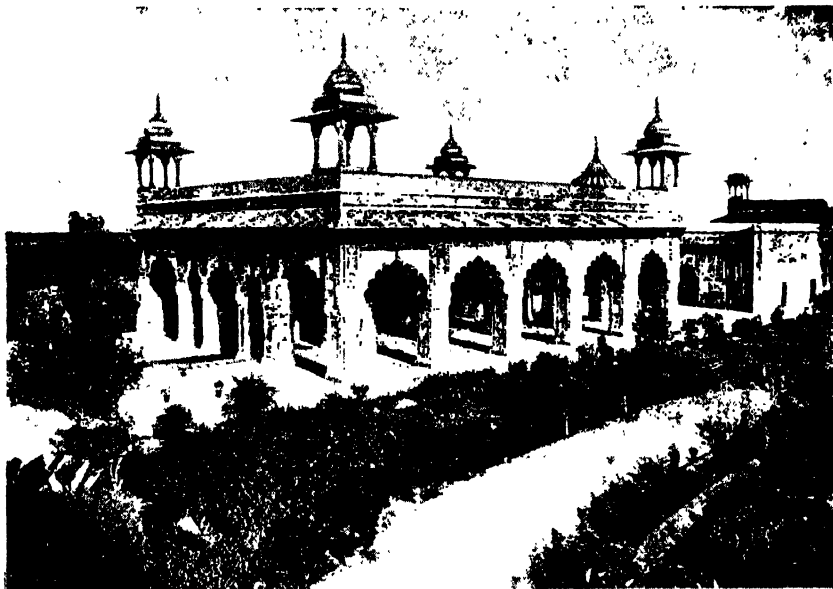
হুমায়ুনের কবর

জাহানারার সমাধি

জুমা মসজিদ

সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তম্ভ

দেওয়ানী খাস

দেওয়ানী খাসের অন্তর্দৃশ্য

দেওয়ানী আম

হামাম

ময়ূরসিংহাসন গৃহ

কুতব মিনার

জয়সিংহের মানমন্দির
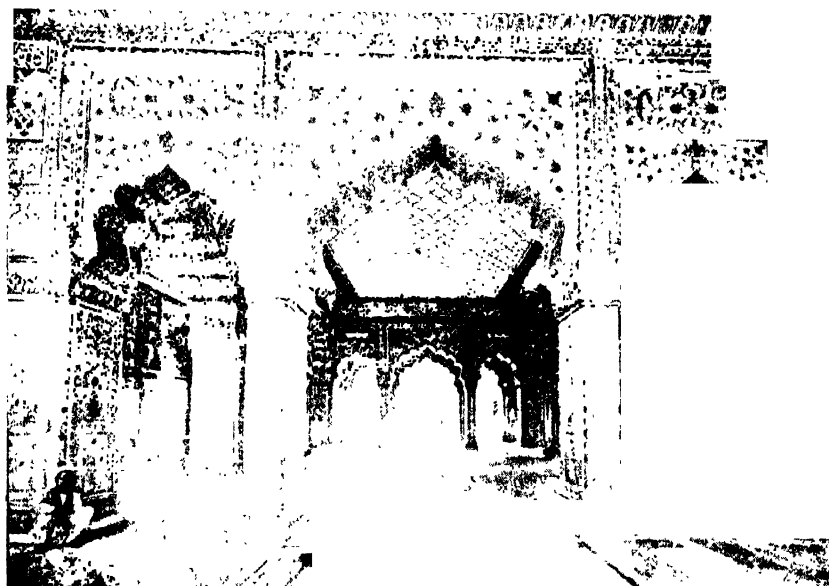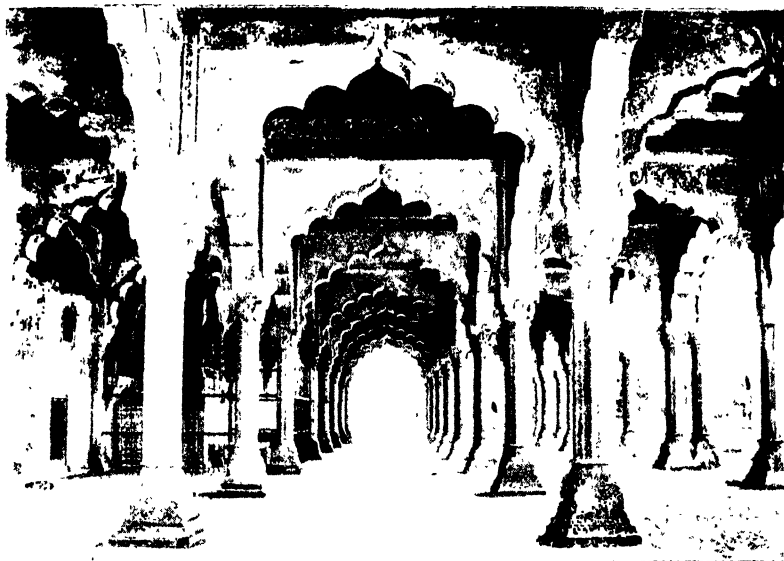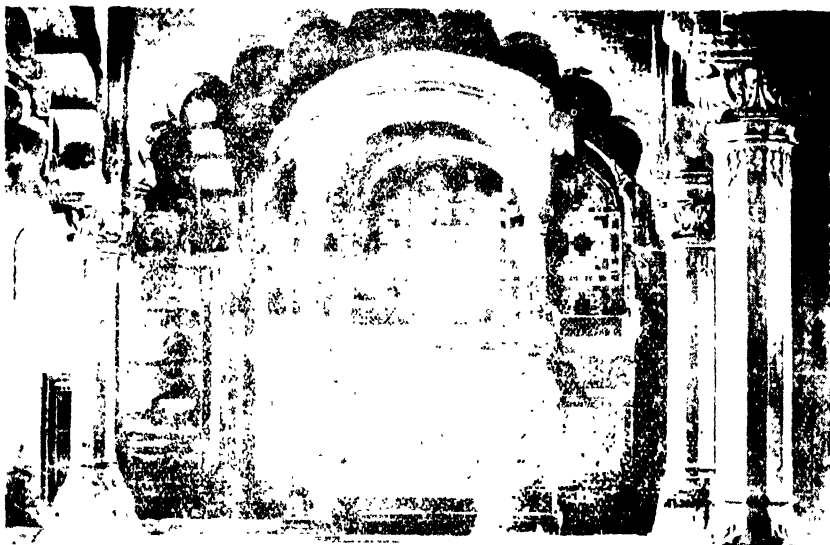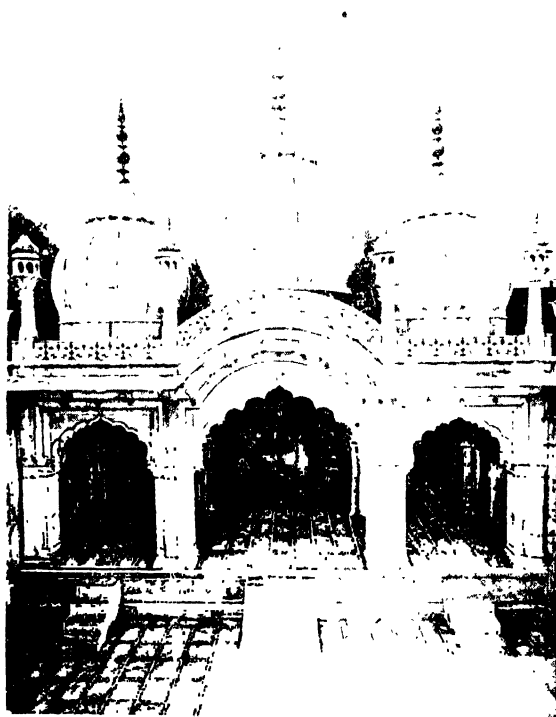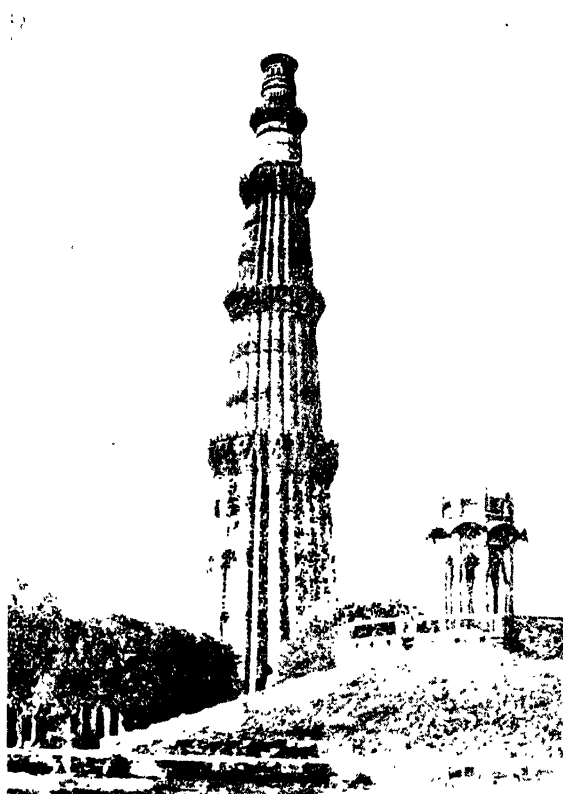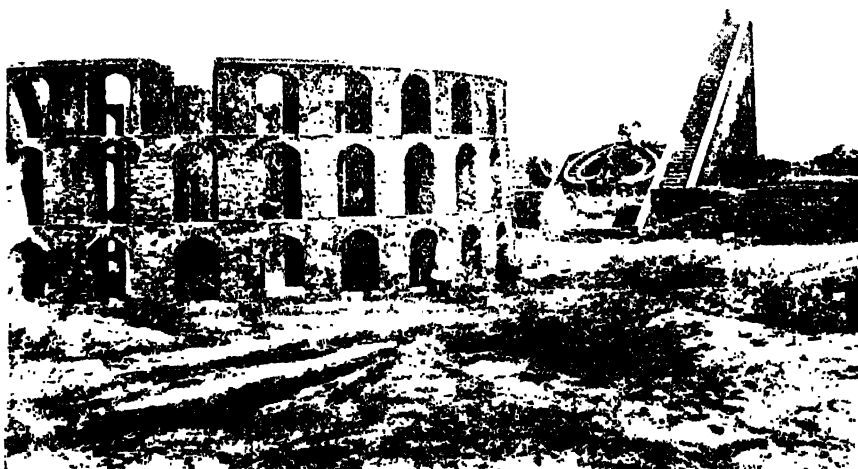
দিল্লী দুর্গ
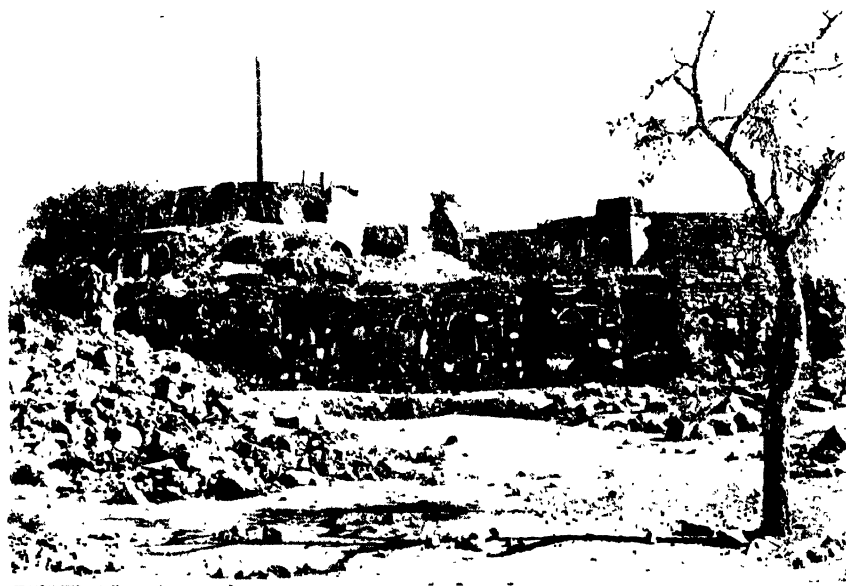
ফিরোজ শাহার দিল্লী

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বস্ত্র-সমস্যা সমাধানও কৃষির উপর সবিশেষ নির্ভর করে। দেশের সাধারণ লোক তুলা ও পাট নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। বড় লোকে রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্র সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুলা, পাট, শণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা কৃষিজাত। রেশম প্রস্তুতও কৃষি-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত এবং পশম সংগ্রহের জন্য পশুপালন করিতে হয়। ভারতবর্ষে সচরাচর যে তুলা জন্মে, তাহার আঁইস বড় নহে। বড় আঁইসের তুলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে জন্মিতেছে এবং দেশের স্থানে স্থানে উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার তুলার চাষ এ দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়ার প্রয়োজন।

পাট বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন সুন্দরভাবে জন্মায় না। পাটের ক্রয়-বিক্রয় যদি বাঙ্গালী নিজ হাতে গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাটের চাষে বাংলায় সোনা ফলিতে পারে। যাঁহারা পাটের চাষ কমাইতে অথবা উহা তুলিয়া দিতে বলেন, আমি তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। বিদেশী বণিক সম্প্রদায় পাটের ব্যবসায়ে লাভবান হইতেছে বলিয়া উহার নিবারণকল্পে পাটের চাষ তুলিয়া দিলে আমরা ইচ্ছা করিয়া আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিব। তবে পাটের ক্রয়-বিক্রয় যতদূর সম্ভব, বাংলাদেশের লোকের হাতে থাকা উচিত। দেশের জমিদারগণ চেষ্টা করিলেই পাটের ব্যবসা বাঙ্গালীর একচেটিয়া হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্র ব্যবহার লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে একটী বিষম আন্দোলন চলিতেছে। ১৯০৬ সালের বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইতেই ইহার উৎপত্তি। তখন এই আন্দোলন বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান অসহযোগিতা প্রচারের ফলে ভারতের সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য দেশে একটা বৃহৎ চেষ্টা, ও উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গ হইয়া মহা অনর্থপাতও হইতেছে। আমরা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু জোর করিয়া বা সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইয়া লোককে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এ বিষয়ে লোকের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত সুবিধার উপর নির্ভর করিতে চাহি। আমাদের বিশ্বাস যে কেবল বলপ্রয়োগ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া অথবা বিদেশী বস্ত্র অগ্নিসাৎ করিয়া কেহ কখন স্বদেশী বস্ত্র চালাইতে সক্ষম হইবে না। বঙ্গদেশে "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। স্বদেশী বস্ত্র বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা সস্তা বা সমান দরে না হইলে জনসাধারণে উহা স্বেচ্ছায় ক্রয় করিতে সমর্থ

বা স্বীকৃত হইবে না। বৎসরে দেশে যত কাপড়ের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম কাপড় ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে, এবং যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার মূল্য বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক। যতদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র দেশে প্রস্তুত এবং তাহা বিদেশী বস্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথবা তুল্যদরে বিক্রীত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কেবল স্বদেশ-বৎসলতার জন্য দেশের সাধারণ লোকে সস্তা বিদেশী বস্ত্র কখনই বর্জ্জন করিবে না।

অসহযোগী সম্প্রদায় স্বদেশী সূতার "খদ্দর" প্রস্তুত করিবার জন্য ঘরে ঘরে চর্‌কা চালাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং উহার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন, তাহা কল্যাণপ্রদ হইলেও আমাদের বিশ্বাস যে তদ্দ্বারা সমগ্র দেশের বস্ত্রের অভাব কখনই মিটিতে পারে না। অবশ্য বহুদিন পূর্ব্বে দেশে চর্‌কার বিস্তৃত প্রচলন ছিল এবং চর্‌কায় কাটা সূতা এবং হাতের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের দ্বারা দেশের সাধারণ লোকের বস্ত্রের অভাব মোচন ও জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইত। কিন্তু এখন আর সেকাল নাই। এখন দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, নানাদিকে কর্ম্মজীবনের বহুল বিস্তৃতির সহিত আমাদের বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁতিদিগের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, বহুসংখ্যক তাঁতি জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। দেশে এখন অতি অল্প সূতাই প্রস্তুত হয়; যাহা হয়, তাহাতেও ভাল কাপড় তৈরি হয় না, সুতরাং বিদেশ হইতে সূতা আমদানি করিয়া হাতে ও কলে অধিকাংশ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এখন চর্‌কার সূতায় এবং হাতের তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশের সমস্ত অভাব দূর করিবে, ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হয়। অসহযোগিগণ বিদেশী সূতার প্রস্তুত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কলের বস্ত্রেরও ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এক চর্‌কার দ্বারাই ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে। আমরা তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করি না। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল চর্‌কা চালাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে হয় ত দেশে যথেষ্ট সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নহে। অপরন্তু আজ কালকার দিনে চর্‌কা এবং হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কখনই টিকিতে পারিবে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে চর্‌কার এবং দেশীয় তাঁতিদের ব্যবসায়ের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না। . .

ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ভাল তুলার চাষ হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস যে অধিকসংখ্যক কাপড়ের কল ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদিগকে চিরদিন লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। কেবলমাত্র চর্‌কা চালাইয়া এবং হাতের তাঁতের সাহায্যে আমাদের দেশের বস্ত্রের দুঃখ কখনই ঘুচিবে না। এ কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা চর্‌কার পুনঃ প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। চর্‌কার প্রতিষ্ঠার দ্বারা বস্ত্রের অভাব যে কতকপরিমাণে দূরীভূত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরন্তু ইহা দ্বারা সামান্য অবস্থার গৃহস্থের আয়ের অনেক সুবিধা

হইবে, বিস্তর নিরাশ্রয়া বিধবার অন্নের সংস্থান হইবে, অনেকানেক ভদ্রপরিবারের মহিলাগণ যে সময় আলস্য বা বৃথা আমোদে নষ্ট করেন, চর্‌কা কাটিয়া তাহার সদ্ব্যবহার, দীন দুঃখীদিগের বস্ত্রের সংস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন। দেশে চর্‌কা চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। এই কার্য্যের জন্য স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কেবল চরকা কাটিতে হইবে, এ প্রস্তাবও আমরা যুক্তিসঙ্গত এবং কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। চর্‌কা-কাটা অন্যতম "কটেজ্‌ ইণ্ডষ্ট্রী" রূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে দেশের সবিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের অনেক অনাবশ্যক অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য এবং অনাবশ্যক অভাব যত পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল অভাব একেবারে উপেক্ষা করিবার আর উপায় নাই। অভ্যাস দোষে সেগুলি আমাদের জীবনের সাথী হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য যাহাতে দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার জন্য যে সকল কল কারখানার প্রয়োজন এবং তাহা চালাইবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক, ভারতবর্ষে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন কেবল তাহার অধিক প্রসারণ আবশ্যক। নতুবা সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেবল চর্‌কার প্রচলন দ্বারা আমরা দেশের বস্ত্র-দারিদ্র্য ঘুচাইতে কখনই সমর্থ হইব না।

তাঁতের কায শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট্‌ শ্রীরামপুরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ছাত্রগণ হাতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য সুন্দরভাবে শিক্ষা করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ হাতে বস্ত্র বুনিবার উন্নত প্রণালীর তাঁত প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিয়াছেন। দেশের স্থানে স্থানে এই নূতন তাঁত বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রগণ অনেক স্থানে শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন। স্থানে স্থানে সমবায়-প্রণালী মতে তাঁতিদিগকে এই তাঁত ও সূতা সরবরাহ করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা তাহাদের উপার্জ্জন সম্বন্ধে সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম হইবে।

শুদ্ধ কৃষিকার্য্যের দ্বারা ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিবে না। ইহার উন্নতি ব্যতীত দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও নানাবিধ শিল্পের (Industry) বিস্তৃত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এইখানেই বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সহিত আমাদিগের বিষম প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইবার কথা। বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকের সম্পূর্ণ করায়ত্ত, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বড় বড় সওদাগরী অফিস্‌ অধিকাংশই বিদেশীয় মূলধনে স্থাপিত এবং বিদেশীয় অধ্যক্ষতায় পরিচালিত। বোম্বাই প্রদেশে আমরা এ বিষয়ে কতকটা স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেখানে সম্ভ্রান্ত ক্রোরপতি

ভারতবাসী ব্যবসাদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বোম্বাইয়ের তুলনায় এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্প শিক্ষার জন্য নূতন প্রকার শিক্ষার প্রবর্ত্তন আবশ্যক! ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য কমার্সিয়াল স্কুল ও কলেজ এবং শিল্প শিক্ষার জন্য টেক্‌নিকাল্ স্কুল্ ও কলেজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এত দিন দেশের লোক এরূপ শিক্ষালাভ করিতে একপ্রকার উদাসীন ছিল। উচ্চ বর্ণের ও ভদ্র পরিবারের বালকগণের কোনরূপ ব্যবসা বা শিল্প কার্য্য করা অপমানসূচক বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। জীবিকা-সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হওয়াতে এ সম্বন্ধে লোকের ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ভারতের সর্ব্বত্র ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এখন দেশের শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দেশের শিক্ষা-পরিষদ সমূহে ইহার সূচনা দেখা যাইতেছে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যবসা ও শিল্প শিক্ষা এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রগণকে উচ্চ উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্রের প্রবেশ করা সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং দেশের যে সকল স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা আছে, তথায় এই শিক্ষার জন্য কতকগুলি স্কুল স্থাপন করিলে অনেক ছাত্র তথায় হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। ন্যাশান্যাল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনের অধীনে কলিকাতা মাণিক তলায় যে টেক্‌নিকাল্ স্কুল্ স্থাপিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কায সুন্দরভাবে চলিতেছে। বঙ্গমাতার সুসন্তান স্বর্গগত সার রাসবিহারী ঘোষ এই স্কুলের উন্নতির জন্য ১২ লক্ষ টাকার বিষয় দান করিয়া গিয়াছেন। স্থানাভাবে অনেক ছাত্র এই স্কুলে প্রবেশ করিতে পায় না। বঙ্গদেশে এরূপ স্কুল্ দশটি হইলেও দেশের অভাব তাহাতেও মিটিবে না। এইরূপ স্কুলের অভাব আছে বলিয়াই আমাদের ছাত্রগণ অগত্যা উপাধি লাভের জন্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক সংখ্যায় আসিতে চায়, কিন্তু ঐ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার শক্তি অনেকেরই নাই, এবং যাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই কলেজে প্রবেশ না করিয়া এই সকল শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথও সুগম হইবে।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট্ কলিকাতায় একটী টেক্‌নিকাল্ স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার জন্য ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের অর্থের যেরূপ অনাটন, আমাদের আশঙ্কা হয় ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সময়সাপেক্ষ। এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সত্বর যাহাতে এই শিক্ষাগারটী স্থাপিত হয়, তজ্জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ব্যবসাস্থলে এবং কলকারখানায় শিক্ষানবীশি (Apprenticeship) ব্যতীত ব্যবসা ও শিল্পকার্য্যে সাফল্যলাভের অন্য উপায় নাই। এ বিষয়েও অনেক বাধা বিপত্তি রহিয়াছে।

ইয়ুরোপীয় ব্যবসাদারগণ এবং কলকারখানার অধ্যক্ষেরা সহজে আমাদের ছাত্রগণকে তাঁহাদের অফিসে বা কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না। বিলাতেও আমাদের ছাত্রগণের কলকারখানায় প্রবেশ করিবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার পথে যে ইহা একটী প্রধান অন্তরায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কি উপায়ে এই প্রতিবন্ধক দূর হইতে পারে, বিশেষরূপে তাহা ভাবিবার বিষয়।

ব্যবসায়িক প্রাধান্য রক্ষা, বাবসা-সঙ্কেত গোপন রাখিবার ইচ্ছা এবং বর্ণ বিদ্বেষ, এই প্রতিবন্ধকতার মূলকারণ হইলেও, যদি ইংরাজ ও ভারতবাসিগণের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব না হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু দেশে জাতি-বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং অসহযোগিতা প্রচার ইহার জন্য যে বিশেষ ভাবে দায়ী, তাহা নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা দ্বারা দেশে বিষম অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ভিন্ন ভারতবর্ষ কখনই নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারিবে না, চিরদিনই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাশ্চাত্য জাতিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদিগের গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহাদের নিকটে অবনত মস্তকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। জাপান এই উপায় অবলম্বন করিয়া ৫০ বৎসরের মধ্যে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদেরও এ বিষয়ে জাপান প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। অন্য উপায় নাই। জাপান অনেক হীনতা দীনতা স্বীকার করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের গূঢ় রহস্য আয়ত্তাধীন করিয়া নিজ দেশে ঐ সকল জ্ঞান-শিক্ষার পীঠ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদিগকেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত অসদ্ভাব করিলে আমাদিগকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, বিদেশে আমাদের ছাত্রগণের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব এই জাতি-বিদ্বেষ যাহাতে কমিয়া যায়, যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে উহার তীব্রতার হ্রাস হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা এবং ঐ সকল উপায় অবলম্বন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয়ই হউন আর ভারতবাসীই হউন, যিনি বাক্য বা কার্য্য দ্বারা এই বিদ্বেষবুদ্ধির সহায়তা করিবেন, তিনি কখনই দেশের প্রকৃত বন্ধু নন।

পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বথা হীনতা স্বীকার করিয়া অর্জ্জন করা আমার অভিপ্রেত নহে। আত্মসম্মানবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ন্যায়সঙ্গত আদান প্রদান দ্বারা এই জ্ঞানের অর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক মনস্বী পণ্ডিত দিনদিন (বিশেষতঃ বিগত যুদ্ধের অবসানে) ভারতীয় সভ্যতার পক্ষপাতী হইতেছেন। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার মূলে তাঁহারা এমন একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন,

যাহার সংযোগে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস এবং তাহা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, কবিসম্রাট রবীন্দ্র নাথ, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু আলোক দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আর্য্যঋষিগণের আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান আমেরিকায় প্রচার করিয়া অনেকানেক ধনকুবের আমেরিকাবাসীকে বিষয়চর্চ্চার সময় সংক্ষেপ করিয়া বেদান্তচর্চ্চায় মনঃসংযোগ করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অপার্থিব কাব্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ ভারতবর্ষকে নূতনভাবে প্রেম ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারই ফলে ফরাসী আচার্য্য সিল্‌ভাঁ লেভির ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতীর" পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র, যোগবলে উপলব্ধ আর্য্যঋষিপ্রচারিত বিশ্বব্যাপী জীবন-রহস্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রমাণীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। যদি আমরা ইয়ুরোপ ও আমেরিকাকে প্রাচীন ভারতের কাব্য, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অমূল্য অনুপমেয় রত্নরাজি প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দাবী করিবার আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমার বিশ্বাস, আমাদের এ দাবী অগ্রাহ্য হইবে না। ব্যবসাপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতি দৈন্য ও ভিক্ষার বিরোধী কিন্তু ন্যায়সঙ্গত আদান প্রদানের পক্ষপাতী। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এই মহাকর্ত্তব্য উপস্থিত। প্রাচীন ভারতের অমূল্য জ্ঞানরত্ন সময়োচিত বেশ ভূষায় সজ্জিত এবং পাশ্চাত্য জগতের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিতে তাঁহারাই কেবল সমর্থ। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা দেশের লোকের "হাতে কলমে" বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেশে অন্নবস্ত্র-সংস্থানের অন্যতম উপায় স্বরূপ হউন।

এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য আমাদের যুবকগণকে দলে দলে ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে যাইতে হইবে। এই সকল দেশে যাইলে জাতি যায়, এই কুসংস্কার সমাজ হইতে একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য সকল প্রকার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন করিয়া দেশ-মাতৃকার কল্যাণে অর্পিতদেহ বিলাত প্রত্যাগত এই সকল যুবককে সাদরে ও সস্নেহে সমাজের বক্ষে স্থান দিতে হইবে।

কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সমিতি (Scientific Advancement Association) দ্বারা এ সম্বন্ধে দেশের অনেক উপকার করিতেছেন। ঐ সভা প্রতিবৎসর কতিপয় ভারতীয় যুবককে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়া ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পাঠাইতেছেন। এই সকল ছাত্র

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দুই চারিটী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেকে কল কারখানায় ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতেছেন। যাঁহারা বলেন যে আগে দেশে কলকারখানা স্থাপিত হউক, তারপর দেশের লোক বিলাত যাইয়া ঐ সকল কার্য্যে শিক্ষালাভ করিবে তাঁহাদের সহিত আমি মতে মিলি না। এখন যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে দেশে দিন দিন নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীর তত্ত্বাবধানে এ সকল কার্য্য করা সকল সময়ে সুবিধাজনক নহে। ইহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয় এবং বিদেশী অধ্যক্ষগণ দেশের লোককে ব্যবসার গূঢ় রহস্য জানিবার অবসর দেন না, এরূপ ব্যবস্থায় দেশের লোক চিরদিনই কেবল মুটে মুজুরের কাযই করিতে থাকিবে, নিজে কোন শিল্প বা ব্যবসা চালাইতে কখনই সমর্থ হইবে না। বিবিধ শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে শিক্ষিত উপযুক্ত লোক দেশে থাকিলে এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে বেশী দেরী হইবে না। ইঁহাদের কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার উপর দেশবাসীর বিশ্বাস জন্মিলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধনেরও অভাব হইবে না। ক্রমে দেশে স্থাপিত শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান হইতে দেশের লোকে এই সকল কার্য্য শিক্ষা করিবে, অর্থব্যয় ও নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া তাহাদিগকে বিদেশ যাইতে হইবে না। জাপান এই পথ অনুসরণ করিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুবর ডাক্তার সার পি, সি, রায়ের সহিত নাগপুরের এম্প্রেস্ মিল নামক কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। উহার বিস্তৃত কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। বোধ হয় ভারতবর্ষে এত বড় কাপড়ের কল আর নাই। ইহা একজন পার্সি ভদ্র লোকের টাকায় স্থাপিত এবং ইহার সমস্ত কার্য্য ভারতবাসী দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে একজনও বিদেশী কর্ম্মচারীকে দেখা যায় না। ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত কল-কারখানা কিরূপ সুন্দরভাবে চলিতে পারে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া কয়েকটী ভারতীয় ছাত্র ইয়ুরোপে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গমন করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই উদ্দেশ্যে দুই একটী বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প—ইহা দ্বারা দেশের অভাব পূরণ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং বিদেশে যাইয়া ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য আরো অনেক বৃত্তি স্থাপনের প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আরো বেশী টাকা খরচ করা উচিত এবং দেশের ধনকুবেরগণ কর্ত্তৃক ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে অধিক সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ ও বৃত্তিস্থাপনের প্রয়োজন এ বিষয়ে বঙ্গের দুই জন কৃতী সন্তান—প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারক নাথ পালিত ও ৺রাসবিহারী ঘোষ—স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর অনুকরণীয়।

সেদিনকার লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্লির কার্য্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। এসেম্ব্লির সুযোগ্য সদস্য মাননীয় সমর্থ মহোদয়ের প্রস্তাবে ভারতীয় ছাত্রদিগের বিদেশে বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য, ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কার্য্য দ্বারা মাননীয় সমর্থ মহাশয় প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। যে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বাৎসরিক ৬ লক্ষ টাকা মজুত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে এতদিন পরে ভারতে বিবিধ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার একটা বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে এই প্রস্তাব যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। তালিকাভুক্ত শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি ঃ—

১। জাহাজ নির্ম্মাণ (Ship-building)

২। জাহাজের কল্‌কব্‌জার সন্ধান (Ship engineering)

৩। সমুদ্র-বিজ্ঞান (Oceanography)

৪। বিনাতারে তাড়িবার্ত্তা বহন (Wireless Telegraphy)

৫। বন্দুক, কামান ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করণ (Gunnery and other modern weapons of warfare)

৬। শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রসায়নী বিদ্যা (Industrial Chemistry)

৭। খনিবিজ্ঞান ও খনিজ পদার্থ হইতে বিবিধ ধাতু পৃথক্‌করণ (Mining Metallurgy)

৮। ভূতত্ত্বের বিস্তৃত অনুসন্ধান (Geological Surveying)

৯। তাড়িত বিজ্ঞান, জল-প্রপাত সাহায্যে তাড়িতের প্রজনন এবং কৃষিকার্য্য তাহার প্রয়োগ (Electrics with special reference to hydro-electric engineering and the application of electricity to agriculture)

১০। ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করণ এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থা (Making and canning fruit preserves)

১১। ঘন দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করণ (Condensed milk, milk-products and concentrated food)

১২। বিবিধ গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা (Cottage industries)

১৩। সমবায় ভাণ্ডার স্থান (Organising and working of distributive Co-operative Stores and Producers' Co-operative Unions)

ইহা ব্যতীত অপর যে কোন শিল্প সময়ে সময়ে দেশে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইবে, এই অর্থ হইতে ভারতীয় ছাত্রগণকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় করা হইবে। মাননীয় সমর্থ মহাশয় এই প্রস্তাব উপলক্ষে যে সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধানের

যোগ্য। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ পত্রিকা হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Mr. Samarth then moved his resolution recommending that not loss than six lakhs of rupees be set apart every year from central revenues to provide for the education and the training abroad of Indian and Anglo-Indian youths in the following subjects :—

Ship-building, ship-engineering, oceangraphy, wireless telegraphy, gunnery and other modern weapons of warfare, industrial Chemistry in all its branches—thœretical and practical ; mining and metallurgy, geological surveying with special reference to hydro-electric engineering, and the application of electricity to agriculture, making and canning preserves, condensed milk, milk-products, and concentrated foods, cottage industries, organising and working of distributive Co-operative stores and producers, Co-operative unions and such other subjects as the Assembly from time to time deem essential for the needs of India. The mover emphasised that the education problem of the country was a national one and it was necessary for modern national growth that education should be given to youths in branches of science and everywhere. He instanced the educational scheme which was inaugurated in Japan and which in two years brought out such a national growth and upheaval and ultimately distinguished itself in the Russo-Japan war. He therefore wanted that his countrymen should rise to that standard and asked Government to send suitable candidates to foreign countries and promote education in a manner a national government would do. Continuing, the speaker said that political domination was an evil and to depend for everything on foreign countries was equally an evil. He was one of those who would forget the past errors of Government and would see that in future, things went as the best interests of India demanded. He did not believe in Ahimsa and going centuries back in order to lead a life of simplicity (laughter). He belonged to the modern world and must try to learn what the world had to teach them."—*Indian Daily News, 24-2-22.*

গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন না করিলেও সমগ্র এসেম্ব্লি বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইহা কার্য্যে পরিণত করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও আমরা আশা করি যে গভর্ণমেণ্ট অন্যদিকে খরচ বাঁচাইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই অর্থের ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইবেন।

ব্যয়াধিক্য হেতু গভর্ণমেণ্টের অর্থের বিশেষ অনাটন যাইতেছে। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট অনেক নূতন ট্যাক্স্ বসাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ভয় হইতেছে যে, এই কার্য্য দ্বারা দেশে অসন্তোষের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, ভারত গভর্ণমেণ্ট কল্‌কব্‌জার (Machinery) উপর ট্যাক্স বসাইয়াছেন বলিয়া দেশে শিল্প বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবে। শিল্পকার্য্যের জন্য কল কব্‌জা অতি অল্পই এদেশে প্রস্তুত হয়, প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ট্যাক্স্ স্থাপনের জন্য কল্‌কব্‌জার দাম অধিক হইবে, সুতরাং এ দেশে

শিল্প প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে। যাঁহারা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মত এই যে, এই ট্যাক্সের জন্য দেশের শিল্পের প্রসার বিশেষভাবে বাধা প্রাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে সর্ রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ও মিষ্টার ডার্সি লিণ্ড্সের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"The new duties only affected industry and commerce and left agriculture, Zemindari etc. practically untouched. They will throw a cold douche of water on the industries and commerce. The increase in the duty of machinary, iron, steel and railway materials will put a strong brake over the industrial wheels. The trade and industry are already in a low state and this new duty on machinery etc. will greatly hamper any new proposal for development of industries. The Government who, in my opinion, are not retrenching their expenditure as much as they ought to do, should have found money from other sources than merely from industries and commerce."—*Sir R. N. Mookerjee K. C. I. E.*

"Mr. Darcy Lindsay bitterly condemned these increases in taxation on certain articles as most disturbing for both the public and the trade. There was not enough imagination or ingenuity in the Budget. The milch-cow was being milked dry. While crying out for industrial development, the country was being taxed on the machinery necessary for such progrees. He felt sure there must be other avenues for taxation. He did not like the Budget as a whole. The Budget, he added, would give a fresh lease of life to non-co-operation."

সুখের বিষয় এই যে গভর্ণমেণ্ট শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়া কলকব্জার উপর সামান্য মাত্র ট্যাক্স বসাইয়াছেন। অবশ্য কলকারখানা স্থাপন যে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণপ্রদ, তাহা নহে। ইহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইলেও বিবিধ সামাজিক অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। নৈতিক জীবন ও স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যভিচার বৃদ্ধি, মাদক দ্রব্য সেবনে প্রবৃত্তি, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, মিতব্যয়িতার অভাব প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গল, সকল দেশেই শ্রমজীবিগণের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এ সকল অমঙ্গল ব্যবস্থার দোষেই ঘটিয়া থাকে যাঁহারা কলকারখানা স্থাপন করেন, তাঁহাদের প্রবল অর্থলিপ্সা, তাঁহাদের স্বার্থ-পরতা এবং কর্ম্মীদিগের প্রতি সহানুভূতির অভাবেই এই সকল অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে। আজ কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কর্ম্মীদিগের হৃদয়ে আত্মসম্মান জাগরূক হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে সঙ্কুচিত হইত, নীরবে প্রভুদিগের (Employers) অত্যাচার সহ্য করিত। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সকলদেশের শ্রমজীবিগণ অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং সকলদেশেই উন্নতমনা একদল ব্যক্তি শ্রমজীবিগণের সমিতি সংঘটন করিয়া তাহাদের সাংসারিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও এইরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং ইহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ অসুবিধা

হইলেও বলপ্রয়োগ বা আইনের দ্বারা ইহা কখনই নিবারিত হইবে না। কলকারখানার অধ্যক্ষগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাহা শ্রমজীবিগণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে। সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ এই অর্থে তাহাদেরও কিয়ৎপরিমাণ অধিকার আছে। তাহাদের আশা বেশী নহে, তাহাদের সাংসারিক অভাব অল্প, সেই অভাব পূর্ণ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। যাহাতে তাহারা পরিজনবর্গের সহিত স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব নহে, নিজ নিজ স্বার্থের দিকে চাহিয়াও যথোচিত ব্যবস্থা করা ধনীদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে হৃদয়বান কলকারখানার অধ্যক্ষগণের মধ্যে এই কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া শ্রমজীবিগণ এবং তাহাদিগের সন্তানসন্ততিদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, উপাসনালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, সমবায় ভাণ্ডার, পাঠাগার, ক্রীড়াগার, ব্যায়ামক্ষেত্র, নির্দ্দোষ প্রমোদাগার এবং সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের পরিজনবর্গের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের সহায় হইতেছেন। স্ত্রীকর্ম্মিগণের কার্য্য করিবার সময়ে যাহাতে তাহাদিগের অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাগণের অযত্ন না হয় এবং তাহারা সময় মত পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জননীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। এ দেশেও এইরূপ সুব্যবস্থার সূচনা দেখা যাইতেছে। মার্চ্চ মাসের "মডার্ণ্ রিভিউ" নামক পত্রিকাতে সেণ্ট্ নিহাল সিংহ মহীশূরের রাজার অধীনস্থ কাবেরী-প্রপাত-চালিত তাড়িৎশক্তি উৎপাদনের কারখানার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রায় ১৫০০ লোক সেই কারখানায় কাজ করে। তাহাদের একটি সুন্দর উপনিবেশ সেখানে স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য কারখানার শ্রমজীবী অপেক্ষা তাহারা অধিক বেতন পায় এবং মহীশূর সরকার হইতে তাহাদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে এই কারখানায় কার্য্য করিতেছে। কি স্বদেশী, কি বিদেশী, প্রত্যেক কলকারখানার অধ্যক্ষগণের এই পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শ্রমজীবিগণের ধর্ম্মঘট অনেক কমিয়া যাইবে এবং কলকারখানায় বহুলোক একত্রে কাজ করিবার জন্য যে সকল অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা বহুলপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। এই অমঙ্গল নিবারণের জন্য কলকারখানা উঠাইয়া দিলে চলিবে না। অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য দেশে কলকারখানা স্থাপন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সামান্য স্বার্থত্যাগ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ দ্বারা কলকারখানা স্থাপনের অমঙ্গল দূরীভূত করিতে হইবে।

বিলাসিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত হয়। কাগজ, পেন্সিল্, কলম, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, দেশালাই, সাবান, বাতি, কাঁচের বাসন, সূতা, পশম ও রেশমের কাপড়, আরসি,

চিরুণী, বুরুষ, লোহার জিনিস, ঔষধ, রঙ্গের জিনিষ প্রভৃতি আমাদিগের নিত্যব্যবহার্য্য পদার্থের অধিকাংশই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যের উপাদানের (Raw materials) অভাব নাই এবং এই সকল উপাদান কাযে লাগাইয়া ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, তাহারও অভাব নাই। এ সম্বন্ধে অভাব কেবল আমাদের শিক্ষার, উদ্যমের, অধ্যবসায়ের ও সাহসের। আমাদের মানসিক বৃত্তি ও কর্ম্মজীবন এই পথে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার এতদিন অবসর পায় নাই; আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। জাতীয় জীবন-স্রোত সবে মাত্র নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে; সম্মুখে অনেক বাধা বিপত্তি অবস্থিত, সেগুলি অতিক্রম করিতে পারিলেই স্রোতের গতি অবিচ্ছিন্ন পূর্ণতা লাভ করিবে। সাফল্য-লাভ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই, উহা কেবল সময়সাপেক্ষ।

এক্ষণে দেখা যাউক যে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার কি ব্যবস্থা আছে। ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার-ভুক্ত স্কুল ও কলেজ সমূহে অধ্যয়ন ও পরীক্ষার বিষয় ছিল। পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজেও রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। এ সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা মেডিকাল কলেজের আশ্রয় লইতে হইত। ক্রমে দুই একটী কলেজে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নী-বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইল। তখন এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রের কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হইত। অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই পরীক্ষাগারে হাতে কলমে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিত। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা অন্য কোথাও ছিল না। মেডিকাল কলেজের রসায়নশাস্ত্র ও ভৈষজ্যতত্ত্বের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের পরীক্ষাগারে অবসর মত অল্প বিস্তর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার্ প্রথমে সামান্যভাবে গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়ার্ডেনের সহিত একত্রে কিছুদিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রসায়নাচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সময় হইতেই এদেশে রসায়নী বিদ্যার গবেষণা কার্য্যের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। তিনি এডিনবরা হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। এবং সেই সময় হইতে স্বীয় প্রতিভা, অবসর ও মানসিক শক্তি রসায়ন-বিজ্ঞান-ঘটিত গবেষণায় নিয়োজিত করেন। ইহার ফলে তিনি জগতের বিজ্ঞান-সমাজে উন্নত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গবেষণা কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাযে লাগাইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক

মনে করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া গবেষণা-কার্য্যে দক্ষ অনেকগুলি বাঙ্গালী শিষ্য গঠিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা দেশে ও বিদেশে সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

অনেকে মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সাধারণের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ইহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয় এবং এই সকল গবেষণার ফল কেবল মতবাদ (Theory) রূপেই থাকিয়া যায়, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে ইহাদিগের উপযোগিতা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য যে এই মত নিতান্ত সঙ্কীর্ণতাজ্ঞাপক। একটু ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই এই মতের ভ্রম সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার আদিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা তাপ, তাড়িত ও আলোককে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে যে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছি এবং কাল ও দূরত্বের ব্যবধান নাশ করিয়া দিন দিন জীবনযাত্রার পথ সুগম হইতে সুগমতর করিতেছি, তাহার মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিদ্যমান। যখন তাড়িৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিয়াছিল যে এই গবেষণা দ্বারা বার্ত্তাবহন-ব্যাপারে পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌বৃদ্ধি নির্ণয়ের জন্য যে অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে ভবিষ্যতে উহা ভারতবর্ষের প্রত্যেক কৃষকের ঘরে ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দিবে না? নিউটন্ যখন সূর্য্য-কিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণছত্রের (Spectrum) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন কে জানিত যে তাঁহার আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ যে কেবল সুদূরস্থিত ব্যোমচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির গঠনোপাদান ও গতিবিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহাই নহে, উহা দ্বারা কত নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার এবং ভূগর্ভস্থ বিবিধ পদার্থের উপকরণ সহজে অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাহার কাযে লাগাইতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা পাস্টুরের জীবাণু সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রোগপ্রতিষেধকতত্ত্ব এবং কতিপয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক কুরী এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী মাদাম্ কুরী রেডিয়ম্ (Radium) ধাতু আবিষ্কার করিয়া, ডল্টনের যে পরমাণু বাদ বৈজ্ঞানিক জগতে এ পর্য্যন্ত অকাট্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে জাগতিক যাবতীয় পদার্থের মূলে ইলেক্‌ট্রন্ নামে একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ অবস্থিত এবং ইহা জড় নহে, তাড়িৎ-শক্তির সূক্ষ্মকণা মাত্র। ইহার গতি ও শক্তি অপ্রতিহত। ইহা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাণুর দেহ হইতে অবিরাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরিমেয় তাপ উৎপাদন করিতেছে এবং এই বিক্ষেপণের ফলে, যে সকল পদার্থকে আমরা এ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় মূল পদার্থ (Elements) বলিয়া স্বীকার করিয়া

আসিয়াছি, তাহাদের রূপান্তর হইয়া তাহারা ভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছে। লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার আশায় যে স্পর্শমণির আবিষ্কারের জন্য মানুষ প্রাণ পাত করিয়া যুগযুগান্তরব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কুরী দম্পতীর রেডিয়ম্ ধাতু আবিষ্কারের ফলে তাহা এত দিন পরে সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে। এতদিনের পর বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন যে তাঁহারা একদিন পরীক্ষাগারে নিকৃষ্ট ধাতুসমূহকে সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন। আর্য্যঋষিগণ যোগবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই, যাবতীয় জাগতিক পদার্থ চেতনাময়। আজ বিজ্ঞানও প্রামাণিক পরীক্ষা দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে যাহাকে আমরা এতদিন জড় বলিয়া আসিয়াছি, তাহা জড় নহে, এক অদ্বিতীয় শক্তির রূপান্তর মাত্র। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কেবল একই শক্তি প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছে।

রসায়নীবিদ্যার গবেষণার ফলে জড় ও জৈবজগতের প্রভেদ দিন দিন লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এতদিন যে সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণাবলে সেই সকল পদার্থ এখন পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে। সুরা, শর্করা, নীল প্রভৃতি রঞ্জন দ্রব্য, নানাপ্রকার সুগন্ধি এবং উদ্ভিজ্জ ঔষধাদি নিত্যব্যবহার্য্য বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু, যাহাদিগের উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির পরীক্ষাগারেই সম্ভব বলিয়া মানুষ এতদিন বিশ্বাস করিত, এখন সেই সকল পদার্থ মানুষের পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে বস্ত্র-রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জবর্ণ ব্যবহৃত হইত। স্বনামখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ পার্কিনের গবেষণার ফলে পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক বিবিধ বর্ণের এনিলিন (Aniline) নামক রঞ্জনদ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ কদাকার পাথুরে কয়লা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই রঞ্জন দ্রব্য এখন লোকে এত সস্তা দরে পাইতেছে যে উদ্ভিজ্জ রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ-সরঞ্জামের যাবতীয় রাসায়নিক স্ফোটক দ্রব্য (Explosives) বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। ফল-শস্যাদিকে ব্যাধি ও কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা সমস্তই বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত। অস্ত্র-চিকিৎসায় এবং সংক্রামক রোগ নিবারণকল্পে মানুষ যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহার মূলে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পাশ্চাত্যদেশ সমূহ এত সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং গবেষণা কার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ ফলপ্রদ না হইলেও ভবিষ্যতে উহা যে সমগ্র মানব সমাজের ধনবৃদ্ধির সহায় ও অশেষ কল্যাণের আকর, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বিজ্ঞান যে কেবল মানুষের পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সহায়, তাহা নহে, ইহার অন্য একটী মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যলাভই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানই মানব-মনকে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ভাব ও কর্ম্মজগতে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। কেবলমাত্র সত্যের অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইয়া কতশত মহানুভব ব্যক্তি বিজ্ঞানের সেবায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কার্য্যদ্বারা তাঁহারা যে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার মূল্য নাই। সে কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়, অপরের নহে। আর্য্যঋষিগণের ন্যায় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণও কায়মনপ্রাণ সমস্তই তাঁহাদের উপাস্য দেবতার আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন, সাংসারিক বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, আর্থিক চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, তন্ময় হইয়া সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্ট দেবতার সাধনা করিয়া থাকেন। যখন দেখি আর্কিমিডিস্ তাঁহার অভীপ্সিত বিষয়ের সন্ধান লাভ করিয়া স্নানাগার হইতে আনন্দের আতিশয্যবশতঃ জ্ঞানহারা হইয়া উলঙ্গাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে "ইউরেকা" "ইউরেকা" (Eureka) মাত্র শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যে তন্ময়ত্বের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। যখন দেখি যে যিনি চীনাবাসন (Porcelain) প্রথম প্রস্তুত করেন, ইন্ধনের অভাবে নিজের বাক্স, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দাহ্য সামগ্রী গৃহে ছিল, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি সেই সকল পদার্থ চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতঃ স্বীয় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই আবার আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তন্ময়ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। গবেষণা, জীবনের যে একটী প্রকৃষ্ট সাধনা, ইহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই।

ক্রমশঃ

শ্রীচুণীলাল বসু

শোচনা

কচি ছিলে, কাঁচা ছিলে, সে দিন থেকে তোরে
স্নেহ ঢেলে রেখেছিলাম যত্নে মাথায় করে';
চলে গেলে বাঁধন খুলে, ভুল হ'ল না একটি চুলে!
খেলে যেন ভেল্‌কিবাজি লাগিয়ে দিলে তাক!
হাত বুলিয়ে দেখি কিনা সারা মাথায় টাক!

জাপানের সামাজিক প্রথা

(১)

(এই প্রবন্ধের লেখক বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ একজন জাপানী ভদ্রলোক। তিনি "বঙ্গবাণী"র জন্য বঙ্গভাষায় জাপানের সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিবেন।—বঃ সঃ।)

জাপানের সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমার নিকট 'বঙ্গবাণীর' আহ্বান আসিয়াছে। আমিও অনেকদিন হইতে এদেশের সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা ঐ দেশে, এবং ঐ দেশের সামাজিক নানা কথা এইদেশে পরস্পর জানাইব মনে করিতেছি। কিন্তু দেখিতে গেলে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা হইয়া উঠে না, কারণ আপনারা সকলে জানেন বুঝাইলে বুঝিতে পারা যায় এমন অনেক বিষয় আছে, কিন্তু এমন বিষয়ও আছে যাহা না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে না। দেশবিশেষের সামাজিক প্রথাগুলি দেখিবার বিষয়, উহা কাগজে লিখিয়া কাহারও হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব চাক্ষুষ না দেখা পর্য্যন্ত কেহ কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া বুঝিতে পারে না, অধিকন্তু শোনা জিনিষের মধ্যে অনেক ভুল রহিয়া যায়। একদিন একজন বাঙ্গালী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জাপানের বাড়ীগুলি কি কাগজের তৈয়ারী ?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি উত্তরে বলিলেন যে "অমুক প্রবন্ধে লেখা আছে যে জাপানের বাড়ীগুলি কাগজের তৈয়ারী।" আমি বলিলাম, "তাহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে ?" তিনি বলিলেন, "তাইত! জাপানের বাড়ীগুলি না দেখা পর্য্যন্ত কাগজে পড়িয়া বা অন্যের কাছে শুনিয়া একটা সম্যক্ ধারণা করা কঠিন।" শুনিলে বা কাগজে পড়িলে নানা অদ্ভুত ভুল হইতে পারে। কাজে কাজেই জাপানকে এই দেশের সম্মুখে না আনা পর্য্যন্ত প্রকৃত বিষয়টী দেখাইতে পারিব না। কিন্তু একদেশকে অন্যদেশে—জাপানকে ভারতবর্ষে—লইয়া আসার ক্ষমতা আমার নাই। যাহা হউক আমি যতদূর পারি জাপানের প্রকৃত ছবিটী আপনাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিব।

"কন্‌নিচুয়া, আয়োনারা"।

সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা বলিতে গেলে, কোন্ দেশের অভিভাষণ প্রথা কিরূপ এই প্রশ্নই সর্ব্বপ্রথম আমাদের মনে উদিত হয়। বাঙ্গালাদেশে লোকভেদে "নমস্কার, কেমন আছেন মহাশয়," ইত্যাদি প্রশ্ন পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হয়। জাপানেও সেইরূপ ভাবগত ও ভাষাগত বিভিন্ন অভিবাদন প্রথা আছে। জাপানে যখন একজন লোক প্রথমে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে যায় সে সময় সে "গমেং কুদাসাই" বলিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ায়; তাহা হইলে ঐ বাড়ীর যে কোন লোক বাড়ীর দরজায় আসিয়া বলিবে "ইরা স্যাই"—"গমেং কুদাসাই" অর্থাৎ ক্ষমা করিবেন, বা অপরাধ লইবেন না, আর "ইরা স্যাই" মানে অসুন, বসুন। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে যদি অপরিচিত ব্যক্তি পুরুষ হয় তাহা হইলে একটু বেশ জোরের সহিত কথাটী উচ্চারণ করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক হইলে নম্রভাবে, এবং আস্তে আস্তে এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। কাজে কাজেই বাড়ীর লোক বাহিরে কে আছে জানিতে পারে। "ইরাস্যাই" উত্তরেও সেই প্রকার স্ত্রী-পুরুষ ভেদে উচ্চারণের নম্রতা ও উচ্চতা লক্ষিত হয়।

যদি পরিচিত লোকের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় বা একজন লোক অন্য লোকের বাড়ী যায় সে সময় "গমেং কুদাসাই" শব্দের পরিবর্ত্তে "কন্‌নিচুয়া" বলিয়া অন্য রকম অভিবাদন শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য এই কন্‌নিচুয়া শব্দটী অপরিচিত লোকের মধ্যে একেবারে ব্যবহার হয় না এমন নহে, কিন্তু সাধারণতঃ পরিচিত লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। "কন্‌নিচুয়া" শব্দটীর প্রকৃত অর্থ ইংরাজিতে Good-morning বা Good day শব্দের ন্যায়। কিন্তু এখানে একটু বিশেষত্ব আছে, যদি সকাল হয় তাহা হইলে "কন্‌নিচুয়ার" পরিবর্ত্তে "ওহাও গোজাইমাস্"—বাঙ্গালায় সুপ্রভাত বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে। যদি সন্ধ্যার সময় বা রাত্রি হয় তাহা হইলে "কন্‌নিচুয়ার" পরিবর্ত্তে "কমবাংওয়া" বলিয়া কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'কমবাংওয়া' মানে This night, কিন্তু ভাবটী ইংরাজি Good eveningএর ন্যায়। এইত গেল জাপানের অভিবাদনের কথা।

তারপর যখন পরস্পরের কাজ শেষ হয় বা কথাবার্ত্তা হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় হয় তখন বাঙ্গালায় যেমন 'আচ্ছা এখন আসি, বিদায় লইব, বলিয়া বিদায়সূচক শব্দ ব্যবহার হয় এবং বাড়ীর অন্য লোকেরা 'আবার আসিবেন' বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেয়, তেমনি জাপানেও কথোপকথন বা কাজ শেষ হইলে 'সায়োনারা' বলিয়া বিদায় লইয়া থাকে। বাড়ীর লোকেরা "মাতা ইরাস্যাই" বলিয়া বিদায় দিয়া থাকে। 'সায়োনারা' মানে 'আমি আসি।' 'মাতা ইরাস্যাই' মানে ঠিক বাঙ্গালায় —"আবার আসিবেন"; মাতা মানে 'পুনরায়' ইরাস্যাই মানে 'আসিবেন'।

দুইজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব থাকিলে 'কন্‌নিচুয়া' 'ওহাইও' বা 'কমবাং' ইত্যাদি বাক্যের পরিবর্ত্তে "ইয়া—সিক্কে" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ "কিহে কেমন আছ"। একজন বন্ধু "ইয়া—সিক্কে" বলিয়া বাড়ী প্রবেশ করিলে তাহার বন্ধুও "ইয়া—সিক্কে" বলিয়া তাহাকে বসায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অভিবাদক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন বাঙ্গালায় নমস্কার বলিয়া কৃতাঞ্জলি করে, সেই প্রকার জাপানের অঞ্জলির পরিবর্ত্তে 'ওহাইও' 'গোজাইমাস' বা 'কন্‌নিচুয়া' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাঙ্গালায় প্রণামের ন্যায় পরস্পর মাথা নীচু করিয়া থাকে। যদি গৃহের ভিতরে হয় তাহা হইলে কেবল মাথা নীচু করা নয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রণাম করিয়া থাকে। এখানে জানিয়া রাখা উচিত যে ইউরোপে বা এদেশে জুতা পায়ে দিয়া গৃহের ভিতরে যাতায়াত করে বা করিতে দেয়, কিন্তু জাপানে সে প্রকার নিয়ম নাই। তাহাদের গৃহের মেজের উপরে প্রায় এক ফুট উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত আর একটী স্থান আছে। তাহার উপর "তাতামী" বলিয়া এক ইঞ্চি মোটা মাদুর বিছান থাকে। গৃহের এককোণে জুতা, খড়ম রাখিবার স্থান আছে, সেস্থানে জুতা রাখিয়া সকলে ঐ উচ্চস্থানটীতে যাইয়া বসে। কাজে কাজেই ভিতরে আসিলে উপরোক্তভাবে প্রণাম করে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে

বলিয়া রাখা উচিত যে যখন উপাসনা হয় সেই সময়ে উপাসক বাঙ্গালীর ন্যায় ঠিক কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করে। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে এই নিয়ম আমাদের দেশে গিয়াছে।

(২)

অতিথি সেবা

এদেশে জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব আসিলে তাঁহাকে যে যত্ন করিয়া খাওয়ান সকলের কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই—উহা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু যখন অপরিচিত লোক বা সামান্য পরিচিত লোক কাজে বা বেড়াইতে আসেন তাঁহাদিগকে পাণ, তামাক, সময়ে সময়ে চা, বা কিছু মিষ্টান্ন দিয়া আজকাল অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে—এবং যদি সময়ে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত না থাকিলেও চারিটী ভাত তাহাদিগকে দেওয়া হয়। শুনিয়াছি, প্রাচীনকালে এদেশের অতিথিসেবার নিয়ম এইরূপ ছিল যে কোন অপরিচিত লোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে মধুপর্কাদি দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

চাণক্যাদির নীতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে সে সময়ে সকলে অতিথিকে ঈশ্বরের ন্যায় সম্মান করিত।

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

সকলে বলেন সেরূপ অতিথিসেবা আজকাল লুপ্ত কিন্তু এখনও অতিথিসেবা করা কর্ত্তব্য এরূপ জ্ঞান ও প্রথার নিদর্শন এখনও যথেষ্ট এদেশে স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। ইহা একটী সুন্দর প্রথা। এরূপ প্রথা অন্যদেশে বিরল কিংবা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপানেও এরূপ অতিথিসেবা এবং নানাবিধ অভ্যর্থনার প্রথা যথেষ্ট ছিল এবং আছে।

জ্ঞাতি বা বন্ধু কোন কাজের জন্য বা শুধু বেড়াইতে আসিলে জাপানে তাহাদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া বৈঠকখানায় বসায়। ভারতে বৈঠকখানা বলিলে বুঝিবেন বাড়ীর বাহিরে একখানা স্বতন্ত্র ঘর। সেখানে অতিথি অভ্যাগতকে বসান হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বৈঠকখানা বলিলে তাহা বুঝায় না। ইহা একেবারে বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ বাড়ীর মধ্যে যে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উহাকেই আমরা বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করি—জাপানীতে ইহাকে "জাসীকী" কহে। জাসীকীতে উহাদিগকে লইয়া বসান হইয়া থাকে। তাহার পর সর্ব্বাগ্রে দেওয়া হয় এক পিয়ালা চা, কেক, এবং তামাক—এই নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত। এদেশের লোকেরা চা পান করা বলিতে এই পর্য্যন্ত বুঝেন—গরম জলের সহিত চা-পাতা, চিনি ও দুধ। কিন্তু আমরা জানি ইহা ইউরোপীয়দিগের প্রথা। জাপানে চা পান একটু অন্য রকমের। অবশ্য আজকাল ইউরোপীয়দিগের সামাজিকপ্রথা আসাতে দুধ চিনি মিশ্রিত

চায়েরও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের চিরপরিচিত স্বদেশের প্রথা নহে। আমরা কেবল চা-পাতার জল, চিনি ও দুধ না মিশাইয়া খাইয়া থাকি—ইহাকে ইউরোপীয়েরা green tea বলিয়া থাকে। চিনি ও দুধ না মিশাইলেই ঐ প্রণালীতে প্রস্তুত চায়ের একটা আলাদা মাধুর্য্য ও আস্বাদ থাকে—ইহা আপনাদিগকে না খাওয়াইলে বুঝিবেন না। বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, শীত—এই চারি ঋতুতে সেই বৈঠকখানায় বা জাপানীতে 'হিবাতী' বলিয়া একখানা আগুনের গোল বাক্স (Fire box) থাকে—ইহা সময়ে সময়ে মাটি বা লোহার তৈয়ারী দেখা যায়। বাক্সটীর মধ্যস্থলে আগুন রাখা হয়, সেই আগুনের উপর সর্ব্বদাই একটী কেটলী রহিয়াছে—তাহার মধ্যে ফুটন্ত জল সকল সময়েই পাইবে। অতিথি আসিলে বিনাবিলম্বে সেই গরম জলের সহিত চা-পাতা দিয়া green চা প্রস্তুত করা হয়।

চা সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলা উচিত। জাপানে চা তৈয়ারী করিবার বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ভদ্রঘরের ছেলে, বিশেষতঃ মেয়েরা সে সমস্ত প্রণালী অবশ্যকর্ত্তব্য হিসাবে শিখিয়া থাকে। এসকল প্রণালীকে আমরা বলিয়া থাকি "চাদ" অর্থাৎ "চা" এবং "দ" অর্থাৎ "প্রথা"। এসকল প্রথাগুলি আয়ত্ত করিতে কমপক্ষে তিন বৎসর লাগে। বিশেষ করিয়া এখানে সকল কথা বলা অসম্ভব। তবে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে কিরকমভাবে আগুন তৈয়ারী করিতে হয়, কিভাবে উহাকে বাক্সের মধ্যে রাখিতে হয়, এবং কত পরিমাণ ছাই আগুনের উপর রাখা দরকার—এই সকল বিষয় জানিতে হইবে। খালি গরম জল হইলে যখন তখন চা প্রস্তুত হইতে পারে তাহার কোন মানে নাই। গরম গরম জল পিয়ালার ভিতর ঢালিয়া কিছুক্ষণ রাখিতে হয়, সেই জল কিছু ঠাণ্ডা হইলে পর পাতার সঙ্গে মিশাইতে হইবে—মিশাইবারও অনেক কায়দা আছে। সেই চা তৈয়ারী হইলে অতিথিকে কিভাবে দিতে হইবে তাহারও আদব-কায়দা যথেষ্ট আছে। এইত গেল চা তৈয়ারী এবং পরিবেশনের ব্যাপার। এইবার যে লোকটী চা গ্রহণ করিবে, সেই গ্রহণের সময় কিভাবে বসিয়া, কিভাবে হাতদিয়া, চায়ের সহিত সেই কেক্‌টী খাইতে হয় সেও এক মহা সমস্যা। এইত গেল চা প্রস্তুত প্রণালী। আপনাদের একজন বলিয়াছেন—"চা পান করিয়া উঠিল জাপান" ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু এখানে বলা উচিত যে এই চা প্রস্তুত প্রণালীগুলি শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষানবীশের জীবনে পরিস্ফুট হইতে থাকে। অতিথিসেবার খাদ্যগুলি দেশকালভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে—যেমন আপনাদের দেশে সুপরিচিত নৈহাটীর সন্দেশ, বম্বের আম, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ইত্যাদি। আমাদেরও সেইরূপ টোকিও, নাভয়া, ওকায়ামা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সহরের খাদ্যগুলি বিখ্যাত। এই খাদ্যদ্রব্যগুলির নাম করিলে আপনারা বুঝিবেন না, কাজে কাজেই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতিথি আসিলে সেই স্থানের বিখ্যাত জিনিষ খাইতে দেওয়া হয়।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতিথি-অভ্যর্থনার দ্রব্যগুলিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন এদেশে গ্রীষ্মকালে চা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে ঘোলের সরবৎ, ডাবের জল ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিষ দেওয়া

হয়, আমাদেরও সেইরূপ নিয়ম। গ্রীষ্মকালে সোডা, লিমনেড ইত্যাদি বরফ দিয়া এবং ফলের নির্য্যাসে তৈয়ারী বিভিন্ন প্রকারের সরবৎ প্রস্তুত হয়। আজকাল দইও প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ইহা অতিথিকে দেওয়া হয় না। এদেশের সহিত, তুলনা করিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ সময়েই শীত—খালি জুন, জুলাই, আগষ্ট তিন মাস গ্রীষ্ম। যেমন গ্রীষ্মকালে সরবৎ ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিষ দেওয়া হয়, সেইরূপ শীতকালে নানাবিধ গরম খাবার জিনিষ দেওয়া হয়। সময়ে উপস্থিত হইলে অতিথিকে অন্নও দেওয়া হয়। বাড়ীতে প্রস্তুত না থাকিলেও নিকটস্থ হোটেল হইতে সমস্ত ক্রয় করিয়া আনা হয়। পরন্তু আজকাল এমন হইয়াছে যে অতিথি অভ্যাগত বাড়ী আসিবেন ইহা পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলেও লোকে বাড়ীতে আহার দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া হোটেল হইতে কিনিয়া আনেন। এই এ গেল সহর সম্বন্ধে কথা। এখন গ্রামবাসীদিগের নিয়ম দেখা যাক্। তথায় অতিথিসেবার নিয়মগুলি সহর হইতে বিভিন্ন নহে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলি সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। আজকাল জাপানের গ্রামেও দোকান, হোটেল ইত্যাদি হইয়াছে, কিন্তু গ্রামবাসীরা প্রাচীন নিয়মগুলি রক্ষা করিবার জন্য বাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অতিথিকে খাওয়ায়। আমি অনেকবার গ্রামে অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম। তাহারা প্রথমে স্বহস্তে প্রস্তুত পিঠা দিয়া অভ্যর্থনা করিল—অবশ্য সহরের কেকের মত মিষ্ট নয় বটে কিন্তু তাহার একটা আলাদা আস্বাদ। তা ছাড়া আপনার স্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্য অপরকে খাওয়াইতে কাহার না আনন্দ হয়? সুতরাং অতিথির পক্ষে সহর অপেক্ষা গ্রামে যাওয়া অত্যন্ত শান্তিকর। এই ভাবটা আমাদের দেশের অপেক্ষা আপনাদের দেশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদের গ্রামগুলি দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীন ভারতের অতিথি সেবার চিত্রগুলি এখনও আপনাদের গ্রামে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষকে তাহার সহরগুলি নষ্ট করিয়াছে। জাপানেও তেমনি। প্রাচীন জাপানের চিত্র অধুনা গ্রামবাসী-দিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

আর, কিমুরা

চির-সঙ্গী

শয়নে স্বপনে সঙ্গী, সহায় শান্তি সুখের নিশানা
মরণেও তুমি চল সাথে সাথে ওগো স-বালিস বিছানা।

বঙ্গ-বন্দনা

জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা—

শীর্ষ উজলি রাজে, শুভ্র তুষার ভার,
বক্ষে শোভিছে শুভ্র গঙ্গা-যমুনা-হার ;
সন্ধু নীলাভ জল   চুম্বে চরণ তল
উর্ম্মিল প্রীতিরাগ ছন্দা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

কুঞ্জ-কানন ঘিরি গুঞ্জরে যত পিক্,
নন্দিত কল-গানে ঝঙ্কৃত দশদিক্ ;
পুষ্পিত তরুদল   ভূষিত ভূমিতল
অঞ্চল ফুল মধু গন্ধা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

কর্ম্ম দণ্ড করে ভাস্কর মহীয়ান—
নিত্য প্রভাতে আসি জাগ্রত করে প্রাণ,—
অন্তরে বহি প্রীতি   মন্থরে আসে নিতি
ঝিল্লী মুখর মধু সন্ধ্যা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

রুদ্র বৈশাখে হেরি দীপ্তি আলোর খেলা,
মুক্ত বরষাধারে সিক্ত চিকুর মেলা,
শান্ত শরতে একি   উৎসব সাজে দেখি
সর্ব্ব বেদন শোক-হন্তা !
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

ধান্যের ঝাঁপি হাতে হেমন্তে হেরি তোমা,
শীতের জড়তা নাশ ঝঙ্কারি বীণা ও'মা ;
ফুল্ল ফাগুনে মন   রসে ভরা রসায়ন,
পুণ্যপীযূষ প্রেমানন্দা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

'চণ্ডী'—'প্রসাদ' কত কাব্য পাপিয়াগণ—
গুঞ্জ তোমার পিয়ে ধন্য করিল মন,—
ধর্ম্মের কত নেতা   সিদ্ধি লভিল হেথা,
বিশ্বে দেখাল আলো পন্থা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

লক্ষ্মী বিরাট তব কক্ষ করিল আলা,
বিশ্ব সরস্বতী কণ্ঠে পরাল মালা ;
মঞ্জু মরম মাঝে   অক্ষয় জ্ঞান রাজে
ধ্যান-নিরতা জ্ঞানা-নন্দা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

দেবজন বাঞ্ছিত—কোটি প্রাণ বন্দিত,
নদনদী মণ্ডিত—সঙ্গীত মুখরিত ;
উল্লাসময় চিত   সুন্দর সুখে ভিত,
অঞ্চল ফুলমধু গন্ধা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা !

[রচনা—অজানা]   [সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

নটনারায়ণ—ঢিমে তেতালা।

আস্থায়ী।

০ (সা) … ১ (মা) … ২ (গা) … •• (পপা)
II {সা -মমা মা মা | মা মা মা মা I গা -পা পপা পা |
শী ০র্ ষ উ জ্ব লি রা জে শু ০ ভ্র তু

• (পা) … ০ (মা) … ১ (মা)
| পা পা পা -া | মা -া মা মা | মা মা ধা পা I
যা র ভা র্ ব ০ ক্ষে শো ভি ছে শু ভ

২´ ৩ ০
I মা -গা গা মা | রা রা সা -া } | র্সা -া ধা র্সা |
গ ঙ্ গা য মু না হা র্ সি ন্ ধু নী

১ ২´ ৩
| র্সা র্সা র্সা র্সা I না -া ধা পা | পা না ধা ধা |
লা ভ জ্ জ চু ম্ বে চ র ণ ত ল

০ ১ ২´
| র্সা -া ধা পা | না -া ধা -া I রা -পা মা -পা |
উ র্ মি ল প্রী ॰ তি ॰ রা ॰ গ ॰

৩
| ধা -া পা -া | ধুয়া II
ছ ন্ দা ॰

অন্তরা।

০ ১ ২´
II { মা -ধধা ধা ধা | ধা ধা ধা ধা I পা -র্সর্সা র্সা র্সা
১ কু ॰ ঞ্জ জ কা ন ন ঘি রি জ ॰ ঞ্ জ রে
২৫ 'চ ॰ ন্ ডী' 'প্র সা দ' ক ত কা ॰ ॰ ব্য পা

| র্সা র্সা র্সা -া | ধা -া র্রা র্রা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
২ য ত পি ক্ ন ন্ দি ত ক ল গা নে
২৬ পি য়া গ ণ্ স্ত ॰ ন্ত তো মা র পি য়ে

২´ ৩ ০
I পা -া ধা না | র্সা র্রা না -র্সা } | { না -র্রা র্সা না |
৩ ঋ ং ক্ত ত দ শ দি ক্ পু ষ্ পি ত
২৭ ধ ॰ ন্ত ক রি ল ম ন্ ধ র্ মে র

১ ২´ ৩
| ধা পা মা গা I সা -া রা গা | মা পা গা মা |
৪ ত রু দ ল ভূ ০ ষি ত ভূ মি ত ল
২৮ ক ন্ত নে তা সি দ্ ধি ল ভি ল হে থা

| মা -ধধা পা পা | মা মা গা মা I রা -গা -মা -পা
৫ অ ০ঞ্ চ ল ফু ল ম ধু গ ০ ০ ন্
২৯ বি ০ ০ শ্বে দে খা ল আ লো প ০ ০ ন্

| মা -া -া -া } | ধূয়া II
৬ ধা ০ ০ ০
৩০ থা ০ ০ ০

সঞ্চারি।

০ ১ ২´
II { সা -রা সা মা | -া মা মা মা I রা -া পা পা
৭ ক র্ ম দ ন্ ড ক রে ভা ০ স্ব র
১৯ ধা ০ ন্যে র ঝা পি হা তে হে ০ মন্ তে
৩১ ল ক্ষ্ মী বি রা ট ত ব ক ০ ক্ষ ক

| পা পা পা -া | মা -া ধা ধা | ধধা ধা ধা ধা I
৮ ম হী য়া ন্ নি ০ ত্য প্র ভা০ তে আ সি
২০ হে রি তো মা শা ০ তে র জড় তা না শ
৩২ রি ল আ লা বি শ্ব স র স্ব তী কন্ ঠে

২´ ৩ ০
I না -া না র্সা | ধা নর্সা র্সা -া } | { মা -া মা ঋা |
৯ জা ০ গ্র ত ক রে০ প্রা ণ্ অ ন্ ত রে
২১ ঝ ং কা রি ণী ণা০ ও মা ফু ল্ ল ফা
৩৩ প ০ রা ল মা ০ ০ লা ০ ম ঞ্ জু ম

১ ২´ ৩
| মা মা মা মা I পা -া পা পা | পা পা পা পা
১০ ব হি প্রী তি ম ন্ থ রে আ সে নি তি
২২ গু নে ম ন্ র সে ভ রা র সা য় ন্
৩৪ র ম মা ঝে অ ০ ক্ষ য় জ্ঞা ন রা জে

০ ১ ২´
| ম্রা -ধা পা পা | মা মা গা মা I রা -গা -মা -পা
১১ ঝি ল্ লী মু খ র ম ধু স ০ ০ ন্
২৩ পু ০ ণ্য পী যূ ষ প্রে মা ন ০ ০ ন্
৩৫ ধ্যা ০ ন নি র তা জ্ঞা না ন ০ ০ ন্

| মা -া -া -া } | ধুয়া II
১২ ধ্যা ০ ০ ০
২৪ দা ০ ০ ০
৩৬ দা ০ ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´
II { পা -ধা পা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I না -র্সা র্রা র্রা |
১৩ রু ০ দ্র বৈ শা খে হে রি দী প্ তি আ
৩৭ দে ব জ ন বা ঞ্ছ্ ছি ত কো টি প্রা ণ

৩ ০ ১
| র্রা -া র্রা র্রা | র্রা -র্মা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
১৪ লো ল্ খে লা মু ক্ ত ব র ষা ধা রে
৩৮ ব ন্ দি ত ন দ ন দী ম ন্ ডি ত

২´ ৩ ০
I না -র্সা ধা ধা | পা পা পা পা } — { মা -া মা মা |
১৫ সি ক্ ত চি কু র মে লা শা ন্ ত শ
৩৯ স ং গী ত মু খ রি ত উ ল্ লা স

	১				২´				৩			
	| পা	পা	ধা	পা I	মা	-গা	মা	মা |	রা	রা	সা	সা |
১৬	র	তে	এ	কি	উ	ং	স	ব	সা	জে	দে	খি
৪০	ম	য়	চি	ত	সু	ন্	দ	র	সু	শো	ভি	ত

	০				১				২´			
	| সা	-া	রা	গা |	মা	পা	ধা	পা I	মা	-গা	-মা	-পা |
১৭	স	র্	ব্ব	বে	দ	ন	শো	ক	হ্	০	০	ন্
৪১	অ	ন্	চ	ল	ফু	ল	ম	ধু	গ	০	০	ন্

	৩				
	| মা	-া	-া	-া)	| ধুয়া II
১৮	তা	০	০	০	
৪২	ধা	০	০	০	

ধুয়া ঃ—

(নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেকবার গেয়)।

০				১				২´			
| রা	-া	-া	-া |	র্সা	-া	-া	-া I	না	-ধধা	পা	না |
জ	০	০	০	য়	০	০	০	ব	ঙ্ গ	জ	ন

৩				০				১			
| ধা	-া	-া	-া |	রা	গা	পা	-া |	মা	-া	-া	-া I
নী	০	০	০	চি	র	ব	ন্	স্থা	০	০	০

২´				৩				০			
I রা	-া	-া	-া |	র্সা	-া	-া	-া |	না	-ধধা	পা	না |
জ	০	০	০	য়	০	০	০	ব	ঙ্ গ	জ	ন

১				২´				৩			
| ধা	-া	-া	-া I	রা	গা	পা	-া |	মা	-া	-া	-া II
নী	০	০	০	চি	র	ব	ন্	স্থা	০	০	০

ঘোষ পাড়া

কর্ত্তাভজার দল

এটা অনুমান করা একটা মস্ত ভুল যে এদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে চলিয়া গিয়াছে। এখনও এদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের অবাধ রাজত্ব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাহারা নিজেরা না জানিয়া বৈষ্ণবধ্বজার নীচে বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা ও অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায় 'শূন্যবাদী' ছিলেন, তাঁহাদের পদ্ধতিতে "ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং" এই রকমের একটা কথা আছে। একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তুমি কি চৈতন্য বিগ্রহের পূজা কর?" সে দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিল "বলেন কি মহাশয়! আমরা কি বিগ্রহ পূজা করিতে পারি? চৈতন্যদেব তো 'শূন্য মূর্ত্তি।'" মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৌদ্ধবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু শাখা এই বৌদ্ধ মতেরই সাধনা করিতেছে, ইঁহারা "সহজিয়া" "কর্ত্তাভজা" "রামবল্লভী" "কিশোরী ভজক" প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। চৈতন্যপ্রভুর নামাঙ্কিত হইয়া মেকী চলিয়া আসিতেছে;—সহজিয়া "জ্ঞানাদ-সাধন" পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে ব্রাহ্মণ ও বেদের যথোচিত নিন্দা আছে, এই পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। ইহাতে "নীলনীরদবর্ণ কৃষ্ণের" সম্বন্ধেও টিট্‌কারী আছে। অথচ লেখক নিজকে বৈষ্ণবদের একশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে 'নারীপূজা'র যে মত প্রচলিত আছে এবং যাহা চণ্ডীদাস রামীর প্রেমোপলক্ষে বিচিত্র কবিতার ছন্দে প্রচার করিয়াছেন, সেই নারীপূজা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিশত শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন কোন পাণ্ডা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের মধ্যে কর্ত্তাভজার দল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের বৃহৎ তরুবর যখন ব্রাহ্মণ্য আক্রমণে ধ্বংসমুখে পতিত হইল, তখন শত শত বৎসর যাবৎ যে মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার শিকড় রহিয়া গেল, এবং সেই শিকড় হইতে নূতন নূতন অঙ্কুর জন্মিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র খড়দহ গ্রামে ২৫০০ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; ইহারা হিন্দুসমাজের দরজা ঠেলিয়া তাহাতে প্রবেশ পায় নাই। লোকচক্ষুতে ইহারা একান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছিল। বীরভদ্রের কৃপায় ইহারা বৈষ্ণবশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া গেল।

'আউল' নামধারী এক ব্যক্তি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে 'বোয়ালে' নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন। ইঁহার জীবন একটা প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন, নবযৌবনে প্রায় ২০ বৎসর কাল ইনি নিরুদ্দিষ্টভাবে

কোথায় ঘুরিয়া অনেক হারানো জ্ঞান আনিয়া সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বাবিংশটি শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহার দলের লোকেরা কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় রং ফলাইয়া ইঁহাকে আঁকিয়া রাখিয়াছেন, সেই চিত্র দেখিলে ইহাকে সাধু ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়—একটি পদ এইরূপ ঃ—

"এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এল
এর নাইক রোষ, সদাই তোষ
মুখে বলে ' সত্য বল '।
এর সঙ্গে বাইশ জন,
সবার একটি মন,
জয় কর্ত্তা বলি বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢল ঢল।"

এই কর্ত্তাভজাদলের প্রবর্ত্তক প্রকৃতই জনসাধারণের গুরু ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। ইঁহাদের একটা সাহিত্য আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের প্রভাব বর্জ্জিত। সকলে যে কথা বোঝে সেই সকল অতি সরল সুমিষ্ট কথায় ইহাঁদের গীতি সাহিত্য পুষ্ট।

সতীমায়ের দাড়িম্ব বৃক্ষ।

ইঁহারা জনসাধারণের ভাষায় যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে কতকগুলি কথা প্রচলিত আছে, তাহা ইঁহারা নিজেরাই ব্যবহার করেন এবং নিজেরাই বুঝিয়া থাকেন। ভাষা সরল হইলেও প্রহেলিকাময়। কিন্তু কোন কোন গান বড়ই মধুর। আমরা পাখীর কাকলী যেমন বুঝি না, সেগুলিও তেমনি বুঝি না; কিন্তু তাহা প্রাণ স্পর্শ করে—তাহাদের অস্পষ্ট ও মধুর ইঙ্গিত দ্বারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লালশশী নামক এক কর্ত্তাভজা কবি এইরূপ শত শত গান রচনা করিয়াছিলেন। ঢাকার

কবিরাজ পার্ব্বতী চরণ কবিশেখর তাঁহার অতি চমৎকার চারুদর্শন নামক উপন্যাসে এই সম্প্রদায়ের কতকগুলি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। কর্ত্তাভজাদের একটি গানে আছে,—"মন তুমি তুফানে পড়িলে তরঙ্গের দিকে তাকাইয়া থাক কেন—ইহাতে তোমার কেবল ভয়ই বাড়িয়া যাইবে। একবার কর্ণধারের দিকে চেয়ে দেখ, ঢেউএর দিকে চেও না।"

বাবা আউলের "মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবি কর্ত্তাভজা" পদ অনেকেই জানেন,—সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিলে ইঁহাদের ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার হয় না।

বাবা আউলের বাইশটি শিষ্যের নাম—হটু ঘোষ, বেচুঘোষ, আনন্দরাম, নিতাইঘোষ, রামশরণ পাল, নয়ন, লক্ষ্মীকান্ত, নিত্যানন্দ দাস, খেলারাম উদাসীন, মনোহর দাস, বিষ্ণুদাস, কিনু, গোবিন্দ,

সতীমায়ের পুকুর।

কৃষ্ণদাস, হরিঘোষ, কানাইঘোষ, শঙ্কর, শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায় রজপুত, পাঁচু রুইদাস, নিধিরাম ঘোষ, শিশুরাম।

কর্ত্তাভজারা আউল চাঁদকে গৌরাঙ্গদেবের অবতার বলিয়া মনে করেন।

ঘোষ পাড়ার রামশরণ পালই এই শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, রামশরণ পালের পত্নীই 'সতী মা' বা 'কর্ত্তা মা' আখ্যায় আখ্যাত হন এবং কর্ত্তাভজাদের চিরপূজ্য হইয়া আছেন। রামশরণ ও তাঁহার স্ত্রীর তিরোধানের পর তাঁহাদের পুত্র রামদুলাল পাল গদি অধিকার করেন। তারপর রামদুলালের বিধবা পত্নী গদির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ক্রমান্বয়ে এই গদি অধিকার করিয়া বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের বংশধরেরা সেই পদ পাইয়াছেন।

এই গদির অধিকার একটা সামান্য কথা নহে। বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই গদির সম্মানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। গদির অধিকারী বা অধিকারিণী, ঠাকুর-ঠাকুরাণী নামে

অভিহিত। বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণও এই গদিতে অভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট মাথা নোয়াইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসে যে দোল হয় তাহাতে একটি মেলা বসিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোক এই উপলক্ষে ঘোষ পাড়ায় উপস্থিত হয়, এই মেলা বঙ্গদেশের কুম্ভমেলা স্বরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় ইংরেজী পড়ুয়াগণ নিজেদের বিপুল শ্লাঘায় অহঙ্কৃত হইয়া জনসাধারণের এই সকল বিরাট অনুষ্ঠানের কোনই খোঁজ রাখেন না। তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ মেলায় উপস্থিত হইতেন, তবে তাহারা বিল, রিশ ডেবিস, এবং সিলভান লেভীর পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। "সন্ধ্যা-ভাষা"র ব্যূহ ভেদ করিয়া কর্ত্তাভজাদের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে মহাযানের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান হইত। কিন্তু আমরা কেরাণীর জাতি, নকল করিবার জন্যইত আমাদের জন্ম। সে দুঃখের কথা পাড়িয়া এখানে কোন লাভ নাই।

সতীমায়ের অশ্বথ বৃক্ষ।

ঘোষ পাড়ার এই পালদের অনেক অলৌকিক সাধনাবলের কথা প্রচলিত আছে। তাঁহারা দেহতত্ত্ব সাধনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেক আত্মিক শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন,—অনেক অসাধ্য রোগ ইঁহারা ভাল করিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন, যে তাঁহার মুমূর্ষু পত্নীকে যখন কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ডাক্তারগণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তখন এক কর্ত্তাভজাদলভুক্ত রমণী অতি আশ্চর্য্যভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ সকল ব্যাপারে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, তাহা গ্রাহ্য করার অন্ধ বিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

ঘোষ পাড়ার ঠাকুরের অধীনে বাঙ্গালার নানাস্থানে "মহাশয়েরা" আছেন, তাঁহাদের শিষ্য সেবকে এদেশ পূর্ণ। এই মহাশয়দের মধ্যে মুসলমানও আছেন, ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা তাঁহার পদধূলি

লইতে দ্বিধা বোধ করেন না। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন "পরমভক্ত হিন্দু শিষ্যেরাও গোপনে গোপনে গিয়া তাঁহার প্রসাদ খাইয়া থাকেন।"

পালদের গদির একটা ছবি ৪২৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। 'সতী মায়ে'র রোপিত দাড়িম্ব গাছটি তাহার দক্ষিণ দিকে দেখিতে পাইবেন, ঐ গাছতলার মাটী মাথায় ধারণ করিয়া শত শত রোগী নীরোগ হইয়া থাকে—এই প্রবাদ।

৪৩০ পৃষ্ঠার ছবিটি 'সতীমায়ে'র পুকুরের। ঐ পুকুরে স্নান করিলে নাকি অন্ধ চক্ষুষ্মান হয় এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে।

৪৩১ পৃষ্ঠার ছবিখানি 'সতীমায়ে'র রোপিত অশ্বত্থ বৃক্ষের। উহার সম্বন্ধেও নানারূপ অলৌকিক প্রবাদ আছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অসহযোগ নীতি ও চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সম্মেলনী

ইতিপূর্ব্বে অসহযোগ-নীতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু নূতন বলিবার আমাদের নাই। তবে চট্টগ্রামে গত প্রাদেশিক সম্মেলনীতে যাইয়া নিজে যতটা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি—তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব।

ষ্টীমারে উঠিয়া প্রথমেই যাহা দেখিলাম তাহা এ জীবনে ভুলিবনা। কত উকীল, অধ্যাপক, জমিদার মহাত্মা গান্ধীর দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হয়। চক্ষে তাঁহাদের কি উৎসাহ—মুখে কি শান্তভাব! দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই যাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়াছেন—দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ যাঁহাদের মূলমন্ত্র—তাঁহাদের একত্র সম্মিলিত দেখিয়া হৃদয় পবিত্র হইল!

চট্টগ্রামে যাইয়া প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে খদ্দরের প্রচার। দুই একজন লোক ব্যতীত যাহাদিগকে দেখিলাম সকলেই খদ্দর-পরিহিত। প্রাদেশিক সম্মেলনীতেও চরকা ও খদ্দরের প্রচার বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। 'প্রায়' এইজন্য বলিলাম যে কলিকাতার তিনজন কিম্বা চারিজন ভদ্রলোককে চরকা কিম্বা খদ্দরে বিশেষ আস্থাবান বলিয়া মনে হইল না। একজন সেই পুরাতন স্বদেশীযুগের নেতার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় চরকার প্রচলন অসম্ভব এবং খদ্দর পরিধান করিলে ফরাশডাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি যায়গার

তাঁতিদের যে শুধু অনিষ্ট করা হইবে তাহাই নহে, পরন্তু বাঙ্গালার একটা প্রধান কলা-কীর্ত্তি নষ্ট করা হইবে। চরকা কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে কিনা—এ প্রশ্নটা আমার মনে হয়, লোকে যতটা সহজে সমাধান করিবার চেষ্টা করে ঠিক ততটা সহজ নয়। লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে হইলে শুধুই টাকা আনায় লাভ লোকসান খতাইলে চলিবে না। অনেক এমন জিনিষ আছে যাহা আপাততঃ দামে সস্তা—কিন্তু যাহা স্বাস্থ্যের দিক হইতে বা নৈতিক দিক হইতে একেবারেই বর্জ্জনীয়। কলের কুলীরা কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। তাহারা যে কেবলমাত্র কলের অংশীভূত হইয়া যায় তাহাই নয়—তাহারা অধিকাংশই মদ্যপায়ী ও ঘোর পাপাচারী হইয়া উঠে। জাতীয় জীবনের এই যে নৈতিক অবনতি ইহার মূল্য কি কেহ কোনও দিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ? এ সম্বন্ধে আর এক প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা এই যে চরকায় কাটা সূতায় সমস্ত দেশের লোকের বস্ত্র তৈয়ার হইতে পারে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দুইটী বক্তব্য আছে—প্রথমতঃ—শুধু আমাদের দেশের কেন সকল দেশেরই এমন একদিন গিয়াছি যে হাতে কাটা সূতা হইতেই দেশের বস্ত্র-প্রশ্নের সমাধান হইত ; এবং দ্বিতীয়তঃ—এখন যে সমস্ত বেকার লোক বসিয়া শুধু দেশের অন্নধ্বংস করে বা যাহারা বৎসরের মধ্যে ৩।৪ মাস পরিশ্রম করে এবং বাকি সময় অলসভাবে বসিয়া থাকে তাহারা সকলেই যদি দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া চরকায় মন দেয় তাহাহইলে এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। অসহযোগপন্থীদের সহিত অবশ্য একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না যে দেশের সমস্ত লোক অন্য সমস্ত কায ছাড়িয়া চরকা কাটিতে আরম্ভ করুক—কারণ তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না এবং অন্নবস্ত্রের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরও অনেকগুলি সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে। চরম-পন্থী এবং চরকার বিরুদ্ধ-পন্থী উভয় পক্ষই চরকা সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন। আমার বিশ্বাস যে এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া যদি দেশনেতারা চরকার যথার্থ প্রচলন কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন (যেরূপ চট্টগ্রামে, নোয়াখালিতে ও ঢাকার স্থানে স্থানে হইয়াছে) তাহা হইলে দেশের প্রকৃত ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে ইংলণ্ডের মত কলকারখানাবহুল দেশে এখনও ৫ কোটি চরকার কায চলে এবং শুধু ইংলণ্ডেই জগতে যত চরকা আছে তাহার ⅙ অংশ চরকা আছে। সেইজন্যই আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে এখনও চরকা প্রচলনের যথেষ্ট আবশ্যকতা ও অবসর আছে, এবং কংগ্রেসের নেতারা সহর ছাড়িয়া দিয়া যদি গ্রামে গ্রামে চরকার কার্য্য চালান, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে ম্যাঞ্চেষ্টারের কবল হইতে স্বাধীন হইতে পারিব। সহর ছাড়িয়া দিবার কথা আমি এইজন্য বলিলাম যে সহরের লোকেরা অধিকাংশই কার্য্যান্তরে ব্যস্ত এবং যাঁহাদের কোনও কার্য্য নাই তাঁহারা বিলাসী ও আয়েসী। এ বিষয়ে আমাদের গুরু পুজ্যপাদ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় যাহা করিতেছেন তাহা সকলের অনুকরণীয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে খদ্দর সম্বন্ধে। অনেকের ধারণা এই যে আজ এই কলকারখানার যুগে তাঁতে প্রস্তুত কাপড় কলের তৈয়ারী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না সুতরাং অর্থনীতির দিক হইতে দেখিলে তাঁতের প্রচলনের কোনই আবশ্যকতা নাই। এই কথাটার অযৌক্তিকতা অনেক দিন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রাদেশিক সম্মিলনী তাঁতের আরও বহুল প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমি নিজে দেখিয়াছি যে দেশের অনেক স্থানে কিছু দিন পূর্ব্বেও তাঁতিদের দিন গুজরান হওয়াও কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল এবং অধিকাংশ তন্তুবায়ই নিজেদের কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতেছিল। কিন্তু আজ প্রত্যেক তাঁতি ঘরে বসিয়া এবং গৃহস্থালির অন্যান্য কার্য্য করিয়াও মাসিক ৩০।৩৫ টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতেছে। এমন কি অনেক ভদ্র সন্তানও আজকাল এই কার্য্য করিয়া স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এটা আশা করা যায় যে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং যে কার্য্য তাঁহার উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সেই কার্য্য করিতে আমাদের তথাকথিত ভদ্র সন্তানেরা ঘৃণা বোধ করিবেন না।

এ বৎসরের সম্মেলনে যাইবার পূর্ব্বে আমার একটা ধারণা ছিল যে, অসহযোগীরা তাঁহাদের কার্য্যে আর কাহারও সহযোগ ইচ্ছা করেন না। কিন্তু এবার সম্মেলনীতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার পর আর কাহারও এরূপ ধারণা পোষণ করা সঙ্গত হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনী দেশের সকল লোককেই তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন—এবং যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই আহ্বান শুধু মৌখিক নয়—এই আহ্বান অন্তরের আহ্বান। বার্দ্দোলিতে আহুত ভারতীয়মহাসভার নিদেশ এখন প্রত্যেক দেশবাসীর অবশ্য প্রতিপাল্য—এবং সেই নিদেশ-পালনে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর আহ্বান যে অরণ্যে রোদন হইবে না ইহা আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

এবার সম্মেলনীর কার্য্যে অনেক হিন্দু গৃহস্থ রমণী যোগ দিয়াছিলেন—ইহা বড় আনন্দের ও আশার কথা। আমাদের প্রত্যেক রমণীর মনে যতদিন না দেশাত্মবোধ জাগিতেছে ততদিন দেশের কল্যাণ কল্পনাই করিতে পারি না। জাহাজে ১৫ দিন কাটান হিন্দু রমণীর পক্ষে কত কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়—কিন্তু তাঁহারা সেই কষ্ট তুচ্ছ করিয়া দেশের কাযে যোগ দিয়াছিলেন—ইহা আমাদের গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের আদর্শ প্রত্যেক হিন্দু রমণীর আদর্শ হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সম্মেলনীর নিদেশ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অসহযোগনীতির প্রথম প্রবর্ত্তনকাল হইতেই আমরা দেখিতেছি যে এই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অসহযোগীদের মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ আছে। মহাত্মা গান্ধী যখন আমাদের ছাত্রগণকে

স্কুল কলেজ ত্যাগ করিতে বলেন—তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের কাযে ব্রতী হইতে। তিনি চাহিয়াছিলেন এই জাতীয় মহা আহবে তাঁহাদিগকে সৈন্যরূপে। যুদ্ধের সময় সৈনিকের যুদ্ধ শিক্ষা করা ও যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোনই কর্ত্তব্য নাই।

শ্রীযুক্ত লজপৎ রায়ও বলিয়াছেন যে স্বরাজ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই মতদ্বয় সমর্থন না করিলেও বেশ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের নেতারা বাঙ্গালী ছাত্রদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, জাতীয় মহাবিদ্যা-পীঠের কথা প্রথম উত্থাপন করেন এবং সেই কথামতই কলিকাতা পীঠের বা National Universityর স্থাপনা হয়। উক্ত পীঠে শিক্ষা কিরূপ দেওয়া হয় তা' আমার জানা নাই। (শিক্ষকদিগের নাম হইতে মনে হয় শিক্ষা ভালই হয়) — কিন্তু উহা কি হিসাঁবে জাতীয় শিক্ষা তাহা এখনও আমি সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। উক্ত পীঠের বিষয় নির্ব্বাচন (Curriculum) ও পরীক্ষার ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয় যে উহা আমাদের "বিজাতীয়" বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই একটা ছোট খাট অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাস্তবিক, ইহাই যদি আমাদের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা হয় তাহা হইলে আমাদের বলিতে হইবে যে আমরা এখনও জাতীয়তার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমাদের এখন শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে আমি এবার চট্টগ্রামে এবং সেখানে যাইবার এবং সেখান হইতে আসিবার পথে অনেক অসহযোগ-নেতার সহিত আলোচনা করিয়াছি। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতেই আমি জাতীয় শিক্ষা-বিধির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই; বরং ইহাই আমার মনে হইয়াছে যে এই বিষয়ে কেহই বিশেষভাবে চিন্তা করেন নাই। আর এক শ্রেণীর নেতাগণের মতে এখন আমাদের শিক্ষা-বিষয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়--কেবলমাত্র চরকা ও খদ্দরের প্রচলনই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে। কোনও কোনও অসহযোগী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর নিতান্তই বিরূপ এবং উহার ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন—আবার কেহ কেহ বলিলেন যে অতঃপর আর তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয় "ভাঙ্গিতে" (Wreck) চেষ্টা করিবেন না। ফলতঃ এই সমস্ত আলোচনার পর ইহাই আমার ধারণা যে অধিকাংশ অসহযোগীরই লোক-শিক্ষার উপর বিশেষ অনুরাগ নাই এবং যাঁহাদের কিছু অনুরাগ আছে তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা নাই। চরকা ও খদ্দরের প্রচলন অতি আবশ্যক কার্য্য সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার অসহযোগী বন্ধুগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন যে লোক-শিক্ষা ব্যতীত কখনও লোকমত গঠন করা যায় কিনা এবং লোকমত গঠন করিতে না পারিলে দেশের স্থায়ী উন্নতি হওয়া সম্ভবপর কি না। তাঁহাদিগের নিকট আমার আর একটি নিবেদন এই যে তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন যে দেশে শিক্ষা বিষয়ে যাঁহারা জীবনপাত করিতেছেন—তাঁহারা তথাকথিত সহযোগীই

হউন বা অসহযোগীই হউন—তাঁহাদের মত আহ্বান করিয়া এবং তাঁহাদের সাহায্য লইয়া এই লোকশিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য কি না। জাতীয় শিক্ষা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। সেই জন্যই আমরা জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের সহযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের অসহযোগী বন্ধুরা যদি তাঁহাদের মহান্ আত্মত্যাগ ও গভীর আন্তরিকতা বর্ত্তমান শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার সহিত মিলিত করেন তাহা হইলে অচিরে আমরা জাতীয় শিক্ষার একটা পদ্ধতি স্থির করিতে পারিব এবং সেই জাতীয় শিক্ষাকেই আমাদের দেশের চিরস্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি করিতে পারিব। আশা করি আমার এই বিনীত নিবেদন অরণ্যে রোদন হইবে না।

কন্‌ফারেন্সের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল অস্পৃশ্যতা নিবারণ সম্বন্ধে। বিষয়ের গুরুত্ব-হিসাবে কিন্তু আলোচনা অতীব সংক্ষেপে হইয়াছিল। শুধু বার্দ্দোলির নিদেশের দোহাই দিয়াই প্রস্তাবটি প্রায় বিনা আলোচনায় গৃহীত হইয়াছিল। বাংলা দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অস্পৃশ্যতা একেবারে দূর করা সম্ভব কিনা—এবং সম্ভব হইলেও উহা সমীচীন কি না—বা উহা দূর করিতে হইলে আমাদের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত এই সমস্ত অত্যাবশ্যক কথা প্রাদেশিক সম্মেলনীর বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। অস্পৃশ্যতা যে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে একটা প্রধান অন্তরায় সে বিষয়ে বোধ হয় আজকাল আর বড় একটা মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক যে ঐ নিয়ম আধুনিক হিন্দু-সমাজের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং আমার মনে হয় সে সামাজিক বিশৃঙ্খলা না ঘটাইয়া ঐ নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল করিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে বৎসরের মধ্যে একদিন তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতির সহিত একত্র বসিয়া পংক্তিভোজন করিলেই আমাদের মধ্যে একতা আসিবে এবং জাতীয় জীবন উন্নতির পথে ধাবিত হইবে—তাঁহাদের সহিত আমরা কোনওরূপে একমত হইতে পারি না। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "তরুণ ভারত"-পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। বাস্তবিকপক্ষে, অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইলে তথাকথিত পতিত জাতির উন্নতি-বিধান করিতেই হইবে—এবং সেই উন্নতি-বিধানের একমাত্র উপায় ত্যাগ ও সেবা। ত্যাগ ও সেবার একটি দৃষ্টান্তে যাহা সাধিত হইবে তাহা শত সহস্র পংক্তিভোজনেও হইবে না। পতিত জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দুর্ভিক্ষে তাহারাই প্রথমে আঘাত পায়—মহামারীর উৎসাদন তাহাদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়—তাহাদের এই সমস্ত দুঃখ ও অভাব দুর করিবার জন্য আমরা কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছি? শুধু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বা নিদেশ দান করিয়া ত কিছুই হইবে না—সেই জন্যই আমি অসহযোগ-পন্থীদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই! তাঁহাদের ত্যাগ আছে—তাঁহাদের আন্তরিকতা আছে—তাঁহাদের সহিষ্ণুতা আছে—তাঁহাদের দ্বারাই ত এই মহাকার্য্য সম্ভব।

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর "নিরুপদ্রব অবাধ্যতা" (Civil disobedience) প্রস্তাব সম্বন্ধে

দুইএক কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ঐ প্রস্তাব কন্‌ফারেন্সে গৃহীত বা আলোচিত হয় নাই কারণ তিনি সভানেত্রীর বিশেষ অনুরোধে উহা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। বার্দ্দোলির পর "নিরুপদ্রব অবাধ্যতা"র কথাই উত্থাপন করা বন্ধ এবং অসহযোগীরা কংগ্রেসের নিদেশ অনুসারে তাঁহাদের এই ব্রহ্মাস্ত্র এখন প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু সরকারের সহিত তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষে তাঁহারা আর কি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন বা করিবেন ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সরকার অসহযোগ-আন্দোলন দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন,—ভারতীয় দণ্ডবিধির অস্ত্রাগার হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন—এ অবস্থায় অসহযোগীদের শুধু সুদর্শনচক্রে কি কায হইবে? এ অসমঞ্জস যুদ্ধ আর কতদিন চলিবে?—তাই বলিতেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আর একটা কথা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং সে কথাটা এই যে অহিংস-অসহযোগ একটা উপায় মাত্র—আমাদের লক্ষ্য স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ। আমার মনে হয় যেন অনেক সময়েই আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া উপায়টার উপরেই বড় বেশী দৃষ্টি রাখিতেছি। ঘটনাবিশেষে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপরে পরিবর্ত্তন করা অবিধেয় বা অসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং যখন অহিংস-অসহযোগের প্রধান অস্ত্র "নিরুপদ্রব অবাধ্যতা" ছাড়িয়া দিতে হইল—তখন অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা-ভেদের সময় আসিয়াছে কি না তাহা আমি আমার অসহযোগী বন্ধুদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের চট্টগ্রাম যাত্রার সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া আমার পক্ষে এ প্রবন্ধ শেষ করা অসম্ভব। যাতায়াতের পথে অসহযোগী বন্ধুগণের আদর আপ্যায়ন এবং চট্টগ্রামে যে মহাত্মার অতিথি হইয়াছিলাম তাঁহার আন্তরিক আতিথেয়তা আমার চট্টগ্রাম প্রবাসের স্মৃতিকে চিরকাল মধুময় করিয়া রাখিবে। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতার উদ্বোধন

১

সেদিন সপ্তমী। সকাল বেলা ছেলে পিলেদের নিয়ে পূজোর বাজার কর্‌তে বেরোন গেল। কলেজ ষ্ট্রীটের একখানা দোকানে বসে' দুএকটী পোষাক পরিচ্ছদ পছন্দ করচি, এমন সময় একজন আধা বয়সী লোক—পরণে একখানা ময়লা ধূতি, গায়ে একটা ময়লা সার্ট, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া

চটী, চুল উস্কো খুস্কো—দেখ্‌লেই কেমন পাগ্‌লাটে বলে মনে হয়—খুব আস্তে ব্যস্তে সেই দোকানে প্রবেশ করে' দোকানের একজন কর্ম্মচারীর পায়ের কাছে একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বল্‌ল—"আমাকে মশায় শীগ্‌গির করে' একখানা জরি পেড়ে সাড়ী দিন্ দেখি? দেখ্‌বেন কাপড়খানা যেন একটুকু ভাল হয়।" সেই কর্ম্মচারী লোকটীকে বস্‌তে বলে' একটা কাপড়ের গাঁট খুলে দু'চারখানা জরি পেড়ে সাড়ী তা' থেকে বার করে' আগন্তুকের হাতে দিয়ে বল্‌ল—"দেখুন মশায় কোন খানা পছন্দ হয়?" আগন্তুক না বসে', দাঁড়িয়ে দাড়িয়েই বল্‌ল—"আমার মশায় পছন্দ টছন্দ নেই। আপনিই একখানা ভাল দেখে' বেছে দিন্, আর দাম যত হয় নিন্——"

অবশেষে দোকানের সেই কর্ম্মচারী একখানা কাপড় তার হাতে দিয়ে বল্‌ল,—"এইখানা নিন্ মশায়—অল্প স্বল্পের মধ্যে মন্দ নয়—এর দাম ৯।৴০ আনা—" লোকটা আর কিছু না বলে' কাপড়খানা হাতে নিয়ে একেবারে সটাং রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, এবং আর কারো পানে না চেয়ে নিমেষের মধ্যে কোন্‌দিকে মিশিয়ে গেল। কর্ম্মচারী বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখ্‌ল লোকটা কখন চলে গেছে।

আমি বসে' বসে' লোকটার কার্য্যকলাপ দেখ্‌ছিলাম আর ভাব্‌ছিলাম—"একটা আশ্চর্য্য জিনিস বটে।" একবার ভাব্‌লাম—"হয় সে পাগল, না হয় জুয়াচোর। পূজোর বাজারে কিছু হাতড়িয়েচে আর কি,—তাই একখানা জরি পেড়ে সাড়ী স্ত্রীর জন্যে—না হয় আর কারো জন্যে—।" কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম—তার মুখ দেখে ত জুয়াচোর বলে' মনে হয় না। কারণ বিশেষ একটুকু লক্ষ্য কর্‌লে তার চোখে মুখে যেন একটা উচ্চবংশের লক্ষণ প্রচ্ছন্ন আছে বলে বোধ হয়। দোকানের কর্ম্মচারীটীও বিশেষ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—"লোকটা কেমন ধারা—বাকী পয়সা পর্য্যন্ত নিয়ে গেল না! পাগল নাকি?"

যাহ'ক আমি ছেলে মেয়েদের পছন্দমত কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম কিন্তু খালি সেই অদ্ভুত লোকটীর কথা আমার মনের মধ্যে উদয় হ'তে লাগ্‌ল।

২

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নিমতলা ষ্ট্রীটের একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে' বাড়ী ফির্‌চি এমন সময় হঠাৎ দেখি সকালবেলার সেই অদ্ভুত লোকটী সেই জরি পেড়ে সাড়ীখানা বগলে করে গঙ্গার দিকে হন্ হন্ করে' চলে' যাচ্চে—এত জোরে যাচ্ছিল যে দৌড়ুচ্চে বল্‌লেও হয়। আমার মনে আরো কৌতূহল হলো, ইচ্ছে হলো তার পিছু পিছু যাই, কিন্তু তার সঙ্গে হেঁটে পেরে উঠ্‌ব না ভেবে সাম্‌নে দিয়ে যে একখানা "রিক্‌-স" যাচ্ছিল, তাতে চেপে বস্‌লাম; চালককে বল্‌লাম "দেখ ঐ যে—ঐ গ্যাসের কাছ দিয়ে—বগলে কাপড়—লোকটা যাচ্ছে—ওর পিছু পিছু তোর যেতে হবে, ভাড়া যা হবে নিস্ এখন!"

সে আমাকে বোধ হয় পুলিসের একজন গোয়েন্দা ঠাওরালে—মস্ত একটা সেলাম করে' বল্‌ল,—"বহুত আচ্ছা হুজুর।"

'রিক্-স' আস্তে আস্তে লোকটার পিছু পিছু যেতে লাগ্‌ল। শেষে সে নিমতলার শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলো—আমারও গাড়ী দাঁড়ালো। আমি চালক্‌কে তার প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঐ লোকটার কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌তে লাগলাম। কিছুতেই তার ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

৩

কারো পৌষমাস, কারো সর্ব্বনাশ। কারো বাড়ীতে 'আগমনীর' উৎসব, কারো বাড়ীতে বিসর্জ্জনের হাহাকার—আজকের দিনেও মরণের গতি অব্যাহত। কত চিতা জ্বলে উঠ্‌চে, কত চিতা নিবে যাচ্চে। সেই লোকটা একটা অর্দ্ধনির্ব্বাণপ্রায় চিতার কাছে দাঁড়িয়ে কি ভাবল—তারপর সেই জরি পেড়ে সাড়ীখানা তার মধ্যে ফেলে দিল—কাপড়খানা আস্তে আস্তে জ্বলে' উঠ্‌ল—সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল।—একবার সে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল—পর মুহূর্ত্তেই ধুতির খুঁটে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর—তারপর সেই কাপড়ের ভস্মাবশেষ নিয়ে একেবারে জাহ্নবীর শেষ সোপানে এসে দাঁড়াল। আমিও তার পিছু পিছু গেলাম—কিন্তু তার কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না—এবং সেই ভস্ম জাহ্নবীর জলে ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"পর্‌বে, পর্‌বে—নিশ্চয়ই সে পর্‌বে—শাস্ত্র আমাকে বলেচে—শাস্ত্রের কথা কখনই মিথ্যে হয় না।—আমরা ভালবেসে যা' দি—তা' পায়রে পায়।—তাই মরে গেলে' লোকে শ্রাদ্ধ শান্তি করেরে—শ্রাদ্ধ শান্তি করে।" * * * আমি তখন তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম, এবং তার হাত দুটী ধরে' স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "ভাই তোমার দুঃখের কাহিনী আমায় বলবে কি?" আমার যেন গলা ধরে' আস্‌ছিল—দুফোঁটা জলও চখের কোণে দেখা দিয়েছিল।

সে উত্তর কর্‌ল "কেন বল্‌ব না?—বল্‌ব। তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌চি—আপ্‌নার কি সহোদর ভাই আছে? যদি থাকে তবে পালান, পালান—দেরী করবেন না—একটুও না" —বলে' সে হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌ল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটুকে পড়তে লাগ্‌ল। আমি তখন যেন তার মনের কথা কতকটা হাতড়ে পেলাম। আবার পর মুহূর্ত্তেই একটুকু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌তে লাগল—"তবে শুনুন্—বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌ব না—দু'কথায় সেরে দেবো।—যদি রাজী হন্ ত বলি।"

আমি তার কথায় সায় দিলাম্।

তখন সপ্তমীর চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েচে। তার গলিত রক্তধারা ভাগীরথীর বুকের ওপর পড়েচে। কত জাহাজ জলে ভাস্‌চে—কত ষ্টীমার বাঁশী বাজিয়ে জল কেটে চলে যাচ্চে—মাঝে মাঝে Search lightএ চোখ ধাঁধিয়ে তুল্‌চে—কত নৌকা চলা ফেরা করচে—কত মাঝি গান

ধরেচে। কখন' বা শ্মশান থেকে 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি কাণের মধ্যে ভেসে আসচে। একজন সন্ন্যাসী ঘাটের কাছে একটা গাছের তলায় বসে' গাঁজা খাচ্চে আর মাঝে মাঝে 'বোম বোম শিব' ধ্বনি করচে!

লোকটা তখন বল্‌তে আরম্ভ করল—"হতভাগাটাকে সর্ব্বস্ব খুইয়ে মানুষ করেছিলাম।—মায়ের পেটের ভাই মশায়, মায়ের পেটের ভাই।—বাপ মা ছিল না।—তাকে আমরা—বুঝতে পারলেন কি না—ছেলের মতনই মানুষ করেছিলাম—লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম।

"সে পাশ কর্‌ল—একজন বড়দরের উকীল হলো—যথেষ্ট পয়সা কড়িও উপার্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল। আর আমাদের মান্‌বে কেন মশায়? আমাদের একটী ছেলে ছিল—সেও আর নাই—এই বলেই সে তার চোখের জল মুছ্‌ল—তার খাবার থেকে কেটেও হতভাগাটাকে খাইয়েছি। যাক্ গে! আজ প্রায় দু'বছর হ'তে চল্‌ল—পূজোর আগে ছেলেটার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হলো। ভাল করে' দেখাতে পার্‌লুম না—সে সময়ে আমি বেকার। মায়ের পেটের ভাই মশায়—মায়ের পেটের ভাই, আমার উকীল ভাই, ভাইপোটাকে দেখবার কোন গাই কর্‌ল না—শেষে ছেলেটা মারা গেল। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে হারিয়ে তার মা একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। * *

"পূজো এল। সে দিন ষষ্ঠী। আমার উকীল ভাই তার স্ত্রীর জন্যে একখানা ভাল জরি পেড়ে সাড়ী কিনে নিয়ে এল। আমার স্ত্রীর আগে থেকেই একটুকু মাথা খারাপ হয়েছিল—সে হতভাগীও আমাকে ধরে বস্‌ল—তাকেও একখানা জরি পেড়ে সাড়ী কিনে দিতে হবে। তখন আমার হাতে একটী পয়সাও নেই—তার ওপর ছোঁড়াটার অসুখে ধূলি গুঁড়ি সার হয়েছিল। আমি অনেক রকম করে' তাকে বুঝিয়ে বল্‌লাম—কিন্তু সে কোন মতেই—শুন্‌বে না। ক্রমে সে তার পাগলামীর মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ল—আমাকে ধরে' বস্‌ল সে ছাড়বে না, কাপড় দিতেই হবে—নইলে সে আত্মহত্যা কর্‌বে। আমার উকীল ভাইকে সমস্ত ব্যাপার বলে গোটাকতক টাকা চাইলাম—হতভাগাটা উত্তর কর্‌ল কি জানেন—'আমার টাকা কোথা? আর থাক্‌লেই বা দেবো কেন? তোমাদের যে থাক্‌তে ও খেতে দিচ্চি এই ঢের।' রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। আমি আর কিছু না বলে' চুপি চুপি নিজের ঘরে এসে বস্‌লাম। সেই রাত্রে হতভাগিনী আবার যখন কাপড়ের জন্যে আমাকে জেদ্ করতে লাগ্‌ল তখন তাকে বিলক্ষণ দু'কথা শুনিয়ে দিলাম এবং বল্‌লাম—তুমি মর আর বাঁচ এবার আমি কিছুতেই দিতে পার্‌ব না। * * * তবুও তারপর দিন ভোর থাক্‌তে থাক্‌তে উঠে গোটাকতক টাকার অনুসন্ধানে বার হলাম। টাকা ত পাওয়াই গেল না—ফির্‌তে অনেকটা বেলা হলো।—কিন্তু এসে যা দেখলাম তা' আর শুনে কাজ নেই—হতভাগিনী তার সাড়ীর ফাঁস গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করেচে।"

* * * * *

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল "হতভাগিনী ত জুড়িয়েচে। এখন বলুন দেখি মশায় আমি কি করি? সময়ে সময়ে মনে হয় আত্মহত্যা করি, কিন্তু পারি না। আমিও আজ একপ্রকার পাগল—তবে পূজো এলেই বিশেষতঃ সপ্তমীর দিন আমার মাথা আরো কেমনতর বিগ্‌ড়ে যায়—কি যে করি, কোথা যে যাই, কিছুরই যেন ঠিক থাকে না। তারপর পূজো কেটে গেলে আবার যেন ধাতে আসি। তবে গত বছর থেকে এই সপ্তমীর দিন একখানা জরি পেড়ে সাড়ী তার চিতায় দিয়ে আস্‌চি—এই একটু পূর্ব্বে তাই করেচি। আমার মনে হয় যে প্রেতলোকে সেই কাপড় গিয়ে তার কাছে পৌঁছবে এবং আমার প্রায়শ্চিত্তও কথঞ্চিৎ করা হবে। ধর্‌তে গেলে আমিই তার মৃত্যুর কারণ।"

* * * * * *

এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনে ক্ষণকালের জন্য যেন আমার চোখ দুটী বুজে এল। আমি যেন খানিকক্ষণ তন্দ্রাজড়িত হয়ে রইলাম—তারপর চেয়ে দেখি লোকটী কখন চলে গেছে। * * *

আমি ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরুলেম্‌। মনের মধ্যে কে যেন একটা কাল ছাপ চিরদিনের জন্য গভীরভাবে অঙ্কিত করে দিয়ে গেল। যখন আমি রাস্তায় এসে পড়্‌লাম, তখন দূরে পূজাবাড়ী হ'তে সন্ধ্যারতির ঢাক ঢোল বেজে উঠেছে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
(কবিগুণাকর)

জাগরণ

আমরা কি জাগিয়াছি? সাদার চেয়ে রূপকেই কথা জমে ভাল,—তাই রূপকেই প্রশ্নটি তুলিলাম। সেই সেদিন লর্ড রবার্টস্‌ তাঁহার ৪১ বৎসরের অভিজ্ঞতার গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশের লোকেরা শান্তিতে ঘুমাইতেছে,—আর সেই শান্তি নাকি মৃত্যুর নামান্তর। আবার রূপকেই বলি,—আমরা যদি মরিয়াছিলাম, তবে কি এদিনের কোলাহল শুনিয়া বুঝিব, যে ইহা জাগরণের চিহ্ন নয়, ইহা কেবল মৃতশরীরে "দানো"র খেলা? কথাটা শুনিয়া চটিও না ভাই স্বদেশ-প্রেমী! তোমার মত প্রেমের গাঢ়তা হয়ত আমার নাই, কিন্তু আমি আমার জন্মভূমিকে ভালবাসি বলিয়াই প্রশ্ন তুলিয়াছি। সকল প্রকার আন্দোলনে ও চীৎকারে যে আমাদের জীবন সূচিত হয় না, জাগরণ সূচিত হয় না, তাহাত তুমি আমি সকলেই স্বীকার করি। আমাদিগকে "দানো"য় পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু একালের

আন্দোলনে একেবারই যে "দানো"র লীলা দেখি নাই, তাহা বলিতে পারি না। সজীব ও সতেজ মানুষের ভুলচুকে যাহা ঘটে, তাহা এক শ্রেণীর, আর যাহা উদ্দেশ্য-হীন সংহারে অভিনীত হয় তাহা অন্য শ্রেণীর। দোষ ধরিবার জন্য নয়, কিন্তু জীবন-পরীক্ষার জন্য এ সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের আস্ফালন মৃতের না জীবিতের, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

কোন শ্রেণীর আন্দোলনে, আমাদিগকে "দানো"য় পাওয়া মনে হয়, তাহা একটু পরেই বলিতেছি; সে কথা বলিবার আগে জাগরণের লক্ষণ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিব। আমাদের দুঃখ অনেক, আর সে দুঃখে অনেক সময়েই অনেকে আর্ত্তনাদ করিয়া থাকি; কিন্তু আর্ত্তনাদকে জাগরণের কোলাহল বলিতে পারি না। মনে হয় না কি যে আমাদের অনেক স্বদেশ-প্রেমের বাণী, যেন ঘুমন্ত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন-পীড়িতের চীৎকার? আমাদের উক্তিতে বেদনার কথা ছাড়া যদি আর কিছু থাকে, সে কেবল অবিবেচিত দাম্ভিকতা; যাহাতে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের পথে চলিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা নাই, কাজেই শায়িত ও নিদ্রিত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন-পীড়িতের চীৎকারের সঙ্গেই একশ্রেণীর আন্দোলন তুলিত হইতে পারে।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে শিশুরা হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদে, আর তাহাদিগকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইতে হইলে, একটু পিঠ থাপ্‌ড়াইতে হয়, পুতুল দিতে হয়, অথবা বড় জোর, তাহাদের হাতে দু-একটা নাড়ু দিতে হয়। যাঁহাদের চীৎকার দু-চারিটি মিষ্ট কথায় শান্তি লাভ করে, তাঁহারা যে জাগিয়া লক্ষ্য পথের যাত্রী হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ইঁহারা অবোধ শিশু, না সুবোধ বালক, না মডারেট বুড়া, তাহা বলা কঠিন।

ঘুম ঠিক কাঁচা না হইলেও উহা কাণ-ফাটান ডাকে-হাঁকে ভাঙ্গিলে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গের ফল দাঁড়ায়।—অসম্ভব খাই-খাই রব ওঠে, উদ্দেশ্য-হীন ভাঙ্গা-চোরার কাজ চলে, কিন্তু স্থির-প্রাণতা ও কর্ম্মশীলতা জাগে না,—সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। জীবনের উৎসাহ ও উদ্যম, হঠকারিতার আগুনে পুড়িয়া যায়। যাহাদের লক্ষ্য স্থির নাই, তাহাদের প্রাণে নীরবে কর্ত্তব্য-পালনের দৃঢ়তা জন্মে না; লক্ষ্য-শূন্য লোককে কাজে লাগাইয়া রাখিতে হইলে, এক রকমের উত্তেজনার পর আর এক রকমের কৃত্রিম উত্তেজনা আনিতে হয়; নহিলে সকল উৎসাহ নিবিয়া যায়। এই গেল আর এক শ্রেণীর জাগরণের কথা। সকল শ্রেণীর আন্দোলনের মূলে, দু-চারি জন যথার্থ জাগরিত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যকে জাগাইবার যথার্থ উপায়ের অভাবে সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া যায়।

যে যথার্থই জাগিয়াছে, যে কর্ম্মী, যে উদ্দিষ্ট পথের যাত্রী, তাহার অটল গতিতে ধীরতা থাকে,—তাহার স্থির সঙ্কল্পে প্রভাতের প্রফুল্লতা দেখিতে পাওয়া যায়; কর্ম্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড রৌদ্রের অথবা কঠোর শিক্ষার ভাবনায়, সেই ধীরতা ও প্রফুল্লতা নষ্ট হয় না। যাহারা একটুও হাসিতে পারে না, পরের হাসি-তামাসা সহিতে পারে না, একটু বাদ-প্রতিবাদেই ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ে, নিজেদের

মতের বিরোধীকে সর্ব্বদাই উগ্রভাবে দমাইতে চায়, তাহারা কর্ম্মী নহে,—তাহারা "দানো"-গ্রস্ত। ইঁহারা আপনাদের প্রফুল্লতা-হীন গম্ভীর মুখের সমর্থনে নানা কথা বলিতে পারেন, কিন্তু যদি একবার আপনাদের কথা ভুলিয়া, প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উদ্বিগ্ন অকর্ম্মাদের ছবি দেখেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, অসহিষ্ণুদের উগ্র-আয়োজন চিরদিনই বিফল হইয়াছে। যে আন্দোলনে চিত্ত-বিনোদনের সাহিত্য জন্মে না, প্রাণ-স্পর্শী মধুর সাহিত্যে দেশের লোক উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহার ভিত্তি নিষ্ফলা মরুভূমির উপরে। আত্মাদরের আধিক্যে নিজেদের দোষ ধরা বড় কঠিন; কোন কাজ লইয়া উৎসাহে মাতিয়া পড়িলে, সে কাজের সমালোচনা করা বড় কঠিন; উদ্বেগের আস্ফালনের সময়, বুঝিতে পারা যায় না যে, এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় নাই,—কেবল নিজের শরীরে নিজের কম্পনই অনুভূত হইয়াছে।

প্রতিধ্বনি

আজগুবি মিথ্যা সংবাদ—লোক সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে কিনা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে বিদেশের পত্রিকায় আজগুবি খবর বা hoax ছাপা হইয়া থাকে; যে দেশে উহা বেশী বিশ্বাস করে, সেই দেশের লোককে বেশী মূর্খ মনে করা হয়। অমুক স্থানে লেজওয়ালা মানুষ আছে, অমুক দেশে মানুষের পেটে অন্য জন্তুর জন্ম হইয়াছে, অমুক দেশের বনের কোন কোন গাছ গরু ঘোড়া ধরিয়া খায়, প্রভৃতি মিথ্যা সংবাদগুলি যে অতি গম্ভীরভাবে আমাদের দেশের অনেক পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভেও স্থান পায়, তাহা অনেকবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। এযুগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অতি মোটা কথাগুলি না জানা, অতি লজ্জার কথা।

* * *

পৃথিবী "ছোট" হইয়া গিয়াছে—আমাদের পৃথিবীতে আর অনাবিষ্কৃত স্থান নাই,—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত সকল স্থানই মানুষেরা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া লইয়াছে। দুই দিকে মেরুর খোঁটায় বাঁধা সাগরকে এখন "অনন্ত" বলিতে যেন মুখে আট্‌কায়; সে অতি ছোট সীমার কারাগারে ঢেউ তুলিয়া ফিরিতেছে। সেকালে অজানা মুল্লুকের কাল্পনিক গল্পে কত দৈত্য দানবের কথা থাকিত—কত না বিস্ময়কর গল্প পড়িয়া আনন্দ হইত। এখন অচেনা অজানা রাজ্যের বিস্ময়কর বিবরণ দিতে গেলে, পাঠশালার ছেলেরাও হয়ত উপহাস করিবে; হয়ত বালক বালিকারা তাহাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যাইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানই দেখিয়া লইয়াছে। আমরা শেষকালে সত্যই ধরাকে সরা জ্ঞান করিব নাকি?

* * *

অক্ষয় প্রদীপ—আমেরিকা প্রবাসী ইটালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার (Italian Engineer) জোয়ান টোমাডেলি, (Joan Tomadilli) একটি চমৎকার বৈদ্যুতিক প্রদীপের আবিষ্কার করিয়াছেন; এমন মালমশলা দিয়া ও এমন কৌশলে তিনি তাঁহার প্রদীপের কলটি গড়িয়াছেন যে, বৈদ্যুতিক উত্তেজনার জন্য তিন বৎসরের মধ্যে কোন কিছু করিতে হইবে না, আর সহজ রকমে টিপ-চাবি ঘুরাইয়া তিন বৎসর ধরিয়া প্রদীপটী জ্বালাইতে ও নিভাইতে পারা যাইবে। কলের আয়তন অনুসারে উহা দিয়া নানা কাজ করান যাইতে পারে,—আলো দেওয়া, রাঁধা প্রভৃতি সকল কাজেই উহার ব্যবহার চলিবে। বাড়ীতে বাড়ীতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে প্রদীপ পাওয়া যাইবে তাহার দাম ১২ শিলিং অর্থাৎ ৮ টাকার অধিক হইবে না।

* * *

অসীম শক্তি ও অফুরন্ত সম্পদ—মানুষের জ্ঞানে বিশ্ব-রহস্যের অতি যৎসামান্য অংশই উদ্ভিন্ন হইয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষেরা আপনাদের জ্ঞানের প্রভাবকে অসীম বলিয়া বুঝিয়া নূতন আশায় বুক বাঁধিয়াছে। 'জানা যায় না' অথবা 'জানিতে পারা যাইবে না',—এ শব্দগুলি এখন আর বিজ্ঞানের অভিধানে স্থান পাইতেছে না। মানুষ আপনাকে চিনিয়াছে,—সে তাহার অসীম জ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে। তাই কোন তথ্যকেই দুর্ব্বোধ্য ভাবিয়া, অথবা কোন কর্ম্মকে দুঃসাধ্য মনে করিয়া, একালের বৈজ্ঞানিকেরা নিরস্ত হইতেছেন না।

এক সময়ে মানুষে ভাবিয়াছিল যে, জন-সংখ্যা বাড়িলে, এ পৃথিবীতে তাহাদের খাদ্য মিলিবে না। এখন মানুষেরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বুঝিয়াছে, পৃথিবী অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, সকল জীবের মঙ্গলের জন্য—বা শিবের জন্য, যত চাই, তত পাওয়া যাইতে পারে। এ পৃথিবীর উৎপাদনের শক্তি—অফুরন্ত। কোন ভূমি নিরন্তর চাষে, অনুর্ব্বর হইতে পারে না, মরুভূমিও প্রয়োজনের সামগ্রী দিতে বাধ্য, এবং বিশ্ব-শক্তির নূতন নূতন আবিষ্কারে জীবন ধারণের নূতন নূতন সুবিধা মিলিবেই মিলিবে। নূতন যুগের এই নূতন জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইতে না পারিলে, কোন দেশ বা কোন জাতির উদ্ধারের উপায় নাই। সকলকেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লইতে হইবে,—জ্ঞানেই মুক্তি।

আইন-আদালত

হজরত মোহানির দণ্ড—এখনও হজরত মোহানির মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, কারণ জজ ডি'সৌজা তাঁহার বিচার্য্য বিষয়ের একটি অংশ বোম্বাই হাইকোর্টের

অভিমতের জন্য সমর্পণ করিলেও, হাইকোর্টকে সকল অংশের সমালোচনা করিয়াই রায় দিতে হইবে। এই জন্য এখন জেলা-জজের বিচারের সমালোচনা করা আইনবিরুদ্ধ। হজরত মোহানি কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার এক অংশে নাকি রাজদ্রোহ সূচিত হইয়াছে, আর অন্য অংশে নাকি সরকারের বিরুদ্ধে লোকজনকে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইয়াছে। হজরত মোহানি আপনার পক্ষ সমর্থনে বলিয়াছেন যে যদি কেহ প্রচলিত শাসন পদ্ধতিকে দোষযুক্ত মনে করে আর সেই কথা খুলিয়া বলে, তবে তাহার কোন অপরাধ হয় না; কেহ যদি একটা আদর্শ শাসন-নীতির কথা প্রচার করে, এবং কাহারও সঙ্গে বিরোধ না ঘটাইয়া সেই নীতিকে কাজে চালাইয়া দেখায়, এবং তাহার ফলে যদি পুরাতন নীতি আপনা আপনি অপসারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও রাজদ্রোহ হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন কামান দাগিয়া নির্ব্বিরোধী মানুষ মারিয়া শাসন চালাইবার ব্যবস্থা করেন নাই এবং করিবার সম্ভাবনাও নাই, তখন সেরূপ ব্যবহার, যদি ঘটে ও যখন ঘটে, তখন যদি লোকের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হওয়া উচিত বলা যায়, তাহা হইলে, কাহাকেও উত্তেজিত করা হয় না অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয় না। কবে কি হইবে, তাহা কল্পনায় ভাবিয়া লইয়া মানুষেরা কখনও কাহার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইতে পারে না, অথবা উত্তেজিত হইতে পারে না। মোকদ্দমায় যাঁহারা জুরী ছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে অপরাধীকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, কিন্তু জজ সে মত মানিয়া লয়েন নাই। মোহানির বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ——লোকের মনে সরকারের প্রতি অভক্তি ও বিদ্বেষের উত্তেজনা করা, এবং দ্বিতীয় অভিযোগ—লোকজনকে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করা; দুই অভিযোগই এক সঙ্গে বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগে হইয়াছে জুরীর বিচার ও প্রথম অভিযোগের বেলায় জুরীদিগকে "এসেসার" গণ্য করা হইয়াছে। জুরীরা একবাক্যে নিরপরাধ বলায় হাকিমটী জুরীর মতের সমালোচনার জন্য, মোকদ্দমাটি, নিজের মন্তব্য সহ, হাইকোর্টে পাঠাইয়াছেন; আর প্রথম অভিযোগের বিচারে "এসেসার"দের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া হজরত মোহানির সম্বন্ধে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় নানাদিক দিয়া আইনের নানা তর্ক আছে; কাজেই ইহার শেষ বিচার জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

* * *

দেবোত্তরে অধিকার—দরিদ্রের অন্নকষ্ট ঘুচাইবার জন্য ও সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাচীনকালের অনেক মহাত্মা অনেক সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া মঠ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশ জীবনী-শক্তি হারাইবার পর মঠের মোহন্তেরা ও অন্যান্য সেবাইতেরা সম্পত্তিগুলির যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাতে দানের উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে বিফল হইয়া যায়।

এই সম্পত্তিগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য মান্দ্রাজের আনন্দচার্লু, একবার নূতন আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; তখন উপযুক্ত কারণেই গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে স্থির হইয়াছে (কলিকাতা উইক্‌লি নোটস্‌ ১৯২২, পৃঃ ৫৩৭) যে, হিন্দুদের মঠের মোহন্তেরা অথবা মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির মাতওয়ালীরা উৎসৃষ্ট সম্পত্তির মালিক বা অধিকারী নহেন,—তাঁহারা সম্পত্তির পরিচালক বা ম্যানেজার মাত্র। ইংরেজী আইনে যাহাকে "ট্রাষ্টী" বলে ইঁহারা তাহা নহেন; "ট্রাষ্টী"দের হাতে সম্পত্তি যেরূপভাবে বর্ত্তে ও ট্রাষ্টীরা যে ভাবে সম্পত্তির নূতন পাকা বন্দোবস্ত করিতে পারেন, সেবাইত কিম্বা মোহন্ত অথবা মাতওয়ালীরা তাহা পারেন না। সেবাইত প্রভৃতিদের জীবিত কালের ব্যবস্থা, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে পরবর্ত্তী সেবাইতেরা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। একালের মোহন্তেরা যদি নূতন যুগের প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেন, এবং সুশিক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির আয়ে এ যুগের উপযোগী জ্ঞান-চর্চ্চার ব্যবস্থা করিতেন, তবে আমাদের বিদ্যা-পীঠগুলির অনেক অভাব দূর হইত।

জ্যৈষ্ঠে

উচ্চ-শিক্ষায় বিরোধ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাইস্‌-চান্‌সেলারের অভিভাষণ মুদ্রিত হইবার পরেও, ছল-ধরা সমালোচকদের সমালোচনা সম্পূর্ণ থামে নাই। তাঁহারা বলিতেছেন:—"স্বীকার করি" যে জ্ঞানের উন্নতিতে বাধা পড়িলে অমঙ্গল হয়,— "মানিয়া লইলাম" যে জ্ঞান-চর্চ্চার বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা, যে একটিকে ছাড়িলে অপরটির উন্নতিতে বাধা পড়ে, তবুও ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া "কাপড়ের পরিমাণে কোট কাটিলে" ভাল হয়, আর ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া জ্ঞানের প্রসার বাড়াইলে ভাল হয়। যাঁহারা কোন একটি বিষয়ের প্রকৃতি ও গুরুত্ব না বুঝিয়া, "স্বীকার করি" ও "মানিয়া লইতেছি" ধূয়া ধরিয়া তর্ক তোলেন, তাঁহারা কেবল তর্কের জালই বুনিয়া থাকেন। শীত নিবারণের জন্য "কোটের" অবশ্য প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত পরিমাণে কাপড় সংগ্রহ করিতে হয়; যাহা কিছু কাপড় লইয়া খেলা ঘরের পুতুলের উপযোগী "কোট" তৈয়ারী করিলে চলে না। ব্যঙ্গ-রসের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন যে, যদি বিলাত যাইবার প্রয়োজন থাকে তবে ধীরে ধীরে যাইবার প্রস্তাবটা বড়ই হাস্যকর, প্রথম বৎসর বোম্বাই-এ, দ্বিতীয় বৎসর এডেন-এ, আর তাহার পর সৈয়দ বন্দরে পাঠাইবার ব্যবস্থা চলে না। যদি এই জাতির উদ্ধার চাই, তবে জ্ঞানের চর্চ্চা কমাইলে চলিবেনা ; বহুদিকের ব্যয় কমাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য টাকা ঢালিতে হইবে।

* * *

জাতীয়-শিক্ষা—গোঁ ধরিয়া কথা কহিলে উপায় নাই; নহিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে শিক্ষায় প্রাচীনকে চিনিতে পারা যায়, নূতনকে অবলম্বন করা যায়,—জাতীয়ত্বের উদ্বোধন করা যায়, সে শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে যেমন হইয়াছে, এমন আর এদেশে এ সময়ে কোথাও হয় নাই। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সমালোচনা করিলে ছল ধরিবার পথ থাকে না; তবে একশ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে খাঁটি ধর্ম্ম-সাধনার ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা মুখে স্বদেশীর নাম করেন, আর কাজের বেলায় বিলাতের কোন কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-শিক্ষা-পদ্ধতির অনুকরণ করিতে বসেন, তাঁহারাই জাতীয় শিক্ষার নামে এইরূপ বাজে কথার ধূয়া তুলিয়া থাকেন। কোন কালে, এদেশের কোন চতুষ্পাঠীতে শিব-পূজা বা কার্ত্তিক-পূজা শিখিয়া মন্ত্র আওড়াইতে হইত না,—যে যাহার ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-সাধনার ব্যবস্থা আপনার বিশিষ্ট গুরু-পুরোহিত লইয়া আপনার বাড়ীতে করিত; শিক্ষা-শালায় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতিরই আলোচনা হইত; কুত্রাপি "কাটি কিস্ট" পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না। এদিনে আবার দেখিতে হইবে যে, যাহারা হিন্দু বা মুসলমানের কোন ঐতিহ্যের (tradition) ধার ধারে না, সেই আর্য্যেতর জাতির সংখ্যা "আর্য্য-জাতি" অপেক্ষা অনেক অধিক। হিন্দুর ঐতিহ্য ধরিয়া আর্য্যেতরদের জন্য গোটাকতক হনুমান ও বিভীষণ খাড়া করিয়া দিলে আর্য্যেতরেরা সুখী হইবে না। একদলের জন্য শিব-পূজা আর একদলের জন্য নামাজ ও আর এক দলের জন্য "চোঙ্গা" পূজা প্রভৃতি শিখাইতে গেলে, অসংখ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় বাড়াইতে হয়; যাহাতে মতবাদ উপেক্ষা করিয়া সকলে এক সঙ্গে লেখা পড়া করিয়া, যথার্থ জাতীয়ত্ব স্থাপন করিতে পারে,—তাহা আর হয় না। ধর্ম্ম কথাটা মধুর, উহার শিক্ষার নামেও মোহ আছে, কিন্তু কথার মোহে যেন কেহ তাঁহাদের যথার্থ হিতকর ও মঙ্গলপ্রদ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা না করেন।

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি দাস-বুদ্ধি বাড়ে ?—যাঁহারা শিক্ষায় দাস-বুদ্ধির কথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদেরই সুবিবেচিত মন্তব্য ধরিয়া ইহার বিচার করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ ইয়ং ইণ্ডিয়া ও উহার অনুবর্ত্তী অনেক পত্রিকায় অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে যে, যাঁহারা স্কুল কলেজে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা "অত্যধিক সংখ্যায়" আড়ির দলে জুটিয়াছেন, এবং তাঁহারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোক সাধারণের মধ্যে নূতন আন্দোলনের মাহাত্ম্য বুঝাইতেছেন। যাঁহারা এদেশ হইতে দাস-বুদ্ধি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্কুল-কলেজে শিক্ষিত এবং সংখ্যায় "অত্যধিক" তাহা হইলে, কিছুতেই বলা চলে না যে, একালের বিদ্যালয়গুলিতে দাস-বুদ্ধি বাড়িতেছে। সকল দেশে, সকল অবস্থাতে ও সকল রকমের শিক্ষার নিয়মেই নানা শ্রেণীর ও নানা বুদ্ধির লোক দেখা যায়; চিরকাল সর্ব্বত্রই উত্তম, মধ্যম ও অধম লোক থাকিবে; কাজেই যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে,

অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় কাজের লোক পাওয়া যায়, সে প্রতিষ্ঠান গুলিকে তাহাদের ফলের পরিচয়ে, কিছুতেই ধ্বংসের সামগ্রী বা নিন্দনীয় পদার্থ বলা চলে না। নূতন ধরণের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, এইরূপ "অত্যধিক" কাজের লোক মিলিবে কি না এখনও তাহার পরীক্ষা হইতে অন্ততঃ দশবৎসর লাগিবে; কাজেই যাহা হইবে তাহার সহিত যাহা আছে, তাহার তুলনা করা চলে না। পরীক্ষায় যাহা দোষযুক্ত বিচারিত হয় নাই তাহাকে দণ্ডিত করিবার উদ্যোগ, ন্যায়সঙ্গত নহে। যাঁহাদের বিচার হিতৈষণাপ্রণোদিত, তাঁহারা মতবাদের জিদ্ ধরিয়া কোন কাজ করিবেন না, ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

* * *

মেয়ে ডাক্তারীর কলেজ—দিল্লীতে নূতন রাজধানী বসাইবার পর ভারত-গবর্ণমেণ্টের যত্নে ঐ সহরে, মেয়েদের ডাক্তারী শিখিবার কলেজ খোলা হইয়াছিল। স্থানের দোষেই হউক অথবা অন্য কোন দোষেই হউক, এ কলেজের প্রতি দেশের লোকের কোনও আকর্ষণ জন্মে নাই; কলেজটি বাঁচিয়া আছে কি না, সে সংবাদও লোকে বড় রাখে না। এই কলেজ স্থাপনের জন্য টাকা দিয়াছিলেন, বড় বড় রাজারা, এবং টাকা উঠিয়াছিল, পঁচিশ লক্ষ। কলেজটিকে ভাল করিতে হইলে, উহার অনেক প্রসার বাড়াইতে হয়, এবং এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিল্লীতে ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি সকলের বাস সুবিধাজনক নয় বলিয়া, সিমলার পাহাড়ে নাকি ঐ কলেজের প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ একটি বড় হাঁসপাতাল স্থাপন করিবার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের জন্য ন্যূন পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা চাই, এবং সেই টাকার জন্য শ্রীমতী লেডি রেডিংএর একখানি নিবেদন পত্র বড় লোকদের নিকট প্রচারিত হইতেছে। মনে হইতেছে টাকাটা ঠিক উঠিবে। দিল্লীতে কোন লোকই যাইতে চায় না, দিল্লীর অবস্থার বিচারে, সিমলাতে হাঁসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে, এবং এ পর্য্যন্ত দিল্লীর কলেজের প্রতি কাহারও অনুরাগ জন্মিল না; তবুও দিল্লীর কলেজের জন্য এত টাকা ব্যয় করা হইবে কেন?

* * *

কটক কলেজের উন্নতি—ওড়িশ্যার লোকের কাছে বিহার প্রদেশের পাট্না বড় আকর্ষণের স্থান নয়,—পাট্নায় যাওয়াও তেমন সহজ ও সুবিধাজনক বিবেচিত হয় না। এই জন্যই পাট্নায় যখন নূতন হাইকোর্ট বসিল, তখন স্থির হইল যে, জজেরা সময়ে সময়ে কটকে বসিয়া ওড়িশ্যার মাম্লা মোকদ্দমার বিচার করিবেন। কলিকাতার হাইকোর্টের অধীনে থাকিবার সময় এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। শিক্ষা বিষয়েও দেখা যাইতেছে যে, কটকে যদি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা না হয় তবে ওড়িশ্যার লোকের পক্ষে বড় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। অল্পদিন পূর্ব্বে বেহারের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গবর্ণর কটক কলেজের নূতন বাড়ী প্রতিষ্ঠার সময়, সকলকে আশা

দিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ কলেজে এম্ এ প্রভৃতি পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইবে। সোনপুর ফিউডেটরী ষ্টেটের মহারাণী সাহেবা এম্ এ পড়াইবার একজন অধ্যাপকের পদের জন্য ৫০,০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে সেই সূত্রে গবর্ণমেণ্ট ঐ কলেজে এম্ এ পড়িবার পথ মুক্ত করিতেছেন, তাহা অস্থায়ী গবর্ণর স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সোনপুর ষ্টেটের বহু কার্য্যেই ওড়িশ্যা উপকৃত হইতেছে।

* * *

আলিপুর জেলের বিদ্রোহ—জেলের কয়েদীরা অল্প বিস্তর অবাধ্য হয়, কিংবা সুবিধা পাইলেই কখনও জেল ভাঙ্গিয়া পালায়,—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এবারে আলিপুরের প্রেসিডেন্সী জেলের বিদ্রোহ সকলকেই স্তম্ভিত করিয়াছে, এবং শাসনকর্ত্তাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। জেলের আঠার শ' কয়েদীর মধ্যে এক হাজারের বেশী লোক এক সঙ্গে যোট বাঁধিতে পারিল, প্রাণের মায়া ছাড়িয়া ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে পারিল,—এটা এদেশের জেলের ইতিহাসে একেবারে নূতন। এদেশে কোথাও অশান্তি দেখা দিলে এক শ্রেণীর বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, জন কতক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় উপদ্রব গুলি ঘটিতেছে। প্রেসিডেন্সী জেলে যে আড়ির দলের কোন লোককে বন্দী করা হয় নাই, কোন বাহিরের কুচক্রী যে ঐ জেলে উৎপাৎ সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তাহা এক রকম স্বীকৃতই হইয়াছে। তবুও যাহারা পরস্পরে অসম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধে দণ্ডিত, এবং যাহাদের মধ্যে যোট বাঁধিয়া আত্মত্যাগের অনুষ্ঠান আশাতীত, তাহারাই এক হাজার লোক এক সঙ্গে মিলিয়া যে এত বড় কাজ করিতে পারিল, তাহা বিস্ময়ের কথা ও ভাবিবার কথা। পরের কুমন্ত্রণায় দেশের সাধারণ লোকেরা উত্তেজিত হইতেছে বলিলে, সুবিবেচকের মত কথা বলা হয় না। আত্মাদরের মোহে অনেক পিতা মাতা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের ভাল ছেলে গুলিকে পাড়ার দুষ্ট লোকেরাই কুপথে চালায়। জনকতক দেশের দুষ্ট লোকের কথা, দেশের ভাল লোকেরা শুনিয়া খেপিয়া ওঠে কেন? বিজ্ঞদের ভাল কথা শুনিতে লোকের অরুচি হয় কেন? প্রভুতা-সম্পন্নেরা যাহা করিতে পারেন না, ক্ষমতাহীন কয়েকজন লোক তাহা করিতে পারে কেন? মোহ কাটাইয়া অশান্তির কারণ না খুঁজিলে সকল পক্ষেরই অমঙ্গল ঘটিবে।

* * *

জেনোয়া সভা—ইউরোপে যাহাতে যুদ্ধ না বাঁধে, আর সকল দেশে শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, তাহার জন্য ইংরেজদের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ পৃথিবীর সকল দেশেই ইঁহারাই অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং নূতন অর্জ্জন অপেক্ষা অর্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। অন্য দেশগুলির মধ্যে রুশিয়া বড় অশান্ত, কেন না সে প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে নূতন রাষ্ট্রনীতি গড়িতে চাহিতেছে, এখনও তাহা গড়া হয় নাই, এবং অধিকাংশ

ইউরোপীয়েরা তাহার উদ্যোগের বিরোধী। জর্মানি অশান্ত, কেন না—সে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্ম-বেদনায় পীড়িত। জেনোয়ার বিশ্ব-সভায় আহূত হইবার পর, রুশিয়া ও জর্মানি পরস্পরের উন্নতিতে সহায় হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। তাহাদের এই মৈত্রীর অঙ্গীকারে ফ্রান্সের মনে আতঙ্ক জাগিয়াছে, ও সে বেল্‌জিয়াম ও পোলাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া জর্মানিকে দাবাইয়া রাখিবার পথ দেখিতেছে। এ অবস্থায় সকলে সরলভাবে ও প্রফুল্লমনে ইংরেজ মন্ত্রী লয়েডজর্জ্জের শান্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লইবেন কিনা সন্দেহ। সকলে মিলিয়া সন্ধি না করিলে, যে আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলিবে, তাহা আমাদের রাজ-মন্ত্রী অনেকবার বলিয়াছেন। আমরা রাষ্ট্র-নীতি বুঝি না—তাই নিয়তির অঙ্গুলি-সঙ্কেত আমাদের কাছে দুর্লক্ষ্য।

ইউরোপীয়েরা যে যাহার আপনার দাবী হাঁসিল করিতে ব্যস্ত, বেলজিয়ম তাহার নষ্ট সম্পত্তির মূল্য চাহিতেছে, আর রুশিয়ায় অরাজকতা আসিবার পূর্ব্বে, সে দেশে যাহাদের যত স্বার্থের কারখানা ছিল, তাহারা সে সকলের ক্ষতিপূরণ চাহিতেছে। এত বাদ-বিবাদের মধ্যে কিন্তু তুর্কী সম্বন্ধে শেষ বিচার কি হইবে, তাহা তেমন জানা যায় নাই। আগা খাঁ এতদিন সকল বিষয়েই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু তুর্কীর সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, যদি তুর্কীকে আড্রিয়ানোপল্‌ দেওয়া না যায়, তবে পশ্চিম এশিয়ায় ও ভারতে অশান্তি বাড়িয়া উঠিবে।

* * *

কল-কারখানায় শ্রম-জীবীর সংখ্যা—সরকারী বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে বিবিধ শিল্পের কল-কারখানা বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও এই সংখ্যা এক হাজারের কিছু অধিক আর সেই সকল কল-কারখানায় "বাঙ্গালী" শ্রম-জীবীর সংখ্যা নাকি—৪, ৩২, ৫১৫। লোক সংখ্যার গণনায় যে জাতি-বিচার হইয়াছে তাহাতে নিশ্চয়ই ভুল আছে। নিশ্চয়ই এইটি ঘটিয়াছে, যে, যাহারা বাঙ্গলা দেশের বিবিধ শিল্প ও শ্রমের কাজে নিযুক্ত তাহাদের সকলকেই বাঙ্গালী বলা হইয়াছে। আমরা জানি যে বাঙ্গলার কল-কারখানা গুলিতে বিদেশী শ্রম-জীবীরাই কাজ করিয়া থাকে, আর বাঙ্গালী অতি অল্প পরিমাণেই সে সকল স্থলে কাজ করে, এবং যাহারা কাজ করে, তাহাও বেশীর ভাগ আপিষে কেরাণীরূপে। এবারকার সরকারী বিবরণী পড়িয়া কিন্তু লোকের মনে উল্টা ধারণা জন্মিবে, কারণ শ্রমজীবীরা যে প্রদেশে কাজ করে তাহাই লেখা হইয়াছে, কিন্তু ঐ শ্রম-জীবীরা কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ হইতে আসিয়া কাজ করিতেছে তাহার উল্লেখ নাই। বাঙ্গলায় অন্ন-কষ্ট আছে, অথচ কল-কারখানায় বাঙ্গালী শ্রম-জীবী বড় অল্প; ইহার কারণ কি? পারিবারিক ভৃত্যের কাজে বাঙ্গালী বড় বেশী পাওয়া যায় না, এবং বাঙ্গলার সহরে সহরে এখন বিদেশী লোকের সংখ্যা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গবাণী

"ধোঁয়ার ছলনে কাঁদিছে।"

শিল্পী— প্রিয়নাথ সিংহ

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

১ম বর্ষ]　　　আষাঢ়, ১৩২৯　　　[৫ম সংখ্যা

শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে-শায়ক-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
　　কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখিনা যে !
ওরে মাণিক ! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে
তোর　জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষ-পুটে ঢাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
　　বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলা রে ! লুটিয়ে প'লি এ কা'র বুকের 'পর ?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?
তোর　ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায় এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর ?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁক্‌ছে হাওয়া, কাঁপ্‌ছে কুটীর মোর,
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তি-হীনার দ্বারে,
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে
ওরে তাইত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি।
ওরে আমার হারামণি ! ওরে আমার পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মাণিক !
দেখেই তোরে চিনেছি আয় বক্ষে ধরি খানিক।
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক
ওরে হারার ভয়ে ফেল্‌তে পারে চির-কালের মা কি ?
ওরে আমার হারামাণিক ! ওরে আমার পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

এযে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই ত আমার ন'স রে অতিথ অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস্ এই গেহ।
এই মায়ের বুকে থাক্ যাদু তোর য'দিন আছে বাকী,
প্রাণের আড়াল কর্‌তে পারে সৃজন-দিনের মা কি ?
ওরে পাগল ! হারিয়ে যাওয়া ? সেত চোখের ফাঁকি।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বিদেশ বাণিজ্যে ভারতের দশা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবে Indian Fiscal Commission বসিয়াছিল এবং বোম্বাইএর স্যার এব্রাহিম রহিমুতউল্লা হইয়াছিলেন তাহার সভাপতি। কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে বিলম্ব আছে।

এখন কথা হইতেছে, প্রধানতঃ ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে?—Free Trade অর্থাৎ অবাধ-বাণিজ্য, যাহাতে আমদানি রপ্তানির উপর বিশেষ কোন শুল্ক বসে না,—কিম্বা Protection অর্থাৎ রক্ষণশীলতা যাহাতে দেশীয় ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসে এবং বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ হইয়া দেশে সেই জিনিস তৈয়ারী হইবার ব্যবস্থা হয়?

আমার দেশ শিল্প-বাণিজ্যে বড় হইবে, কর্ম্মকুশল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দেশে প্রস্তুত হইবে, স্বদেশী ব্যক্তিগণ অন্নবস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইবে না, দেশের ধন দেশে থাকিবে, চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেই ইহা ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আজ কি লজ্জাকর অবস্থা—

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল-টেনা-ডোর-কপিন?

ছুঁচ্ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

বিনিময়প্রথা হইতেই ব্যবসার উৎপত্তি। আন্তর্জাতিক ব্যবসার মূলেও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও অবাধ বিনিময়—একজনে অন্যের নিকট হইতে তাহার নির্ম্মিত দ্রব্য দিয়া নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ পাট তৈয়ারী করে। বোম্বাই বস্ত্র প্রস্তুত করে। ধরুন, বোম্বাইএর পাট দরকার, বাঙ্গালায় বস্ত্রের প্রয়োজন। এখন বাঙ্গালা কি পাট ছাড়িয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবে, না বোম্বাই পাঠ বুনিতে আরম্ভ করিবে? সেইজন্য বাঙ্গালা বোম্বাইকে পাট বিক্রয় করিবে, এবং বোম্বাই বাঙ্গালাকে বস্ত্র পাঠাইবে। ইহাতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু যখন বাঙ্গালা ইংলণ্ডকে পাট পাঠায় এবং ইংলণ্ড পরিবর্ত্তে ম্যান্‌চেষ্টারের তৈয়ারী কাপড় পাঠায়, তখনই আমরা আপত্তি করি। দেশের ধন বিদেশে গেল, বিলাতের জিনিস আনা বন্ধ কর।

অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ বলেন, অবাধ-বাণিজ্য বন্ধ করিও না। বিলাত যদি কম দামে কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে করুক, ভারতবর্ষের তাহা লওয়া উচিত, তাহার আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বোম্বাই ও বাঙ্গালার মধ্যে অবাধ বিনিময় যেমন ভাল, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের

মধ্যেও সেইরূপ। প্রাদেশিক ব্যবসায়ে যে কথা খাটে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সেই কথা খাটে। তাহার ব্যতিক্রম করিতে গেলে শ্রমবিভাগ ও বিনিময়-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

অর্থনীতি-শাস্ত্র মতে কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু কেবল নীতিশাস্ত্র দেখাইয়াই কোন জাতির এই সভ্য পৃথিবীতে বড় হওয়া কঠিন। যুদ্ধের মত নৃশংস ব্যাপার ত আর নাই। বিশ্বব্যাপী শান্তিই সকলের চেয়ে ভাল। তাই বলিয়া কি দেশপ্রেমিক কর্ম্মবীর বলিবেন যে সৈন্যসামন্ত পুলিশ পাহারা সব এখনই বরখাস্ত কর? অন্য সব জাতি কিন্তু লোলুপ দৃষ্টিতে সঙ্গীন উঁচু করিয়া রহিল। সেইরকম পৃথিবীর অন্য সব জাতি অবাধ-বাণিজ্য ছাড়িয়া রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিল, নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া আমদানি-রপ্তানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইল, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পবাণিজ্য সব তাহাতে নষ্ট হইয়া গেল, আর ভারতবর্ষ কি কেবল অর্থ-নীতির দোহাই দিয়া, মার্শাল্ পিগু আওড়াইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষ্ণব-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে? ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যে ইংলণ্ডের সুবিধা, আমেরিকার সুবিধা, জাপানের সুবিধা। তাহারা পৃথিবীতে এমন সুবিধার জায়গা আর পায় না। অধ্যাপক লিস্ স্মিথ বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে ইংলণ্ডের কেবল এখন একটি 'open market' বা খোলা বাজার আছে—সেটি হইতেছে এই দুর্ভাগ্য দেশ।

কিন্তু পাছে ইংলণ্ডের বা অন্য পাশ্চাত্য জাতির ক্ষতি হয় সেইজন্য সর্ব্বভূতে দয়াশীল নরনারায়ণে বিশ্বাসী ভারত কি আজ আপন ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিবে? গত শতাব্দীর ইতিহাস দেখুন, ইউরোপের এমন একদিন গিয়াছে যে, এই ভারতবর্ষই ইংলণ্ডকে কাপড় পাঠাইয়াছে; আর আজ ইংলণ্ড হইতে ৮১ কোটী টাকার সুতার জিনিস আনিয়া ভারতবর্ষ লজ্জা নিবারণ করিতেছে। আজ আমাদের যেরূপ অবস্থা একশত বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানীরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান অর্থ-নীতিবিদ্ লিষ্ট লিখিয়াছিলেন—জার্ম্মানী কেবল খাবার জিনিস এবং কাঁচা মাল (raw materials) রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য (manufactured goods) বিদেশ হইতে আমদানি করে। এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত জাতির সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ ভারতবর্ষের সেই রকম অবস্থা। ভারতবর্ষের প্রধান রপ্তানির মাল হইতেছে—

(১৯২০—২১ সাল)

(১)	পাট	৬৯ কোটি টাকা	শতকরা	২৯
(২)	তুলা	৬০ "	"	১৭
(৩)	চাউল, গম প্রভৃতি	২৫॥ "	"	১১
(৪)	চামড়া	৮॥ "	"	৪
(৫)	চা	১২ "	"	৫
(৬)	বীজ	১৭ "	"	৭
(৭)	গালা	৭॥ "	"	৩
		১৯৯॥		৭৬

এইগুলিতেই প্রায় আমাদের রপ্তানির বার আনা জিনিস হইয়া যায়—মোট রপ্তানি ২৩৮ কোটি টাকার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা। আর আমাদের আমদানি প্রধানতঃ—

(১৯২০—২১ সাল)

(১)	সূতার জিনিস	১০২	কোটি টাকা	শতকরা	৩০
(২)	লোহা এবং ইস্পাত	৩১	"	"	৮
(৩)	কল কব্জা	২৪	"	"	৭
(৪)	চিনি	১৮॥	"	"	৬
(৫)	রেলওয়ের জিনিসপত্র	১৪	"	"	৪
(৬)	লোহার জিনিস	৯	"	"	৩
(৭)	খনিজ তৈল	৮	"	"	২
(৮)	রেশম	৭	"	"	২
		২০৩॥			৬২

এই আটটী জিনিসেই আমাদের আমদানির প্রায় দশ আনারও উপর হয়। মোট আমদানি দ্রব্যের দাম ৩৩৫ কোটী টাকা—এই আটটীতে ২০২॥০ কোটী টাকা খরচ হয়।

এই আমদানি মালগুলির বেশীভাগই শিল্পজাত দ্রব্য। আর রপ্তানি অধিকাংশই খাদ্যদ্রব্য বা কাঁচা মাল—যাহা বিদেশ হইতে নিপুণ শিল্পীর হাত ঘুরিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসে ;—দেশ হইতে যাইবার সময় যায় সস্তাদরে—আর আসিবার সময় দাম হয় তাহার বহু গুণ।

এই রকমে কিছুদিন চলিলে লিষ্ট জার্ম্মানির পক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষেরও তাহাই হইবে—এই জাতির সর্ব্বনাশ হইবে ; শ্রমশিল্পের কখনও উদ্ধার হইবে না। বিদেশী শিল্পীর জন্যই ভারতবর্ষ কেবল কাঁচা মাল তৈয়ারী করিবে এবং পুনরায় সেই জিনিসই দ্বিগুণ দামে কিনিবে। দেশেরই চামড়া বিলাতে গিয়া tanned হইয়া ফিরিয়া আসিবে, লাভটা লইবে বিদেশীর। লিষ্ট যাহা জার্ম্মানিকে এক শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছেন ভারতবর্ষকে এখন তাহাই করিতে হইবে—"to make her economic progress in the face of the overwhelming industrial supremacy of Great Britain"—অর্থাৎ শ্রমশিল্পে সমুন্নত গ্রেট্ ব্রিটনের সম্মুখে তাহার অর্থ-নৈতিক উন্নতি করিতে হইবে। জার্ম্মানির পক্ষে ইহা যেরূপ দুরূহ ছিল, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা এখন তাহা অপেক্ষা বহু কঠিন। কারণ জার্ম্মানি ছিল স্বাধীন, ভরাতবর্ষ পরাধীন—আবার যে জাতির শিল্প-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে তাহারই অধীন। এই কথা গোপন করিয়া, সত্যকে বিকৃত করিয়া, আমলাতন্ত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া, কোন লাভ নাই। জার্ম্মানির অপেক্ষা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক

বেশী পরাধীন। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতেই দেখা যায় যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ভারতবর্ষের সমস্ত আমদানীর মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের যদি গড় পড়তা হিসাব করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ভাগ হয় শতকরা ৬৩, অর্থাৎ মোট ১৪৬ কোটী টাকার আমদানীর মধ্যে প্রায় ১০০ কোটী টাকার দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে আসিত। যুদ্ধের কয় বৎসর ইংলণ্ডের ভাগ কিছু কমিয়া যায়। ১৯১৭—১৮ সালে ৫৪%, ১৯১৮—১৯ সালে ৪৬%, ১৯১৯—২০সালে ৫১%। আবার গত বৎসর খুব বাড়িয়াছে। নূতন Trade Review বা বাণিজ্য সমালোচনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৯২০—২১ সালে ইংলণ্ডের অংশ বাড়িয়া প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—শতকরা ৬১ ভাগ বিলাতী জিনিস। ঐ বৎসর আমদানীও ভয়ানক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী ছিল প্রায় ১৫০ কোটী টাকা, গত বৎসর হইয়াছে ৩৩৫ কোটী টাকা; তাহার মধ্যে ২০০ কোটী টাকারও উপর ইংলণ্ডের জিনিস। আমদানী রপ্তানী দুই ধরিলেও ইংলণ্ডের ভাগ হইতেছে শতকরা ৫৬, যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ৫২।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষের উপায় কি? লিষ্ট জার্ম্মানিকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং জার্ম্মানি যাহাতে বাঁচিয়া গেল, এই দেশেরও সেই পথে যাওয়া উচিত। সেটী হইতেছে—"A reasoned policy of protection"—অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা। জার্ম্মানির Zollverin বা শুল্ক-যৌথ এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও আশা করি যে এক শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের Fiscal Commissionও সেই পথ নির্দ্দেশ করিবেন।

আর একটা কথা। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বরাজ কেবল রাষ্ট্রীয় অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে এই দেশের প্রয়োজন, তাহা নয়। জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, বাণিজ্যলক্ষ্মীকে দেশমাতৃকার সিংহাসন পার্শ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, প্রবল প্রতাপশালী অসীম কার্য্যকুশল অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগী পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংঘর্ষণের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বীয় স্থান অধিকার করিতে হইলে স্বরাজ একান্ত আবশ্যক। মহামতি রাণাডের কথাগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকা উচিত। পুণা শিল্পসভায় সভাপতির অভিভাষণে মহামতি রাণাডে বলিয়াছিলেন—"The political domination of one country by another attracts far more attention than the more formidable, though unfelt domination which the capital, enterprise and skill of one country exercise over the trade and manufacture of another. This latter domination has an insidious influence which paralyses the springs of all the varied activities which together make up the life of a nation."

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—কেবল Protection বা রক্ষণশীলতায় কোন জাতি বড় হইতে পারে না। বিদেশী আমদানী বন্ধ করিবার এবং নিজের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি

করিবার একটা উপায়—বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসান। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের উপরই খুব উচ্চ হারে শুল্ক বসাইলেই যে দেশের উন্নতি হইবে তাহার কোন অর্থ নাই—ইহাতে কেবল জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে আর গরীব লোক মারা যাইবে। প্রথম দেখিতে হইবে সে জিনিস দেশে তৈয়ারী হইবার সুবিধা আছে কি না, তাহার জন্য যে সব মাল মশলা দরকার তাহার কতটা দেশে আছে, সেই শিল্পের উপযোগী শ্রমজীবী পাওয়া যাইবে কি না, এবং কিরূপ খরচে তাহা তৈয়ারী হইবে ও বিদেশী জিনিসের অপেক্ষা দাম কত বেশী পড়িবে। এইস্থানে ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞ আডাম স্মিথের কথাটী মনে রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে খুব বেশী শুল্ক বসাইয়া আর দাম খুব বেশী বাড়াইয়া সব জাতিই প্রায় প্রত্যেক জিনিসই তৈয়ারী করিতে পারে। উদাহরণ দিয়াছিলেন যে স্কট্‌ল্যাণ্ডে ভাল মদ তৈয়ারী হয় না, কিন্তু কাঁচের ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার ভিতর আঙ্গুর জন্মাইয়া অন্য দেশের অপেক্ষা ত্রিশ গুণ বেশী খরচ করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডে খুব ভাল মদ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। (Wealth of Nations, Vol. I, Book IV, Ch. II, p. 23) ভারতবর্ষেও হয়ত খুব বেশী খরচ করিলে এখনকার আমদানীর অনেক জিনিস তৈয়ারী করা যায়। তাই বলিয়া কি সব বিদেশী পণ্যের উপর কর বসান ঠিক্? তাহাতে ফল হইবে বিপরীত—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নষ্ট হইবে, আমদানী বন্ধ হওয়ার সহিত রপ্তানীও বন্ধ হইবে, কিংবা জিনিসের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত শুল্কভার বহন করিয়াও বিদেশী দ্রব্য আসিবে এবং তাহার দাম সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য জাতিরা রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিল্পোন্নতির অন্য কারণও ছিল—প্রধান হইতেছে স্বাধীনতা। ইংলণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখিলেন যে ভারতীয় সূতার জিনিসের সহিত কিছুতেই সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না। ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলসন্ বলিয়াছেন যে "The cotton and silk goods of India up to the period (1813) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent lower than those fabricated in England." অর্থাৎ ভারতে প্রস্তুত সূতা এবং পশমের জিনিস ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যের অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম দামে বিলাতে বিক্রয় হইত। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, কি করিলেন? ভারতীয় জিনিসের উপর শতকরা ৮১ টাকা শুল্ক বসাইলেন এবং ভারতবর্ষে বিলাতী আমদানীর উপর নামমাত্র ২॥০ টাকা শুল্ক রাখিলেন। ফলে এই হইল যে, ভারতীয় শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিছুদিন পরে শুল্কগুলি তুলিয়া লওয়া হইল, কিন্তু তখন ভারতীয় শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার "Prosperous British India" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The burdensome charges were subsequently removed, but only after the export trade in them had, temporarily or permanently, been destroyed." (পৃঃ ৯০)। ডিগ্‌বি

সাহেবকে অনেক ইংরাজ পক্ষপাতদুষ্ট বলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উইলসন্‌ও সেই কথাই বলিয়াছেন—"It became necessary to protect the latter (English manufactures) by duties of 70 and 80 per cent on their value, or positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory decrees and duties existed, the mills of Paisly and Manchester would have stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, even by the power of steam. They were created by the sacrifice of the Indian manufacture. Had India been independent she would have retaliated, would have imposed prohibition duties upon British goods, and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted her; she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty, and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms."

ইহার ভাবার্থ এই যে, এই রকম উচ্চহারে শুল্ক না বসাইলে, পেস্‌লি বা ম্যানচেষ্টারের কলগুলি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যাইত, আর কখনও চলিত না। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের উপর হইল তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষও ইংলণ্ডীয় পণ্যের উপর বিনিময়ে খুব উচ্চ শুল্ক বসাইয়া ইংলণ্ডকে শিক্ষা দিতে পারিত। কিন্তু বিদেশীর কবলে বলিয়া তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে দেওয়া হইল না। জোর করিয়া ব্রিটিশ জিনিস ভারতের উপর বিনাশুল্কে চাপান হইল এবং বিদেশী বণিক্ রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের দ্বারা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপিয়া খুন করিল।

ভারতের নষ্ট শিল্পের উদ্ধার কেবল অর্থনীতির দ্বারা হইবে না—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও চাই। শুদ্ধ রক্ষণশীলতা কিছু করিতে পারে না, নিজের মতে কাজ করিবার ক্ষমতাও চাই। জগন্মান্য অর্থশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক টসিগ্ তাঁহার একখানি নূতন পুস্তকে ইংলণ্ডের কথা লিখিয়াছেন—"Political freedom came first, and soon was supplemented by industrial freedom. Hence the all-pervading spirit of ambition, reasource and enterprise." অর্থাৎ প্রথমে আসিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, তার পরে শিল্প স্বাধীনতা—সেইজন্য উন্নতির এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সাহস ও প্রচেষ্টা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভিমান

জীবনে যা চেয়েছিলুম, সবই আমার পুরোমাত্রায় পাওয়া হয়েছে, কিন্তু একজনকে দীর্ঘ নয় বছর ধরে ডাকছি,—তবুও তার দেখা পাইনি, সে মরণ। যারা মরণকে বরণ করে' নেবার জন্যে সারাটী জীবন উন্মুখ হয়ে বসে থাকে, তাদের কাছে মরণের শঙ্কা-হরণ মূর্ত্তি এত দুর্ল্ভ কেন? আঁধারের দেবতাকে পেতে হলে জীবনের সব ক'টা আলোই নিভিয়ে দিতে হয়, তা জানি;—দিয়েছিও, কিন্তু কোথায় মৃত্যু-দেবতার সেই স্নেহ-শীতল পরশটুকু?

আমার যে দেহটার পানে এখন লোকে চেয়ে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, একদিন সেই দেহটাই সকলের সকৌতুক সানন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একদিন এই সর্ব্ব-পরিত্যক্ত দেহটার চারিদিকে সৌন্দর্য্যের নন্দন বন উচ্ছ্বসিত হয়ে বর্ণে গন্ধে গানে ফুটে উঠেছিল। মাথায় এক রাশ কালো কোঁকড়ানো চুল এলিয়ে পড়লে আমার পিছনটা আঁধার হয়ে যেত, টানা চোখের চটুল চাউনিতে সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে থাকত, বিম্বাধরে একটু মুচকে হাসলে একেবারে নাকি মুক্তা ঝরে পড়ত; কালাপেড়ে সূক্ষ্ম শুভ্র শাড়ীখানি প'রে' যখন বাগানে প্রজাপতি ধরবার জন্য ছুটাছুটি করতুম, তখন আমার মা বাবাকে বারান্দায় ডেকে বলতেন, 'ওগো, দেখে যাও, একবার দেখে যাও! ও আমার লক্ষ্মী,—ওর কপালে খুব সুখ আছে, রাজার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে।' আমার পানে চেয়ে বাবা হেসে চলে যেতেন।

মস্ত বড় জমীদারের একমাত্র সন্তান আমি, জীবনে দুঃখের করুণ মূর্ত্তি কখনো দেখিনি। দিনের মধ্যে প্রহরে প্রহরে আমার মাষ্টার আসত; একজন ইংরাজী পড়াবে, আর একজন বাংলা, আর একজন সংস্কৃত। গান শেখাবার জন্যে একজন ওস্তাদ আসত। ইংরাজী কায়দাদুরস্ত করবার জন্য একজন ইংরাজ গভর্ণেস্‌ও দিনকতক ছিল। কিন্তু কোনো শিক্ষার বাঁধনেই ধরা পড়তে আমার মন রাজী ছিল না। হায়, সেই সুখের দিনগুলি! সে-সব দিন আমার চোখে এখন স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা হয়ে গেছে, তবু তার মধুর স্মৃতি এখনো আমার দুঃস্বপ্ন-ভরা-চোখে মোহের কাজল মাখিয়ে দিয়ে যায়। যৌবন যে স্মৃতিকে পূজা করে বাসনার বেদীতে বসিয়ে, বার্দ্ধক্য তাকে ভয় করে' চলে যমের মত,—কারণ স্মৃতির জ্বালা যে রক্তবহ্নির কঠোর দহন!

চোদ্দটা বসন্তের পাগল হাওয়া অধীর এই দেহের উপর দিয়ে যখন বয়ে গেল, তখন বাপ-মার মনে হলো যে আমার বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। জমীদারের একমাত্র রূপসী মেয়ে, অনেক বড় ঘর থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এল। কত সম্বন্ধ এলো, কত গেল—তার ঠিকানাই নেই। আমি তখন ধনুকভাঙ্গা পণ করে' বসেছিলুম যে, রাজার ছেলে না হলে বিয়ে করবোনা। তারপর একদিন সন্ধ্যার আঁধারে মার সঙ্গে যখন দীঘির উপর বোটে করে' বেড়াচ্ছি, তখন নায়েব মশাই এসে খবর করলেন যে, পলাশপুরের রাজকুমার নিশীথকান্তি দেব স্বয়ং আমায় দেখতে এসেছেন।

আমার রূপ লোকে আবার যাচাই করতে চায় ? এই রূপের আগুনে আমি সারা বিশ্ব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারি, স্বর্গের ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর যে রূপ দেখে পাগল, আমি মানবী হলেও সেই রূপের রাণী। তাই বড় সাধ করে' মা আমার নাম দিয়েছিলেন 'জ্যোতির্ম্ময়ী'। ফিকে সোণালী রংএর ওড়নাখানা সবুজ রেশমী সিল্ক শাড়ীর উপর অলসভাবে দিয়ে মুক্তাকিরীট মস্তকে মুক্তকুন্তলে যখন আমি নবাগত রাজকুমারের সম্মুখে যোড়করে নমস্কার করে' দাঁড়ালুম, তখনো আমার মুখে সেই গর্ব্বের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হাসি। সেই হাসির ছুরিকাঘাতটা রাজকুমারের অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে বোধ হয় বিঁধে গিছল, নইলে তিনি আমার মুখের দিকে মুখ তুলে আর চাইতে পারলেন না কেন ? তাঁর কপোল ও কর্ণমূল সহসা আরক্ত হয়ে উঠল কেন ? তাঁর হাত থেকে গোলাপের ছোট তোড়াটী পড়ে গেল কেন ? বিদ্যুতের আলোয় ওড়নার ও শাড়ীর শল্মাচুম্‌কিগুলা জোনাকীর মত জ্বল্‌-জ্বল্ করে উঠল, আমার টানা চোখের প্রশান্ত দীপ্তিটী আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমার তরঙ্গোল্লাসিত বুকে আনন্দের লহর গভীরতর স্রোতে ছুটে চলল।

রাজকুমার বললেন, 'গান গাইতে জানো তুমি ?'

আমি সপ্রতিভস্বরে বাবার সমুখেই বললুম, 'জানি বৈ কি।'

বাবা বললেন, 'গাওনা মা একটা। সেই 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটা—'

পিয়ানোর কাছে বসে আমার স্বাভাবিক স্বর যখন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠতে লাগল, তখন নিশীথকান্তি আত্মহারা হয়ে গেলেন। এটা তার সেই দিশেহারা লুব্ধনয়ন থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। আমার বুকে গর্ব্বের হিল্লোল জেগে উঠল—তার মন জয় করতে পেরেছি বলে'। আমি চলে এলুম, বাবার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

এই রাজপুত্র ?—রাজপুত্র আসবে দুধের মত সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে দুর্গম বনের মাঝ থেকে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে—তার কটিতটে ঝুলবে শাণিত কৃপাণ, মস্তকে থাকবে সোণার পাগড়ি, সঙ্গে আসবে তার অসংখ্য সৈন্য—আর পলাশপুরের এ কি রাজপুত্র ? এ যে নিতান্তই অশোভন আমার স্বপ্নের রাজকুমারের কাছে! কিন্তু সুন্দর বটে এই রাজার ছেলে। আমি তখনি মা-কে গিয়ে বললুম, 'রাজপুত্তুর আমার চাইনা মা, আমি গরীবের ঘরের বউ হব।' মা ত হেসেই খুন! 'জমীদারের মেয়ের গরীবের ঘরে কি বিয়ে হয় পাগলি ? তাতে যে কর্ত্তাকে সকলের কাছে মাথা নীচু করে' থাকতে হবে। তুই যেন কি! তা-ও কি হয়, বাছা ?' কিন্তু একটা খেয়াল আমার মাথায় একবার ঢুকলে সেটা আর কিছুতেই বেরিয়ে যেতে চাইত না। মা বাবাকে ডেকে বললেন, আমার কান্নাকাটি দেখে বাবা আবার অন্য যায়গায় বর খুঁজতে লোক পাঠালেন। আমি আমাদের 'জুঁইমহল' নামে বাগানবাড়ীতে গিয়ে ফুলের মালা গাঁথতে লাগলুম— আমার হবু-বরের গলায় পরাবার জন্য।

এবার সম্বন্ধ এলো অনাথ এক ভট্চায্যির ছেলের সঙ্গে। তার কেউ নেই—কেবল আছে

তার রূপ আর বিদ্যা। সংস্কৃতে সে নাকি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যোগাদ্যার মন্দিরের ব্রহ্মচারী সে, সব পণ্ডিত তর্কে তার কাছে হেরে গিয়ে তাকে উপাধি দিয়েছে 'তর্কবাচস্পতি'। তরুণ-প্রফুল্ল-আননে সে একদিন গোধূলির আলোয় সত্যিই আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলে, আমি আমার বুকজোড়া গর্ব্ব নিয়ে অবহেলায় যখন সেই মালা নতবদনে তার কণ্ঠে ফিরিয়ে দিলুম, তখন মালাগাছটা তার পায়ের কাছেই পড়ে গেল। মহিলার দল আসন্ন অমঙ্গলাশঙ্কায় অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

বিয়ের পর আমার তেজস্বী স্বামী বাবার অনুরোধে ঘর-জামাই থাকতে কিছুতেই স্বীকার পেলেন না। তিনি বলিলেন, "এমনি চুক্তিতে ত আমি বিয়ে করিনি। আমার স্ত্রী আমারই শাকান্ন আমার সঙ্গে ভাগ করে খাবে।' মা কাঁদলেন, বাবা রেগে গেলেন। বাবা শেষে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবি, জ্যোতি? ঐ গোঁয়ার গোবিন্দটার সঙ্গে যাবি, না, আমাদের ঘরে থাকবি?' ছেলেবেলার শিবপূজা বোধ হয় আমার সার্থক হয়েছিল, আমি মুখ তুলতেই দেখি—আমার চোখের সামনেই আমার কিশোর যৌবনের আরাধ্য দেবতা মহেশ্বর মূর্ত্তিতে শশাঙ্ক-লাঞ্ছন-সৌন্দর্য্যে দাঁড়াইয়া। অবহেলায় যার কণ্ঠে মালা ছুঁড়ে দিছলুম, তাঁর সৌম্যকান্তির নিকটে আমার অটল গর্ব্ব, ভুবনমোহন রূপ হার মেনে গেল, আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'যাঁর হাতে আমায় তুলে দিয়েছেন, তাঁরই সঙ্গে আমি যাবো।' আমার সেই মহেশ্বর-মূর্ত্তির মোহন অধরে সন্ধ্যার যোগক্ষান্ত অরুণ রাগটী সরলভাবে ফুটে উঠল। আমি তাঁরই আদেশে বাপের-দেওয়া সব বসনভূষণ খুলে ফেলে' দীন বেশে মুগ্ধার মত তার পিছনে পিছনে এগিয়ে চললুম।

যোগাদ্যার মন্দিরের কাছে ছায়া-নিবিড় একখানি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় বসে' তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা করতেন, কত শিষ্য তাঁর চরণোপান্তে বসে' জ্ঞানামৃত পান করে' তৃপ্তি পেত, কত রাজা মহারাজার আহ্বান তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করতেন, কিন্তু দুটী বছরের গভীর সান্নিধ্যে আমি বেশ বুঝেছিলুম যে আমার এই দেবতাদুর্লভ সৌন্দর্য্যে তিনি আত্মহারা না হলেও আমায় সমস্ত হৃদয়টা দিয়েই ভালবেসেছিলেন। কাপড়ের পাকে যেমন আগুন লুকিয়ে রাখা যায়না, ভালবাসাও তেমনি অন্তরের গোপন-নিকেতনে চিরগোপন করা চলেনা। অব্যর্থভাবেই এই গভীর প্রীতি আত্মপ্রকাশ করবে, সহস্রকণ্ঠে একদিন সমস্বরে চীৎকার করে' বলে' উঠবে—'ভালবাসি, বড় ভালবাসি!'

একদিন রান্নাঘরে আমি রাঁধছি, তিনি এসে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ধূমের অন্ধকারে যেন আমার জ্যোতির্ম্ময় দেবতা! তিনি হেসে বললেন, 'ইস্! তুমি যে ঘেমে গেছ, জ্যোতি!'

'সেটা কি আজ নূতন দেখছ?'

'রাজার ঘরে ছিলে তুমি—এত কষ্ট সইতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। কি বল?'

'ছাড়ো, ছাড়ো, আমার সকড়ি হাত, আমার কষ্ট সইতে খুব আমোদ হয়। যা জানিনা,

যা দেখিনি—তা' আমার জানতে, দেখতে ইচ্ছা করে। আমার কষ্ট সইতে খুব আমোদ হয়। সুখের মুখ দেখাও যেমন সৌভাগ্য, দুঃখের মুখ দেখাও তেমনি। বুঝলে, ভট্‌চায্যি মশাই ?'

'দেখ, আজ আমার একটী বড় শিষ্য এসেছেন—পলাশপুরের রাজকুমার—'

আমার মুক্ত কুন্তলের দু'একটী চূর্ণ অলক চোখের আশেপাশে সাপের মত এসে পড়েছিল—কপালের স্বেদবিন্দু চিক্কণ গণ্ডতটে শিশিরকণার মতই ফুটে উঠেছিল—রন্ধনশালার ধূমকুণ্ডল উদ্যতফণ সহস্র নাগিনীর মত আমার চারিদিকে লেলিহ রসনা নিয়ে যেন ছুটাছুটি করতে লাগল। আমি সঙ্কুচিতভাবে কইলুম, 'পলাশপুরের রাজপুত্তুর ? নাম কি বল দেখি ?'

পুঁথিখানা রেখে তিনি বললেন, 'কেন গা, তুমি তাঁকে চেনো নাকি ?'

কোমরের অঞ্চলবেষ্টন হাত ধুয়ে খুলে আমি উন্মনাভাবে বললুম, 'হাঁ চিনি বই কি—'

'নিশীথকান্তিকে তুমি চেনো ? সে চিরকুমার, কোথায় যেন একবার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার পর ভেঙ্গে যায়, তারপর আর সে বাপের অনুরোধসত্ত্বেও বিয়ে করেনি। প্রকাণ্ড পণ্ডিত সে, 'সকলশাস্ত্রপারংগমঃ' যাকে বলে—এ সেই। রাজার ছেলে আজ সন্ন্যাসী—সংসারের কোনই বন্ধন নেই তার। এমন কখনো দেখেছ ? তরুণ বয়স—তীর্থে তীর্থে ঘুরেই কাটাচ্ছে।'

'ওসব ভণ্ডামি !'

'ছি ছি, জ্যোতি, ও কথা বলো না। নিশীথ দেবতার মতই—'

'খুব বোঝা গেছে গো, তুমি এখন নিজের কাজে মন দাও গে।'

গভীর আদরে স্বামী আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে সানন্দে আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। আদরের মর্য্যাদা আমি ত কোন দিনই বুঝতে শিখিনি—আমার দেবতার সস্নেহ আহ্বান অবহেলায় আমি ফিরিয়ে দিলুম। স্বামী চলে গেলে নিশীথকান্তির সেই কিশোর সৌন্দর্য্য আমার স্মৃতির পর্দ্দায় চলন্ত ছবির মতই ফুটে উঠল, আমার সব রান্নাই গুলিয়ে গেল। কিন্তু আমার স্বামীর কাছে সে ? পরিবেষণের সময় নিশীথকান্তির সন্ন্যাসবেশ দেখলুম। অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে আমরা যেটা দেখি, তাহাই আমাদের চোখে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে—আজ রাজপুত্তুরকে বোধ হয় এই রকম করেই দেখেছিলুম, তাই এই তরুণ সুন্দর গৌরকান্তি কাষায়বাস জটাচূড় সন্ন্যাসীকে দেখে একে একে আমার মনে পড়ে গেল—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের কথা। আমার স্বামীও তাঁর পাশে আহারে বসেছেন—দুজনেই হবিষ্যভোজী। নতবদনে রাজপুত্র আহার করছিলেন—শ্বেতশতদল-সন্নিভ আমার চরণের দিকে চেয়ে অর্দ্ধগুণ্ঠিত আমার মুখের পানেও বোধ হয় একটিবার চাইতে বড় সাধ হয়েছিল তাঁর,—তাই তিনি একটিবার আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, নিমেষে চার চক্ষুর একটা অপ্রতিভ মিলন হয়ে গেল। আমি চাইনি—কখনো চাইনি সে মিলন, তাই স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি স্মরণ করে' তাঁকে মনে মনেই প্রণাম করলুম সসম্ভ্রমে।...........

একদিন—তুদিন—তিনদিন—রাজপুত্রে সারা সকাল-সন্ধ্যা স্বামীর সঙ্গে নব্য ন্যায়ের আলোচনা করছেন। আমার বুভুক্ষিত যৌবন অনাদৃত কুসুমদামের মতই বিজন প্রান্তরে পড়ে রইল, কার উপর কি দাবী আছে আমার? সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীর শিষ্যবর্গ যখন যোগাত্মার মন্দিরটী স্তোত্রগানে মুখর করে' তুলত, শঙ্খঘণ্টার অজস্ররোলে ধূপধুনার নিবিড়-গন্ধে ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সেই গভীর স্তুতি বন্দনায় সারাটি কানন যখন একটা ভক্ত-নিকেতন হয়ে পড়ত,—তখন শূন্যমনে স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নায় পরিস্নাত হয়ে আমার মনটা যেন অনন্ত অতৃপ্তিদুঃখে 'হা—হা' করে উঠত। কে আমার? কে আমায় চায়? সর্ব্বস্ব দিয়ে এ-ই না একদিন আমায় নিতে এসেছিল? ভগবান কিন্তু যা আমায় দিয়েছেন, তা-ই বা আমি হাত বাড়িয়ে নিতে পেরেছি কই? স্বামী আমার কর্ম্মনিপুণতায় ও সেবাতৎপরতায় যথেষ্ট সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু তুজনের জীবনের মাঝখান দিয়ে যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান সীমাহীন সমুদ্রের মত বয়ে যাচ্ছিল, তা তিনি 'তর্কবাচস্পতি' হয়েও দেখতে পাননি। নানা চিন্তায় মনটা আমার এমনি বিষতিক্ত হয়ে উঠল যে কোন্‌টা সোজা পথ, কোন্‌টা বাঁকা পথ—তা আমি দেখতেই পেলুম না।............

'জ্যোতি—জ্যোতি—জ্যোতি—ঘুমুলে?' রাত্রে স্বামী যখন ডাকলেন, তখন আমি না ঘুমুলেও মনে মনে বহুদূরস্থ একটা ঘুমের রাজ্যে চলে গিছলুম। পিছন দিকে দাস-দাসী, ধনরত্ন, বসন-ভূষণ, আমোদ-উৎসব—সব ফেলে এসেছি, কিন্তু এক দিনের তরেও সেজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। স্বামীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশ ভোগ করতে ভারি আনন্দ হতো আমার—একটা লোক সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে' আমায় চাইছে, আমি উচ্চ গৌরবের আসনে বসে তিল তিল করে' তাকে আমার বহুকল্পতুর্ল্ভ প্রেমকণা দান করছি—এর অপরিসীম আনন্দে আমায় মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু নিশীথের মতই নীরবচরণে এই নিশীথকান্তি উল্কার মত আমার জীবন-কক্ষাপথে সহসা অতীত তিমিরাবরণ ভেদ করে' কোথা হতে ছুটে এল?.........ওগো আমার জীবন মরণের দেবতা! ধনবৈভবের অহঙ্কার থেকে আমার বাঁচিয়েছ, এইবার আমায় মোহের অন্ধকার থেকে বাঁচাও! মাথার সব শিরাগুলো প্রচণ্ড যাতনায় ঝন্ ঝন্ করছিল, সারা দেহ একটা বিপ্লব সূচনায় তড়িৎ-স্পৃষ্ট লতার মতন সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে, কানে বাজছে শুধু নিশীথ রজনীর একটা বাঁশীর গান!............

'নিশীথকে তুমি চেনো?'

'না।'

'তবে সেদিন বললে—চিনি?'

'যদিই বলি—চিনি?'

'ও তোমায় তুপুরবেলা কি বলছিল?'

'ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙ্গে যায়—আমায় সেই সব কথা বলছিলেন।'

'ওর সঙ্গে কথা কয়ো না, ওর ব্রত ভঙ্গ হবে। এখনো ছেলে মানুষ—'

'কেন, আমি কি রাক্ষসী, না দানবী ?'

সহসা স্বামীর ললাটে ক্রোধের আগুন জলে উঠল। তিনি বললেন, 'ও সম্বন্ধে আর আমার সঙ্গে কোনও কথা বলো না। নিশীথ কাল সন্ধ্যায় চন্দ্রনাথ চলে যাবে, ঠিক করেছে।'

'তা সে কথা আমায় শোনাবার দরকার ?'

'আমিই ওকে যেতে আদেশ করেছি—তোমার সঙ্গে কথা কয়েছিল বলে।'

'ওঃ !'—বলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই পাশ ফিরে শুলুম। প্রদীপের স্বল্পালোকে কক্ষতলে বসে' স্বামী পড়াশুনা করতে লাগলেন। আমার দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্ব আবার জেগে উঠল—তার সকল অহঙ্কার নিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে এসে সাদরে আমার বল্লরী-প্রতিম দেহটীকে বুকের মাঝখানে পরিমৃদিত মৃণালের মত আঁকড়ে ধরে বললেন, 'রাগ করলে, জ্যোতি ? তোমার মঙ্গলের জন্যই ওকথা বলেছি, তোমার মনে কস্ট দেবার জন্য নয়। জ্যোতি, বল রাগ করোনি ?'

'না।'

'কথা কইবে না ?'

'না।'

'ঘুম পেয়েছে তোমার ?'

'না।'

স্বামীর মুখের উপর একটী তৃপ্ত প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠল। তিনি চিরন্তন অভ্যাসমত দূরে একখানি জীর্ণ কম্বলে শুয়ে পড়লেন।............

এতই হীন হয়ে গেছি আমি ? আমার কি প্রাণ ছিল না ? ক্ষুধা ছিল না ? আত্মসম্মান ছিল না ? কই, কখনো ত তিনি অমন কঠোর-গম্ভীর মূর্ত্তিতে আমার পানে চান নি,—আজ এমন কি দোষ করলুম যে নিশীথের সঙ্গে কথা কওয়া আমার বারণ হয়ে গেল ? আমার ব্যথিত অভিমান আঘাত ফিরিয়ে দিতেই শিখেছিল, আঘাত নিতে শেখেনি। তাই আজ তাঁর ব্যবহারটা নীচ সন্দেহ-জাত বলেই আমার মনে হলো, আমার স্বামীর মত যে সব-হারিয়ে ভালবাসে, সে-যে কোনও তৃতীয় জনের কথা সইতে পারে না—এ সোজা কথাটা আমার বিদ্রোহী মনের ত্রিসীমায়ও এলোনা একবার। তাই পরদিন দুপুরবেলা আহারান্তে রাজপুত্র যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন আমি মৌনমুখে তাঁর কক্ষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি-যে কথাবার্ত্তা তাঁর সঙ্গে হয়েছিল, তা আজ আমার একটুও মনে নেই।...সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় নিশীথকান্তিকে পথ দেখিয়ে যখন ঠাকুরের উদ্যানের বাহিরে এসে দাঁড়ালুম,—রাজপুত্র বললেন, 'আর তোমায় ছাড়বো না, জ্যোতি। তোমাকেই খুঁজেছি দিবানিশি ধরে—আমার এ সন্ন্যাস মিথ্যা।'

. চোখের উপর সমগ্র পৃথিবীটা গোলকের মত ঘুরছিল। ধূমের অন্ধকারে যেমন অগ্নিশিখা ফুটে উঠে, তেমনি করে' আমার জড়ীকৃত নয়নের অস্পষ্ট দীপ্তিতে ফুটে উঠল—আমার স্বামীর সেই চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তি—বেদনা ভরা অথচ শান্তিময়, সকরুণ অথচ ক্ষমাসুন্দর! 'জ্যোতির্ম্ময়ি—কি সুন্দর নামটি তোমার! সারাটি বছর শুধু তোমাকেই ভেবেচি, তোমাকেই চেয়েচি, তোমাকেই খুঁজেচি। তোমায় না পেলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে—'

রাজপুত্রের এই সকাতর প্রণয়-নিবেদনের একটী শব্দও আমার অন্তরে প্রবেশ করেনি। এতক্ষণ তিনি নিশ্চয়ই আমায় খুঁজচেন, সহস্র কাজের মধ্যে থেকেও একদণ্ডের জন্য ত তিনি আমার কাছ-ছাড়া হননি! বুকের রক্ত দিয়ে তিনি আমায় ভালবেসেছিলেন, তাই এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার শরীর খারাপ হলে সারাদিন আমার সকল কাজকর্ম্মে নিষেধ হয়ে যেত। চিন্তায়, কর্ম্মে, ভাবনায়, ধ্যানে, আমি যথার্থই তাঁর গৃহিণী, সচিব, সাথী ও প্রিয়শিষ্যা হয়েছিলুম। কিন্তু আমার বিক্ষুব্ধ যৌবনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুকের মাঝে যে কালসাপের বিষ-নিষেক লুকিয়ে রেখেছিল, আজ তা নির্লজ্জভাবে ছুটে চল্‌লো আমার এই ছার দেহটার উপর দিয়ে নরকের নদীর মত।......

সাপুড়ে যতক্ষণ সাপটাকে মন্ত্রৌষধির দ্বারা রুদ্ধবীর্য্য করে রাখে, ততক্ষণ তার নড়বারই ক্ষমতা থাকে না। নিশীথকান্তি সত্যই আমায় এই রকম করে' একটা নিশীথের দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চল্‌ছিল—আমার সর্ব্বনাশী যৌবন তার পাপাগ্নির সকল ইন্ধন যুগিয়ে দিয়েছিল। তৃষ্ণা মিটে গেল যে প্রগাঢ় ঘৃণাপূর্ণ অবসাদ আসে, সেইটে যখন এলো, তখন দেখি—আমি একেবারে সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে। আর আমার তখন আপন বলবার কেউ নেই। যা আজ আমাদের সব চেয়ে আদরের, কাল তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই সেই আদরের জিনিষটা আমরা দূরে ফেলে দিই। যুগ যুগান্তধরে প্রকৃতির ও সমাজের মাঝে এই নিয়মটাই একটানা চলে আসছে। তাই নিশীথকান্তি যেদিন আমার সঙ্গে ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার কর্‌তে লাগল, সেদিন আমার মনটা পাগলা ঘোড়ার মত একেবারেই রুখে দাঁড়াল—মুক্তির পথের দিকে, স্বেচ্ছাচারিতার দিকে, স্বাধীনতার দিকে। মনে হল—বন্ধনের নাগপাশ দিয়ে মানুষ যেটাকে বাঁধে, তার সার্থকতা কখনই হয় না। তাই আজ যেদিকে দুচোখ যায়, সেইদিকেই লক্ষ্যহীন হয়ে ছুটে চললুম। তখনো আমার মনে পড়ত—কৈশোরের সেই জুঁইমহল, যৌবনের সেই যোগাদ্যাপূজন।

স্বেচ্ছায় যে পথ ছেড়ে চলে এসেছি, তার জন্য একটুও অনুশোচনা হতনা আমার। এক একটা বাঁকের পথে আমি এক একটা কাঁটা দিয়ে এসেছি—আর সে পথে ফেরবারই উপায় নেই। যার উপর এত রাগ করে চলে এসেছিলুম, তাকে কিন্তু একদণ্ডের তরেও ভুলিনি। কেমন করে ভুলবো সেই তেজোদীপ্ত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!—সে যে আমার ধ্যানের দেবতা, খেলার নর্ম্মবন্ধু, প্রাণের গভীর আরাম। ঝড়ের উপর দিয়ে, তুফানের ভিতর দিয়ে, বজ্রের মাঝখান দিয়ে যে প্রচণ্ড দানব-

বাসনা জেগে উঠত প্রলাপের ঘোরের মত, একদিন সেই বাসনাই প্রতিজ্ঞার তর্জ্জনী উঁচু করে' মনের মাঝে খুব জোরে বলে উঠলো—'শান্তি চাই আমি—শুধু শান্তি চাই !'............

প্রভাতের আলো তখন আকাশের উপর থেকে দেবতার মঙ্গলের মত ধরণীর বুকে গলে পড়েছে। আমার প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীর নীচের বারান্দায় ভিক্ষার্থী একজন দণ্ডী এসে দাঁড়িয়েছে। দরোয়ানের কাছে সে অবহেলার মুষ্টিভিক্ষা পেয়ে আবার ফিরে চললো সুদূরের পথে; তখন আমার সব গর্ব্ব, সব অভিমান, সব অহঙ্কার চোখের জলে ভেসে গেল;—আমি সব ছেড়ে রাস্তার উপর দিয়ে পাগলিনীর মতই ছুটে চললুম তার পিছনে পিছনে। ওগো, তোমাকেই যে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দেহ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়ে চেয়েছি আমি;—তুমি আমার অন্তর্য্যামী হয়েও এ কথা বুঝতে পারোনি, প্রিয়তম? যখন তাঁর চরণতলে তরঙ্গের মত আছড়ে পড়লুম, তখন তিনি পূর্ব্বেরই মত প্রশান্তস্বরে বললেন, 'কে—জ্যোতি?'

'ওগো, শুধু বল আমায় মার্জ্জনা করলে? আর আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনি। বিষের ব্যাধি আমার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে রয়েছে, দেবতার চরণ ছোঁবার মত দুঃসাহস আমার নেই। আমারই দ্বারে ভিক্ষা নিয়ে তুমি আজ আমার সকল কলঙ্কের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছ। এখন আমায় ক্ষমা কর, ওগো আমার জন্ম-জন্মান্তরের দেবতা! পশুর চেয়েও অধম, ঘৃণ্য আমি—'

একটু হেসে তিনি বললেন, 'আমি ক্ষমা করবার কে জ্যোতি?'

'ওগো, তোমারই উপর অভিমান করে চলে এসেছিলুম, আবার আজ তুমিই আমার দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার কাছ থেকে মুক্তির অভয়মন্ত্র না পেলে নরকেও আমার স্থান হবে না। ক্ষমা কর, ওগো ক্ষমা কর আমায়!'

শ্রান্তভাবে একটা গাছের তলায় তিনি বসে পড়লেন; যেন এখনো অনেকদূর যেতে হবে—চোখে তাঁর এমনি একটী উজ্জ্বল, সুদূর, শান্ত চাউনি। তেমনি আদরে তিনি আমার মস্তক চুম্বন করলেন—সে স্পর্শ চন্দন-প্রলেপের মতই স্নিগ্ধ ও মধুর।

অন্ধ যেমন স্বপ্নে সুখের স্মৃতি দেখে' জাগরণের যাতনায় বুকফাটাস্বরে কেঁদে ফেলে, সহসা তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তেমনি কেঁদে ফেললুম। এতদিনে পাষাণের বুক চিরে গোমুখীর গৈরিকনির্ঝর ছুটে বেরিয়ে পড়ল। সুদূরের বিজনপথ দূর-প্রসারিত ব্যগ্র আলিঙ্গনপাশে আমায় বেঁধে নিলে।

আজ তাই আমি আঁধার পথের ভিখারিণী।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

বাংলার নবযুগের কথা

চতুর্থ কথা—

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

(১)

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এই বড় কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়া প্রথম যৌবনে অন্তরে স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মসমাজ এখন আর নাই। থাকিলে বাংলা আজ এতটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িত না।

যে স্বাধীনতা এবং মানবতা বাংলার চিন্তার এবং সাধনার সনাতন বৈশিষ্ট্য, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার নূতন প্রেরণা লইয়া আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীকে একদিন মাতাইয়া তুলিয়াছিল, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে দেশের গতানুগতিক ধর্ম্মের এবং সমাজের পুরাতন সংস্কারের ও রীতিনীতির নিগড় ভাঙ্গিয়া নিজেদের মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—সেই স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শ বুকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হন। ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজের আইন-কানুন দেশমধ্যে সাধারণভাবে একটা স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে আংশিক-ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্ম-সমাজই এই স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিটী প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এই খানেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। এই ব্রাহ্মসমাজ বাংলার নিজস্ব বস্তু। অন্য কোনও প্রদেশে এই বস্তুটি ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ এই যে, বাংলা যে স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা পাইয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশ তাহা পায় নাই।

বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশেরা নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় সমাজে একটা প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য আনিয়া ফেলেন; আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতির বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের বন্যায় সমাজকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হ'ন। কিন্তু ইহারই মধ্যে যাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বলবতী ছিল, তাঁহারা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ত্রিবিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষা করেন, ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই সত্য কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন ?

(২)

কেবল ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসনের হাতে এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কা-নিবারণের ভার ছাড়িয়া দিলে চলিত কি ? য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লবের মুখে স্বাধীনতার এবং মানবতার যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়িয়া সংশোধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই বৈপ্লবিক আদর্শের উদ্দাম আস্ফালন কালক্রমে য়ুরোপেও সংযত হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-শাসনের উপরে একান্তভাবে আমাদের বিগত শত বর্ষের সামাজিক অভিব্যক্তিধারার পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিলে য়ুরোপের মতন এদেশেও প্রথমযুগের স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শের উদ্দামতা আপনি সংযত হইয়া আসিত,—এরূপ কল্পনা করা যায় বটে। আর সে অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-শাসনই, ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিয়াছেন, আপনা হইতেই সে কাজটা করিত। ফলতঃ ইংরাজী শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মসমাজও এ কাজটা করিয়াছেন। সে শিক্ষা দেশময় পরিব্যাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কোনও দিকেই সফলতার সম্ভাবনা ছিল না। এ কথা যে একেবারে মিথ্যা, এমনও নহে। কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলেও বাংলার নবযুগের ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিয়াছেন, তাহার মূল্য হ্রাস হয় না।

প্রথমতঃ, শুধু ইংরাজী শিক্ষাই যদি আমাদের নবযুগের নবীন চিন্তা ও সাধনাকে পরিচালিত করিত, তাহা হইলে এই যুগের উপরে এখনও আমাদের স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও সাধনার যে ছাপটা অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যাইত। য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া এবং ব্রিটিশের শাসনতন্ত্রাধীনে থাকিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের ছাঁচেই গড়িয়া উঠিতাম। জাপানের মত একটা স্বাধীন ও পরাক্রমশালী জাতি যখন নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, য়ুরোপের প্রভাবে, য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়াই য়ুরোপের মতন হইয়া উঠিতেছে, তখন আমাদের মতন একটা পরাধীন ও আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে এই অপরিহার্য্য পরিণাম পরিহার করিবার সম্ভাবনা ছিল কি ?

আমাদের এই আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্রেক করেন, ব্রাহ্মসমাজ। আর এই কর্ম্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রাজা রামমোহন ইহার সূত্রপাত করিয়া যান, একথা সত্য। কিন্তু রাজা বিলাত চলিয়া গেলে এবং সেখানে দেহরক্ষা করিবার পরে তাঁহার সংস্কার-ব্রত উদযাপনের সকল সম্ভাবনা একরূপ লোপ পাইয়া যায়। তিনি

যে কাজটা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় অতি অল্প লোকই সে কাজের প্রকৃত মর্ম্ম এবং মূল্য ধরিতে পারিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি যে ইংরাজী শিক্ষার পত্তন করেন, সেই শিক্ষার প্রভাব তাঁহার নিজের কর্ম্মের প্রভাবকেই ছাপাইয়া উঠে। রাজা একটা সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজার সাধনাতে শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির, গুরুর উপদেশের সঙ্গে স্বানুভূতির, সমাজানুগত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের সূত্রটা যদি দেশের লোকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিত, তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষা যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলা জাগাইয়া তুলে, তাহা উঠিতে পারিত না। রাজার অভাবেই তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত ইংরাজী শিক্ষা ও যুরোপীয় সাধনা একটা দেশব্যাপী নাস্তিক্য ও বিপ্লবের আশঙ্কা জাগাইয়া তোলে। এই আশঙ্কা নিবারণ করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রাজা রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানে তাঁহার ব্রহ্মসভা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসাধনে রাজার সতীর্থ এবং রাজার সংস্কারকার্য্যে তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাকে ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এদেশে থাকিতে যাঁহারা তাঁহার সহচর এবং অনুচর ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তিনি চলিয়া গেলে, এই ব্রহ্মসভা হইতে সরিয়া পড়েন। জোড়াসাঁকোর ব্রহ্মসভার বাড়ীটা এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই রাজার এই কীর্ত্তির স্মৃতিকে রক্ষা করিতেছিলেন। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রাজাকে দেখিয়াছিলেন। রাজা আদর করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে "বেরাদর" বলিয়া ডাকিতেন। বিকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সময় অনেকদিন রাজা আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে রমাপ্রসাদের সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথকেও গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন। এইরূপে বালক দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। দেবেন্দ্রনাথের মুখে এ সকল কথা শুনিয়াছি। বিলাত যাইবার সময় রাজা তাঁহার সুহৃদ্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া "বেরাদর" দেবেন্দ্রনাথকেও ডাকাইয়া পাঠান; এবং নীরব করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে এই নীরব করমর্দ্দনের দ্বারাই রাজা তাঁহার উপরে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া যান। এইভাবে রাজার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে বাল্যকাল হইতেই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রাজার চরিত্রের প্রভাবেই ফুটিয়া উঠেন; রাজার বিশিষ্ট সাধন-পন্থার কিম্বা তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অনুশীলন করেন নাই। ফলতঃ দেবেন্দ্রনাথ রাজার সিদ্ধান্ত ও সাধন দুইই বর্জ্জন করেন। তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে রাজা অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। এ বিষয়ে রাজা শঙ্করের শিষ্য ছিলেন; তবে পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদীরা পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রাজা তাহাকে

শঙ্করমতের সত্য অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন না। পণ্ডিতবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কহেন যে রাজা নিজের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে শঙ্কর এবং রামানুজের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, রাজা যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের নামগন্ধমাত্র তিনি সহিতে পারিতেন না। রাজা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। পরমহংস হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন। মহর্ষির সাধন অন্য পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। মহর্ষির ভক্তিসাধনের উপরে হাফেজ, সাদী প্রভৃতি পারসিক ভক্তদিগের খুব প্রভাব পড়িয়াছিল। ভগবদ্-প্রেমের কথা কহিতে কহিতে মহর্ষি সর্ব্বদাই ভাবে গদগদ হইয়া হাফেজ প্রভৃতির কবিতা আবৃত্তি করিতেন। ভক্তি সাধনায় মহর্ষি ইস্‌লামীয় ভক্তির সখ্যরসের বিশেষ অনুবর্ত্তন করিতেন। রাজার ভক্তি রসের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছিল কিনা সন্দেহ। রাজার গ্রন্থাদিতে তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের দিকটা যে পরিমাণে ফুটিয়াছে, ভক্তিসাধনের দিকটা সে পরিমাণে ফোটে নাই। রাজা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই সরাসরিভাবে এই প্রামাণ্য বর্জ্জন করেন।

রাজার সময়ে এবং তাঁহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজে "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য" ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ হইত। তখনকার ব্রাহ্মসমাজ বেদ মানিতেন। ক্রমে বেদে ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে, অথবা বেদ দেববাদ এবং দেবোপাসনাও প্রচার করিয়াছেন, মহর্ষির অন্তরে এ সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য মহর্ষি চারিজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বেদ পড়িবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। ইঁহারা বেদ পড়িয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন যে বেদে কেবল ব্রহ্মবাদ উপদিষ্ট হয় না; দেববাদ ও দেবোপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে। মানুষের রচিত অপরাপর গ্রন্থে যেমন সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশিয়া রহে, বেদেও সেইরূপ সত্যাসত্য মিশিয়া আছে। এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলেন। আর এখানেও তিনি রাজার পথ ছাড়িয়া যান।

বেদে যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়া আছে, রাজা ইহা জানিতেন। শব্দার্থের দ্বারা বিচার করিলে উপনিষদেও যে দেবোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাও রাজার অবিদিত ছিল না। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাও এ সকল কথা জানিতেন। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে এ সকল সত্ত্বেও যে ভাবে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে খবরও রাজা রাখিতেন। বেদে যাহা কিছু আছে, তাহারই যে প্রামাণ্য-মর্য্যাদা আছে, এমন নহে। বেদে অনেক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা আছে, এ সকলের শাস্ত্র-মর্য্যাদা নাই। কারণ শাস্ত্র দৃষ্ট বিষয়ের প্রমাণ দেয় না। যাহা চক্ষে দেখা যায়, চক্ষুই তার প্রমাণ। তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন; তাহাতে শাস্ত্রের অধিকারও নাই। এই জন্য মীমাংসা "অদৃষ্টাত্মকং শাস্ত্রং," শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টও

ত কল্পিত হইতে পারে। আর সত্য হইলেও যাহা কিছু অদৃষ্ট অথবা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহারই সঙ্গে আত্মার যে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে, এমন নহে। এই প্রশ্ন উঠিলে শাস্ত্রের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হয়—"মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং।" উত্তর-মীমাংসা প্রামাণ্য-শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ বা উপনিষদের যে সকল অংশ মুক্তির উপদেশ দেয়, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-শাস্ত্র। আর অন্য যাহা কিছু তাহা অর্থবাদ মাত্র; অর্থবাদের শাস্ত্রপ্রামাণ্য নাই। উপনিষদ বারংবার কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি হয় না। সুতরাং বেদ এবং উপনিষদের যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার এবং ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-শাস্ত্র। গোটা বেদ বা উপনিষদের শাস্ত্র হিসাবে কোনও প্রামাণ্য নাই। রাজা এই পথেই প্রাচীন মীমাংসকদিগের হাত ধরিয়া বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এ পথে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের সঙ্গে স্বানুভূতির প্রাধান্যের কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিরোধ নাই। মহর্ষি এ পথ ধরিলেন না। তিনি আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রেরণায় সরাসরিভাবেই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলেন।

(৩)

আর এরূপ না করিলে মহর্ষি এ যুগের নাস্তিক্য এবং সন্দেহবাদকে ঠেকাইয়া রাখিতেও পারিতেন না। রাজার সিদ্ধান্ত এবং সাধনার বিচার করিতে হইলে, তিনি যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে কালের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের দ্বারাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। রাজা দেশের লোকের অন্তরে সন্দেহ জাগাইয়া তাহাদের মানসিক তমোকেই দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সন্দেহ হইতেই বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। আর বিচারের মুখেই লোকের স্বাধীন চিন্তা জাগিয়া ওঠে। সন্দেহ—বিচার—সঙ্গতি—এবং সমন্বয়, ইহাই সত্যের সনাতন পথ। রাজা এই পথটি ধরিয়াছিলেন। কি করিয়া লোকের গতানুগতিক বিশ্বাসটা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে, রাজার সমক্ষে ইহাই প্রধান সমস্যা ছিল। মহর্ষির সমক্ষে এই সমস্যা ছিল না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক্য এবং সন্দেহবাদের বান যখন ডাকিয়া উঠিল, সেই সময়েই মহর্ষি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে সন্দেহ এবং বিচার জাগাইবার কোনও চেষ্টা করিতে হইল না। কিন্তু কি করিয়া নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মের সত্য প্রাণবস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, মহর্ষির নিকট ইহাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যার হইল। শিক্ষিত লোকেরা শাস্ত্র মানিতেন না। শাস্ত্র-প্রামাণ্য ব্যতীত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না বা হইতে পারে না, ইহাঁরা এ কথা বিশ্বাস করিতেন না। যুক্তি যদি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মকে রাখিবার কোনও প্রয়োজনই নাই; ইহাই সে যুগের মূল কথা ছিল। সুতরাং ধর্ম্মসাধনে শাস্ত্রের কোনও স্থান আছে কি না, থাকিলে সে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কি বা কতটুকু, শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মসাধনের বা ধর্ম্ম সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার কি ব্যাঘাত হয়, এ সকল

প্রশ্নের বিচার তখন নিষ্প্রয়োজন ছিল। এ চেষ্টার সময় তখন আসে নাই। অকালে এই চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার ফলে গুরুশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা দূরে থাকুক, ধর্ম্মের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত নষ্ট হইত। এ অবস্থায় মহর্ষি গুরুশাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াও শুদ্ধ যুক্তির উপরে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ এতদিন পরে দেশের নূতন অবস্থাধীনে মহর্ষির প্রথম জীবনের সিদ্ধান্ত ও সাধনের অপূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি বটে। কিন্তু সে সময়ে মহর্ষি যদি রাজার মতন শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করিতেন এবং শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির একটা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশেরা কেহ বা একান্ত নাস্তিক্যবাদী হইয়া পড়িতেন, আর কেহ বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সে সময়ে মহর্ষি শাস্ত্র ছাড়িয়া কেবল যুক্তির উপরে ধর্ম্মকে গড়িতে যাইয়া এই দুইটা পথই বন্ধ করিয়া দেন। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি।

(৪)

কিন্তু এখানে মহর্ষিও একটা সমন্বয়েরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তি মানিয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার করিলেন না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা দেখাইয়া য়ুরোপের আমদানী নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের হাত হইতে ধর্ম্মকে ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে বাঁচাইলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা যে আত্মা তাহাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ ছাঁচ আছে। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তু সকল আত্মার এই জ্ঞানের ছাঁচে যাইয়া ঢালাই হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় কোনও বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাঁচগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না। ইহারা অতীন্দ্রিয় যে আত্মা তাহারই বৃত্তি। এই ছাঁচগুলি নিত্যসিদ্ধ। আত্মার ধর্ম্মরূপে নিত্যকাল এই আত্মাতে আছে। মহর্ষি জ্ঞানের এই নিত্যসিদ্ধ ছাঁচগুলিকে 'আত্মপ্রত্যয়' কহিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে ইহাকে Intuition কহে। এই আত্মপ্রত্যয় বা Intuitionই মহর্ষির সাধনে ও সিদ্ধান্তে প্রচলিত যুক্তিবাদ এবং তাঁহার প্রকৃতিগত ভক্তিবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তাও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই এই প্রত্যক্ষই যে একটা অতীন্দ্রিয় জগতের আশ্রয়ে কার্য্য করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এবং এই সিদ্ধান্তের সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখানে মহর্ষি আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠায় উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। আর য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম চিন্তার সঙ্গে তাঁহার যোগ না থাকিলে এবং

সে চিন্তার দ্বারা তাঁহার মতবাদ সমর্থিত না হইলে সে সময়ে তিনি আমাদের নূতন ইংরাজী-নবীশদিগের চিত্তকে কিছুতেই ফিরাইতেও পারিতেন না।

বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়াও স্বদেশের প্রাচীন এবং সর্ব্বজনপূজ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই মহর্ষি নিজের স্বানুভূতিলব্ধ ধর্ম্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ উপনিষদের শ্রুতির দ্বারাই রচিত হয়। ইহার ফলে মহর্ষির নবযুগের নবীন সাধনা প্রাচীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে সময়ে এদেশে উপনিষদাদির বহুল প্রচার হয় নাই। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বেদ-বেদান্তের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন না। সুতরাং মহর্ষির এই নূতন ধর্ম্ম যে প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্ম নহে, অতি অল্প লোকেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষির সিদ্ধান্তের ও সাধনের সঙ্গে নূতন যুক্তিবাদের কোনও বিশেষ বিরোধও ফুটিয়া ওঠে নাই। এই যুক্তিবাদ যাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিতেছিল, তাঁহারা স্বদেশের প্রাচীন সাধনাতেই এমন একটা ধর্ম্মের সন্ধান পাইলেন, যাহা শুদ্ধ যুক্তি এবং বিচারের দ্বারাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এ ধর্ম্মে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই। ইহাতে অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন গুরুরও প্রাধান্য নাই। এখানে পৌরোহিত্য নাই। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোনও গ্রন্থে নহে। ইহার প্রামাণ্য কোনও বিশেষ ঈশ্বরাবতারের উপদেশেতেও নহে। এই ধর্ম্মের প্রামাণ্য মানুষের অন্তরে, সাধারণ মানব প্রকৃতির মধ্যে। সাধারণ মানুষে যাহা দ্বারা প্রতিদিন চারিদিকের বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতেছে, সেই জ্ঞানের মূল ভিত্তির উপরেই এই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ ইহা আধুনিক নহে। য়ুরোপীয় সাধনা সবে মাত্র এই পথের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু এ পথ ভারতের অতি পুরাতন ও পরিচিত পথ। মধ্য যুগের লোকে এই পথের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মহর্ষি এই লুপ্ত পথের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। এই ভাবেই আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেখিয়াছিলাম। ইহার উপরে কতটা পরিমাণে যে আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তার ছাপ পড়িয়াছিল, সেকালে ইহা অতি অল্প লোকেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। মহর্ষি নিজেই ইহা বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' প্রাচীন উপনিষদের শ্রুতির ভাষাতে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা দেশের প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখিয়া স্বদেশের সাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণে ক্রমে সে শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন। একদিন যাঁহারা নূতন শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপের আগন্তুক সাধনাকে নিজেদের স্বদেশের সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে স্বদেশের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষাগুরু হইয়া উঠেন। এই শিক্ষার ফলে যাঁহারা একদিন হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যার ও কুসংস্কারের জঞ্জাল বলিয়া ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আধুনিক সভ্যতার সমক্ষে এই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে

লাগিলেন। মহর্ষির সুযোগ্য শিষ্য এবং সহকর্ম্মী ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগের যুগ-সাধনার প্রথম গুরু হইয়া আছেন।

বাংলার চিরদিনের বৈশিষ্ট্য যে স্বাধীনতা এবং মানবতা, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শকে একদিন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনে ও চরিত্রে এই আদর্শকে প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আর কেহ সেরূপ করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষা ভারতের সকল প্রদেশেই স্বল্প-বিস্তর প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে বাংলা যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এ দাবীও করিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। কোনও কোনও দিকে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষা ও সাধনার অনুশীলনে বাংলা অপেক্ষা অধিক সফলতাই লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা ও সাধনার প্রাণবস্তু যে স্বাধীনতা এবং মানবতা তাহাকে বাংলা যেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই। ইহাও ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজ সত্য প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। যাহা আমার বিচার-বুদ্ধিতে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যাহা নিজের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাকে কাহারও কথায় সত্য বলিয়া মানিয়া লইব না। শাস্ত্রের কথায়ও নহে; গুরুর কথায়ও নহে। যাহা নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিতে সাধু এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিব। যে পথ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটে আত্মপ্রকাশ না করে, কল্যাণের পথ বলিয়া তাহাকে কখনই আশ্রয় করিব না। গুরুজনের আদেশেও নহে, সমাজের শাসনের ভয়েও নহে। সত্যাসত্যের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টি-পাথর আমার নিজের ভিতরেই আছে। সত্য এবং ধর্ম্মকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইব। কাহারও কথায় না বুঝিয়া সত্য বা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিব না। এ সকলই বাংলার প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজের জীবনের এবং সাধনের মুল সূত্র হইয়াছিল। এই শিক্ষার প্রভাবেই আধুনিক বাংলা দেশে এমন একটা স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছিল, যাহা ভারতের আর কুত্রাপি আসে নাই। এই স্বাধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া বাঙ্গালী যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং অম্লানবদনে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশের লোকে সেরূপ করে নাই। এবং এই ত্যাগের সাধনায় ব্রাহ্মসমাজই আমাদের প্রথম গুরু হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু এ সাধনা অসাধারণ শক্তিলাভ করে, দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীনে। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনায় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগ দেবেন্দ্রনাথ এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের, অন্য ভাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের। দেবেন্দ্রনাথ যে স্রোতকে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধীর-গম্ভীর-

ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট খাতের ভিতর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা সকল বাঁধন ভাঙ্গিয়া সেই স্রোতকে চারিদিকে উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গ তুলিয়া ছড়াইয়া দিয়াছিল। বাংলার আধুনিক স্বাধীনতার সেই সংযম অসংযমের উন্মাদিনী কাহিনী এক অপূর্ব্ব বস্তু। এই স্বাধীনতার ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এক নূতন অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সেকথা গুরুদেব সময় এবং শক্তি দিলে বারান্তরে কহিতে চেষ্টা করিব।

বাংলার নবযুগের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া এ পর্য্যন্ত আমি বহুল পরিমাণে শ্রুতির হাত ধরিয়া চলিয়াছি। রাজাকে ত দেখিই নাই। প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশদিগের কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা অতীতের স্মৃতিরূপেই আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। মহর্ষির প্রথম জীবনের কাহিনীও শ্রুত, প্রত্যক্ষ নহে। কেশবচন্দ্রের সময় হইতেই এই যুগস্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়ি। সুতরাং এখন হইতে এই কথা বহুলপরিমাণে আমার প্রত্যক্ষের উপরই গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

"উৎসব"

নিখিল-ভুবনে একি আনন্দ,
উৎসব কলরোল!
উতলা করিয়া নিথর হৃদয়
কে দিল এমন দোল!

ঘুচাইয়া দিল সকল দ্বন্দ্ব,
শঙ্কা-সরম, সকল বন্ধ,—
ঝঙ্কারি, উঠে বিশ্ব বীণায়
একি এ মধুর বোল!

শিশির-সিক্ত লতিকার সনে
কিরণের কোলাকুলি,
অসীমের সাথে মিলিতে সসীম
দিয়াছে পরাণ খুলি!

ফুটে ওঠে হাসি সবার আননে,
সুখ-তরঙ্গ ভুবনে ভবনে—
বিরহবিধুর অধীর হৃদয়
পেয়েছে শান্তি-কোল
বিশ্ব সভায় উৎসব আজি
উচ্ছল কলরোল!!

শ্রীবেলা গুহ

মলিয়ারের ত্রৈশতাব্দিক স্মরণোৎসব

তিন শতাব্দীর পারে তুলেছিলে যে হাসি-হিল্লোল
ফরাসীর রঙ্গমঞ্চে—এ যুগের দাম্ভিক কল্লোল
পারেনি ছাপিতে তারে। বিশ্বব্যেপে' সে হাসির ধারা
পূত দীপ্ত চিরস্নিগ্ধ চিরন্তন মন্দাকিনীপারা
ছুটেছে আপন বেগে! সে যে আসে তব বক্ষ ভেদি'
বেদনার ঊর্ম্মিভঙ্গে! কাপট্যের বর্ম্ম মর্ম্ম ছেদি'
দেখায়েছ সত্যরূপ হাস্যার্ণব ওহে মলিয়ার!
জাগায়েছ শক্তিভরা রঙ্গভরা প্রাণের জোয়ার
নিজ প্রাণ বিনিময়ে! আজীবন করেছ সংগ্রাম
মেকি, ছল, মিথ্যাসাথে—বার বার ব্যর্থ মনস্কাম
তবু ক্ষান্তি নাই রণে! বিদ্রূপ বজ্রের তাড়নায়
অসত্যের বক্ষোভেদ—সেই মন্ত্র তব সাধনায়।
জীবন স্রোতের তলে পাই শুধু গুপ্ত অশ্রুরাশি,—
তরঙ্গের শীর্ষে শীর্ষে খেলে তবু স্বর্গ-গড়া হাসি!

পারিস
জানুয়ারী ১৯২২

দীপঙ্কর

দান্তের ষট্‌শাতাব্দিক স্মরণোৎসব

ওহে কবিকুলগুরু ! রাভেনার নিঠুর প্রবাসে
নির্ব্বাপিত হ'ল যবে জ্যোতির্ম্ময় তব প্রাণশিখা—
তারায় তারায় তব প্রেমমন্ত্র হ'য়ে গেল লিখা
মৃত্যুহীন সত্যরূপে—ফিরেন্‌জের ক্ষুদ্র ইতিহাসে
পড়ি শুধু তুচ্ছ কথা ! ঘটনার স্রোতে শুধু ভাসে
দৃপ্ত আবর্জ্জনাভার : নেরি-বিয়াঙ্কীর হানাহানি
নশ্বর সংঘর্ষ মাঝে ইতালিরে যেন ফেলে টানি'
ধরিত্রীর ক্রোড় হ'তে ! অন্ধকার ঘনাইয়া আসে !

ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে আজ দেখি, হে সাধক কবি !
তোমার তপস্যাবীজে প্রেম সত্য শিল্প বনস্পতি
উর্দ্ভিয়া উঠিল মৌনে ! ভক্তি তব সঞ্চারিল প্রাণ
জিয়োত্তোর পূত শিল্পে ; রাফেলের মাতৃমুখচ্ছবি
ফুটিল অমর গর্ব্বে ; শক্তি তব ধরিল মূরতি
আঞ্জেলোর রূপে রূপে ; ধন্য দান্তে চিরদীপ্তিমান্ !

ফিরেঞ্জে (ফ্লরেন্স)
সেপ্টেম্বর ১৯২১

দীপঙ্কর

অপরাজিতা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আগুন লইয়া খেলা

যাওয়া আসা সম্বন্ধে কথা ঠিক রাখা লোকেশের কোষ্ঠীতে লিখিত ছিল না ; সে বিষয়ে তাহার কথায় আমি কখন নির্ভর করিতে পারি নাই। কতদিন সে আসিবে বলিয়া মা খাবার করিয়া-রাখিয়াছেন—সে আইসে নাই। তবে সে সদা সপ্রতিভ ছিল ; পরদিন আসিয়াই একটা কৈফিয়ৎ দিত। মা হাসিয়া বলিতেন, "বাবা, তোমার কৈফিয়ৎ ত আমি চাহি নাই—তুমি স্থির হও, আজ ঘরে যাহা আছে, তাহাই খাও।" এবার কিন্তু সে তাহার কথামত কায করিল—পরদিন সকালে আমি যখন পেয়ালায় চা ঢালিতেছি তখনই আমাকে ডাকিতে ডাকিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিল।

আমি আপনার পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া তাহার জন্য একটা পেয়ালায় চা ঢালিলাম। সে আপনি তাহাতে চিনি ও দুগ্ধ দিল। এই বিষয়ে তাহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল - সে চা'য় অতি অল্প চিনি দিত আর দুগ্ধে সর সহিতে পারিত না। চা'র পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া সে একটি সিগারেট ধরাইয়া লইল ; কুলদীপকে বলিল, "তুই কায করিতে যা ; আমরা আমাদের কায করি—অর্থাৎ চা খাই।"

কুলদীপ চলিয়া গেলে সে আমাকে বলিল, "তোমার জ্বালায় কাল রাত্রিতে আমার ঘুম হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার অপরাধ ?"

"ঠাট্টা রাখ ; কাল তুমি যে কথা বলিয়াছ সে কথা সত্য না চালাকি ?"

"কাল ত অনেক কথাই বলিয়াছি—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, আর কোন্‌টা সত্যও বটে মিথ্যাও বটে তাহাত মনে নাই।"

"আরে ছাই তোমার বাড়ীতে সেই অপরিচিতা কিশোরীকে আনিবার কথা।"

"সম্পূর্ণ সত্য।"

"সত্য !"

"বরং আমি সবটা তোমাদের বলি নাই—তোমাকে বলিবার জন্য আমার পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে।"

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলে লোকেশ অধিক চুরুট টানিত। সে বেগে চুরুট টানিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "চা যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

সে বলিল, "যাউক ; তুমি সব কথা বল।"

তখন আমি অপরাজিতার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইতে পূর্ব্বদিনের কথা পর্য্যন্ত সব কথাই লোকেশকে বলিলাম। সে তাহার মধ্যে একটা সিগারেট শেষ করিয়া আর একটা ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

আমার কথা শেষ হইলে লোকেশ বলিল, "অপরাজিতা এখনও তোমার বাড়ীতেই আছে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

লোকেশ একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "তুমি আগুন লইয়া খেলা করিতেছ। এমন ছেলেখেলা করিও না।"

"কেন ?"

"কেন ! যে অবস্থায় দেবতারাও আপনাদের বিশ্বাস করিতে পারেন না, সেই অবস্থায় তুমি মানুষ হইয়া কোন্ সাহসে আপনাকে এত বিশ্বাস করিবে ?"

লোকেশের আশঙ্কায় আমার হাসি আসিল। সে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি হাসিতেছ ; কিন্তু তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, তুমি এ ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিতেও পারিতেছ না ?"

লোকেশ যে আমার প্রতি তাহার আন্তরিক স্নেহহেতুই আমার জন্য শঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম ; যাহাকে ভালবাসিবার লোক নাই সে সহজেই প্রকৃত ভালবাসা বুঝিতে পারে। অন্ধকারে আলোক ফুটিলে তাহা সহজেই লক্ষিত হয়।

আমি বলিলাম, "আমিত সব কথাই তোমাকে খুলিয়া বলিলাম। তুমি কি বল, আমার পক্ষে অপরাজিতাকে হয় বিপদ নহেত আত্মহত্যা—এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া আসাই সঙ্গত হইত ? মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করাই কি মানুষের কর্ত্তব্য নহে ?"

লোকেশ বলিল, "কিন্তু তোমার নিজের বিপদটা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?"

"সত্যকথা বলিতে কি, আমি তাহাকে আনিবার সময় সে বিপদের সম্ভাবনা যে বুঝি নাই, এমন নহে।"

"তবে ?"

"কিন্তু তাহার মুখের ভাবে—নয়নের দৃষ্টিতে আমার সঙ্কল্প স্থির হইয়াছিল।"

"তাহাহইলে তুমি বুঝিতেছ, তুমি কত সহজে বিচলিত হইতে পার—তোমার মত ভাবপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা কত অধিক ?"

"কিন্তু আপনাকে বিপন্ন করিয়াও যদি পরকে বিপন্মুক্ত করা যায়, সেও কি ভাল নহে ? একজন জলে ডুবিতেছে দেখিয়া আপনার কি হইতে পারে ভাবিয়া কূলে দাঁড়াইয়া থাকাই মানুষের কায, না, যাহা হয় হইবে, তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি মনে করিয়া জলে লাফাইয়া পড়াই মানুষের কায ?"

লোকেশ আমার কথার উত্তর দিল না—চুরুট টানিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ অবস্থায় তুমি কি করিতে ?"

লোকেশ কয় মিনিট কোন উত্তর দিল না—টানিতে টানিতে চুরুটটা যখন ছোট হইয়া আসিল, তখন টুক্‌রাটা ফেলিয়া দিয়া চা'র পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। ততক্ষণে চা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। সে চাটুকু পান করিল। আমি বলিলাম, "আর একটু চা দিব ?" সে বলিল, "না।" তাহার পর সে বলিল, "এমন অবস্থায় তুমি যাহা করিয়াছ, বোধ হয় আমিও ঠিক তাহাই করিতাম।"

"তবে আমার অপরাধ ?"

"আমার অবস্থায় আর তোমার অবস্থায় অনেক প্রভেদ। আমার মা আছেন, আমার স্ত্রী আছেন, দিদি আছেন। তবুও আমি হয়ত এমন একজন অপরিচিতাকে আনিতে দ্বিধা করিতাম।"

"তোমার দ্বিধা যাঁহার ভয়ে আমার ত তিনি নাই।"

"সেটা কি বড় ভাল কথা ? যে নৌকার নোঙ্গর থাকে না ঝড়-ঝাপটায় তাহাকে বিপন্ন হইতে হয়। এবার, বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিবে।"

"আমি ত কিছুই বুঝিলাম না।"

"ও কথা যাউক ; এখন কথা—ভবিষ্যতের। ইহার পর কি করিবে মনে করিতেছ ? অপরাজিতার কি হইবে ?"

"আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি কি বল ?"

"আমিও কিছু বলিতে পারি না। ভাবিয়া দেখি।"

কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব হইয়া রহিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অপরাজিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

লোকেশ যেন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকিয়া উঠিল ; বলিল—"না।" তাহার পর সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিল ; যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেল, "কিন্তু, নিশীথ, যদি তুমি এই অপরিচিতা কিশোরীকে ভালবাস, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। সুখের বিষয়, বংশপরিচয়ে বুঝা গিয়াছে, সামাজিক আচারে এ বিবাহ বাধিবে না।"

লোকেশের কথায় আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "তুমি কি বাল্মীকি ছিলে যে, রাম না হইতেই রামায়ণ রচিয়া রাখিতেছ ?"

লোকেশ একটু চিন্তিত—একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল, "দেখ, নিশীথ, তুমি ব্যাপারটা নিতান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত মনে করিওনা। যাহারা সাপ পুষে, তাহারা একটু অসাবধান হইলে সাপের কামড়েই মরে।"

"তুমি কি তবে অপরাজিতাকে সাপের দলেই ফেলিলে ?"

"অপরাজিতা বলিয়া নহে—"

"তবে ?"

"বয়স আর অবস্থা বিবেচনা করিয়া। না হয় তুমি বাইবেলের মত-ই ধরিলে—মানুষ সকলেই ত সাপের মত।"

যাইবার সময় লোকেশ বলিয়া গেল, "দেখ, আমিও ভাবিয়া দেখিব—তুমিও দেখিও, একটা কোন উপায় করা যায় কি না।"

"তুমি অবশ্য তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিবে ?"

"অবশ্য—তুমি ও-রসে বঞ্চিত, তাই ঠাট্টা করিতেছ। অনেক বিষয়ে আমাদের মতের অপেক্ষা মেয়েদের মতের মূল্য অনেক অধিক। যদি কখন সুদিন পাও, তখন বুঝিবে।"

লোকেশের এই কথার সার্থকতা আমার জীবনে আমি যেমন অনুভব করিয়াছি, তেমন আর কয় জন করিয়াছে ? মানুষ চিনিবার—ভবিষ্যৎ দেখিবার ক্ষমতা বোধ হয় পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক। আমি যদি অপরাজিতার বুদ্ধি লইতাম, তবে বোধ হয়, আমার জীবন এমন ব্যর্থ হইত না। যাউক সে কথা।

লোকেশ চলিয়া গেল—তাহার মুখে চিন্তার ছায়া।

সেইদিন মধ্যাহ্নে অপরাজিতা শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি লইয়া আমার বসিবার ঘরে আসিল। তাহার মুখে বিষণ্ণভাব—পূর্ব্বদিন আমি তাহা দেখিতে পাই নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের ছেলেদের উপযোগী বহি লিখিবার কোন পথ করিতে পারিলে ?"

অপরাজিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "লোকেশ বাবু তোমার বাল্যবন্ধু ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

"তিনি তোমার প্রকৃত বন্ধু।"

"শৈশবাবধি সে আমাকে ভালবাসে—এখন আর পূর্ব্বের মত প্রতিদিন উভয়ে সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু তাহার সঙ্গে দেখা হইলেই মনে যে একটা আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি।"

"এমন বন্ধু আদর করিয়া রাখিবারই মত।"

"কেন ?"

"কই, তোমার সখাসঙ্ঘের আর কোন সখাকেই ত তোমার জন্য সত্য সত্যই চিন্তিত দেখিলাম না! কেবল লোকেশ বাবুই তোমার আগুন লইয়া খেলায় যেন আপনারই বিপদের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছেন। এইরূপ বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।"

বুঝিলাম, আমার সঙ্গে লোকেশের কথা অপরাজিতা শুনিয়াছে।

অপরাজিতা বলিল, "কিন্তু লোকেশবাবু সত্যই বলিয়াছেন, তুমি আমাকে আসিয়া হয়ত নিজে নানা অসুবিধায় পড়িবে।" বলিতে বলিতে তাহার মুখে লজ্জার ও বেদনার ভাব যুগপৎ

ফুটিয়া উঠিল। অপরাজিতা যেন অতিকষ্টে আপনার ব্যবহারে বেদনার বিকাশ ও চিত্তের চাঞ্চল্য গোপন করিতেছিল।

লোকেশের কথা অপরাজিতা শুনিয়াছে বুঝিয়া আমি একটু লজ্জা বোধ করিতেছিলাম—তাহার শেষ কথাগুলি সে না শুনিলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু আমাকে লজ্জার সঙ্কোচ অতিক্রম করিতে হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি যখন সব কথা শুনিয়াছ, আমি লোকেশকে আমার সঙ্কল্প জানাইয়া দিয়াছি। তাহার পর আর তোমার দুশ্চিন্তা কেন?"

"তুমি আমার জন্য আপনাকে বিপন্ন করিতে প্রস্তুত বলিয়াই আমার অধিক দুশ্চিন্তা; যে স্থানে আমার জন্য তোমার অসুবিধা ঘটিতেও পারে সে স্থানে আমার কর্ত্তব্য—সে অসুবিধার সম্ভাবনা ঘটিতে না দেওয়া।"

"কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি তোমাকে অসহায় অবস্থায় আপনার পথ আপনি দেখিয়া লইবার জন্য অপরিচিত সংসারারণ্যে একাকী যাইতে দিব না। তুমি যে ভাবে—যে রূপে আমার কাছে আসিয়াছ, তাহাতে কি মনে হয় না যে ইহা বিধাতার বা অদৃষ্টের নির্দ্দিষ্ট বিধান? হয় ত জন্মান্তরের কোন কর্ম্মসূত্রই তোমাকে আমার কাছে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে।"

আমার কথায় অপরাজিতা হাসিল; বলিল,—"আমি তোমার কথা যত শুনিতেছি ততই ভয় পাইতেছি।"

আমি বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলাম।

তখন তাহার মুখে বেদনার ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছে—দুশ্চিন্তা ও কৌতুক যেন ভাদ্রের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের মত মিশামিশি করিয়া আছে। সে বলিল, "তোমাকে যেরূপ ভাবপ্রবণ দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি, তুমি ভাবের প্রবাহে বিচার-বিবেচনা ভাসাইয়া দিবে। তাহাই তোমার স্বভাব। সুতরাং আমার জন্য তোমার কতটুকু পর্য্যন্ত করা সঙ্গত—কতদূর পর্য্যন্ত বিপদ ভোগ করা চলিতে পারে, সে সব বিবেচনা তুমি করিতে পারিবে না, মানুষের জন্য মানুষ যতখানি করিতে পারে সবটাই করিবে।"

"সেটা কি নিন্দার?"

"নিন্দা প্রশংসা ভাগ আমি করিতেছি না—আমি সমালোচকও নহি, গুরুমহাশয়ও নহি। আমি কেবল যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি।"

"তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই ত?"

"ভয়ের কারণ না থাকুক, ভাবনার কারণ অনেকটা আছে।"

"তা' থাকুক। সে ভাবনা আমরা ভাগ করিয়া ভাবিব,—তুমি ভাবিবে, আমি ভাবিব, লোকেশ ভাবিবে। সুতরাং বাটোয়ারায় এক একজনের ভাগে ভাবনা কিছু কম হইবে।"

তাহার পর অন্য কথা পাড়িবার জন্য আমি বলিলাম, "ছেলেদের বহির কিছু করিতে পারিলে ?"

"এই দেখ, আমি একটা প্রণালী ছকিয়া আনিয়াছি"—বলিয়া অপরাজিতা একখানি খাতা বাহির করিল ; আমি খাতাখানি লইতে যাইতেছি দেখিয়া সে বলিল, "কতক কথা খাতায় লিখিয়াছি—কতকটা আমার মাথায় আছে।"

এই বলিয়া সে খাতা খুলিয়া আমাকে তাহার কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিল। দেখিলাম, সে যে উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছে, তাহা আমাদের ছেলেদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। আমি বোধ হয় দশ বৎসরের চেষ্টাতেও সে উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারিতাম না, অথচ তাহার মনে সহজেই সেই উপায়টির সন্ধান মিলিয়াছে !

সে তাহার পরিষ্কার হস্তাক্ষরে একখানা পুস্তকের অনেকটাই লিখিয়া ফেলিয়াছিল। আমি সত্য সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম—প্রশংসায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, আগুন লইয়া খেলা যদি এমন সুখের হয়, তবে তাহাতে ভয় কি ? আর আগুন—সেও যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই পবিত্র করে, অপবিত্রতা কি কখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ?

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শিল্প ও ভাষা *

"বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।"

বাঙ্গালা ভাষা যে বোঝে সেই এ শোলোকটা শুনলেই বলবে—'বুঝলেম' কিন্তু ভারতী কাগজের মলাটের নিচে থেকে টেনে বার করে আজকালের একখানা ছবি সবার সামনে যদি ধরে দিই, সাড়ে পনেরো আনার চেয়ে বেশি লোক বলবে বুঝলেম না মশয় ! এই শেষের ঘটনা ঘটতে পারে হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিষ্টের ছবির ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায় অথবা যে ছবি দেখছে, চিত্রের ভাষার দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ভারতীর বন্দনাটা যে ভাষায় লেখা সেই ভাষাটা আমাদের সুপরিচিত আর ভারতীর ছবিখানা যে ভাষায় রচা সে ভাষাটা একেবারেই আমাদের অপরিচিত সেই জন্যে চিত্র পরিচয় পড়েও ওটা বুঝলেম না এমনটা হতে বাধা কোনখানে ?

* কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী প্রফেসাররূপে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা।

চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়া সরস্বতীর স্তোত্রপাঠ করলেও সে বুঝবে না কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্ব্বজনীন ভাষা—'আবর্' কথাটা ফরাসীকে বল্লে সে গাছ বুঝবে, আবার 'আবর্' শব্দ হিন্দুস্থানির কাছে মেঘরূপে দেখা দেবে, ইংরেজ সে এই শব্দটার কোনরূপ কোন অর্থ আবিষ্কার করতে পারবেনা কিন্তু আঁকার ভাষায় 'আবর্' হয় গাছ নয় অভ্র স্বরূপ হয়ে দেখা দেয়, কথিত ভাষার মতো কৃত্রিম উপায়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া রূপ নিয়ে নয়, সুতরাং ছবির ভাষার মধ্যে বলতেই হয় অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই এমন কি ছেলেতেও সেটা উল্লঙ্ঘন সহজেই করতে পারে কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা যার নেই তার কাছে ঐ এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার, ছবি ঠেকে সমস্যা! কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিৎ করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্ত্তিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে 'নবঘনশ্যাম' এই কথাটা—ছাপা দেখলেই রূপ ও রং দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে! নাটক যখন পড়া হয় কিম্বা গ্রামোফোনের মধ্যে দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর মন সঙ্গে সঙ্গে নট নটীদের অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি মায় দৃশ্য পটগুলো পর্য্যন্ত চোখের কোন সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলাতে এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো মন শুনে চল্লো কানের শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা বলছে তা, বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলা ফেরা, ছবি কিন্তু যা বল্লে সেটা মন শুনে নেয়।

কবির মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তবে বাংলা খুব ভাল করে না শিখলে ইংরেজ সেটী বোঝে না, তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুস্কিল। মুখের কথা একটা না একটা রূপ ধরে আসে কাগ্ বগ্ বল্লেই কালো সাদা দুটো পাখি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির! শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রংএর সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে—রূপ-কথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা। কবিতার ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রূপ দিয়ে বাক্য সমূহকে যথোপযুক্ত স্থান কাল পাত্রভেদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা সুর করে দিলে বাক্যগুলো, চল্লো ছন্দ ধরে যথা—

'করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অপরূপ সুন্দর দেহা'

কিন্তু বাক্য গুলোকে ভাষার সূত্রে নটনটী সূত্রধার ইহাদের মতো বাঁধা হলনা, তখন কেবলি

বাক্য সকল শব্দ করলে—ও, এ, হে, হৈ, ঐ, কিম্বা খানিক নেচে চল্লো পুতুলের মতো কিন্তু কোন দৃশ্য দেখালেনা বা কিছু কথাও বল্লেনা, কোলাহল চলাচল হ'ল খানিক, বলাবলি হলনা যেমন—

'হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি
হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত গতি
করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে?'

শোলোক্‌টা কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু খাপছাড়া ভাবে, এ যেন কেউ তুরকী আরবী পড়ে ফরাশি মিশালে'! কিন্তু কথাকে কবি কথা বলালেন ভাষা দিয়ে, চালিয়ে দিলেন ছন্দ দিয়ে কথাগুলো তবে সজাগ সজীব অভিনেতার মতো নেচে গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে চল্লো পরিষ্কার—

'চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।'

ছবির বেলাতেও এমনি, সুরসার কথাবার্ত্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বলেনা চলেনা—পিদুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব কিম্বা অমুক অমুক অমুক এর বেশি নয়। কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্‌তে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠলো, "নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানম্!"

ছাবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল চলানো গেল। নাট্যকলা প্রধানতঃ ইঙ্গিতেরই ভাষা বটে কিন্তু তার সঙ্গেও কথিত ভাষার সঙ্কেত অনেকখানি না জুড়লে নাটকাভিনয় করা চলেনা—এই লেকচার লিখছি সামনে এতটুকু 'টোটো' ছেলেটা বোবা নটের মতো নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে চল্লো, ভেবেই পাইনে তার অর্থ! হঠাৎ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে শিশুনট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে অং অং ভুস্ ভুস্, বোঁ বন্ বল্ সোঁ শন্ শন্, হিং টিং ছট্ ফট্, আয় চট্ পট্, লাগ লাগ ভোজবাজি, চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রদ্দুরে, তালপুকুরে উত্তুরে, কার আজ্ঞে? না কথিত ভাষার 'আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিৎ যাদু-মন্ত্র কথা কয়ে ফেল্লে যেন ঘুড়ি উড়িয়ে চল্লো ঘুরে ফিরে!

ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সঙ্গীতের ভাষা এই রকম নানা ভাষা এ পর্য্যন্ত মানুষ কাযে খাটিয়ে আসছে। এর মধ্যে সঙ্গীত শুধু যা বলতে চায়, কিম্বা যখন কাঁদাতে চায় বা হাসাতে চায়, কাকুতি বা মিনতি জানাতে চায় তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে অবলম্বন না করেও নিজের স্বতন্ত্র ভাষার মীড় মূর্চ্ছনা ইত্যাদি দিয়ে সুব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। রংএর ভাষারও এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে—আকাশের রূপ নেই কিন্তু রংএর আভাস দিয়ে সে কথা বলে। কিন্তু আর সব ভাষা, কথিত চিত্রিত অভিনীত সমস্তই এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে। সুর আর রূপ, বলা ও দেখা এরা সব কেমন মিলে জুলে কায করে দুএকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিষ হলেও মাধবীলতার মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় না করে পারেনা। দৃশ্য বা ছবিকে আশ্রয় না করে কিছু বলা কওয়া একেবারেই চলেনা তা নয় যেমন—

'কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে'

এখানে মনোভাব বাচন হল, কোনরূপ কোন ভঙ্গি ছবি বা অভিনয়ের সাহায্য না নিয়েও! বাচনের বেলায় বাক্য স্বাধীন কিন্তু বর্ণনের বেলায় একেবারে পরাধীন যেমন—

'একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন'

নবযৌবন আর বৃন্দাবনের বসন্ত শোভার ছবি বাক্যগুলোর মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে!

'আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল'

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো কালো যমুনা তার ধারে কদমতলা তার ছায়ায় সহচরী সহিত রাধিকা—

'আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন'

রাধিকার রত্ন অলঙ্কারের ঝিকিমিকি থেকে দূরের কালো পাহাড়ের ছবি দিয়ে Landscapeটা সম্পূর্ণ হল, ছবি মিলে গেল কথার সঙ্গে, কান চোখ দুয়ের রাস্তা একত্র হয়ে সোজা চল্লো মনোরাজ্যে!

এর পর আর ছবি নেই বর্ণনা নেই শুধু কথা দিয়ে বাচন—

'এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নাহি শুন এ কাহিনী'!

এবারে কথিত ভাষায় ছবির সাক্ষাদ্দর্শন—

'জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়—
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিষে নিমিখ নাহি রয়
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!'

একেবারে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছবি দেখা কথার ভাষা দিয়ে!

এইবার অঙ্গভঙ্গি আর চলার সঙ্গে বলা কথার যোগাযোগ পরিষ্কার দেখাবো—

'চলিতে না পারে রসের ভরে
আলস নয়ানে অলস ঝরে
ঘন ঘন সে যে বাহিরে যায়
আন ছলে কত কথা বুঝায়'!

চোখের সামনে চলাফেরা সুরু করে দিলে কথার ভাষা অভিনয় করে নানা ভঙ্গিতে!

চিত্রিত ভাষা কথিত ভাষা অভিনীত ভাষা এসব যদি এ ওর কাছে লেনা দেনা করে চল্লো তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কারের সূত্র আইন কানুন ইত্যাদির সঙ্গে আর দুটো ভাষার ব্যাকরণাদির মিল থাকিতে বাধ্য! কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু', ছবির ব্যাকরণে তার নাম 'কাঠামো' (Form), ধারণ করিয়া রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু! ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখা দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্ম্মা বাঁধা গেল কিন্তু সেটা বানর না নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর বানরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দিই! শুধু এই নয় বিভক্তি যিনি ভাগ করেন, ভঙ্গি দেন তাঁর চিহ্ন লেজ ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোর জুড়ে দেওয়া চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনের, নরের সঙ্গে ঘরের কি আর কিছুর সন্ধি সমাস সন্ধান করা চাই। বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা বস্তুর সন্ধি সমাস করার সূত্র আছে ছবির ব্যাকরণে, বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ, সর্ব্বনাম অব্যয় এমন কি মুগ্ধবোধের সবখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে ছবির ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের ধারা গুলো! কথিত ভাষার বেলায় 'ভৃ' ধাতু গক্ প্রত্যয় করে হয় যেমন 'ভৃঙ্গ' ছবির ভাষায় কালো ফোঁটার উপরে দুটো রেফ্ যোগ করিলেই

হয় 'দ্বিরেফ্ ভৃঙ্গ', আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় রেফ্ না দিয়ে শুধু প্রত্যয় দিলে হয় 'ভৃঙ্গার যেমন 'ভৃ' ধাতুতে 'গিক্' প্রত্যয় জুড়লে হয় 'ভৃঙ্গি' !

ছবি লিখার উৎসাহ নেই কিন্তু ছবির ব্যাকরণ লেখার আস্থা আছে এমন ছাত্র যদি পাই তো চিত্রকরে আর বৈয়াকরণে মিলে এই ভাবে আমরা ছবি দেওয়া একটা ব্যাকরণ রচনা করতে পারি, কিন্তু একা এ কাজে নামতে আমার সাহস নেই কেননা ব্যাকরণ বলে জিনিষটা আমার সঙ্গে কি কথিত ভাষা কি চিত্রিত ভাষা দুয়ের দিক দিয়েই চিরকাল ঝগড়া করে বসে আছে। সংকীর্ত্তিত ভাষা যেমন তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এইটে যদি সাব্যস্ত হল তবে এও ঠিক হ'ল যে ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে না ভাষা জ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি স্রষ্টার পক্ষেও ঐ একই কথা। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি, টাপুর টুপুর পড়ে বিষ্টি' এটা বুঝতে পারে না পাঠশালায় না গিয়েও এমন ছেলে কমই আছে কিন্তু শিশুবোধের পাঠ থেকে ভাষা জ্ঞান বেশ একটু না এগোলে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন মাঝে !

এটা বোঝা সম্ভব হয় না চট্ করে বালকের। শুধু অক্ষর কিম্বা কথা অথবা পদ কিম্বা ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে, অথবা চিনে চিনে পড়তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না, ছবি অভিনয় নর্ত্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন ! যেমন চিঠি লিখিতে পারে অনেকে তেমনি ছবিও লিখতে পারে একটু শিখলে প্রায় সবাই, কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল কজনে পায় ? কাযেই বলি যে ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প তেমনি দ্রষ্টাও ক্কচিৎ মেলে ভাষা জ্ঞানের অভাববশতঃ। ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক, ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণন করায় তফাৎ আছে কে না বলবে !

বাংলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা হয়ে প্রচলিত যেমনি হল অমনি, বাংলার পণ্ডিত সমাজে খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখলে কইলে বুঝলে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলায় খাঁটি বাংলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়লো, ফল হ'ল—এক কালের চলিত ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়লো, এমন কি কথার অক্ষর মূর্ত্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল ! বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে তবে ছবির ভাষার বেলায় সেটা খাটবে কেন ? ছবির মূর্ত্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেইগুলোর নাম হয় অন্ধযুগ, এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময় !

চোখে দেখা মাত্রই যার সবখানি বোঝা না গেল সে ছবি ছবিই নয় একথা নাহয় শিল্পীর উপরে জবরদস্তিতে চালানো গেল, কিন্তু আমাদের নিজ বাংলার মুখের কথা আমরা অনেক সময়ে নিজেই বুঝিনে বোঝাতেও পারিনে ভাষাতে পণ্ডিতেরা না বুঝিয়ে দিলে, তবে কি বলবো বাংলা ভাষা বলে বস্তুটা বস্তুই নয় ?—'ছীয়াল্', 'ছিমনী', 'ছোলঙ্গ' এ তিনটেই বাংলা কথা কিন্তু বুঝলে কিছু ? ফরিদপুরের ছেলে 'ছোলঙ্গ' বলতেই বোঝে, বহরমপুরের লোক বোঝে না, বাংলা শব্দকোষ না আয়ত্ত হ'লে, ওয়েবষ্টার জ্ঞান নিয়েও বুঝতে পারে না 'ছোলঙ্গ' হচ্ছে বাতাবি লেবু নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর ! 'ছীয়াল' 'ছিম্‌নী' এ দুটোও বাংলা কিন্তু বাংলার সাধুভাষা বলে কৃত্রিম ভাষা নিয়ে যাঁরা ঘর কন্না করছেন তাঁরা এর একটাকে শৃগালের অপভ্রংশ আর একটা ইংরাজী চিম্‌নি কথার বাংলা বলেই ধরবেন কিন্তু এ দুটোই তা নয়—ছীয়াল মানে শ্রীল বা শ্রীমান ও শ্রীমতী আর ছিম্‌নি মানে পাথর কাটা 'ছেনী' শৃগালও নয় চিম্‌নিও নয় ! দুশো বছর আগে যে ভাষা চলিত ভাষা ছিল, পট ও পাটার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে গেছে সুতরাং যে শোলোকটা এবারে বলবো তা বাংলা হলেও আমাদের কাছে চীনে ভাষারই মতো দুর্ব্বোধ--

'ঘাত বাত হাত ঘর জোহি অয়লাহু
ন ভেতল চোলে আবে সবে থকলাহু'

পরিচিত বাংলায় আন্দাজে আন্দাজে এর যতটা ধরা গেল তার তর্জ্জমা করলেম তবে অনেকটা বোধগম্য হল ভাবার্থটা—

ঘাট বাট হাট ঘর করিনু সন্ধান
চোরে না পাইয়া মোরা হইনু হয়রান !

দুই তিন শত বছরের আগেকার বাঙ্গালী যে চলিত ভাষায় কথা কইতো তাই দিয়েই উপরের কবিতাটা লেখা আজকের আমরা সে ভাষা দখল করিনি অথবা ভুলে গেছি কবিতা দুর্ব্বোধ হ'ল সেইজন্য, ভাষার দোষেও নয় কবির দোষেও নয়।

কথিত ভাষার হিসেব পণ্ডিতেরা এইরূপ দিয়েছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, মিশ্র অথবা সংস্কৃত, ভাষা, আর বিভাষা ! আর্টের ভাষাতেও এই ভাগ যথা—শাস্ত্রীয় শিল্প Academic art, লোকশিল্প Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশ্রশিল্প Adapted art. লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়-চোপড় এমনি যেসব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিল্লেও মন হরণ করে। শাস্ত্র ব্যাকরণ ইত্যাদি 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যে artর সঙ্গে যোগ দেয়নি কিন্তু 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্য্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যেমন দেবমূর্ত্তি রচনা শিল্প-শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প সেই হ'ল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা—কোথাও লোক-শিল্পের চলিত

ভাষাকে মেজে ঘষে সেটা প্রস্তুত কোথাও প্রাচীন লুপ্ত ভাষাকে চলিতের সঙ্গে মিলিয়ে নব কলেবর দিয়েও সাধুভাষারূপে সেটা প্রস্তুত করা হয়। পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েলপেণ্টিং! মিশ্র শিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এসিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার ইয়োরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থান বিশেষের বৌদ্ধশিল্প, এবং এখনকার বাংলার নবচিত্রকলা পদ্ধতি! সুতরাং শিল্পের ভাষা রহস্য বড় জটিল হয়ে উঠেছে ক্রমেই, কাকে রাখি কাকে ছাড়ি এও এক সমস্যা! সব ছেড়ে দিয়ে বাংলার নব চিত্রকলাকেই ধ'রে দেখা যাউক—ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠলে তো বড় বিপদ! ছবির ছবিত্ব চুলোয় গেল, সেগুলো হয়ে উঠলো ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব এবং বর ঠকানো কূট প্রশ্ন! নব চিত্রকলার এ ঘটনা যে ঘটেনি তা অস্বীকার করবার যো নেই যখন সবাই বলছে কিন্তু ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি দেখিয়ের দোষে সেটা তো বিচার করা চাই! "বায়বা যাহি দর্শতে মে সোমা অরং কৃতাঃ, তেষাং পাহি শ্রুধী হবং!" সব অন্ধকার ছবির সমস্যার চেয়ে ঘোরতর সমস্যা আমাদের মতো অজ্ঞানের কাছে কিন্তু বেদের পণ্ডিতের কাছে এটা একেবারেই সমস্যা নয়! ছবি যেমন তেমনি রাজাও, রাষ্ট্রনীতি যুদ্ধ-বিগ্রহ, সৈন্য সামন্ত, ধূম ধাম, হাঁক ডাক, দ্বারপাল দুর্গ ইত্যাদির দুর্গমতা নিয়ে একটা মস্ত সমস্যার মতো ঠেকেন প্রজার কাছে কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলে রাজার একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে—যেখানে রাজা হন রাজামহাশয়, দুর্গম সমস্যা নয় তেমনি ছবি মূর্ত্তির সত্তা হল সুন্দর ছবি বা সুন্দরমূর্ত্তি বা শুধু ছবি শুধু মূর্ত্তিতে। রাজাকে উপযুক্ত মানুষের সত্তার দিক দিয়ে দেখার পক্ষেও যেমন দুর্গদ্বার ইত্যাদির বাধা আছে এবং কার কার কাছে নেইও বটে, ছবি মূর্ত্তির সত্তার বোধের বেলাতেও ঠিক একই কথা। ছবিকে মূর্ত্তিকে শুধু ছবি মূর্ত্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর সব দিক সহজ হয়ে যায় কিন্তু একাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে,—হঠাৎ ছবিমূর্ত্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট্ করে যে হয় তা নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কথা!

সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা দুর্ব্বোধ শব্দ মাত্র! সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর গেয়ে কি ছবি রচে' কিম্বা হাতপায়ের ইসারা দিয়েই বলুক সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন যে বুঝতে চলেছে তারও তেমনি ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই।

কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝলে, না হলে বাচন ব্যর্থ হ'ল—'হুঁকো নিয়ে এস' এটা ব্যাকরণ আড়ম্বর অলঙ্কার ইত্যাদি না দিয়া বল্লেম তবে হুকোবরদার বুঝলে পরিষ্কার। দরজার দিকে আঙ্গুল হেলিয়ে বল্লেম 'যাও' বেরিয়ে গেল হুকোবরদার, একটা মটর কারের ছবি এঁকে দোকানের দরজার উপর ঝুলিয়ে

দিলে সবাই বুঝলে এখানে মটর কার পাওয়া যায় কিন্তু বর্ণনের বেলায় ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদির অবগুণ্ঠন আর আবরণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া গেল কথা ছবি সুরসার সমস্ত, কেমন করে সে বোঝে ভাষার গতিবিধির সঙ্গে যার মোটেই পরিচয় হয় নি!

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন সুতরাং দেব ভাষাতেই তাঁর অধিকার হল, একদিন তিনি শুনলেন জল সব চলেছে কি যেন বল্‌তে বল্‌তে! দেবমাতা বামদেবকে শুধালেন ঋষি! অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে করিতে জলবতী নদিগণ আনন্দ-ধ্বনি করতঃ গমন করিতেছে, তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে? অদিতির মতো, ঋষিরও যদি জলের ভাষা-জ্ঞান জলের মতো না হতো, তবে তিনিও শুধু অ-ল-লাই শুন্‌তেন, কিন্তু ঋষি আপনার প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বিশ্বের ভাষা বুঝে নিয়েছিলেন, জল কি বলে, মেঘ কি বলে, নদী সমুদ্র কি বলে, সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কাজেই মেঘ থেকে ঝরে পড়া জলের সেদিনের কথাটি দেবভাষাতে তর্জ্জমা করে অদিতিকে জানানো তাঁর সুসাধ্য হল যথা—'জলবতী নদিগণ ইহাই বলিতেছে মেঘসকলকে ভেদ করে জল সমূহের এমন শক্তি কোথায়! ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করতঃ জল সমূহ মুক্ত করেন, মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।"

অ-র-ণ্য এই কটা অক্ষর জুড়ে দিলেই মূর্ত্তিমান অরণ্যটা আমাদের চোখ দিয়ে সাঁ করে গিয়ে আজকাল প্রবেশ করে মনে, কিন্তু ভাষা যখন অক্ষরমূর্ত্তি ধরেনি, শব্দমূর্ত্তি দৃশ্যমূর্ত্তিতে চলেছে, তখন দেখি শুধু অরণ্য এইটে বাচন মাত্র করে দিয়েই ঋষির ভাষা স্তব্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ছন্দে, সুরে, অরণ্যের ভাষা শব্দ আর নানা রহস্য ধরে ধরে তবে অরণ্যের সত্তা আবিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে চলেছে ঋষির ভাষা জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে—'অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি। কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি নত্বা ভীরিব বিদন্তি॥ বৃষারাবায় বদতে যদুপাবতি-চিচ্চিকঃ। আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥ উতগাব ইবাদন্তুত বেশ্মেব দৃশ্যতে। উতো অরণ্যানিঃ স্যায়ং শকটীরিব সর্জতি॥ গামংগৈষ আ-হ্বয়তি দার্বং গৈষো অপাবধীৎ। বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষাদিতি মন্যতে॥ ন বা অরণ্যানির্হংত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি। স্বাদো ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষিবলাং। প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানি-মশংসষং॥ ১৪৬ দেবমুনি ঋক্‌দেব॥

"হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হও (কত দূরেই তুমি চলিয়াছ) অরণ্যানি তুমি গ্রামের বার্ত্তাই লওনা, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ!

জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন বলিতেছে, উত্তর সাধক পক্ষীরা চিচ্চিক স্বরে যেন তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে এ যেন বীণার ঘাটে ঘাটে ঝনৎকার দিয়া কাহারা অরণ্যানীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে! বোধ হইতেছে অরণ্যানির মধ্যে কোথাও যেন গাভী সকল বিচরণ করিতেছে কোথাও অট্টালিকার মত কি দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ংকালের অরণ্য যেন কত শত

শকট ওখান হইতে বাহির করিয়া দিতেছে! কেও! গাভী সকলকে ফিরিয়া ডাকিতেছে, ও কে! কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে বাস করে সেই লোক বোধ করে সন্ধ্যাকালে যেন কোথায় কে চীৎকার করিয়া উঠিল! বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণবধ করে না অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু না আসিলে ওখানে কোন আশঙ্কা নাই, নানা স্বাদু ফল আহার করিয়া অরণ্যে সুখে দিন যাপন করা যায়, মৃগনাভি গন্ধে সুরভিত অরণ্য যেখানে কৃষিগণ নাই, অথচ বিনা কর্ষণেই প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। মৃগগণের জননীস্বরূপা এমন যে অরণ্যানী তাঁহাকে এইরূপে আমি বর্ণন করিলাম॥”

এখন উপরের এই অরণ্য বর্ণনার একটা তর্জ্জমা বাংলায় না করে ছবির ভাষায় করলে অনেকের পক্ষে বোঝা সহজ হতো সবাই বল্‌বে! ভাল কথা—বর্ণনাটা ছবিতে ধর্‌তে আর্টস্কুলের পরীক্ষার দিনে কাঁচা আধপাকা পাকা সব আর্টিস্‌টদের হাতে দেওয়া গেল ফল কি হল দেখ—কচি আর্টিষ্ট যে ছবি দিয়ে শুধু বাচন কর্‌তেই জানে সে ‘অরণ্যানী’ এইটুকু মাত্র একটা বনের দৃশ্যে বাচন মাত্র করে হাতগুটিয়ে বসলো—আর তো বাচন করিবার কিছু পায় না! পক্ষীর চিক্‌চিক্ বৃষের রব, বীণার ঝনৎকার এসব তো ছবিতে ধরা যায় না, বাকি সমস্তটা মরীচিকার মতো এই দেখতে এই নেই! এদের স্থিরতা দিয়ে ছবিতে ধর্‌লে সমস্তটা মাটি কিন্তু আধপাকা আর্টিষ্ট little learning বা স্বল্প শিক্ষা যাকে ভীষণ, সমস্ত পরীক্ষায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে সে ‘অরণ্য’ কথাটি মাত্র ছবিতে বাচন করে খুসি হলো না সে নির্ব্বাচন করতে বসে গেল—যেন যা হচ্ছে, যেন যা দেখা যাচ্ছে এমনি সব ছায়ারূপ মায় কস্তুরীগন্ধী সোণার মৃগটাকে পর্য্যন্ত রং রেখার ফাঁদে ধর্‌তে চল্লো মহা উৎসাহে! প্রজাপতিকে যেমন ছেলেরা কুঁড়োজালিতে ধরে সেই ভাবে সব ধরলে ছবিতে চিত্রভাষায় নাতি পরিপক্ব আর্টিষ্ট কিন্তু দেখা গেল ধরা মাত্র সব চিত্র পুত্তলিকার মতো কাট হয়ে রইলো, ঋষির গতিশীল বর্ণনা দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে গিল্‌টির ফ্রেমের ফাঁস গলায় দিয়ে অপঘাত মৃত্যু লাভ কর্‌লে! তারপর এল পাকা শিল্পীর পালা সে ঋক্‌বেদের সুক্তটা হাতে পেয়েই তার সমস্ত রসটা মন দিয়ে পান করে ফেল্লে, তারপর ছবির শাদা কাগজে মোটা মোটা করে লিখলে—ছবি মানে Book illustration নয়, একমাত্র Stage craft এই বর্ণনার illustration, চিত্র শব্দ আলো ছায়া এবং নানা গতিবিধি ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে নিখুঁতভাবে, আমি stage manager নই সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। কথাগুলো অরণ্যের সত্তাকে একদিক দিয়ে বোঝালে, ছবির ভাষা অন্যদিক দিয়া তাকে বোঝাবে এই জানি, illustration চান্, না ছবি চান্ সেটা জান্‌লে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হব ইতি—

পুঃ—ঋষিরা এক জায়গায় বলেছেন অন্যের রচনার সাহায্যে তোমরা স্তুতি করিওনা, সুতরাং আমার নিজের মনোমতো রচনা দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে অরণ্যের স্তুতি ছবি দিয়ে লিখে পাঠাবো মনে করেছি; বিদায়—

যে ছেলেটা সব চেয়ে জ্যেঠা পরীক্ষক যদি পাকা হন তো জ্যেষ্ঠ হিসেবে তাকেই দেবেন ফুল মার্ক, আর কাঁচা যার পক্ষে ignorance is bliss তাকে দেবেন পাস্ মার্ক, আর মাঝামাঝি লোকটিকে দেবেন শূন্য এটা নিশ্চয় বলতে পারি। ছবি, কথা, ইঙ্গিৎ, সুর সার ইত্যাদি যদিও এরা ভাষা—কিন্তু ব্যক্ত করার উপায় ও ক্ষেত্র এদের সবারই একটু একটু বিভিন্ন, এরা মেলেও বটে না মেলেও বটে এরা একই ভাষা-পরিবারভুক্ত কিন্তু একই নয়—"Language is a system of-signs, of Ideas and of relations between ideas. These signs may be spoken sounds as in ordinary speech or purely Visual (নাট্য চিত্র) or as the Egyptian Hieroglyphs (অক্ষর মূর্ত্তি বা নিরূপিত বাক্য) or as construction of movements as in the finger language used by deaf-mutes (ইঙ্গিৎ)"—(F. Ryland)

মানুষের ভাষা সব প্রথম শব্দকে ধরে আরম্ভ হল কি চিত্রিত রূপকে ধরে তা বলা শক্ত, তবে স্বভাবের নিয়মে দেখি—জন্মাবধি শিশু শব্দ শোনা, শব্দ করা, আলো ছায়া এবং নানা পদার্থের রূপ রং ইত্যাদি দুটোই এক সঙ্গে ধরে বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়াছে মায়ের দিকে তারি থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বল্লে ভুল হবে না।

পুরাকালের ও প্রাক্কালে মানুষ যে সব শব্দ করে এ ওকে ডাক্‌তো, সে তাকে আদর করে কিছু শোনাতো কি জানাতো, যে বাক্য তারা বল্‌তো তার সুর সার ইঙ্গিৎ আভাষ কোন কালের আকাশে মিলিয়ে গেছে কিন্তু সেই সব দিনের মানুষের চিত্রিত যে বাক্য সমস্ত তা এখনো যে গুহায় তারা থাক্‌তো—তার দেওয়ালে বিচিত্রবর্ণ আর মূর্ত্তি নিয়ে বর্ত্তমান আছে, ইউরোপে এসিয়ার নানাস্থানে কত কি যে ছবি তার ঠিকানা নাই—গরু, মহিষ, শৃগাল, হস্তী, অশ্ব, মৃগ-যূথ, দলে দলে জলের মাছ, যুদ্ধ বিগ্রহ অস্ত্র শস্ত্র কত কি! চিত্রের ভাষা দিয়ে তারা কি বোঝাতে চেয়েছিল তা এখনো ধরতে পাচ্ছি—দিনের খবর, রাতের খবর, জলের খবর, বনের পশুর খবর, এমন কি হরিণের চোখটা কেমন তার খবরটা পর্য্যন্ত! সেই সব ইতিহাসের বাহিরেও যুগের মানুষ এবং সাধক পুরুষেরা নিজেদের তপস্যালব্ধ চিত্রভাষার সাহায্যে মনোভাবগুলো লিখে গেছে, সুতরাং ছবিকেও খুব আদিকালে ভাষা হিসেবেই মানুষ যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। শব্দের দ্বারায় বাক্যের দ্বারায় যেমন, আঁকা ও উৎকীর্ণ রূপের দ্বারাও তেমনি, পরিচিত সব জিনিসকে চিহ্নিত নিরূপিত নির্ব্বাচিত করে চলেছে মানুষ এই হ'ল গোড়ার কথা। যে সব কিছু জীবন্ত কিম্বা যারা গতিশীল কেবল তাদেরই আদি যুগের মানুষেরা চিত্রের ভাষায় ধরতে চেয়েছে, .গাছ, পাথর, আকাশ যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শব্দ করে না, চলে না, বলেও না, আলোতে অরণ্যানীর মতো হঠাৎ দেখা দেয় আবার অন্ধকার হঠাৎ মিলিয়ে যায়, ছবির ভাষায়

তাদের ধরা তখন সম্ভব বোধ করেনি মানুষ, হয়তো বা কথিত ভাষাতেও এসব বর্ণন করেওনি তখনকার মানুষ, কেন যে, তা এক প্রকাণ্ড রহস্য! ধরতে গেলে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়েছে যে হরিণ কি মাছ তাদের ছবিতে ধরার চেয়ে, পাথর, গাছ কি ফুল যারা স্থির রয়েছে চিরকাল ধরে আঁকা দিয়ে তাদেরই ধরা সহজ ছিল কিন্তু তা হয়নি, গাছ, পালা, পাহাড়, পর্ব্বত, এরা বাদ পড়ে গেল, আর যাদের শব্দ অঙ্গভঙ্গি এই সব আছে—এক কথায় যাদের ভাষা আছে—পুরাতন মানুষের ছবির ভাষা আগে গিয়ে মিল্লো তাদেরই সঙ্গে! এ যেন মানুষের সঙ্গে চারিদিকের যারা এসে কথা কইল, তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বস্‌লো মানুষ, জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—জল তুমি কেমন করে চল? জলস্রোতের রেখা ও গতি ভঙ্গি দিয়ে এঁকে, ইঙ্গিত করে, শব্দ করে পর্য্যন্ত যেন জানিয়ে দিলে—এমনি করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি! হরিণ তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল! কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না—গাছ তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ, মর্ম্মর ধ্বনি করে দিলে—এই এমনিই নড়ি থেকে থেকে জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলেনা মানুষ! পাহাড় দাঁড়িয়ে কেন! আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল কেন! ছবির ভাষায় এদের কথা লেখা হলই না শুধু এদের বোঝাতে মানুষ গাছ বল্‌তে গোটাকতক দাঁড়ি কসি, পাহাড় বল্‌তে একটা ত্রিকোণ চিহ্ন দিয়ে গেল কখন কখন কতকটা চীনে অক্ষরের মতো,—রূপাভাষ কিন্তু পুরো রূপ চিত্র নয়। ব্রতধারী মানুষ কামনা ব্যক্ত করবার সময় পুরাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কথা, ছবি, সুর, নাট্য ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করে চলেছে তার রীতি আমাদের এখনো ধরে থাকতে হয়েছে—শুধু এক কালের অস্ফুট শিশুভাষা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে কালে কালে—ভাবসম্পদে অর্থ শব্দ বর্ণ ইত্যাদিতে ভরে উঠতে উঠতে, এইটুকু পার্থক্য হয়েছে পুরাকালের ব্রতধারির ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার।

যে মানুষ ছবি কথা কিম্বা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারিনে স্ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে আস্তে একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে—আলপনার পদ্ম পত্রের উপরে একটি বুদ্‌বুদের আকারে, স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়লো বসুন্ধরা—'হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারায় তোমার স্তব করেন!' জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনি গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণন করে চল্লো আকাশে ভ্রাম্যমানা পৃথিবীকে! স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক্ষ ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্য্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাতপায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা, এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্ত্তি, এঁর পার্শ্ব দেবতা হল দুটি—'বাচন' ও 'বর্ণন', এই মূর্ত্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন

মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ! এর পরে এল—বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্য্যন্ত, আবৃত্তি থেকে সুর করে বিবৃতি পর্য্যন্ত—"বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগেদবীর করুণাক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল"—ভাষা, বোধোদয় বস্তুপরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোলো! তারপরে এলো ভাষার মহিমা সৌন্দর্য্য ইত্যাদি—'যেমন চালনীর দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেইভাবে বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত কবিয়াছেন (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন......সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন,...ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন...বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন...ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেইভাষা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে"...! বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পাবার আগে থেকে কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল—মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিষ্কৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল। মানুষের সব চেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই দিয়ে রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভরা দেখি 'আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার হৃদয় নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে...দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে...আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!" কিম্বা যেমন—"কিরূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।" হৃদয়ের বেদনার অন্ত নাই, দেখতে চেয়ে শুনতে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে, ধাবিত হচ্ছে! অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছেনা!—"যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতা সকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি!" মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোন রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুসি হচ্ছেনা মানুষের মন, সুন্দর উপায় সকল উত্তম উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য সাধনা চলেছে—"হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতা দোষে দুষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়"! ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল স্তোত্র আর

ভাষা চাইলেন। ভাষার মধ্যে এই গতি পৌঁছয় কোথা থেকে। মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গালার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙ্গালীর মন বাংলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাংলা চলছে ও চলবে চিরকাল—বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে, নানা জিনিষ যুক্ত হতে হতে; ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের মধ্যে দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাংলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবেনা। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—'হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল!' বৃষ্টির জল ঝরণা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাযের হল, আর জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চূড়োয় বসে রইলো—গল্লোওনা চল্লোওনা, গলালেও না চালালেও না, জলের থাকা নাথাকা সমান হল। বাঁধা বস্তুর বা styleর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায় কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিৎ করার ভাষা সবারি এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্ত্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে! নতুন কবি নতুন আর্টিষ্ট এরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই! ভাষা সকল গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো অথচ দেখে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতি

ওগো ও মুগ্ধ! দীপ্তির জলে গলিয়ে যাও।
ওগো ও লুব্ধ! তৃপ্তির তলে তলিয়ে যাও।
হে সুখ-ভুক্ত! দুখের জ্বালায় জ্বলিয়ে যাও।
হে দুখ-মুক্ত! বুকের বালাই দলিয়ে যাও।

উদ্ভট-সাগর

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

(৬)

নব-বিবাহিতা বালিকা বধূ পতিকে দেখিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট হয়, ধনবান্ লোকও ভিক্ষুককে দেখিয়া সেইরূপ অসন্তুষ্ট হন। ইহাই কবি এই শ্লোকে উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :—

আনম্রাননমাগতে বিতনুতে নো ভাষতে ভাষিতে
স্থানাদ্ গন্তুমপীহতে ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং ক্বচিৎ।
রুদ্ধে বর্ত্মনি বক্তি নিষ্ঠুরতরং গুপ্তাক্ষরং জল্পতি
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূলোকো যথা চেষ্টতে॥

মুখ খানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে।
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
দুটা মিষ্ট কথা বলি' না চায় তুষিতে।
পথ-রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড় বিড় শব্দ কত করে সে সময়।
নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে!

(৭)

বহু-সংখ্যক গোপী, শ্রীমতী রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া যমুনা-পারে দধি, দুগ্ধ ও ঘোল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৌকার কর্ণধার হইয়া তাঁহাদিগকে এক পার হইতে অপর পারে লইয়া যাইবার সময় শ্রীমতী রাধিকার নিকটে যে কৌতুকে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে নিহিত হইয়াছে :—

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্য নাবং মম
বাতো বারিদসম্ভ্রমাদ্ যদি বহেন্মগ্না ভবেন্নৌরিয়ম্।
শুক্লং তদ্ বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ তবেদং বপুঃ
শ্যামং শ্যাম নবীননীরদসমং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাম্॥

কৃষ্ণ—
নৌকার উপরে মোর উঠি' শীঘ্রগতি
নীলাম্বর খানি তব ত্যজ লো শ্রীমতি!
পাছে বায়ু মেঘ ভাবি' সত্বর উঠিয়া
নৌকা খানি দেয় আজ জলে ডুবাইয়া!

রাধিকা—
গোপীর কাণ্ডারী হরি! শুন হে এখন,
এখনি করিব শুভ্র বসন ধারণ।
কিন্তু নব-ঘন-শ্যাম এই তব কায়
শাদা ক'রে দিই আগে ঘোল ঢেলে তায়!

(৮)

ভারতবর্ষে কোন্ স্থানের রমণীর কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সুঘনঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে।
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেঽসৌ
বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে॥

কোথায় কি মদনের অতি প্রিয় স্থান,
এই কবিতায় মিলে তাহার প্রমাণ ;—
গৌড়-দেশ-নিবাসিনী নারীর দশন,
উড়িষ্যার রমণীর সুরম্য জঘন,
তৈলঙ্গ-নারীর রম্য নিতম্ব-প্রদেশ,
কেরল-নারীর নব-ঘন-শ্যাম কেশ,
কর্ণাট-নারীর কটি পরম শোভন,
গুর্জ্জর-নারীর ঘন-পীনোন্নত স্তন,
মথুরার রমণীর বাক্য মনোহর,
মিথিলার রমণীর কটাক্ষ সুন্দর।

(৯)

কিরূপ ছাত্র উত্তম, মধ্যম বা অধম এবং কিরূপ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া উচিত বা অনুচিত, তাহাই কোন কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

যশ্ছাত্রঃ শ্রুতমাত্রমর্থমখিলং গৃহ্নাতি স শ্রাব্যতাং
যো বেত্তি দ্বিরুদাহৃতং কৃতফলং তত্রাপি বক্তুর্বচঃ।
যস্তু স্পষ্টমনেকশোঽপ্যভিহিতাং নাবৈতি লেখ্যার্থতাং
ধিক্ তং তৎপিতরৌ ধিগেব নিতরাং ধিক্ তদ্‌গুরুং গর্দ্দভম্ ॥

(উদ্ভটস্য)

যে ছাত্র শুনিবামাত্র অর্থ বুঝে মনে,
তাহাকেই শিক্ষা দিবে পরম যতনে।
যে ছাত্র দু-বার শুনি' অর্থ বুঝে লয়,
তাহাকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত নিশ্চয়।
বারংবার স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রেও শ্রবণ
যে ছাত্র প্রকৃত অর্থ না বুঝে কখন,
ধিক্ সেই ছাত্র, ধিক্ মাতাপিতা তার,
আর শত ধিক্ তার গর্দ্দভ মাষ্টার !

(১০)

কোন কবি সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কাঁঠাল-গাছের সহিত উত্তমের, আম-গাছের সহিত মধ্যমের এবং কুঁদ-ফুলের গাছের সহিত অধমের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন :—

পনসাম্রকুন্দসমা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কর্ম্ম বাক্ কর্ম্ম বাগপি ॥

উত্তম, মধ্যম, পুনঃ অধম যে জন,
কাঁঠাল, রসাল, কুন্দ বৃক্ষের মতন।
কাঁঠাল, রসাল, কুন্দ এ তিন যেমন
ফল, পুষ্প-ফল, পুষ্প করে বিতরণ,
উত্তম, মধ্যম, পুনঃ অধম তেমন
কার্য্যে, বাক্যে কার্য্যে, বাক্যে করে সমাপন !

ব্যাখ্যা। কাঁঠাল-গাছ ফুল না দিয়া একেবারেই ফল দিয়া থাকে ; উত্তম ব্যক্তিও বাক্যদান না করিয়া একেবারেই কার্য্য করিয়া বসেন ; এইহেতু উত্তম ব্যক্তি কাঁঠাল-গাছের মত। আম-গাছ ফুল (বউল) দিয়া তৎপরে ফল দিয়া থাকে ; মধ্যম ব্যক্তিও বাক্যদান করিয়া তৎপরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন ; এইহেতু মধ্যম ব্যক্তি আম-গাছের মত। কুঁদ-ফুলের গাছ ফুল দিয়াই ক্ষান্ত হয়,—ফল দেয় না ; অধম ব্যক্তিও বাক্যদান করে, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না। এ কারণ-বশতঃ অধম ব্যক্তি কুঁদ-ফুলের গাছের মত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

বর্ত্তমান লাহোর

['কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে]

রেলওয়ে গীর্জ্জা

রোমান ক্যাথলিক উপাসনামন্দির

লাহোর হাইকোর্ট

লাহোর জেনারেল পোষ্ট আফিস
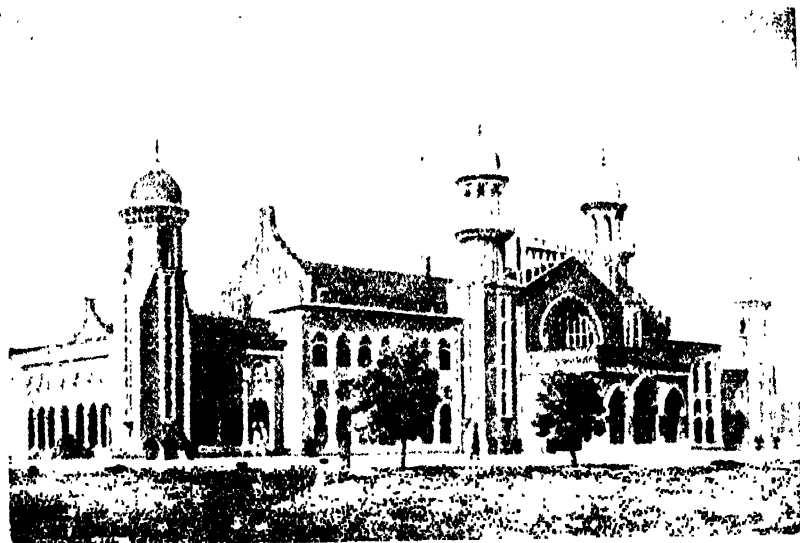
সালিমার উদ্যান

লাহোর যাদুঘর

সোণা মসজিদ

দিল্লী-দ্বার

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

মার্কিণে বড় বড় সহরগুলি নূতন ধরণে গড়িয়া উঠিয়াছে; আর কোথাও এই নমুনার সহর-পত্তনের কথা শুনি নাই। জগতের পুরাতন সহরগুলি নিজের ধন ও জন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে দিকে সুবিধা পাইয়াছে, সেইদিকেই যেন ঠেলিয়া উঠিয়াছে। কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রথম হইতেই মনে মনে একটা নমুনা গড়িয়া এ সকল সহরের পত্তন করেন নাই। এই জন্য পুরাণো সহরগুলি কতকটা আমাদের প্রাচীন বনস্পতির মত; চারিদিকে কেবল ছড়াইয়াই পড়িয়াছে, কিন্তু সহর-পত্তনের ভিতর দিয়া নিজের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের চেষ্টা করে নাই। লণ্ডন সহরটা একটা বিস্তীর্ণ ইমারতের জঙ্গল বলিলেও হয়। আমি একদিন একটী রাস্তা ধরিয়া চলিয়া ভাবিয়াছিলাম যে ক্রমে নিজের সুপরিচিত পথে পড়িতে পারিব। আমার পাড়ার বড় রাস্তাটি ছিল উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী। আমি পাড়ার নিকটেরই একটা পূর্ব্ব-বাহিনী পথ ধরিয়া চলিয়া ভাবিয়াছিলাম, কোনও না কোনও একটী জায়গায় আমার পাড়ার পথে যাইয়া পড়িব। কিন্তু ঘণ্টা দুইকাল পথ হাঁটিয়া বহুদূরে যাইয়া শেষে গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। লণ্ডনের পথ ধরিয়া দিঙ্-নির্ণয় করা নূতন লোকের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। কিন্তু মার্কিণের বড় বড় সহরগুলিতে পথ ভুলিবার আশঙ্কা আদৌ নাই বলিলেই হয়। নিউইয়র্কে বহুবার একেলা দূর দূরান্তের পল্লীতে যাতায়াত করিয়াছি। কিন্তু কখনও পথ ভুলিবার ভাবনা হয় নাই। ফলতঃ নিউইয়র্ক সহরটীর এমনিভাবে পত্তন হইয়াছে যে ঠিকানা জানিলে নিতান্ত অপরিচিত লোকেও চোখ বুজিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে।

নিউইয়র্ক দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে বাড়িয়া গিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে, দক্ষিণ পূর্ব্বে হাডসন্ নদী। নদীর তীরবর্ত্তী রাস্তাগুলি প্রাচীন সহরের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে, অর্থাৎ সহরের অন্যান্য অংশের যে ভাবে পত্তন হইয়াছে, এ অংশটীর ঠিক সেভাবে হইতে পারে নাই। সহরের এই অংশটুকু বাদ দিলে বাকীটাকে শতরঞ্চ খেলার ঘরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। পূর্ব্ব-পশ্চিমে সহরটা কতকটা সরু। দক্ষিণ দিকে কতদুর যে গিয়াছে আমি তার ঠিকানা করিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু তখনও সহর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিম বাহিনী পথগুলিকে (Street) ষ্ট্রীট্ কহে। দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যে রাস্তাগুলি চলিয়া গিয়াছে, তার নাম (Avenue) এভেনিউ। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে বারটা এভেনিউ ছিল, এইত মনে পড়ে। Streetএর সংখ্যা কত ছিল বলিতে পারি না; তবে বোধ হয় আমার একটী পরিচিত লোক একশত উনত্রিশ নম্বর

ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। এক, দুই করিয়া সংখ্যা গণনায় নিউইয়র্কের ষ্ট্রীট্ ও এভেনিউগুলির নামকরণ হইয়াছে। কেবলমাত্র একটা এভেনিউএর নামকরণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। এই এভেনিউএর নাম ম্যাডিসন্ এভেনিউ। এই নামটা কেন যে বদলাইয়া দেওয়া হয় নাই, তাহার কারণ বোধহয় এই যে এই ম্যাডিসন্ এভেনিউই নিউইয়র্ক সহরটাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম—এই দুই ভাগ করিয়াছে। ম্যাডিসন্ এভেনিউর পূর্ব্বদিকের ষ্ট্রীট্গুলিকে ইষ্ট্ (East) বিশেষণে ও পশ্চিমদিকের ষ্ট্রীট্গুলিকে ওয়েষ্ট্, (West) বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। এরূপ বিভাগ না হইলে কেবল ষ্ট্রীটের নম্বর ধরিয়া গিয়া তাহাতে কোনও বাড়ীর ঠিকানা করিতে খামকা অনেক সময় খরচ হইত। আমার হোটেল উনত্রিশ নম্বর ষ্ট্রীটে ছিল। কিন্তু ষ্ট্রীটগুলি ত অল্প লম্বা নহে। উনত্রিশ নম্বর ষ্ট্রীটে উনচল্লিশ নম্বর বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে হইলে অপরিচিত লোকের পক্ষে একেবারে প্রথম এভেনিউ ধরিয়া এই ষ্ট্রীটে পড়িতে হইত। কিন্তু Number 39 west 29th street অর্থাৎ উনত্রিশ নম্বর ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশে উনচল্লিশ নম্বর বাড়ী—এই ঠিকানা খুঁজিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। যেখান হইতে হউক না কেন, ম্যাডিসন্ এভেনিউ ধরিয়া আসিলে যেখানে 29th street পড়িয়াছে, তাহার পশ্চিমদিকে গেলেই সহজে এই ঠিকানাতে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

এইরূপে সমস্ত সহরটাকে পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী কতকগুলি সমান্তরাল রাজপথ দিয়া কাটা হইয়াছে বলিয়া নিউইয়র্কের প্রত্যেক বাড়ীই একটা বড় রাস্তার উপরে পড়িয়াছে। আর প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে কিছু কিছু খোলা জায়গা ও বাগান আছে। এবং এগুলি পিটোপিটি বাড়ীর পরস্পরের সংলগ্ন বলিয়া বাড়ীর পেছনের বারান্দায় দাঁড়াইলে মনে হয় যেন একটা উপবনের মাঝখানে যাইয়া পড়িয়াছি। এখানে সহরের ইট্-পাটকেলের লোহা-লক্কড়ের এমন কি জন-কোলাহলের পর্য্যন্ত কোনও কিছু দেখাশোনা যায় না। অনেকদিন আমি আমার হোটেলের পেছনের বারান্দায় যাইয়া নিউইয়র্কের অভ্রভেদী ইমারতের দৃশ্যে পীড়িত চক্ষু দুটীকে জুড়াইয়াছি।

নিউইয়র্ক সহরটা মাটী ধরিয়া বেশী বাড়িবার অবসর না পাইয়া অনেকদিন হইল উপরের দিকেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এদেশে তেতলার না হয় চারি-পাঁচ তলার বাড়ী পর্য্যন্তই দেখা যায়। লণ্ডনেও ছ'-সাত তলার চাইতে উঁচু বাড়ী এখনও বেশী হয় নাই। যতদিন সিড়ি ভাঙ্গিয়া তেতলায় চৌতলায় উঠিতে হইত, ততদিন পর্য্যন্ত লোকে আট-দশ তলার বাড়ী করিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সিঁড়ি না ভাঙ্গিয়া দোলায় চড়িয়া তড়িৎ কিম্বা জলশক্তির চাপে চক্ষের নিমেষে শ'-দু'শত ফুট উপর-নীচে যাতায়াত করিবার ব্যবস্থার আবিষ্কার হইল, তখন হইতে সভ্যজগতের ইমারতগুলি আকাশ ভেদিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথম বিলাত যাই, তখনও লণ্ডনে এই ব্যবস্থা বেশী হয় নাই। কিন্তু নিউইয়র্কের

সকল আফিসে এবং অনেক বাড়ীতেই তখন এই লিফ্‌টের (lift) ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং পঁচিশ ছাব্বিশ তলার বাড়ী করিবার পথে আর কোনও বিশেষ অন্তরায় ছিল না। মার্কিণে পূর্ত্ত-বিদ্যা-বিশারদেরা কি প্রণালীতে এ সকল বাড়ী প্রস্তুত করিলে নিরাপদ হইবে তাহার পথও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি যখন নিউইয়র্কে ছিলাম, তখন বোধ হয় যতদূর মনে পড়ে সাতাশ-তলার বাড়ী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি নিউইয়র্ক উঁচুর দিকে তার চাইতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এত উঁচু বাড়ীর দিকে তাকান কষ্টকর ছিল। পথে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিলে জলে চক্ষু ভরিয়া আসিত।

(৭)

আমার হোটেলে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষ নিয়মিত বাসিন্দা ছিলেন। এ ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই বোধহয় পনর-কুড়িজন অভ্যাগত মফঃস্বল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এই চল্লিশ পঞ্চাশ জন হোটেলবাসীর সঙ্গেই যে আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, তাহা নহে। আহারের সময় কাহারও কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত। কখনও বা রাত্রিকালের আহারান্তে বসিবার ঘরে গেলে দু'দশজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ মিলিত। কিন্তু অনেকেই নিজেদের ঘরেই অবসরকাল কাটাইতেন। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় খাইতে যাইবার কালে পথি-মধ্যে দুইটী মহিলা আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করেন। ইঁহাদের সঙ্গে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঁহাদের একজনের বয়স আশীর উপরে গিয়াছিল। অন্যজন ইঁহা অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন, অনুমান চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হইবে, এবং তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করিতেন। বর্ষীয়সী মহিলাটি সাহিত্যচর্চ্চাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। খুব যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু মার্কিণ সাহিত্যিক সমাজে সকলেই ইঁহার নাম জানিত এবং ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। ইঁহার জীবন-কথা মর্ম্মস্পর্শী। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ইঁহার বিবাহ হয়। বোধহয় তখন তাঁহার বয়স আঠার কি উনিশ ছিল। বিবাহের দিনেই অপরাহ্ণে নববধূকে নূতন বাড়ীতে আনিয়া তাঁহার স্বামী একবার পল্লীটী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হয়েন। কিন্তু বেশীদূর যাইতে না যাইতেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়! নববধূ তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়াছিলেন। পল্লীবাসীরা যখন তাঁহার মৃতদেহ লইয়া আসিল তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ আঘাতে ছয়মাসের মধ্যে কেবল অহর্নিশি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু দু'টা অন্ধ হইয়া যায়। চক্ষু থাকিলে যাহা হউক জীবনধারণ সম্ভব হইত। কিন্তু চক্ষুহীন স্বামী-পুত্রহীন যুবতী কাহার গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণ করিবেন, এই ভাবিয়া ইনি আকুল হইলেন। শেষে একটা অন্ধদিগের আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই খানেই তাঁহার প্রথম সাহিত্য-শক্তির স্ফুরণ হয়। এই আশ্রমে যে

অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহারই কিছু কিছু অবলম্বন করিয়া তিনি উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হন। একদিকে কালযাপন এবং অন্যদিকে জীবিকা-উপার্জ্জন, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া ইনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। তাঁহার দু'একখানা গ্রন্থ আমি পড়িয়াছি। উপন্যাস হিসাবে সেগুলি মার্কিণ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান না পাইলেও এই কাহিনীগুলির ভিতর দিয়া ভগ্ন-হৃদয়ের যে করুণ কাতরতা এবং এই কারুণ্য হইতে যে একটা উদার মৈত্রীভাব স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত উপাদেয়।

খাবার-ঘরে যাইবার পথে যখন ইনি আমার পেছন হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—"Is it Mr. Pal from India ?"—আমি বামাকণ্ঠ-নিঃসৃতস্বরে চমকিয়া উঠিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, এক অসাধারণ রমণীমূর্ত্তি। দেখিয়া মনে হইল যেন একখানা Classic ছবি; এইরূপ মূর্ত্তিই গ্রীক ও রোমক শিল্পিগণ চিত্রপটে কিম্বা প্রস্তর-ফলকে সৃজন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা, তথাপি যে অলোকসামান্য রূপ ও লাবণ্য এই দেহেতে জীবনের বসন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ছাপ ও স্মৃতি এখনও যেন এই শিথিল-গ্রন্থি দেহের সঙ্গে জড়াইয়া আছে। ইনি যে অন্ধ, তখনও ইহা বুঝিতে পারি নাই। আমাকে অভিবাদন করিয়াই কহিলেন, আসুন, আমাদের টেবিলে আসিয়া আহার করুন। এই প্রথম পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এবং যতদিন নিউইয়র্কের এই হোটেলে ছিলাম, ততদিন এই ভদ্রমহিলার ও তাঁহার সঙ্গিনীর আদর-আপ্যায়নের সহানুভূতি এবং সাহচর্য্যে, স্নেহে এবং সেবাতে সুদূর প্রবাস-জনিত অন্তরের নিঃসঙ্গতার নীরব বেদনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

মাস দুই পরে ইঁহারা নিউইয়র্ক ছাড়িয়া ওয়াসিংটন চলিয়া যান। ইঁহাদের স্নেহ ও সখ্যই আমাকেও ওয়াসিংটন টানিয়া লইয়া যায়। সে এক অদ্ভুত কাহিনী। যথাকালে তাহার কথা কহিব।

(৮)

মার্কিণের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। বহুকাল ধরিয়া অসহায় নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের উপরে প্রভুত্ব করিয়া মার্কিণ চরিত্রের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। নিগ্রোদিগকে ইহারা যত না ঘৃণা করে, নিগ্রো ও মার্কিণীয়ের রক্তমিশ্রণ-জনিত যে শঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে আরও যেন বেশী ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই শঙ্করবর্ণকে মুলাটো (Mullato) কহে। ইহারা কাফ্রীদের মত কালো নয়; অনেকটা আমাদেরি মতন শ্যামবর্ণের। হঠাৎ দেখিলে আমাদিগকে মুলাটো বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নহে। এইরূপ ভ্রম করাতেই কখনও কখনও আমাদের দেশের লোককে আমেরিকাতে একটু আধটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপীয় বেশ-ভূষা ধারণ করেন না, তাঁহারা সহজেই এই ভ্রম নিবারণ করিতে পারেন। আমি কোনও দিন ইংরাজের পোষাক পরি নাই। পাণ্টালুন, কোট ও চোগা এবং মাথায় হাতে

বাঁধা পাগড়ী—এই পোষাকেই সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়াছি। ইহাতে কখনও বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কেবল একবার বিলাতে কার্লাইল সহরে য়ুনিটেরিয়ান গীর্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের কাজ করিতে যাইয়া, সহরের ছেলের দল, আমার অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া প্রায় অর্দ্ধেক সহর আমার পেছনে বহর বাঁধিয়া ছুটিয়াছিল। ইহা ছাড়া কিন্তু আমাকে কোনও প্রকারে অবমানিত বা উত্যক্ত করে নাই। দুর্দ্দমনীয় কুতূহলপরবশ হইয়া আমি কীদৃশ জীব, কি ভাষায় কথাবার্ত্তা কই, কেমন করিয়া খাই-দাই, এ সকল জানিবার জন্যই আমার পেছন লাগিয়াছিল। সে অদ্ভুত দৃশ্য ভুলিব না। প্রথমে একটা নিকটবর্ত্তী গীর্জ্জায় রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটী পাইয়া পথে বাহির হইয়াই আমাকে সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পরে নিজের বাড়ীর পথ ভুলিয়া গিয়া অনেকে আমার পেছন লইল। ইহাদের মুখে কথাটা পর্য্যন্ত নাই। কেবল প্রায় একশত বুটের শব্দ পল্লী জাগাইয়া চলিল। এই শব্দে পল্লীর বালকেরাও ঘরের বাহির হইয়া এই অদ্ভুত অভিযানের সঙ্গে মিশিয়া গেল। এইরূপে আমি যখন আমার বাসাবাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সে পথে প্রায় তিন চারি শত বালক জুটিয়াছে। এ দৃশ্যটী এখনও চোখের উপর যেন ভাসিতেছে। এই অদ্ভুত অভ্যার্থনায় আমার কিছুই অপমান বোধ হয় নাই ; এবং এইরূপ ঘটনার পুনরভিনয়ের আশঙ্কায় আমার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের বাসনা নিমেষের জন্যও অন্তরে স্থান পায় নাই।

নিউইয়র্কে একদিন মাত্র, অতি সামান্যপরিমাণে, আমার গৈরিক শিরস্ত্রাণ—কোনও বালকের দলকে নহে, –কিন্তু কৌতুকপ্রিয় সুরা-প্রফুল্ল কতকগুলি অশিক্ষিত আমেরিকানকে একটু চঞ্চল করিয়াছিল। কিন্তু এ চাঞ্চল্য কতটা পরিমাণে যে আমার পোষাক দেখিয়া হইয়াছিল, বলা কঠিন। সে দিন শনিবার ছিল। National Temperance Societyর কর্ত্তৃপক্ষ আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বৈঠক ভাঙ্গিতে প্রায় রাত্র এগারটা হইয়া যায়। আমার হোটেলের পথে একটা সালোন (Saloon) ছিল। আমেরিকায় এই সকল সালোনে যাইয়াই লোকে মদ্যাদি পান ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিয়া খোস-গল্প করিয়া থাকে। একদল লোক এই সালোনের দরজায় দাঁড়াইয়া রঙ্গ-তামাসা করিতেছিল। বুয়র যুদ্ধ তখন চলিয়াছে। বুয়র রাষ্ট্র-নায়ক ক্রুজারের নাম তখন সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়াই একজন লোক চেঁচাইয়া উঠিল—"Gee, Kruger !" অর্থাৎ "একি ! এই যে ক্রুজার !"—অমনি তার সঙ্গীদের দু'তিন জন আমার কাছে আসিয়া আমার মুখ দেখিয়া চলিয়া গেল। সেকালে কেইন সাহেব "অমৃত বাজার পত্রিকায়" ও "মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ডে" বিলাতের চিঠি লিখিয়া পাঠাইতেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার উপর রং চড়াইয়া তিনি "পত্রিকায়" লিখিয়াছিলেন, আমেরিকায় আমাকে এক দল লোক ক্রুজার বলিয়া তাড়া করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ওমেদারের গান

পাশ করেছি এম-এ, বি-এ
নাশ করে এ জীবন ভাই,
দাসের দাদন কে করে, কা'র
গ্রাজুয়েটেড্ নোকর চাই ?
কে আছে গো চাকরী-দাতা
একটু ধর ছায়ার ছাতা,
পাবে না আর এমন মাথা,
মাটির দরে বিকিয়ে যাই।
একটি দানা নেইকো পেটে,
ফোস্কা-পায়ে হেঁটে হেঁটে,
"কর্ম্মখালি" ঘেঁটে ঘেঁটে
পদ্ম চোখে নিদ্রা নাই।
মা ভেবেছেন তীর্থে যা'বেন,
বাবা আঁচেন কি জমা'বেন,
"তিনি" সোণার ল্যাজ গড়া'বেন
আমি যদি চাকরী পাই।
গঙ্গা-তীরে চাকরী হ'লে,
হয় না খারাপ দিদি বলে—
সেথায় থাকা ভালই চলে,
গঙ্গাজলে হাড় জুড়াই।
এমনি ধারাই আরও কত,
ভাব্ছে সবাই নানান্ মত,
দেখে এদের আশাহত
ভাব্ছি আমার মরণ নাই।

সবার সেরা দুঃখু মনে,
করবো নিরাশ এত জনে,
এ তুলনায় দেখ্ছি গণে,
নিজের আমার দুঃখু ছাই।
দেখ্ছি শুধু বিয়ের হাটে ;
পাশের "পসার" একটু কাটে,
তাহাও ইতি ; বুদ্ধি গাঁটে
কোন কালেই একটু নাই।
সাত পুরুষের মোক্ষ হেতু,
কচি পিঠে স্বর্গ সেতু,
বেঁধে দিলেন মকরকেতু,
ট্যাঁ ট্যাঁয় গৃহ ভরল তাই।
ষষ্ঠী দেবীর নেক্ নজরে
ঠাঁই টুকু নাই একটু ঘরে,
ভাব্ছি এতদিনের পরে,
পাছে বা হায় ক্ষেপে যাই।
সুখ তো হ'বে কপালে ঢের—
জানি ; শুধু জানি না এর,
কোথায় গিয়ে মিট্‌বে বা জের,
জান যদি জানাও ভাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

লাভ লোকসান

বহুকাল পূর্ব্বে আমরা লাভ লোকসানের কথা বড় শুনিতাম না। প্রচুর অন্নের সংস্থান থাকায় কথাটা চাপা ছিল। এখন জীবনরক্ষা সুকঠিন হইয়া পড়াতে সকলেরই লাভের দিকে দৃষ্টি।

কাঁদিয়া লাভ কি? ভগবানকে ডাকিয়া লাভ কি? পরের খোসামোদ করিয়া লাভ কি? অমুক চাকুরিতে লাভ কত? বক্তৃতা করিয়া লাভ কি? ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিয়া লাভ কি? গরু কিনিয়া লাভ কি? ঘোড়া রাখিয়া লাভ কি? লেখাপড়া শিখিয়া লাভ কি? এই প্রকার কোনো কর্ম্মের কথা উঠিলে তাহাতে লাভ কি, এই প্রশ্নই মনে উদয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা করেন লোকসানই বা কি? তাহার উত্তরের জন্য কেহ অপেক্ষা করে না।

লাভের কথা উঠিলেই 'টাকা' নামক পদার্থ মনে পড়ে। একটা লোকের যদি দশটা গরু এবং দশ বিঘা জমি থাকে, তবে তাহার লাভ কত, ইহা স্থির করিতে হইলে আমরা টাকা দিয়া হিসাব করিয়া লই। যদি ঘরে টাকা না আসে, তবে গরু ও জমি বৃথা। সেই প্রকার, স্ত্রী পুত্রাদির মূল্যও এখন নিরূপিত হইতেছে।

টাকা থাকিলে, সংসারের উপর একটা দাবী থাকে। অন্ততঃ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া লয় বলিয়া টাকার একটা মূল্য আছে। টাকার আর একটা গুণ যে তাহা সুদে খাটাইলে বাড়িয়া যায়। ভবিষ্যতে পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য লোকে টাকা সঞ্চয় করে। কেবল মানুষ নয়, অনেক গৃহপালিত পশুও টাকার মহিমা বুঝে। এক তোড়া টাকা দেখাইলে কুকুর লাঙ্গুল আন্দোলনপূর্ব্বক তাহার appreciation জ্ঞাপন করে। অনেক বজ্জাৎ ঘোড়া টাকা দেখাইলে আনন্দিতচিত্তে গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়! এমনকি দেখা গিয়াছে যে বালিশের তলায় টাকা রাখিয়া দিলে ছারপোকা গৃহস্থকে কামড়ায় না।

সুতরাং, এই সংসারের দোকানদারিতে লাভ লোকসান বিচার করিতে হইলে খাতাপত্রে টাকা দ্বারা তাহার হিসাব করিতে হয়।

তবে লাভ লোকসান স্থির করা যতদূর আমরা সহজ মনে করি, তাহা নহে। এ বিষয়ে মনীষিগণের মতের পরস্পরের সহিত কোন কালেই ঐক্য হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, সুখ দুঃখের সঙ্গে লাভ লোকসানের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কখনো কখনো টাকাই দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে। অনেকের মতে সংসারে লাভ লোকসান বলিয়া কোন পদার্থই নাই। এ সব কথার উল্লেখ করিতে গেলে প্রথমতঃ দর্শন শাস্ত্রের কথা স্বতঃই উত্থাপিত হয়। তবে সেটা

যাহাতে বিরক্তিকর না হইয়া পড়ে তাহার উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব সাধারণ কথায় ইহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

১। সংসার একটি মালগুদাম, তাহাতে মাল (Goods) কলে প্রস্তুত (Manufactured) হয় তাহার নাম 'সৃষ্টি'। মালের সরঞ্জাম পাঞ্চভৌতিক।

এ মাল তৈয়ারি করে কে? আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই যে সকলে মিলিয়া এই মাল তৈয়ারি করে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, রাম, শ্যাম, হাতী, ঘোড়া, গাধা, মৌমাছি, স্থাবর, জঙ্গম, সকলেই এই গুদামের মাল তৈয়ারি করিতেছে। সকলেরই পরিশ্রমের ফলে এই বিশ্বের বিভূতি। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা খুব সম্ভবতঃ একটা Limited liability কোম্পানির মতো। কবে এই কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ইহার Share holders এবং Directors কে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। গুদামের মাল যাহারা তৈয়ারি করে, তাহারাই যদি Share holders হয়, তবে ইহা Co-operative association অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। অন্ততঃ Socialist সম্প্রদায় তাহাই মনে করেন। আমাদের দেশে সে ভাব এখনও বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। সুতরাং পুরাণো কালের ভাব লইয়া ধরা যাউক—

২। স্বয়ং নারায়ণ এই কোম্পানীর Director এবং লক্ষ্মী Cashier। 'প্রকৃতিদেবী' নামিকা একজন বৃদ্ধা মহিলা এই কারবার কিংবা কলকারখানার অধ্যক্ষা। স্বয়ং Directorই ইহার Capitalist। Capital তাঁহার শক্তি। যদি তাহার মূল্য একটাকা ধরিয়া লওয়া যায় তবে—

Subscribed Capital	এক টাকা	১৲
Paid up Capital	ঐ	১৲
Dividend declared	ঐ	১৲
Profit—(লাভ)	ঐ	১৲
Loss—(লোকসান)	ঐ	১৲
Directors' fees	ঐ	১৲
জমা	ঐ	১৲
খরচ	ঐ	১৲

ফলে ইহাতে লাভ লোকসান কিছুই নাই। কেবল ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্র।

লৌকিক ভাষায় এই প্রকারে বুঝানো যাইতে পারে। লক্ষ্মীর কৌটার মধ্যে এক কড়া কড়ি (কিংবা একটা সিঁদুর মাখানো টাকা) থাকে। সেই টাকাটি তিনি সুদ খাটাইবার জন্য প্রত্যেক যুগে প্রকৃতিদেবীর হাতে দেন। প্রকৃতিদেবী নিজগুণবিভাগে সেই একটাকা বহুধা করিয়া বিশ্বপ্রকটিত করেন (তাহার নাম ব্রহ্মার সৃষ্টি)। কিন্তু এই টাকার সুদে লক্ষ টাকার বিকাশ একটা অলীক পদার্থ। প্রলয়ের সময় সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সেই আসল টাকাটা নারায়ণে আবার লীন হয়।

লক্ষ্মী যখন সুদ চাহেন তখন তিনি অন্ধকারে লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকেন। লক্ষ্মী তখন সাগর তীরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসেন।

লক্ষ্মীর কৌটার (কিংবা ঝুপড়ির) মধ্যে একটা জমা খরচের খাতা দেখিতে পাইবেন তাহা এই—

সত্যযুগ—

জমা—	খরচ—
১৲	প্রকৃতিকে ধার———১৲
যুগাবসানে সুদে আসলে	
১৲	

লাভ—০ (শূন্য)

ত্রেতাযুগ—

দ্বাপরযুগ—

কলিযুগ—

প্রত্যেক যুগেই ঐ প্রকারে ১৲ টাকা জমা থাকিয়া যায়।

সাংখ্যদর্শনকার এইজন্য সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এই সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়া ঈশ্বরের লাভ কি? যদি তাঁহার অভাব থাকে তবে তিনি বদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ" ইহার উত্তর যে সুদে টাকা খাটাইয়া ভগবানের আসলে কিছুই লাভ নাই। সুদ যে একটা অলীক পদার্থ তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন, যেমন উদরের আয়তন বৃদ্ধি হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়না। তবে মায়াবশে তাহার দিকে তাকাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং অনেকের মতে—

৩। লাভ লোকসান অলীক—তাহার আদি অন্ত নাই। কিন্তু লাভের দিকে দৃষ্টিপাত থাকায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। ইহা ব্যক্তিগত, এবং কালবিভাগের অন্তর্গত।

প্রত্যেক লোকেরই বহুকাল বাঁচিবার সাধ, এবং বাঁচিয়া থাকিয়া হয় ধর্ম্মসঞ্চয় কিংবা ইন্দ্রিয়-সুখভোগে সাধ, এবং বহু পুত্রকলত্র সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টির উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করার সাধ। তাহাতে ধর্ম্ম কোথায়, এবং অধর্ম্ম কোথায়, এবং Moral government কোথায়, এবং Economics ও Politics কোথায়, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এখন কেবল ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক।

প্রত্যেক জীবই প্রাণশক্তি লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এটা তাহার নিজস্ব নহে। পঞ্চভূত একত্র হইয়া প্রাণের কারবার খাড়া করিয়া দেয়। সুতরাং প্রাণ Subscribed Capital মাত্র। তুমি কেবল ব্যাংকের Director কিংবা ম্যানেজার। তুমি যদি ঠিক চালাইতে পার তবে কোন রকমে দিন কাটিতে পারে। কিন্তু ইহার অংশীদার অনেক। লাভ হইলেই তাহারা বাঁটিয়া লইবে। সুতরাং গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—'কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই'। Raifessen এর Co-operative bookএর মতো।

কারবারের সময় এই কথাটা মনে রাখিলে অনেক সমস্যা পূরণ হইয়া যায়।

একএকটা উদাহরণ লইয়া দেখুন।

বিবাহ করিয়া লাভ কি ?

জমা		খরচ	
Opening balance প্রাণ (Capital)	১৲	পঞ্চাশ বৎসর কিংবা শত বৎসরে (যাহার যেমন জীবনের মিয়াদী পাট্টা) সংসারের কৃষি কর্ম্মে খাটানো——	১৲
ত্রিশ বৎসরের স্থদে পুত্র, কলত্র, গাড়ী, ঘোড়া, পুষ্করিণী, বাস্তুভিটা প্রভৃতি— লাভ	১০০০০৲	ত্রিশ বৎসরের খরচ—	১৫০০০৲
দেনা	৫০০০৲		
	১৫০০১৲		১৫০০১৲

লোকসান ৫০০০৲। দেনা তোমার পুত্র কলত্রের স্কন্ধে। তুমি পুরাতন এক টাকা লইয়া অদৃশ্য।

লেখাপড়া শিখিয়া লাভ কি ?

জমা		খরচ	
প্রাণ	১৲	লেখা পড়া শিখিবার খরচ	১০০০০৲
পিতৃমাতৃঋণ ইত্যাদি, যাহাতে লেখা-পড়া শিখিয়াছি	১০০০০৲	চাকুরীর স্থলে খরচ ও পরবর্ত্তী বংশের খরচ	১০০০০৲
চাকুরী করিয়া উপার্জ্জন	৫০০০৲		
দেনা	৫০০০৲		২০০০০৲
	২০০০১৲		

এস্থলে তোমার ১৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে, কারণ প্রাণ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার ফল সংসার পাইয়াছে, তোমার কেবল কর্ম্মভোগ।

কারবারের লাভ।

মনে করুন যে আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন এবং কারবারে দশ বৎসরের মধ্যে আপনি লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

জমা		খরচ	
প্রাণ	১৲		
পূর্ব্ব সঞ্চিত মূলধন কিংবা পিতৃদত্ত ধন	৫০০০০৲	লড়াইয়ের পূর্ব্বে লোহার কিংবা বস্ত্রের মাল খরিদ	৫০০০০৲
লৌহ এবং বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া	১০০০০০৲	(লাভ	১০০০০১৲)
	১৫০০০১৲		১৫০০০১৲

হয়ত এই এক লক্ষ টাকা আপনার নগদ জমা আছে কিংবা অর্দ্ধেক সুদে খাটিতেছে, এবং অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে আপনি নিম্নলিখিত সখের জিনিস সঞ্চয় করিয়াছেন।

Assets.

মোটর কার	৫০০০৲
দোতালায় গৃহ	২৫০০০৲
গহনাপত্র	২০,০০০৲
(এবং নগদ	৫০,০০০৲)

হঠাৎ যদি রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তবে দেখিতে পাইবেন যে আপনার সঞ্চিত ধনের কোন মূল্য নাই, এবং যদি অপর্য্যাপ্ত ঘৃত-পক্ক দ্রব্য খাইয়া এবং মোটর কারে ভ্রমণ করিয়া আপনার Blood pressure কিংবা Liver বাড়িয়া গিয়া থাকে তবে ঐ পুরাতন ১৲ টাকা ছাড়া আপনার পরকালের কিছুই থাকিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত লাভ লোকসান বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে নাই। সমগ্র বিশ্ব যদি আজি বাকি খাজনার নিলামে বিক্রয় হয় তবে কেবল নারায়ণ এক টাকায় ডাকিয়া লইতে পারেন, অন্য কেহই লইবে না, কারণ, ইহার তত্ত্বাবধান করা শক্ত ব্যাপার।

মানবসমাজ হইতে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পশুসমাজে নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের মধ্যে লাভ লোকসানের কোন হিসাব পত্র নাই। কোন মালে দাবী দাওয়া নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে

সখ্যতা এবং প্রীতি

যখন আমরা দেনা পাওনার এবং লাভ লোকসানের হিসাব করি, তখন সেটা দেখিতে পাই না, কেবল টাকার দিকেই দৃষ্টি। যখন রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, দেশ বিদেশে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, মহামারী ও দস্যুবৃত্তি প্রবল হয়, কিংবা ঘোর জলপ্লাবনে জীব হাহাকার করিয়া উঠে, তখন কেবল মনে হয়—.

‘ধ্রুতবানসি বেদং’

সংসার অলীক হইলেও ইহার মধ্যে কারবারের একটা কৌশল আছে তাহা দ্বারা মানব দীর্ঘায়ু, শান্তি ও একতা, এবং চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করিতে পারে। সেই কারবারের খাতাপত্র একটু বেতর—

জমা		খরচ	
১৲		তোমার জন্য	
		আমার জন্য	॥৹
তোমার লাভ	... ...	আমার লোকসান	
১৲			

ফলে দুইটী প্রাণীর ॥৹ লাভ

পুনর্ব্বার

জমা	খরচ	
	উভয়ের খরচ	।৹
॥৹	তৃতীয় ব্যক্তির জন্য	।৹
তৃতীয় ব্যক্তির	আমার খরচ	৵৹
লাভ ১৲	তোমার খরচ	৵৹
১॥৹	তৃতীয় ব্যক্তির	।৹
		১৲

ফলে তিনটি প্রাণীর ॥৹ লাভ

এইরূপে কারবারের মধ্যে প্রীতিসহকারে প্রাণীসংখ্যা যোগ করিলে দেখিতে পাইবেন ফলে কখনো লোকসান হয় না, সেই কারবারের গুণে চুরি, প্রবঞ্চনা, দস্যুবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা সকলই লুপ্ত হয়, এবং যে ধর্ম্ম-সমাজ সংগঠিত হয় তাহার ফলে দুঃখের ভার লঘু হইয়া পড়ে।

পরস্পর পরস্পারের ভারগ্রহণ না করিলে টাকার কোনই মূল্য নাই! মনে করুন আপনি লক্ষ টাকার নোট সৃষ্টি করিয়া দেশে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে অভিলাষী। দেশের লোক যদি আপনার ভার বহন করিতে বিমুখ হয় তবে আপনার কাগজের টাকার বদলে মাল কেহ ছাড়িবে না। এমন সময় আসিতে পারে যে টাকার মূল্য এত কমিয়া যাইবে, এবং ব্যক্তিগত প্রাণশক্তির মূল্য এত বাড়িয়া যাইবে যে পঞ্চাশ টাকায় একসের দুগ্ধ জুটিবেনা! সুতরাং এস্থলে মনুসংহিতাটা একবার পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিলে মন্দ হয় না। একালের লক্ষ টাকা লাভ সেকালের দশ টাকার লোকসানের সমান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

পাশের বাড়ী

(গল্প)

মার্চ্চেন্ট অফিসে চাকরি করি। থাকি বেনেটোলার এক জীর্ণ মেশে। সকালে সাড়ে ন'টা বাজিতেই গরম ভাতে বর্ণহীন পাঁচনের মত ঝোল মাখিয়া তাই মুখে গুঁজিয়া অফিসে বাহির হইয়া পড়ি। সারা পথ লোকের ভিড় ঠেলিয়া অফিসে গিয়া হাজিরা দিতে হয় দশটায়। অফিস হইতে ফিরি সন্ধ্যার পর, কোন দিন সাতটায়, কোনদিন আটটায়। মুখ-হাত ধুইয়া মেশের অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া খানিক তাশ-পাশা পিটি, তার পর শয়নে পদ্মনাভ। দিনের আলো ফুটিলে পালাক্রমে বাজার করা আছে, জামা-কাপড়ে সাবান লাগানো আছে,—এমনি ভাবেই সময় কাটে। আর কোন দিকে বা কাহারো পানে চাহিবার ফুরসুৎ মেলে না।

সাত বৎসর পরে মেশের ঘরে মিস্ত্রী লাগিয়াছিল। বাজার করিয়া ফরমাস খাটিয়া মেশের কর্ত্তার মন একটু পাইয়াছিলাম, তাই সুপারিশ আর মিনতির জোরে দক্ষিণ দিকের সিঙ্গল্-সীট্-ওয়ালা ছোট ঘরটায় বদলি হইয়া আসিলাম। একটাকা ভাড়া বেশী দিতে হইল। তা হোক, তবু এ ঘরে একটু হাওয়া আছে, গরমে পচিয়া মরিতে হইবে না। তা ছাড়া একটু আকাশের মুখও দেখা যাইবে। যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরে জানলা একটা মাত্র ছিল, তার নীচেই অন্ধকার সরু গলি, ছাপ-মারা সেওয়ার্ড ডিচ্। হাওয়ার নাম ত ছিলই না, মাঝে মাঝে গুম্সুনি ঝাঁজের সঙ্গে এমন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ উঠিত যে নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিত!

বাজার করিয়া আসিয়া নূতন ঘরে বিছানা-পত্র পাতিয়া বসিয়া ছিলাম। সেদিন রবিবার। কোন তাড়া ছিল না। কাগজপত্র বাহির করিয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিতেছিলাম। স্ত্রীর অসুখ, ছোট ছেলেটাও মাসখানেক ভুগিতেছে, তাহার জন্য একটিন বার্লি আর কিছু বিস্কুট কিনিয়া পাঠাইতে হইবে। একবার বাড়ী যাইতে পারিলে ভাল হইত! কিন্তু পয়সায় কুলায় না। সেবারে বাড়ী গিয়া দুইদিন থাকিয়া আসিয়াছি। বাড়ী যাওয়ার মানে যাতায়াতে প্রায় তিন টাকার উপর ট্রেণ-ভাড়া লাগে। তাই মনে করিলেই যাওয়া চলে না। পূর্ব্বে মাসে একবার করিয়া যাওয়া ঘটিত; এখন চারটি ছেলেমেয়ে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, সংসারে খরচ বাড়িয়াছে—ঘন-ঘন গেলে অনর্থক কতকগুলা পয়সা খরচ হয়, তাই যাওয়া চলে না।

স্ত্রী অনুযোগ করিয়াছিল, একবার গিয়া বাড়ীর হাল দেখিয়া আসিলে হয়! তাই বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া এক লম্বা চিঠি ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। কেরাণী-জীবনের দুঃখ যে কি, বিশেষ মার্চ্চেন্ট অফিসের সামান্য কেরাণীর জীবন—তাহাই বুঝাইতেছিলাম, হঠাৎ নীচে পাশের বাড়ী হইতে কতকগুলা কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। বালিকা-কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—এই দেখ'সে মা, তোমার আদরের বৌ

কল্‌তলায় পড়ে দাদার ভালো চায়ের বাটী ভেঙ্গে ফেলেছেন! অমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠের তীব্র ভৎর্সনা জাগিল,—অ্যাঁ! এমন বেয়াক্কেলে বাপের মেয়েও দেখিনি কোনকালে, বাবা! হাড় জ্বালিয়ে খেলে! ধিঙ্গি মাগী! কলতলায় পড়ল কি বলে, বল দিকি! এ খালি হিংসে বৈ ত না! চায়ের বাসন নিত্যি ধোওয়া-মাজা, ভাঙ্‌ একটা—তাহলে আর ধুতে বলবে না! তা হচ্ছে না বাবা, এই বাটী ভাঙ্গার খেসারৎ তুলবো এবেলার খাবার থেকে! মনে করেছ, পার পেয়ে যাবে, ভেলকি দেখিয়ে! আমার কাছে সে ফাঁকি চলচে না! আসুক নন্দ আজ বাড়ী। তার আদরের বৌয়ের কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখুক একবার! মা বড় মন্দ! মিছি-মিছি বৌয়ের পেছনে লাগে, না? আমি যাই বাপের বেটী, তাই এই বৌ নিয়ে ঘর করচি, নৈলে এ অসৈরণ কে সয়, একবার দেখি!

চিঠি লেখা বন্ধ হইল। খোলা জানলার মধ্য দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে উঁকি মারিলাম। তক্তাপোষে বসিয়া কিছু দেখা গেল না। উঠিব কি না, ভাবিতেছি, এমন সময় সেই কর্কশকণ্ঠে আবার ঝঙ্কার উঠিল,—ঢং করে আর কতক্ষণ পড়ে থাকবে গো! ওমা, এ কি আবার! মূচ্ছো গেলেন না কি রাজনন্দিনী!

তার পরেই একটি মিস্ট কণ্ঠে করুণ সুর জাগিল,—আহা, ঠোঁট কেটে রক্তে রক্ত হয়ে গেছে মা, তা দেখেচ।

এ স্বর কোন কিশোরীর! সংসারের ব্যথায় বেদনায় ক্লিষ্ট ব্যথিত সুর! বড় মিঠা লাগিল।

অমনি আবার সেই ঝঙ্কার,—দেখো, ডাক্তার-বদ্যি চাই না কি! নাহলে ওঠা হবে না? বাঁদী-বান্দা এসে পাঙ্খা ঢুলোবে, তবে রাজনন্দিনীর মূচ্ছো ভাঙ্গবে! আঃ, আর পারি না, বাবা! তিতি-বিরক্তি ধরে গেছে আমার। ওঠো না গো রাজার কন্যে!

সেই কিশোরীর সুর তখন কর্কশ ঝঙ্কারের উপরে মিহি তুলি বুলাইয়া দিল,—ওঠো, বৌ, দেখি। আহা, এসো ভাই, আমি ধুইয়ে দি। দেখ দেখি মা, কি রকম কেটে গেছে। যে তোমার কলতলায় পেছল!

মার কণ্ঠে আবার কাঁশর বাজিল—দেখতে হয় তুই দেখ্‌গে। অত আদর আমার দ্বারা হবে না! ভালো আপদ! দামী বাটিটা ভেঙ্গে চূরমার করে দিলে! নন্দর আমার কত সাধের বাটি!

কিশোরী বলিল,—মানুষটা কেটে রক্তারক্তি হলো, তাতে একটা আহা নেই, তুমি এক বাটির শোকে পাগল হলে মা! ও সব থাক্ ভাই বৌ, তোমায় মাজতে হবে না। আমি সব মেজে ধুয়ে দিচ্ছি।

অমনি খুব চাপা গলায় মৃদু আর্ত্তনাদের মত একটি ক্ষীণ স্বর ফুটিল—না ভাই ঠাকুরঝি, আমিই মেজে নিচ্ছি!

—না, না, না। ভারী রাগ করবো, তুমি সরে দাঁড়াও। আমায় মাজতে না দিলে আমি ভারী রাগ করব কিন্তু।

এই বিচিত্র স্বরের দেওয়ালিতে কয়েকটি মূর্ত্তিও আমার চোখের সাম্‌নে নিমেষে জাগিয়া উঠিল। কাংশ্যকণ্ঠী এক স্থূলদেহী গৃহিণী, পাশে তার এক আহ্লাদী মেয়ে, প্রকাণ্ড উঁচু ঢিপি কপালের উপর চুলগুলা টানিয়া বাঁধা, ওদিকে কলতলায় ময়লা ছেঁড়া শাড়ী পরা কুণ্ঠিতা ভীতা বৌটি, আর তাহার হাত ধরিয়া দেবীর মত সান্ত্বনাময়ী কিশোরী-মূর্ত্তি! কথাগুলার ফাঁকে ফাঁকে এমন একটি করুণ নাট্য জাগিয়া উঠিল যে আমার মন নিতান্ত ব্যথা-হত এই বিচিত্র স্বরের মালিকদের দেখিবার জন্য অধৈর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

তক্তাপোষ-শয্যা ছাড়িয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাশের বাড়ীর উঠানের একটু খানি দেখা যাইতেছিল। কয়েকটা শাড়ীর প্রান্ত মাত্র চোখে পড়িল। আর কিছুই না। তারপর আরো কয়টা ঝঙ্কার আর মিনতির সুর তুলিয়া স্বরগুলা স্তব্ধ হইল।

চিঠি সারিয়া স্নান করিতে গেলাম। মনটা কিন্তু ঐ পাশের বাড়ীর উঠানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া মাথায় চিরুণী ছোঁয়াইয়াছি, আবার সেই কর্কশকণ্ঠ বাজিল,—ঐ দেখ্‌সে নন্দ, তোর সাধের চায়ের বাটি আদুরী বৌ ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ করেছে!

ছেলে নন্দ তীব্র ঝাঁজে বলিয়া উঠিল,—ভেঙ্গেছে! আঃ, রোজ রোজ আর পারিও না। কি করে ভাঙ্গলে!

মার স্বরে কাঁশর বাজিল—ঢং গো ঢং! রাজনন্দিনীর কি ও-সব ধোয়া-মাজা পোষায়। তাই ভাঙ্গলে—যে আর মাজ্‌তে বলবে না! আর কেনই বা মাজতে যাওয়া। আমার কি গতরে পোকা ধরেছে, না, আমি মরেছি! আমি দাসী-বাঁদী আছি ত,—সব করচি, ওটাও নয় ধুতুম!

সেই মিহি সুর তখন বীণার মত বাজিয়া উঠিল,—ও কথা বলোনা মা। না দাদা, বৌ পড়ে ঠোঁট কেটেছে, বাটিটাও তাই ভেঙ্গে গেছে তোমাদের কলতলায় যে পেছল বাবু! দৈবাৎ ভেঙ্গে ও একেবারে চোরের অধম হয়ে আছে গো, বেচারী মরে আছে যেন! আর সেই মরার উপর মার খাঁড়া সমানে চলেছে! তুমিও এবার কোমর বাঁধবে নাকি!

তার পর একমিনিট সব চুপচাপ—আবার সুপুত্র গর্জ্জন ছাড়িল,—দেখি সে ভাঙ্গা বাটি! ভেঙ্গেচে, দেখ! এর একটার দাম দশ আনা। তিন দিনও হয় নি, কিনে এনেচি!

মা বলিলেন,— সর্ব্বস্ব উড়ে পুড়ে গেল। কি বৌই এনেছিলুম বাবা! ছি, ছি!

—মা— এ সেই দেবীর কণ্ঠস্বর! দেবীর কণ্ঠের সুরে যেন আগুন ছুটিল।

মা বলিলেন,—তুই থাম্‌ বীণা, আর আস্কারা দিস্‌নে। শাসনের সময় শাসন করতে দে।

দেবীর নাম বীণা! নামটা সার্থক হইয়াছে, ও কণ্ঠের সুর বীণার ঝঙ্কারই বটে!

পুত্র গর্জ্জন করিল,—এক বেলা খাওয়া বন্ধ কর। মার-ধর ত করতে পারি না, ভদ্দর লোকের ঘরে।

বীণা বলিল—আমারো খাওয়া সেই সঙ্গে তাহলে বন্ধ কর। দুজনের ভাত বাজারে বেচে এসোগে, পেয়ালার দাম উস্থল হয়ে যাবে।

তারপর পাশের বাড়ীর রঙ্গভূমি চুপচাপ। আমি খাইতে গেলাম। গলা দিয়া ভাত আর নামিতে চায় না। কেবলি মনে হইতেছিল,—আহা, পাশের বাড়ীর ঐ বালিকা দুটি আজ অনশনে কাটাইবে! দৈবাৎ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহারি ফলে আজ উহারা উপবাস করিয়া থাকিবে! হায়রে মানুষের অন্ধ হিংসা, স্পর্দ্ধিত অহঙ্কার! বেচারী বৌটি, বাঙালীর ঘরের অসহায়া বালিকা! তোমার উপর এ কি কঠোর নির্ম্মম নির্য্যাতনের ধারা গো! স্নেহ-মমতার ধারও কেহ ধারে না!

সেদিন অফিসে যাইতেছি, হঠাৎ আবার সেই কাংস্যকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,—ঢং গো ঢং! অসুখ! আনো বদ্যি, আনো হাকিম! ভুলকালাম বাধাও খরচের! অসুখ, তা হবে কি? দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকুক।

বীণা বলিল,—ভয় নেই। আমি পয়সা দিয়ে সাবু আনাচ্ছি, তোমাদের পয়সা খরচ হবে না। আনিয়ে নিজে সাবু তৈরী করে দেব। তোমরা গতর দুলিয়ে দশভুজা হয়ে অন্নের গ্রাস মুখে তোলোগে। ওকে না খাইয়ে আমি খাব না।

মা বলিল,—তোর আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে।

অসুখ! সেই বেচারী বধূটির অসুখ হইয়াছে? ঐ রাক্ষসের পুরীতে দুরন্ত চেড়ীগুলার বাক্য-যন্ত্রণা আর সহস্র নির্য্যাতনে না জানি মুখখানি ম্লান করিয়া কি ভাবেই সে পড়িয়া আছে! মুখে জল দিতে ভাগ্যে ঐ বীণা আছে, নহিলে কি দশাই হইত!

ইচ্ছা হইতেছিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনি, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় কি না! যদি না হয়, তবে নিজেই গাঁট হইতে পয়সা দিয়া কোন ডাক্তারকে উহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিই—সে দেখিয়া ব্যবস্থা করুক! কিন্তু দাঁড়াইবার উপায় নাই! ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অফিসে লেট্ হইলে মাহিনা কাটা যাইবে! কেরাণীর আবার পরের দুঃখে দুঃখ করা সাজে কখনো!

মনের মধ্যে পাহাড়ের বোঝা চাপাইয়া আহারে গিয়া বসিলাম। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া কোটটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দশটা বাজিতে তখন আর দশ মিনিট বাকী। বেলা হইয়া গিয়াছে! যাইবার সময় পাশের বাড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া গেলাম। বাড়ীটা দারুণ স্তব্ধতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে হইল, নানা নির্য্যাতনে কাতর ব্যথিত বাড়ীখানা কি যেন এক অজানা ভয়ে স্তম্ভিত চিত্ত লইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সেদিন ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। পরদিন ভোরে বড় বাবুর মেয়ের পাকা দেখা—তাঁহার সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়া কতকগুলা ফল-ফুলুরি কিনিয়া দিতে হইল। যখন ফিরিলাম, তখন চারিধার নিশীথের নিদ্রা দিয়া ঘেরা। পাশের বাড়ীরও সেই অবস্থা।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বড় বাবুর বাড়ী ছুটিতে হইল। সেইখানেই আহার সারিয়া অফিসে

রওনা হইলাম। পাশের বাড়ীর বৌটি কেমন আছে জানিবার জন্য প্রাণটা সারাদিন অস্থির হইয়া রহিল। অফিসে কাজকর্ম্মের মধ্যেও ঐ পরিচয়হীনা বালিকার রোগ-কাতর ম্লান ছলছল দৃষ্টিটুকু আমার আশে-পাশে বেদনার ঝড় তুলিয়া যেন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার বেদনা ছুঁচের মত বুকে বিঁধিতেছিল।

ফিরিবার পথে দুইটি বেদানা ও কিছু আঙুর কিনিয়া লইলাম। ভাবিলাম, কাহাকেও ডাকিয়া পাশের বাড়ীর বৌটির জন্য পাঠাইয়া দিব। তবু বেচারী মুখে দিলে একটু তৃপ্তি হইবে। কিন্তু কি বলিয়া পাঠাই ?

একরকম পাগলের মত ছুটিয়া বাসায় ফিরিলাম। গলির পথে তখন গ্যাস জ্বালিয়া দিয়াছে। মেশের কাছে আসিতেই একটা তীব্র ক্রন্দনের শব্দ কাণে আসিল,— ওগো মা গো, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে কোথায় চল্‌লে মা !

বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তবে কি— !

যা ভাবিয়াছিলাম ! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ঠিক সন্ধ্যার সময় পাড়ার গৃহে গৃহে যখন শঙ্খরোল উঠিয়াছে, তখন সেই বেচারী বালিকা সংসারের শত অত্যাচার, শত নির্য্যাতনের পাশ কাটিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া বাঁচিয়াছে !

মেশের সদরে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গুঞ্জন-ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে সেই রাক্ষসী শাশুড়ীর তীব্র ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছিল,—ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর আঁধার করে কোথায় গেলে মা ! ও বাপ নন্দরে !

রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি ঝড়ের মত ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ঐ রাক্ষসীর কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরি—প্রচণ্ড প্রহারে তার ওই নির্লজ্জ শোকাভিনয় একেবারে জন্মের মত বন্ধ করিয়া দিই !

বেদানা, আঙুরগুলা দ্বারের সামনে রাখিয়া দিলাম। মরণ-পথযাত্রিণী বালিকার উদ্দেশে বলিলাম,—দেবী, তোমার দুঃখে গলিয়া তোমারই উদ্দেশে এগুলি নিবেদন করিলাম। বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ ! প্রার্থনা করি, মরিয়া সুখী হ'ও, শান্তি পাও, তৃপ্তি পাও !

উপরে আসিয়া জামাটা খুলিয়া দড়ির আলনায় ঝুলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বীণার কথা মনে হইতেছিল। বেচারী শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া ঘরের কোণে কোথায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে ! শোকের এই বিরাট অভিনয়ের মাঝখানে কে আর তাহাকে দেখিতেছে ! ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার শ্রান্ত বেদনাহত শির এই কোলে তুলিয়া লইয়া বলি,—কেন কাঁদছ বোন্ ? সে যে মরিয়া সব জ্বালা জুড়াইয়াছে ! এ ত তার মৃত্যু নয়—এ যে মুক্তি, মুক্তি !

কিন্তু তা বলে চলে না ! বলিবার অধিকারও নাই ! আমার দুই চোখে অশ্রুর সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ও বাড়ীর সেই রাক্ষসীর কণ্ঠে তীব্র ক্রন্দন জাগিল,—ওগো মা গো, ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—মায়া কাটিয়ে কোথায় চল্‌লি মা ? কি দুঃখে ছেড়ে গেলি গো মা ? তোর কিসের দুঃখ ! এমন সংসার, রাজা স্বামী—ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী, আজ কোথায় চল্‌ল গো !

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ফুলের ভারে সজ্জিত দড়ির খাটে বাসি ফুলের মতই শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তি ! আলতা-রাঙা পা দুখানি বাহির হইয়া আছে, সিঁথির সিঁদুর রক্তরাগে সৌভাগ্যের কি দীপ্ত মহিমাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে ! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, যাও মা, দেবীর মহিমায় সাজিয়াই ওপারে যাও। সেখানে গিয়া ও সিঁদুর মুছিয়া ও আল্‌তার রঙ ধুইয়া বিশ্ববিধাতার কাছে এই শোকের ভণ্ডামির খোলস্ ছিঁড়িয়া নির্য্যাতনের নালিশ কর গিয়া। আর মিনতি জানাইয়ো, বাঙালীর ঘরে আর যেন বৌ করিয়া তোমায় তিনি না পাঠান্ !

হরিবোল বলিয়া বালকেরা খাট লইয়া চলিয়া গেল। নন্দ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল। মাথার ঝাঁক্‌ড়া চুলগুলা ঝুলিয়া মুখে পড়িয়াছে—ডাকাতের মত ভীষণ মূর্ত্তি ! ঐ পাষণ্ডই বালিকাকে খুন করিয়াছে,—আর উহার সেই দুর্দ্দান্ত মা ! খুন—হাঁ, খুনই করিয়াছে ! ইহাদের বিচার করে এমন আদালত কি দুনিয়ায় নাই ! আমি গিয়া হলফ লইয়া তাহা হইলে সেখানে সাক্ষ্য দিই, বলি, খুনে, ইহারা খুনে ! হাকিমকে গিয়া বলি, উহাদের ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইয়া দাও।

কিন্তু মিথ্যা রে, মিথ্যা এ অভিযোগ—মিথ্যা এ কাতরতা ! উপরে আসিয়া বিছানায় দেহভার লুটাইয়া দিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল, ঐ বালিকা বধূটির বাপ-মায়ের কথা ! হায়রে, হয়ত এই একটিমাত্রই সন্তান তাদের ! ইহাকে যোগ্য বরে যোগ্য ঘরে দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে এখন তাহারা বসিয়া আছে ! জানেও না, এখানে কি সর্ব্বনাশই তাহাদের হইয়া গেল !

আমার দুই চোখে হু-হু করিয়া জল ঠেলিয়া আসিল।

ঠাকুর আসিয়া বলিল,—বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ। আসুন।

গম্ভীরকণ্ঠে বলিলাম,—খাব না। শরীর খারাপ।

ঠাকুর চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোথা দিয়া কেবলি কতকগুলা দুঃস্বপ্নেই কাটিয়া গেল। পরদিন ভোরে মেশের কর্ত্তাকে বলিয়া আবার সেই বায়ু-হীন পুরানো ঘরেই ফিরিয়া আসিলাম। দক্ষিণদিকের ও-ঘরে টেঁকা যায় না। পাশের বাড়ীর হাওয়া কেমন যেন বিষাইয়া রহিয়াছে—ও হাওয়া গায়ে না লাগে !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স্ এসোসিয়েসন্ (Indian Association for the Cultivation of Science) এ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য। যাহাতে দেশের লোকের অধ্যাপনায় ভারতবাসিগণ স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায় গবেষণায় নিপুণ এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে পারে, এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাক্তার সরকার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার রমণের তত্ত্বাবধানে, ভারতের নানাস্থান হইতে আগত জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রগণ এই বিদ্যামন্দিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের আবিষ্কৃত নব নব তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জগতে সাদরে গৃহীত হইতেছে। এই বিজ্ঞান-সভাই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত দেশের লোককে বিজ্ঞান-শিক্ষা দিবার প্রথম প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকারের নিকট তাঁহার দেশবাসী চিরদিন অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

সার্ তারকনাথ পালিত ও সার্ রাসবিহারী ঘোষের অর্থ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ্ (University Science College) স্থাপিত হইবার পর বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্য সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার স্থাপয়িতা ও কর্ম্মকর্ত্তা মাননীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা-জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে এই বিজ্ঞানপীঠ তারকনাথ ও রাসবিহারীর সহিত চিরদিন সার্ আশুতোষের সুযশ ঘোষণা করিবে। এখানে সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন-বিভাগে এবং অধ্যাপক রমণ পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে বহু সুযোগ্য শিষ্য পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই বিজ্ঞানমন্দিরে ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা (Applied Physics), ব্যবহারিক রসায়ণ-বিজ্ঞান (Applied Chemistry) এবং শিল্প-বিজ্ঞান (Technology) শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইয়ুরোপে শিক্ষিত অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে এই শিক্ষার ভার সমর্পিত হইয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞানমন্দিরের গবেষণা-কার্য্যের ফল বৈজ্ঞানিক জগতে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে। সায়েন্স্ কলেজের আরো প্রসারণ আবশ্যক। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের আরো অধিক অর্থ সাহায্য করা উচিত। উপযুক্ত বৃত্তি স্থাপন করিয়া এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ভারতীয় ছাত্রগণের গবেষণা কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া দেশের ধনিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর একটী কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস্ বিভাগের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, বিজ্ঞান-বিভাগে তাহা অপেক্ষা কম খরচ করেন। সময়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া এ বিষয়ে সামঞ্জস্য স্থাপন একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পর বঙ্গদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা সমুচিত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণ যাহাতে অব্যাহতভাবে শুদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতে পারে, এই সময় হইতে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষাগারে (Laboratory) নিজহস্তে যন্ত্রাদি সাহায্যে কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে কেবল উপাধি পরীক্ষার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল এবং তাহাতেও আশানুরূপ ফল লাভ হইত না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট্-শিক্ষা-বিভাগ (Post Graduate Department) স্থাপিত হইবার পর দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার আরো বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং গবেষণা-কার্য্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা মাননীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আর একটী মহতী কীর্ত্তি। এই বিভাগ পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগের বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ছাত্রগণ বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ও আইন প্রভৃতি বিষয়ই তাহাদিগকে প্রকৃষ্টভাবে আকর্ষণ করিত। সম্প্রতি ছাত্রগণেরও এ সম্বন্ধে মনোভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি তাহাদের একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। যে সকল কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের অধ্যক্ষগণ বলেন যে বিস্তর ছাত্রের বিজ্ঞান-শ্রেণাতে প্রবেশ করিবার আবেদন, স্থানের অভাববশতঃ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা যে একটী সুলক্ষণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কলেজের অধ্যক্ষগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহাদের কলেজে যাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে পারে, তাঁহারা অবিলম্বে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

আচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে (Bose Institute) উদ্ভিদ্-জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উন্নত গবেষণা কার্য্য চলিতেছে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার আজীবন-স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দেশের কল্যাণার্থ এই বিজ্ঞানপীঠ-প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট্ অর্থ দ্বারা তাঁহার এই কার্য্যের সহায়তা করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে এই বিজ্ঞানপীঠ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের বৈজ্ঞানিকদিগের একটী তীর্থস্থান হইবে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানালোক যেমন প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে এক সময়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন জ্ঞান-বিস্তার-কল্পে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পুনরায় ভারতের লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়।

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ওয়াটসন্ ও তাঁহার ছাত্রগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই কার্য্যের সবিশেষ

প্রসারণ দেখিতে বাসনা করি। অধ্যাপক ওয়াটসন্ এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট্ প্রতিষ্ঠিত কানপুরের শিল্প-শিক্ষাপীঠে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং ব্যবহারিক রসায়নে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

স্বনামধন্য টাটা মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোরের টাটা-বিজ্ঞান-মন্দির (Imperial Institute of Science) বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত ও বেসরকারী কলেজ সমূহে এবং গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক স্থাপিত কতিপয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা-কার্য্য অল্পবিস্তর সম্পাদিত হইতেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণার কার্য্য ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এ সম্বন্ধে কলিকাতার School of Tropical Medicine and Hygiene, কসৌলির Research Institute এবং বোম্বাইয়ের Parel Laboratory বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ডাক্তার সর্ লেনার্ড্ রজার্স্, কলিকাতা Tropical Schoolএর স্থাপয়িতা। আগে লোককে বিলাতে যাইয়া এ দেশের রোগ-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইত; ডাক্তার রজার্স্ এই গবেষণা-মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক সেই অভাব দূর করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দিন দিন বিবিধ সংক্রামক রোগ প্রসার লাভ করিতেছে। ঐ সকল রোগের কারণ নির্দ্ধারণ ও প্রতিষেধের উপায় উদ্ভাবন করাই এই গবেষণা মন্দিরের উদ্দেশ্য। রোগ পরীক্ষার ও উপশমের জন্য ইহার সহিত কার্মাইকেল্ হস্পিটাল্ নামক একটী চিকিৎসালয় সংযুক্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বহুমুত্র প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধি সম্বন্ধে এক্ষণে এই স্থানে গবেষণার কার্য্য চলিতেছে। গবেষণা-কার্য্য শিক্ষার জন্য এখানে ছাত্র লইবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার রজার্স্ এই অনুষ্ঠান দ্বারা চিকিৎসা-জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কসৌলি এবং বোম্বাইয়ের গবেষণা-মন্দিরে বহু দিন হইতে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। রোগোৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত কসৌলিতে প্লেগ, ডিপ্থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক রোগের এবং কুক্কুর ও সর্পদংশনের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্যারেল্ লাবরেটারিতে প্লেগ সম্বন্ধে এতাবৎকাল বহু গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। এই সকল গবেষণার ফল গভর্ণমেণ্ট্ পরিচালিত Indian Journal of Research নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বিস্তারের সহিত দেশের শিল্প বাণিজ্য যথোচিত প্রসার লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ভারতবাসীর অর্থে ও কর্ত্তৃত্বে শিল্প ও শিল্পজাত পদার্থের ব্যবসা কতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় অনেক স্থলেই নিস্ফলতা ও তজ্জনিত নিরাশা অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সততা ও যথোচিত মূলধনের অভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত অনেকানেক শিল্প ও ব্যবসা অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য হতাশ হইবার কারণ নাই। নিস্ফলতা হইতে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেছি এবং এই সকল কার্য্যে আমাদের অভিজ্ঞতা দিন দিন বাড়িতেছে। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে আমরা ক্রমশঃ আমাদিগের শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সজীব রাখিতে ও উন্নতিশীল করিতে সমর্থ হইব।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে, তন্মধ্যে বেঙ্গল্ কেমিকাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ (Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ld.) প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহার ইতিহাস হইতে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এবং সতীশচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক এই কারখানার সূত্রপাত হয়। দেশীয় উপাদান হইতে আধুনিক উপায়ে ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২৫০০০ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় লিমিটেড কোম্পানিরূপে রেজিষ্ট্রি করা হয়। তাহার পর মূলধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এখন ২৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানির কারখানা কলিকাতার সারকুলার রোডেই অবস্থিত ছিল। তাহার পরে মাণিকতলায় প্রায় ১০/০ বিঘা জমি লইয়া নূতন কারখানার পত্তন করা হয়।

এখন ৪০/০ বিঘা জমির উপর বিস্তৃত এই কারখানার ৪৫টী প্রশস্ত গৃহে (Shed) নানাপ্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন কারখানার অধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী, শ্রমিক প্রভৃতির জন্য বাসগৃহ হস্‌পিটাল, পুস্তকাগার, বিশ্রাম ও প্রমোদ গৃহ, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আফিস্ এবং কারখানায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০০ শত কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত।

কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি উল্লেখযোগ্য :—

সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid), নাইট্রিক এসিড্ (Nitric Acid), হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hydrochloric Acid), এমোনিয়া (Ammonia), ম্যাগ্‌নেসিয়ম সল্‌ফেট্ (Magnesium Sulphate), হীরাকশ (Ferrous Sulphate), পটাস্ সলফেট্ (Potassium Sulphate), সোরা (Potassium Nitrate), সোডা সল্‌ফেট্ (Sodium Sulphate), সোডিয়ম্ থিয়সল্‌ফেট্ (Sodium Thio-sulphate), এলুমিনিয়ম্ সল্‌ফেট্ (Aluminium Sulphate), ডেক্সট্রিন্ (Dextrine), কেফিন্ (Caffeine), পিচ (Pitch) এবং বিশোধক ঔষধাদি (Disinfectants)। এতদ্ব্যতীত ঔষধের নির্য্যাস (Pharmaceutical extracts, tinctures, etc.) অস্ত্রচিকিৎসার

সরঞ্জাম (Surgical dressings,) বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Scientific instruments), পরীক্ষাগারের আসবাব (Laboratory furniture), জ্বালানি গ্যাস্ প্রস্তুতের যন্ত্র (Gas generator and holder), গ্যাস ও কলের জলের সরঞ্জাম (Gas and Water fittings) এবং অগ্নি-নির্ব্বাণ যন্ত্র (Chemical Fire Extinguishers) প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কারখানায় যত "বয়লার" (Boiler) আছে, তাহার বলের (Power) মোট পরিমাণ ৪৫০ "Horse Power"। তাড়িৎ-প্রবাহেই অধিকাংশ যন্ত্র চালান হয়। কারখানার ভিতরে মাল-বহনের জন্য প্রায় ১ মাইল ব্যাপী রেলপথ আছে। ঔষধের লেবেল্, তালিকা, বিজ্ঞাপনী ইত্যাদি কারখানাস্থ মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয়। প্রত্যহ প্রায় ৪০০ শত মণ কয়লা পোড়ে এবং ৪০০০০ গ্যালন্ জল খরচ হয়। প্রায় ২০০ শত 'ফীট' গভীর তিনটী "টিউব ওয়েল" (Tube Well) হইতে জল সরবরাহ হয়। কারখানার যন্ত্রশালা (Machine-Shop) সুবিস্তীর্ণ এবং সুব্যবস্থিত। কোম্পানির নিজ ব্যবহারের জন্য অনেক যন্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র এই কারখানায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মাণিকতলায় স্থানাভাববশতঃ কোম্পানি অন্যত্র আর একটী বৃহত্তর কারখানার পত্তন করিতেছেন। এই জন্য পাণিহাটিতে প্রায় ২০০/০ বিঘা জমী লওয়া হইয়াছে।

বোধ হয় কোন্নগরের ওয়াল্ডি কোম্পানি (Waldie & Co) বঙ্গদেশে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রথম স্থাপন করেন। তাঁহাদের কারখানা এখনো চলিতেছে এবং অনেকানেক রাসায়নিক দ্রব্য সেখানে প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহারা এ বিষয়ে বঙ্গদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতা কেমিক্যাল্ কোম্পানি লিমিটেড্ নামক নবপ্রতিষ্ঠিত কারবারের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ইহা বেঙ্গল্ কেমিক্যালের অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঔষধ এবং অনেকানেক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

দেশে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ঔষধের এবং শিল্পে ব্যবহার্য্য বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের উপকরণ (Raw materials) যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার কারখানা এদেশে অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইলে এই সকল দ্রব্যের মূল্য সুলভ হইবে, দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে এবং বহু লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ সুগম হইবে।

এদেশে যে কয়টি কাগজ প্রস্তুতের কারখানা আছে, তাহাদের অধিকাংশ বিদেশীয় মূলধনে ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা চালিত। এই সকল কারখানায় যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেক অভাবও মিটে না; বিদেশ হইতে বহুলপরিমাণ কাগজের আমদানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কাগজের উপকরণের সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ প্রয়োজন পরিমাণ কাগজ এদেশে প্রস্তুত হইতেছে না। সম্প্রতি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং

দেশের স্থানে স্থানে ভারতবাসীর অর্থে ও তত্ত্বাবধানে কাগজের কল বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। আসাম পেপার্ মিল্স্ লিমিটেড্ নামক একটী যৌথ কারবার, কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা আসাম প্রদেশে স্থাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সদুদ্যমের সফলতা কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান্ পেপার এণ্ড্ পেষ্ট বোর্ড্ কোম্পানি নামক একটী নবপ্রতিষ্ঠিত যৌথ কারখানায় সুন্দর পেষ্ট্ বোর্ড্ প্রস্তুত হইতেছে।

এত দিন পরে বঙ্গদেশে ভারতবাসীর মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে চীনা মাটির বাসন (Porcelain) প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও ভালরূপে চলিতেছে। গৃহব্যবহার্য্য সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হইলেও এই কোম্পানী দ্বারা দেশের একটী প্রকৃত অভাবের মোচন হইয়াছে।

কাচ প্রস্তুত করিবার জন্য ইছাপুর ও অন্যান্য স্থানে ইতিপূর্ব্বে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু উহা সাফল্য লাভ করে নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে দুই একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য মন্দ চলিতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে একটি কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তথায় শিশি বোতল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, বাজারে তাহা বিক্রীত হইতেছে। কি শিক্ষা, কি গৃহকার্য্য, সকল বিষয়েই কাচের জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবসায়ের বিস্তৃতি একান্ত প্রার্থনীয়।

দেশালাইয়ের কারখানা মাঝে মাঝে দেশের স্থানে স্থানে স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহা এপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দেশালাই প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ। দেশে যত দেশালাই ব্যবহৃত হয়, তাহা সমস্তই ইয়ুরোপ ও জাপান হইতে আসে। ভারতবর্ষে দেশালাই প্রস্তুত করিবার কাঠের অভাব নাই, কল কব্জাও বিশেষ জটিল নহে, রাসায়নিক উপকরণগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে। অথচ ইহার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। সম্প্রতি দেশের দুই এক স্থানে দেশালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু যে দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বিদেশী দ্রব্যের তুল্য উৎকৃষ্ট নহে।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য বঙ্গদেশে কয়েকটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

চাট্নি ও ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করণ এবং ফল টাট্কা অবস্থায় রাখিয়া বিদেশে পাঠাইবার জন্য কয়েকটী কারখানা এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ও অধিক পরিমাণে জন্মে। এই ব্যবসা ভালরূপে চলিলে দেশে ধনাগমের বিস্তর সুবিধা হইবে।

আগে দেশে অনেক চিনি প্রস্তুত হইত এবং দেশের খরচ কুলাইয়া বিদেশে তাহার রপ্তানি হইত। এখন দেশের খরচের জন্য অর্দ্ধেকের অধিক চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। দেশে চিনির বৈজ্ঞানিক কলকারখানা আরো অধিক পরিমাণে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

কাপড়ের কল বঙ্গদেশে আরো বেশী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী প্রভৃতি দুই তিনটি কল বঙ্গদেশের বস্ত্রের সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের বস্ত্রের অভাব সম্পূর্ণভাবে কখনই দূর হইবে না। বস্ত্রের কল অধিক পরিমাণে স্থাপিত না হইলে আমাদের চিরদিনই লজ্জানিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

এইরূপ শত শত শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারের উপর দেশের লোকের মরাবাঁচা নির্ভর করিতেছে। কৃষির সহিত ইহাদের সংযোগ না হইলে কোনকালেই দেশের কঠিন অন্নবস্ত্র-সমস্যার সন্তোষকর সমাধান হইবে না। ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত কয়েকটী প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নাম এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গালী দ্বারা চালিত বঙ্গদেশের কতিপয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

রাসায়নিক দ্রব্য (Chemicals)

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.
Calcutta Chemical Company, Ld.
Bengal Acid Manufacturing Co. of P. M. Dutt & Co. of Bagmari.
Asiatic Chemical Works Ld., Bagmari.
Alpho Chemical Works Ld., Belgachia.
Techno-Chemical Laboratory and Works Ld., Connagor.
Dutta Chemical Works Ld., Narkeldanga.

ঔষধাদি (Pharmaceuticals)

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ld.
Butto Kristo Paul and Co.
Bose's Laboratory Ld.
Bengal Immuinty Co. Ld.
Lister Antiseptics and Dressings Ld.
Standard Drug and Chemical Ld.

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি (Scientific Instruments)

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ld.
Bose's Laboratory Ld.

ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা (Electric Fans)

Bando & Co.
Clyde Engineering Co.
P. N. Dutta & Co.

চীনামাটীর দ্রব্য (Pottery)

Bengal Potteries Ld. (Calcutta Pottery Works)

ওয়াটার্ প্রুফ্ (Water-proof)

S. M. Bose & Co.

এনামেল্ (Enamel)

Soor, Neogi, Coomar & Co.

রবার (Rubber)

Diex Aye Rubber Factory Ld.—N. K. Mitter & Co.

দড়ি (Rope)

B. N. Koondoo & Sons
D. C. Neogi & Sons.
Deshmuker & Co.

রং (Paint)

Bengal Point & Varnish Works Ld.

কাগজ (Paper)

Assam Paper Mills, Ld.
Indian Paper & Paste Board Co.

কলম, পেন্সিল ইত্যাদি (Pen, Pencil & Stationery)

F. N. Gupta & Co.
Small Industries Development Co. Ld.

কালি (Inks)

Howrah Printing Ink Co.
Bengal Miscellany Ld. (Writing Inks)
P. M. Bagchi & Co. do
Das-Gupta & Sons. (Printing Inks).
Roy Brothers.

মোরব্বা ও চাটনি (Preserves & Condiments)

Pioneer Condiment Co. Ld.
Hindusthan Fruit Preserving Co. Maldah.
Bengal Canning & Condiments Works, Ld.
Ishwar Chandra Koondoo & Co.
Sreekissen Dutt & Co.
Daw, Sen & Co.

কাচ (Glass)

Bengal Glass Works Co. Ld. Dum-Dum.
Calcutta Glass & Silicate Works Ld.
Reliance Glass Works, Santragachi.

ষ্টোভ্ (Stove)

Pumpus Engineering Co.
Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ld.

সাবান (Soap)

Indian Soap Co.
Calcutta Soap Works, Ld.
Oriental Soap Factory Ld.
National Soap Factory.
British India Soap Factory Ld.
Indian Soap Factory.

দেশালাই (Matches)

Govinda Match Factory (Naraingunj)
Bikrampur Match Factory.
Kishoregunj Match Factory of Chakravarty & Co.

বিস্কুট (Biscuits)

K. C. Bose & Co.
Lily Biscuit & Co, Baranagore.

ছুরী কাঁচি ইত্যাদি (Cuttleries)

Union Cuttleries Ld.
Khan & Co.

কল (Machinery)

P. N. Dutt & Co.
Bengal Small Industries Co.
Calcutta Industries Ld.
Bando & Co.
Ghatak Iron Works (Behala)
Bengal Bridge & Bolts Co. Ld.

তোরঙ্গ (Trunks)

Bijoya Factory.
Arya Factory.
Swaraj Factory.
Subal Factory.

চিনি (Sugar)

Kushtea Sugar Cane Mills Ld.

বস্ত্রের কল (Cotton Mills)

Bengal Luxmi Mills Ld.
Mohini Mills Ld. (Kushtea)

মোজা (Hosiery)

Economic Hosiery Mills Ld.
Kushtia Hosiery Mills Ld.
Pubna Silpa Sanjibani Hosiery Manufacturing Co. Ld.
R. C. Shome, Jhamapuker.
Annapurna Hosiery, Kidderpore.

চামড়া তৈয়ারী (Tanning)

National Tannery (Calcutta)

টিনের জিনিস (Tin Goods)

Calcutta Colour Printing & Hollowwares Ld.

বেল্টিং (Belting)

Eureka Belting Works of P. N. Dutt & Co.

কুলুপ (Locks)

Ghosh Das & Co.
Das & Co.

বোতাম (Buttons)

Ashuda & Co, Beliaghata.
S. Gupta & Co. Ld., Maniktola.
Ghosh & Mitter, Jhamapukur.
Chankshell Buttons of Dacca.

চিরুণী (Comb)

Jessore Comb, Button & Mat Manufacturing Co. Ld.

ফিতা (Tapes & Newars)

S. L Charan & Bros.

অন্য প্রদেশের ভারতবাসী কর্তৃক পরিচালিত।

MANAGED BY NON-BENGALI INDIANS.

বস্ত্রের কল (Cotton Mills)

Keshoram Cotton Mills Ld.

এলুমিনিয়ম্ ধাতু দ্রব্য (Aluminium Goods)

Jiwanlal & Co (Calcutta)
P. E. Guzdar & Co., Ghoosery.

এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিবিধ শিল্পবিজ্ঞান, ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদিগের কতকগুলির নাম এস্থলে উল্লেখ করা গেল (Institutions for Technical Education) :—

Bengal Engineering College, Sibpur.
University College of Science (Technological Chemistry Dept)
Indian Association for the Cultivation of Science (Commercial Analysis Class)
Dacca Agricultural School.
Calcutta Workingman's Institute.
Young Women's Christian Assosiation Commercial Class.
Bengal Tachno-Commercial Institution, Kidderpur.
Ghose's School of Chemical Technology.
Commercial College, 172 Bowbazar Street.
do do 24-2, Cornwallis Street.
Coronation Technical School, Khulna.
Government Weaving Institute, Hooghly.
B. N. Ry. Apprentices Night School, Kharagpur.
Technical Institute, E. I. Ry., Lillooa.
E. B. S. Ry. Apprentice Class, Kanchrapara.
Serampore Weaving Institute.
Maharaja Cossimbazar Polytechnic, Calcutta.
District Board Technical School, Burdwan.
Midnapore Weaving School.
Bankura Weaving School.
Bengal Technical Institute, National Council of Education, Maniktola.
Manicktolla Government School of Art. Calcutta.
Government School of Art, Calcutta.
Government Commercial Institute, Calcutta.
Industrial School, Bengal Social Service League.
Indian Art School, Calcutta.
Indian League & Albert Temple of Science and School of Arts, Calcutta.
Calcutta Technical Evening School.
Mohila Silpasram for Women, Calcutta.
Wesleyan Mission Industrial School, Raneegunge.
Srishchandra Institute (Mining School), Ethora, via Sitarampore.
Mining Instruction Centres in the Coal-fields (under Government management) at Dashargarh, Jamuria, Raneegunge, Toposi, Kalipahari and Charanpur in the District of Burdwan.
M. E. Mission Agricultural Class, Assansol.
Mission M V. and Technical School, Bankura.
London Mission Society's Women's Industrial School, Berhampore.
Commercial Class attached to the Krishnath College, Berhampore.
Barisal Technical School.
Deaf and Dumb School, Barisal
Telegraph Training Class, Chittagong.
Zorwarganj Weaving School, „
Railway Apprentice's Class „
Comilla Survey School, Comilla.
Elliot Artisan School, „
Ashanullah School of Engineering, Dacca.
Agricultural M. V. School, Dacca.
Widows' Home, Wari, Dacca.
Zenana Classes under the Industrial Zenana Instructress, Dacca.
Tangail Weaving School, Tangail,

Kashi Kishore Technical School, Mymensing.
Australian B. M. Industrial Institution, Faridpur.
Widows Industrial House and School, Orakandi, Faridpur.
R. C. Industrial Class for Women, Krishnagar.
C. M. S. Mission Industrial and Technical School, Chapra, Nadia.
Diamond Jubilee Industrial School, Rajshahi.
Bayley Gobindalal Technical School, Rungpur.
Edward Industrial School, Bogra.
Elliot Bonomali Technical School, Pabna.
Government Weaving School, Pabna.
Women's Industrial School, Pabna.
Government Weaving School, Maldah.
Kalimpong Industrial Schools for Indians, Kalimpong.
Mulvany Home, Calcutta (for destitute Christian Indian women).
Industrial Home and School for the Blind Calcutta.
Vidyasagar Bani Bhaban (for Hindoo Widow), Calcutta.
Calcutta Deaf & Dumb School Technical Department.
The Boston Commercial School, Calcutta.
Business Institute, Calcutta.
K. B. Shorthand Institute, Calcutta.
Commercial Class attached to the Youngmen's Christian Association, 86, College Street, Calcutta.
Huson's Chambers, 249—S., Bowbazar Street, Calcutta.
Modern Business Academy, 187, „ Street, Calcutta.
Cann's Fonetik School, 73, Bowbazar Street, Calcutta.
The Refuge, 125, Bowbazar Street, Calcutta.
The Calcutta Orphanage Tachnical School.
Mahomedan Orphanage, Calcutta.
Labchand Matichand Jain Literary and Technical School. Calcutta.
Anjuman Rafique Islam Industrial School, Calcutta.
Orphan Boys' Industrial School, Baranagore.
Primary and Technical School for small orphan boys, Baranagore.
Widows Industrial Home (Church of England Zenana mission) Baranagore.

ইহা ব্যতীত পিতল-কাঁসার বাসন, বালতি, রেশম ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আরো অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে; বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুযোগ্য সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম্ এ এবং বাংলার ডিরেক্টার্ অব্ ইণ্ডষ্ট্রিজ্ শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টন্ সাহেব, এই দুই জনের নিকট এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম সংগ্রহ করিয়াছি। এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলা দেশে শিল্পোন্নতির জন্য ডিরেক্টার্ অব্ ইণ্ডষ্ট্রিজ্ ও তাঁহার বিভাগস্থ কর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে নবযুগের সাধনায় প্রবুদ্ধ করিতে হইলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল যে ইহা স্কুলের বালকগণের বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা হইবে, তাহা নহে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া ও পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহাতে উপাধি পাওয়া যাইতে পারে, যথাসময়ে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা বাংলাভাষার পুষ্টিসাধন এবং শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া যে কোন বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। বাংলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালীর ছেলে অনেক অল্প সময়ে এবং অল্পায়াসে সকল বিষয়েই

অধিক পরিমাণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কলেজের উচ্চশ্রেণীতে অনেক সময়ে বাংলায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে ইহাদ্বারা ছাত্রগণ প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে বুঝিতে পারিত। আমি প্রায় ৩৬ বৎসর বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রামেন্দ্র বাবুর মতের সমর্থক।

বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার বিস্তৃত প্রচলনের উদ্যোগী, মাননীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহার উদ্যমে ও চেষ্টায় শুদ্ধ বাংলা ভাষা নয়, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই সকল ভাষাসম্বন্ধে গবেষণাও চলিতেছে। এখন কেবল বাংলা ভাষা চর্চ্চা দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভের পথ সুগম হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বহুকাল হইতে যাহাতে বাংলাভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গগত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ইংরাজী ভাষা ব্যতীত প্রবেশিকা পরীক্ষার অপর সমস্ত বিষয়ে ছাত্রদিগের মাতৃভাষায় যাহাতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আরম্ভ হইলে বাংলা ভাষায় বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচিত হইবে, সুতরাং আপাততঃ উপযুক্ত পুস্তকের যে অভাব লক্ষিত হয়, তাহা বেশী দিন থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা প্রস্তুত করিয়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক রচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন।

সুকুমারমতি বালকগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের বুঝিবার উপযোগী করিয়া বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা করিতে হইবে। বালকদিগের জন্য সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়, সেগুলি ভাষায় ও ভাবে অনেক সময়ে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে এবং উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাবে পাঠ্য বিষয়গুলি বালকেরা একেবারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, শুদ্ধ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং বিজ্ঞান-শিক্ষার সুফল তাহারা জীবনে কোন কার্য্যে লাগাইতে পারে না। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি শিক্ষাকার্য্যে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে যেরূপ সহজ ভাষায় সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ধরণের বাংলা বিজ্ঞান-পুস্তকের বিস্তৃত প্রচার আবশ্যক।

বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে হইলে হাতে কলমে কায করা চাই। শিক্ষক যদি ছাত্রকে এইরূপ শিক্ষা দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই শিক্ষা দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার সাধিত হয় না।' এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল শিক্ষক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ছাত্রগণকে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল সময়ে বড় বড় পরীক্ষাগার এবং বহুমূল্য আসবাব ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন, তাহা নহে। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক গৃহব্যবহার্য্য নানা পদার্থের সাহায্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি অনায়াসে ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা অতিশয় ব্যয় সাপেক্ষ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্কুল ও কলেজ বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন। এ বিষয়ে আমি শিক্ষা বিভাগের ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বড় বড় ল্যাবরেটারি, বহুমূল্য যন্ত্র ও মোটা মাহিনার শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অনেক স্কুল ও কলেজ একেবারেই অসমর্থ। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া এ সকল বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবী করিলে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ সবিশেষ প্রসার লাভ করিবে।

অতঃপর আর একটী কথা বলিয়া এই অভিভাষণের উপসংহার করিব।

আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংযোগ বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা উভয় দেশেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। উভয় জাতিরই পরস্পরের নিকট শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ইংরাজ বা ভারতবাসী কেহই দোষশূন্য নহেন। ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের গুণের পক্ষপাতী হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসী ভাবপ্রবণ, ইংরাজ কর্ম্মপ্রবণ। বহুশতাব্দীব্যাপী নানা প্রতিকূল কারণে আমাদের কর্ম্মজীবন শ্লথ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নিষ্ক্রিয়তা তমোগুণপ্রসূত, আমাদের জীবন এখন তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম-মন্ত্রে ইহাকে পুনরায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই জন্য বিধাতার বিচিত্র বিধানে আমরা রজোগুণসম্পন্ন এক মহাকর্ম্মী জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। এখন উভয়ের কাহারো আদর্শ পূর্ণ নহে; পরস্পর সম্মিলিত হইয়া গুণের আদান-প্রদান দ্বারা একটী পূর্ণ আদর্শের গঠন করিতে হইবে। ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের সহিত পাশ্চাত্য কর্ম্মজীবন সম্মিলিত হইলে এই অপূর্ব্ব আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়কেই সাধনা করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সে দিন লর্ড্ রোণাল্ড্‌সে ঢাকা ইউনিভার্সিটী কন্‌ভোকেসন্ (Dacca University Convocation) উপলক্ষে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, উভয়েরই বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন:—

"There ought to be harmonious development of the Eastern and

Western culture hand in hand and that the achievements of the material science in the West should be tinged with the spiritual lever of the East."

আনন্দমঠ হইতে দেশাত্মবোধের প্রথম প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। চিকিৎসক সত্যানন্দকে বলিতেছেন ঃ—

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই। ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরাজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। ইংরাজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনাপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী, যাঁহারা মনে করেন যে যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই বর্জ্জনীয়, তাঁহাদিগকে মহাপুরুষের এই মহাবাণী একবার স্মরণ করাইয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

সম্পূর্ণ

শ্রীচুণীলাল বসু

আনন্দ

অচিন কথার উপমাতে তোমায় বুঝি ভাল,—
রূপে তুমি তপস্বিনী উমার মুখের আলো;
রসে তুমি শচীর ভোগের ফলের মত মিঠে;
স্পর্শে, সীতার করুণ চোখের স্নিগ্ধ জলের ছিটে;
গন্ধে, রমার গলার মালার ফুলের কলির হাওয়া;
শব্দে বাণীর গীতি-প্রীতির ঢেউ-এর তালে গাওয়া।

ছিটে-ফোঁটা

বুব্বুদ—তুমিও বুব্বুদ, আমিও বুব্বুদ, তুমি আলোকের বুব্বুদ, আমি জলের বুব্বুদ। তুমি ফুটিয়াছ অফুরন্ত আকাশের অজ্ঞেয় উচ্ছ্বাসে, শূন্যের কোলে; আমি জাগিয়াছি পরিপূর্ণ বিশ্বের জমাট-বাঁধা বেদনার তরঙ্গের কম্পনে। তুমি হাসি আমি রোদন। আমি আমার সারা অঙ্গে তোমাকে জড়াইয়া ধরি, আর রূপের চঞ্চল চমকে দহিয়া মরি; সহমরণে তুমিও মর আমিও মরি।

* * *

উদ্বুদ্ধ—আমি জাগিয়াছি, তুমি নিদ্রিত; আমি চেতন, তুমি অচেতন। আমার কর্ম্ম, আমার সাধনা,—আমি তোমাকে জাগাইতে চাই। হাহাকারের ধ্বনিতে, অধীর সঙ্গীতে, আগ্রহের তাড়নায় তোমায় নিরন্তর ডাকিতেছি; কিন্তু হে সঙ্গী, হে অঙ্গীভূত, তুমি জাগিলেনা। তোমার অটল জড়ময় আঘাতে আমার সংজ্ঞাময় জীবন-লীলা বাড়িতেছে; কিন্তু তুমি বাড়িলেনা, তুমি জাগিলেনা,—তুমি রহিলে নিস্পন্দ নীরব। হে স্তব্ধ! হে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ জীবনের অবলম্বন! তুমি কি জড়, না চেতনার অতীত বৈরাগ্য? হে কর্ম্ম-সাগরে শায়িত শান্তি! তুমি কি একবার চঞ্চল হইয়া জাগিবেনা?

* * *

যজ্ঞান্তে—উষার সঙ্কল্প,—অরুণের উদ্বোধন ও প্রভাতের উৎসব, দ্বিপ্রহের উগ্রতাতে রুদ্র যজ্ঞে জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই যজ্ঞের আগুন অপরাহ্ণের অবসাদে ধোঁয়াইয়া সন্ধ্যার শীতল ছায়ায় ভস্ম হইয়া পড়িল। হে যজ্ঞ-শালার পুরোহিত! রাত্রি আসিয়াছে।

* * *

জীবন—তুমি জড়ের গহ্বর ভেদিয়া উঠিলে,—জীবন হইয়া ফুটিলে, বাড়িয়া চলিলে এবং বাড়িয়া চলিতেছ। তোমার এই বৃদ্ধিতে ও বিকাশে সংজ্ঞাময় অনুভূতি নাই; এই অনুভূতি-হীন বিকাশের গতির নাম—স্ফূরণ—স্ফূর্ত্তি—আনন্দ। তুমি চারিপাশের প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত করিয়া বাড়িলে; দুঃখ আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল, অঙ্গে অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইল, আর তোমার জীবনের উৎসবের জন্য তুমি পাইলে বেদনা,—চৈতন্য—সংজ্ঞা। দুঃখ তোমাকে দমাইয়া দিয়া ক্ষয়ের পথে টানিতেছে; আর তুমি সেই ক্ষয় এড়াইয়া যেটুকু বাড়িয়া চলিয়াছ, তাহার নাম সুখ। তোমার আনন্দের আয়তনে দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণে তোমার সুখ পরিমিত হইতেছে। তোমার বিকাশ চলিয়াছে ক্ষয়কে এড়াইয়া; এই বিকাশের প্রসার কতদূর? দুঃখ-হীনতা ত চৈতন্য-হীন জড়ত্ব; তাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্থিতিতে সংজ্ঞা নাই—সুখ নাই,—আছে কেবল জড়ত্ব। হে অজড়। তোমার অক্ষয় রাজ্যে দুঃখ-নিবৃত্তি কোথায়? সুখ কোথায়?

* * *

'হারাই হারাই সদা মনে হয়—বুঝি হারাইয়া ফেলি চকিতে !"

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

হারানো খাতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে !
পূজার তরে হিয়া, উঠে যে উথলিয়া, পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে ?

—মানসী

বিবাহিত জীবনের এই কয়টা বৎসরে স্বামীর যে পরিচয় পরিমল পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে আর যতই যা থাক একটা প্রচণ্ড জিদ যে ছিল ইহা নিঃসন্দেহ। স্বামীর অসঙ্গত খামখেয়ালীর কথা মনে করিয়া পরিমলের মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া বলিল, মানুষের সকল ইচ্ছা ও সকল কাজের উপর দখল লওয়া—এ যে বিষম অত্যাচার! উচিতের দিক্ দিয়া যতই দাবী করা যাক্, মানুষ নিজেকে কোন অবস্থাতেই এমন ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না যে, আর একজনের প্রত্যেক খুঁটিনাটীর সকল আদেশকেই সে তার নিজের করিয়া লইতে পারে। অন্ততঃ হাসিমুখে যে পারে না, সেটা সে নিজেকে দিয়াই বুঝিত। নতুবা জুলুমের ভয়ে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রবল পক্ষের প্রচণ্ড ইচ্ছাস্রোতে মগ্ন করা,—সে ত সংসারশুদ্ধ লোকে বাধ্য হইয়াই করিতেছে। পরিমল রাগ করিয়া অনেকক্ষণ বিছানার বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিল। অভিমান করিয়া মনে মনে আহত হইয়া ভাবিল, লোকে যে বলে সমানে সমানে না পড়লে কোন পক্ষেরই ঠিক মান থাকে না, তা ঠিকই। আমি গরীব, অনাথা বলেই আমার উপর উনি সকল তা'তেই জবরদস্তি চালান। হতুম আমি বাগবাজারের রায়েদের মেয়ে কি বৌ-গাঁয়ের জমিদার রাজাদের কেউ তা'হলে কক্ষণই আমার উপর এতটা জোর চালাতে পারতেন না। আমি দুঃখী, আমার কেউ কোথাও নেই, মনে কষ্ট হ'লে যে একদিন বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখাব, তারও আমার উপায়টুকু নেই কি না, তাই না আমায় সব কিছুতেই বাধ্য করতে সাহস করেন। পরিমলের দুঃখ যেন বুক তার ছাপাইয়া উঠিতে গেল। তারপর মুখ তুলিতেই হঠাৎ নজর পড়িল তাহার খাটের সাম্‌নাসাম্‌নি রক্ষিত কাপড়ের আলমারিটার আয়না আঁটা কবাটের উপর। দুচোখ ভরা জলের উপর আরও খানিকটা জলের আমদানী করিয়া সে সবেগে মুখখানা ফিরাইয়া লইল। তাই কি ছাই শরীরে তার খুব খানিকটা রূপই আছে! ওই যে বিধাতার পরম করুণার দান,—পার্থিব কোন কিছুরই বিনিময়ে যেটা ক্রয় করিবার উপায় নাই বলিয়া কত কত ধনী গৃহের বিলাসী মেয়েরা অসাধ্য সাধনার আরাধনায় লাগিয়া আছেন এবং সম্পূর্ণরূপে সফলপ্রযত্ন হইতে না পারায় ভাগ্য ও তাহার নিয়ন্তাকে মনে মনে শাপ দিতেও ক্রুটী করিতেছেন না,—পরিমলও সেই বস্তুটার অভাব আজ যেন বড় বেশী করিয়াই নিজের মধ্যে

অনুভব করিল। এতদিন নিজের রূপহীনতার কথা মনে করিবার অবসরটুকুও তাহার ঘটে নাই বলিয়াই বোধ করি সেকথা তাহার মনে ছিল না। বরং ভোগে ও স্বাস্থ্যে যে দরিদ্র জীবনের অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্য্য সে তাহার এই নবযৌবনোদ্ভাসিত নবজীবনে লাভ করিয়াছিল, তাহাই ছিল এতদিন তাহার কাছে পরমাশ্চর্য্যের মতই বিস্ময়কর। কিন্তু আজ সেদিক দিয়া নহে, আর একটা দিক হইতে—অতিরিক্ত পাওয়ার গুরু বোঝার ভারটা যখন মাথার উপর বড় বিষম বলিয়া ঠেকিতে ছিল, তখন নিঃস্ব দেনদার চারদিকে হাতড়াইয়া ঋণশোধের একটা সিকি পয়সাও খুঁজিয়া না পাইয়া ধনীর ঘরের লোহার সিন্দুকের দিকে তাকাইয়া মনের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর স্বামীর চাইতেও বড় বেশী অভিমানী হইয়া উঠিল। সে এই বলিয়া তাঁহার দরবারে নালিশ রুজু করিয়া দিল যে, বড় লোকের মেয়ে, যাদের মা আছে, বাপ আছে, মা বাপের রাশিকরা টাকা আছে তারা কালো কুৎসিত হইলেও তাদের ভাল ঘরে বরে পড়িতে এতটুকুও আটকায় না যখন, তখন অনর্থক ও অদরকারে তাহার ঘাড়ে বাড়ার ভাগ—রূপের বোঝাগুলা না চাপাইয়া সেগুলা আমাদের মতন অধম, অক্ষম ও অভাগা জীবেদের জন্য রাখা কি চলিত না? স্বামী যেমন দয়া করিয়া আমায় পথের পাশ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছেন, তা আমার যদি একটুখানি রূপও এই দেহের মধ্যে থাকিত, তো নাহয় তাই দেখিয়াই মনে মনে একটু গুমোরও রাখিতে পারিতাম যে, এই দেখিয়াই হয়ত তিনি আমায় নিজের করিতে পারিয়াছেন। তাঁর এই অগাধ দয়ার মূল্যে নিঃস্বত্ব ভাবে বিকাইয়া যাওয়া হইতে হয় ত বা তাহাতে আমি একটুখানি বাঁচিয়া থাকিতেও পারিতাম! তিনি অত দিলেন,—একেবারেই যে সমুদয় টুকুই নিঃস্বার্থভাবে দিয়া ফেলিলেন, এর বদলে যে এতটুকু একটু কিছুও ফেরৎ পাইলেন না, এইখানেই যে মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগে। এই খানেই যে এই বিনামূল্যের কেনা বাঁদীরও অযোগ্যা যে, সে তাঁর দয়ার দামে বিকাইয়া যায়। —তাই অভিমান উথলানোবুকে পরিমল মনে মনে ভাবিল, যার জোরে পরাজিত দৈত্যের মেয়ে শচীদেবী ইন্দ্রের পাশে মাথা উঁচু করেই বসতে পেরেছিলেন, মৎস্যগন্ধা জেলের মেয়ে ভারত সম্রাটের মহিষী হতে লজ্জা পাননি, সেই রূপ থাক্‌লেও ত আমার একটুখানি মনের ইজ্জতও থাকৃত। আমার এ যে একেবারেই দয়া! দেবার তো আমার এতটুকু কিছু নেই, কেবল বোঝা বেঁধে নেওয়া, মান থাক্‌বেই বা কিসে?—

রাগের মাথায় সে নরেশচন্দ্রের উদ্ভট্ দারিদ্র্যপ্রেমকে যৎপরোনাস্তি অপভাষা প্রয়োগ করিল। অন্নদা দাসী, তাহার চুল বাঁধা যে তখনও সমাধা হইয়া উঠে নাই—এই বিস্মৃত সংবাদটা জানাইতে আসিলে, তাহারই সহিত সে এ বিষয়ে আলাপ করিতে বসিয়া জোর করিয়া বলিল তা'বলে "এতটা বাড়াবাড়ি রকমের ভাল হওয়াও মানুষের পক্ষে ভাল নয়। যা' রয় সয় সকল বিষয়েই সেই মতন চলাই সঙ্গত। গরীবকে দয়া দেখাতে হবে বলেই কি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করতে হবে নাকি?"

অন্নদার সহিত যে তাহার মনিব-পত্নীর মতের এমন সামঞ্জস্য আছে, ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদটা জানা থাকিলে আর সে বেচারা ইঁহার সম্বন্ধে বোধ করি পড়সীর বাড়ী বাড়ী গিয়া অনর্থক দশকথা প্রচার না করিয়া বেড়াইয়া তাহার সহিতই উহাদের সম্বন্ধীয় দু'চারিটা মুখরোচক আলোচনা ঘরে বসিয়াই চালাইতে পারিত। পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সে হাতমুখ নাড়িয়া মনিব-গৃহিণীর স্বপক্ষ সম্পূর্ণ সমর্থনপূর্ব্বক সোৎসাহে কহিয়া উঠিল,—"ও মা, তা' আর বল্‌তে রাণীমা! রাজাবাবুর আমাদের পছন্দর ছিরিই যদি থাক্‌বে, তা'হলে আর আমাদের ভাবনাটাই বা কি? এই দেখনা কত কত রাজা জমিদার হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌লে, তা' তানাদের পরী পরী সব মেয়ে ফেলে উনি কিনা কোন পাড়া গাঁর—মরুকগে, মুখে আগুন লাগুক আমার! ওমা, কি কথা বল্‌তে কি বলি দেখ একবার! এই জন্যেই বলে গো, বুড়ো হলে বাহাত্তুরে ধরে যায়। কিছু মনে নিও না মা! কার সাম্‌নে যে কথা হচ্চে, তোমার দিব্যি মা;—এক্কেবারে নিজ্যুস্ ভুলে গেছি। ন্যাও বাছা! এখন চুলটো ফিরিয়ে ন্যাওসে, অবলার মা আট্‌কে রয়েচে, তাকে আবার পাঁচ বাড়ী তো যেতে হবে।"

পরিমল ঢিলটী মারিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটকেলটী খাইল, এবং খাইয়াই সেটুকু সে তৎক্ষণাৎই বুঝিল,—আশ্চর্য্য! এ'ও আবার মানুষকে কানে ধরিয়া গালে চড় দিয়া মনে পড়াইয়া দিতেও হয়? রাজাবাবুর যদি পছন্দর শ্রীই থাকিবে তবে বাগবাজারের চন্দ্ররায়ের সেজ মেয়ে সুন্দরী সাগরিকা, অথবা চৌগাঁয়ের রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়ে সুখলালিতা সুধালতা আজ রাজা নরেশচন্দ্রের রাণী না হইয়া এই পথে কুড়ান কুরূপা পরিমল এই আসনে দখল লইল কেন? আজ একটা বসন্তক্ষত বিকৃত কদাকার ভিখারীর প্রতি সমাদরকে সে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, তাহাকে সে আদর দেখায় নাই বলিয়া তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করায় এই যে রাগে অভিমানে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছে, আর যেদিন শত শত ধনী মানী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা সকলকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া নির্ব্বান্ধব এবং এমন কি পূর্ণ যৌবনে অশন বসনের অভাবে পরাশ্রিতা, অপরিচিতা এই যুবতীকে আপনি যাচিয়া বিবাহ করিয়া ওই ধনীর দুলাল তাহাকে ঘরে তুলিলেন, সেদিন তাঁর পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকার অধরে ও নেত্রপ্রান্তে কি ঘৃণা তাচ্ছিল্যের হাসি কি ক্রোধাভাষই না ব্যক্ত হইয়াছিল!—তা, সে কি তা জানেই না? মূর্খ তাতে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হইলেও এই অপরিচিত ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যময় নগর নিবাসে, এই খেতাবী রাজার রাজ-প্রাসাদে আনীত হইবার পর হইতেই পদে পদে যে সেটাকে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। যখন আসিয়াছিল এ বাড়ীর দাসীচাকরদের শুদ্ধ নাকি তাহাকে ও তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণালজ্জায় ধরণীগর্ভপ্রবেশেচ্ছা জন্মিতে ছাড়ে নাই, তা অন্যে পরে কা কথা! তার নিজের সংসারে আত্মীয়জন বেশী নাই। বৌ-ভাত উপলক্ষে দেশ হইতে সৎশাশুড়ী ও তাঁর মেয়ে অলকানন্দা এই দুজন মাত্র লোক এখানে

আসিয়াছিলেন। সৎমা হইয়াও যে তিনি নরুর পাশে অমন বউ সহ্য করিতে পারেন নাই, এটাও অকৃত্রিম সত্য সংবাদ। তিনিও নাকি গরীবের মেয়ে। চেলি-চন্দন ও ফুলের মালায় সাজাইয়া তাঁর গরীব বাপ তাঁহাকে লক্ষপতি গিরীশচন্দ্রের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের সময় তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু এক হিসাবে যে সেই নিঃস্ব গরীবের মেয়ে অনেক ধনাঢ্য কন্যাকে লজ্জা দিয়া দশের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, সে তাঁর অনবদ্য সৌন্দর্য্য। সেই জিনিষটারই যে পরিমলের বিশেষ অভাব ঘটিয়া গিয়াছে। তাই ধনীর মেয়ে না হইয়াও যিনি রাজার মেয়ের মতই নিজের আনমিত রূপের গৌরব, উচ্চ গ্রীবায়, বক্র কটাক্ষে, মাটির জগৎকে তাচ্ছল্যভরে চাহিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁরও কঠিন নেত্রের অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে এই নিঃস্ব ভিখারিণী পরিমল ঘৃণা-লজ্জায় পলে পলে মাটিতে মিশিতে চাহিয়াছে। সে সব কথা ফিরিয়া ফিরিয়া আজ তাহার মনের বুকে ফুটিয়া থাকা কাঁটার মতই আবার খচ খচ করিয়া উঠিল। সেই সময়কার একদিনের মাতা-পুত্রের আলাপ দৈবাৎ তার কানে যায়, সেই কথা কয়টা ব্যথার উপর তীক্ষ্ণ-প্রলেপের জ্বালার মতই স্মৃতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। "নরেশ"—তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া বিমাতা পদ্মাবতী অনুযোগ করিয়া বলিলেন "দেশে থেকেই শুনেছিলেম যে, তুমি এক চাটগেঁয়ে ধেড়ে মেয়ে কুড়িয়ে এনে এতবড় মিত্তির বাড়ীর বউ ক'রে দিচ্চো; কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে মেয়ের রূপের দিকটাও এমন কালিঢালা। এ কেলেঙ্কারী করার চাইতে তুমি যে এতদিন ধরে বিয়ে করবে না বলে যে পণ নিয়ে চলছিলে—সেও যে ভাল ছিল। সে তবু বোঝা যায়, এ যে একেবারেই দুর্বোধ্য!"

নরেশচন্দ্র এই ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটিমাত্র বর্ণও ব্যবহার করেন নাই, সেদিনে কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা এত বড় হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাতে তাহার মনকে সে ধাক্কা দিতে পারে নাই, কিন্তু আজ এ কথার সবটুকুই যখন জানা শুনা হইয়া গিয়াছে, তখন এত বড় অপমান-জনক তুলনাটা স্মরণে আনিয়া এবং এই লজ্জাকর অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বামীর মৌনভাবকে সম্মতিলক্ষণ বোধে তাহার বুকের মধ্যে অভিমানের তরঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল। নাঃ—ঠিক কথাই অন্নদা বলিয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রবৃত্তিই যদি নিম্নাভিমুখে না হইবে, তবে সেই বা আজ এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিতা কেন? রাগ করিবার কিছুই তো নাই। যা সত্য, তা অস্বীকার করিলেও সে মিথ্যা হয় না।

পরিমলের মনটা সেই সব ভয়াবহ পূর্ব্বস্মৃতির তোলাপাড়ার মধ্য দিয়া কোন সময় লঘু হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর জিদকে আর ততটা অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম বলিয়া তার মনে রহিল না, বরং চিরদিনের বিপন্ন-বৎসলতা ও অনন্যসাধারণ দয়া গুণের আধার বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহার স্বতঃ প্রবাহিত শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ বিপরীত স্রোতকে প্রতিহত করিয়া উথলিয়া উঠিয়া নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে একেবারেই ছোট করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবিচারের শাস্তি লইয়া স্বামীকে তুষ্ট করিতে মন তাহার উৎসুক ও অধীর হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছোটরে করিয়া ঘৃণা করিছ যে পাপ, তোমারে করেছে নীচ তারি অভিশাপ ;
তাদেরে না কর যদি উচ্চাসন দান, ঘুচিবে না কভু তব 'নীচ' অপমান ॥

—প্রবাসী

সূর্য্যের আলোভরা অলস মধুর মধ্যাহ্নে কলিকাতার এই কোলাহলবিরল অংশ প্রায় পল্লী-বিজনতা প্রাপ্ত হইয়া একখানি দৃশ্যের মতই প্রশান্ত হইয়া আছে। এই দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটীর দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন তাহার নিরালা ঘরে চুপটী করিয়া একটি চৌকির উপর খোলা জানালার ধারে বসিয়াছিল।

এই জানালার নীচের বাগানে রং বেরংএর কৃষ্ণকলি,. জিনিয়া আর রজনীগন্ধ্যা একেবারে প্রচুরতররূপে ফুটিয়া আছে। ইহারই ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি বাড়ীর সীমাবিভাগের প্রাচীরের গায়ে একটা বক ফুলের গাছ আধহেলা হইয়া রহিয়াছে ; তাহার ডালপালার মধ্য হইতে একটা লুকানো পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর শিষ্‌ দেওয়ার শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ইহারই ঠিক পাশের অপরাজিতার ঝোপটাকে নাড়া দিয়া কয়েকটা শালিক কি যেন খুঁটিয়া খাইতেছিল, এবং কিচির মিচির শব্দে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করিতেছিল সেটা কিন্তু বেশ বোধগম্য হইতেছিল না। বাগানের জমিটি নববর্ষার কয়েকটি বর্ষণ পাইয়াই নয়নলোভন শ্যামলতায় যেন চিকণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আর্দ্র তৃণ হইতে একটা অতি মৃদু সজল গন্ধ যেন সঙ্কুচিতভাবে উত্থিত হইয়া অনিচ্ছামন্থরভাবে বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির বাহ্য জগতের এই স্তব্ধ আত্ম-সমাহিতভাব নিরঞ্জনের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ত অশান্তি ও নিরানন্দে ভরপূর চিত্তটিকে শুদ্ধ যেন তাহার সেই শান্তির মাধুর্য্যে পরিপূরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেন ইহাদের হইতে একটী অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করিয়া তাহার ভিতরেই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অহোরাত্র, জাগ্রতে এবং নিদ্রাতেও যে সান্ত্বনাবিহীন ও শান্তিহীন দুশ্চিন্তা বা দুষ্ট স্মৃতির তাড়নায় তাহার প্রত্যেক দণ্ড পলটুকু পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখভারাক্রান্ত সে সবই যেন তাহার মনের মধ্য হইতে এই শান্ত মধুর প্রকৃতির শান্তিধারা এই মুহূর্ত্তে ধৌত করিয়া দিয়াছে।

ঘরের দরজার কাছে খুট্‌ করিয়া একটু শব্দ হইল ; দোরটা খুলিয়া গেল, পেঁচোর মা মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যটা ভাল করিয়া দেখিয়া তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল। একপাশে শয়নের নেয়ারবোনা খাট, আর এক ধারে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ আর তারই মধ্যে কয়েকখানা ছোট বড় নোট একখানা লেফাপার মধ্যে খোলাই পড়িয়া আছে। পেঁচোর মা প্রায় নিঃশব্দে সেইখানে আসিয়া উহার মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট

বাহির করিয়া লইয়া আবার তেম্‌নিভাবে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, গৃহস্বামী ইহার বার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিল না। টাকাগুলা তাহাকে নরেশচন্দ্রই বেতন হিসাবে দিয়াছিলেন।

বাবুর খানসামা হরি আসিয়া ডাকিয়া উঠিল "মাষ্টার মশাই!"

প্রথম ডাকে নয়, দু তিন ডাকের পর নিরঞ্জন মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, "উঁ ?"

—"বলি মাইনে পেলেন, তা আমরা যে আপনার অসুখে বিসুখে এতটাই করলুম, বলি আমাদের বকশিষ কই ?"

নিরঞ্জন তদবস্থাতেই উত্তর দিল "নাওনা ভাই! ঐখানেই তো আছে।" হরি এই উত্তরই আশা করিয়া পেঁচোর মার হেয় নীতি অবলম্বন করা অনর্থক বোধে উহা হইতে বিরত ছিল। খাম হইতে নোট কয়খানা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কত নিই ?"

"যা তোমাদের খুসী।"

"তাহলে এই পঁচিশের মধ্যে পনের আমরা বকশিষ নিলুম, আর এই দশটা টাকা আমার কাছেই আমানত রইলো, দরকার হ'লে বলবেন বার করে দোব। বাড়ীর দাসী চাকরদের কারু কারু যে বেশ একটু হাত টান আছে, সে ত আর আমার কাছে ছাপা নেই, কে কখন গেঁড়া দিয়ে দেবে বই তো নয়, কি বলেন মাস্টার মশাই! রাখবো কি আমার সিন্ধুকে তুলে ? তাতে খুব ভাল বিলিতি তৈরি কুলুপ লাগান আছে।"

নিরঞ্জন সবকথা—সব কেন একটা কথাও—কানে না তুলিয়া অম্‌নি অম্‌নিই জবাব দিয়া চুকিল, "রাখো।"—

বোকারাম মাষ্টারের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিতে করিতে প্রসন্ন-মনে হরিধন টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল "বাবু তো পঁইত্রিশ টাকা দিয়েছিলেন, আর দশটা কোন চিলে এর মধ্যেই ছোঁ মার্‌লে ? অ্যাঁ! আমার মুখের গরাস কেড়ে খায়, সে ত সামান্যি নয়, যা হোক সন্ধান করতে হবে।"

বক ফুলের গাছের ডালে সুখসমাসীন পাখীটা একটা তীক্ষ্ণ উচ্চরব করিয়া ডানা ঝাড়া দিতে দিতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সেই আকস্মিকশব্দে চকিত হইয়া উঠিতেই নিরঞ্জনের কর্ণে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি প্রবেশ করিল "মাষ্টার মশাই!"

আহ্বান নারী-কণ্ঠের, এবং তাহা যে 'পেঁচোর মা' শ্রেণীর কাহারও নহে, তাহা নিরঞ্জনের স্বাভাবিক বুদ্ধিই তাহাকে জানাইয়া দিল। সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধ একটু বিস্মিত ও উত্তেজিতভাবে মুখ ফিরাইতেই এক সুদর্শনা নারীর সহিত মুখামুখী হইয়া গেল। রমণীর সাজসজ্জায় ও হাবভাবে তাহাকে উচ্চ জগতের জীব বলিয়া চিনিয়া লইতে উহার বিলম্ব ঘটিল না এবং এই পরিচয়ে একাধারে

বিপন্ন, বিরক্ত ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়া নিরঞ্জন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, হাত তুলিয়া ইহার উদ্দেশে সে একটা ভদ্রতার নমস্কার পর্য্যন্ত জানাইতে সমর্থ হইল না।

ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল বাড়ীর কর্ত্রী স্বয়ং। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল বলিয়াই সে নিজের সেই ভুল শোধরাইয়া লইবার সদিচ্ছায় তাঁহার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আনিয়াছিল, সে যে এত কঠিন, এ ধারণা তার একটু পূর্ব্বেও ছিল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে সে চাহিতে ভরসা করে নাই, তাহার জুতাখোলা পায়ের দিকেই তার চোক ছিল। বসন্তের গভীরতর ক্ষত চিহ্নের সেখানেও অভাব ছিল না। তার উপর সেই দুর্ব্বল শীর্ণ পা দুখানি সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে লক্ষ্য করিয়া কিছু দয়ার্দ্র ভাবেই বলিয়া ফেলিল "আমি আপনার কাছে পড়তে এসেছিলুম, যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, তাহলে আজ থাক।"

এই বলিয়াই সে উহার দিকে পিছন ফিরিতে গিয়া পশ্চাত হইতে এমন একটা স্বর শুনিতে পাইল এবং তাহাতে এমন করিয়াই সে চম্‌কাইয়া উঠিল যে, যেন সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল ও ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একটা আকস্মিক বর্শার মতই আসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের হাড়ের মধ্যে তার তীক্ষ্ণ ফলাটাকে সবেগে বিঁধিয়া দিয়াছিল। ভয়ার্ত্ত মুখের পাংশু ছবি লইয়া আবার সে চকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সাম্‌নে তাহার কীটদষ্ট পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মতই এক বসন্তক্ষত বিকৃত এবং আগুনে বা অপর কোন দাহ্য পদার্থের দ্বারায় অধিকতর বিকৃতিপ্রাপ্ত এক অপরিচিত মুখ! তবে সেই তাহার পরিচিত সুরের লেখা কোথা হইতে অকস্মাৎ এই অজানাকে আশ্রয় করিয়া আজ এত দিন পরে আবার এই জাগ্রত মধ্যাহ্নে ভাসিয়া আসিল? সেকি স্বপ্ন না সত্য? পরিমলের বুকের মধ্যে একটা সন্দেহ আশঙ্কা ও তার সঙ্গেই মিশ্রিত একটুখানি যেন আগ্রহও এক সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে একটা অজানা তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন—স্বপ্ন ইহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে? মানুষ কখন জাগিয়া থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারে? সে উৎসুক-নেত্রে উৎকণ্ঠা ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া করিয়াই নিরঞ্জনের নতমুখ দেখিতে লাগিল এবং অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টিকে ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিয়া পূর্ণ অবিশ্বাসে, দীর্ঘ করিয়া একটা শ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, "বই তো আমি কিছুই আনিনি, যাহোক একটু পড়ান; ইনি বলে গেছেন, আপনার কাছে পড়তে।"

নিরঞ্জনের যে কথার স্বরে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই "আপনি কি পড়তে চান বলুন, আমি পড়াচ্চি।"

এবার নিরঞ্জন এই কথাটার মধ্য দিয়া অনেকখানিই অনুভব করিল। তাহার চাকরীটা যে কি, এতদিনের পর সেইটাই এবার তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, তা সেটা যে এমন মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে, এ সংশয় সে অভাগার মনের কোনেও কখন উদিত হয় নাই। নরেশ অবশ্য

কাজটাকে খুব কঠিন বলিয়াই স্বীকার করিয়া প্রথমাবধিই এতৎ সম্বন্ধে তাহার কৃতকার্য্যতারও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না, কিন্তু সেটা যে এমনই কঠিনরূপে প্রকাশ পাইবে তাহা জানা থাকিলে, নিরঞ্জন হয়ত—তা'জানা থাকিলেই বা নিরঞ্জন কি করিতে পারিত ? জীবন ও আশ্রয়-দাতাকে সে কি মুখের উপর বলিতে পারিত যে, তাঁহার এই সামান্য কাজটুকুও তাহার দ্বারায় ঘটা সম্ভব নয় ? প্রাণপণে নিজের সকল সঙ্কোচকে সে মনের মধ্যেই চাপিয়া লইয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের কম্পনের যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "তা'হলে লাইব্রেরি থেকে কোন বই বেছে দেবেন চলুন ; এখানে তো কোনই বই নেই।"

পরিমলের পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত প্রবলবেগে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া চলিয়া গেল। সে আবার বৃথাই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই ভস্মস্তূপবৎ ভীষণদর্শন দগ্ধমুখের রহস্য-জটিলতা যেন উলটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছু না, কোন নিদর্শনই নাই ! তবে কোথা হইতে, কেমন করিয়া সেই পরিচিত, বড় পরিচিত কণ্ঠের শব্দটুকু, আজ বারেবারেই সুদূর অতীত, করুণ কঠিন ভয়াবহ অতীতের—মধ্য হইতে তার সমস্ত বিস্মৃতির ধূলি জঞ্জাল ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে ? একি তবে পরিমলের কল্পনা মাত্র, সত্য নয় ? একি তার মনের মধ্যের স্মৃতির তারে যে অবিস্মৃত অতীত আজও দিনে রাত্রে সকল সময় সকল সুখ-সম্পদের মধ্য দিয়াও করুণ ও কাতর মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে থাকে, তারই একটা রেস, আর কিছু নয় ? আবার একটা দীর্ঘতর নিশ্বাস সে মোচন করিল এবং তারপর নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্যই ইহার সান্নিধ্য ছাড়াইতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "আজ থাক, কাল বই নিয়ে আসবো,"—বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিজের পরিত্যক্ত আসন খানার উপর সবেগে বসিয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক নিরঞ্জন আর্ত্তকণ্ঠে আত্মগত কহিয়া উঠিল, " আবার সেই ছায়া ! সে নয়—তবু যেন সেই ! নাঃ, মানুষ আমায় থাকৃতে দিলে না। আবার দেখছি পাগল করে আমায় পথে বার করে দেবে।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

ভ্রান্তি

এই কিরে সুখ ? রাঙ্গা টুক্‌টুক্ ফল্ রে !
এ যে গো মাকাল ! হোস্‌নে নাকাল ; চল্ রে !

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

বাঙ্গলার আইন-মজলিসে, অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইয়াছে যে মহিলারা আজিও সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই মতের স্বপক্ষে তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন আবৃত্তি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি। পোপের হুকুমে পৃথিবীর আবর্ত্তন বন্ধ হয় নাই। আমরাও আশা করিতে পারি যে আইন-মজলিসের হুকুমে বাঙ্গালী জাতির অগ্রগতি বন্ধ হইবে না এবং এই নির্দ্দেশকেই অভ্রান্ত বলিয়া দেশের মহিলারা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না। মজলিসের বাহিরে এবং ভিতরে আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতে থাকিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সভ্যেরা অথবা ইহাদের পরবর্ত্তিগণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অধিকার-বৈষম্য রহিত করিয়া দিবেন। এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মহিলাদিগের রাজনৈতিক অধিকারে প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণার লেশ মাত্রও নাই।

শিবাজী ও আফজল খাঁর যুদ্ধের কথা এখন বাঙ্গালার বালকেরাও জানে, আইন-মজলিসের সভ্য মহোদয়গণের ত কথাই নাই। আফজল খাঁ তাঁহার মনিবের হুকুমেই শিবাজীর সঙ্গে লড়িতে আসিয়াছিলেন ইহাও সকলের নিকটই সুপরিজ্ঞাত। এই মনিবটি কে, মহিলা কি পুরুষ—তাহা জানিতে হইলেও মারাঠী ভাষায় লিখিত প্রাচীন বখর ও পারসী ভাষায় লিখিত তারিখ ঘাঁটিতে হইবে না। দেশ শাসনের গুরু দায়িত্বভার যাহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত তাহাদের নিকট হইতে আমরা স্কুলমাষ্টারের কায আশা করিতে পারি না। 'স্কুল মাষ্টারের কায' একজন স্কুলমাষ্টারই করিয়াছেন। মারাঠী ও পারসী গ্রন্থের সাহায্যে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বর্ষত্রয় পূর্ব্বে শিবাজীর জীবনচরিত লিখিয়াছেন। অল্পকালের মধ্যেই ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। এই বহুল প্রচারিত এবং সর্ব্বজনমান্য চরিত গ্রন্থের সহিত দেশের 'ভাগ্য বিধাতা' আইন-মজলিসের সভ্য-মহাশয়গণের পরিচয় প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে না। এই গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ) ৬৭ পৃষ্ঠায় দেখা যাইবে আফজল যাহার হুকুমে দুর্গম গিরিসঙ্কুল জাবলী প্রদেশে শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একজন মহিলা—অপ্রাপ্তবয়স্ক সুলতানের রাজ্য পরিচালনার ভার তাঁহার মাতা বড়ি সাহিবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সরকার বলিতেছেন,—The Queen mother, Bari Sahiba, who virtually ruled the state till ner fatal journey to Mecca, was a woman of masterful spirit and experienced in the conduct of business. সাহস ও রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা এই মহিলার প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও নারীর অধিকার-

বিরোধীরা তর্ক তুলিতে পারেন যে তিনি যখন শিবাজীর শক্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই তখন তাঁহার দৃষ্টান্ত নারীর অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। কিন্তু সে প্রকার তর্ক তুলিলে বিজাপুরের অসংখ্য রাজপুরুষের অযোগ্যতা কি নিখিল ভারতের সমস্ত পুরুষজাতির রাজনৈতিক অধিকারের স্বপক্ষে যাইবে? বড়ি সাহিবা নারী হইলেও বিজাপুরের ইতিহাসের এক সঙ্কটসঙ্কুল দিনে সমগ্র রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, নারী বলিয়া কোন পুরুষ সেদিন তাঁহার অধিকার অমান্য করে নাই। কারণ তাহারা জানিত আর এক প্রাতঃস্মরণীয় নারী চাঁদবিবি একদিন মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আহম্মদ নগরের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

শিবাজী রাজকার্য্যে তাঁহার মাতার পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতেন। ঔরংজীবের রাজধানীতে যাইবার সময় তিনি তাঁহার রাজ্যের ভার মাতা জিজাবাইয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীদিগের উপর হুকুম ছিল, তাহারা মাতু শ্রীজিজাবাইর হুকুম প্রতিপালন করিবে। একথা সভাসদ বখরে লেখা আছে, অধ্যাপক সরকারের শিবাজী চরিতেও লেখা আছে। শিবাজীর শক্তি তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দিল্লীতে তিনি তাহার উত্তরাধিকারীকেও লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারা দুইজনেই সেখানে নজরবন্দী হইয়াছিলেন। তিনি বন্দী হইলে তাহার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের কিরূপ সঙ্কট হইবে তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। এবং সেই সঙ্কট সময়ে তিনি রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহার মাতাকে,—নারী বলিয়া তাহাতে কেহ আপত্তি করে নাই।

শাহাজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অক্ষম শিবাজী, পত্নী সইবাইর উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একথা কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মহাকাব্যে স্থান পাইলেও কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রাচীনতম বখরে যখন উহার উল্লেখ নাই তখন কোন ঐতিহাসিক আদালতেই এই নজীর গ্রাহ্য হইবে না। কবিভূষণ মহাশয় এই তথ্য পরবর্ত্তীকালের বখর হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; পরবর্ত্তীকালের বখর প্রধানতঃ প্রবাদমূলক অতএব অবিশ্বাস্য। তর্কের খাতিরে এই আপত্তি না হয় মানিয়াই লইলাম। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর অনেক মহিলা শিষ্যা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বেণী বাই ও অকা বাই গ্রন্থ রচনা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মহারাষ্ট্রে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বামী স্বয়ং স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিধ অধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক টীকাকার এখানেও আপত্তি করিতে পারেন যে, সাহিত্যসৃষ্টি ও ধর্ম্মালোচনা কাহারও অনুমতিসাপেক্ষ নহে, এবং সুসাহিত্যিক নারী প্রতিভাশালিনী হইলেও রাজনৈতিকগুণগ্রামবিবর্জ্জিতা হইতেও পারেন। তর্কের খাতিরে প্রতিভার জাতিভেদও মানিয়া লইলাম। কিন্তু তর্কের খাতিরেও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, দেশ শাসনের প্রকৃত অধিকার আছে তাহার,—যে দেশের জন্য অস্ত্র ধরিতে সমর্থ। আমরা জানি যে, এই হিসাবে অতি অল্প বাঙ্গালী পুরুষই এখন রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এদেশের রমণীরা একদিন সামরিক প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজপুতানার ঘরে ঘরে বহু বীরনারী

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—যাঁহারা সমরক্ষেত্রেও স্বামীর সহকারিতা করিতে পারিতেন; আর মহারাষ্ট্রেও এরূপ বীর রমণীর অভাব ছিল না। মোগল বীরেরাও যখন শিবাজীর নামে কম্পিত হইতেন তখনও দুইজন বীরনারী অস্ত্র হস্তে শিবাজীর প্রতিযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

সভাসদ লিখিয়াছেন যে উম্বরখিণ্ডি নামক স্থানে রায়বাগীন উপাধিধারিণী একজন মহিলার সহিত শিবাজীর যুদ্ধ হইয়াছিল। রায়বাগীন মুখল সরকারের একজন হিন্দু কর্ম্মচারীর বিধবা পত্নী। পুত্র নাবালক তাই তিনি নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। মারাঠা ইতিহাসকার কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ উল্লাসের সহিত লিখিয়াছেন—রায়বাগীন দন্তে তৃণ লইয়া শিবাজীর শরণাগত হইয়াছিলেন (শিবছত্রপতি, পৃঃ ৮৮)। কিন্তু মুখল সম্রাট আলমগীরের চিত্তে এই বীরোচিত পরাজয়ও মহিলা সেনানায়িকার প্রতি সম্ভ্রমের উদ্রেক করিয়াছিল। কথিত আছে, রায়বাগীনের শৌর্য্যের কথা শুনিয়া সম্রাট বলিয়াছিলেন—আমার সেনানায়কেরা নারীর মত আচরণ করিতেছে, আর একজন নারী প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে!

কর্ণাটক বিজয়ের পর গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় শিবাজীর সৈন্যের সহিত আর এক বীর রমণীর যুদ্ধ হয়। ইনি প্রভুকায়স্থ জাতীয় এক দেসাইর পত্নী, নাম সাবিত্রী বাই। অল্পবক্তা সভাসদ এই যুদ্ধের বিবরণ সংক্ষেপে সারিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বেলবাড়ীর দেসাইন শিবাজীর রসদবাহী বলদগুলি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শিবাজী এই সংবাদ শুনিয়া বেলবাড়ীর দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গ অধিকার করিয়া দেসাই পত্নীকে শাস্তি দেন। সভাসদের বিবরণে এই বীর রমণীর শৌর্য্যের সম্যক পরিচয় দিবার চেষ্টা নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের একজন অজ্ঞাতনামা লেখক শিবদিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে সাবিত্রী বাইর সাহস ও সমর-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সমসাময়িক ইংরেজ বণিকদিগের নিকট সাবিত্রীর বীরত্ব-বার্ত্তা পৌঁছিয়াছিল। অধ্যাপক সরকারের গ্রন্থে রাজাপুর হইতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি মুদ্রিত হইয়াছে—"He (শিবাজী) is at present besieging a fort where, by relation of their own people come from him, he has suffered more disgrace than ever he did from all power of the Mughal or the Deccans (=Bijapuris), and he who hath conquered so many Kingdoms is not able to reduce this woman Desai!" ইংরাজ বণিকের পত্রে প্রকাশ যে মহাপরাক্রান্ত শিবাজী এই মহিলার হস্তে যেমন লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, দিল্লীর ও বিজাপুরের খ্যাতনামা সেনানায়কগণের হস্তেও তিনি কখন সেরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন নাই। সাবিত্রী বাই কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সামান্য একটা মাটির কেল্লা দখল করিতে মোগলত্রাস শিবাজীর প্রায় একমাসকাল লাগিয়াছিল!

সাহস ও সামরিক প্রতিভাই যদি রাজনৈতিক অধিকার ক্রয়ের মূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়,

তবে মহারাষ্ট্রের আরও একটী রমণীর উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না। ইতিহাস তাহার নাম জানে না, জাতিতে সে অত্যন্ত হীন, দরিদ্র তৈলকারের গৃহে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সমাজে তাহার কোন স্থান ছিল না, কারণ সে পতিতা, ব্রাহ্মণ প্রতিনিধির সে উপপত্নী। কিন্তু এই উচ্চবংশজাত প্রতিনিধি যখন পেশবারে কারাগারে বন্দী তখন তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সাহস দেখাইয়াছিল পতিতা অন্ত্যজা রমণী! সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের এক দুর্গম দুর্গ অধিকার করিয়া এই অজ্ঞাতনাম্নী চরিত্রহীনা রমণী প্রতিনিধির অনুচরগণকে একত্রিত করিয়াছিল। তাহার পর যখন একে একে প্রতিনিধির সকল দুর্গ পেশবার করায়ত্ত হইল তখনও তাহার পতাকা নারী-রক্ষিত বসোটা দুর্গশিরে উড়িতেছিল। এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন পেশবার প্রধান সেনাপতি বাপু গোখ্‌লে—যিনি খিরকীর যুদ্ধে ইংরাজের বিরুদ্ধে মারাঠা সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। যতদিন দুর্গে শস্য ছিল ততদিন পর্য্যন্ত গোখ্‌লে বসোটা অধিকার করিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া শস্যাগার দগ্ধ হওয়াতে উপায়ান্তরবিহীনা তেলিনী গোখ্‌লের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আজিও মহারাষ্ট্র-নারী এই তৈলিক নারীর বীরত্ব-কাহিনী বিস্মৃত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধরের নিকট একটি মারাঠা ব্যঙ্গ কবিতা শুনিয়াছিলাম; তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'বাপু গোখ্‌লে মস্ত বীর! কারণ তেলিনীর সম্মুখেও তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই।' আইন-মজলিসের সুপণ্ডিত সদস্যবৃন্দের এ ঘটনাটি নিশ্চয়ই অবিদিত নাই, কারণ গ্রাণ্ট ডফের সুবিখ্যাত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

শুনিয়াছি কোন কোন সদস্য আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, নারীদিগকে ভোটের অধিকার দিলে অনেক চরিত্রহীনা নারী মজলিস কলঙ্কিত করিবে। বলা বাহুল্য পুরুষদিগের সম্বন্ধে এরূপ কোন বাধা উত্থাপন করা কেহই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আইন-মজলিসের সভ্যদিগের সকলেরই চরিত্র হয়ত কলঙ্কলেশরহিত! তাই তাহারা চরিত্রহীনাদিগকে তাহাদের গবেষণাগারে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক নিয়ম কেন হইবে তাহা আমার স্কুলমাষ্টারের বুদ্ধির অনধিগম্য। চরিত্রহীন পুরুষ ত ইচ্ছা এবং অর্থ ও প্রতিপত্তি থাকিলে অনায়াসেই মজলিসের মছলন্দে বসিতে পারেন। আর দেশ বিদেশের বড় বড় বহুরাজনীতিক নেতার যে চরিত্রাংশটা তাদৃশ অনুকরণীয় ছিল না ইহাও ত কাহারও অজানা নাই। তাঁহারও নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কারণে সেইরূপ গুণ থাকিলে নারীরাই বা কেন রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন? আমি চরিত্রহীনতার সমর্থন করিতেছি না। কিন্তু আমি নর ও নারীর সমান অধিকারের পক্ষপাতী। যদি চরিত্রহীনা নারীদের মজলিস অধিকারের আশঙ্কায় বাঙ্গালার চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে চরিত্রহীন পুরুষদিগকেও মজলিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রাচীনতার দোহাই দিয়া অন্যায়ের সমর্থন করা বেশী দিন চলিবে না। আর যদি রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম করা হয় যে—He

should have who has the power—তবে যে পতিতা তেলিনী বসোটা দুর্গ-প্রাকারে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ সেনাপতির শক্তি উপেক্ষা করিয়াছিল তাহাকে মজলিসের দ্বার হইতে হটাইবে কে ?

শিবাজীর পুত্রবধূ তারাবাই, ত্রিসব্যকরাও দাভাড়ের মাতা উমাবাই ও প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা-বাইর কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তারাবাই রাজারামের পত্নী। তাহার পুত্র দ্বিতীয় শিবাজী, নামে মাত্র, মারাঠাদিগের রাজা ছিলেন। তাহার বয়স ও বুদ্ধি উভয়ই অল্প ছিল। তাহার রাজত্বকালে তারাবাইই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। শাহুর মৃত্যুর পর যাহারা পেশবা বালাজী রাওর শক্তি খর্ব্ব করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সেনা-নায়ক ও বরদারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দমাজ গায়কবাড় অন্যতম। কিন্তু তাহার সামরিক খ্যাতি সত্বেও তিনি পেশবার বিরুদ্ধপক্ষের নেতৃত্বে নির্ব্বাচিত হন নাই, তাঁহাদের নেত্রী ছিলেন বর্ষিয়সী তারাবাই। তারাবাই-এর সাহস, তারাবাই-এর দৃঢ়তার কথা মারাঠা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মারাঠা ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন হিন্দুস্থান-বিজয়ী বালাজী রাও তাঁহাকে কিরূপ ভয় করিতেন। গায়কবাড়ের পরাজয়ের পরেও বালাজী রাও সাতারা দুর্গের অধিকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

পেশবা বাজীরাওর সহিত যুদ্ধে মারাঠা সাম্রাজ্যের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ত্রিসব্যক রাও দাভাড়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পদে নামেমাত্র তাঁহার ভ্রাতা যশোবন্ত রাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যশোবন্ত অলস ও অক্ষম ; তাই কার্য্যতঃ এই উচ্চ পদের দায়িত্ব তাঁহার মাতা উমাবাইকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মুখল সমরে বিপন্ন পেশবাকে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া উমাবাইর নিকটই ছত্রপতি শাহু পত্র লিখিতেন। এইরূপ অনেক পত্র পেশবাদিগের রোজনিশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। যদি মারাঠা সামন্তগণ নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বাঙ্গালার আইন-মজলিসের মহামান্য সদস্যদিগের সহিত সমান মতাবলম্বী হইতেন, তবে শাহু ছত্রপতির অনুরোধ পত্র, নারী উমাবাই দাভাড়ের উদ্দেশ্যে লিখিত হইত না ;—অযোগ্য হইলেও পুরুষ যশোবন্ত রাওয়ের নিকট প্রেরিত হইত।

অহল্যা বাইএর শাসন-দক্ষতার কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতবর্ষে এমন কে আছে যে কিছুমাত্র শিক্ষা পাইয়াছে কিন্তু অহল্যাবাইএর পুণ্যজীবন-কাহিনীর কথা অবগত নহে। ইংরাজ ঐতিহাসিক Malcolm শতমুখে এই মহীয়সী মহিলার স্তুতি গান করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা সামন্তগণ সম্ভ্রমের সহিত তাহার নাম উল্লেখ করিত। অহল্যাবাই-এর প্রতিভার ও উন্নত চরিত্রের শতাংশের একাংশের অধিকারী আইন-মজলিসে কয় জন আছেন জানিনা। তবে ইহা স্থির তাঁহার মত গুণবতী নারী আজ বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ও ব্যবহার নিতান্তই অসম্ভব

হইত। অসিজীবী বৃদ্ধ মহ্লাররাও কিশোরী অহল্যার পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু বক্তৃতাজীবী বঙ্গবাসীর বিবেচনায় বোধ হয় তাহা অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া পরিগণিত হইত।

এত কথার পরও তর্ক উঠিতে পারে মহারাষ্ট্রের মহিলাদিগের মত বাঙ্গালী মহিলাদিগের যে যোগ্যতা আছে তাহার প্রমাণ কি? কিন্তু সে প্রমাণ দিবার সুযোগ কোথায়? মারাঠা ইতিহাসের প্রাক্কাল হইতেই দেখিতেছি প্রতিভাশালিনী নারীরা প্রয়োজন হইলেই দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য পুরুষ পরীক্ষক সমিতির অনুমতি অপেক্ষা করিতে হয় নাই। বাঙ্গালা দেশেও রাণী ভবানীর ন্যায় নারী-রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী রমণী বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকেরা বুদ্ধিমান বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন। এমন হইতেই পারেনা যে, এই বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবলমাত্র পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, ইহাতে কি মাতার দান কিছুই নাই? এমন হইতেই পারে না যে, সকল প্রতিভাবান বাঙ্গালী বুদ্ধিহীনা মাতার সন্তান। বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহারা যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী মহিলারাও যে মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদিগের মত রাজনীতি ক্ষেত্রেও যোগ্যতার পরিচয় দিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

দক্ষিণেশ্বর

কলিকাতার অনতিদূরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে সারি সারি শিব মন্দির যেন ধ্যানী যোগীর মত বসিয়া আছে; এই দক্ষিণেশ্বর বাঙ্গালীর স্পষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক তীর্থ।

এই তীর্থের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন রাণী রাসমণি। ইনি কৈবর্ত্ত জাতীয়া। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের পূজারি পাইলেন না, কৈবর্ত্তের মন্দিরে কোন্ সদ্‌ব্রাহ্মণ পূজা দিতে আসিবেন? কিন্তু রাসমণি সামান্য মেয়ে ছিলেন না। একদা তিনি কাশীধামে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই তীর্থে ব্যয়ের জন্য শত শত স্বর্ণ মুদ্রার থলিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল; যাত্রাকালে শুনিলেন দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বহুলোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। রাসমণির প্রাণ আর্ত্তের ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "আমার তীর্থযাত্রার জন্য মজুত অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীকে বিতরণ কর, তাহা হইলেই তীর্থদর্শনের পুণ্য আমার অর্জ্জিত হইবে।" তিনি তীর্থে গেলেন না, কিন্তু দরিদ্র নারায়ণকে তুষ্ট করাতে তীর্থদর্শনের সম্যক্ ফল তিনি পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের জন্য যদি তিনি ভাল ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাইতেন, তবে শত শত তীর্থের এক পার্শ্বে কৈবর্ত্তনির্ম্মিত তীর্থটি মুখখানি নত করিয়া মৌনভাবে চুপ করিয়া থাকিত, শুধু তুচ্ছতা ও অবহেলা পাইয়া ব্রাহ্মণদত্ত একটা সঘৃণ পূজা পাইয়াই চরিতার্থ হইত। কিন্তু রাসমণি দেবের আসন বাহিরে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা বড় আসন তিনি নিজের মনের ভিতরে রচনা করিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী দেবতা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সেই ঐকান্তিকী পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য এমন একটি পূজারি তাঁহাকে দান করিলেন, যে পূজারি সমস্ত ভারতব্যাপী মন্দিরের পূজারিদের রাজা, রামকৃষ্ণ স্বয়ং যে মন্দিরের পূজারি হইলেন, সেই মন্দিরে যে দেবতা স্বয়ং আসন গ্রহণ করিলেন, তাহাতে কাহার সন্দেহ হইতে পারে? এই দক্ষিণেশ্বর বঙ্গের সমস্ত তীর্থের রাজা হইয়া দাঁড়াইল। রাসমণির যে পুণ্যবল রামকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল, সেই সৌভাগ্য ও পুণ্যবল কম নহে। রাসমণি ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে অতি দরিদ্রের ঘরে
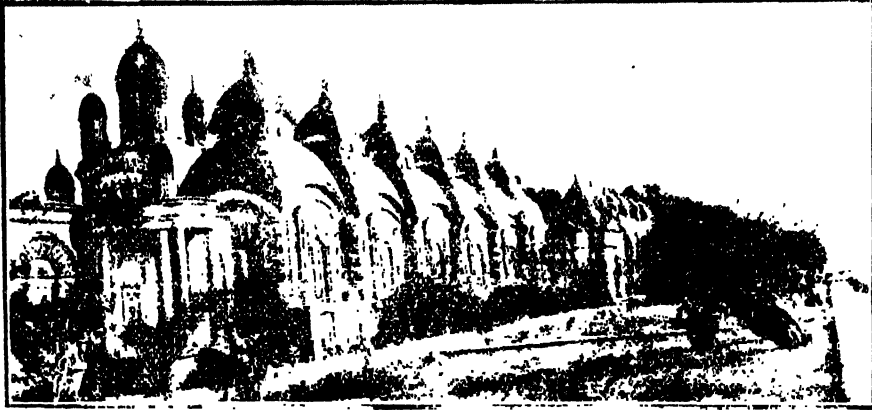
দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির

জন্ম গ্রহণ করেন, হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোনা নামক গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক কলিকাতাবাসী রাজচন্দ্র মাড়ের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পিতৃবিয়োগের পর রাজচন্দ্র স্বয়ং বুদ্ধিমতী রাসমণির পরামর্শানুসারে নিজের বিপুল বিষয়ের ভার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে রাজচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই সময় হইতে বিধবা রাণী রাসমণি ধর্ম্মকার্য্যে অজস্র ব্যয় করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির গুলিতে তাঁহার মুক্তহস্তব্যয় ও পুণ্য চরিত্রের চিরন্তন ঘোষণা থাকিবে। এই সীতাসাবিত্রীকল্পা মহানুভবা রমণী নশ্বর জগৎ হইতে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে অপসৃত হইয়াও অবিনশ্বর কীর্ত্তি দ্বারা চিরকাল লোকপূজ্য হইয়া আছেন।

ভাগিরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দির গুলির ছবি দেখুন ; আপনাদের অনেকেই হয়ত ইহা দেখিয়াছেন। ছবিতে যেন এই তীর্থের পবিত্রতা আকাশের গায়ে অঙ্কিত হইয়া আছে।

তারপর কালীমন্দিরটি। এই মন্দিরটি কি সুন্দর! ইহার ভিতরকার মায়ের পাষাণময়ী মূর্ত্তি যেন নবনীতকোমলা, এই মায়ের সঙ্গেই না রামকৃষ্ণ কথাবার্ত্তা বলিতেন? এই মায়ের নিকট আরতি করিতে যাইয়া রামকৃষ্ণ একবারে পাগল হইয়া যাইতেন, পঞ্চপ্রদীপ তাঁহার হাতে ঘুরিতেছে, ক্রমে তৈলহীন হইয়া দীপগুলি নিভিয়া যাইত, কাঁসরবাদক তাহার কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত ; বাদ্যকরের হাতে কাটি আর ঢোলের উপর সজোরে পড়িত না। তথাপি এই উন্মত্ত সাধকের আরতি থামিত না,—যিনি বিশ্বেশ্বরীর সন্ধান পাইয়া আরতির ছলে তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভ করিয়াছেন, সামান্য বাদ্যকরগণ তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিবে কেন?
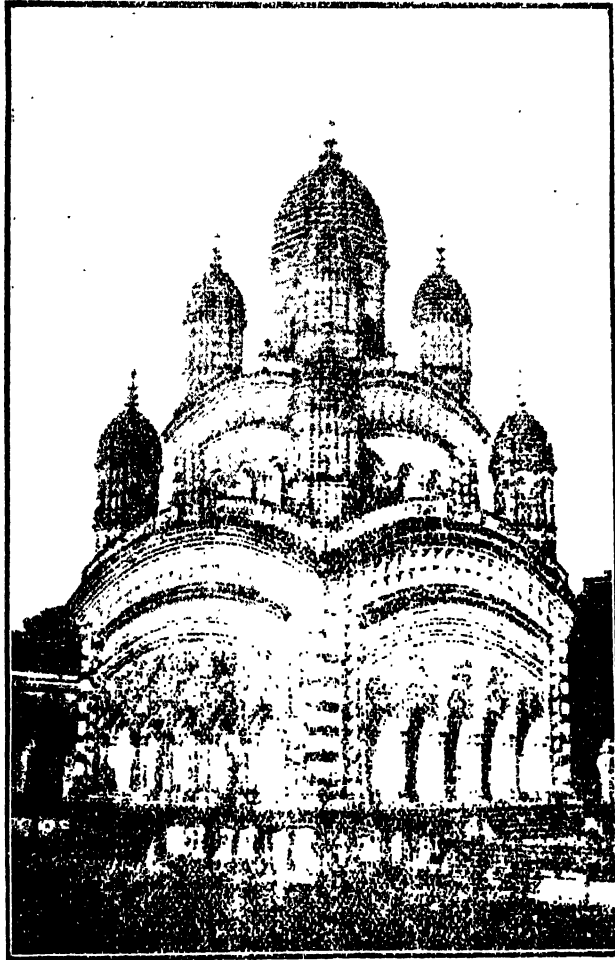
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির
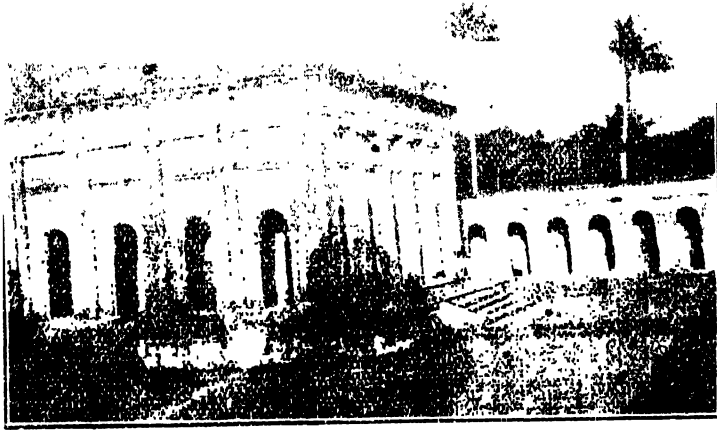
দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দির ও কৃষ্ণমন্দির
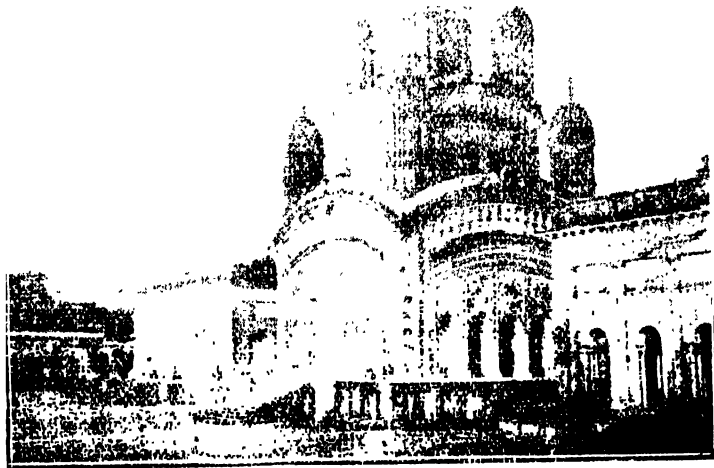
দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, নাটমন্দির ও কৃষ্ণমন্দিরের পার্শ্বচিত্র

রামকৃষ্ণ শেষে স্বয়ং একদিন কাঁদিয়া মথুরবাবুকে বলিলেন, "আমি মায়ের কাছে গেলে এলাইয়া পড়ি, আমার দ্বারা আর আরতি হইবে না।

এইবার রামকৃষ্ণের বাসগৃহ, পঞ্চবটী ও শয্যার চিত্র দিতেছি; রামকৃষ্ণ আধুনিক ভারতের ধর্ম্মরাষ্ট্রের গুরু, ধর্ম্মজগতে তাঁহার স্থান কি, তাহা আমার মত ধর্ম্মহীনের মুখে না শুনিয়া ধর্ম্মজগতের

রামকৃষ্ণের গৃহ

রামকৃষ্ণের শয্যা

অন্যতম গুরু আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের মুখে শুনুন; তিনি লিখিয়াছিলেন,—"চৈতন্য, খিশু প্রভৃতির নামমাত্র জানা আছে, কিন্তু সত্য সত্যই আজ তাঁহাদের মতই এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।"

পঞ্চবটী

বেল গাছ

সাত সংখ্যক চিত্রে রামকৃষ্ণের তপস্যার স্থল পঞ্চবটী দেখিতে পাইবেন, এই স্থানে তিনি তাঁহার গুরু তোতাপুরীর উপদেশানুসারে তপস্যা করিয়াছিলেন।

বেল গাছের নীচে তিনি প্রায়ই বসিতেন, উপরে তাহার চিত্র দেওয়া গেল।

রামকৃষ্ণ ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলার কামারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ১৬ই আগষ্ট তাঁহার লীলা শেষ হয়।

ীনেশচন্দ্র সেন

আইন-আদালত

উকীলের অবৈধ ব্যবহার—চাটগাঁ বিভাগের চাঁদপুরে কুলিদের ধর্ম্মঘট লইয়া গোলযোগ বাধিবার সময়ে আড়ির আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে চাটগাঁয়ে কয়েকদিন হরতাল হইয়াছিল; এই হরতালের সময় অনেক উকীল আদালতে যান নাই অথবা যাইতে পারেন নাই, এবং তাহাতে মক্কেলদের অনেক মোকদ্দমায় উকীল উপস্থিত না হওয়ায় আদালতের কাজে অসুবিধা ঘটে। আদালতে উপস্থিত হইয়া মক্কেলদের কাজ না করা এবং আদালতের সঙ্গে আড়ি করিয়া আদালতের কাজ কর্ম্ম ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্যোগ করা উকীলদের পক্ষে অবৈধ মনে করিয়া জেলার হাকিমেরা উকীলদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য হাইকোর্টে তাঁহাদের মন্তব্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে যাহা বিচারিত হইয়াছে তাহা বিশেষ জ্ঞাতব্য (কলিকাতা উইক্লি নোট্‌স, ২৬ ভাগ, পৃঃ ৫৮৯)। কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করা বা না করা উকীলদের ইচ্ছাধীন, তবে তাঁহারা একবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিলে উপযুক্ত সময়ে আদালতে ও মক্কেলকে নোটিস না দিয়া মোকদ্দমা ছাড়িতে পারেন না; ফিস্ বাকী থাকিলেও পারেন না। এই মোকদ্দমায় একজন উকীল জবাব দিয়াছিলেন যে হরতালের সময়ে আদালতে গেলে তাহাকে সামাজিক নিগ্রহ ভুগিতে হইত; হাইকোর্ট বিচার করিয়াছেন যে, এ আপত্তি গ্রহণ-যোগ্য নহে। উকীলেরা একদিকে আদালতে মক্কেলদের মুখ-পাত্র, আর অন্যদিকে তাঁহারা আদালতের কর্ম্মচারীরূপে গণ্য, এবং আদালতের বিচার-কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ বাধ্য। উকীলেরা আড়ি করিয়া আদালতের কাজ ছাড়িলে, একেবারে ওকালতি হইতে বরখাস্ত হইবার যোগ্য। কোন একজন উকীল ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে কোন আদালতে কাজ না করিতে পারেন, কিন্তু উকীলেরা যোট্ বাঁধিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধে কোন বিচারকের আদালতে কাজ করা বন্ধ করিতে পারেন না। কোন বিচারকের অন্যায় ব্যবহার হইলে উকীলেরা তাহা হাইকোর্টে জানাইতে পারেন, কিন্তু নিজেরা ধর্ম্মঘট করিয়া আদালতের উপর দাদ তুলিতে পারেন না। চাটগাঁর উকীলেরা দণ্ড-যোগ্য বিচারিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এটি নূতন রকমের প্রথম অপরাধ বলিয়া, হাইকোর্ট এ যাত্রা উকীলদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

প্রতিধ্বনি

ঠাণ্ডা প্রদীপ—আষাঢ়ে গল্পের আজগুবি কল্পনায় জোনাকী দিয়া প্রদীপ গড়ার কথা আছে, মাকড়শাকে ভাল খাদ্য খাওয়াইয়া কাপড় বোনাইয়া লইবার কথা আছে; এখন সে সকল কল্পনা সত্য হইতে চলিল। প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিউটন্ হারভে, জোনাকী প্রভৃতির শরীরের মাল মশলা লইয়া ঠাণ্ডা প্রদীপ তৈয়ারী করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন। এখনও এতটা হয় নাই যে এই আলোকের ল্যাম্প সকলের ব্যবহারের জন্য বাজারে বাজারে বিক্রী হইবে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। এবারে মাকড়শাকে তাঁতি করিতে পারিলে "গুলিভারের" কল্পনা সফল হয়।

* * *

পাতালপুরী—এদেশে পাতালপুরীর উপাখ্যান আছে, কিন্তু এখনও কোথাও একটা পাতালপুরী পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেটোরিয়ার পশ্চিমে কষ্টার নামক জেলায় একটি স্থানে প্রকাণ্ড একটি ২০০ ফীট গভীর গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর ঐ গর্ত্তের ভিতর দিয়া খাড়া ৮০ ফীট নামিয়া অতি প্রকাণ্ড একটি পাতাল পুরী পাওয়া গিয়াছে; এ পুরী চারিদিকে অনেক হাজার ফীট বিস্তৃত এবং চারিদিকে পাহাড়ের প্রাকৃতিক দেয়ালে রক্ষিত। ইহার মধ্যে প্রাচীনকালের অনেক জীবজন্তু এমন ভাবে শুকাইয়া "মামী" করিয়া রাখা হইয়াছে, যে কোথাও একটি জীব শরীর নষ্ট হয় নাই। একালে যে সব জীব-জন্তু দেখা যায় না তাহা এই পাতালে রক্ষিত আছে। কাজেই এ পাতালপুরী যে অতি প্রাচীনকালের তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তর আফ্রিকার মিশরে যাহারা পিরামিড্ গড়িয়াছিল ও মৃত মানুষের "মামী" করিয়া গিয়াছে, তাহাদের সভ্যতা কি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সংক্রামিত? বৈজ্ঞানিকেরা এই পাতালপুরীর রহস্য উদ্ভিন্ন করিলে, জীব-বিজ্ঞানে ও নৃ-তত্ত্ব বিষয়ের অনেক সমস্যার পূরণ হইতে পারিবে। আফ্রিকার এখনকার অসভ্য অধিবাসীরা ঐ দেশের খাঁটি আদিম অধিবাসী বলিয়া বিচারিত নহে; উহাদের আফ্রিকায় আসিবার পূর্ব্বে কাহারা অধিবাসী ছিল ও কিরূপে তাহাদের সভ্যতা বাড়িয়াছিল, হয়ত তাহার ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

* * *

রুশিয়ার নারী—বহুকাল হইতে এক শ্রেণার ইউরোপীয় সাম্যবাদীরা বলিয়া আসিতেছেন যে, আলোক বাতাস যেমন সকলের সম্পত্তি, জলাশয়ের জলে যেমন সকলের সমান অধিকার, তেমনি এই বসুন্ধরার মাটিতে সকলের সমান সমান অধিকার,—কেহ ভূ-স্বামী হইতে পারিবেন না, কেহ ধনী হইয়া অথবা রাজা হইয়া অন্যের উপর প্রভুতা চালাইতে পারিবেন না।

রুশিয়ার বলশেভিকেরা এই সকল মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, রাজার রাজত্ব তুলিয়া দিয়াছে, ধনীকে দরিদ্রের পদবীতে নামাইয়াছে,—অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের ঠাট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রুশিয়ায় এখন পুরুষ নারীর সমান অধিকার, নারীরা হাকিমি করিতেছেন, পুলিসের কাজ করিতেছেন, সৈন্যদলে ঢুকিতেছেন। শুনা যায় যে নারীরা যেরূপ নির্ব্বিকারচিত্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ও জল্লাদের কাজ করেন, পুরুষেরা তেমন পারেন না।

* * *

অমর জঞ্জাল—মহা সমরের সময়ে কাজে লাগিতে পারে, মনে করিয়া যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ২৮৫ খানি কাঠের জাহাজ গড়িয়াছিলেন; জাহাজ পিছু খরচ পড়িয়াছিল, প্রায় চারি লক্ষ টাকা। সেগুলি দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চলে না, যাতায়াতের কাজও চলে না,—কাজেই খরচপত্র করিয়া রাখা বিড়ম্বনা। এ জাহাজের খরিদ্দার নাই,—বিলাইয়া দিলেও কেহ এই শ্বেত হস্তীকে পূজা করিবার জন্য রাখিতে চায় না; কাজেই স্থির হইল, পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। সাত হাজার টাকার তেল খরচ করিয়া একখানিতে আগুন ধরান গেল, কিন্তু পুড়িয়া ভষ্ম হইল না; জাহাজখানা একটা জমাট বাঁধা কয়লার চাঙ্গড় হইয়াছে, আর সে কোথায় গিয়া কোন জাহাজে লাগিয়া বিপত্তি বাধাইবে, এই ভয় হইয়াছে। ইঁট পাথর বোঝাই করিয়া জলে ডুবাইলেও উল্টিয়া পড়িয়া ইট পাথর ডুবিয়া ভাসিয়া উঠে। এ জঞ্জাল আত্মার মত অমর,—আগুনেও পোড়ে না জলেও ডোবে না।

* * *

জর্ম্মানিতে বৎসর গণনার নূতন প্রস্তাব—নূতন কিছু করায় জর্ম্মানির বিশেষত্ব আছে। প্রস্তাব হইয়াছে যে, পূরা ১৩টি সপ্তাহে তিন মাস করিয়া ধরিয়া বৎসরকে চারি ভাগ করা হইবে, আর তাহাতে বৎসর হইবে ৩৬৪ দিনে। বৎসরে প্রতি ভাগের প্রথম মাস গুলির হইবে ৩১ দিনে আর অন্য গুলি ৩০ দিনে বৎসরের বাড়তি দিন ডিসেম্বরের শেষে জুড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং সেই অধিক দিবসটি কোন মাসের সঙ্গেই গণিতে হইবে না। বৎসর আরম্ভ করা হইবে ঠিক রবিবারে; ইহাতে খ্রীষ্ট মাস-ডে সোমবারে পড়িবেই, আর ৮ই এপ্রিলে ইষ্টারের পর্ব্ব হইবে। দেশের জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা ও বণিকেরা এ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছেন।

মুক্তি

না থাক্‌লে "সং" জীবন যাত্রায়   তত্ত্বকথার গানের মাত্রায়
আসর যেত ভেঙ্গে।
আঁধারে পায় মুক্তি পেঁচা   পাক্‌গে তোরা হেসে চেঁচা
আলোর রং-এ রেঙ্গে।

'বিজলী'তে বীরবলের পত্র

[সবুজ পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সুরসিক বীরবলের প্রবন্ধটি 'বিজলী' হইতে উদ্ধৃত হইল—বং সং]

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে ইউনিভারসিটির পরমায়ু ফুরিয়াছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় নাকি বেশির ভাগ অপব্যয়। তাই আমাদের education minister ইউভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু-কিঞ্চিৎ দেন ত সে টাকার কানদেগে (ear marked করে) দেবেন। ইউনিভারসিটি-ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্ণমেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলিবে না।

আমাদের education minister ইউনিভারসিটির উপর কোনরূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co-operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দৈখছি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা হচ্ছে এই—

"আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয় তা তুমি বুঝিবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে স্থূলদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয় অপরের মতে তা অপব্যয় হতে পারে। আমার মতে minister-দের যে মাইনে দেওয়া হয় তার ষোল আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্ আমার কোন ব্যয়টা সদ্ব্যয় আর কোনটি অপব্যয় সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি যে রকম ভাল বুঝি সেই রকম খরচ করবার অধিকার আইনতঃ আমার আছে। হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি হচ্ছে স্বরাট্।"

এর উত্তরে minister মহাশয় বলেন :—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর। আর তা যদি না মানতে চাও ত মেনো না, একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি, অতএব কে কার অধীন তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে মনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে তার কপালে উপবাস ঘটিবে আর তার ফল মৃত্যু।

অতএব এটা নিশ্চিত যে রিফরম কাউনসিলের প্রথম এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভারসিটী ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যের সহায় হবে, কেন না এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ, তাই একটা ভাঙ্গা হচ্ছে দেখলেই লোকে খুসি হবে। ও বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকজন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায় সেটাই হচ্ছে আপাতত আসল ভাবনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি আশা করি বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আরজি বিনা বিচারে ডিসমিস করিবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(২)

(১) ইউনিভারসিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকদের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড়বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে, কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপকেরা পেটেণ্ট ঔষধ বানান—ওতে দু-পয়সা আছে, Physics-এর অধ্যাপকেরা বিজলী বাতি বিজলী পাখার মিস্ত্রি হোন, আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন। তাও যদি না পারেন ত খবরের কাগজ লিখুন। বাকী থাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহলে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে কতক জেলে, কতক পাঠশালায় কতক পশুশালায়, কতক হাটে আর কতক মাঠে। হট্টে গোল করবার জন্য আর মাঠে গুলি-ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্রপাতি সব যাদু ঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কালস্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দু-দলের উপকার করা হবে—এক জনগণের, আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐ সব ত্রিভঙ্গ বিভঙ্গ অপরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিন্‌তে পারবে যে ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার যাদুর যন্ত্র-তন্ত্র, আর ওরই ভিতর মানুষের জিওনকাঠি মারণ-কাঠি দুই লুকোনো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ সব কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের তত্ত্ব সব উদ্ধার করিবেন, এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও জায়গা হবে না, এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীরও তদ্রূপ হওয়া উচিত। তবে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে পাঁজিপুথির অগ্নি সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কু-সংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিদ্যাদাহের মুরদাফরাস দেশে ঢের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে, মাধববাবুর বাজারের অন্তর্ভূত করা হউক। ইউনিভারসিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত, অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের টাকা আয় হবে। আমার বিশ্বাস ও-ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নতুন minister অর্থাৎ fish market minister-এর মাইনে দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে ইউনিভারসিটি কলেজে একটি নতুন পুলিসকোর্ট বসানো হোক্‌। এ বিষয়ে নজির আছে। ডফ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে জোড়াবাগান পুলিস কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজির অনুসারে, ইউনিভারসিটি কলেজকে, গোলদিঘি পুলিসকোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদিঘির ধারে যে একটা পুলিসকোর্ট থাকা দরকার একথা বোধ হয় কোনও মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশাকরি Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করবেন। ইতি

৪।৬।২২　　　　বীরবল।

ভারতের ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ অর্থ-ই সে অজানা, সে অন্ধকার। তবুও মানুষের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম এই, সে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ করে। অতীত ও বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের মূল্য অধিক। অতীতের স্মৃতি যেখানে বড় মধুর, সেখানেও মানুষেরা উন্নততর ভবিষ্যতকে আনিতে চায়; তবে বড় জোর হইতে পারে, যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা,—অতীতের প্রথায় তাহাদের অভীপ্সিত ভবিষ্যতকে গড়া। যাহাদের ভবিষ্যতের আশা নাই, তাহাদের জীবন নিষ্প্রভ এবং কর্ম্মঅনুরাগশূন্য; কঠোর নিয়তির দিকে চাহিয়া,—সংসারকে অসার ভাবিয়া, হয় তাহারা তাহাদের বিষাদ ভাঙ্গিবার জন্য মরণান্তের শান্তি প্রার্থনা করে, না হয় ইন্দ্রিয় সুখের মোহে দুদিনের জীবন-লীলা শেষ করিবার উদ্যোগ করে। কি রকমের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ইহলোকের সাধনা তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়, কেন না আশার অক্ষয় আলোক না জ্বালিতে পারিলে, অন্ধকারের দিকে চলা অসম্ভব।

অনেক ইউরোপীয়ের বিশ্বাস, আমাদের কোন ঐহিক ভবিষ্যত নাই; আমরা ইউরোপের আওতায় কিছু কিছু বাড়িয়া চলিতে পারি, কিন্তু কখনও একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতি হইতে পারিব না। ইঁহারা বলেন, যে মানুষের সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে, শীত প্রধান দেশ গুলি বৃদ্ধির অনুকুল ছিল না; তখন নাইল ধৌত মিশর, টাইগ্রীস্-ইউফ্রেটিস-মাতৃক বাবিলন, এবং বৈদিক সপ্তনদী পরিপুষ্ট উত্তর ভারত মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির বড় সহায় ছিল। এযুগের শীতপ্রধান দেশের নূতন সভ্যতা কঠোর প্রকৃতিকে শাসন করিয়া চলিয়াছে,—প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ দানের উপর নির্ভর করিয়া বাড়ে নাই; তাই সে বলদৃপ্ত এবং অশ্রান্তকর্ম্মী; কালিদাসের দিনে যাহা হিমালয়ের "একোহি দোষঃ" ছিল, তাহা এখন উহার প্রধান গুণে পরিণত হইয়াছে। যে অক্লান্ত উৎসাহ ও অশ্রান্ত কর্ম্ম ইউরোপের পক্ষে সম্ভব, তাহার অতি অল্পাংশও ভারতের পক্ষে সম্ভবে না। আমরা নাকি বহু অবকাশে অল্প কাজ করিতে পারি, তাই আমাদের পক্ষে নাকি, কেবল ইউরোপের আওতায় থাকিয়া ধীরে সুস্থে, বাড়িয়া উঠিয়া মানুষ হওয়া চলে।

তবে কি আমাদের দেশের লোকেরা এখন মৃত্যু কামনা করিয়া জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যকে যমের জনক বলিয়া অর্ঘ্য দিবে? যে সকল শীতের দেশের লোকেরা এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশে চাকুরী করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, এবং সৈন্য-বিভাগের কাজ করেন, তাঁহারা কি অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন? অনলস পরিশ্রমে কি তাঁহাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়? স্বাস্থ্য শুমারীর বিবরণ পড়িলে ত তাহা প্রমাণিত হয় না। শৈল-বিহারে থাকিয়া গ্রীষ্ম এড়াইবার ভাগ্য খুব বহুসংখ্যক ইউরোপীয়ের ঘটে না; যে সকল উচ্চ কর্ম্মচারীদের পক্ষে তাহা ঘটে, তাঁহাদিগকে প্রথম জীবনেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই নানা জেলায় দারুণ গ্রীষ্মে কাজ করিতে হয়। ইঁহারা

যে অল্পজীবী ও অকর্ম্মণ্য না হইয়া বিলাতে গিয়া বহুকাল পেনসন ভোগ করেন, ও অন্য কাজে উপযোগী বিবেচিত হয়েন, তাহা ত কোন বিবরণেই অস্বীকৃত হয় না। উচ্চ কর্ম্মচারীর কথা ছাড়িয়া দিয়া সৈন্য বিভাগের লোকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। এ বৎসরের মে-মাসে স্বাস্থ্য সুমারির যে বিবরণ কাগজ পত্রে ছাপা হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল, যে যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া ভারতে সৈন্যের কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই গ্রীষ্মের প্রকোপে অল্পায়ু বা অকর্ম্মণ্য হয়েন নাই। এ বিবরণও পড়া গেল, যে যাহারা কখনও ছুটি লইয়া বিলাত যায় নাই, এবং ক্রমাগতই এদেশে কাজ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে ৮০।৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে ভাল স্বাস্থ্য রাখিয়াছে।

ইহাতে কি মনে হয় না যে, আমাদের অল্পায়ু ও অলস হইবার কারণ অন্যবিধ? নূতন আমদানি করা সভ্যতার প্রথা-পদ্ধতিতে যে সকল রাষ্ট্র পরিচালনের ঠাট গড়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিতে হইলে, যেরূপ নিয়ম পালন করা উচিত ও যে রকমে প্রাচীন অভ্যাস বদ্‌লাইয়া লওয়া উচিত, তাহা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই হয়ত বা আমরা অপরিচিত ও অনভ্যস্ত নূতন কলে দমিত হইতেছি। যাঁহারা দেশী রাজসরকারের চমৎকার কাজ করেন, তাঁহারা যে ইংরেজ সরকারের কাজের কলে পড়িলে হাঁপাইয়া ওঠেন, তাহা অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, যাঁহারা বাঁধা নিয়মে পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, ও প্রাচীন অভ্যাসগুলিকে অবস্থার উপযোগী করিয়া বদলাইয়া লইয়াছেন, তাঁহারা যে সুস্থ শরীরে নিরন্তর পরিশ্রম করিতে পারেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এ আলোচনা করিতে গেলেই এ দেশের লোকের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী খাদ্য পাইবার সুবিধার কথা ওঠে; কিন্তু সে আলোচনা এখানে করিব না।

অন্য দেশের পক্ষে ইউরোপের প্রভুতার শীতল ছায়া চাই-ই চাই, এবং ইউরোপের সর্ব্বজয়ী প্রভুতা সেই দেশেরই বিশিষ্ট জল বায়ুর ফলে ইহা মানিয়া লওয়া কঠিন। মিশর ও বাবিলনের কথা তুলিয়া আমাদের বক্তব্য জটিল করিবনা; ইউরোপের প্রভুতার প্রসঙ্গে কেবল ভারতের কথাই লক্ষ্য করিব। আমরা গ্রীষ্মের তাপে মরি নাই, মরিয়াছি নির্ভাবনার শাপে। ষ্টার্ণের গল্পের টবি খুড়া যেমন মাছিটিকে না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিল যে তাহাদের দুজনের জন্য পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থান আছে, আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও তেমনি সকল বুভুক্ষু জাতিকে এই প্রচুর অন্নের দেশে অবাধে বাস করিতে দিয়াছিলেন। আমরা বিদেশে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করি নাই,—দেশেই প্রচুর পাইয়া নির্ভাবনায় অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং একদিকে যেমন অন্য জাতিকে মারি নাই, তেমনি আবার অন্যদিকে সকল জাতিতে রাষ্ট্রোন্নয়নের চেষ্টা করি নাই; প্রয়োজনের তাড়নায় সকলে বাঁধা পড়িয়া একলক্ষ্যে ছুটি নাই।

ইউরোপের প্রভুতার মূল শীতের গরিমায় নয়,—কর্ম্মের গরিমায়। অসভ্যতার যুগে ইউরোপের বুভুক্ষুরা দায়ে পড়িয়া লুট্-তরাজ করিয়া যোট্ বাঁধিয়া পাইরেটের দল গড়িত; সভ্যতা অর্থাৎ ক্ষমতা বাড়িবার পর, তাহাদের বিঘ্নময় লুট্-তরাজ শান্তিময় বাণিজ্য রূপে বিকাশ পাইয়াছে,

এবং অশ্রান্ত উদ্যোগের ফলে বল বাড়িয়াছে, কল বাড়িয়াছে, কর্ম্ম-চটুলতা বাড়িয়াছে, শাসন-পটুতা বাড়িয়াছে। ভারতের যে প্রয়োজন ছিল না, সে প্রয়োজন এখন দেখা দিয়াছে; তাহার ফলে কর্ম্মময় নূতন জীবন যে জাগিবেনা, তাহা কি সম্ভব ?

আমাদের অধোগতি হইয়াছে কর্ম্ম-হীনতা-জনিত বিষাদ ও বৈরাগ্যের চাপে, সূর্য্যের তাপে নয়, গ্রীষ্মের তাপে নয়। কর্ম্ম নিরত হইলে যে শক্তি জাগে, ইউরোপ তাহার দৃষ্টান্ত। ইউরোপে তাহার দৃষ্টান্ত। ইউরোপ যদি কর্ম্মের প্রভাবে নবশক্তি জাগিয়া প্রকৃতির প্রতিকূলতা পরাজয় করিতে পারিয়াছে, তবে এখানেও তাহা অসম্ভব হইবে না; শৈত্য হইতে যাহা জন্মিয়াছে, সবিতার দীপ্তি হইতেও সেই "ধী" লাভ করা যাইতে পারে। বাহ্য প্রকৃতি কোন দেশেই মানুষের প্রতিকূল হইতে পারিবে না; ভূতজয়ের মন্ত্র শিখিলে ভূতেরা আমাদের দাস হইতে বাধ্য। খাঁটি জ্ঞান-সূর্য্যের গায়ত্রী মন্ত্রে ধী-শক্তি বাড়িলে, প্রভুতার সুশীতল ছায়ায় না বসিয়াও আমরা মানুষ হইতে পারিব।

আষাঢ়ে

ইউরোপের রাজনীতি—এদেশে ইউরোপের সভ্যতা উপেক্ষিত হইতে পারে, লোকে ইউরোপের সঙ্গে আড়ি করিতে পারে, কিন্তু অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতিতে আমাদের ভাগ্য নিয়মিত হইতেছে। তাই ইউরোপের সংবাদ শুধু আমাদের কৌতূহলের সামগ্রী নয়। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, ইংরেজের অকপট স্বার্থ, যে সর্ব্বত্র শান্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য চলে। জেনোয়ায় সর্ব্বজাতির সম্মিলনের মন্দিরে কিন্তু বোঝা গেল যে শান্তি দুরারাধ্যা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সদ্ভাব হইবে কিনা তাহা হেগ্‌এর সভায় জানা যাইবে; এদিকে নিজের ঘরে আয়ার্লণ্ডকে লইয়া ইংরেজ উদ্বিগ্ন। দক্ষিণ আয়ার্লণ্ড স্বরাজ পাইল, তবুও বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থামিল না; সিন্‌ফিনের দলের লোকেরা উত্তর আয়ার্লণ্ড আক্রমণ করিয়া অনেক হত্যাকাণ্ড করিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের সৈন্যকে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে হইয়াছে। যে সর্ত্তে স্বরাজ বসিয়াছিল, তাহা এখন পালিত হইবে, না অস্ত্রবলে দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডকে শাসন করিতে হইবে, ইহার বিচার চলিতেছে।

রুশিয়ার নূতন বিধানে কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, এবং সকল সম্পত্তি প্রজাসাধারণের। এইজন্য রুশিয়া বলিতেছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের ব্যক্তিবিশেষের বা কোম্পানির যে সম্পত্তি ছিল, এবং এখন বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সে তাহার জন্য

কাহাকেও খেসারতের টাকা দিবে না, কারণ, উহারা রুশিয়ার প্রজার সামিল ছিল, এবং অন্য প্রজার যাহা অবস্থা হইয়াছে, উহারাও সেই অবস্থা ভোগ করিতে বাধ্য। ইউরোপের লোকে সে কথা মানিতেছে না। রাষ্ট্রের হিসাবে রুশিয়ার যাহা ধার হইয়াছে, তাহাও সে দিতে অক্ষম; সে বলিতেছে, তাহাকে আরও টাকা ধার দাও, তবে সে একদিন টাকা শোধ দিবে। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ; প্রজারা বলিতেছে "খাব খাব"; গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন "কোথা পাব?"; বন্ধুরা বলিতেছেন "ধার করনা"; আমেরিকা বলিতেছেন "শুধিবে কিসে?"; আর লেলিন হয়ত এখনও রোগ-শয্যায় পড়িয়া মনে মনে বলিতেছেন "নব ডঙ্কা"। শিক্ষিত লোকেরা না খাইয়া মরিতেছে বলিয়া একজন ইংলণ্ড-প্রবাসী অধ্যাপক আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালায় ভিক্ষা তুলিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। দেশের লোকের প্রাণে আর বড় মায়া মমতাও নাই; একটি স্থানে অনেক লোক অনুপযুক্ত খাদ্য খাইয়া রুগ্ন হইয়া পড়ে, এবং তাহারা রুগ্ন ও দুর্ব্বল বলিয়া, ও তাহারা রোগের বীজ ছড়াইতে পারে আশঙ্কায়, তাহাদিগকে দলে দলে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। এই নৃশংসতাকে যাহারা দয়া বলিতেছে, তাহাদের ধ্বংস বুঝি অনিবার্য্য।

জর্ম্মাণি তাহার ধারের টাকা দিতে পারিতেছে না বলিয়া ও সে রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিতেছে দেখিয়া ফরাসীরা উত্তেজিত হইয়াছে, এবং সে জোর করিয়া ও সন্ধির নিয়ম তুচ্ছ করিয়া জর্ম্মানির রূর্ রাজ্য দখল করিতে চায় ও অন্য দশ রকমে জর্ম্মানিকে লাঞ্ছিত করিতে চায়। ইংরেজ ইহার বিরোধী। আবার জনরব উঠিয়াছে যে, আরবে ও মেসোপোটেমিয়ায় ইংরেজের প্রভুতা ধ্বংস করিবার জন্য ফরাসীরা গোপনে আরবের সঙ্গে নূতন সন্ধি করিতেছে। এ জনরব মিথ্যা হইলেও বলিতে পারি ফরাসীরাই সকল সন্ধি ভণ্ডুল করিতে বসিয়াছে; নহিলে ইংরেজ ও মার্কিণদের ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের দুরবস্থার পরে কোন জাতির উপর টাকার দাবী না করিলেই চলে,—সকলের দেনা-পাওনার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই বালাই যায়।

জাপান তাহার বাহুবলে ইউরোপীয়ের দলে। অবস্থার উন্নতিতে নীচ উচ্চ হয়, এবং চেহারাও বদলায়। জাপানীরা সত্যই আমেরিকার এক আদালতে মোকদ্দমা তুলিয়া দাবী করিয়াছে যে তাহারা "সাদা" এবং তাহাদের গায়ের রং পীত নহে। এতদিন ককেশিক ছাঁচের ক্ষুদ্র একটি জাতি জাপানের এক কোণে অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল; এখন জাপানীরা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের উৎপত্তি সেই "আইনু" জাতি হইতে। গোলে পড়িলেন নৃ-তত্ত্ববিদেরা।

তুর্কীদের উত্তমাঙ্গ ইউরোপে; তবুও সে এসিয়ার হীনবল অসভ্য; উহারা খৃষ্টীয়ান নহে বলিয়াও অবজ্ঞাত। ইউরোপে নালিশ উঠিয়াছে যে তুর্কীরা খৃষ্টীয়ানদের উপর অত্যাচার করিয়াছে; তুর্কীরা বলেন যে, খৃষ্টীয়ানেরা মুসলমান বিদ্বেষে যে অত্যাচার করে, তাহাতে তাহাদিগকে রাজ্যে রাখা ভার। বিচারের জন্য হয়ত দুই দিকের কথারই অনুসন্ধান হইবে।

ইউরোপীয়েরা, জাপানীরা, মার্কিণ বাসীরা এবং অষ্ট্রেলিয়াদি উপনিবেশের লোকেরা প্রশান্ত

মহাসাগরের দ্বীপে হনলুলু নগরে শীঘ্রই বিচার-বৈঠক বসাইবেন, এবং তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে সকলের অধিকার ও বাণিজ্যের সুবিধার বিষয় আলোচিত হইবে। পৃথিবীর চারিদিকেই শান্তির বেড়াজাল পড়িতেছে। শাস্ত্রীজী অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংবাদ দিতে পারেন কি, যে ইহাতে ভারতের সৌভাগ্য বাড়িবে কি না ?

* * *

ভারতবাসীর হাত-বৃদ্ধি—ভারতবাসীর পদ-বৃদ্ধি অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের ক্ষমতা ও সচ্ছলতা বাড়ে নাই ; এবারে প্রস্তাব হইতেছে যে রাষ্ট্র-শাসনের সকল দিকে এ দেশের লোকের সংখ্যা বাড়ান যায় কি না,—সকল কাজে আমাদের হাত বাড়ান চলে কি না। চট্ করিয়া মনে হইতে পারে যে, হয়ত নিদানপক্ষে বিচার বিভাগে দেশীয়ের সংখ্যা খুব বাড়ান চলে, কিন্তু ক্ষমতাশীল বণিক-সভার বিজ্ঞেরা বলিতেছেন যে তাহাও চলে না ; তাঁহারা বলেন যে, সভ্য ইউরোপের বাণিজ্য ও চুক্তির জটিল আইন, এ দেশের লোকে বোঝেনা বলিয়া উচ্চতম আদালতগুলিতে খাঁটি বিলাতী জজ নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং মফঃস্বলের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ সিবিল সার্বিসের লোকদিগকে পুরা মাত্রায় হাইকোর্টের আসন দেওয়া উচিত! প্রথম কথা এই যে, এ দেশে বিদেশী সভ্যতার জটিলতাঘটিত মোকদ্দমা কয়টি, আর এ দেশেব লোকের সুবোধ্য বাদ-প্রতিবাদ কতগুলি ? দ্বিতীয় কথা এই যে, ইউরোপীয়েরা সিবিল সার্বিসে কাজ করিবার সময়ে এ দেশ সম্বন্ধে দেশের লোক অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন কি ? কর্ত্তা-গিরি করিতে গিয়া অলক্ষ্যে যে মেজাজ জন্মে, তাহাও সুবিচারের পক্ষে অনুকূল কি না ভাবিতে হইবে। বর্ব্বর দেশের সামাজিক অবস্থা জানিবার কৌতূহল না বাড়াইয়া ইউরোপীয়েরা সুবিচার করিতে পারেন, আর দেশের কথা যাঁহারা ষোলআনা জানেন, এবং প্রাণপণে বিদেশের অবস্থা শিখিয়া থাকেন, তাঁহারা অপটু,—এ সিদ্ধান্তের উপর কথা নাই। হাত-বৃদ্ধির একটি দিকের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ; কুলি ও কেরাণীর পদ ছাড়া, সকল দিকেই এক কথা। রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ভুলিয়াই আমরা গোলে পড়ি। দেশের নাম ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া, এবং ইহার শাসন-দণ্ডের গোড়াটি, ইংরেজ ছাড়া আর কাহারও মুঠায় থাকিতে পারে না ; ঐ দণ্ডের মুক্ত-প্রান্তটুকু ধরিয়া আমরা ততটুকু হেলাইবার অধিকারী, যাহাতে মুঠার দণ্ড, মুঠা হইতে বিচলিত না হয়। বিশ্বাস করিয়া যতটুকু আমাদের হাতে দেওয়া চলে, তাহাই দেওয়া হইবে ; যে বস্তু বিশ্বাসের অভাবে মিলিবেনা, তাহা আন্দোলনে ও তর্কে বহুদূর।

* * *

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক—সিবিল সার্বিসে উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতেই কলিকাতার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়া থাকেন ; পাকা চেয়ারম্যান

শ্রীযুক্ত জে. এন্ গুপ্ত অবসর গ্রহণ করায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় অস্থায়ী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। মল্লিক মহাশয়ের মত সাধু ও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বে-সরকারী চেয়ারম্যান হওয়ায় সহরের লোকেরা আনন্দিত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় সুযোগ্য ব্যক্তি কিন্তু ধরা-বাঁধা নিয়মে যে সরকারী কর্ম্মচারীরাই এ পদে নিযুক্ত হইবেন, এ দেশের লোক তাহার বিরোধী। বর্ত্তমান নিয়োগ অস্থায়ী হইলেও আমরা নিয়ম-ভঙ্গে সুখী হইয়াছি।

* * *

এইচ্, জি, কটন—মাননীয় সাম্‌শুল হুদার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় শ্রীযুক্ত এইচ্, জি কটন বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। "কটন" নাম করিলে এ দেশের লোকে পরলোকগত ভারতসুহৃদ সার হেন্‌রী কটনকেই মনে করে। এ কটন, তাঁহারই পুত্র; পিতার মেদিনীপুর অবস্থানের সময়ে সেখানেই ইঁহার জন্ম হয়। একে জন্ম এদেশে, তাহে ইনিও ইঁহার পিতার মত ভারতসুহৃদ, তাই ইংরেজেরা তামাসা করিয়া ইঁহাকে এক সময়ে বাঙ্গালী বাবু বলিতেন। এদেশে বেরিষ্টারী করার পর ইনি বিলাতে ভারত-কংগ্রেস-সভায় অনেক কাজ করিয়াছেন, এবং বহুদিন লণ্ডনে কাউণ্টি কাউন্সিলের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বিশ্ব-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ ও ভারতের বন্ধু এবং ইঁহাকে পাইয়া আমরা আনন্দিত; তবুও নীতির মর্য্যাদার খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই সভাপতিত্বের কাজে দেশের লোককেই নিযুক্ত করা উচিত ছিল।

* * *

জাতীয় শিক্ষা সমিতি—লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গ বিভাগের সময় এই শিক্ষা সমিতির সৃষ্টি, এবং বিশেষভাবে পরলোকগত মহাত্মা সার রাস বিহারীর দানে ইহার পুষ্টি। সম্প্রতি এই সমিতি, কলিকাতার ৫ মাইল দক্ষিণে যাদবপুরে ৯৯ বৎসরের পাটায় এক শত বিঘা জমি লইয়াছেন, সেখানে ৫।৬ লক্ষ টাকার ব্যয়ে আপনাদের শিক্ষা-শালা গড়িবেন। আমরা এই সমিতির উন্নতি ও কর্ম্মের প্রসার কামনা করি।

* * *

ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতির মিণ্টো প্রফেসার এবং গত বৎসর অক্সফোর্ডে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেসের বৈঠকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এ দেশের একটি হিতৈষী দলের বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে ইনি খুব ছোট হইলেও, ইউরোপীয়েরা অক্সফোর্ডে ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন; তাই এবারে লীগ-অফ্-নেশনস্‌এর পরিচালকেরা ইঁহাকে পৃথিবীর পণ্ডিতদের দশ জন প্রতিনিধির মধ্যে একজন করিয়া লইয়াছেন। এই দশজন প্রতিনিধি জেনিভা

নগরে বিচার করিবেন যে, কি উপায়ে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও সাহচর্য্য স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব যে, ইহার অধ্যাপকেরা সুযোগ্য বলিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছেন। বিষের জ্বালায় এ দেশের দুই তিন জন সমালোচক যাহাই বলুন, দেশের বাহিরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও সম্মান আছে। সম্প্রতি সার দিন্‌শা ওয়াচার মত সুপণ্ডিত ও স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনার ও কর্ম্ম-গৌরবের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-দ্রোহী সমালোচকদের বিষের জ্বালা বাড়িবে। যাঁহারা প্রমথনাথের সুরচিত অর্থনীতি গ্রন্থকে প্রশংসা করেন নাই, তাঁহারা এখন নীরবে তাঁহার গৌরব উপেক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দশজনের একজন বলিয়া আদৃত হইলেন,—বাঙ্গালীর সম্মান বাড়িল,—ইহাই আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা।

* * *

ব্যয় সংক্ষেপ—দুর্ব্বোধ্য পণ্ডিতি ভাষার শব্দগুলি পেঁচাল ধরণে আওড়াইয়া দার্শনিকেরা যেমন কথাকে ঢাকিয়া ফেলেন, বিজ্ঞ রাষ্ট্রপরিচালকেরা যেন সেইরূপ জটিল অর্থনীতির কুটিল পন্থার আলোচনায় আমাদের মরণ-বাঁচনের কথাটি প্রচ্ছন্ন না করেন। মহাযুদ্ধের দিনের ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীময় হাহাকার বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বুঝিলেই আমাদের হাহাকার কমিবেনা,—প্রাণও বাঁচিবে না। বিদেশ বাণিজ্যের তত্ত্ব-কথা তুলিলে আমরা তর্কে হারিতে পারি, কিন্তু তাহাতে প্রত্যক্ষ পেটের ক্ষুধা যায় না; রাষ্ট্রনীতির হেঁয়ালি আওড়াইয়া যদি দিল্লী গড়িবার খেয়াল বজায় রাখা যায়, আর সৈন্য বিভাগের জন্য আয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক ৬৫ কোটি ব্যয় হয়, এবং অন্য পক্ষে যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার খরচে টানাটানি পড়ে ও উপার্জ্জন-শক্তির মূলের জ্ঞান-চর্চ্চায় টাকা না যোটে তবে বিদেশের পণ্যে ও সৈন্যে আমাদের দৈন্য ঘুচাইবে না। দিল্লীর কথায় বুঝিয়াছি যে প্রাণের চেয়ে মানের দায় অধিক। সৈন্যের কথা কিন্তু ভাল বুঝি নাই; কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে Young India পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, এদেশে আত্ম প্রতিষ্ঠার বোধ যত বাড়িবে, ততই পুলিস ও সৈন্য বাড়াইবার প্রয়োজন হইবে। সে গেল এক দিকের কথা। যুদ্ধ-কুশল ইংরাজেরাই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কাবুল যখন এখন বন্ধু, তখন সীমান্তের বর্ব্বরদিগকে তাহাদিগের জ্ঞাতিপ্রায় আফ্‌গানদের শাসনে ছাড়িয়া দিয়া সিন্ধুর তীরেই ভারতের সীমা বাঁধিলে চলিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের কথা চলিবে না; যে ফিস্‌কল কমিশনের রিপোর্ট অপেক্ষিত হইতেছে, তাহাতেও এ বিষয়ের ইঙ্গিতটুকুও থাকিতে পারে না। আগামী শীতে শ্রীযুক্ত লর্ড ইন্‌চকেপ আসিতেছেন; তাহার পরিচালিত কমিটিতে সকল কথার বিচার হইয়া ব্যয়সঙ্কোচের বন্দোবস্ত হইবে। লর্ড ইন্‌চকেপের নেতৃত্বে যে কমিটী হইবে, তাহার সদস্য হইবেন ছয় জন ব্যবসায়ী বড়লোক, এবং তাহার মধ্যে দেশী লোক থাকিবেন সার

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডি, এম্ দালাল ও শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস। লর্ড ইন্‌চকেপ্ ব্যবহারনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ও ধনী মহাজন। এই নীতিজ্ঞ পুরুষ কি বলিবেন জানি না এবং যাহা বলিবেন বা উপদেশ দিবেন, তাহাও গৃহীত হইবে কিনা, অথবা কত দিনে গৃহীত হইবে তাহাও জানিনা,। দেশের স্বাস্থ্য কিন্তু কালের মুখ চাহিয়া টিকিবে না; প্রাণ বাঁচাইবার অতি প্রয়োজনীয় টাকা ব্যয় না করিয়া অর্থনীতির ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করিলেও চলিবে না। বড় গরজে যদি সৈন্যের জন্য টাকা যোটে, তবে প্রাণের জন্য যুটিবে না কেন? খেয়াল এবং শত্রুর বৃথা আতঙ্ক আপাতক চাপিয়া রাখিলেই ত তত্ত্ব-মীমাংসা বিনাও প্রাণ বাঁচিতে পারে।

* * *

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামে মিথ্যা অভিযোগ—ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়াও দলাদলি সৃষ্টি করিতে পারিলে সুখী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর বিষের ঝাল ঝাড়িলে যে, নিজেদের হিতের গোড়ায় কুড়াল মারা হয়, তাহা কি শিক্ষিত লোককেও বুঝাইতে হইবে? অকাতর পরিশ্রমে যদি নিরন্তর মাসে দুইবার করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিন্দা প্রচার করা যায়, তবে কি বিদ্বেষ-বুদ্ধি সহজেই ধরা পড়ে না? এবারে Modern Review এ দেখিতেছি যে নিন্দাবাদের নূতন উপাদান না পাইয়া, মাসিক নিয়ম রক্ষার জন্য পাঁচ বৎসরের আগেকার একটি কথা তোলা হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে একটি ছাত্রকে অর্থ-নীতিতে কোনরূপে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করাইবার জন্য জোর করিয়া অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ কথার আলোচনা হইল না কেন? এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা, এবং এই মিথ্যা কথা অতি অপরাধ-জনক। প্রতিবাদ করিবার পর দোষ স্বীকার করিলে এ শ্রেণীর দোষ বা অপরাধ কাটে না; যে কোন কথা পরের কাছে শুনিয়া তাহা প্রচার করিলে অপরাধ-জনক অসতর্কতার দোষ ঘটে। মিথ্যা কথা ছাপিয়া প্রতিবাদ আহ্বান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ছলে ও কৌশলে নিন্দা রটনাই লেখকের উদ্দেশ্য। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধে আরও যেসকল কথা বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা; কিন্তু হঠাৎ অসতর্কতায় মানুষে সেরূপ মিথ্যা কথা হয়ত বা ছাপিতে পারে, কিন্তু প্রথমের উল্লিখিত মিথ্যার বেলায় এক তিলও কিছু বলা চলে না। ছাত্রটি পাশ করিবার পর Scottish Church College-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রায় এক বৎসরের পর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চাকুরী পান; তাঁহাকে কোনরূপে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করাইয়া টানিয়া আনিয়া অবিলম্বে চাকুরী দেওয়া হয় নাই। যে গুরু-প্রসন্ন বৃত্তি পাইয়া ছাত্রটি ইউরোপে যান, তিনি যে সে বৃত্তির অযোগ্য নহেন, এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে পাথেয় পাইতে পারেন, তাহা বৃত্তির সর্ত্ত-পত্র পড়িলেই জানা যায়; কিন্তু সমালোচনার আবেগে তাহা সমালোচকের চোখে পড়ে নাই। উক্ত বৃত্তিভোগীদের মধ্যে আর কেহ জাহাজ ভাড়া পায় নাই,

ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা; টাকায় কুলাইলে যাইবার সময়ে কেন, ফিরিবার সময়েও কৃতী ছাত্র পাথেয় পাইতে পারেন; এইরূপ ফিরিবার পাথেয়ও অন্যকে দেওয়া হইয়াছে। এই শেষ মিথ্যা কথাগুলিকেও উপেক্ষা করা চলে না, তবে প্রথমের উল্লিখিত ভীষণ মিথ্যা কথার কাছে এগুলি ছোট মিথ্যা কথা। নিন্দা করিবার জন্য খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া কথা তোলা যে বিদ্বেষ-বুদ্ধির ফলে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সীমা ছাড়াইয়া চলিতেছে বলিয়াই এই পচা কথা ঘাঁটিতে হইল; নহিলে এই বাদ প্রতিবাদের হীনকার্য্যে সময় নষ্ট করিতাম না।

পত্র লেখকের প্রতি

বৈশাখ মাসের কয়েকটী সম্পাদকীয় মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত গৌরমোহন রায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন; সেখানি সম্পূর্ণ ছাপিবার সুবিধা হইল না। জ্ঞানেই মুক্তি,—উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানচর্চ্চার বজায় না রাখিলে কল কারখানা বিকল হইয়া পড়ে, এ সকল কথা গৌরবাবু সম্পূর্ণ স্বীকার করেন; তবে তাঁহার কথা এই যে, ব্যবহারের উপযোগী কল কৌশল শিখিবার বিদ্যালয় এদেশে নাই বলিলেই চলে; কাজেই উহার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের একতিলও মতভেদ নাই; জ্ঞান-চর্চ্চা বন্ধ না রাখিয়া এই শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কারখানা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

গৌরবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য বিষয় ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন। আমাদের মন্তব্যের বিরোধী না হইলেও তিনি চাহেন যে, ছাত্রেরা ফুটবল খেলার মত অথবা সখের সৈন্য হইবার মত, সময় সময় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে মন দিয়া নিজেদের মনে হিতৈষণা জাগাইয়া রাখে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, হিতৈষণা জাগাইবার নানা ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু যাহাতে মন উত্তেজিত হয় এবং চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, তাহা করিতে নাই। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এমন নাই, যাহাতে আনন্দের খেলাধূলার মত কাজে লাগিয়া সেবাব্রতের জন্য শিক্ষা হইতে পারে।
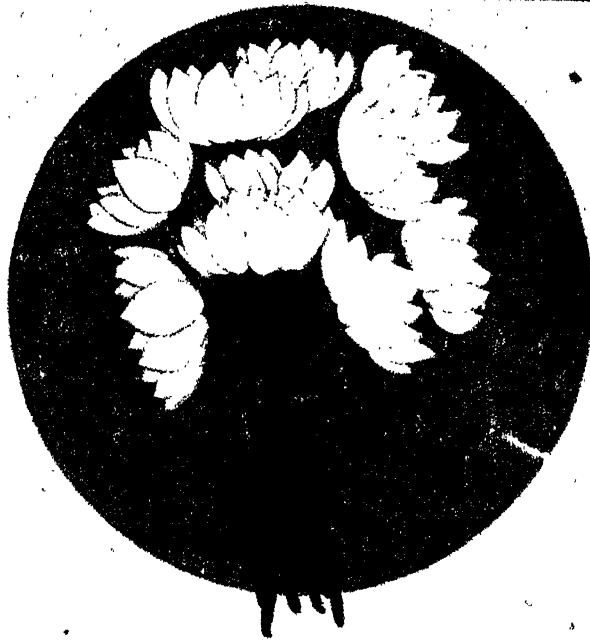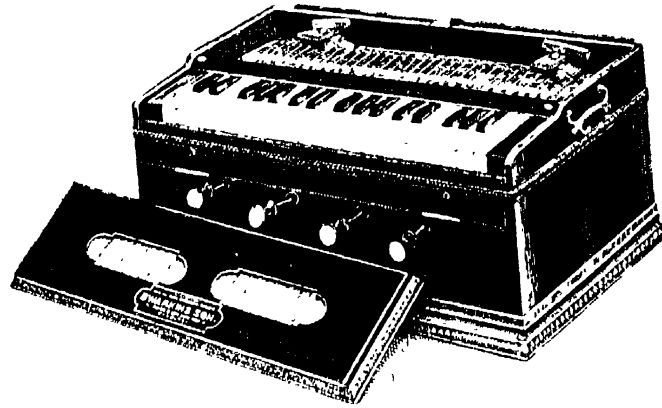
বঙ্গবাণী

C Roy

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

১ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিল্পের সচলতা ও অচলতা

ছবি কবিতা অভিনয় যাই বল সেটা চল্লো কিনা এই নিয়ে কথা। যে বীজের মধ্যে মাটি ঠেলে ওঠবার শক্তি না পৌঁছল সে বীজ ফল থেকে বেড়ে চলতে চলতে গাছ হতে চল্লোনা, কবির ভাষা ছবির ভাষা গায়ক নর্ত্তক অভিনেতা এদের ভাষার পক্ষেও ঐ কথা। যে ভাষা প্রয়োগ করছে সেই দেখছে মন দিয়ে লেখা তীরের মত সোজাসুজি চলে, কিন্তু অভিধান ইত্যাদি দিয়ে লেখা যতই ভারি করা যায় শক্ত করা যায় ততই সে কচ্ছপের মতো আস্তে চলে। অন্তরের শক্তি বীজকে ঠেলে নিয়ে চলে আলোর অভিমুখে রসাতল ভেদ করে, ভাষাকেও গতি দেয় পরিস্ফুটতার দিকে মানুষের অন্তর বা মনের গুণ! দুএকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি, মনের গুণ ভাষাতে গিয়ে পৌঁছয় এবং কাযও করে কতটা—মনে যেখানে ছবি কি ছাপ পরিষ্কার নেই সেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিন্যাস সমস্তের মধ্যে একটা আবল্য আলস্য অস্ফুটতা আমরা দেখতে পাই, কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথার মধ্যে যেন ঝোঁক নেই ঝিমিয়ে আছে আবল তাবল বকে চলেছে ভাষা!—প্রথম উদাহরণ—

'ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা।
ছল ছল চক্ষু ছাতি ফাটেগো বন্ধনে
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে।'

ভাষায় ত্বরা নেই ঝিমিয়ে চলেছে কেননা কবির মন এখানে 'ছ' অক্ষরের ফাঁকিটা লিখতে ছ-প্রমুখ বাক্যগুলোকে পটের সেফায়ের মতো খালি প্রতি ছত্রের গোড়াতে স্থিরভাবে দাঁড়াতে হুকুম করলেন, কাযেই কথাগুলো নড়াচড়া কিছুই করলে না কাঠের সেফাই কাঠ হয়ে ভাষার চলার পথ আগলে রইলো। খুব খানিক ঝোঁক দিয়ে এটা পড়ে যেতে চেষ্টা করলেই বুঝবে কতটা অচল এটা—। অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত রসের দেবতা হলেন ব্রহ্মা তাঁর পুরি বর্ণন হচ্ছে—

'কিবা মনোহর দেখিতে সুন্দর
শোভে ব্রহ্মপুর সবার উপর
কনক রচিত মৃত্তিকা শোভিত
পীযূষ-পূরিত স্থির সরোবর
কল্পতরু তায় কিবা শোভা পায়
ফল ধরে যায় ধর্ম্ম মোক্ষ আদি
পত্র পুষ্প তার ভক্তি তত্ত্ব সার
কেহ নাহি আর তাহাতে বিবাদি!'

মনের সমস্ত স্পর্শ ও সুরের সঙ্গে বিবাদ করে যেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নেই এমন ব্রহ্মালোক বর্ণন হল—যেন সাতপুকুরের বাগান বাড়ীর ফটোগ্রাফ, তাও আবার অনেকখানি ঝাপ্‌সা, একটু অদ্ভুতরস পাওয়া যায় শুধু যেখানে কল্পবৃক্ষে গাছের ডালে ধর্ম্ম মোক্ষ আর ভক্তি তত্ত্বের আম কাঁঠাল পেকে পেকে ঝুলছে! ভাষা চোস্ত হলে কি হয় কথাগুলোকে তীরের মতো চালিয়ে দেবে যে গুণ তারি পরশ ঘটলো না যে মোটেই কবিতাটায়!

খালি চোস্ত ভাষার দু একটা রূপবর্ণন শুনিয়ে দিই দেখ দেখি মনে গিয়ে পৌঁছয় কিনা—

"ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে
হরি অরি সন্নিধানে অলি রস পূরে বাণে
রমণী মুনির মন বান্ধে

খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়
কুম্ভীর নন্দন মূলে কশ্যপ নন্দন দোলে
মনমথ মনমথ তায়—"

মনে গিয়ে বাজলো না? আচ্ছা দেখ দেখি একটু মন দিয়ে—

"কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান
হেরইতে রূপ, সায়রে মম ডুবল,
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ।"

মনে ধরেও ধরছে না ! শব্দভেদী বাণে কিছু হল না, ব্রহ্মাস্ত্রেও নয়, আচ্ছা এইবার উপরো উপরি গোটা তিনেক শক্তিশেল ছাড়ি দেখি মনে পৌঁছয় কিনা ?—

" জিমুনা গো মুঞি জিমুনা—"

মন যে হরিণের মতো এগিয়ে আসছে ! তা হলে সুর সন্ধান করা যাক্ মন দিয়ে এইবারে—

" মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারু নই।"

এই্বার মন কি বলছে শুনতে পাচ্ছ কি ?

" রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।"

এইবার নিজের মনকে ফিরে ডাক এই উত্তর পাও কিনা বল—

" রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যউবনের বনে মন হারাইয়া গেল
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।"

মুখে বলে যাওয়া, আর মনের সঙ্গে বলে যাওয়া কথায় লেখায় চলায় ফেরায় অনেকখানি ধরণ ধারণ সমস্ত দিক দিয়েই যে তফাৎ হয় তা কে না বলবে। মন যে রচনাকে ফাঁকি দিয়ে গেল, তাকে খুব, সব জমকালো বাক্য মন্দ্র মধ্যম তার স্বর, অথবা রং চং ঢং ঢাং শব্দকোষ অলঙ্কার ব্যাকরণ ইত্যাদির কৃত্রিম উপায়গুলো দিয়ে খানিক চালানো যেতে পারে না যে তা নয়, কিন্তু রঙ্গীন কাগজের প্রস্তুত খেলানা প্রজাপতির মতো খানিক উড়েই ঝুপ করে পড়ে যায়। এই যে কবিতাটা হচ্ছে 'করুণাময়ীর গালবাদ্য' নাম শুনেই মনে হয় এতে অনেকখানি সুর তাল ইত্যাদি পাওয়া যাবে, কবিতাটা আরম্ভও হল ঐ ভাবে—'গালবাদ্য ঘন ঘন' কিন্তু এইটুকু বলেই কবি আন্-মন হলেন, বাক্য শক্তি হারালে, সুরের তার যেন পটাং করে ছিঁড়ে গেল, শোনো,—"গালবাদ্য ঘন ঘন সজল-লোচন !" কোথায় বাদ্য কোথায় কান্না অকারণে ! তার পর পতন ভূমিতে হঠাৎ— 'গালবাদ্য ঘন ঘন, সজল লোচন, প্রণাম যেমন বিধি', এখন 'গালবাদ্য' কবিতা এইভাবে মনের সঙ্গে বিযুক্ত শুধু কথার মার পেঁচ অভিধান অলঙ্কার নিয়ে কতটা কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠলো দেখ—

' গালবাদ্য ঘন ঘন সজল লোচন
প্রণাম যেমন বিধি
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসীদ শঙ্কর বেদবিদাম্বর
কৃপাময় গুণনিধি !'

এইবার সব ছেড়ে মনকে দিলেন কবি খালি শব্দ দিয়ে কিছু রচনা করতে, চমৎকার শব্দ দিলে ভাষা—

' মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।'

মনকে কবি চলতি ভাষার বাহনে চড়িয়ে ছেড়ে দিলেন ভাষা ঝড় বইয়ে চল্লো এবারেও—

' দশদিক অন্ধকার করিল মেঘগণ
দুনো হয়ে বহে উনো পঞ্চাশ পবন !'

পঞ্চাশ এই শব্দটা বাতাস ধূলো কাঁকর আর বৃষ্টির একটা ঝাপটা দিয়ে গেল, উনো দুনো শব্দ দুটো থেকে থেকে বাতাসের সুর শুনিয়ে গেল, তার পরে একেবারে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নাম্‌লো চেপে—

' ঝন্‌ঝনার ঝনঝনি বিদ্যুৎ চকমকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।'

যদি আর্টিস্টের মনের হাতে পড়ে চলিত ভাষাও বিনা সাধুভাষার সাহায্যেই এমন সুন্দরভাবে চলতে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না আর্টিষ্টের হাতে এই পটের ভাষা যে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না তা কেমন করে বলা যায়। জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুসাই এই পটের ভাষাতে যে চমৎকার চিত্রসব লিখে গেছেন তা আজকের ইউরোপ দেখে অবাক হচ্ছে! তাই বলি যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন মনের হাতে তার লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওয়া শক্ত। শব্দ সুর ছন্দ, বাক্য রূপ ইঙ্গিৎ-ভঙ্গি এরা ভাষাকে চালাবার মনকে বেঁধবার মহাস্ত্র বটে কিন্তু মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া তো চাই! ধর ক্ষুরধার ছেনি ও গুরুভার হাতুড়ি নিয়ে বসা গেল পাষাণের অক্ষরে লিখতে, কিন্তু তার পূর্ব্বে মন এঁচে নেয়নি কিছুই—বাটালী তেজে চল্লো হাতুড়ি মহাশব্দে দিলে আঘাত; ফল হল একটু পরে পাথর চূর্ণবিচূর্ণ হল, নয় তো পাথর থেকে বেরিয়ে এল মনের অনির্দ্দিষ্টতা ও শূন্যতা!

বায়ু যাঁর রূপ একেবারেই নেই—ধ্বনি আছে, পদ নেই কিন্তু পদক্ষেপের চিহ্ন যিনি রেখে যান, অঙ্গ যাঁর দেখি না কিন্তু স্পর্শ করেন যিনি শীতল বা উষ্ণ এই বায়ুকে রূপ দিয়ে নিরূপিত করা অন্যমনস্কভাবে তো যায় না! খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না, কিন্তু এই ক্রিয়াপদ ছবিতে মূর্ত্তিতে অভিনয়ে ঢের বেশি কায করে, কিন্তু এর সদ্ব্যবহার খুব পাকা আর্টিস্টের দ্বারাই সম্ভব। রাফেল প্রমুখ পুরোনো ইতালীর আর্টিস্টরা ছবিতে বায়ু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে—ছবির আকাশ-পটে গোটাকতক গালফুলো ছেলে ফুঁ দিয়ে ঝাঁটার মতো খানিক ঝড়, কি দক্ষিণ হাওয়া বয়ে দিচ্ছে এইটে আঁকতো, কিন্তু বায়ুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধরা না ধরা সমান, ওটা ছেলে মানুষি ছাড়া কিছু নয়! ভারত শিল্পের বায়ু দেবতার মূর্ত্তি তাও আমাদের ইন্দ্রচন্দ্র বরুণের মতোই ছেলে মানুষি পুতুল মাত্র। একই মূর্ত্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নাই! দেবমূর্ত্তিগুলো তেত্রিশ কোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গীতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মূদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য্য! একই দেবীমূর্ত্তি মকরে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসিয়ে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপ কল্পনার মধ্যে যে রকম রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীক মূর্ত্তি আপোলো, ভিনাস্, জুপিটার, জুনো ইত্যাদি মূর্ত্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্ত্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ জল আর বাতাস দুটো এক নয় দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না! এ পর্য্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এই মূর্ত্তির একটা ছাঁচ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি—গ্রীক দেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে—ছবি দেখে বুঝবে না মূর্ত্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো! এই যাঁর রূপ নেই অথচ ক্রিয়া আছে কথার ভাষায় সেই বায়ুকে, দেবতাকে ক্রিয়া দিয়ে রূপ দিতে চেয়ে ঋষির মন যেমনি উদ্যত হল বুক ফুলিয়ে, বাতাসের দুর্দ্দমনীয় গতি পৌঁছল অমনি ভাষায় সে কতখানি তা ঋষির ভাষার অত্যন্ত বিশ্রী তর্জ্জমাতেও ধরা পড়ে—"রথের ন্যায় যে বায়ু বেগে ধাবিত হন তাঁহাকে আমি বর্ণন করি, বজ্রধ্বনির ন্যায় ইহার আরাব ইনি বৃক্ষ সমূহ ভগ্ন করিতে করিতে আসেন, ইনি দিক্ বিদিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে শূন্য পথে গমনাগমন করেন, ধরণীর ধূলি বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিয়া যান, পর্ব্বতাদি যে কিছু স্থির পদার্থ তাহারা বায়ূর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে এবং ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে!" যুদ্ধের ঘোড়ার গতি নিয়ে কবি কালিদাসেরও মনের ভাষা বা'র হয়েছিল। বর্ষা বর্ণনে——

"সশীকরাম্ভোধর মত্ত কুঞ্জর সড়িৎ পতাকোঽশনি শব্দ মর্দ্দলঃ
সমাগতো রাজবতুদ্ধতদ্যুতি র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥"

এই মনের উদ্দাম গতি বাংলা ভাষাকেও তেজে চালিয়ে নিলে—

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে,
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীরা সরসা ॥'

সারথির মানস রাশের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছয় তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিৎ ও ভাষার মধ্যে গিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়ক বা নর্ত্তকের ভাষা যে ভাষাই হোক।" "The art of painting (নিরূপণ ও বর্ণন শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts—বাচন করা চলে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে, যেমন মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালিটারও লোভ আছে কন্যাকে 'শ্যামাঙ্গী' বলে বাচন করা গেল, কিন্তু তুলনায় বর্ণন কর্‌তে হলে মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক! কথার যেটুকু বা বাচন করবার ফাঁক আছে, ছবির তাও নেই হুবহু বর্ণন নয় মিথ্যা বর্ণন দুই রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নাই, ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রংটার বেলায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্তু পারে না সত্যি বল্‌তেই হয়, মনকে ছবিতে ধরবার বেলায়, এই জন্যই বলা হ'ল—it is an unimpeachable witness to the moral state of the painter at the moment when he held the brush (শতং বদ মা লিখ) all the shades of his nature even to the lapses of his sensibility all this is told by the painter's work as clearly as if he were telling it in our ears!" (Fromentin.)

হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বালালেও আগুন ধরে না, আলো যেখানে নেই রূপ সেখানে থেকেও নেই, তেমনি মন যেখানে নেই, কথা সেখানে থেকেও নেই, মনে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতায় নাট্যে! মন কার নেই কিন্তু মনের কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা যার তার নেই এটা ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও মনঃসংযোগ দিয়ে লিখছে সে মন এক, আর সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে যাত্রা জুড়েছে, কি মাঠে বসে মন দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে সে মন অন্য প্রকার! তেমনি সাধারণ মন, আর রসায়িত মন, কবির মন আর্টিষ্টের মন আর তাদের হুঁকোবরদারের মন ও মনের আবেগে তফাৎ আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে

লিখে কিম্বা বলে কয়ে চল্লেই কবি চিত্রকার অভিনেতা হয় তা নয়। অভিনেতা যদি অত্যন্ত মনের আবেগে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীনের মতো রুদ্রমূর্ত্তিতে বেরিয়ে সত্যিই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গলা কেটে বসে তবে তাকে নট বল্‌বে, না পাগল মূর্খ এসব সম্বোধন করবে দর্শকরা! কিম্বা দর্শকদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের নাচে মুগ্ধ হয়ে কেউ যদি হঠাৎ কোমর বেঁধে নানা অঙ্গভঙ্গী মনের আবেগে সুরু করে দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে ডাকে কেউ! অভিনেত্রী বেশ তাল লয় সুর দিয়ে কেঁদে চলেছে হঠাৎ উপরের বক্স থেকে আবেগভরে ছেলে কাঁদা ও ঘুমপাড়ানো সুরু হ'ল তার বেলায় শ্রোতারা ধম্‌কে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে, মনের আবেগ তো যথেষ্ট সেখানে ভাষায় প্রকাশ হচ্ছিল কিন্তু আর্ট বলে তো চল্লোনা সেটা! তবেই দেখ শিল্পের অনুকূল মনের পরশ আর তার প্রতিকূল এই দুরকম মনের পরশ রয়েছ। মালি যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের তোড়া ফুলের হার গাঁথে শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেই ভাবে কায করে যায় বাক্য রং রেখা ভঙ্গী ইত্যাদিকে ভাবের সূত্রে ধরে ধরে! নিছক আবেগের উচ্ছৃঙ্খলা আছে, সংযম নির্ব্বাচন এসব নেই। ছেলে কাঁদার ঠিক উল্টো যে পাকা নটীর কান্নার সুর, কৃত্রিম সুরে হলেও সেটা মনোরম হয় শিল্পীর বর্ণনভঙ্গি নির্ব্বাচন ইত্যাদি নিয়ে। বাষ্পের মতো শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর যে লেখাই বল শিল্প বলে যে চলেনা তার নমুনা এই——

'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে, এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে!
শ্যাম কেশ পক্ক হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছুদিনে,
লোল চর্ম্ম কদাকার কফ কাশ দুর্নিবার, হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে!'

এর জুড়ি মূর্ত্তি কতকটা সেই গান্ধারের কঙ্কাল সার বুদ্ধ! জীবনকে কুশ্রী আর দীনতা দিয়ে যে শিল্পী নয় কবিও নয় তার ভাষা বিকট রকমে বীভৎস রূপে দেখালো! যাকে বলে— inartistic reality তাই, এইবার যিনি কবি তিনি কি সুন্দর করে বল্লেন ঐ কথাটাই দেখ এও reality কিন্তু কুশ্রী নয় artistic reality যাকে বলে তাই—

"মন তুমি কি রঙ্গে আছ, ভোলা মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ,
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ঘোরা ফেরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ!
রং এর বেলা রাং এর কড়ি, সোণার দরে তাও কিনেছ
দুখের বেলা রতন মাণিক মাটির দরে তাও বেচেছ
সুখের ঘরে রূপের বাসা সেরূপে মন মজে আছ
যখন সেরূপ হইবে বিরূপ, সেরূপের কি রূপ ভেবেছ!"

"...There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital essence of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion." —(R. G. Hatton)

কাঁচা অভিনেতা Realismর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে তর্জন গর্জন করে যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চলে আর পাকা অভিনেতা শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে যায় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে ! এইজন্যই ঋষিরা বলেছেন বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কর বা 'কায়েন মনসা বাচা' ছবি লেখ কথা বল অভিনয় কর সাফল্য লাভ করতে বিলম্ব হবে না। কথা তো বলতে পারে সবাই, চলেও সবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে অনেকে কিন্তু ভাষাকে পায় না সবাই—"যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দরপরিচ্ছদধারিণী ভার্য্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন তদ্রূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।" বাগ্দেবীর দেহ মন অতি বিচিত্র ভাষা সমস্ত নিয়ে যার কাছে অপ্রকাশিত রইল হাজার খানা Nude studyতে তার কি ফল হবে ? লজ্জার আবরণ ছেড়ে দিয়ে আধুনিক Nude ছবির ভাষা আর পাথরের অন্তঃপুর ছেড়ে নিরাবরণ নিরাভরণ বেরিয়ে এসেছিল গ্রীক ও ভারত শিল্পীর সেই দেবীর মতো অনবগুণ্ঠিতা সুন্দরী যে ভাষা দুয়ের কতখানি তফাৎ হয়েছে reality আর ideality নিয়ে বুঝে দেখ! ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। তাঁরা বলেন—কথা বল কবিতা বল উপকথা বল তার তো স্বতন্ত্র রাস্তা, art বর্ণমালার পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিম্বা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য্য ও তার অনুভূতির রাস্তাতে চালানোই ঠিক ! একথা মানতেম যদি রূপের জগতে এমন বিশেষ্য পদার্থ একটা থাকতো যে নির্ব্বাক নিশ্চল। বিন্দু সে বলে আমি চোখের জল, শিশির ফোটা, কত কি ! মৃত্যু সেও বলে আমি এই দেখ চলেছি আর ফিরবো না, গভীর সান্ত্বনা আমি, নিদারুণ আমি, সকরুণ আমি ! ফুলের সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কথা না কইতো তবে কি তারা মানুষের মনে ধরতো ? নির্ব্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে—আমি বলতে পারছিনে মন কি করছে ! অবোধ যারা তারাই কেবল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত আর্টের কল্পনাজাল বুনে বুনে নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকার মতো বদ্ধ করে রাখতে চায়। শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দ-কাকলী, আনন্দের দোলা—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ"

মহাশূন্য তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে। বাক্যকে ছেড়ে চলতে পারে কি, বেদের বাগ্দেবীর উক্তি কি মহিমা নিয়ে অভ্রভেদী একটি মূর্ত্তির মতো আপনাকে প্রকাশ করেছে দেখ—

"আদিত্যগণ বিশ্বদেবতাগণ রুদ্রগণ এবং বসুগণের সহিত আমি বিচরণ করিতেছি। মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বীদ্বয়কে আমি ধারণ করি ॥১॥ প্রস্তরাঘাত হইতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহাকে, তষ্টাকে পুষণকে ভগকে আমি ধারণ করি।......যজ্ঞোপযোগী উপকরণ সমূহের মধ্যে প্রথমা আমি।...এতাদৃশা আমাকে দেবতারা নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অপরিমেয় আমার আশ্রয় স্থানে; তাবৎ প্রাণিগণের মধ্যে আমি আবিষ্ট আছি।......যিনি দর্শন করেন প্রাণ ধারণ করেন কথা শ্রবণ করেন—তিনি আমারি সহায়তাতে সেই সকল কার্য্য করেন......আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি......আমি আকাশকে প্রসব করিয়াছি......সমুদ্রের জলের মধ্যে আমার স্থান সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। আমিই তাবৎ ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই আমার মহিমা বৃহৎ হইয়া দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে—॥"

বিরাট এই বিশ্বচরাচর, যার বাণী বিশাল, অতি বৃহৎ যার রূপ তার এই মূর্ত্তি! অতি পুরাতন ইজীপ্তের ভাস্কর কঠিন প্রস্তরে যে বিরাটত্ব আর বিশালতা দিয়ে আপনার দেব দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করেছে তারি তুল্য মূল্য শিল্প এই স্তোত্র রচনার ভাস্বর ভাষা দিয়ে ধরা রয়েছে। এর পাশে রঙ্গীন রাংতা জড়ানো পাকাটির বীণা হাতে আমাদের এখনকার খেলার সরস্বতীর মূর্ত্তিটি ধরে দেখ কিম্বা একটা তুলসীমঞ্চে উপরে সাজানো শ্বেত পাথরের এতটুকু ভিনাস্ মূর্ত্তিকেও ধরে দেখ মূর্ত্তি শিল্পের ভাষা হিমালয়ের উর্দ্ধ থেকে উইটিবিতে এসে পড়ে কিনা। চটক্ এবং চাকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটার উপভোগের অনিত্যতার উপরে, কিম্বা ক্ষণিক শ্রুতিসুখ দৃষ্টিসুখ ইত্যাদির উপরে শিল্প রচনার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়া হয় আকাশ থেকে রসাতলে যেমন—

............রূপ নিরুপম সোহিনী।
শারদ পার্ব্বণ—বিধু বরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী।
কুঞ্জর গামিনী কুঞ্জ বিলাসিনী লোচন খঞ্জন গঞ্জিনী।
কোকিল নাদিনী, গীঃ পরিবাদিনী হ্রী পরিবাদ বিধায়িনী।
ভারত মানস মানস সারস, রাস বিনোদ বিধায়িনী!

এর থেকে আর একটুখানি নামলেই কেবল সুরসার বাক্য রেখা রং ইত্যাদি দিয়ে মনের চোখে কানে সুড়সুড়ি দেওয়া—

'নাহি তালবোধ ভাল, নিত্য ধ্বংস কারক
চিত্ত মর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম, মর্ম্ম বোধ জারক।'

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের তপস্যালব্ধ জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে তখন যুগ যুগান্তরের তপস্যা দিয়ে কত মহৎ জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ থেকে স্বার্থকতার আনন্দ দিয়ে

লাভ করা ভাষা সমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয় ছয় করে খেলা করবে তার বাধা কি ? শিল্পরূপিনী সুন্দরী ভাষাকে পেতে তপস্যার দুঃখ আছে "Art interprets the mightier speech of nature. It is a poetical language, for it is an utterance of the imagination addressed to the imagination and to rouse emotion."—(Gilbert)

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা, অরূপের ইঙ্গিৎ ও রূপ দর্শন করার যে ভাষা, নিশ্চল নির্ব্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে। ভাষা যখন তপোবনের ঋষিদের তপস্যার সামগ্রী তখন তাঁরা যে কোন দুর্ভেদ্যতার দুর্গ থেকে বাণীকে জয় করে এনেছিলেন তা তাঁরা জানিয়ে গেছেন—"সোমরস নিপীড়ন করিতে করিতে এই প্রস্তর সকল কথা কহুক, আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা বলিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও...ইহারা শব্দ করিতেছে...ইহাদের শব্দে পৃথিবী ধ্বনিত হইতেছে...ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে...তৃণভূমিতে কৃষ্ণসার হরিণেরা যেন চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে ...সোমরস নিপীড়ন কালে প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে যেন ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়াসক্ত শিশুরা জননীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোলাহল করিতেছে। ভাষার তপস্যায় বলীয়ান মানুষ পাথরের কারাগার গেকে বার করে নিয়ে এল যে ভাষাকে চির সুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী—তারি চতুঃষষ্টি ধারা হল—কথা, ছবি, মূর্ত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলা বিদ্যা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চির-চেনা

(গান)

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে।
লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে সুর-সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে॥

ফাগুন-মাঠে শীষ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায়-ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে, চায় ইসারায় অস্তাচলের প্রাসাদ মিনারে।
আমি কাঁদি, এইত আমার চির-চেনা রে॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ

(১)

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে যখন প্রথম 'বন্দে-মাতরম্' কার্য্যালয়ে আসি তখন অরবিন্দ বাবু ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। তাঁহার সম্বন্ধে বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতে অনেক গল্পই শুনিয়াছিলাম। বরোদায় ৮০০ টাকা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া তিনি ১৫০ টাকা বেতনে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমি বিস্ময়ে একটা এ-ত বড় হাঁ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ঐ টাকায় তাঁহার সংসার খরচ কি করিয়া চলিবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে মা, বোন, ভাই প্রভৃতি সকলকে মাসিক খরচ দিয়াও তাঁহার নিজের জন্য ১০ টাকা বাকি থাকে। বস্ আবার কি চাই?

তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ত্যাগের কথা শুনিয়া ত আগে হইতেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তাহার পর তাঁহার লেখা পড়িয়া একেবারে কাৎ হইয়া পড়িলাম। উঃ, সে কি ভাষা!—যেন আরবী ঘোড়ার জুড়ী একেবারে বুকের উপর দিয়া বগ্ বগ্ করিয়া ছুটিয়াছে! পড়িতে পড়িতে মনে একটা অদ্ভুত রকমের নেশা জমিয়া উঠিত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভারি কৌতূহল হইত। দেশ বিদেশের জানা অজানা সমস্ত বড়লোকের ছবি মিলাইয়া মনে মনে তাঁহার একটা ছবিও আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন অফিসে গিয়া শুনিলাম কংগ্রেস উপলক্ষে অরবিন্দ বাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন; আর শুধু তাই নয়—পাশের ঘরে তিনি সশরীরে বর্ত্তমান! বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে গিয়া দরজার কাছে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—কৈ, কোথায় অরবিন্দ? আমার একজন সহকর্ম্মী কোণের এক চেয়ারে উপবিষ্ট কাঠের মত আড়ষ্ট একটি মূর্ত্তির দিকে দেখাইয়া দিলেন।

ব্যোম ভোলানাথ! এই অরবিন্দ! মা ধরিত্রি, দ্বিধা হও, মা। ঐ রোগা, কালো, সিড়িঙ্গে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট প্রাণী—ঐ অরবিন্দ? ঐ আমাদের Chief? তার চেয়ে শ্যামসুন্দর বাবু ত ছিলেন ভাল। তিনি বেঁটে বটেন, তবু তাঁহার বেশ প্রমাণসই দাড়ী আছে। হেমেন্দ্র বাবুরও বেশ গোলগাল নধর ভদ্রলোকের মত চেহারা। কিন্তু এ কি!

মনটা প্রায় দমিয়া গিয়াছিল, এমন সময় সেই কাষ্ঠমূর্ত্তি ঘুরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। সে চাহনির যে কি বিশেষণ দিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কালো তারার আশেপাশে একটা কৌতুকপ্রিয় তরলতা মাখান ছিল, কিন্তু ঐ তারার মাঝখানে এমন একটা কি অতলস্পর্শ ভাব ছিল যাহা আজও বিশ্লেষণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বছর কতক আগে আমরা কয়জন বন্ধু মিলিয়া একবার বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের কাছে মাথা দেখাইতে গিয়াছিলাম। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু আমার মাথার গঠন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে লোকের মুখ দেখিয়া তাহাদের চরিত্র অনুমান করিবার ক্ষমতা আমার অসাধারণ। সেই অবধি আমার মনে মনে বেশ একটু গুমর ছিল যে লোক দেখিয়া চিনিয়া লইবার আমি একজন ওস্তাদ। কিন্তু আজ অরবিন্দ বাবুর কাছে আমার সে ওস্তাদি ব্যর্থ হইল।

কাহারও কাহারও ভিতরের কথা যেন মুখের উপর লেখা থাকে। ১৮৯৮ সালে বেলুড়মঠে একবার স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম। তখন আমি বঙ্গবাসীর দলের খাঁটী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। স্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মিতার কথা কাগজে পড়িয়াছিলাম; আমেরিকায় তাঁহার দিগ্বিজয়ের কথা ভাবিয়া যথেষ্ট গর্ব্বও অনুভব করিতাম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যখন কলিকাতার বক্তৃতায় বাংলার ব্রাহ্মণদের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মনে মনে তাঁহার উপর বেশ একটু চটিয়াছিলাম। বেলুড় মঠে যখন তাঁহাকে প্রথমে দেখিলাম, তখন তাঁহার পায়ে মোজা ও জুতা ও হাতে থেলো হুঁকা। একে সন্ন্যাসী জাতিতে কায়স্থ, আবার তাহার উপর এই অশাস্ত্রীয় পোষাক! কাজেই ব্রাহ্মণ-সুলভ রাগে আমার টিকিটা বিদ্রোহের পতাকার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ভেদ করিয়া এ জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে ভগবানের স্বহস্তপ্রদত্ত রাজটীকা ইঁহার ললাটে দেদীপ্যমান। দিব্য প্রতিভা ইঁহার মুখে, চোখে, কথায় বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

অরবিন্দের মুখে তেমন রাজশ্রী তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। অরবিন্দ বর্ণচোরা আম; বাহির দেখিয়া তাঁহার ভিতর বুঝিবার জো নাই।

(২)

১৯০৭ সালের বসন্তকালে তিনি দেওঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাকাপাকিভাবে 'বন্দে মাতরমের' ভার লইলেন। আলাদা বাসা আর করা হইল না; তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ বাবুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ঘর সংসার করা আর তাঁহার অদৃষ্টে জুটিল না।

আগে 'বন্দে মাতরম্' অফিসের কেহ নিয়ম বা শৃঙ্খলার বড় একটা ধার ধারিতেন না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শ্যামসুন্দর বাবু লিখিতেন; কিন্তু প্রবন্ধ লিখিবার inspiration তাঁহার উপর কখন যে ভর করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। একদিন হয়ত এক কাপ চা খাইতে না খাইতেই inspiration আসিয়া গেল; আর কোন কোন দিন বা চায়ের উপর তিন চার ছিলিম তামাক পোড়াইয়াও inspiration আসিল না! কাজে কাজেই প্রিণ্টার বেচারার সময় মত কাগজ বাহির করা কঠিন হইয়া পড়িত। অরবিন্দ বাবু আসিবার পর সে দুঃখ ঘুচিল। তিনি সুবোধ বাবুর বাড়ী হইতেই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অফিসে বড় একটা আসিতেন না, আর আসিলেও

কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহিতেন না। একে তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী লোক; তাহার উপর বাংলা-চল্‌তি ভাষার উপর খুব বেশী দখল ছিল না বলিয়া বোধ হয় সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধাও তাঁহার হইত না। তাঁহার বাংলা উচ্চারণ অনেকটা সাহেবী ধরণের ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার আড়ালে খুব হাসাহাসি করিতাম। কিন্তু চল্‌তি ভাষার উপর দখল না থাকিলেও তিনি সাধুভাষা বেশ লিখিতে পারিতেন।

তাঁহার মত এমন অসাধারণ একাগ্রচিত্ত লোক আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সুবোধ বাবুর বাড়ীতে লোক জনের ভিড় প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। কেহ গল্প জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ অট্টহাস্য করিতেছে, কেহ বা তর্ক লাগাইয়াছে; আর তাহাদের মাঝখানে বসিয়া তিনি নির্ব্বিকার ভাবে লিখিতেছেন বা পড়িতেছেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

রাশভারি লোক বলিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীরা তাঁহাকে ভয়ও করিত, ভক্তিও করিত। তাঁহার কথার কোনরূপ প্রতিবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কাজকর্ম্মের কোনরূপ গোলমাল দেখিলে বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন; আর যখন খুব বেশী রাগিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার ঠোঁট একটু একটু কাঁপিত। তাঁহার আশপাশের লোকেরা সেই সময় প্রমাদ গণিত।

বিনয় বাবু নামে আমাদের একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন। একাধারে এত গুণ এই কলিযুগে খুব কম লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। সুবোধ বাবুর স্ত্রী যখন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন, তখন এই বিনয় বাবুটী তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। একে যক্ষ্মারোগ, তাহার উপর বিনয় বাবুর চিকিৎসা, সুতরাং রোগী অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া রোগ ও চিকিৎসার দায় এড়াইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিনয় বাবু কথকতা করিয়া, য়্যাকটিং শুনাইয়া ও সং দেখাইয়া বাড়ীর বৃদ্ধামহলে এমনি পশার জমাইয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহাকে একটা কোন কাজকর্ম্ম দিয়া আটকাইয়া রাখিবার জন্য নানাস্থান হইতে সুপারিশ আসিতে লাগিল। কাজেই তিনি 'বন্দে মাতরম্' আফিসের একজন Maid-of-all-work হইয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রে প্রুফ দেখিবার ভার একদিন তাঁহার উপর পড়িল। অরবিন্দ বাবুর প্রবন্ধের মধ্যে একটা কথা ছিল—churchianity। বিনয় বাবু বেচারা churchianityর ধার ধারেন না; কাজেই তিনি নিঃসংশয়চিত্তে ঐ লম্বা চৌড়া কথাটাকে কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দিলেন—christianity, সকাল বেলা কাগজ পড়িয়াই অরবিন্দ বাবু দেখিলেন কোন্ পণ্ডিত তাঁহার লেখার উপর কলম চালাইয়াছে। খোঁজ করিয়া দেখা গেল যে ঐ সংশোধন কার্য্যটা শ্রীমান বিনয় বাবুর কৃত। অরবিন্দ বাবুর এজলাসে তাঁহার ডাক পড়িল। বিনয় বাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"কি করবো, মশাই! দোষ আমার নয়; দোষ ইউনিভার্সিটির। আমি এক গাদা বই পড়ে বি, এ পাশ করেছি,

কিন্তু কোথাও churchianity কথাটার দেখা পাই নি"।—বক্তৃতাটা আরও কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। হঠাৎ অরবিন্দ বাবুর ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। বিনয় বাবু বেগতিক দেখিয়া প্রাণ লইয়া সেখান হইতে চোঁচা দৌড় দিলেন।

(৩)

কথাবার্ত্তায় ও মেজাজে অনেকটা সাহেবী ধরণের হইলেও পোষাক-পরিচ্ছদে ও আচার-ব্যবহারে অরবিন্দ একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মত। ধুতি চাদর ও চটিজুতাই তাঁহার সম্বল ছিল। ঘরের আসবাবের মধ্যে শুইবার একখানি খাট ও টেবিলের উপর ছড়ান একগাদা বই। কোনরূপ বাবুয়ানি তাঁহার ভিতর দেখি নাই। পয়সা কড়ির দিকে নজর কস্মিন্ কালেও ছিল না। বরোদায় থাকিবার সময় একবার হঠাৎ বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে প্রায় দুই হাজার টাকা জমিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে টাকাটা খরচ হইয়া গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বস্তি বোধ করেন নাই।

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার কিনা জানি না, কিন্তু সাহেবিয়ানার মধ্যে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও হিঁদুয়ানীর উপর তাহার খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল। বরোদায় থাকিবার সময় কে একজন সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার উপর রাজকোপ হইবে; এবং তাহা খণ্ডনের জন্য তাঁহাকে সোণার বগলামূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতে বলিয়াছিলেন। অরবিন্দ বাবু সেই অবধি বহুদিন পর্য্যন্ত এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলামন্ত্র জপ করিতেন। টেবিলের প্রেত নামান, প্ল্যানচেট্ ধরা ও Automatic writing করার বাতিকও অরবিন্দ বাবুর খুব প্রবল ছিল। ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার মতামত শুনিয়া অনেক সময় তাঁহাকে শিশুর মত সরলবিশ্বাসী বলিয়া মনে হইত।

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পথে বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ও তাঁহার নিকট হইতে অরবিন্দ বাবু দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সুবোধ বাবুর বাড়ী ছাড়িয়া আলাদা বাসায় বাস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম সাধনায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল। অফিসে তাঁহার সহকারীদের উপর হুকুম দিলেন—'কাগজে কাহাকেও গালি দিতে পারিবে না।' হেমেন্দ্র বাবু ত হুকুম শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। খবরের কাগজ হইতে যদি গালাগালিটুকুই বাদ গেল তাহা হইলে আর বাকি রহিল কি?

সাধনের জন্য এই সময় অরবিন্দ বাবু আহারাদি বিষয়ে কঠোর সংযম অভ্যাস করিতেন। নুন, লঙ্কা ত নিষিদ্ধই ছিল; ভাতের সঙ্গে ডাল বা তরকারী পর্য্যন্ত খাইতেন না। ভাত, দুধ ও ফলমূল খাইবার ব্যবস্থা ছিল; তবে অধিকাংশ দিনই দুধ জুটিত না। দেশে একটা প্রবল ধর্ম্মভাব না জাগিলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সফল হইবে না, এই মতবাদ তিনি এই সময় হইতে প্রচার করিতে

আরম্ভ করেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া অরবিন্দ বাবু জেলে একদিন বলিয়াছিলেন—"ভগবান আমায় জেলে নিয়ে এসে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। চারদিকের টানাটানিতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম। বাইরে একদিকে টানছিল ন্যাশনাল কলেজ, আর একদিকে টানছিল 'বন্দে মাতরম', আর ভিতরে একদিকে টানছিল বারীন, আর একদিকে টানছিল বৌ। জেলে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।"

তাঁহার জীবনের গতি এই সময় হইতে নূতন দিকে ফিরিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুষ্ক-মরু

(১)

কলিকাতার একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাতে সেদিন বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। বাড়ীটি আগাগোড়া সাহেবী ধরণে সাজান; গৃহকর্ত্তা কর্ত্রী ও সমাগত অতিথিদিগের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, এমন কি চলাফেরাও ইউরোপীয় অনুকরণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেই সান্ধ্যসম্মিলনের প্রাণশূন্য গান, আনন্দশূন্য হাসি ও আন্তরিকতাশূন্য মিষ্টকথার ছড়াছড়ির মধ্যে বাণীর প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। যেখানে কয়েকটি নবীন ব্যারিষ্টার তাহার স্বামীকে ঘিরিয়া জটলা পাকাইয়া বসিয়াছিল, সেদিকে অগ্রসর হইয়া বাণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাড়ী গেলে হয় না? আমার মাথাটা বড় ধরেছে।" তাহার স্বামী,—হাইকোর্টের তখনকার 'বার'-এর উজ্জ্বল নক্ষত্র, মিঃ বসু,—দাঁতে সিগারেটটি চাপিয়া বলিলেন,—"তা বেশ, চল। যাই গাড়ীটার খোঁজ করিগে।" অমনি নবীন ব্যারিষ্টারবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, এখনি যাবেন কি!" একজন বলিলেন,—"মিসেস্ বসু, আপনার গান শুনব বলে আমরা এতক্ষণ আশা করে আছি।" বাণী অধরপ্রান্তে একটু জোর-করা-হাসি আনিয়া বলিল,—"গান শোনার ভাবনা কি? আর একদিন শুনবেন এখন। বল্লুম যে আজ মাথা ধরেছে।" ইহার উপর প্রতিবাদ চলিল না। মিঃ বসু গাড়ী ডাকিতে একজন বেয়ারাকে আদেশ দিলেন, আর বাণী ততক্ষণ সকলের কাছে বিদায় চাহিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে একটি মিষ্ট কলহাস্যের সঙ্গে "হাসি" নামটি তাহার কাণের কাছে উচ্চারিত হইতেই বাণী ফিরিয়া দেখিল তাহার বন্ধু লীলা তাহাকে ডাকিতেছে। বাণীর হাসি

ও কণ্ঠস্বরে তৎক্ষণাৎ যেন প্রাণসঞ্চার হইল। সে লীলার হাত জোরে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কবে বিলাত থেকে ফিরলি? তোর স্বামী কই?" লীলা একটু সলজ্জে হাসিয়া পাশের সৌম্যমূর্ত্তি, সহাস্যমুখ ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ইনি আমার স্বামী।—ওগো এই আমার বন্ধু হাসি।" বাণী নমস্কার করিয়া বলিল, "হাসি নয় বাণী।" লীলা উত্তর দিল "আমাদের কাছে স্কুলের নামটাই বাহাল রাখতে হবে।" বাণী তখন তাহার স্বামীর সঙ্গে লীলা ও তাহার স্বামী ডাক্তার বিনয় সেনের পরিচয় করাইয়া দিল। পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হইতেই বেয়ারা আসিয়া খবর দিল মিঃ বসুর গাড়ী প্রস্তুত। বাণী লীলাকে কাছে টানিয়া বলিল, "কবে আমাদের বাড়ী যাবি?" লীলা বলিল. "তুই যেদিন একলা বাড়ী থাক্‌বি।" বাণী বলিল,—"কালই যাস্ তাহলে। আর তোর খোকাকেও নিয়ে যাস্। অবিশ্যি ডাঃ সেনও যাবেন।" লীলা ও বিনয় সম্মতি জানাইল। বাণী স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডোটির এককোণে বসিয়া বাণী ভারি শ্রান্তভাবে চক্ষু মুদিল। মিঃ বসু অপর প্রান্তে বসিয়া অনবরত ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা সহর হইতে বালিগঞ্জ অনেকটা দূর ত,—ধূমপান বিনা সে পথের দৈর্ঘ্য আরও অধিক বোধ হইবে যে! সবে একবৎসর বিবাহিত দম্পতি নির্জ্জনেও পরস্পরকে কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইলেন না, একথায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, এমন কি বাণী নিজেও একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল যে বলিবার কোন কিছুই নাই। যাহোক্, তাহার ভাবিবার অনেক ছিল, তাই সে চোখ বুঁজিয়া অতীতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তার বালাই তাহার ছিল না। জীবনের সব ঘটনা-পরম্পরা তাহার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত ভাসিয়া চলিল।

(২)

প্রথম মনে পড়িল তাহার স্নেহময় পিতার কথা,—যিনি তাহার শৈশবে মায়ের অভাব বুঝিতে দেন নাই। যিনি একাধারে তাহার পিতা-মাতা-ভাই-বোন-বন্ধু সব ছিলেন। মাতৃহীনা বাণীকে তিনি যেমন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত। বাণীর স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রভাকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তিনি কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। মানুষের ইচ্ছা, সুযোগ ও অর্থের একত্র সমন্বয় হইলে কোন্ সাধটাই বা অপূর্ণ থাকে? বাণীর মানসিক উন্নতিকল্পে তাহার পিতা অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। নবনব জ্ঞানলাভ ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাণী কি অপূর্ব্ব আনন্দের অধিকারিণী হইত, সেই সকলের স্মৃতি আজ তাহাকে সুখের পরিবর্ত্তে পীড়া দিতে লাগিল। সে ভাবিল অজ্ঞ থাকিলেই ছিল ভাল,—তাহা হইলে বেশ অন্ধের মত পথ চলা যাইত। সুখদুঃখের অনুভূতি বুঝি তাহা হইলে এত প্রবল হইত না।

তাহার পর চোখের সাম্‌নে আর একখানি ছবি ভাসিয়া উঠিল,—সেখানি তাহার পাঠ্যাবস্থার। সে চিত্রখানি স্নেহপ্রীতির বিচিত্র বর্ণ সমাবেশে ও সাফল্যের উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত হইয়া অন্ধকার প্রাণের এককোণে যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। স্কুলে শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তাহার নাম ছিল—"আনন্দপ্রতিমা,"—বন্ধুরা ডাকিত "হাসি"। সে যেমন সকলের প্রিয় ছিল এমনটি কেহই ছিল না। তার সে সময়ের জীবন ছিল যেন সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল খরতোয়া নির্ঝরিণীর মত। তাহার হাসি ও কথার বিরাম ছিল না, আর ঠিক্ নদীটির মতই সে কঠিন উপলকেও আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। তাই কত কঠিন হৃদয় বালিকাকেও সে জয় করিয়াছিল। তাহার প্রীতির উচ্ছ্বাসে সে তাহার দুই পাশে কেবল কমনীয়তা ও মধুরতাই সৃজন করিত। সেই ছবির মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হইয়া জাগিতেছিল লীলার মুখখানি। লীলার মত বন্ধু বাণীর কেহ ছিল না। লীলা কিন্তু চিরকালই একটু চুপ্‌চাপ্ ও আত্মগোপনপ্রয়াসী। তাহাকে আবিষ্কার করার বাহাদুরি সবটুকুই বাণীর।

লীলার যখন বিনয়ের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল, সেদিনকার কথাগুলি আজও বাণীর পরিষ্কার মনে আছে। লীলা স্কুলে আসিয়া বাণীর গলা জড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, "হাসি, জানিস্ আমার বিয়ে।" বাণী তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "দূর! এতদিন তাহলে বলিস্ নি যে?" লীলা বলিল, "আগে ত জানতাম না।" বাণী অবজ্ঞার স্বরে বলিল,—"তোর বাপ্-মা ঠিক্ করেছেন বুঝি, এত লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হয়েছে? সে তোকে ভালবাসে কি না তার খোঁজ নেই, বিয়ের নামে অমনি নেচে উঠ্‌লি?" লীলা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ভাল না বাসেন ত আমায় বিয়ে করতে চাইবেন কেন? তিনিই নাকি চেয়েছেন। আমার ত এমন রূপগুণ নেই যে না ভালবেসেও তারই জোরে কেউ বিয়ে করবে?" বাণী উত্তর করিল, "তোর বুদ্ধি কোনকালেই খুল্‌বে না। দুদিন পরীক্ষাই করে দেখ্ কতটা ভালবাসে,—তুই 'না' বল্‌লেও সে তোর অপেক্ষায় থাকে কি না তাই দেখ্। আমার ত মনে হয় সে তাহলে অপেক্ষা না করে চট্ করে অন্য বিয়ে করে বস্‌বে। বিয়ে করতে হবেই বলে একটা বিয়ে করা, এর কি কোন মূল্য আছে?" লীলা এবার অভিমান করিল,—বলিল, "আমি অত পারব না ভাই। 'না' বলাটলা আমার দ্বারা হবে না। বাবা, মা, দাদাদের সব মত যে অমন ছেলে হয় না। আর আমিও তাঁকে দেখে বুঝেছি যে তাঁর স্ত্রী হওয়া পরম সৌভাগ্য।" বলিতে বলিতে লজ্জার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া লীলা মুখ ঢাকিল। বাণী আর কিছু বলিল না।

লীলার বিবাহের সময় বাণী তাহার পিতার সহিত শিম্‌লায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিল, তাই বিনয়কে দেখা ঘটে নাই। বিবাহের পরেই বিনয় বিলাতে গিয়া ডাক্তারি ডিগ্রি লইবে কথা হইল। যাইবার সময় সে লীলাকে সঙ্গে লইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন আপত্তি করিলে বলিয়াছিল, যে দেশে আমি গেলে আমার উন্নতির সম্ভাবনা আছে, সেখানে লীলা মেয়ে মানুষ

বলেই কি তার যাওয়ার আপত্তি? আমার সহধর্ম্মিণীকে আমার ইচ্ছামত গড়তে চাই তাই সঙ্গে নিয়ে যাব। বিনয়ের এই কথাগুলি বাণীর কাণে পৌঁছিলে, সে বুঝিল লীলা অপাত্রে আত্ম-সমর্পণ করে নাই। এমন দৃঢ়চেতা পুরুষকে স্বামীরূপে পাওয়া নেহাৎ দুর্ভাগ্য নয়। আজ লীলা ও বিনয়কে একত্র দেখিয়া সে বুঝিল, যে, পাঁচবৎসর বিবাহিত জীবন তাহাদের নিকট যে নিত্য-নব সুখের উৎস খুলিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিনয়ের স্নেহকোমল ও প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে লীলার দিকে চাওয়া ও লীলার বিষাদ রেখাশূন্য সরলতা ও আন্তরিকতা হইতেই তাহাদের আনন্দময় জীবনের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

(৩)

লীলার বিবাহের পরই বাণীর অনেক পাণিপ্রার্থী জুটিল। বাণী তাহাদের কাহাকেও আমল দিত না। সে সঙ্গিনীদের নিকট বলিত,—"বাবার অনেক টাকা, আর আমিও ত দেখ্‌তে নেহাৎ কুৎসিত নই, তাই ওরা আমায় বিয়ে করতে ব্যস্ত। আমি অত বোকা নই। সবাইকেই 'না' বলি, দেখি কে বেশীদিন টিঁকে থাকে।" বন্ধুরা তাহাকে পাগল ঠাওরাইত। সত্য সত্যই অনেক যুবক বাণীর মোহ কাটাইয়া ক্রমে ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল। তখন বাণী হাসিয়া বলিত,—"আমি আগেই জান্‌তাম! একমাস যাদের প্রেম স্থায়ী নয়, তারা চায় চিরজীবনের সঙ্গী হতে!" সকলে গেল,—রহিলেন কেবল ব্যারিষ্টার মিঃ বসু।

ইঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া থাক্‌। ইনি রূপবান, বিদ্বান, ধনবান। নূতন ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়াও অধ্যবসায়ের বলে খুব দ্রুত উন্নতি করিতেছিলেন। প্রত্যেক বাধাকে অতিক্রম করিয়া জয়ী হওয়ার প্রবল একটা বাসনা ইঁহার স্বভাবের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। ইঁহাকে জামাতারূপে পাইবার জন্য Reformed Hindu ও ব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি রূপ, গুণ, ধন ও বিদ্যায় বাণী ছাড়া কাহাকেও নিজের উপযুক্ত দেখিলেন না। বাণীর প্রত্যাখ্যান ইঁহাকে আরও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। তিনচার বৎসরের একনিষ্ঠতায় বাণীর হৃদয় জয় করিলেন। বন্ধুরা বাণীর আত্মসমর্পণে মহা আনন্দিত হইল, ও তাহাকে মহাসৌভাগ্যবতী মনে করিল। বাণীও আপনাকে এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী জানিয়া প্রতিদানে নিঃসঙ্কোচে হৃদয় প্রাণ অর্পণ করিল। সেদিন তাহার কি আনন্দ! ভবিষ্যতের মোহন চিত্র কল্পনায় দর্শন করিয়া কি তাহার উন্মাদনা! লীলাকে সব বিবরণ দিয়া পত্র লিখিল। তাহাতে লিখিল,—"তুই চোখ বুঁজে অন্ধকার হাতড়ে হঠাৎ রত্ন পেয়ে গেছিস্‌ বটে, কিন্তু অমন অবস্থায় প্রায় লোকে মাটির ঢেলাই তোলে। আমি *নিজের মত নিজের ওপর খাটিয়ে একটুও ঠকি নি।* আমার আজ কি আনন্দ কি বল্‌ব। *কারণ এঁকে এত ভাল লাগ্‌ত যে* ভয় হত পাছে ইনিও চলে যান। আজ আমার সব সার্থক।

তুই কাছে থাক্‌লে কতকটা বুঝতিস্।" লীলার উত্তর আসিল, "হাসির হাসি কল্পনার চক্ষে দেখেই সুখী হচ্ছি। তোর চিঠির ছত্রে ছত্রে মিঃ বসুর যে বর্ণনাটি ফুটে উঠেছে তা পড়ে বেশ বুঝতে পারছি, তুই প্রেমে একেবারে অন্ধ! চোখ খুলে পরীক্ষা করবার মত তোর শক্তি থাক্‌লে ত? যাক্, ঠাট্টা নয়—মিঃ বসু যে জহুরী সন্দেহ নাই,—তা না হলে এমন রত্নটি চিনে নিয়ে গলায় পরেন। তোদের সুখের জন্য আমাদের দুজনের প্রাণ থেকে নিরন্তর প্রার্থনা উঠ্‌ছে।"

ইহার পরই বাণীর মানসপটে একটি শোকান্ধকারময় চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তাহার বিবাহের একমাস পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই আঘাতের সময় স্বামীর নিকট যতটা, স্নেহপ্রলেপ পাইবে ভাবিয়াছিল, ততটা তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। তিনি বিষয়কর্ম্ম টাকাকড়ির ব্যবস্থায় এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, বাণীর ব্যথিত প্রাণকে সান্ত্বনা দিতে অধিক সময় পাইতেন না।

সেই সময় স্বামীর চরিত্রের একটা অন্ধকার দিক্ বাণীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়াতে সে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইল। ঘটনাটি এই যে—তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় কন্যা জামাতাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ত আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী। আমি ভেবেছিলাম আমার বন্ধুপুত্র চারুকে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে তার শিক্ষার ও উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করে দেব। আমার সময় হল না। তোমরা তার জন্য এইটুকু করো। তাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ, কিন্তু তার বাপের কাছে আমি অচ্ছেদ্য স্নেহঋণে আবদ্ধ ছিলাম।"

পিতার মৃত্যুর শোক কিছু সামলাইয়া বাণী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল যে চারুর জন্য কি করা যায়। স্বামী সাহায্যের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া বলিলেন,—"গরীবকে সাহায্য করতে গেলে ওর চেয়ে যোগ্যপাত্র আরও ঢের আছে।" বাণী ব্যথিতভাবে বলিল, "গরীব বলে ত নয়। আমাদেরও টাকার অভাব নেই, আর বাবারও শেষ ইচ্ছা।" মিঃ বসু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"মরবার সময় মানুষের কি মাথার ঠিক্ থাকে! আমার ত ইচ্ছা নয় যাকে তাকে দিয়ে টাকাগুলো নষ্ট করা।" স্বামীত্বের অধিকার ফলাইয়া মিঃ বসু সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। বাণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। আপনার ঠিক্ অবস্থাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল বাপের কথা যেমন করিয়া হোক্ রাখিবে। তাহার নিজের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল তাহা হইতে পাঁচ হাজার তুলিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। বলিল,—"চারুদা, বাবার শেষ ইচ্ছাটুকু আমায় পালন করতে দাও। এটা আমার দান বলে নিওনা,—বাবার স্নেহের চিহ্ন।' চারু ফিরাইতে পারিল না। বলিল, "বোন্, তোমার টাকার অসদ্ব্যবহার আমি করব না। তবে এই কথাটুকু তুমিও আমার রেখো যে যদি কোনদিন ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার হয়, তখন দিলে তুমি গ্রহণ করবে। এ টাকা আমার ঋণস্বরূপই থাক্। স্নেহের ঋণ ত কোন দিন

শুধতে পারবই না।” চারু এই টাকায় বিলাতে গিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে লাগিল। টাকা দেওয়ার কথাটা অবশ্য বাণী স্বামীকে গোপন করিল না; কিন্তু ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ খানিকটা অশান্তির সৃষ্টি হইল।

অজেয়কে জয় করবার ইচ্ছাই যে মিঃ বসুকে চারিবৎসর ধরিয়া দৃঢ় ও একনিষ্ঠ রাখিয়াছিল, সে কথা বুঝিতে বাণীর বেশি দেরি হইল না। জয়ের পর মিঃ বসুর অবসাদ আসিল। তিনি চারিবৎসরের প্রেমাভিনয় ভুলিয়া দুদিনেই ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়িলেন। নিজেকে প্রেমিক ভাবিতে তাঁহার লজ্জা করিতে লাগিল। কাজেই তিনি এখন ছেলেমানুষি ও কবিত্ব ছাড়িয়া কাজে মন দিলেন। বাণীর বয়সও যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। কোথায় গেল তাহার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হাসি গান, কোথায় বা গেল তাহার কবিত্ব ও কল্পনা! কঠিন বাস্তবের আঘাতে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সরলা সংসার-অনভিজ্ঞা বাণীও সমাজের দশজনের মত অভিনয় করিতে শিখিল। বাহিরের লোকে তাহার স্বামীর যশ, বিদ্যাবুদ্ধির কথা তুলিয়া তাহাকে সর্ব্বদা মনে করাইয়া দিত যে, অদৃষ্ট দেবতা তাহার উপর একটু অসাধারণ রকমেই প্রসন্ন। সেও বাহিরে তেমনই ভাব দেখাইত। স্বামীর প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা হারাইয়া তাহার মনে হইল যে শ্রদ্ধার আসন ভিন্ন বুঝি বা প্রেম দেবতার বসিবার ঠাঁই হয় না। শূন্য হৃদয়ের ব্যর্থ আশঙ্কা মনেই চাপিয়া সে দিন কাটাইতে লাগিল; অনেকটা অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল;—আজ আবার লীলাকে দেখিয়া সমস্ত অতীতটুকু ও সেই অতীতের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ কল্পনাগুলি ছিল, সে সব তাহাকে একেবারে উন্মনা করিয়া তুলিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—“বিধাতা, কি অপরাধে আমার বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ সব, তোমার কলমের একটানে এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে?” গাড়ীর অন্ধকার কোণে তাহার চোখের জল পড়িলেও মিঃ বসু লক্ষ্য করিতেন না; কিন্তু দুঃখার সম্বল চোখের জলও বাণীর ছিল না,—সব যেন তপ্ত বাতাসে শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে আবার বলিল, “বুদ্ধির বড়াই ছিল বলেই দর্পহারী ভগবান দর্পচূর্ণ করলে বুঝি?”

গাড়ী এবার বালিগঞ্জের বাড়ীতে ঢুকিল। মিঃ বসু সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকু ফেলিয়া হাত ধরিয়া বাণীকে নামাইলেন। বাণীর প্রতি বাহিরের ব্যবহারে তাঁহার এতটুকু ত্রুটি ছিল না। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় মিঃ বসু বলিলেন,—“বাণী, আমাদের নূতন বাড়ীটা প্রায় তৈরী হয়ে এল। তোমায় শীঘ্রই দেখাতে নিয়ে যাব। বাড়ীটার একটা নাম রাখলে হয় না? তোমার ত খুব কবিত্ব আছে, একটা নাম ঠিক্ করে ফেলো দেখি।” বাণী ধীরে ধীরে উদাসকণ্ঠে বলিল, “শুষ্ক মরু।” মিঃ বসু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া নীরবে নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীসুনীতি দেবী

বাঙ্গালী

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী
অন্যের মুখ চাওয়া
অন্নের কাঙালী ?
তিরাই-এর জঙ্গলে, বিপাসার বুকে সে,
বর্ম্মার তেলকলে, মেঘনার মুখে সে,
পেশোয়ারে তার-ঘরে, কুমারীতে কেরাণী,
কোয়েটায় ধূলি খায়, কি কঠিন পরাণই।
গুজরাটে ডাকবাবু, লুণ্ডীতে পোদ্দার,
চিত্রালে দেনদার—নাই তার উদ্ধার।
ইরাবতী পাড়ি দেয় কাবেরীতে সাঁতারে
নর্ম্মদা মর্ম্মরে রাজকাজ হাতাড়ে।

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী
অন্যের মুখ চাওয়া
অন্নের কাঙালী ?
যব্‌দ্বীপ সিংহলে দাসখত লিখেছে
ভোগ করা ভুলে গিয়ে যোগ করা শিখেছে।
অসিতে সে বড় নয় বড় বটে মসীতে
আর গুণ না থাকুক পারে গুণ কষিতে।
খাইবারে রেল যাবে পেতে পারে চাক্‌রী
পিণ্ডিতে পড়ে আছে কালীবাড়ী আঁক্‌ড়ি
মরিসাসে ভূমি চষে চা'র গাছ আগলে
মিস্‌মির সাথে ফেরে খাতা করি বগলে।

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী
অন্যের মুখ চাওয়া
অন্নের কাঙালী ?
কোথা মেসাপোটামিয়া, বোগদাদ কোথা রে
সিন্ধ্‌বাদ বাঙলার সেইখানে উতারে।
ট্রিনিডাড্ কাছে আজ, কাছে আজ কেনিয়া
বাঙ্গলার ছেলে আজ বেঙ্ককে বেনিয়া।

সুয়েজের গুদামেতে রাত দিন যাপে সে,
জাম্বেজি তীরে ঘোরে জরিপের আফিসে,
পিরামিডে উঠে, ছুটে আল্‌পের উপরে
অরোরার দেশে ভ্রমে রাতি দিন দু'পরে।

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী ?
ধন্য সে গণ্য সে
আর নয় কাঙালী।
কাজ করে বাতিঘরে, মাছ ধরে ডোঙ্গাতে
খেদাতে খেদায় হাতী, বাস করে টোঙ্গাতে।
লড়ে গিয়া ব্রেজিলেতে পড়ে গিয়া জাপানে,
মার্ণে সে গোলা দাগে, চড়ে উড়ো ঝাঁপানে।
পরিখার মাঝে তার আছে হাড় ছড়ানো
রাইনের বুকে আছে, ভুলে গেছে ডরানো।
মিশে আছে পিষে আছে নেটালের খনিতে
শোণিতের দাগ তার আছে নীলামণিতে।

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী ?
ধন্য সে গণ্য সে
আর নয় কাঙালী।
পশ্চিম পূজা দেয় আজি তার রবিকে,
ভাণ্ডাল হুন গথ পূজে তার কবিকে
গুণী তার কথা কয় তরু সনে আড়ালে
ডাকে তায় সাড়া দেয় বুনো বনচাঁড়ালে।
দর্শনে বিজ্ঞানে খাটো নয় কিছুতে
আগে তার চলে যারা পড়ে রবে পিছুতে।
সেই মহামানবের বন্ধন খসাবে
প্রেমে মহাকুম্ভের মেলা সেই বসাবে।

কোথা নাই কোথা নাই
ঘর মুখো বাঙ্গালী ?
ধন্য সে গণ্য সে
আর নয় কাঙালী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বরাজ-সাধনা

লক্ষ্যের চেয়ে পথটাই যদি দেশের সমস্ত মন-প্রাণকে পেয়ে বসে তা' হলে যে সমস্যা দেখা দেয়, আজ আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌লে স্বরাজলাভ সম্ভব হ'তে পারে, লক্ষ্ণৌ সহরে দেশ-সেবকদের বৈঠকে এই নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। যতটুকু খবর পাওয়া গেল তা' পড়ে মনে হয়েছে যে, দেশটা রাজনৈতিক মুক্তির পথটাও যেন খুঁজে পেতে নিতে চায় না; চায় কাটা ছাঁটা একটি নিয়ম (Formulae)—একটি অব্যর্থ উপায়,—যার প্রয়োগমাত্র স্বাধীনতালাভ সহজ-সাধ্য হবে। সহজ উপায়ে মুক্তির প্রয়াসী বলে' আমরা এ ক্ষেত্রেও গুরু খুঁজে বেড়াই, আর যদি গুরু ক্ষণকালের জন্যও চোখের আড়াল হ'ন্, তখন তাঁর মুখের কথাকেই সার কথা জেনে আমরা স্বাধীনচিন্তার প্রয়োজনও বোধ করিনে। বৈঠক স্থির করেছেন, ভারতবর্ষের মুক্তির মন্ত্র হচ্চে 'খদ্দর', অতএব এই মন্ত্রবীজটি ছড়ানই হচ্চে এখন কাজ।

জেলখানাকে 'স্বরাজ-আশ্রম' নাম দিয়ে যারা জেলে ঢুকে ছিলেন, আজ তাদের দল এক এক করে বেরিয়ে আস্‌ছেন। তারা বাইরে এসে দেখেন,—উত্তেজনা থেমে গেছে, যে-সব বৃহৎ আয়োজনের পত্তন করা হবে এমন আশা ছিল তার কিছুই বিশেষ করা হয়নি। সমস্ত দেশটা যেন আবার ঝিমুচ্চে, আর তাকে সচেতন রাখ্‌বার জন্য একদল কর্ম্মী থেকে থেকে চীৎকার করে' উঠ্‌ছেন "খদ্দর পর"

তারপর, স্বরাজলাভের এই বীজটি কি ভাবে বিস্তৃত হচ্চে, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি এমন কোনো আয়োজনই হচ্চেনা যা'তে বর্ত্তমানকালের ব্যবসাবাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা টিকে থাক্‌তে পারি। আমরা জোট বেঁধে কাজে হাত দিতে পারিনি। এখানে সেখানে দু'দশটা তাঁত চালিয়ে এক বিরাট বস্ত্র-ব্যবসার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে পারব এমন কল্পনা করে' যদি আমরা স্বরাজপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় বসে' থাকি, তবে জান্‌ব আমাদের অদৃষ্টে আরো দুঃখ আছে। কুটিরজাত শিল্পের উন্নতি সাধন করে' দেশের অর্থশক্তি বৃদ্ধি না করলে আমরা প্রবলের সঙ্গে লড়বার শক্তি অর্জ্জন করতে পারব না, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি সাধনের পথ আবিষ্কারের জন্য কি প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা আজ বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে প্রযোজ্য? আজ আমাদের ঘর ও বাহির সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের সাম্‌নে উন্মুক্ত। যদি এর গতি রোধ করতে হয়, তবে তার আয়োজনও বর্ত্তমান কালোপযোগী হওয়া চাই।

কিন্তু খদ্দর চালনা যেমনভাবে হওয়া দরকার, তেমন করে' হচ্চেনা,— আমি কেবল এই 'সমস্যার কথা উল্লেখ করে' খেদ করছিনে। আমার মনে হয় আমরা লক্ষ্যটাকে দেশের সাম্‌নে ধরতে পারছিনে। যতক্ষণ না লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট হবে, যতক্ষণ না আমাদের চিত্ত সুপ্তির জড়তা থেকে মুক্তি পাবে, ততক্ষণ বাহিরের কোনো আয়োজনই সফল হতে পারে না।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক স্বদেশসেবক কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। কি কাজে কোন প্রণালী অবলম্বন করে' তারা দেশসেবাব্রতে ব্রতী হ'তে পারেন এই হচ্চে এখন সমস্যা। উত্তেজনার মুখে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে তারা এখন যেখানে এসে ঠেকেছেন, সেখানে আর থাকা চলেনা। অতএব এইবার দেশের যুবকদের সাম্‌নে দেশকে গড়ে তোল্‌বার মাল মসলা এনে দিয়ে বল্‌তে হবে, "পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে, বর্ত্তমান কালের সকল অবস্থার গতি কোন্ দিকে তার হিসাব মনে রেখে, তোমরা দেশসেবার প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করে নাও।"

কিন্তু মুস্কিল এই, যে-দেশের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আটঘাট বাঁধা নিয়মকানুনের ইঙ্গিতে চলে, সে-দেশে পথ আবিষ্কার করার প্রস্তাবটা হেঁয়ালির মতন মনে হয়। আমরা হয় গুরু, না হয় সংহিতা, না হয় শাস্ত্র —এমন একটা কিছু অবলম্বন না করে' চল্‌তে পারিনে। এই অভ্যাস মজ্জাগত হ'য়ে উঠেছে বলে' মুখে স্বাধীনতার কথা যত জোরেই বলিনা কেন, পথ চলার বেলা বলি "ওগো, কে আছ দেশনায়ক, আমাদের চালিয়ে নাও।"

যদি ভারতবর্ষ যথার্থ মুক্তি-প্রয়াসী হ'য়ে থাকে, তবে এই অভ্যাসের বন্ধন সর্ব্বপ্রথমে ছিন্ন করা প্রয়োজন। যে সমস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থা বাল্যকাল হ'তে আমাদের মনোবৃত্তির স্বাধীনতা প্রকাশের পথ সঙ্কীর্ণ করে দেয়, যে-শিক্ষা স্বাধীন চিন্তার উৎসকে বন্ধ করে' আমাদের চিত্তকে নানা জালে জড়িয়ে রাখে, সবার আগে তার বিস্তার ও আধিপত্য বন্ধ করতে হবে। এ-কথা মনে রাখা দরকার, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক হিসাবে কোনো একটা জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আছে বা ছিল, কেবলমাত্র এই সত্যটুকু নিয়ে গৌরব করবার কিছু নেই। আজ পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষকে সম্মানের আসন পেতে হ'লে এই পরিচয়টাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে, জীবনী-শক্তির প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন বহু জীর্ণ-সংস্কারের মূল আমরা উচ্ছেদ করেছি এবং আজ আমরা এমন কিছু গড়ব না, যে ব্যবস্থামধ্যে মানুষের চিত্ত স্বাধীনভাবে বিকশিত হ'তে না পারে। এইজন্য আমি মনে করি আমাদের পরিবারের ও সমাজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেখানে যদি মানুষের চিত্তকে পঙ্গু করে দেওয়া হয় তবে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ হাতে তুলে দিলেও আমরা স্বাধীন হ'তে পারব না।

অনেকের মুখে শুন্‌তে পাই, দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার জন্য যথার্থ স্পৃহা জেগেছে ; কেউ কেউ বলেন নিম্নস্তরেও নাকি এই উদ্দীপনা পৌঁছেছে। কথাটা একেবারে অস্বীকার করবার জো নেই ;

কিন্তু দেশে যে স্বাজাত্যবোধের (National sense-এর) লক্ষণ দেখা দিয়েছে আমরা তার স্বরূপ যেন ভাল করে' বুঝে লই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, পাঞ্জাবের নির্য্যাতন, খিলাফতের প্রাণসংহার প্রভৃতি অন্যায় অবিচার থেকে এই স্বাজাত্যবোধের জন্ম, এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে হয় ত কেবলমাত্র এই বোধের দ্বারা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি সংগৃহীত না হতেও পারে। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবার শক্তি (Protest) আর স্বাজাত্য-বোধ এই দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আসল কথা, প্রতিবাদের উত্তেজনায় আমরা কাঠ খড় পুড়িয়ে দেউলে হ'য়ে বস্‌লে পাকা ভীত গাঁথবার সুযোগ হারাব। শক্তির কেন্দ্র গড়ে না উঠ্‌লে, কি করে মেনে নেব যে এই অপমানিত লাঞ্ছিত দেশে যথার্থ স্বাজাত্যবোধ জেগেছে ? দেশের অন্তরাত্মায় এই বোধ স্পর্শ করলে আমাদের ঘর, সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি এমন প্রাণময় হ'য়ে উঠ্‌বে যে তখন জীবনীশক্তির স্বাভাবিক নিয়মে আমরা মুক্তির সন্ধান পাবই। তারপর, স্বদেশ, স্বরাজ, যা' কিছু আমাদের নিজস্ব আমরা ফিরে পাব, সন্দেহ নাই।

অতএব বাঙ্গলা দেশে যারা দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তাদের কাছে নিবেদন করছি, গোড়াপত্তনের কাজে তারা মন দিন্। বাঁধিবুলি আউড়িয়ে বা রাজনৈতিক উত্তেজনার আবেগে শক্তির অপচয় করে কোনো ফল নেই।

বর্ত্তমান আন্দোলন বদ্ধ-জীবনপ্রবাহে যদি একটু নাড়া দিয়ে থাকে, ক্রমে এ'তে গতি সঞ্চার করবার সময় এসেছে। তাই বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আবার বড় এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেশের কাজে নাম্‌তে হবে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতার মাঝখানে জাতীয়-জীবনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে বলার সাধনাই হচ্চে আমাদের একমাত্র কাজ। এই জন্য জাতীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া চাই; যে-সকল বিধিব্যবস্থা এই জীবনের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, তা' জোর করে, ছিন্ন করা চাই; তারপর, আমাদের সামাজিক আত্মার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাবে। তখন এই শক্তিই হবে স্বরাজের প্রাণ।

এই কথা মনে রেখে আমরা একবার ঘরের দিকে তাকাই; একবার নিজের গাঁয়ে গিয়ে বাস করি; দেখে আসি পনের আনা দেশবাসী কি অবস্থায় আছে; দেখে আসি পল্লীসমাজের জীর্ণাবস্থা; খোঁজ নিয়ে জানি, পল্লীবাসীর উপর কে কি-ভাবে জুলুম করছে। গাঁয়ের জমিদার কে, কোথায় থাকেন,—জেনে সহরে এসে একবার তার সঙ্গেও দেখা করি। একবার ভূস্বামীর নায়েবের বৈঠকখানায় যাই; তারই বৈঠকখানায় হয় ত পুরোহিত ঠাকুর, মহাজন, ও দারোগা মহাশয়দের দেখা পাব,—তাদের সঙ্গে দেশের কথা আলোচনা করি। তারপর, নিজের ঘরে ফিরে এসে একবার সমস্ত অবস্থা বিশ্লেষণ করে' শান্ত-সমাহিতচিত্তে ভাবি, এই দুর্গতির প্রতীকার কি ?

তারপর ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মার্কিণে চারিমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে আমি মার্কিণের জাতীয় মাদকতা নিবারণী সভার--National Temperance Societyর পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্যই আমেরিকায় যাই। সে সময়ে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ না পাইলে আমার আমেরিকা দেখিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিলে ইহাঁদের এই নিমন্ত্রণ একটা সৌভাগ্যের কথাই ছিল। কিন্তু ইঁহাদের সম্পর্কে আমেরিকায় গিয়াছিলাম বলিয়া ইঁহাদের সংসর্গে বা সাহায্যে মার্কিণ সমাজের উচ্চতর স্তরের এমন কি বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধা ঘটে নাই। মাদকতা নিবারণী সভার কর্ত্তৃপক্ষ এবং পৃষ্ঠপোষকেরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত গোঁড়া খৃষ্টীয়ান, ধর্ম্মাভিমান এবং বর্ণাভিমান ইঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। আমেরিকাকে এই শ্রেণীর লোকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া মনে করে; এবং এশিয়ার কথাই ত নাই, য়ুরোপকে পর্য্যন্ত স্বল্পবিস্তর হেয় জ্ঞান করে। ইঁহাদের মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণের প্রতি একটা গভীর এবং দুরারোগ্য ঘৃণার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে উদার দৃষ্টি মার্কিণ সভ্যতার একটা অতি প্রধান লক্ষণ এই সকল লোকের মধ্যে তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে নিউইয়র্কে যাইয়া প্রথমে আমি এই সকল লোকের মাঝখানেই পড়িয়া গেলাম। নিউইয়র্কের সমাজের উচ্চতর স্তরের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনও বিশেষ অবসর পাইলাম না। তবে আমার হোটেলে মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত ও উদারমতি মার্কিণীয়দিগের সর্ব্বদাই গতিবিধি ছিল। এই সূত্রেই আমি মার্কিণ সমাজের ও সভ্যতার অন্যান্য দিকের স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

ন্যাশনাল্ টেম্পারেন্স সোসাইটীর সঙ্গে আমার বক্তৃতার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাঁহারা সপ্তাহে চারিদিন মাত্র আমাকে তাঁহাদের কাজে লাগাইতে পারিবেন, শনি রবি সোম, এই তিনদিন আমি অন্যকর্ম্ম করিতে পারিব, এই কথা ছিল। এই তিনদিন আমি আমেরিকার Unitarian (য়্যুনিটেরিয়ান) দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিব, এই কল্পনা করিয়াই এই ব্যবস্থা করি। আর ক্রমে য়্যুনিটেরিয়ানদিগের নিকট হইতেও নিমন্ত্রণ পাইতে আরম্ভ করি। এই উপলক্ষেও মার্কিণ সমাজের শিক্ষিত উচ্চতর স্তরের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই সুযোগ না পাইলে আমার মার্কিণ প্রবাস নিষ্ফল হইয়া যাইত।

বিলাতে মাদকতা নিবারণের জন্য যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা সকলে না হউন কিন্তু অনেকে ইংরাজের ধর্ম্মজীবনে এবং বিশেষতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উঁচু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

স্যার উইলফ্রিড লসন্ এই সংস্কারক দলের সর্ব্বজনসম্মানিত বর্ষীয়ান নেতা ছিলেন। কেইন সাহেবও এই সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই রাজনীতিক্ষেত্রে উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং বিলাতের পার্লামেণ্টে ইঁহাদের উভয়েরই প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক বিলাতের মাদকতা নিবারণসভা সকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইজন্য বিলাতে মাদকতা নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিতে যাইয়া সাধারণতঃ ইংরাজ সমাজের শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সমদর্শী সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। কখনও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এমন নহে। একদিনের কথা এখনও মনে আছে।

আমি হাডার্সফিল্ডে মাদকতা নিবারণীসভায় একবার বক্তৃতা করিতে যাই। এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর গৃহে আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়। ইঁহারা বেশি শিক্ষিত ছিলেন না। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারেও জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাই। বোধ হয় গৃহস্বামী প্রথম বয়সে দারিদ্র্য ঠেলিয়াই উঠিয়াছিলেন, ক্রমে সমৃদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই শ্রেণীর ইংরাজেরা অনেক সময় তাঁহাদের গির্জ্জার সংশ্লিষ্ট সদনুষ্ঠানাদিতে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া প্রতিবেশিদিগের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করেন। এই গৃহস্বামীও বোধ হয় স্থানীয় মাদকতা নিবারণীসভায় অর্থ সাহায্য করিয়া শ্রেষ্ঠীর স্থান পাইয়াছিলেন। আর এই সূত্রেই তাঁহার উপরে আমার আতিথ্যের ভার পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমি ইঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হই। আতিথেয়তা সম্বন্ধে বিলাতে অভিজাত পরিবারে যাহা দেখিয়াছি এখানেও প্রায় তাহাই দেখিলাম। সে বিষয়ে কোনই ত্রুটি লক্ষিত হইল না। কেবল ধনের ব্যবহারে ও ভোগ বিলাসে যাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত তাহাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ভিতরে যে একটা শোভনতা ও সংযম থাকে, এ বাড়ীর সাজসজ্জায় তাহার ঈষন্মাত্র পরিচয়ও পাইলাম না। বাড়ীর সাজ গোজগুলি নীরবে ইহাদের সত্য সামাজিক আসনটা যেন নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার পরে খাইতে বসিয়া পরিবারবর্গের বিশেষতঃ গৃহস্বামিনীর কথাবার্ত্তায় এ ভাবটা একেবারে ফুটিয়া উঠিল। গৃহস্বামিনী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মিষ্টার পাল, আপনাদের দেশে লোকে কি আমাদের মতনই টেবিলে বসিয়া এইরূপভাবে আহারাদি করে ?”

আমি কহিলাম, “না। আমরা মাটিতে আসন পাতিয়া বসিয়া খাই। কাঁটাচাম্‌চে ব্যবহার করি না। আঙ্গুল দিয়া খাদ্য তুলিয়া মুখে দিই। আর এ সকল মাটির বাসনও আমরা ব্যবহার করি না। হয় কাঁসার বাসন, না হয় কলাপাতাই ব্যবহার করিয়া থাকি।”

আমার কথা শুনিয়া গৃহস্বামিনী উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং স্বামীকে ডাকিয়া কহিলেনঃ—“ফ্যাদার তুমি শুন্‌চ ? মিষ্টার পাল বলছেন যে তাঁদের দেশে তাঁরা মাটিতে বসিয়া, আঙ্গুল দিয়া, কলাপাতা হইতে খাদ্য তুলিয়া আহার করেন !”

তখন টেবিলে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার শিরদাঁড়া শক্ত হইয়া উঠিল। হাসির ঢেউ থামিলে আমি কহিলাম, "আপনারা জানেন কি আমার দেশের লোকে এমনি করিয়া খায় কেন? এ দেশে লোকে যে ভাবে খাওয়া দাওয়া করে আমার দেশের লোকে তাহাকে অত্যন্ত কদাচার বলিয়া মনে করে। এদেশে উচ্ছিষ্ট বিচার নাই, খাওয়াটা যে একটা পবিত্র কাজ, যে ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতে হয়, সেই ভাবেই যে পবিত্র দেহ মন লইয়া ভোজন করাও প্রয়োজন, এ ধারণা ত দূরের কথা, এরূপ কল্পনাও এদেশের লোকের নাই। এই যে টেবিলে চাদরখানা পাতা রহিয়াছে, ইহার উপরে যাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পড়িয়া যায়, আর একটা বুরুস দিয়া সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়াই এদেশের লোকে মনে করে যে চাদরখানা শুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু হয় কি? তারপর এই কাঁটাচাম্‌চেগুলি। এইগুলি পরিষ্কার রাখিতে কত বেগ পাইতে হয়? অনেক সময় কাঁটার ফাঁকের ভিতরে কত ময়লা জমিয়া থাকে। কিন্তু আমার এই আঙ্গুলগুলি যখন তখন আমি ধুইয়া পরিষ্কার করিতে পারি। আমার দেশে ভদ্র ইতর সকলে হাত না ধুইয়া খাইতে বসে না। তার পর এই প্লেটগুলি। আমরা মাটির বাসনে খাই না। কখনও যদি খাইতে হয় সেগুলি তখনই ফেলিয়া দেওয়া হয়; আর তাহা ব্যবহারে আসে না। আমরা হয় ধাতুর বাসনে না হয় কলাপাতায় খাই। ধাতুর বাসন যেভাবে মাজিয়া পরিষ্কার করা যায়, কাঁচের বাসন সেভাবে মাজা যায় না। আর আমাদের দেশের শুদ্ধাচারী লোকে অপরে যে ধাতুর বাসনে খায় তাহাতে কখনও খান না। তার পর মাটিতে পাত পাড়িয়া খাওয়ার কথা। আপনাদের এই ব্যবস্থাতে সামাজিকতার ব্যাঘাত করে। লোক নিমন্ত্রণ করিতে গেলে এদেশে চেয়ার গুনিতে হয়, টেবিলে কজন লোক ধরিবে তাহার হিসাব কষিতে হয়, যথেচ্ছভাবে কেহ কখনও অযচ্ছল টাকা না থাকিলে এবং বড় বড় হোটেলে ভোজের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কোনও ক্রিয়া কার্য্য উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন না। আমাদের এ সকল বালাই নাই। সস্তায় কুশাসন মেলে, কলাপাতার ত কথাই নাই। আর আমাদের দেশে ধনী লোকের বাড়ীতে বড় বড় ঘরেরও অভাব নাই। তার উপরে বাড়ীর ছাদ ও উঠান ত পড়িয়াই আছে। সুতরাং আমরা এক সঙ্গে হাজার লোক ডাকিয়া খাওয়াইতে পারি। এখন বুঝিলেন কি যে মাটিতে বসিয়া নিজের হাতে আঙ্গুল দিয়া কলাপাতা হইতে খাদ্য তুলিয়া লওয়াটা নিতান্ত মন্দ নহে? শুদ্ধাচারের দিক দিয়াই দেখি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক দিয়াই দেখি, আর লোক-লৌকিকতার দিক দিয়াই দেখি, কোনও দিক দিয়াই এদেশের প্রথা হইতে ইহাকে হীন বলা যায় না। তবে আপনাদের এ প্রথারও নিন্দা করি না। "যস্মিন দেশে যদাচারঃ।" আমার কথায় তাঁহাদের হাসির রোলই যে কেবল থামিয়া গেল তাহা নহে, কিন্তু মুখ পর্য্যন্ত ছোট হইয়া উঠিল।

আমেরিকায় মাদকতা নিবারণী-সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতে যাইয়াও অনুরূপ কারণে

আমার শিরদাঁড়া এইভাবে শক্ত হইয়া উঠিত। আমাকে শ্রোতৃবর্গের নিকটে পরিচিত করিয়া দিবার সময় মাঝে মাঝে সভাপতিরা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি যেন একটু অনুকম্পা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে আমার স্বাজাত্যাভিমানে খোঁচা লাগিত। এবং আমি মাঝে মাঝে পালটা জবাব দিতেও ছাড়িতাম না। বিশেষভাবে বষ্টনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বষ্টন সহরের বড় বড় সভাগুলি Tremont Temple (ট্রেমণ্ট টেম্পল) নামে একটা বড় বাড়ীতে হইয়া থাকে। একবার এই বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় হলে আমার বক্তৃতার আয়োজন হয়। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মেজ' হইতে প্রায় ছাদের কাছাকাছি পর্য্যন্ত লোকে ভরিয়া গিয়াছে। বোধ হইল যেন সর্ব্বশুদ্ধ আট নয় হাজার স্ত্রীপুরুষ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সভাপতি এবং বক্তার মঞ্চেও বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশ হইয়াছে। মাদকতা নিবারণ সম্বন্ধে আমি আমেরিকায় এত বড় এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত সভামণ্ডলীর মধ্যে আর বক্তৃতা করি নাই। একজন ধর্ম্মযাজক আমাকে সভার নিকট পরিচিত করাইয়া দিতে উঠিয়া প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন ঃ—

"আমাদের খৃষ্টীয়ান্ দেশের এমনি দুর্ভাগ্য হইয়াছে যে ভারতবর্ষের একজন লোকের নিকটে আজ আমাদিগকে মিতাচার সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইল।"

অমনি আমার স্বাজাত্যাভিমান ফণা মেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া কহিলাম ঃ—

"বৃদ্ধলোকেরা বালকের স্পর্দ্ধা এবং অভিমানের প্রকাশ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। এ স্পর্দ্ধা, তাঁরা জানেন, বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেনা। তখন নিজের ওজন বুঝিয়া সে আপনি সংযম এবং সৌজন্য শিক্ষা করিবে। আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে এই সহরে আতিথ্য সৎকার সম্ভোগ করিতেছি তাঁহার আট নয় বৎসরের একটি বালক আছে। তাঁর পিতামাতার সঙ্গে আমি যখন কথাবার্ত্তা কহি তখন সে মাঝে মাঝে তাহাতে বুকনি দিয়া বলে, I guess it is so. অন্যের মুখে একথা বিরক্তিকর হইত; ইহাতে অসৌজন্য প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বালকের মুখে এইগুলি বড় মিস্ট লাগে। এই সভাতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বপ্রথমে আমার এই কথাটা মনে পড়িয়া গেল। আমেরিকার ত কথাই নাই, যে য়ুরোপ হইতে আমেরিকার জন্ম সেই য়ুরোপের লোকেরা যখন পশুর মত বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত, সভ্যতার ক, খ পর্য্যন্ত মক্স করিতে আরম্ভ করে নাই, তখন আমি যে দেশ হইতে আসিয়াছি সে দেশের লোকে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী স্বরূপে আপনাদের এই সদ্যোজাত শিশু-সভ্যতার মাঝখানে আমি যখন দাঁড়াইয়া আপনাদের অভিমান ও স্পর্দ্ধার অভিনয় দেখি তখন আমার অবমাননা বোধ হয় না। এই বালক-স্বভাব-সুলভ স্পর্দ্ধা দেখিয়া মনে মনে আনন্দ উপভোগ করি। সুতরাং আপনারা যখন কহেন যে আপনাদের এমনি দুর্গতি হইয়াছে যে ভারতবর্ষের লোকের মুখেও শেষে মিতাচারের উপদেশ লইবার প্রয়োজন

হইয়াছে, তখন একথা শুনিয়া আমি মনে মনে কেবল হাসিয়া থাকি। ইহাতে কোনও প্রকারের বিরক্তির কারণ দেখিতে পাই না।"

তার পরই বলিলাম্, "এই সুরাপান সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে—

All barbarians drink. When we were barbarians in India and that is far beyond 3000 years back, our primitive forefathers also used to drink to profusion. They made libations of wine to their Gods but with the expansion of experience and advance of knowledge and wisdom they not only discarded it but condemned the drinking of spirituous liquors as a mortal sin. In India so far as the higher castes or classes are concerned, we had practically no drink problem until the British came to our county as the messengers of a new civilisation carrying, as the late Keshub Chandra Sen declared in many of his addresses to the British public 30 years ago, in one hand their Bible and in the other brandy. Since then there has developed no doubt a temperance problem in my society also, but it is not an inheritance of my civilisation. And when I come to speak to your civilisation from your temperance platforms I do so in the name of that ancient civilisation of mine. The British have not made us sober. If anything, their contact has created a taste for strong drinks in a section of our classes, while their excise administration has helped to create this habit among the masses, where it did not exist and widened it and depened it, where among the lowest rungs of our social ladder, the drink habit has existed always.

অর্থাৎ বর্ব্বরমাত্রেই সুরাপান করে। তিন হাজার বৎসরের সুদূর অতীতে আমরা যখন বর্ব্বর ছিলাম তখন আমরা আমাদের দেবতাদের নিকটে সুরা নিবেদন করিতাম এবং নিজেরা যথেচ্ছ পান করিতাম। কিন্তু ক্রমে যখন আমাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বাড়িতে লাগিল তখন সুরাপানের অপকারিতা অনুভব করিয়া আমার পিতৃপুরুষেরা ইহাকে মহাপাতকরূপে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইংরাজ আমাদের দেশে আসিবার পূর্ব্বে আমাদের সমাজের উচ্চতর স্তরে সুরাপান নিবারণের জন্য কোনও চেষ্টা করা অনাবশ্যক ছিল। ইংরাজ যেদিন তাহার নূতন সভ্যতার সুসমাচার প্রচার করিতে আসিয়া এক হাতে বাইবেল ও আর এক হাতে ব্রাণ্ডীর বোতল লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, সেদিন হইতেই আমাদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তখন হইতে আমাদের সমাজেও একটা সুরা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি যখন এখানকার সুরাপান নিবারণের বক্তৃতামঞ্চ হইতে আপনাদের নিকটে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াই

তখন আমি আমার প্রাচীন সভ্যতার নামেই এই সকল কথা কহি। ইংরাজ আমাদিগকে মিতাচারী করে নাই, বরঞ্চ ইংরাজের সংসর্গে আসিয়া আমাদের ভদ্র সমাজের এক অঙ্গ মদ্যপ হইয়া উঠিয়াছে, আর ইংরাজের আব্‌গারী আইন আমার দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোথাও মদ্যপান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, আর কোথাও বা এই কু-অভ্যাস বাড়াইয়া দিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

অভাব ও অভিযোগ

অর্থনীতি-শাস্ত্রে কথিত আছে অভাবই উন্নতির সোপান। আমাদের অভাবের ত অন্ত নাই, কিন্তু উন্নতি কতটা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। কেন এরূপ হইল ?

মানবের মূল অভাব সংখ্যায় অধিক নহে, এবং তাহাদের কোনটিই খুব অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। শরীর ধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়, মানসিক স্ফূর্ত্তির জন্য শিল্প সংগীত এবং শিক্ষার সহজসাধ্য সাধারণ উপকরণ, এবং যাতায়াতের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় যানবাহনাদিই মূল অভাব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। স্বল্পায়াসেই এই অভাবগুলির নিরাকরণ সম্ভব মনে করা অসঙ্গত নহে। . আমাদের ঋষি বাক্য—

> "স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে
> অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।"

নিরর্থক নহে। জীবন রক্ষার জন্য যে অন্নের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে খুব অধিক সময় বা কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন কোন কালেই হইত না এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-যুগে তাহা আরও সহজসাধ্য হইবারই কথা। শীতাতপ নিবারণের জন্য যে আচ্ছাদন বা আশ্রয়ের প্রয়োজন তাহাও খুব কষ্টসাধ্য নহে। আদিম যুগের মনুষ্যকুলের এবং একালের যে সকল জাতি অসভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নের বা আচ্ছাদনের অভাব খুব তীব্র বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহাদের দেহ অসুস্থ বা ক্ষীণ নহে; তাহাদের শারীরিক সামর্থ্য সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে; তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা যে সভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা অধিক সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। অভাব নিরাকরণের—প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহের—সহজ উপায় স্বরূপ অর্থের নিমিত্ত, তাহাদের হাহাকার নাই। তবে সভ্য জগতে এত

দুর্দ্দশা কেন ? ধনের জন্য এত হাহাকার, কায়িক এবং মানসিক শক্তির এত একাগ্র নিয়োগ, ধর্ম্ম বা নৈতিক জীবনের প্রতি এত ঔদাসীন্য কেন ?

মানব সমাজের বর্ত্তমান যুগকে অর্থাকাঙ্ক্ষা-যুগ নাম দিলে অন্যায় হয় না। বর্ত্তমান কালে মানব জীবনের এবং শক্তির মধ্যে অধিকাংশই অর্থ চিন্তায় নিয়োজিত। জগতের মনুষ্যকুল ব্যষ্টিভাবেই হউক বা সমষ্টিভাবেই হউক, প্রচুর ধনলাভের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে সর্ব্বদা তৎপর। এ বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ নাই। কল কারখানার উন্নতি সাধনে, সমবায় সংস্থাপনে, বাণিজ্য প্রসারে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ জাতিকে ছলে বলে কৌশলে শোষণ করিয়া অর্থ-সংগ্রহে প্রচেষ্টার অভাব সভ্যজগতে কুত্রাপি নাই। ব্যষ্টি মানব তাহার বিলাসের, প্রতাপের, প্রখ্যাতির, জনহিতকর প্রবৃত্তির, তৃপ্তির জন্য,—আর সমষ্টি মানব স্বদেশের, স্বসমাজের, বলবৃদ্ধির জন্য, নানাবিধ সামাজিক উন্নতির জন্য ধন সঞ্চয়ে সর্ব্বদা ব্যগ্র। সহজসাধ্য কয়েকটি মাত্র মূল অভাব শত শাখায় বিভক্ত হইয়া, সহস্র রূপান্তরে নিত্য নূতন প্রতিভাত হইয়া, একটির নিরাকরণ মাত্রেই আর একটি রক্তবীজের মত, তাহার স্থান অধিকারের দ্বারা অপূর্ব্ব ধাঁধার সৃজন করিয়া বর্ত্তমান জগতের সমগ্র মানবশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে পৃথিবীতে এমন কোনও লোভনীয় বস্তুই নাই যাহার ভোগলালসার তীব্রতা ভোগে ক্ষয় না হয়। প্রত্যেক বস্তুরই হস্তগত সংখ্যার বা পরিমাণের আধিক্যের সহিত, তাহার শেষ সংগৃহীত অংশের তৃপ্তি সাধনের শক্তি যে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ইহা মানব-প্রকৃতির অন্যতম গূঢ় তত্ত্ব।

যে জাতির প্রকৃতিতে এই ধনলিপ্সাযুগের নির্ম্মম জীবনসংগ্রামে জয়লাভের উপযোগী শক্তি নিহিত আছে, তাহার সূক্ষ্ম নৈতিক আত্মিক জীবনের পক্ষে যাহাই হউক, পার্থিব স্থূল শরীরের পক্ষে নিত্য নূতন অভাবের বিকাশ, এক অভাবের পরিপূরণ মাত্রেই অন্য একটি অভাবের তৎস্থান গ্রহণ, অপকারী না হইয়া উপকারীই হইতে পারে। এরূপ কারণে অন্তর্নিহিত জাতীয়শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া সে জাতি প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তির সহায় হইয়া থাকে। ইয়ুরোপীয় জাতিগুলির অন্তরে যে দুর্জ্জয় শক্তি নিহিত আছে, সাংসারিক ভোগবিলাসের, রাষ্ট্রীয় সংঘের প্রবল প্রতাপের, সর্ব্ববিধ পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির যে প্রবল লালসা তাহাদের প্রকৃতির সহিত ভগবদ্দত্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত, তাহা তাহাদিগকে অভাবের বিকাশ ও তাহার পরিপূরণের মধ্য দিয়াই উন্নত করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু যে জাতির প্রকৃতি এইরূপ নির্ম্মম জীবন সংগ্রামের উপযোগী নহে, যাহার পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া আবহমানকাল ধরিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, যাহার অন্তর্দ্দর্শী ঋষিগণ শিক্ষা দিয়াছেন—"তৃপ্তি অভাবের পরিপূরণে নহে, তাহার অনুভূতিতেই," যে জাতির আত্মা শান্তি এবং মুক্তির যত প্রয়াসী, সুখ এবং ভোগের তাহার শতাংশের একাংশও নহে, সর্ব্ববিধ মিলনে যাহার পরম আনন্দ এবং সর্ব্ববিধ সংগ্রামে যাহার তীব্র বিতৃষ্ণা, সেই

ভারতের পক্ষে, ইয়ুরোপ এই ধনলিপ্সার যুগে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে সেই পন্থা অবলম্বনীয় এবং তাহার সাহায্যে জাতীয় উন্নতি সাধন সম্ভব কিনা বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ।

অথচ এ কথা ঠিক যে ইয়ুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম, ঐশ্বর্য্যশালী এবং অভাব উন্মেষণের ও নিরাকরণের শত প্রণালী উদ্ভাবনে সিদ্ধহস্ত একটি সমাজের সহিত, ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ আজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত। ফলে সেই সমাজের ভোগবিলাসের ধারণা, সামাজিক হিতের কল্পনা, ভারতের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার সহস্র নূতন অভাবের সৃজন করিয়াছে। বৈদেশিক পণ্যের চাকচিক্যে, বৈদেশিক ভাবের আতিশয্যে তাহার শান্ত স্বল্পে তৃপ্ত মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক শক্তি, তাহার ভগবদ্দত্ত প্রেরণা অনুরূপ বলিয়া, যে পথে চলিতেছে, তাহা তাহার পক্ষে অনুপযোগী। বাহিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী নিত্য নূতন অভাবের স্ফূরণ ও নিরাকরণের সহিতই তাহার জাতীয় জীবনের সার্থকতা জড়াইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু হয়ত, ইহাই সত্য যে ভারতের পক্ষে অভাবের সংখ্যা হ্রাস ও পরিমাণ সঙ্কোচন, এবং তাহার অনুভূতির নিরাকরণই প্রশস্ত পথ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই জনপদের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ হইয়াছে। তাহার স্বপ্রকৃতির বিরোধী যে পথ তাহা যদি তাহার পক্ষে বিপথ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারত বিপথে চলিয়াছে। আহার্য্যের যে অভাব, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাহা অতি সহজেই পরিপূরিত হইতে পারে। তথাপি অনাহারে মৃত্যু এবং অল্পাহারে জীবনমৃত্যু এদেশে যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে, জগতের আর কোন দেশে সেরূপ করিয়াছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। এদেশে আহার্য্য কম জন্মে না কিন্তু তাহার এক বৃহদাংশ বিদেশে চলিয়া যায়, কেবল ধনীর ব্যসন বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্যই নহে, যাহাকে অনাহারে কঙ্কালসার হইতে হয়, সেই অপরিণামদর্শী শস্যোৎপাদনকারীর দেহ ও মনের অপকারী বিলাস সামগ্রীর সংগ্রহেও। চতুর পাশ্চাত্য বণিকেরা নবাবিষ্কৃত কোন অসভ্য জনপদে এক সময়ে কাচখণ্ডের পরিবর্ত্তে, সুবর্ণ-মুষ্টি ও হীরকখণ্ড সংগ্রহ করিত বলিয়া পুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতেছি যে আমাদের জন্মভূমির এমন অবস্থা হইয়াছে যে পরিজনের প্রাণ ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় স্বহস্তে উৎপাদিত শস্য-সম্ভার, নূতন বিদেশাগত অভাবের তাড়নায়, ভারতবাসী পরহস্তে তুলিয়া দিয়া অনাহারে মরিতেছে। অজ পল্লীগ্রামেও বিলাতী সিগারেটের প্রচলন হইয়াছে, জাপানী এসেন্স তাহার দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, শীতনিবারণোপযোগী স্থূল স্থায়ী বস্ত্রের সচ্ছলতা না থাকিলেও লেস্, সাটিন, জরির অভাব নাই।

শুনিতে পাই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গ পল্লীবাসিগণ খাদ্যের অভাব কি জানিত না। অনাবৃষ্টির বৎসরে অন্নকষ্ট হইত বটে কিন্তু প্রতিবেশী মহাজনের ধনভাণ্ডার বঙ্গীয় কৃষকের সে কষ্ট দূর করিবার জন্য উন্মুক্ত থাকিত। অবশ্য উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া শস্য হানি হইলে দুর্ভিক্ষের

করাল-মূর্ত্তি যে কৃষকের দ্বারে আসিয়া দেখা দিত না, তাহা নহে; কিন্তু তাহা কদাচিৎ কালেভদ্রে। সাধারণতঃ তাহাদের অবস্থা সচ্ছলই ছিল। বঙ্গপল্লীতে প্রচুর মৎস্য, দুগ্ধ, বিশুদ্ধ তৈলের ও ও ঘৃতের অভাব ছিল না, এবং পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাহার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল। এখন কিন্তু তখনকার সম্পন্ন মধ্যবিত্তগণের বংশধরদিগেরও শতকরা ৯০ জনেরও অধিক জীবনব্যাপী অর্দ্ধাহারে শীর্ণ হইতেছে। শিশু সন্তানেরা দুগ্ধাভাবে অকালে মরিতেছে অথবা মৃতপ্রায় হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে। খুব ধনিগণের কথা বাদ দিয়া বেশ বলা যায় যে সুপ্রচুর মৎস্য, মাংস, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির ভোগ এখনকার সম্পন্ন গৃহস্থগণেরও সাধ্যাতীত। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া একমাত্র দুর্ম্মূল্যতার দোহাই দেওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে না, কেন না এই সকল দ্রব্য দেশেই জন্মিতেছে এবং তাহাদের উচ্চমূল্য দেশবাসীরই ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছে। আবার ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন লোক শস্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত সুতরাং এই সকল দ্রব্যের উচ্চমূল্য তাহাদের অকল্যাণকর না হইয়া মঙ্গলনিদান হইবারই সম্ভাবনা। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা বাড়িয়াই চলিতেছে। কারণ কি?

ভারতে নূতন অভাবের তাড়নায় অপব্যয়ের উদাহরণ পুঞ্জীভূত করা যাইতে পারে। আমাদের নিত্যজীবনে বা নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে—বিবাহে, কুটুম্বিতায়—অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কত যে ব্যয় হয়, এবং কত লোককে যে সে ব্যয় অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কার্পণ্য করিয়া, পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করিয়া, বাস্তুভিটা বন্ধক দিয়া, মিটাইতে হয়, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। এই সকল কার্য্যে যে সকল দ্রব্যের বা আড়ম্বরের অভাব আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মোটেই অনুভব করিতেন না, এখন সেগুলি অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভাবের বিকাশই যদি দেশের অবস্থানির্ব্বিশেষে বা দেশবাসীর প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে উন্নতি-বিধায়ক হইত, তাহা হইলে ভারতের এত অভাববৃদ্ধির সহিত তাহার উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির এই দৃশ্য বিস্ময়জনক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ হয় উপরোক্ত অর্থনৈতিক সূত্রটি দেশকাল-নির্ব্বিশেষে প্রযোজ্য নহে। যাহার অভ্যন্তরে অভাব নিরাকরণের শক্তি নিহিত আছে, অভাবের প্রতিঘাতে তাহারই সেই শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে এবং এইরূপে সে ব্যক্তি অভাব নিরাকরণক্ষম হইয়া তাহার নিজের বা পারিপার্শ্বিকের উপকার সাধন করিয়া থাকে। যাহার ভিতরে এই সুপ্তশক্তি মহাপরিমাণে আছে বহু অভাবের মহাভার তাহার পক্ষে সহনীয় এবং উপকারী। যাহার ভিতরে সেই শক্তির পরিমাণ অল্প, অভাবের স্বল্পভারে তাহার উপকার হইতে পারে কিন্তু আকস্মিক অভাব বৃদ্ধির গুরুভার সে শক্তিকে স্ফূর্ত্ত না করিয়া তাহাকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। আবার সব শক্তিরই ক্রমবিকাশ বাঞ্ছনীয় এবং তাহা করিতে হইলে প্রতিঘাতেরও ক্রমবৃদ্ধি প্রয়োজন। ভারতের নূতন অভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে, বিশেষ বিবেচনার সহিত পাশ্চাত্যের উপকারী প্রথাগুলির শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির অতি প্রয়োজনীয় উপদানগুলি ধীরে

ধীরে অবলম্বিত হইলে, নূতন অভাবের ক্রমোন্মেষের সহিত ভারতবাসীর অভাব নিরাকরণশক্তিরও ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হইত। কিন্তু অনির্ব্বাচিত অর্থহীন অনুকরণে গড্ডলিকা প্রবাহের পথে চলিয়া আমরা একেবারে অভাব সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি। অভাববৃদ্ধি আমাদিগকে উন্নত না করিয়া একবারে ডুবাইয়া মারিবার কারণ হইয়াছে। আমাদের নূতন অভাবের অধিকাংশই হয়ত আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিরোধী। শান্তিলিপ্সা, ধর্ম্মপিপাসা, নিরাড়ম্বরতা, ঐহিক-ভোগে অনিচ্ছা এবং পারলৌকিক মুক্তিতে আগ্রহ, যদি ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ হয়, ভারতবাসীর প্রকৃতির বিশেষত্ব হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে নূতন অভাব জন্মিয়াছে, তাহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ না হইয়া নাশ হওয়াই সম্ভব। বোধ হয় এই কারণেই,—আমাদের বর্ত্তমান অভাব শক্তির পরিমাণে অতিরিক্ত গুরুভার বলিয়া এবং তাহার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার, ভারতীয় জাতীয় প্রকৃতির একান্ত বিরোধী বলিয়াই আমাদের ভাগ্যে অভাব উন্নতির কারণ না হইয়া অভিযোগের মূল হইয়াছে।

সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য যে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার আয় ও অর্থ-সামর্থ্যের এরূপভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনের উপর—ভিন্ন ভিন্ন সাংসারিক অভাব নিরাকরণের জন্য—বিতরণ করা যে ব্যয়িত অর্থশক্তির প্রত্যেক বিভিন্ন অংশ সংসারের পক্ষে সমান উপকারী হয়। এরূপ করিতে পারিলে বিভিন্ন কার্য্যে ব্যয়িত অর্থ সমষ্টির উপকারিতা সংসারের পক্ষে অধিকতম হইবার সম্ভাবনা। যাঁহার হাতে পাঁচটি মুদ্রা আছে তিনি নানা প্রয়োজনে তাহা ব্যয় করিতে পারেন; কিন্তু সেই বিভিন্ন অভাব-গুলির প্রত্যেকটির নিবারণের উপকারিতা সংসারের পক্ষে সমান না হইতে পারে। যদি আহার্য্যে কার্পণ্য করিয়া বস্ত্রে বিলাসিতার জন্য খাদ্যে ১৲ ও বস্ত্রে ২৲ ব্যয় করা হয়, যদি পুত্রের বিদ্যালয়ে দেয় বৃত্তির পরিবর্ত্তে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্য ১৲ ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে এই পাঁচটি টাকা ভিন্ন ভিন্ন অভাবের মধ্যে এরূপভাবে বিতরিত হইল যে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিতরিত অংশের উপকারিতা সমষ্টির অধিকতম নহে।

অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে উপরোক্ত তথ্যটি নিঃসংশয় করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে :—

	অভাব	১৲ এক টাকায় যে অভাব নিরাকৃত হয় তাহার উপকারিতার পরিমাণ।
১।	আহার্য্য	১০
২।	বস্ত্র	৮
৩।	আশ্রয়	৬
৪।	শিক্ষা	৪
৫।	বিলাসিতা	২
	৫ অভাব—৫৲	৩০ উপকারিতা

অর্থাৎ উপরের অভাবগুলির মধ্যে ৫৲ সমান ভাবে বিতরিত হইলে যে ফল হয়—উপকার সমষ্টি লাভে হয় তাহা ৫৲ = ১০ + ৮ + ৬ + ৪ + ২ = ৩০।

কিন্তু যদি অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে মুদ্রাগুলি বিতরিত হয়, যদি আহার্য্যের অভাবের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক বলিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপকারিতা সম্বন্ধে ফল ভিন্নও হইতে পারে। যথা—

	অভাব	মুদ্রা	উপকারিতা।
১।	আহার্য্য	২৲	১০ + ৯
২।	বস্ত্র	১৲	৮
৩।	আশ্রয়	১৲	৬
৪।	শিক্ষা	১৲	৪
৫।	বিলাসিতা	০	০
	৫ অভাব	৫৲	৩৭ উপকারিতা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে অর্থ-সামর্থ্যের বিতরণের উপরও, অর্থাৎ কোন কোন অভাব নিবারণে মনোযোগ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের উপর অধিক অর্থ নিয়োগ, এবং কোন কোন অভাবের অনুভূতি মন হইতে দূর করিয়া দিয়া তাহাদের উপর অর্থের সম্পূর্ণ অনিয়োগ দ্বারা, ব্যয়িত অর্থের উপকারিতা সমষ্টির বৃদ্ধি নির্ভর করে।

উপরে আহার্য্যের জন্য যে প্রথম মুদ্রাটির খরচ করা হইয়াছে তাহার উপকারিতা ১০। অর্থনীতি শাস্ত্রের একটি সূত্র অনুসারে যে কোন পদার্থের পরিমাণের বা সংখ্যার আধিক্যের সহিত তাহার পরবর্ত্তী সমানাংশের উপকারিতার সন্তোষ বিধানের শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং প্রথম মুদ্রাটি যে আহার্য্যের সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে তাহার পরিমাণ যদি /১ সের হয় এবং তাহার উপকারিতা যদি ১০ হয়, তাহা হইলে ২য় মুদ্রাটিতে যে দ্বিতীয় /১ সের আহার্য্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উপকারিতা ৯, ৩য় টাকায় যে আহার্য্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহার উপকারিতা ৮, অর্থাৎ বস্ত্রে ব্যয়িত মুদ্রাটির উপকারিতার সমান। সুতরাং এস্থলে তৃতীয় মুদ্রাটি আহার্য্যে বা বস্ত্রে ব্যয়িত হইলে কিছু ক্ষতি হয় না, বস্ত্রে ব্যয় করাতে কোন ক্ষতিই হয় নাই। এইরূপে ৪র্থ মুদ্রাটির উপকারিতা আহার্য্য বিষয়ে ব্যয় ৪ কিন্তু আশ্রয়ের জন্য ব্যয়িত হইলে ৬; যথা:—

মুদ্রা		আহার্য্য	উপকারিতা
১ম	১৲	১ম /১	১০
২য়	১৲	২য় /১	৯
৩য়	১৲	৩য় /১	৮
৪র্থ	১৲	৪র্থ /১	৪

সুতরাং আমাদের কল্পিত উদাহরণে ৫৲ পাঁচটি টাকা সন্তোষজনক ভাবে বিতরিত হইয়াছে, সংসারের কোন ক্ষতি হয় নাই।

ইহা সত্য যে সংসারের অবস্থানুযায়ী তাহার অর্থ-সামর্থ্যের পরিমাণ অনুসারে কোন অভাবের নিরাকরণের অধিক শক্তি নিয়োগ করা উচিত, কোন্ অভাবকে নিম্নে ফেলিয়া রাখা উচিত এবং

কোন্ অভাবের অনুভূতি মন হইতে একবারে দূর করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। যদি নানাপ্রকার অভাবের চাপ আমাদের উপর এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকে যে তাহাদের সবগুলির নিরাকরণ আমাদের সাধ্যাতীত, তাহা হইলে নিকৃষ্ট অভাবগুলি মন হইতে দূরীভূত করিয়া যে অভাবগুলির নিরাকরণে সামাজিক উপকারিতার সমষ্টি অধিকতম তাহাদেরই উপর আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা অভাব উন্নতির কারণ না হইয়া অভিযোগেরই কারণ হইবে।

সাদা কথায়, বিদেশের অনুকরণে অভাব আমরা এত বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে তাহাদের সবগুলির তৃপ্তি সাধন আমাদের বর্ত্তমান সামর্থ্যের অতীত। সুতরাং আমাদিগকে আহারে, বিলাসিতায়, বস্ত্রে, আভরণে, ব্যসনে, লৌকিকতায় সংযত হইতে হইবে। যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার আমরা পাশ্চাত্যের সংশ্রবে আসিয়া গ্রহণ করিয়াছি অথচ যাহা ত্যাগ করিলে সামাজিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় না, যাহার ব্যবহারে আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা চরিত্রগঠন সম্বন্ধে কোন উপকার নাই, সেই সকল দ্রব্যের বর্জ্জন বাঞ্ছনীয়। অভাবের গণ্ডী এইরূপে সংকীর্ণ করিয়া লইতে পারিলে আমাদের অভিযোগ দূর হইতে পারে ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

আমাদের য়ুরোপ প্রবাস

আমাদের মধ্যে একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেছি যার জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ না করেই পারিনি। সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নানান্ রকম মানুষের সঙ্গে মেশবার আগ্রহের ঐকান্তিক অভাব। এ পক্ষে দোষ যে সবটাই আমাদের নিজেদের তা নয়, কারণ নিয়তিদত্ত গাত্র-চর্ম্মের রঙ্গের পরিহাস য়ুরোপে আছেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে ডুবে না থেকে—অন্ততঃ ইংলণ্ডের বাহিরে—বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্ত্তে অগ্রসর হলে সফলতা লাভ সর্ব্বত্র অসম্ভব নয়। এটা আমার একার অভিজ্ঞতাও নয়। আমার কোনও বন্ধু বার্লিনে এসেই অনেকগুলি নিতান্ত ভদ্র পরিবারে এমন সুন্দর ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েছিলেন যে সেটা অত্যন্ত চমৎকার। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে

তিনি মোটেই গৌরাঙ্গ ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে তাঁকে charming আখ্যায় অভিহিত কর্ত্তে শুনেছি। তিনি যখন বার্লিনে আসেন তখন সেখানে একজনকেও জানতেন না এবং তাঁর ক্ষেত্রে এই ভদ্র পরিবারে মেশাটা যে মোটেই ওপর, ওপর ছিল না তা-ও আমি জানি। এমন কি বার্লিনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি-ধারিণী কোনও মধুরপ্রকৃতি সুন্দরী তরুণী তাঁর স্বভাবে এতই প্রীত হয়েছিলেন যে তাঁকে নিজেদের নির্জ্জন পল্লীগৃহে নিমন্ত্রণ কর্ত্তেও সঙ্কোচ বোধ করেননি যেখানে তিনি ও তাঁর মা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না এবং শুধু তাই নয় একবার তাঁর জ্বরের সময় তিনি আমার বন্ধুবরকে নিজের শয়নকক্ষে দেখা কর্ত্তে আস্‌তেও ইতস্ততঃ করেননি। (কুমারীর শয়নকক্ষে নিতান্ত প্রিয়জন বা আত্মীয় ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ)। তাই এ থেকে বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত করাটা অসঙ্গত হবে না যে আমার বন্ধুবরের প্রতি এই তরুণীর শ্রদ্ধার ভাবটা নিতান্ত অগভীর ছিল না। এই সামান্য ঘটনাটির একটু বেশী করে উল্লেখ কর্লাম শুধু এই কথাটি জ্ঞাপন কর্ত্তে যে যদি আমরা আমাদের কূর্ম্মচর্ম্ম পরিহার করে বাইরের মানুষের সঙ্গে সহজ ও সরলভাবে মিশতে অগ্রসর হই তাহ'লে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ—(অন্ততঃ ইংলণ্ডের বাহিরে, এমন কি ইংলণ্ডেও দুই এক বিরল ক্ষেত্রে এটা যে সম্ভব এ অভিজ্ঞতাও আমার আছে, যদিও সেখানে সেটা নিতান্ত বিরল বলে সে ক্ষেত্রে এ কথা সাধারণভাবে বলা চলে না)—অসম্ভব নয়, যদি আমরা যথার্থ এ শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগ্য হই ও যদি আমাদের স্বভাব সুন্দর হয়। আমার পরিচিতা আর একজন বিদুষী রুস তরুণীর (ইনি তরুণ বয়সেই এস্থোনিয়ার রাজধানী রেভালের Musical Conservatoriumএ পিয়ানোর ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন) আমার এক তরুণ ভারতীয় বন্ধুকে এত ভাল লেগেছিল যে তিনি আমাকে বার্লিন থেকে সেদিন একটা চিঠিতে একস্থলে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :—"Vous avez raison en disant qu'il est frais—ill'est frais—il l'est ; frais comme le souvire d'un matin jeune, qui nous promet un beau jour du printemps" এর ভাবার্থ এই :—"তুমি যে লিখেছ যে সে অভিরাম প্রকৃতির লোক সেকথা খুব ঠিক্ ; তার প্রকৃতি শরতের মনোজ্ঞ প্রভাতের হাসির মতই অভিরাম, যে হাসি একটি সুন্দর দিনের সূচনা করে।" এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত। আমি এসব থেকে মাত্র এই কথাটি বল্‌তে চাই যে আমার উপরোক্ত বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে আমাদের য়ুরোপে এসে সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিয়ে কাল কাটান যে আক্ষেপের বিষয় একথা স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই। আমি একথা অস্বীকার করি না যে নিজেদের মধ্যে মেলামেশার সুখ ও বন্ধু লাভের সুযোগ বিদেশীর সঙ্গে মেলামেশার সুখসুবিধার চেয়ে বেশী ; কিন্তু আমাদের এ সত্যটাও বোধ হয় ভুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যে line of least resistance অনুসরণ করে চলাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের বিকাশের পরিপন্থী। তা ছাড়া এই সাদা কথাটা আমা

প্রায়ই ভুলে গিয়ে বসে থাকি যে স্বদেশবাসীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ যখন আজীবনই থাক্‌বে তখন বিদেশে বহির্জগতের সঙ্গে যত বেশী পরিচয়লাভ ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন কর্ত্তে পারা যায় লাভের খাতায় খতিয়ে ততই বেশী জমা হ'তে থাকার সম্ভাবনা। বিদেশে স্বদেশবাসীর সঙ্গ কত মধুর তা কে না জানে? কিন্তু তাই বলে যদি শুধু নিজেদের এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তাকে কোলে করে বসে থাকা যায় তা হ'লে মনের পটে ছাপ নেওয়ার শ্রেষ্ঠ বয়সের তিন চার বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরবার সময়ে দেশের অর্থ ও যৌবনের উৎসাহ ব্যয়ের পরিবর্ত্তে একটা ডিগ্রীর ছাপ ছাড়া অন্য বিশেষ কোনও গরীয়ান্ মূলধন সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বোধ হয় একটু অনিশ্চিতের কোঠায়ই গিয়ে পড়ে।

পরীক্ষা পাশের জন্য আমরা কতটা সময়ই না বৃথা ব্যয় করি? এ সম্বন্ধে একটু তীব্র প্রতিবাদ করার সময় বোধ হয় এখন এসেছে। তাই আমি এ সম্পর্কে দু'চারটে কথা লিখ্‌ব। এ বিষয়ে এখন আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার হয়ে পড়েছে যে শিক্ষাটা আমরা কোন্ প্রণালীতে সব চেয়ে সহজে জীর্ণ কর্ত্তে পারি, এবং পরীক্ষা পাশের জন্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান না করে ঘরে দুয়ার দিয়ে যতটা দেহরক্ত জল করি তদনুরূপ লাভ করি কি না। আমার মনে হয় যে এজন্য অন্ততঃ বিদেশে এসে আমরা বিস্তর সময় বৃথা পড়া মুখস্থ করে কাটাই যে সময়ের অনেকটা অংশ বিদেশীর সঙ্গে মিশে কাটালে ঢের বেশী লাভবান্ হওয়া যেত। আমার এক ভারতীয় বন্ধু রাশিয়ায় তিন বছর ছিলেন অথচ কোনও পরীক্ষার জন্য নয়। ইনি পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যে সত্য সত্যই কতটা লাভবান্ হয়েছেন তা এঁর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপেই বুঝ্‌তে পেরে বড় তৃপ্তি বোধ করেছিলাম। তাই একথা আরও বেশী করে মনে হয় যে শিক্ষাটা যে কি বস্তু তা আমরা তলিয়ে ভেবে দেখি না এবং সেইজন্যই পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশাটাকে অনেক সময়েই সময়ের অপব্যয় স্বরূপে গণ্য করি। অবশ্য যাঁরা কোনও research প্রভৃতি কাজে আসেন তাঁদের সম্বন্ধে একথা ততটা প্রযোজ্য নয়, কারণ যে কোনও বিষয়ে নিজস্ব কিছু দিতে হ'লে সেদিকে যথেষ্ট চিন্তা ও শ্রমের ব্যয় কর্ত্তেই হয়; কাজে কাজেই এরূপ স্থলে হয়ত পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশী সময় উদ্বৃত্ত রাখা কঠিন হয়ে ওঠে যদিও তাঁদের ক্ষেত্রেও ইচ্ছা থাক্‌লে খানিকটা উপায় হয়ই হয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় researchএর ছাত্রদের কথা বাদ দিয়ে বোধ হয় একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই য়ুরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে যা শিখি একটা চাক্‌রি পেলেই সে বিষয়ে চর্চ্চার সচরাচর পাঠ উঠিয়ে দিয়ে থাকি, যেন পড়াশুনার যা মুখ্য প্রয়োজন তা সাধিত হয়ে গেছে। আমাব এ ধারণা বোধ হয় নিতান্ত অমূলক নয়। কারণ অস্মদ্দেশীয় অপিচ য়ুরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা এযাবৎ ভাল রকম পরীক্ষা পাশ করে এসেছেন তাঁদের অধিকাংশের নামই বোধ হয় এক চিত্রগুপ্তের ছাড়া অন্য কোনও খাতায় আজ অবধি পাওয়া যায় নি। এস্থলে আমার বলার

উদ্দেশ্য শুধু এইমাত্র যে এরূপভাবে কেবল পরীক্ষা পাশ কর্ত্তেই যাঁরা আসেন তাঁরা যদি উদ্বৃত্ত সময়ের কিয়দংশও বিদেশীর পরিচয় লাভের জন্য নিয়োগ কর্ত্তে রাজি থাকতেন তা হ'লে তাঁরা দেশে ফিরে যেতেন একটা মানসিক প্রসার ও উদারতা নিয়ে যার দাম সম্বন্ধে আমরা এযাবৎ একান্ত পরমহংস বৈরাগীর মতনই উদাসীন হয়ে এসেছি বলে মনে হয়।

আমার মনে হয় যে বিভিন্ন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে আমরা যা শিখি মনের সম্পদ ও দৃষ্টির প্রসারবৃদ্ধিতে তার প্রভাব ও গভীরতা যে সচরাচর কত বেশী হয়ে থাকে তা আমরা বড় একটা উপলব্ধি করি না—এই কারণে, যে যে স্থানে বই পড়ে বা উপদেশাদিতে লাভটা হয় জ্ঞাতসারে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অনুরূপ লাভটা হয় অজ্ঞাতসারে। সুতরাং খতিয়ে না দেখ্‌লে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শিক্ষালাভটা যে কতটা গভীরভাবে মজ্জাগত হয়েছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না। "Home keeping youths have ever homely wits" ইত্যাকার কথা আমরা তবু মুখেই আওড়াই, উপলব্ধি করি না। তা যদি কর্ত্তাম তবে আমরা ছুটিতে নিজেদেরই দল বেঁধে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতাম না—তা আবার ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে যেখানে ইংরাজ আমাদের দেখে মুখ ফেরায়। আমি আমাদের মধ্যে এমন অনেক ছাত্র দেখেছি—(এবং আমার দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যাই বেশী)—যাঁরা সুদীর্ঘ ছুটীগুলি লণ্ডনে, বা লোকমুখর সমুদ্রতীরে ছাত্রাবাস ইত্যাদিতেই কাটিয়ে দিতে একটুও গ্লানি বোধ করেন না। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এর মধ্যে যে বিসদৃশ কিছু থাক্‌তে পারে তা না তাঁরা নিজে, না তাঁদের সহপাঠীরা, না তাঁদের দেশস্থ অভিভাবকগণ কেউই উপলব্ধি করেন না। বিদেশীর সঙ্গে মেলামেশাটা যে বিদেশবাস বা ভ্রমণের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এটা আমার খুবই মনে হয় এবং য়ুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাই মনে করেন। কিন্তু আমাদের দেশে সুবোধ বালকের মত পড়াশুনায় ভাল হওয়াটাই যে জীবনের একমাত্র কাম্য এ বিষয়ে সুধীজনের মধ্যে বোধহয় মতদ্বৈধ নেই।

আমি জানি যে ভালছেলের-মতন পড়াশুনা করার মূল্য সম্বন্ধে আমার এই বাগ্মিতা প্রকাশে আমাদের দেশের অনেক গুরুজনই এরূপ মতপ্রচারকারীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হবেন। কিন্তু কোন্ গুণকে কি দাম দিতে হবে সেটা নূতন অভিজ্ঞতা ও সত্যের আলোতে মিলিয়ে দেখ্‌বার সময় এসেছে। শাস্ত্র আচার, ও বয়স্কের "ছি ছি"-র ভয়ে চলে চলেই আজ আমরা শরীর, মন ও নৈতিকবলে এত সঙ্কুচিত ও সব উদ্যমেই এত দ্বিধাসন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি।

ক্রমশঃ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মানুষ পূজা

মহামানুষকে পূজা করি নিজের জীবনে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য।

মহামানুষকে শ্রদ্ধা জানাইবার সার্থকতা থাকিলেও শুধু শ্রদ্ধা জানাইয়াই মানুষ যেন তাহার কর্ত্তব্য শেষ না করে। পতিত জাতির একটা লক্ষণ এই যে মহামানুষকে শুধু শ্রদ্ধা করিয়া সে তাহার কর্ত্তব্য শেষ করে।

জাতি যখন এই ভাবের ভুল করিতে আরম্ভ করে, তখন আমরা দুঃখিত না হইয়া পারি না।

মহামানুষ জাতিকে মুক্ত করিতে পারে না,—মানুষের কাছে মানুষ যেন পরিত্রাণ ভিক্ষা না করে।—মানুষ নিজকে নিজে মুক্ত করিবে,—নিজের পরিত্রাণ নিজে লাভ করিবে।

মহামানুষের মূর্ত্তি পূজা করিও না,—তাহার আত্মাকে পূজা কর।—তাহার শিক্ষা, তাহার জীবন-বাণীকে গ্রহণ কর—তাহার দেহ লইয়া টানাটানি করিও না।

মহামানুষের দেহ পূজায় আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

জনৈক মহামানুষ মরিয়া গিয়াছেন—সংবাদপত্র লেখকেরা লিখিলেন—দেশের উজ্জ্বলতম রত্ন আজ খসিয়া পড়িল, কতকালে তাহার শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হইবে কে জানে?—দেশ আজ যথার্থই দরিদ্র হইল।—যেন জাতির কিছু করিবার নাই, চিরকাল তাহারা শিশু হইয়া থাকিবে—এক একটা বিরাট পিতা আসিবেন আর শিশুগুলিকে হাত ধরিয়া তাঁহাকে চালাইতে হইবে। সবাইকে বিরাট হইতে হইবে তাহা কাহারও মনে নাই।

একটা মানুষের মৃত্যুতে যদি জাতির মৃত্যু হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে জাতির বাঁচিবার যোগ্যতা নাই।

আলোক, জীবন ও শান্তির উপাসক আমরা,—শুধু ভক্তি শুধু শ্রদ্ধা জানাইয়া জীবনের কর্ত্তব্য বোধ করিবার মূঢ়তা হইতে আমরা যেন মুক্ত হই।

আঃ, মানুষ মহামানুষকে কেমন করিয়া অপমান করিয়াছে! মহামানুষেরা আকাশে বসিয়া মানুষের এই ভুল দেখিয়া কাঁদিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের কাছে বার্ত্তা আসিয়াছে।—

প্রত্যেক মানুষই দেবতা, প্রত্যেক মানুষই মহামানুষ। নিজকে অস্বীকার করিয়া মহামানুষের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিও না, তাহার অশ্রুর মর্য্যাদা করিও না। জীবনের এই পরম বেদনা হইতে মহামানুষকে বাঁচাও।

শ্রীলুৎফররহমান

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ

উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে

পশ্চিমদিকের দৃশ্য

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ দক্ষিণদিকের দৃশ্য
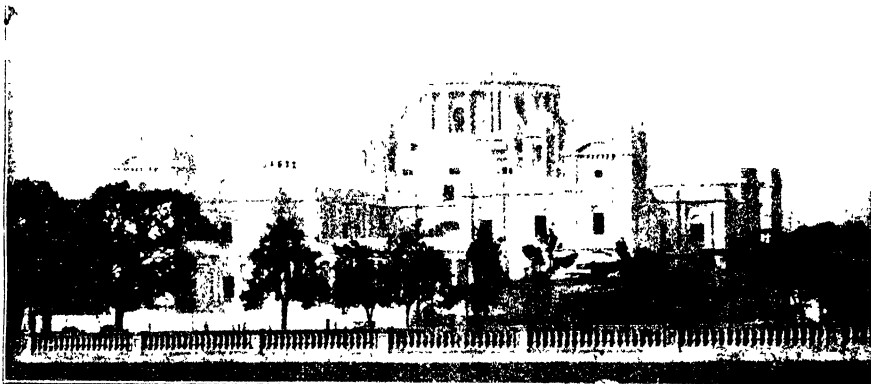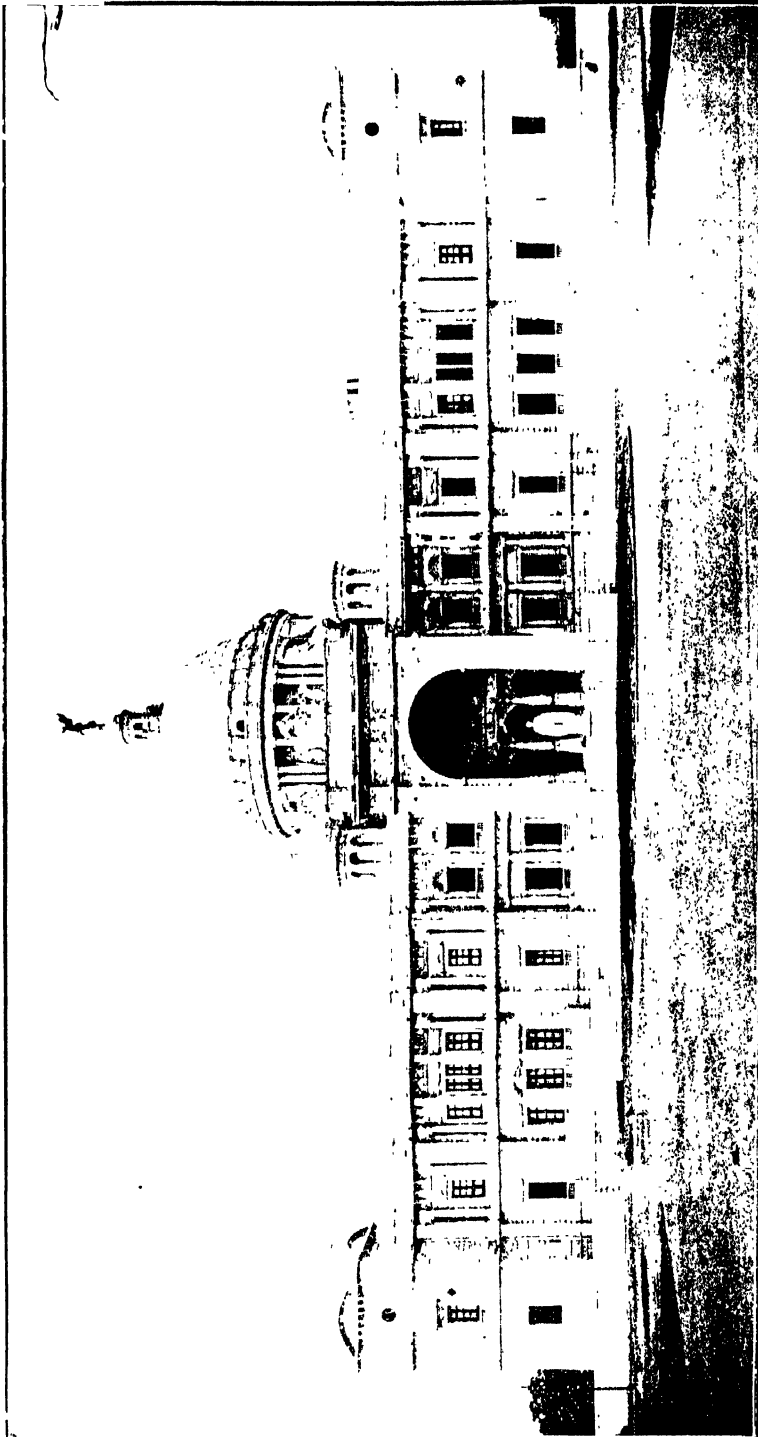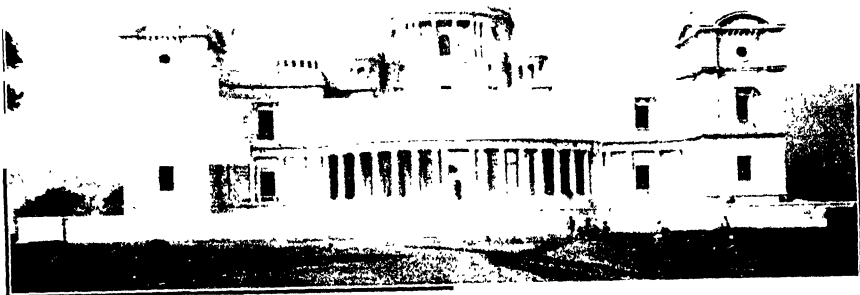
সৌধ প্রবেশ দ্বার

পূর্বদিকের দৃশ্য
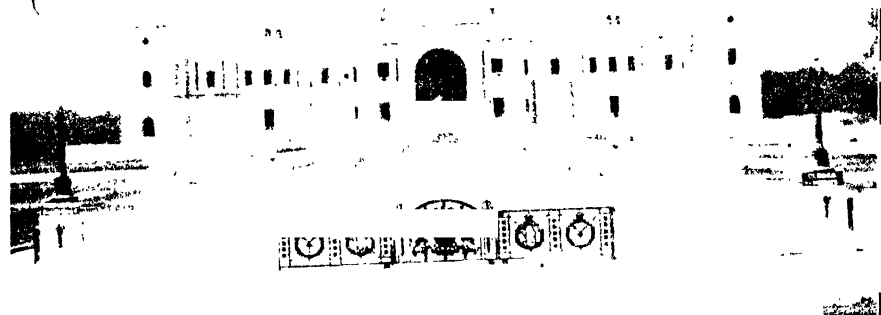
উত্তরদিকের দৃশ্য
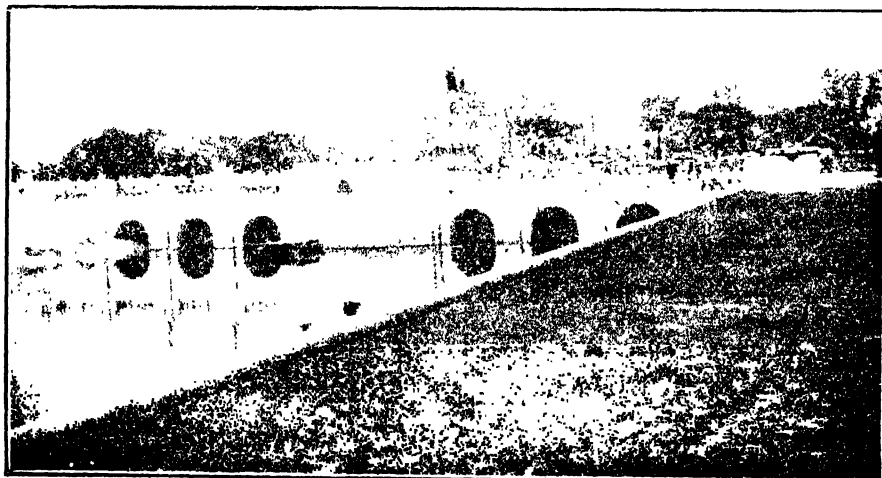
কুইন্‌স্‌ওয়ের প্রবেশ দ্বার হইতে সৌধ প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ

লর্ড কার্জ্জনের স্বপ্ন এতদিনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ১৯০১ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সৌধনির্ম্মাণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, দীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পরে তাহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, এবং গত ১৯২১ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে স্বর্গগতা সম্রাজ্ঞীর প্রপৌত্র বর্ত্তমান যুবরাজ সেই সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ রাজত্বের সময় ইংরেজ-সাম্রাজ্য এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে যথার্থই সে সম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না। এই বহুবিস্তৃত রাজ্যের অনেক স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সে সকল স্থানে বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু এই দরিদ্র ভারতবর্ষ ভিন্ন এই মহিমময়ী মহারাণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এরূপভাবে কোন স্থানে কিছু করা হয় নাই। খাস ইংলণ্ডই বা তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য কি করিয়াছে? লর্ড কার্জ্জনের মতে, ভারতে বিশেষ ভাবে স্মৃতি রক্ষার কারণ এই যে,—মহারাণী ভারতকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। তিনি ভারতবাসীর হিতকল্পে সর্ব্বদাই চিঠিপত্র লিখিতেন,—সকল সময় ভারতীয় পরিচারক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত থাকিত,—তিনি ভারতীয় ভাষা পর্য্যন্ত শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার জুবিলি উৎসবদ্বয়ে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ভারতীয় সামন্ত রাজগণ ও ভারতীয় সৈন্য সকল তাঁহার শোভাযাত্রার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল এইজন্যই কি এই বিশাল স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল?—না, লর্ড কার্জ্জনের ঐতিহাসিক স্মৃতি রক্ষা করিবার যে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান, ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি কালের কবল হইতে রক্ষা করিবার যে আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার ইহা একটী সুন্দর ও সময়োপযোগী সুযোগ মাত্র? অনেকে এমনও মনে করিয়া থাকেন মোগল রাজত্বের সৌধসম্পদ এই আত্মাভিমানী গভর্ণর জেনেরলকে উত্তেজিত করিয়াছিল; হয় ত, "সাজাহানের স্বপ্ন"-এর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। অপাতদৃষ্টিতে মমতাজ স্মৃতি-মন্দির ও ভিক্টোরিয়া মন্দিরে কিছু গঠন সৌসাদৃশ্য আছে; হয়ত বা তাজ-ছায়া বিলাসিনী যমুনার অনুকল্পে ভিক্টোরিয়া মন্দিরের সম্মুখে খাদ প্রভৃতি খনিত হইয়াছে; ১৯২১ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে "ইংলিশম্যান" পত্রিকাতেও ছিল "It dwarfs the Taj in size and majesty."

১৯০১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টাউনহল-সভায় লর্ড কার্জ্জন তখনকার রাজধানী কলিকাতায় এই স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি বহু লক্ষ মুদ্রার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুরের নিকট পনের লক্ষ, জয়পুরের মহারাজার নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সমস্ত অর্থ ও অতিরিক্ত নয় লক্ষ, এইরূপ বহু অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের সমস্ত অংশ হইতে সংগৃহীত অর্থে যে একমাত্র বঙ্গদেশ গৌরবলাভের

অধিকারী হইবে ইহা সকলের ভাল লাগে নাই। কেহ বলিলেন, প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হউক। কেহ প্রকাশ করিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষে যদি একটী মাত্র প্রতিষ্ঠান হয়, তবে তাহা স্থাপিত হউক মোগলের সৌধ গর্ব্বে গর্ব্বিত দিল্লীতে। কিন্তু দৃঢ়সংকল্প লর্ড কর্জ্জন বাগ্মিতায় সকলকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন।

কলিকাতা ময়দানের দক্ষিণাংশে ও ঘোড়দৌড় মাঠের পূর্ব্বদিকে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি জেল ছিল, সেই স্থানই এই সৌধনির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত হইল। ১৯০৬ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে তদানীন্তন প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ এবং বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর ইহার ভিত্তি-সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করেন। লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে, বিলাতের প্রসিদ্ধ শিল্পী সার্ উইলিয়ম ইমারসন্ সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোং কর্ত্তৃক তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅনুকুল চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল। যোধপুরের অন্তর্গত মাক্‌রাণা খনি হইতে আনীত প্রস্তরাদিতে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে জিনিষ পত্র দুর্ম্মূল্য হওয়ায় প্রথম বরাদ্দের ৫৪ লক্ষ টাকায় ব্যয় সংকুলান হয় নাই। এপর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

প্রধান সৌধের দৈর্ঘ্য ৩৩০ ফিট, প্রস্থ ৩৫৮ ফিট, কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক বারান্দা প্রভৃতি ধরিলে ইহার দৈর্ঘ্য ৪২৫ ফিট এবং প্রস্থ ৩০০ ফিট। ইহার উচ্চতা ২০০ ফিট—উচ্চতায় ইহা কলিকাতার ভিতর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অক্টোরলনী মনুমেণ্টের উচ্চতা ১৫২ ফিট। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতেও ইহা ২৪ ফিট উচ্চ। কেবল সেণ্টপল্‌স ক্যাথিড্রাল অপেক্ষায় ইহা ৫ ফিট কম। নবনির্ম্মিত কুইনস্‌ওয়ে রাজপথের উপর এই মহাসৌধ স্থাপিত। ইহার সিংহদ্বারের সম্মুখে কুইন্সওয়ের উপরেই লর্ড কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সিংহদ্বার হইতে সৌধ সোপানাবলী পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যভাগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রঞ্জ নির্ম্মিত প্রতিমুর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই মুর্ত্তি পূর্ব্বে লাট ভবনের দক্ষিণ দিকস্থ ময়দানে স্থাপিত ছিল।

মহাসৌধের প্রধান গম্বুজের নিম্নস্থিত গোলঘর কুইন ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত। এই ঘরের মধ্যভাগে মহারাণীর মধ্যবয়সের একটী প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই ভিক্টোরিয়া গৃহের উচ্চতার অর্দ্ধপথে একটী বারান্দা আছে এবং তাহারও কিছু উর্দ্ধে গৃহগাত্রে কুইন ভিক্টোরিয়ার জীবনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া বারখানি খোদিত চিত্র দেওয়ালে সংবদ্ধ আছে। এই চিত্রগুলি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিল্পী মিষ্টার ফ্রাঙ্ক সালিসবেরি কর্ত্তৃক কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিগেহের জন্য অঙ্কিত। চিত্রগুলি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের বিভিন্ন অংশের। সুতরাং যাহাতে চিত্রগুলিতে যথাযথ বয়সের সাদৃশ্য রক্ষিত হয়, সেইজন্য সম্রাট তাঁহার বিভিন্ন বয়সে গৃহীত সমস্ত ছবি সালিসবেরির ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে ছবিগুলি ভিক্টোরিয়া-হলের মধ্যে কিরূপ ভাবে আছে তাহা দেখাইবার জন্য সেই বার খানির মধ্যে আট খানি ছবি মুদ্রিত হইল। ছবিগুলির বিবরণ এই—
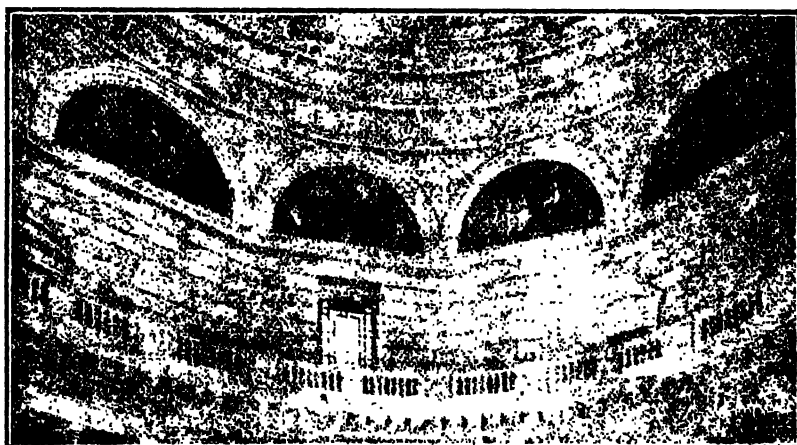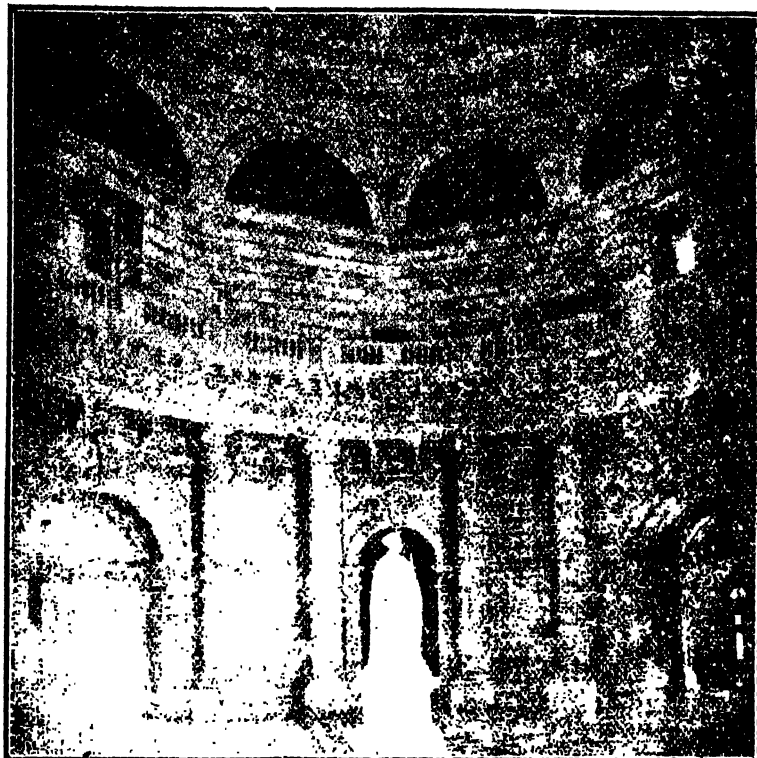
ভিক্টোরিয়া গৃহে ক্ষোদিত চিত্র

(১) ১৮৩৭ সালের ২০ জুন তারিখে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ।

(২) ১৮৩৭ সালের ২০শে জুন তারিখে কেনসিংটন রাজপ্রাসাদে প্রথম রাজসভা।

(৩) ১৮৩৮ সালের ২৮শে জুন তারিখে ওয়েষ্ট মিনষ্টার আবিতে অভিষেক।

(৪) ১৮৩৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে পার্লিয়ামেণ্টের ব্যাক্ষেপ।

(৫) ১৮৩৭ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখে মহারাণীরূপে লণ্ডন দর্শন।

(৬) 'সাম্রাজ্য'।

এই ছবিখানি প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে যে বৃটন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃটিশ সিংহ ও বাঙ্গলার ব্যাঘ্র লইয়া একটী স্ফটিক মণ্ডলের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং ভারতীয় সৈন্যগণ তদীয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছে। এই চিত্রে লিখিত আছে আধিপত্য (Dominion), শক্তি (Power), একতা (Unity), রাজভক্তি (Loyalty)—স্বাধীনতা আনয়ন করে।

(৭) ১৮৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেণ্ট জেমস্ গির্জ্জায় ভিক্টোরিয়ার বিবাহ।

(৮) ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতেশ্বরীরূপে মহারাণীর ঘোষণাবাণী।

(৯) দেবত্ব আরোপ—

এই চিত্রে মহারাণী রাজকীয় পরিচ্ছেদে ভূষিত হইয়া রাজকীয় মুকুট পরিধান করিয়া রাজদণ্ড ও রাজচক্র ধারণ করিয়া চন্দ্রাতপ তলে আসীন। ইহাতে অঙ্কিত ন্যায়বিচারের চিহ্ন 'তুলাদণ্ড' ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন অনির্ব্বাপনীয় বর্ত্তিকা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে তাঁহার রাজ্য ন্যায়বিচার, সততা, বিশ্বস্ততা ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত।

(১০) ১৮৮৭ সালের ২১শে জুন তারিখে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে জুবিলি উৎসব উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্য।

(১১) ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে সেণ্টপলস গির্জ্জায় হীরক জুবিলি উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্য।

(১২) ১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে —শেষ শয়ান।

এই চিত্রে শবযান—মহারাণীর রাজকীয় ভূষণে আচ্ছাদিত, শবাচ্ছাদন, রাজকীয় চিহ্নে মুদ্রিত এবং শবাধারের উপর রাজ-মুকুট, রাজদণ্ড, রাজচক্র স্থাপিত। ইউনিয়ন জ্যাকের সেণ্ট জর্জ্জের ক্রুশের উপর এই সমস্ত স্থাপিত। চারিটী বর্ত্তিকা চারিকোণে প্রজ্বলিত। বর্ম্মধারী প্রহরী শবরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। রাজলক্ষ্মী বৃটেনিয়া ভারতীয় পদ্ম ও ইংলণ্ডীয় পদ্মে নির্ম্মিত একটা তোড়া ধারণ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "ভিক্টোরিয়া উপকার সাধনান্তর বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন।" একটী রক্ত ও শ্বেত বর্ণের বালুকা ভূমির উপর অঙ্কিত বালিঘড়িতে দৃষ্ট হইতেছে ১৮১৯, এবং অপর একটী কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের বালুকা ভূমিস্থিত বালিঘড়ি নির্দ্দেশ করিতেছে ১৯০১।

সৌধের অন্যান্য স্থলে কুইন ভিক্টোরিয়া সংক্রান্ত আরও অনেক দ্রষ্টব্য চিত্রাদি রহিয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত পিয়ানো, লিখিবার টেবল ও চেয়ার উল্লেখ যোগ্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই স্মৃতিসৌধ প্রধানতঃ ভারতের ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষা কল্পে ব্যবহৃত হইবার জন্য লর্ড কর্জ্জন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ইহাতে নানা শ্রেণীর চিত্র, শিল্পাদি, নানা সময়ের প্রহরণাদি, নানা দলিল দস্তাবেজ, নানা পুস্তকের গ্রন্থকারের হস্তলিপি, নানা শ্রেণীর পুস্তক ও পত্রাদি, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের ষ্ট্যাম্প ও মেডেলাদি কালের ধ্বংস কবল হইতে রক্ষাকল্পে এইস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ; তবুও সামান্য কয়েকটি বিবরণ দেওয়া গেল।

ছবির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃশ্য চিত্র

১। আকবরের কবর ভূমি।

২। বেহারের রোটাশ গড়ের উত্তর পূর্ব্বভাগ।

৩। মুঙ্গের দুর্গের অন্তর্দৃশ্য।

৪। সেরশার দুর্গ।

৫। জুম্মা মসজিদের পূর্ব্বভাগ।

৬। শ্রীরঙ্গ পট্টম দুর্গের পূর্ব্বভাগ।

৭। কাণপুরের রক্তকক্ষ। (১৮৯৭)

নরনারী চিত্র

এই চিত্র শ্রেণীর মধ্যে টিপু সুলতানের জীবনী সম্পর্কীয় চিত্রাবলী প্রাণস্পর্শী ও চিত্তাকর্ষক। নিম্নে প্রধান প্রধান গুলির উল্লেখ করা গেল।

১। টিপুর শেষ চেষ্টা।

২। শ্রীরঙ্গ পট্টম্ দুর্গ আক্রমণ।

৩। শ্রীরঙ্গ পট্টম্ অধিকার।

৪। টিপুর মৃতদেহ অনুসন্ধান ও সার ডেভিড বেয়ার্ড কর্ত্তৃক মৃতদেহপ্রাপ্তি।

৫। টিপুর পরিবারগণ কর্ত্তৃক মৃতদেহ পরিচয়।

৬। টিপুর সন্তানদ্বয়ের আত্ম সমর্পণ।

৭। প্রতিভূস্বরূপ টিপুর সন্তানদ্বয়।

৮। টিপুর সন্তানদ্বয়ের অন্তঃপুর হইতে বিদায় গ্রহণ।

৯। লর্ড কর্ণওয়ালিশ টিপুর পুত্রদ্বয়কে প্রতিভূ-স্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন।

১০। টিপুর সিংহাসন।

বিশেষ চিত্র

১। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার (১৭৮৮।১৩ই ফেব্রুয়ারী)।

২। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়পুর প্রবেশোপলক্ষে হস্তীর শোভাযাত্রা। এই ছবিখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য ২২ ফিট ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্ত ১৬ ফিট ৪ ইঞ্চি। ইহা স্মৃতিগৃহে ঢুকিয়াই দক্ষিণ দিকের গৃহে স্থাপিত রহিয়াছে।

৩। লর্ড কার্জ্জনের সময়ে দিল্লী দরবার দৃশ্য।

৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রফেসার কেরী ও পণ্ডিত সভা।

৫। আকবরের নবরত্ন দরবার। এই চিত্রে আকবর দরবারের নবরত্ন—হাকিম হামান, রাজা টোডরমল, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, মোল্লা দো পেয়াজা, ফৈজি, আবুল ফজল, মীরজা তানসেন, নবাব খান খানান, (বৈরাম খাঁ নামে পরিচিত) এই নব রত্নের চিত্র আছে।

দলিলাদি

এই গৃহে যে সমস্ত দলিলাদি রক্ষিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। বিশেষ একস্থানে এতগুলি দলিলের সমাবেশ ঐতিহাসিক-গণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক এবং এইজন্য লর্ড কার্জ্জন বিশেষ ধন্যবাদার্হ। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য কয়েক খানির উল্লেখ করিলাম।

১। লর্ড ক্লাইব, এবং বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদার নবাব নাজিমদ্দৌলা ও নবাব সুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের সহিত সন্ধি (১৬ই আগষ্ট, ১৭৬৫)।

২। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মিরজাফরের সন্ধি। (১৩ই জুলাই, ১৭৬৩।

৩। লর্ড মিণ্টো ও নবাব সাদত আলি খাঁর সন্ধি (জানুয়ারি ২২, ১৮১২)।

৪। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও নবাব সুজা উদ্দৌলা বাহাদুরের সন্ধি (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭৩)।

৫। কাপ্তেন জন বুচানন নামক জনৈক কাপ্তেনের মৃত্যু হইলে তৎপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিচালক (Administrator) নিযুক্ত হইবার বিবরণ।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়পুর প্রবেশ

৬। কাপ্তেন জন বুচাননের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা ও উত্তরাধিকারী মেরীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংসের (১৭৫৮ সালের ৯ই) জুন দরখাস্ত। ইহাতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহি আছে।

৭। মৃত কাপ্তেন বুচনান সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা। ইহাতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের এটর্ণী এ, জেড্, হলওয়েল সাহেবের সহি আছে।*

৮। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরাণের কবিতাবলী। ইহাতে জাহাঙ্গীর ও

* ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথমা স্ত্রী কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া আলোচনা ও মতভেদ চলিতেছিল। বহুদিন পর্যান্ত ঐতিহাসিক গণের বিশ্বাস ছিল যে, ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে অন্ধকূপ হত্যার প্রতিশোধ কল্পে ওয়াট্‌সন ও ক্লাইবের অধিনায়কত্বে প্রেরিত সৈন্যদলের কলিকাতা প্রবেশের পূর্ব্বে বজবজ অধিকারকালে ঐ সৈন্যদলভুক্ত কাপ্তেন ডুগাল্‌ড্ ক্যাম্বেল নামক একজন ঘটনাক্রমে বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস ছিল যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী উক্ত মৃত ক্যাম্বেল সাহেবের বিধবা। গ্লিগ হইতে সার আলফ্রেট লায়েল পর্য্যন্ত হেষ্টিংসের সমস্ত জীবনচরিত লেখকই এই মত পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেণ্টজন্স চার্চ্চের ভূতপূর্ব্ব পুরোহিত (Chaplain) ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা হইতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে যে হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী অন্ধকূপ হত্যার ফলে মৃত কাপ্তেন জন বুচানন সাহেবের বিধবা। উপরোক্ত তিনখানি দলিল (৫, ৬, ৭) হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কাশিমবাজারের কবরভূমিতে মেরী হেষ্টিংস ও তাঁহার কন্যা এলিজাবেথের কবর আজও দেখিতে পাওয়া যায়। হাইড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নীর হেষ্টিংসের অনুপস্থিতকালে ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের ১১ই জুলাই তারিখে মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বয়স বোধ হয় হেষ্টিংসের জানা ছিল না, অথবা কালের ধর্ম্মে মুছিয়া গিয়াছে। কারণ, কালের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যখন ইহার সংস্কার করেন, তখন ইহাতে লিখিত হইয়াছিল, "ইনি ২—বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।" হেষ্টিংস এই সময়ে ইংরাজদিগের কাশিমবাজার কুঠির একজন কর্ম্মচারী ছিলেন মাত্র।

সাহাজাহানের সহি ও আলমগীর ও সেই সময়ের অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির মোহর চিহ্ন আছে।

৯। ফার্দ্দুসিকৃত "সাহনামা" :—ইহাতে পারস্য-দেশীয় রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে। ইহা ৯৯৯ খৃঃ সম্পূর্ণ হয়—এবং সুলতান মামুদের নিকট পঠিত হয়।

১০। পারসিক কবিগণের ও সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদি হইতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে মীর ওমাদ কর্ত্তৃক (১৬১০ খৃঃ) সারসংগ্রহের হস্তলিপি। মীর ওমাদ তাঁহার পারসিক হস্তলিপির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং কথিত আছে যে, তিনি এক একটী অক্ষরের জন্য এক একটী মোহর লইতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই হস্তলিপিখানি সত্তর হাজার টাকা মূল্যে তদানীন্তন নবাব নাজিম কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে এবং মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক ইহা স্মৃতিগৃহে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

১১। রণজিৎ সিংএর দিনলিপি।

১২। রণ সিংএর আদেশে রচিত তৈমুর লঙ্গ হইতে সাজাহান পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস। ইহাতে সম্রাটগণের চিত্র এবং ফরাসী পরিব্রাজক বারনিয়রের সাহাজাহানের রাজসভায় প্রবেশ মূলক একখানি চিত্র আছে।

১৩। সাদির "গোলেস্তান"—মীর ওমার কর্ত্তৃক গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে লিখিত পুস্তকের সম্রাট আলমগীরের আদেশে সৈয়দ আলি হোসেন কর্ত্তৃক অনুলিপি।

১৪। টিপু সুলতানের স্মৃতিলিপি।

১৫। আবুল ফজল রচিত "আইন আকবরী"র চিত্র সম্বলিত হস্তলিপি।

১৬। দারা সেকোর হস্তলিখিত "মাজমল বারায়ুন"।

১৭। দারা সেকোর হস্তলিখিত "সিরাব আছরার" (উপনিষদের অনুবাদ)।

১৮। হস্তলিখিত "মসনবি মির হাসান"।—হাসান মীর লক্ষ্ণৌবাসী একজন হিন্দুস্থানী কবি ছিলেন। তিনি বদরে মুনির ও বেনজীরের প্রেম বিষয়ক উর্দ্দু ভাষায় একখানি উপন্যাস লিখিয়া ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে নবাব আসফ উদ্দৌলার নামে উৎসর্গীকৃত করেন।

উপরে চিত্র বা পুস্তকাদির যে উল্লেখ করা হইল তাহা অতি সামান্য মাত্র। ফলতঃ এই স্মৃতি-গৃহ ঐতিহাসিক ভাণ্ডাররূপে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী

"আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু"

দেখিলাম কিবা মৃত্যু অমরবাঞ্ছিত;
যেই মৃত্যু দেখিবারে ছিল একজন
বসি রোগশয্যাপাশে, স্থির অচঞ্চল,
রোগে শোকে শতজীর্ণ কঙ্কালের মত
দেহখানি লয়ে; ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই
নাহি কাতরতা, আশঙ্কা উদ্বেলজাত
উথলিত অশ্রুধার সম্বরি গোপনে,
নির্নিমেষ চক্ষু দুটী রাখি মুখ পানে
ছিল অহর্নিশ; যতদিন যতক্ষণ—
না ফুরাল ক্রমক্ষীণ আশার স্বপন।

* * * *

কি হইবে হায়! যেই দিন এই দেহ
শুইবে শয্যায় অন্তিম শয়ন তরে?
কে রাখিবে চক্ষুদুটী এই দেহ পরে?
তখনও কি প্রিয়তমে! তুমি একবার
আসিবে তোমার সেই দেবপুরী হতে,
দেখিতে যাতনা মম অন্তিম সময়ে,
বসিতে শিয়রে, বুলাইতে কমকর
জীর্ণ দেহে, শীর্ণ বক্ষে, শুষ্ক গণ্ড'পরে?

* * * *

একি ভ্রান্তি! এ আশঙ্কা কেন উঠে মনে,
কেন সে আসিবে, কেন সে কাঁদিবে আর
অদৃষ্ট লিখনে সে যে সুখে চলে গেছে,
পূর্ণ করি জীবনের কামনা তাহার,
শোক-দুঃখ-বিবর্জ্জিত শান্তি নিকেতনে।

* * * *

চাহি সুধু শূন্য পানে নিরাশ নয়নে,
ভাসাইয়া গণ্ডস্থল নিজ অশ্রুজলে,
চরম নিশ্বাস হবে ত্যজিতে তোমার,
নিদারুণ বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিচার।

হারানো খাতা

দশম পরিচ্ছেদ

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায়, বিষম ঝড়ে,
নাই মা, বধূ নাই, খেতে কে দেবে ভাই,
কে তা'রে দেবে ঠাঁই বৃষ্টি পড়ে।

—তীর্থ সলিল।

পঠন পাঠন চলিতে লাগিল। যদিও গুরু শিষ্যা উভয়েরই পক্ষে এই শিক্ষাদান ও শিক্ষা-লাভ ব্যাপারের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও আগ্রহ বা আনন্দের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ছিল না; উভয় পক্ষের সবটুকুই শুধু দায় ঠেলার খাতির, সুতরাং ফলও ঠিক তদনুযায়ী প্রচূরতররূপে ফলিয়া উঠিতে লাগিল, অর্থাৎ বড় একটাই দেখা গেল না। পরিমল প্রথম দিনের সেই সঞ্চারিত সঙ্কোচকে প্রাণপণে যুক্তি তর্ক ও সিদ্ধান্তের দ্বারায় কোনমতে তাহার মন হইতে অপসৃত করিয়াছিল। নিজেকে সে এই বলিয়াই শান্ত করিতে চাহিল যে, মানুষের মত মানুষ যে কত থাকে; একজনের গলার সুরের মতন কি আর আর-একজনের গলার স্বর থাকে না? এর হাসি তো দেখিনি; বোধ হয় এ মোটেই হাসে না, কিন্তু তার,—তার হাসিটীই যে তার সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য ছিল। এর আড়ন সেই রকমই বটে, কিন্তু সে রং, সে চোখ, সে চুল সেই বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠন—সে সব এর কোথায় কি? তারপর তাহার ঠোঁটের কোনে একটী ফোঁটা হাসি এবং চোখের কোনে ফোঁটা দুই অশ্রু দেখা দিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমিও কি পাগলের বাতাস লেগে পাগল হলেম নাকি? কি ছাই ভাবছি? যাকে নিজের চোখে মর্‌তে দেখলেম, পুড়িয়ে পর্য্যন্ত এলো, তার সঙ্গে কার কতটুকু মিল কোথায় খুঁজলে পাওয়া যায়, সেই ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে লাভ? মনকে সে কড়া হুকুমে ঠাণ্ডা করিতে চাহিল। সেদিন পড়িতে গিয়াই সে বই খুলিবার আগে ভাগেই মুখ খুলিয়া এবং মুখ তুলিয়া নিরঞ্জনের বিদগ্ধ ও বিব্রত মুখের দিকে করুণচোখে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতরটা যেন করুণায় ও বেদনায় নিবিড়ভাবে ভরিয়া আসিল, তখন সে গভীর সহানুভূতি ও ব্যথায় বিজড়িত চিত্তে তাহার সহিত আলাপ করিতে বসিল। নিরঞ্জন নতমুখে তাহার পাঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ম্যাকমিলানের ছাপা স্কুল পাঠ্য বই এর মাপাজোকা রচনার পরিবর্ত্তে তাহার কানে আসিয়া সবিস্ময়ে এই প্রশ্নটা প্রবেশ করিল—

"আচ্ছা মাষ্টার মশাই! আপনার দেশ কোন খানে ছিল?"—

নিরঞ্জন প্রথমে চমকিয়া উঠিল ; তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল ; আরও খানিক পরে সে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "বসিরহাট"।

"বসিরহাট! তবেতো ঠাকুরঝিদের দেশেরই লোক আপনি! হারাণ চন্দ্র ঘোষেদের জানেন? নাম শুনেছেন অবশ্য? সেই হারাণঘোষের মেজ-ছেলেই আমার নন্দাই। তার নাম জ্যোতিঃ প্রসাদ ঘোষ। সে গেল বছর ওকালতি পাশ করে উকিল হয়েছে। জানেন তাকে? বড্ড ভাল ছেলে সে। নেহাৎ ভালমানুষ, যেন গো-বেচারী একেবারে!"—

পরিমলের মনের মধ্যে বোধ করি মানুষের পরিচয়ে তাহার গো-জন্মের আভাসটা একটু বেশী পরিমাণে সুব্যক্ত হওয়াটাকেই তাহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বোধ ছিল, সেই জন্যই সে সুযোগ পাওয়া মাত্রে তাহার এই নিরীহ প্রকৃতির নন্দাইটীর প্রশংসা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে করিয়া বসিল, এবং ইহার মধ্যে প্রসুপ্ত রহিল যাহারা 'গো-বেচারা' নহে, তাহাদেরই সম্বন্ধে ঈষৎ একটুখানি গ্লানির আভাস।

নিরঞ্জন আবার যেন কতকটাই ইতস্ততঃ করিল। তারপর সঙ্কুচিতভাবে সে জবাব দিল "না না, ওঁকে আমি চিনিনে, আমি অনেকদিন দেশ ছাড়া।"

ঈষৎ দমিয়া গিয়া পরিমল তখন ছোট্ট করিয়া একটী "ওঃ" বলিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তকের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল, এবং তৎপরে পুনশ্চ একটুখানি আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? আপনার মা বাবা নেই বোধহয়? আচ্ছা, ভাই বোন নিশ্চয়ই আছেন? আর কেউ? আর কোন আত্মীয়?"

একটা দীর্ঘ ও ব্যথাভারাতুর নিশ্বাসের শব্দ তাহার সকল উৎসাহকেই দমিত করিয়া দিয়া আরও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল,—"কেউ না।"

পরিমলের বুকের মধ্যে এই আর্ত্ত স্বরটা এম্‌নি ভীষণবলে বাজিয়া উঠিল যে, সেই নিঃসঙ্গ নিঃশেষিত মরুভূমির মতই জীবনের ভয়াবহ শূন্যময়তা সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরেরও অন্তরে অনুভব করিল ও তাহার অকৃত্রিম সহানুভূতি একান্তভাবেই এই সর্ব্বহারা এবং আত্মহারা অভাগাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে যে জানে,—এই নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব পরিত্যক্ত জীবনের দুঃখ যে কি বিষম, কি দুর্ব্বিষহ। সে যে নিজে তার ভুক্তভোগী, সে যে নিজের বুকের ভিতর হইতে এ অপরিমেয় দুঃখের রিক্ততা ও তিক্ততা আজও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেছে! যদি যে সদয়চিত্ত এই পথপ্রান্তের মরণশয্যালীন দুরবস্থার চরমে পতিত ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়া সযত্ন সেবায় জীয়াইয়া তুলিলেন, সেই তাঁহারই উদার অন্তর তাহারও জন্য না কাঁদিত,—যদি সেই তিনিই তাহাকেও ওম্‌নি করিয়াই পথের ধূলার মাঝখান হইতে—শুধু তাই নয়—একেবারে নিজের বুকে তুলিয়া না লইতেন,—তবে আজ তাহার অবস্থা ইহার চাইতেও আর একটু শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত কি না তাও বেশ জোর করিয়া বলা যায় না! স্বামীর দয়া যে কি অসীম, এবং

তাঁহার পরে তাহার কৃতজ্ঞতা যে কতই গভীরতর হওয়া উচিত তাই ভাবিয়া, ও নিজের মধ্যে যে জিনিষটা অপর্য্যাপ্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা পর্য্যাপ্ত দেখিয়া, নিজের প্রতি সে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মনটাকে অন্যদিকে ফিরাইতে চাহিয়া তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতের লেখাটী তো খুবই সুন্দর! ইংরেজী উচ্চারণও খুব কম জানার মতন লাগে না। তাহলে আপনি কেন কাজ কর্ম্ম না করে অত কষ্ট সইছিলেন? কতদিন বাড়ীছাড়া হয়েছেন আপনি?"

নিরঞ্জন এই প্রশ্নগুলা নতমুখে শুনিয়া গেল। কিন্তু তাহার ভাবশূন্য নিশ্চল শরীরে ইহার উত্তরের কোন চেষ্টাই জাগ্রত হইতেছে কি না, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। অগত্যা পরিমল তাহার কৌতূহলবৃত্তিকে দমনে রাখিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিল এবং অনেকখানি পড়া হইয়া গেলে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মাষ্টার মশাইএর কানে তাহার পাঠের শব্দটুকু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে না, এম্নি গভীরতর অন্যমনস্কতায় তাহার মনকে অভিভূত প্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তখন সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাকবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল ও তারপরই কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সমস্ত শরীরে ও মনে ভীষণভাবে শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়া গেল, সে যেন কোন এ-জগতের প্রাণীর সান্নিধ্যে নাই,—এই যে মানুষটীর সাম্‌নে সে রহিয়াছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যেন কোথায়ও একটু যোগ আছে কিন্তু সে যেন পুরাপুরি এখানের নয়। চেহারাখানা এর মোটামুটি দেখিতে মানুষেরই মত বটে, গলার স্বরও এই দেশেরই সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে,—কিন্তু না,—তবু না—কিছুতেই ইহাকে যেন রক্তমাংসের জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না! এ যেন কোথাকার একটা ছায়া, কোন্ দূরান্তর প্রস্থিতের একটুখানি মায়ামূর্ত্তি এর মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায়; শুধু সেইটুকু আর বাকি সবখানিই এর অবাস্তব, অসঙ্গত, অনাসৃষ্টি! পরিমলের মনের মধ্যটা ছমছমে হইয়া উঠিল। এই শব্দহীন,—স্পন্দনেরও চিহ্ন যাহার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট নয়—তাহার সান্নিধ্যকে সভয়ে বর্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

নরেশ সেদিন অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, পরিমল খবর দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেখ, নিরঞ্জনকে আর কোন কাজ দিয়ে আমার জন্য অন্য কোন শিক্ষয়িত্রী ঠিক করে দিতে পারো না? সেই যদি পরিশ্রমই কর্‌বো, তা'হলে যাতে কাজ হয়, সেই রকমই তো করা ভাল।"

নরেশ ইদানীং পরিমলের মুখে মাষ্টার মশাই'এর বিদ্যাবুদ্ধি ও বিনয়ের বিস্তর খ্যাতি শুনিতে-ছিলেন। আজ আবার হঠাৎ এই অনুযোগে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আবার কি হলো?"

পরিমল বলিল, "হয় নি কিছুই, তবে পড়া বড় হয় না কিনা তাই বল্‌ছি, উনি বড়ই অন্য-মনস্ক, আমার অনেক সময় নষ্ট হয়।"

নরেশ নিজেও এটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই স্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইতে না পারিয়াই ঈষৎ চিন্তিতমুখে কহিলেন, "আচ্ছা তা হলে ভেবে চিন্তে দেখি, ওকে আর কি কাজ দিতে পারা যায়। কিছু না দিলে তো ওকে ওম্‌নি রাখা যাবে না, সেই যে হয়েছে মহা মুস্কিল!"

পরিমল বোধকরি পূর্ব্বাবধি এবিষয়ে কিছু কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সে প্রস্তাব করিল—"ছাপাখানার কোন কাজ দেওয়া চলে না?"

নরেশ কহিলেন "দেখি, তাই না হয় কোন কিছু যদি পারে। বাংলাটা কি রকম জানে বুঝলে কিছু? ইংরাজী যে মন্দ জানে না, সেটা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু বাংলা যদি তেমন—"

পরিমল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া আসিল ও উহা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল "পড়ে দেখ।"

নরেশ কাগজটার ভাঁজ খুলিয়া দেখিলেন তাহার ভিতরপৃষ্ঠায় একটা কবিতা লেখা। কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন,—

"কাঁদিতে এসেছি আমি কাঁদিয়াই চলে যাব,
এসেছি অনন্ত হতে অনন্তেই মিশাইব।
দুঃখের তরঙ্গ তুলি,　　এসেছি আপনা ভুলি,
খুঁজিব বিরাট বিশ্ব কোথা গেলে সীমা পাব।

জগতে হবে না সুখী এ পোড়া পরাণ মন।
অসীম দুঃখেরে আমি করে আছি আলিঙ্গন।
আপনি নীরবে রহি,　　আপন যাতনা সহি,
অপরে করিতে দুঃখী চাহে না কো এ জীবন।
ভবের সুখের আশা করিয়াছি বিসর্জ্জন।

না চাহি কাহারও স্নেহ কাহারও ভালবাসা,
রাখিনে রাখিনে মনে পার্থিব প্রেমের আশা
কারও উপেক্ষার হাসি,　　সহিতে গঞ্জনা রাশি—"

কবিতা অসমাপ্ত। নরেশ পাঠশেষে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে লিখেছে—নিরঞ্জন?"

পরিমল মাথা দুলাইয়া সায় দিল। তারপর বলিল "আরও দুটো একটা ওঁর টেবিলে পড়ে থাক্‌তে দেখেছি, একটা মোটে ক'টা লাইন লেখা। সেটা আমার মনেই আছে।

পাবো কি না পাব ফিরে কেন বৃথা এত ভয়?
কেন, কেন এ সংশয়?
যখন দাঁড়াব গিয়ে তোমার চরণতলে,　　আমার গচ্ছিত নিধি ফিরাইয়া দাও বলে,
না দিয়ে পারিবে কিগো ফিরাইতে দয়াময়!
তবে কেন এ সংশয়?

দেখ, মাষ্টার মশাইএর বউ নিশ্চয় ছিল, মরে গেছে, তাইতে ওঁর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না ?—কিন্তু স্ত্রীকে কি রকম ভালবাসে বলতো ?"

নরেশ হাসিয়া নিজের স্ত্রীর গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া জবাব দিলেন, "ঠিক যেন মহাদেবের সঙ্গে সমান! স্ত্রীটীও হয়ত সতী-ঠাকরুণের মতই পতির জন্য দেহ ত্যাগ করে থাকবেন। তা না হলে কি আর অতটাই পারা যায় ?"

কথাটীর মধ্যে বেশ একটুখানি খোঁচা খাইয়া পরিমলও সেটুকু তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দিল।—"তাই কি আর বল্‌তে পারা যায় ? এই সেদিন কালীঘাটে একটী মেয়ে স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ দেখে আর ডাক্তারের মুখে 'আশাহীন' কথাটা শুনেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবেনা বলে তক্ষুনি নিজের প্রাণটা নষ্ট করে ফেল্লে, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকটী সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং স্ত্রীর অত বড় আত্মত্যাগের মূল্য শোধ করলেন কি দিয়ে জানো ? বৎসর না ঘুরতেই একটী নূতন বউ ঘরে এনে। এই তো সব তোমরা !"

নরেশ এ ঘটনাটি জানিতেন, কাজেই মাথা পাতিয়া এই নিন্দাটুকু গ্রহণ করিয়া লইতেই হইল এবং হাসিয়া উঠিয়া রহস্য করিয়া জবাব দিতে হইল, "তা মহাদেবও শেষটায় পার্ব্বতীকে বিয়ে করে ছিলেন। তারটীরও হয়ত সেই রকমই অংশাবতার হয়েছিল টিল, তার কে' কি জানে বলো! আচ্ছা তাহলে নিরঞ্জনকে আমাদের 'কর্ণধারেরেই কর্ণ ধরিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমার উক্ত কার্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর খোঁজ খবর করতে হবে।"

পরিমল কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া চাপা হাসির মধ্যে তর্জ্জন করিয়া উঠিল "যাও।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

আদিগঙ্গার উপরে ছোট্ট একখানি লালরংয়ের দোতলা বাড়ীর গঙ্গার ধারের পাঁচিল ঘেরা ছাতে কয়েকটী ফুলের গাছ টবে সাজান এবং তারই মধ্যে একখানি কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া একটী মেয়ে এস্‌রাজ বাজাইতেছিল, টবের গাছগুলি সদ্যজলসিক্ত, তখনও ভিজামাটীর গন্ধটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। রজনীগন্ধা, দুএকটা জুঁই এবং কতকগুলি ভুঁইচাঁপা, জিনিয়া আর কস্‌মিয়া জাতীয় ফুল অল্প বিস্তর ফুটিয়া রহিয়াছে। গোলাপের গাছ দুটো একটা আছে কিন্তু ফুল তাহাতে একটাও ফুটিয়া উঠে নাই।

মেয়েটীর বয়স সতের বা আঠরোর বেশী নয়। রূপ, হ্যাঁ, তা রূপ তাহার শরীরে নেহাৎ কম ছিল না। গোলগাল গড়ন, অথচ একটু ক্ষীণ দেহ, রং আরমানী বিবিদের মত না হোক তবু

সচরাচর যাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে ফরসা রং বলে তাহাতেই একটু খানি জৌলুস ছিল। চোক দুটী মাঝারি, নাক, কপাল, ঠোঁট সবই তাহার মাঝামাঝি, শুধু চুলগুলিতে বড় বেশী বিশেষত্ব ছিল। —কোঁকড়ান না হইলেও, রেশমের মতন নরম, কাল ও ঢেউখেলান খোলা চুলগুলি তাহার বাজনার তালে তালে তাল দিয়া যখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, তখন অপরাহ্নের শুক্তি-শুভ্র আকাশের একপ্রান্তে আকস্মিকোদিত প্রাবৃট মেঘের কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। একেবারেই নিরাড়ম্বর বেশভূষণে এই সুশ্রী মেয়েটীকে যেন বেশী করিয়াই সুন্দরী মনে হইতেছিল। বাজনা বাজানর সখ মিটিয়া গেলে সে কোলের উপর হইতে যন্ত্রটাকে নিজের পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া দিয়া বেঞ্চির পিঠের উপর নিজের পিঠ চাপিয়া একটু আয়েস করিয়া বসিল এবং তারপর গুণ গুণ করিয়া একটা গান আপনার মনেই গাহিতে বসিল। বাজনায় সুর যেমন চড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশের বাড়ীর ছাদে যে যুবকটী প্রায় প্রত্যহই তাহার উঁচু পাঁচিলের ছোট ছোট ফুকর দিয়া তাহার অদৃশ্যপ্রায় মূর্ত্তিটাকে একবার চোক বুলাইয়া লইয়া কৃতার্থ হইবার লোভে উঁকিঝুঁকি মারিয়া শেষে বিরক্তমনে আর এক দিকে চলিয়া যায়, আজও তাহার এস্রাজ নিজের সেই নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে ত্রুটী রাখেন নাই; কিন্তু গানের এ গুঞ্জন সেই উৎসুক পিয়াসীর কর্ণগোচর পর্য্যন্ত হইল না, এ শুধু এই পুষ্পবাসিত, নিরালা ছাদটীর বুকেই একা একা নিজের সকরুণ মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। সে একেবারেই যেন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অন্যমনস্কভাবে গাহিতে ছিল—

"এসো এসো ফিরে এসো, বঁধুহে, ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত—নাথহে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো, ওগো করুণ কোমল এসো,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত, সুন্দর ফিরে এসো।"

গানের সঙ্গে যখন প্রাণের ঘনিষ্টতর সংযোগ ঘটিয়া উঠে, তখন গানের বাণী আর বাহিরের শব্দ মাত্র থাকে না, তাহা প্রাণের কথায় পরিণত হইয়া যায়, গান তখন ধ্যানের আসন গ্রহণ করে। এই গায়িকাও তেমনিতর তন্মনস্ক হইয়া গিয়া বেঞ্চির পিঠে মাথা রাখিয়া এলায়িতদেহে অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে পায়ের তালে তাল দিয়া যেন গানের বাণী ভুলিয়া গিয়া প্রাণের ভাষাতেই ভাসিয়া চলিতেছিল,—

"আমার নিতি সুখ ফিরে এসো, আমার চিরসুখ ফিরে এসো;
আমার, সব সুখ দুঃখ মন্থন করা বাঞ্ছিত ফিরে এসো,"—

এই ছাদে আসিতে হইলে সিঁড়িতে উঠিয়া যে দালানটা পার হইয়া আসিতে হয় সেইখানে ঠিক সেই সিঁড়ির মাথায় জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল। গানের সুরে ও ভাবে মন ছাইয়া থাকায় গীত-

কারিণী তাহা জানিতে পারে নাই দেখিয়া, যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, সে সেইখানেই একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। চুরি করিয়া পাশের বাড়ীর লোকটীর মতন গান শোনার জন্য যে রহিল তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না; বোধ করি কোন একটা সংশয় বা দ্বিধায় পড়িয়াই সে ওই রকম চলচ্চিত্ত বা মানসিক কোন দ্বিধায় দোদুল্যমান হইয়াই রহিল। একবার তার যেন যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবার জন্যও মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার সিঁড়ির ধাপের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই প্রমাণ করিয়া দিল; আবার কি ভাবিয়া কে জানে সে নিজেকে ফিরাইয়া লইয়া ছাদের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর যেন মনকে শক্ত করিয়া একেবারে গট গট করিয়া সঙ্গীতকারিণীর পিঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—বোধহয় একটু শব্দ হইয়া থাকিবে—মেয়েটী গান বন্ধ করিল। চোক মেলিয়া ও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া চুলের গোছাটাকে ঠেলিয়া দিয়া সে তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কপালে হাত ঠেকাইয়া একটী নমস্কার করিয়া সে চুপটী করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রকার ভাল মন্দ একটী সম্ভাষণের কথাও তাহার মুখ দিয়া যেন বাহির হইল না। মনের মধ্যে একটা বড় রকম ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল কি না বলা যায় না। তবে ওই গানটাই যে সে বিশেষ করিয়া এমন সময়টায় গাহিতেছিল ইহারই জন্য লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ঘুরিয়া আসিয়া ইহার পরিত্যক্ত আসন খানায় বসিয়া পড়িলেন এবং ইহারই হস্তচ্যুত বাজনাটা নিজের জানুর উপর তুলিয়া ধরিয়া বাজনা রাখা জায়গাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া উহাকে আমন্ত্রণ করিলেন "বসো।"

মেয়েটী উঁহার পাশের জায়গাটীতে না বসিয়া খানিকটা দূরে খালি মেজের উপর বসিয়া পড়িল। নরেশ—আগন্তুক নরেশচন্দ্র একবার—"অনুসন্ধিৎসুচক্ষে উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণে এস্‌রাজে ঝঙ্কার তুলিয়া অনুরোধের সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একটা গাইবে?"

মেয়েটীর মুখের উপর কোন ভাবের রেখাই পড়ে নাই, যা ছিল সে তার মনের ভিতরেই ছিল, মুখখানাকে অমন ভাবশূন্য রাখিতে মনের মধ্যে তাহার কত খানি বেগ দিতে হইতেছিল, তা' সেই জানে, তবে বাহিরে সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয় নাই। মাথা হেলাইয়া সে নিজের সম্মতি জানাইলে নরেশ অনির্দ্দেশ্যভাবে তারের উপর ছড়ি চালাইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন "কোন্‌টা গাইবে?"

সে নম্রস্বরে জবাব দিল "যেটা বল্‌বেন।"

"আমি যেটা বল্‌বো সেটাই যে তোমার গাইতে ইচ্ছে হবে, এমন কি কথা আছে? যেটা তোমার ভাল লাগবে সেইটাই তার চাইতে গাও না কেন সুষমা!"

সুষমা ক্ষণকাল মাথা নত করিয়া কি ভাবিল, তারপর মুখ না তুলিয়াই আস্তেআস্তে গান ধরিল—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,—
প্রভু! তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে,—
যায় যেন মোর গভীরতর আশা—
প্রভু! তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে,"—

গানটা আরম্ভ করিয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল, এ গানও আজ ইঁহার সাক্ষাতে তাহার গাওয়া ভাল হয় নাই। আধ্যাত্মিক হিসাবে এ সব খুবই বড় জিনিষ বটে এবং সবারই এ জিনিষের উপর দাওয়া আছে। কিন্তু মানুষ সব কিছুরই বড়র দিকটার চাইতে ক্ষুদ্র অংশটুকুই সহজে দেখিতে পায় অথবা দেখিতেই চাহে। অর্থবিকৃতি ঘটাইয়া এই সর্ব্বস্বান্তকর আত্ম-নিবেদনকে যে নিজের ভোগে লাগাইতে না পারা যায় তাওতো নয়! তার চেয়ে সে যদি গাহিত,—

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখেরই জলে!"

না, তাহাতেও তার মনের দুর্ব্বলতা হয়ত ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘুচিত না!

গানশেষে নরেশ বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফুল গাছের টবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রশংসাসূচকভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ ভারি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে তো তোমার! সুষমা! তোমার সেই হীরেমনটা কি কি কথা কইতে শিখেছে? কই সেটাকে যে দেখছি না? ননীবাবু তো তার প্রশংসা করতে শতমুখ হয়ে ওঠে।"

সুষমাও তাহার মান্যবান অতিথির সঙ্গেসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; "সেটাকে আমি খাঁচাখুলে উড়িয়ে দিয়েচি।"

"উড়িয়ে দিয়েছ! ওঃ অসাবধানে উড়ে গেছে বুঝি? সুন্দর পাখীটা ছিল!"

"সুন্দর বলেই তো তাকে তার কুৎসিৎ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিলাম। স্বাধীন হয়ে কি আনন্দেই সে উধাও হয়ে নীল আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল! তার মনে তখন কি আনন্দই হচ্ছিল!"

নরেশ মৌন বিস্ময়ে দু চোখ ভরিয়া সেই এতক্ষণকার নির্ব্বাক এবং এক্ষণে উচ্ছ্বসিতমুখী নারীর সহসা উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন তাহার মনের ভাবটা একটুখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া চয়ন-করা-এক-গোছা রজনীগন্ধা লইয়াই ফিরিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "সুষমা! স্বাধীন হওয়াই কি সর্ব্বত্র বাঞ্ছিত? স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নেই, লজ্জা নেই?"

সুষমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "আছে, যতদিন না মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস করতে শেখে সে আশঙ্কাও ততদিনের, কিন্তু যদি কোন দেবতার আশীর্ব্বাদ

তাকে স্বাবলম্বনের মহৎ শিক্ষায় দৃঢ়করে তুলতে পারে তখন তারপর থেকে অধীন জীবনের লজ্জা তার পক্ষে সব চেয়ে বড় লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় না কি ?"

নরেশ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর অতি মৃদু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমায় আসতে লিখেছিলে কেন ?"

সুষমা আবার নতমুখী হইল, নরেশের দৃষ্টি হইতে নিজের মুখ সে একটুখানি আড়াল করিয়া রাখিয়াই শান্ত অথচ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল "এমন করে আর তো আমার দিন কাটবে না, তারই একটা উপায় করে দেবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমার বোঝা যখন ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তখন তো আর হঠাৎ ফেলতেও পারবেন না। যা ভাল হয় করুন। না হয় এই খাঁচার দরজা খুলে দিন।"

নরেশচন্দ্র এই কথায় একটুখানি ব্যথিত হইলেন। সহসা জোর করিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি ঈষৎ আবেগভরেই কহিয়া উঠিলেন, "আমার নির্লিপ্ততা তোমায় দুঃখ দিয়েছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমিই যে আমার সেই থেকে সে অধিকার কেড়ে নিয়েছ সুষমা! আমায় যে বারণ করেছিলে। তাতেই আসি নি।"

সুষমা মুখ তুলিল না। সেই আধ-ফেরানো মুখেই চাপাকণ্ঠে সে উত্তর দিল "তার জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই, আপনার অম্লান চরিত্র আমারজন্য লোকের চোখে আজও ম্লান হয়ে রয়েছে, আর সে দাগ নারায়ণের বুকের ভৃগুপদচিহ্নের মত, হয়তো চিরস্থায়ী হয়েই রইলো। এতবড় অভাগীকে যে শুধুই নিজের দয়াগুণে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন,—তেমন কথা বিশ্বাস করবার মত উদারতা ক'জনের আছে। তারপর এখন আপনি বিয়ে করেছেন; আপনার স্ত্রী, বৌ রাণীর কানে যদি ওঠে আপনাদের দাম্পত্য জীবনের শান্তি নষ্ট হবে, সে আমি জানি বই কি! তা নয়, তা নয়; সত্যি সত্যি আর আমি পারচি না। আমার এ অবস্থা আমার আর সহ্য হচ্ছে না! আপনি বুঝতে পার্‌চেন না, আমার এই খাঁচা কত বড় অসহ্যই যে হয়ে উঠেছে!"

সুষমা সুগভীর নিশ্বাসে যেন তাহার অন্তরস্থ অসহনীয় যন্ত্রণানলের অনেকখানি বাহিরে প্রেরণ করিয়া নীরব হইল, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোমল চিত্তে তাহার সেই মর্ম্মবিদারী বেদনার কাতর কণ্ঠ অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই সুরভরা বীণার তারের মতই আপনা আপনি বাজিয়া চলিল। এযে কত বড় ব্যথার অভিব্যক্তি, কি হতাশার আবেদন, সে কথা যে তিনি জানিতেন।

একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন "আমি বুঝি বই কি সুষো! তোমার দুঃখ যদি আমি না বুঝতুম,—সেই প্রথম দেখার দিনে, এতটুকু ছোট্ট মেয়ে যখন তুমি, সেই তখন থেকেই যদি না বুঝতুম,—তা হলে হয়ত তোমায় আজ আমার এত কাছে এনে দিতে পারতো না! আমি জানি,—তোমার দুঃখ আমি জানি। তোমার আত্মত্যাগ সেও যে কত বড় তাও আমার অজ্ঞাত নয়। সে যদি ভুলতে পারতুম, আজ তোমায় আমাকে চিঠি লিখে ডেকে আনতে হতো না। কিন্তু শোন

সুষমা! তোমার এই বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আমি ক্রমাগতই ভেবেছি, ভেবে কোন কুল পাই নি। দেখ, হয়ত এখনও অনেকদিনই তোমায় বাঁচতেই হবে। তার আগে রোগ ও জরার আক্রমণে অক্ষম হয়ে সেবার দরকার হওয়ারও কিছুই বিচিত্র নয়। তারপর একটা অবলম্বন না রাখলে চিরদিন তোমার কাটবেই বা কি নিয়ে? কোন একটা পথ তুমি এই বেলা বেছে নাও।"

সুষমা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না, বা দিবার চেষ্টাও দেখাইল না।

নরেশ তাহার এই নিশ্চেস্টতা লক্ষ্যে ও ইহাকে অর্দ্ধ সম্মতি মনে করিয়া ঈষৎ উৎসাহিতভাবে কহিতে লাগিলেন—"তোমার মায়ের যে ইচ্ছার উপর আমি তোমার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে ছিলেম, দেখছি তোমার মনের সঙ্গে সেটা ঠিক সায় দিচ্চে না। তুমি সেদিকে মন দিতে পারচো না।—"

সুষমা কহিল, "তাই বা পারচি কই।"

নরেশ ক্ষণকালের জন্য সচিন্তিত নীরব থাকিয়া পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন "কিন্তু একটা মানুষের জীবন যে কোন রকমের কর্ম্মবন্ধন শূন্য, নিরালম্ব ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসাবিহীনভাবে টেঁকে থাকতে পারে না। তাই অনেক ভেবেই আমি—যাক্ কিন্তু হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য যে সব সমাজে সমাজবিধির নিয়ম একটু শিথিল, সেখানের অনেক কৃতবিদ্য ও সুচরিত্র লোকে—"। যে কথাটা নরেশচন্দ্রের জিভের আগায় আট্‌কাইয়া পড়িতেছিল, সেটা শেষ করিবার প্রয়োজনও হইল না। অকস্মাৎ উচ্চ এবং মর্ম্মভেদিকণ্ঠে, "আপনি এইকথা বল্লেন!—"এইটুকু বলিয়া উঠিল এবং তারপরই বক্ষবিদ্ধ ঘুরিয়াপড়া পাখীর মত স্খলিতপদে সুষমা চলিয়া গেল। তাহার বুক চিরিয়া তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তখন একটা উদ্দাম ক্রন্দন ঝরণার মতই বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে কোনমতেই আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতে ছিল না।

নরেশচন্দ্র অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া একাকী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারও বুকের মধ্যে তখন একটা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথার সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের পুরাতন অথচ অবিস্মৃত স্মৃতি মনের মধ্যে যেন নূতন হইয়া আবার ফুঠিয়া উঠিল।—

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

শ্রাবণ

এই যে শ্রাবণে জীবন-প্লাবনে ঝরিছে করুণা গলিয়া!
রে অভিশপ্ত! তবু কি তপ্ত অন্তর যায় জ্বলিয়া?

গৌরীদান

নেমন্তন্ন খেতে গেলাম কোনো বিয়ের বাড়ীতে ;
চাপা হাসি হেসেই মরি, খিল্ ধরে সব নাড়ীতে !
ষাট বছরের কচি ছেলে,
দশ বছরের বৌটি পেলে !
এমন মানিকজোড় কি মেলে ? লজ্জা কোথায় দাড়িতে ?
আবার কিনা মিছিল কোরে এলেন খোলা গাড়ীতে !

বাচস্পতি, বেঁচে থাকো লম্বা টিকি নাড়িতে !
এবং হিন্দুঘরের ঝি-সব জবাই কোরে মারিতে !
আচ্ছা মজার শাস্ত্র আমার,
গৌরীদানটা করছে চামার !
হিন্দুসমাজ রামা শ্যামার চলছে আড়াআড়িতে !
মেয়ের বাবা, পোড়ে ঘুমোও ! কাজ কি বাড়াবাড়িতে !

কাঁদছো মিছাই বোন্‌টি আমার মুখ লুকিয়ে শাড়ীতে !
ভাবছে সবাই কাঁদছে কনে প্রথম ছাড়াছাড়িতে !
"চর্‌কা চিতর্ বাড়ীর ভিতর,
সত্যি এরা বেজায় ইতর !"—
বাজ্‌না ঢুলীর করলো কাতর সমাজের বুক ফাঁড়িতে !
দুদিন বাদে আসবে পুরুৎ বৃষোৎসর্গ সারিতে !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বাংলার নবযুগের কথা

পঞ্চম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ

(১)

বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা। ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বতোভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। এ কাজটা করেন কেশবচন্দ্র। এইজন্যই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র একটা অতি উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আটত্রিশ বৎসর হইল কেশবচন্দ্র সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা জন্মিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে ভাল করিয়া জানেন না। এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবও অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও কমিয়াছে। প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্র যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ শুকাইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শুকাইতে আরম্ভ করে। তাঁহার শেষ জীবনের চিন্তা ও সাধনা অন্য খাতে প্রবাহিত হইয়া নিজেই সেই আদি স্রোতকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশায়, বিশেষতঃ তাঁহার প্রথম-যৌবনে, যে সকল সমস্যা শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল, আজিকার শিক্ষিত সমাজের সমক্ষে সে সকল সমস্যা নাই। এই সকল কারণে আজিকালিকার লোকের পক্ষে কেশবচন্দ্রের সাধনার যথার্থ মূল্য গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার শিক্ষিত লোকে কেশবচন্দ্রের নামমাত্রই জানেন, তাঁহার অলোকসামান্য বাগ্মীতার কথাও লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন; কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান চিন্তা ও সাধনা কতটা পরিমাণে যে কেশবচন্দ্রের কাছে ঋণী, ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না।

কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে খাটো করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মের সঙ্গে ধার্ম্মিকের প্রত্যক্ষ অনুভবের কোনও সজীব সম্পর্ক ছিল না। কলের পুতুলের মতন মানুষ ধর্ম্মের আদেশ মানিয়া চলিতেছিল। গীতা কহিয়াছেন ঃ—

চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ
আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

চারি শ্রেণীর সুকৃতিসম্পন্ন লোকে, হে অর্জ্জুন, আমার ভজনা করে। প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, এবং চতুর্থ জ্ঞানী। এই চারি শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে সমাজে সে সময়ে জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু ছিলেন না, বলিলেই চলে। আর্ত্ত, অর্থাৎ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, এবং অর্থার্থী, অর্থাৎ যাঁহারা কোনও ঈপ্সিত লাভের লোভে দেবতার ভজনা করেন, এই দুই শ্রেণীর উপাসকেই তখন যা কিছু আন্তরিক ভক্তিভরে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। ধর্ম্ম যেখানে সত্য হয়, সেখানে মানুষকে সৎসাহসী এবং শক্তিশালী করিয়া তুলে। সত্য ধর্ম্ম লাভ করিলে মানুষ ভয় ভাবনার অতীত হইয়া যায়।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ

এই সত্য ধর্ম্মের স্বল্পপরিমাণও পাইলে ধার্ম্মিক মহৎ-ভয় হইতেও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে সময়ের ধর্ম্ম ভয়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সংসারের ক্ষতির ভয়ই সে ধর্ম্মের প্রেরণা ছিল। মানুষ এইরূপে সর্ব্বদা ভয়ের তাড়নায় চলিতে বাধ্য হইলে তাহার জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি, সকলই অত্যন্ত পঙ্গু হইয়া পড়ে। ভয়ে মানুষকে তামসিক করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এই তামসিকতাতেই বাংলার সমাজ আচ্ছন্ন ছিল।

ইহার পূর্ব্বেই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবনে সেই শিক্ষার ফলে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে চারিদিকে একটা অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্রোতের মাঝখানেই কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সাধনের বলে চারিদিকের এই অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা কেশবচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের ভক্তিসাধনের ফলেই কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনের চারিদিকের স্বেচ্ছাচার এবং অনাচারের মধ্যে নিজেকে সংযম ও সদাচারের বেষ্টনীর ভিতরে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার দুইটী ধারা। এক ধারা বৈধী ভক্তির ধারা। দ্বিতীয় ধারাকে রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তিধারা কহে। বাংলার ভদ্রসমাজের বৈষ্ণবেরা বৈধী ভক্তির সাধনই করিতেন। বৈধী ভক্তি আচার-বিচার মানিয়া চলে। ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইজন্য মনু, পরাশর প্রভৃতির স্মৃতির অনুসরণ করিয়া চলেন। ভক্তিপন্থী হইলেও ইঁহারা প্রচলিত মায়াবাদের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এইজন্য বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কখনও কখনও কঠোর সংসার-বৈরাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজিকগুণে কেশবচন্দ্রও যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে অত্যন্ত সংসারবিরাগী হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র কহিয়াছেন যে এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রাণের ভিতরে এই বাণী শুনিতে পাইলেন—"ওরে, তুই সংসারী হ'স না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস না; কলঙ্ক, পাপ এসকল ভারী কথা; আপাততঃ আমোদ ছাড়; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।" কেশব তখন আমোদকে বলিলেন,—"তুই শয়তান,

তুই পাপ", বিলাসকে বলিলেন,—"তুই নরক, যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।", এমন কি শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।" এই অদ্ভুত বৈরাগ্যই কেশবচন্দ্রকে তাঁর প্রথম যৌবনে বাংলার ইংরাজী-নবীশ সমাজের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এইজন্য ইংরাজী শিক্ষা যে প্রবল যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাগাইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে কেশবচন্দ্রকে বাঁচাইতে পারে নাই; বরঞ্চ তাঁহার মধ্যে এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম্মের আদর্শের দ্বারা সংযত করিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরাজী শিক্ষা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ জাগাইয়া তুলে, কেশবচন্দ্র তাহারই মধ্যে একটা প্রবল ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চারিত করেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ইংরাজীনবীশেরা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকেই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ভাঙ্গাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ ভাঙ্গার কাজ কিছুদিন এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্তই চলিতে পারে; বেশী দিন বা বেশী দূরে যাইতে পারে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা-লিপ্সা প্রায় কখনই নিষ্কাম হইতে পারে না; সর্ব্বদাই ফলাপেক্ষী হইয়া থাকে। এইজন্য এই স্বাধীনতার মধ্যে ভাল করিয়া ত্যাগের শক্তি জাগিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোভে লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, বটে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিতরে একটা বলবতী বৈরীতা জাগিয়া রহে। রাজশক্তির অত্যাচারের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত হয়। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে অত্যাচারী রাজশক্তির উপরে প্রতিহিংসা তুলিবার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইয়া রহে। এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির মাদকতাতেই মানুষকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রণোদিত করে। যে স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিতরে এরূপ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না, সেই স্বাধীনতার প্রেরণা ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে আসিলেই কেবল মানুষকে ত্যাগের পথে লইয়া যাইতে পারে। অন্যথা এই স্বাধীনতার গতিবেগ সামান্য বাধাবিপত্তি পাইলেই থামিয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের মধ্যে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগাইয়াছিল, ধর্ম্মের প্রেরণা না পাইলে তাহাও প্রাচীন সমাজের তাড়নায় অল্পেতেই থামিয়া যাইত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা হইয়াছে। যেখানেই এই স্বাধীনতার অন্তরালে ধর্ম্মের প্রেরণা ছিল না, সেইখানেই এই সংগ্রাম বাধিতে না বাধিতেই থামিয়া গিয়াছে; সেইখানেই সমাজশক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষাকে সহজে চাপিয়া মারিয়াছে। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের আধুনিক সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশেও যে পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও এমন দেখা গিয়াছে যে শুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক লোকে প্রাচীন সমাজের সমক্ষে দু'চারদিন বীরদর্পে বাহ্বোস্ফোট করিয়া পরে বিষম ত্যাগের আহ্বান যখন আসিল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া তাহারা নিঃশেষে সেই সমাজের নিকটেই

আত্ম বিক্রয় করিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রেরণা ব্যতীত সচরাচর এই ত্যাগের শক্তি জাগে না। আমাদের নব্যসমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শে যে স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার করিয়া কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে একটা অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন। এই ত্যাগের দ্বারাই বাংলার নবযুগের সাধনা মহীয়সী হইয়া আছে। কেশবচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত দলের মধ্যে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিক্ষার মত আসিয়া পড়িলেন। সেই আগুনে বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক সম্প্রদায় একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং এই অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

(২)

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশদিগের মতি-গতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে; এবং ইঁহারা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের মতি-গতিকে সংযত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বদেশাভিমুখীন করেন। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির প্রধান কীর্ত্তি। মহর্ষির প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন একটা বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা দুর্জ্জয় রক্ষণশীলতাও ছিল। ইংরাজী শিক্ষাপ্রভাবে দেশে যে বিপ্লবের বাণচাল ডাকিয়া উঠে, তাহাতেও মহর্ষির এই প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রেরণায় মহর্ষি যখন দেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কারকে প্রকাশ্যভাবে বর্জ্জন করিলেন, প্রচলিত প্রতিমা পূজাদিকে অসত্য ও অধর্ম্ম বলিয়া ত্যাগ করিলেন, তখনও এই রক্ষণশীলতা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। যাহা নিতান্ত না ছাড়িলে নয়, তাহাই তিনি ছাড়িলেন। প্রাচীন ও প্রচলিতের যতটুকু রক্ষা করা সম্ভব হয় প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার চারিদিকের ইংরাজীনবীশেরা যখন ধর্ম্মে এবং সমাজে প্রাচীন এবং প্রচলিতকে নির্ম্মমভাবে ভাঙিতে চুরিতে আরম্ভ করেন, তখনও মহর্ষি তাঁহার প্রকৃতিনিহিত এই রক্ষণশীলতার প্রেরণায় তাঁহার ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। মহর্ষি পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু প্রচলিত জাতিভেদ একেবারে পরিহার করিলেন না। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রাহ্মণেরাই কেবল আচার্য্যের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এ সকল ব্রাহ্মণ আচার্য্যদিগের গলায় উপবীত থাকিত। ইঁহারা হিন্দু-সমাজের শাসন মানিয়া চলিতেন। বিবাহাদি সংস্কারে শালগ্রাম এবং ব্রাহ্মণ ডাকিতেন। তথাকথিত পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইঁহারা সকল সম্বন্ধ কাটিয়া দেন নাই। এইভাবে সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম্ম-সংস্কারের মধ্যে একটা ব্যবধান জাগিয়া রহিল। এরূপ ব্যবধান এদেশে চিরদিনই

ছিল। সকল হিন্দুই যে দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহা নহে। পণ্ডিতেরা দেবদেবীর উপাসনা বা প্রতিমা-পূজা যে কেবল নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্যই বিহিত হইয়াছে; এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই যে শ্রেষ্ঠতম উপাসনা, এ সকল কথা চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। দণ্ডী-সন্ন্যাসীরা এ সকল নিকৃষ্ট উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন না। ইহাতে তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায়ও হয় না। এজন্য লোকসমাজেও তাঁহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয় না। মহর্ষি যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, হিন্দু-ধর্ম্মের বা হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনও বিরোধ ছিল না। নিতান্ত অজপল্লীগ্রামে ও জ্যেষ্ঠদিগের মুখে এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার সাধুবাদ শুনিয়াছি। মহর্ষির ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও বিরোধ ছিল না। তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধটা জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া নহে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সামাজিক আদর্শ লইয়া। মহর্ষির সময়ে এ বিরোধটা ভাল করিয়া জাগে নাই। জাগে কেশবচন্দ্রের সময়ে। আর এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের প্রথম বিরোধ হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

কেশবচন্দ্র প্রথমে মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। মহর্ষিই কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দান করেন। কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাঁহার প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতার বাঁধনকে পর্য্যন্ত আল্‌গা করিয়া দেন। তখন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে মহর্ষি কেবশচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বাংলার বাহিরে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় মহর্ষি দেখিলেন, তাঁহাকে যদি কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইলে সকল সমাজের সম্যকরূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। তিনি বলিলেন,—

"যেখানে যেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটী আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি বলিলেন,—

"শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ উন্নত হয় কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোনও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে

ঐক্য বন্ধন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্য্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্য্যাদা দিবে। তুমি যে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি দুরূহ কর্ম্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা "রামমোহন রায় ধর্ম্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগতপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

"ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

"এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটীমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এহ ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অধ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্য্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবশ্যই গৌরববৃদ্ধি হইবে।"

(৩)

কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রগাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ক্রমে গুরুতর মতভেদ দাঁড়াইয়া গেল। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটা ধর্ম্মসাধনের কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিপ্লব আনয়ন করিতে চাহেন নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরেরা জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। ইঁহারা সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চা'ন। জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীতধারণ এই সংস্কৃত ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬০ ইংরাজীতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে "সঙ্গত সভা" নামে একটী নূতন সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মজীবন গঠন সম্বন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত। এই আলোচ্য-বিষয়ের তালিকায় "উপাসনা, আত্ম-পরীক্ষা, আমোদ, নির্ভর, সত্য বাক্য, পৌত্তলিকতা, পবিত্রতা, কর্ত্তব্যশ্রেণী, লোকভয়, ত্যাগস্বীকার" প্রভৃতি একুশটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। "সঙ্গতে"র কার্য্যবিবরণে লেখা আছে:—

"যে কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবে না," "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্যপ্রকার দেখায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্তৃক কি পাপ কৃত না হয়," "কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন এমত নহে, ইহা পরিত্যাগ করাও সহজ, আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয় সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা, কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে," "স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া"।

এই সকল আলোচনার ফলে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে পরিবার পরিজন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে লাগিলেন। কেহ কেহবা অশেষ প্রকারের শারীরিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রহ্মোপাসনা করিতেছিলেন। এখন অদম্য উৎসাহ সহকারে সমাজ-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাতে আঘাত পড়িল। প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তিনি নবীন ব্রাহ্মদিগের এ সকল সংস্কার চেষ্টা সহিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে আর সহিতে পারিলেন না। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদিতে মহর্ষির অনন্য-প্রতিদ্বন্দী একাধিপত্য ছিল। নবীন ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে ব্রাহ্মসাধারণের মতানুযায়ী পরিচালনা করিবার জন্য এক ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ছোট বড়, যুবক ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মসমাজে কার্য্য পরিচালনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমান অধিকার, এই গণতন্ত্র আদর্শের উপরে ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। মহর্ষির একাধিপত্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। যে সকল ব্রাহ্ম কেবল ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের সঙ্গে কোনও প্রকারের বিরোধ বাধাইতে চাহেন নাই, তাঁহারা নবীন ব্রাহ্মদিগের উদ্যমে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মহর্ষির রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের একটা বিরোধের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি ছিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের সকল সম্পত্তি তাঁহার তত্ত্বাবধানেই ন্যস্ত ছিল। ট্রাষ্টিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার তাঁহার হাতেই ছিল। তিনি সে সকল অধিকার মাঝখানে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন আবার সে অধিকার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য থাকিতে পারিবেন না, নবীন ব্রাহ্মেরা এই প্রস্তাব আনিলেন। মহর্ষি সম্পূর্ণভাবে ইহাতে সায় দিতে পারিলেন না। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্র

প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজই বাংলা দেশে একটা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রবল চেষ্টা জাগাইয়া তুলেন।

মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে আদি বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রামটা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মহর্ষির চরিত্র, সাধনা এবং বৈষয়িক পদমর্য্যাদার প্রভাবে সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল করিয়া মাথা তুলিবার অবসর পায় নাই। মহর্ষিই ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতেন। কখনও কখনও বিপন্ন ব্রাহ্মদিগকেও অন্নঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এ সকল কারণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্যক পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ধর্ম্মসাধনেও প্রত্যেক সাধকের স্বাধীন যুক্তিই যে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র কষ্টিপাথর, ইহাও ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পায় নাই। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া মহর্ষি তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থখানিকে ব্রাহ্মসাধকদিগের শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিবার সময় মহর্ষি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার (অর্থাৎ এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের) একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না।"

এখানেই মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে কি চক্ষে দেখিতেন, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাও ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আতিশয্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সে সময়ের খৃষ্টীয়ান পাদরী ডাইসন (Dyson) সাহেব কহিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কিছুই নহে, কেবল Conjugation of the verb to think মাত্র অর্থাৎ I think; We think; Thou thinkest; You think; He thinks; They think—ইহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। এককথায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্ম্মের আর কোনও প্রামাণ্য নাই।

কথাটা সম্পূর্ণরূপেই সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের সকল ধর্ম্মেই মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে শাস্ত্রের বন্ধনে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রচার করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাও মানিতেই হইবে। এদেশে এই শাস্ত্রানুগত্যের ফলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সাধকের আন্তরিক অনুভবের একটা বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবধান নিবন্ধন লৌকিক ধর্ম্মের শক্তি ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে তোলা দূরে থাকুক, নানা দিক দিয়া মনুষ্যত্ব হইতে

বঞ্চিতই করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে উদ্যত হন, তাহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নবীন ব্রাহ্মদিগের জীবনে ধর্ম্মকে কেবল একটা খেয়ালরূপেই গড়িয়া তুলে নাই, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইঁহারা নিজে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিদ্র্য, কত নির্য্যাতন, আত্মীয় স্বজনবর্গের সঙ্গে কি দুর্ব্বিষহ বিচ্ছেদ-যাতনা, ইঁহাদিগকে নিজের মতবাদের জন্য সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে এই সকল স্বাধীনতার সাধকের প্রতি অন্তর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে। এ খেলা ছিল না। ইঁহারাই বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ইতিহাস

ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলনে গভর্ণমেণ্টের বিষম ভয় ও সন্দেহ।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ-বাহাদুর সিরাজ-উদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে একাধিপত্য স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন। এই সময় হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজ্যে কেবল শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্তই সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাঙ্গালীরা ইংরাজী জানিতেন না; অথচ বাঙ্গালীরা ইংরাজী না জানিলে ইংরাজদিগের কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইত না। বাঙ্গালীরা ইংরাজ-গণের অধীনতায় কর্ম্ম স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহিবার জন্য ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলন করিলে পাছে সমগ্র বাঙ্গালীর মনে ধর্ম্মহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ ইংরাজী-শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হন নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেব-গণ পারসী-ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে এরূপ লিখিত ছিল যে, মুসলমান-গণের ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্রিশ্চান্-গণেরই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলে ইংরাজ-গণ দারুণ ভয় পাইলেন যে, রাজ্যে বিষম বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা তখন দিনেমার-গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, এখনই এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করা হউক। পত্র পাইয়াই ডিনেমার রাজপুরুষ-গণ, কেরি ও অন্যান্য পাদরী সাহেবদিগের নিকট হইতে অবশিষ্ট

১৫০০ পুস্তক বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া কলিকাতায় গভর্ণর-জেনারলের মন্ত্রি-সভার হস্তে অর্পণ করেন। তৎকালে ইংরাজ-বাহাদুরের মনে কিরূপ ভয় ছিল, তাহা এই একটীমাত্র ঘটনা হইতেই স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারা যায়।

১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইভাবে কাটিয়া গেল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো বাহাদুর নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে একটী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

নবদ্বীপ ও মিথিলায় সংস্কৃত-কলেজ-স্থাপনে লর্ড মিণ্টোর প্রথম সংকল্প।

"ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। বিদ্বানের সংখ্যা হ্রাস পাইতে বসিয়াছে এবং বিদ্যা-চর্চ্চারও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। দর্শন ও সাহিত্যের আদর কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। বহু-সংখ্যক প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে পাঠ্য-গ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এজন্য আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, কাশীর সংস্কৃত-কলেজ ব্যতীত বৰ্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে এবং ত্রিহুত-জেলার অন্তর্গত ভাউর-নামক স্থানে আর দুইটী সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করা হউক ; কারণ এই দুই স্থানেই বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ; বিশেষতঃ এই দুইটী স্থান সংস্কৃত-ভাষা-চর্চ্চার সর্ব্ব-প্রধান কেন্দ্র।"

লর্ড মিণ্টো এবং হোরেস্ উইলসন প্রভৃতি সাহেব-গণের সংস্কৃত-ভাষায় অনুরাগ।

লর্ড মিণ্টো সংস্কৃত-ভাষার বহুল-প্রচারের জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার এরূপ কৃত-সংকল্প হইবার বিশেষ কারণ ছিল। তৎকালে যে সকল সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, তাঁহারা স্যার উইলিয়ম জোন্সের ন্যায় সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া সুনাম লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইতেন। এইহেতু সকল ভদ্র সাহেবই তৎকালে কিছু না কিছু সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোল্‌ব্রুক্ সাহেব গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রি-সভায় এক জন প্রধান সদস্য ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-বিদ্যার বহুল-প্রচারের জন্য বড়লাট বাহাদুরকে বিশেষ অনুরোধ করেন। এই সময়ে মহামতি হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন, জেম্‌স্ ও টোবি প্রিন্সেপ্ (ভ্রাতৃদ্বয়), হে ম্যাক্‌নাটন্, মিষ্টার সাদারল্যাণ্ড, মিষ্টার সেক্‌স্‌পিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ সাহেব-গণ কোল্‌ব্রুক সাহেবের পৃষ্ঠপোষক ও গভর্ণর জেনারলের পরামর্শ-দাতা হইলেন। লর্ড মিণ্টো উক্ত সাহেবগণ-কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও সংস্কৃত-বিদ্যার বহুল-প্রচারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে আর এক দল সাহেব সংস্কৃত-ভাষা-প্রচলনের প্রতি খড়গ-হস্ত হইয়া লর্ড মিণ্টো বাহাদুরকে কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই কয়েক জন প্রধান,— মিষ্টার বার্ড্, মিষ্টার সণ্ডার্স্, মিষ্টার বুস্‌বী, মিষ্টার ট্রিভিলিয়ান্ ও মিষ্টার কল্‌ভিন্। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত দলেরই সম্পূর্ণ-রূপ জয়লাভ হইয়াছিল।

এই সময়ে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী পুনর্ব্বার সনন্দ গ্রহণ করিতে বসিলেন। তখন পার্লামেণ্টের উত্তেজনায় ডিরেক্টর-গণ ভারত-গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন ঃ—

বিদ্যা-বিস্তারে কোম্পানীর বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দান।

"প্রত্যেক বৎসরে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় প্রজা-গণের বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন, পণ্ডিত-গণের উৎসাহ-দান এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে এই টাকা ব্যয় করা হইবে।"

১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসল কার্য্য কিছুই হইল না। গৌর-চন্দ্রিকা মাত্র হইয়া রহিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই তারিখে একটী কমিটি গঠিত হইল,—ইহার নাম Committee of Public Instruction. মহামতি উদারচেতাঃ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তিনি অন্যান্য মেম্বর-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন, পণ্ডিত-গণের বৃত্তিদান এবং সংস্কৃত বিদ্যার্থি-গণের 'মাসহারা'-প্রদানে অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সংস্কৃত-কলেজের কমিটি-গঠন।

এই সময়ে এক মহা হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিল। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত-ভাষায় স্বয়ং সুপণ্ডিত হইয়াও সহস্র-মুখে সংস্কৃত-ভাষার নিন্দা করিয়া তাৎকালিক গভর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। যাহাতে সংস্কৃত-ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী-ভাষার বহুল প্রচলন হয়, তাহার জন্যই তিনি বদ্ধ-পরিকর হইলেন। শ্রীরামপুরের পাদরী-সাহেব-গণও সংস্কৃত-ভাষার বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, পরিশেষে হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্ সাহেবেরই জয়লাভ হইল। তিনি লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে লিখিলেন, "নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করিলে বহুদূরে থাকিয়া আমরা তাহাদের ভালরূপ তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। অতএব পূর্ব্বোক্ত দুইটী সংস্কৃত-কলেজ না করিয়া কেবল কলিকাতা-নগরে একটীমাত্র সংস্কৃত-কলেজ করাই উচিত।" লর্ড আমহার্স্ট তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া কেবল কলিকাতায় একটী সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। (১)

সংস্কৃত-কলেজ-স্থাপনে রামমোহন রায় ও পাদরী-গণের আপত্তি এবং উইলসন্-সাহেবের জয়লাভ।

---

(১) লুসিংটন-সাহেবের সংগৃহীত "গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডস্", কার্-সাহেবের সংকলিত "রিভিউ অফ্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্," পিয়ারীচাঁদ মিত্রের প্রণীত "ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত" ও "রামকমল সেনের জীবন-চরিত," এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন বাগ্‌বাজার-নিবাসী মদীয় পরম-হিতৈষী সুহৃৎ, কনিষ্ঠ-সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দে মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকখানি সুদুর্লভ গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে "সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কথা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিয়াছিলেন, "আমাদের বাল্যকালে উদ্ভট-কবিতার অত্যন্ত আদর ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর উদ্ভট-কবিতার সেরূপ আদর নাই। আমার গুরুদেব জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদিগকে উদ্ভট-শ্লোক মুখস্থ করাইতেন, এবং কবিতা-রচনা করিতে শিখাইতেন।" ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কি সূত্রে সংস্কৃত-কলেজ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঐকান্তিকী কামনায় এবং হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেবের বলবতী চেষ্টায়সংস্কৃত-কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সংস্কৃত কলেজ সর্ব্বপ্রথমে এই দুইটী স্তম্ভেরই উপরি-ভাগে অবস্থিত ছিল।" এখন এই দুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

সংস্কৃত-কলেজের সংস্থাপন-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বীয় মন্তব্য।

যশোহর-জেলার অন্তর্গত কোট্‌চাঁদ-পুরের নিকটবর্ত্তী বজ্রাপুর-নামক গ্রামে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি নাটোর-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরাম জয়গোপালকে লইয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ৺কাশীধামে বাস করিতে গিয়াছিলেন। জয়গোপাল সেইখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া সেইখানেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত করেন। কাব্য-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২৮ অক্টোবর দিবসে ৺কাশীধামে সংস্কৃত-কলেজ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেব এই কলেজের কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া সাহেব মহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। জয়গোপাল সেই সময়েই সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "কলিকাতায় গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিবার আমার ইচ্ছা আছে।" তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় একটী সংস্কৃত-কলেজ খুলিবার ইচ্ছা সাহেবের মনে জাগরূক ছিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "কলিকাতায় যাইলে আমার সহিত দেখা করিবেন।" ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল শ্রীরামপুরে আসিয়া প্রসিদ্ধ পাদরী কেরি সাহেবের অধীনতায় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। এই পাদরী কেরি ও মার্সম্যান্ সাহেব শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ জয়গোপাল-কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি পাদরী সাহেবদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ইহাঁরই উদ্যোগিতায় তৎকালে কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন পাঠ সংশোধন করিয়া তিনি স্বকৃত অনেক কবিতা তাহাতে

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-ভাষার আলোচনা করিবার নিমিত্ত জয়গোপাল লালায়িত হইয়া পড়িলেন। পাদরী সাহেবদিগের সহিত নিরন্তর বাঙ্গালা-ভাষার চর্চ্চা করা তাঁহার মনঃপূত হইল না। বিশেষতঃ তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এজন্য ম্লেচ্ছ-গণের সংসর্গে আর অধিক কাল যাপন করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না।

সাহেবদিগের কার্য্যোপলক্ষে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন ক্রমে ক্রমে কলিকাতার প্রতি তাঁহার মমতা জন্মিয়া গেল। সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্রদিগকে সংস্কৃত-কাব্য শিক্ষা দিবেন, ইহাই তাঁহার চিরদিন কামনা ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পাদরী সাহেবদিগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় কি কার্য্য করিতেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত-কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর শর্ম্মা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি স্বনাম-ধন্য ও কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁহারই প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুকাল সুপ্রীম-কোর্টের জজ-পণ্ডিতও ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পরিচয় দিবার পরেই হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর লণ্ডন-নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সেখানে সুশিক্ষিত হইয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা-বিভাগে এসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াই কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি রসায়ন ও ধাতু-পরীক্ষা-শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি কলিকাতার টাকশালায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সেখানে স্কট্‌ল্যাণ্ড-দেশীয় কবি লিডন্ সাহেবের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। ক্রমে ক্রমে এচ্. টি. কোলব্রুক্ মহাশয় তাঁহার গুণগ্রাম জানিতে পারিয়া ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "এসিয়াটিক সোসাইটীর" সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-ভাষায় উইল্‌সন্ সাহেবের পূর্ণ অনুরাগ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি এদেশে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু-সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। একাধারে তাঁহার অনেক গুণ ছিল। তিনি ইতিহাসজ্ঞ, রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ, ধাতু-তত্ত্বজ্ঞ, অভিনেতা ও সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহারই অনূদিত "উত্তর-রাম-চরিত" নাটক স্বর্গত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের শুঁড়োর বাগানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি-মাসে অভিনীত হইয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ ও হিন্দু-কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তৎকৃত 'সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান' তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-নগরে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একখানি চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ এখন যে স্থানে অবস্থিত, ঠিক সেই স্থানের উপরেই একখানি গোলপাতার ঘরে তাঁহার টোল বসিল। বদান্যবর ডেভিড্ হেয়ার সাহেব তাঁহাকে টোলের জমিটুকু বিনা খাজনায় দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি একাকী কয়েকটি মাত্র ছাত্রের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই একটি অধ্যাপক তাঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিছুদিন পরে এই টোলের কথা উইল্‌সন্ সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি এক দিন টোল দেখিতে আসিলেন। জয়গোপাল তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ৺কাশীধামে উইল্‌সন্ সাহেবের সহিত জয়গোপালের সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। জয়গোপালের গোলপাতার ঘর এবং কাব্য-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে টোল দেখিতে আসায় উভয়ের মধ্যে গাঢ়তর সদ্ভাব জন্মিয়া গেল। তখন হইতেই সাহেব মনে করিতে লাগিলেন যে, কলিকাতায় একটী সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করিতেই হইবে। মনে মনে তাঁহার এই বাসনা বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

টোল-ঘরে বর্ত্তমান সংস্কৃত-কলেজের জন্ম।

১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এই বৎসরে জুলাই মাসে হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেব গভর্ণমেণ্টে একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, উইল্‌সন্ সাহেবের মতে দুইটি সংস্কৃত-কলেজ দুই স্থানে স্থাপন না করিয়া কেবল কলিকাতায় একটী বড় সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই একটি কমিটি গঠন করিলেন। ডব্লিউ. বি. মার্টিন, ডব্লিউ. বি. বেলী, জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড এবং এচ্. এচ্. উইল্‌সন্, এই চারি জন সাহেব এই কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। উইল্‌সনের কথানুসারে সংস্কৃত-কলেজের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৪০০০৲ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন, এবং কি প্রণালীতে কলেজের কার্য্য হইবে, তাহাও জানাইবার জন্য উইল্‌সন্ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। উইল্‌সন্ কমিটি হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কলেজ প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম বিভাগে ব্যাকরণের সহজ অংশ, পদ্য ও অঙ্ক এবং দ্বিতীয় বিভাগে ব্যাকরণের দুরূহ অংশ, জ্যামিতি, বীজগণিত, স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বিভাগেই ৬ বৎসর করিয়া ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবেন। প্রথমতঃ বেদ-শাস্ত্র পড়াইবার কথা হইয়াছিল; কিন্তু শিক্ষা দিবার উপযুক্ত অধ্যাপক না পাওয়ায় বেদ-শাস্ত্র পড়াইবার নিয়ম বন্ধ হইয়া গেল।

সংস্কৃত-কলেজের কমিটি-গঠন ও নিয়মাবলী।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে (সংস্কৃত-কলেজ খুলিবার ৩ বৎসর পূর্ব্বে) গভর্ণমেণ্ট এরূপ বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের তত্ত্বাবধান করিবার ভার "স্পেশ্যাল্ কমিটির" হস্তে ন্যস্ত হইবে; তাহাতে একজন উপযুক্ত সেক্রেটারী মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইবেন। ইনি "জেনারল কমিটির" সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইভাবে কার্য্য চলিয়াছিল। ফল কথা এই যে, "স্পেশ্যাল কমিটির" সেক্রেটারী প্রাইস্ সাহেব, "জেনারল কমিটীর সেক্রেটারী" উইল্‌সন্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম প্রথম কলেজের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া প্রাইস্ সাহেব কর্ম্মত্যাগ করেন। তাঁহার পরে অন্য ৩ জন সাহেব ক্রমান্বয়ে তাঁহার পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। আরও নিয়ম হইল যে, ১২ হইতে ১৮ বৎসরের ছাত্র প্রথম-বিভাগে (নিম্ন-শ্রেণীতে) এবং ১৯ হইতে ২৪ বৎসরের ছাত্র দ্বিতীয়-বিভাগে (উচ্চ-শ্রেণীতে) পাঠ করিতে পারিবেন। উইল্‌সন্ সাহেব গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের দেহ অতি পবিত্র। এই পবিত্র দেহে আঘাত করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং কিছুতেই শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইবে না।

কলেজ-গৃহ-নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ৪ জন সাহেব লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ইহার নাম General Committee of Public Instruction. হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব ইহার সেক্রেটারী হইলেন। এই কমিটির সঙ্গে আর একটী কমিটি সংযুক্ত রহিল। ইহার নাম Special Committee. ক্যাপটেন্ প্রাইস্ সাহেব ইহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেব জেনারল-কমিটী হইতে সংস্কৃত-কলেজের বাটীর একটী নক্সা পাঠাইয়া দিলেন। গভর্ণমেণ্ট ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লিখিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মিত না হয়, ততদিন আপনারা একখানি উপযুক্ত ভাড়াটিয়া বাটীতে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন; এবং যে কয়েক জন পণ্ডিত নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাহাও আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

কলেজে পণ্ডিত-নিয়োগ।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর-মাসে উইলসন্ ও প্রাইস্ সাহেব গভর্ণমেণ্টে লিখিলেন, "আমরা কলেজের জন্য একখানি উপযুক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ী পাইয়াছি এবং ৭ জন পণ্ডিত মনোনীত ও নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাঁদের মধ্যে ৪ জন গভর্ণমেণ্টের অনুবাদ-বিভাগে কার্য্য করিতেন; তাঁহারা সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহাঁদের নাম—নিমাইচাঁদ শিরোমণি (নৈয়ায়িক), যোগধ্যান মিশ্র (জ্যোতিষী), নাথুরাম শাস্ত্রী (আলঙ্কারিক), শম্ভুনাথ বাচস্পতি (বৈদান্তিক)। আর একজন পণ্ডিত কেরী সাহেবের নিকটে কর্ম্ম করিতেন। ইনিও অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইঁহার নাম জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। অবশিষ্ট ২ জন পণ্ডিত বিখ্যাত না হইলেও তাঁহারা কৃতবিদ্য ও চরিত্রবান্। তাঁহাদিগের নাম হরনাথ তর্কভূষণ (স্মার্ত্ত) ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (বৈয়াকরণ)। পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষক

পাওয়া গেল না।”. উল্লিখিত কেরী সাহেবের পণ্ডিত আর কেহই নহেন,—ইনিই আমাদের, সেই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়। উইলসন্ সাহেব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত বিশেষ-রূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তার পরিচয় পাইয়াই উইলসন্ সাহেব এখন তাঁহাকে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

“জেনারল-কমিটির” সেক্রেটারী উইলসন্ সাহেব, “স্পেশ্যাল কমিটির” সেক্রেটারী প্রাইস্ সাহেবের রিপোর্ট পড়িয়া আদেশ দিলেন, “১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী হইতেই শিক্ষক-গণ শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিবেন। “পাটীগণিত” শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোক পাইলেই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করা যাইবে। যে সকল ছাত্র কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৫০টী ছাত্রকে মনোনীত করা হইবে, এবং প্রত্যেককে ৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া যাইবে। এই ৫০টী ছাত্র ভিন্ন আরও অধিক ছাত্র আসিলে তাঁহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু বৃত্তি দেওয়া যাইবে না।”

ছাত্র-নিয়োগের নিয়ম।

যে দিন সংস্কৃত-কলেজ খোলা হয়, সেইদিন হইতেই উইলসন্ সাহেব পটোলডাঙ্গা-নিবাসী রামধন গাঙ্গুলী মহাশয়কে “ইংলিশ-রাইটার” (English writer) পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে (কাউয়েল্ সাহেবের সময়ে) তাঁহার পুত্র কালীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় হেড্ ক্লার্ক নিযুক্ত হন। কালীচরণ বাবুর মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র শ্রীননীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কলেজে সেকেণ্ড ক্লার্কের কার্য্য এখনও করিতেছেন। তিন পুরুষ ধরিয়া একই বংশের লোকে এক কলমে প্রায় ১০০ বৎসর ক্রমান্বয়ে চাকরী করিতেছেন!

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি দিবস কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ইতিহাসে এক মহাপুণ্য দিন; কারণ এই দিনেই সংস্কৃত-কলেজ প্রথম সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে কলিকাতা বর্ত্তমান সংস্কৃত-কলেজের বয়ঃক্রম ৯৮ বৎসর। কলেজ খুলিবার দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ৪৯ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জুন-মাসে “জেনারল কমিটি” গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন যে, “এখন হইতে ৫০টী ছাত্রের পরিবর্ত্তে ১০০টী ছাত্রকে ‘মাসহারা’ দিতে হইবে। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ কলিকাতার এবং দুই-তৃতীয়াংশ মফস্বলের অধিবাসী হইবেন; এবং এখন হইতে নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক ৫৲ টাকা ও উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে ‘মাসহারা’ দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে ১০টী বৃত্তি ছাত্রদিগকে পারদর্শিতানুসারে দান করিতে হইবে।”

সংস্কৃত-কলেজে পঠন ও পাঠনারম্ভ।

প্রথমতঃ একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই কলেজ বসিত। প্রায় দুই বৎসর পরেই কলেজের

জন্য গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে বাটী-নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বর্ত্তমান সময়ে গোলদীঘির উত্তর দিকে যে "সংস্কৃত-কলেজ" ও "হিন্দু-স্কুল" দেখিতে পান, তাহা ১৮২৫ সালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। "সংস্কৃত-কলেজ" ও "হিন্দু-কলেজ" পূর্ব্বে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসিত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেই এই দুইটী বিদ্যালয় নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিল। নূতন নির্ম্মিত বাড়ী খানির মধ্যস্থলে "সংস্কৃত-কলেজ" ও দুই পার্শ্বে "হিন্দু-কলেজ" বসিতে লাগিল। অদ্যাবধি এই ভাবেই এই দুইটী বিদ্যালয় অবস্থিত রহিয়াছে।

সংস্কৃত-কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণ ও প্রবেশ।

"সংস্কৃত-কলেজ" ও "হিন্দু-কলেজ" বসিল। পাছে জাতি-বিচার লইয়া কোনরূপ গোলযোগ হয়, ইহাই এক বিষম চিন্তার কারণ হইল। উইলসন্ সাহেব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, "সংস্কৃত-কলেজে" কেবল ব্রাহ্মণ-সন্তান-গণ এবং "হিন্দু-কলেজে" কেবল ব্রাহ্মণ ও সদ্বংশ-জাত হিন্দু-সন্তান-গণ পাঠ করিতে পারিবেন। "সংস্কৃত-কলেজ" এবং "হিন্দু-কলেজের" প্রাচীর বিভিন্ন রহিল; এবং প্রত্যেক বিদ্যালয় লোহার রেলিং দিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে রক্ষিত করা হইল। সাধারণ প্রবেশ-পথ একটী মাত্র রহিল। কলেজ-কমিটি এবং গভর্ণমেণ্ট পরিহাস-চ্ছলে কহিলেন যে, যখন ব্রাহ্মণগণ ও শূদ্রগণ একই আকাশের নিম্নে বাস করিয়া একই বায়ু সেবন করিয়া থাকেন, তখন "সংস্কৃত-কলেজ" ও হিন্দু-কলেজের" ছাত্রগণের একটীমাত্র সাধারণ প্রবেশ-পথ থাকা তত দোষাবহ নহে! এতদ্ভিন্ন আরও নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের "বাহিরের ঘর" (out offices) সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিবে। উক্ত দুইটী বিদ্যালয়ের মধ্যে যে "লোহার রেলিং" দেওয়া ছিল, তাহা কিছুদিন পরে ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় "সংস্কৃত-কলেজের" অধ্যাপক ও ছাত্রগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপর কেহ "সংস্কৃত-কলেজে" পড়িতে পাইতেন না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে কায়স্থ ছাত্র লইবারও নিয়ম হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন কায়স্থ ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হন নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক পক্ষের প্রতিপদ্ ও অষ্টমী তিথিতে সংস্কৃত-কলেজ বন্ধ থাকিত, কিন্তু রবিবারে বসিত; এখন হইতে নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক রবিবারে কলেজ বন্ধ থাকিবে।

"সংস্কৃত-কলেজ" ও হিন্দু-কলেজে জাতি-বিচার লইয়া গোলযোগ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতেই সংস্কৃত-কলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম-বিভাগের নাম "নিম্ন-শ্রেণী" এবং দ্বিতীয়-বিভাগের নাম "উচ্চ-শ্রেণী"। প্রত্যেক বিভাগেই ৬ বৎসর করিয়া পড়িবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই ১২ বৎসর করিয়া পড়িতে হইত। তবে যে সকল ছাত্র একটু কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবারেই দ্বিতীয়-বিভাগে (উচ্চ-শ্রেণীতে) গ্রহণ করা হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নিয়ম করা হইল যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই ১৫ বৎসর করিয়া পড়িতে হইবে।

সংস্কৃত-কলেজে পাঠ্য-প্রণালী।

ব্যাকরণ—সংস্কৃত-কলেজ খুলিবার ৬ মাস পরে অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে, ক্যাপ্‌টেন প্রাইস্‌ সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই বলিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, ছাত্রগণের ভালরূপ ব্যাকরণ-শিক্ষা হইতেছে না। অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহ-সহকারে ন্যায়-শাস্ত্র পড়িতে চাহেন, এবং যে সকল অধ্যাপক ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা স্বীয় বাটীতে পূজা বা শ্রাদ্ধ হইলে ছাত্রগণের নিকট হইতে বিলক্ষণ উপঢৌকন পাইয়া থাকেন। এইরূপ লোভে পড়িয়াই কোন কোন অধ্যাপক ব্যাকরণ না পড়াইয়া ন্যায়শাস্ত্রই পড়াইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে ব্যাকরণ-শিক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইহেতু ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য দুই একটী অধিক শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণের সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী শ্রেণী খোলা হইয়াছিল।

সাহিত্য ও অলঙ্কার—তখন "সংস্কৃত-কলেজে" এইরূপ নিয়ম ছিল যে, প্রথম বৎসর ব্যাকরণ-পাঠ করিয়া দ্বিতীয় বৎসর সহজ সহজ কাব্য পাঠ করিবে। দুই বৎসর ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ করিয়া ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অলঙ্কার-শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন। অলঙ্কার-শ্রেণীতে অলঙ্কার এবং উচ্চ-শ্রেণীর কাব্যও অধ্যাপিত হইত। প্রথমতঃ এক বৎসর অলঙ্কার-শ্রেণীতে পাঠ করিতে হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে দুই বৎসর পাঠ করিবার নিয়মও হইয়াছিল।

অঙ্ক-শাস্ত্র—সকল ছাত্রকেই অঙ্ক শিখিতে হইত না। ব্যাকরণ-শ্রেণীস্থ ছাত্র ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলেই অঙ্ক-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারিতেন। লীলাবতী ও বীজগণিত গ্রন্থই পাঠ্য ছিল। অঙ্কের নিয়মগুলি সংস্কৃত-কবিতায় নিহিত থাকায় ছাত্রগণের তাহা বুঝিতে ও মনে রাখিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। অঙ্ক-শাস্ত্রের উপরি একবারেই অধ্যাপক-গণের দৃষ্টি থাকিত না। সময়ে সময়ে শিক্ষক-গণ চেয়ারে আসন-পীড়ি হইয়া অথবা টেবিলে চরণ দুইখানি তুলিয়া দিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন!

ন্যায়-শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম ছিল যে, ছাত্রগণ স্মৃতি অথবা ন্যায় ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক ছাত্র কিয়দংশ কাল স্মৃতি এবং অবশিষ্ট কাল ন্যায় ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক ছাত্রের ৩ বৎসর অতিবাহিত হইত।

বাঙ্গালা ভাষা—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র চর্চ্চা হইত না। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ নিয়ম হইল যে, ছাত্রগণকে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় রচনাও লিখিতে হইবে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আরও নিয়ম হইল যে, বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় প্রণালীতে পাটীগণিত, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

সংস্কৃত-কলেজে বাঙ্গালা-ভাষার চর্চ্চা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—"সংস্কৃত-কলেজ" ও "হিন্দু-কলেজের" ছাত্রগণ একত্র বসিয়া এবিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে পাইতেন। ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হইত। হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণই ইহা বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণ ইহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিতেন না। টাকশালার কর্ম্মচারী রস সাহেব "প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান" সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্র—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "জেনারেল কমিটি" স্থির করিলেন যে, সংস্কৃত-কলেজে ইউরোপীয় প্রণালী-মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিশেষতঃ, হিন্দুগণের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় আছে; ইহাও শিক্ষা করা ছাত্রগণের বিশেষ আবশ্যক। ডাক্তার টিট্‌লার সাহেব ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় সাধারণ চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। ডাক্তার জে, গ্র্যাণ্ট সাহেব ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এনাটমি ও ফিজিওলজি পড়াইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে রোগ নির্ণয়ের উপায় এবং অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উত্তম-রূপে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলেজের নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে হাঁসপাতাল খোলা হইল। সেই স্থানে ৩০টী রোগী থাকিবারও ব্যবস্থা করা হইল। ছাত্রগণ কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানাবিধ সনাতন শাস্ত্র কয়েক ঘণ্টা পাঠ করিয়া অবশিষ্ট সময় ইউরোপীয় প্রণালীতে রোগ-চিকিৎসা ও শাস্ত্র-প্রয়োগ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন ইউরোপীয় প্রণালী, অন্যদিকে সেরূপ হিন্দু-প্রণালীও চলিতে লাগিল। চরক, সুশ্রুত, ভাব-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থও পড়াইবার নিমিত্ত বিভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে দো-টানায় পড়িয়া ছাত্র-গণকে দুর্জ্জয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত।

সংস্কৃত-কলেজে আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথিক শিক্ষাদান।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে "জেনারল কমিটির" সেক্রেটারী সাহেব, ডাক্তার টিট্‌লার সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, "ছাত্রগণকে শিক্ষা-দান করিবার সময় ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হইবে কি না? এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী চিকিৎসা-গ্রন্থ পাঠ্য হইবে কি না? কোন কোন ডাক্তার বলেন, উভয়বিধ শিক্ষা না দিয়া একরূপ শিক্ষা দেওয়াই উচিত।" ডাক্তার টিট্‌লার তদুত্তরে বলিলেন, "উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া উচিত। যেরূপ-ভাবে শিক্ষাদান করা চলিয়া আসিতেছে, সেইভাবেই কার্য্য চলুক।" এই সব মতভেদ লইয়া "জেনারল কমিটিতে" ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুবন্দোবস্তের কথা উঠে, এবং তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ডাক্তার গ্র্যাণ্ট সাহেব ইহার সভাপতি হইলেন। স্থির হইল যে, ইংরাজী-ভাষাতেই চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে। কমিটির এই সাহায্যের ফলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন যে, সংস্কৃত-কলেজে ও মাদ্রাসায় যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বন্ধ হইবে এবং পৃথক্ মেডিক্যাল কলেজ খোলা হইবে। ইহারই ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি "মেডিক্যাল কলেজ" প্রথম সংস্থাপিত হইয়াছিল।

মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় প্রথমতঃ সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র হইয়া সেই স্থানেই ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন। তৎকালে নবকুমার গুপ্ত মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে যখন "মেডিক্যাল কলেজ" সংস্থাপিত হয়, তখন মধুসূদন সংস্কৃত-কলেজ ত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল-কলেজে প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ, সাহেবেরা মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরা নর-দেহ ছেদ করিতে সম্মত হইবে না। পরে দেখা গেল, এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। ১৮৩৫ সালে ২৮ অক্টোবর তারিখে ৪ জন হিন্দু-যুবক শবচ্ছেদ করেন; মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদিগের পথি-প্রদর্শক। শুনিতে পাওয়া যায়, মধুসূদনের এই অসম-সাহসিকতার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মান-সূচক তোপ-ধ্বনি করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা-নগরীর সম্ভ্রান্ত লোকগণ স্ব স্ব গৃহ আলোক-মালায় বিমণ্ডিত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল-কলেজে তাঁহার তৈলচিত্র অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে।

মধুসূদন গুপ্তের প্রতি গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোকের সম্মান-প্রদর্শন।

ইংরাজী-ভাষা-শিক্ষা—১৮২৭ খৃষ্টাব্দে একটী ইংরাজী-ক্লাস খোলা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ৪০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ইহার দ্বিগুণ হইয়াছিল। ২ বৎসর পরে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রত্যহ ১॥ ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন এক জন ইউরোপীয় হেড্-মাষ্টার (উলাস্‌টন্ সাহেব) ও একজন এদেশীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ ইতিহাস ও ভূগোলে পারদর্শী হইতেন, এবং বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে ও ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় এবং সংস্কৃতে বিশুদ্ধ-ভাবে অনুবাদ করিতে পারিতেন।

সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী-ভাষার শিক্ষারম্ভ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশ করিয়া ৩ বৎসর সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। সে সময় ইংরাজী-ক্লাস খোলা হওয়াতে হেড-মাষ্টার উলাস্‌টন্ সাহেব ভূদেব বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইহাতে ভূদেব বাবুর পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৮৩৫ সালে ইংরাজী-ক্লাস বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Court of Directors দিগের তাড়নায় ইংরাজী-ক্লাস পুনরায় খোলা হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই ক্লাসে ছাত্র-সংখ্যা ৮৫, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১১৮ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৫১ জন হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীনাথ দাস মহাশয় ১০০৲ টাকা মাসিক বেতনে ইংরাজী ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত-কলেজের উপরি পাদরী সাহেবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন সংস্কৃত-কলেজ খুলিবার প্রস্তাব হয়, তখন সরকারী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী বিসপ্ হিবার সাহেব ইহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়াছিলেন। যখন গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, এদেশে সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা

দিবার পরিবর্ত্তে ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তখন পাদরী সাহেবেরা আর একবার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের জন্য যে অর্থব্যয় করা হয়, সে অর্থ ইংরাজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করা বিধেয়। ডাফ্ সাহেব এই বিরোধী দলের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজের বিরুদ্ধে তিন খানি পত্র লর্ড অক্ল্যাণ্ড বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, পরিণামে পাদরী সাহেবদিগেরই পরাজয় হইয়াছিল।

সংস্কৃত-কলেজে প্রেমচন্দ্রের প্রবেশ, এবং উইল্সন্ সাহেব ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার পরিচয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (কাব্য), নিমাইচাঁদ শিরোমণি (নৈয়ায়িক), নাথুরাম শাস্ত্রী (আলঙ্কারিক), যোগধ্যান মিশ্র (জ্যোতিষী), শম্ভুনাথ বাচস্পতি (বৈদান্তিক), হরনাথ তর্কভূষণ (স্মার্ত্ত) ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (বৈয়াকরণ),—এই ৭টী সুপ্রসিদ্ধ ও কৃতবিদ্য পণ্ডিতকে লইয়াই সংস্কৃত-কলেজ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বীয় অধ্যাপনা বিষয়ে কৃতকর্ম্মা ছিলেন। তৎকালে এই সমস্ত পণ্ডিতের, বিশেষতঃ জয়গোপালের, যশঃ ও গুণ-গরিমা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভুয়াড়-গ্রামে জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় সংস্কৃত-কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলে দর্শন-শাস্ত্র পড়িবার জন্য তাঁহার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ২১ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি সংস্কৃত-কলেজে আসিয়া জয়গোপালের নিকটেই উপস্থিত হইলেন। উইল্সন্ সাহেব তখন "জেনারল কমিটির" সেক্রেটারী। তিনি প্রত্যহই সংস্কৃত-কলেজে আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপক-গণের পঠন ও পাঠন কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জয়গোপাল প্রেমচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া উইল্সনের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উইল্সন্ প্রেমচন্দ্রের সুগঠিত মস্তক ও সুপ্রশস্ত ললাট দেখিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। উইল্সন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সংস্কৃত-কবিতা লিখিতে জান?" প্রেমচন্দ্র "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়াই নিম্ন-লিখিত কয়েকটী শ্লোক লিখিয়া উইল্সন্ সাহেবকে অভিনন্দিত করিলেন ঃ—

(ক)

ভবান্ ধন্যঃ শ্রীহোরেস-উইল্সন-সরস্বতি।
লক্ষ্মীবাণীচিরদ্বন্দ্বং ভবতৈব নিরাকৃতম্॥

শ্রীহোরেস উইল্সন্ সরস্বতী তুমি,
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি,—বুঝিলাম আমি।
লক্ষ্মী সরস্বতী,—দুয়ে শত্রু বারমাস,
একত্র, তোমারি গুণে, করিছেন বাস!

(খ—গ)

শ্রীসংস্কৃতকলেজস্য ভিত্তিস্তং শ্রীউইল্সন।
শ্রীগোপালনিমাইশম্ভুনাথুস্তম্ভচতুষ্টয়ম্ ॥
গঙ্গাধরযোগধ্যানহরনাথা ইমে ত্রয়ঃ।
ছাদাঃ সুনির্ম্মিতা নিত্যং চতুঃস্তম্ভোপরি স্থিতাঃ ॥

সংস্কৃত-কলেজের ভিত্তি উইল্সন্, শ্রীজয়গোপাল, নিমাইচাঁদ মহামতি,
তদুপরি চারি স্তম্ভ স্থিত সর্ব্বক্ষণ,— নাথুরাম শাস্ত্রী, শম্ভুচন্দ্র বাঁচস্পতি।
যোগধ্যান, হরনাথ, আর গঙ্গাধর,—
এই তিন ছাদ চারি স্তম্ভের উপর!

(ঘ)

কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভৃতঃ সম্মানিতো বিশ্রুতঃ
শ্রীযুক্তো জগতীতলে বিজয়তামূইল্সনঃ সাহবঃ।
যস্যানন্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রীতিদং
মন্যে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভণিতুং বাচোঽপি বাচস্পতেঃ ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

এই পরিদৃশ্যমান নিখিল ধরণী
যার অধিপতি 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী'।
এই কোম্পানীর সদা সম্মানিত অতি তাঁহার অসীম গুণ কি কহিব আর,
হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্ মহামতি। জয় জয় জয় তাঁর জয় অনিবার।
বর্ণিতে তাঁহার গুণ দেব বৃহস্পতি
থতমত খেয়ে যান্,—হেন মোর মতি!

প্রেমচন্দ্র উক্ত চারিটী কবিতা লিখিয়া উইল্সন্ সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। জয়গোপাল নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পূর্ব্বে কোন্ অধ্যাপকের নিকটে পড়াশুনা করিয়াছ?" প্রেমচন্দ্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করিলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিম্ন-লিখিত কবিতাটী লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন :—

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও জয়গোপাল তর্কভূষণের প্রভেদ।

গোপালৌ দ্বৌ জয়ৌ দ্বৌ চ দ্বাবেব তর্কমণ্ডনৌ।
মথুরাধিপ একো হি বৃন্দাবনাধিপোঽপরঃ ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

দুইটি ‘গোপাল’, পুনঃ দুইটিই ‘জয়’,
দুইটিই জানি ‘তর্ক-মণ্ডন’ নিশ্চয়।
একটী ‘গোপাল’ মোর মথুরা-ভবনে,
অন্য যে ‘গোপাল’ মোর, তিনি বৃন্দাবনে।

প্রেমচন্দ্রের পূর্ব্ব গুরুর নাম জয়গোপাল তর্কভূষণ এবং বর্ত্তমান গুরুর নাম জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। তর্কভূষণ মহাশয় ‘মথুরাধিপ’, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় ‘বৃন্দাবনাধিপ’। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ গোপাল মথুরার রাজা হইয়া যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনের রাজা হইয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, তর্কভূষণ মহাশয় শব্দ-রাজ্যের অধীশ্বর এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাব-মাধুর্য্য-রাজ্যের সার্ব্বভৌম সম্রাট্।

উইল্‌সন্ সাহেব ও জয়গোপাল প্রেমচন্দ্রকে উপস্থিত কবি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন প্রেমচন্দ্র ন্যায়-শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহাকে আপাততঃ সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। প্রেমচন্দ্রও সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া স্বল্পকাল-মধ্যেই স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। জয়গোপাল ও নাথুরাম শাস্ত্রীর অধ্যাপনার কৌশলে প্রেমচন্দ্র কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্র সর্ব্ব-প্রধান কৃতী ছাত্র। প্রেমচন্দ্রের সহাধ্যায়ি-গণের মধ্যে দুই জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—তন্মধ্যে একজনের নাম, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। ইনি জয়গোপালের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। অপর জনের নাম রামগোবিন্দ শিরোমণি।

সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী-শিক্ষার পরীক্ষা-গ্রহণ।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের একজন ইংরাজ-অধ্যাপক সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র-গণকে ইংরাজী-ভাষার পরীক্ষা করেন। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

Reading	Indifferent	History	A failure
Explanation ...	A failure	Geography ...	Ditto
Grammar	Satisfactory		

তৎকালে প্রশ্নের নমুনা।

সংস্কৃত-কলেজে উচ্চ-বৃত্তি মাসিক ২০৲ টাকা ছিল। যখন “উচ্চ-বৃত্তি পরীক্ষা” গৃহীত হইত, তখন পরীক্ষার্থি-গণকে পরীক্ষা-গৃহে বসিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রশ্নের নমুনা দিলাম :—

গদ্য।—মাতাপিতরৌ কন্যাপুত্রানাং কিংবিধানুপকারান্ কুর্ব্বাতে ইতি সংস্কৃতোক্ত্যা বর্ণয়।

পদ্য।—ফলানি বিদ্যাভ্যাসস্য শ্লোকৈঃ বর্ণয় সংস্কৃতৈঃ।

বাঙ্গালা।—স্বার্থপরায়ণতা ও অসত্যনিষ্ঠতার গুণ-দোষ বর্ণনা কর। দেশীয় ভাষায় পরিশ্রমের ফল বর্ণনা কর।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আর, এন, কাষ্ট্‌ নামক একজন সিভিলিয়ান্ সংস্কৃত-পদ্যে রচনা লিখিবার

জন্য প্রতিবৎসর ৫০৲ টাকা হিসাবে ৪ বৎসরের পারিতোষিক ২০০৲ টাকা একবারে দান করিয়াছিলেন। এই পারিতোষিকের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিয়ম হইল যে, পরীক্ষা-দান-কালে সংস্কৃত অনুষ্টুপ্-ছন্দে নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ২৫টী শ্লোক রচনা করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী ইন্দ্রবজ্রা বা উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের শ্লোক থাকা চাই। প্রশ্ন ছিল :—"What are the advantages of a town and country life, and which of the two deserves preference ?"

সংস্কৃত-কলেজে কাষ্ট্ সাহেবের ২০০৲ টাকা পুরস্কার-প্রদান।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের তাৎকালিক নবাব নাজিম মহাশয় সংস্কৃত-কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত তিনি ৫০টী মোহর দিয়া গিয়াছিলেন :—

সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র-গণকে নবাব নাজিমের পুরস্কার-প্রদান।

উচ্চ-শ্রেণী———ন্যায়———২০ মোহর
" ———স্মৃতি———১০ মোহর
নিম্ন-শ্রেণী ———ব্যাকরণ———২০ মোহর

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রচনার বিষয় এইরূপ ছিল :—

গদ্য। ক্ষমারোষয়োঃ গুণদোষৌ গদ্যেন বর্ণয়।
পদ্য। তোষরোষয়োঃ গুণদোষৌ পদ্যেন বর্ণয়।

সংস্কৃত-কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক-গণের নাম।

তাৎকালিক অধ্যাপক-গণের নাম, বেতন ও নিয়োগ-সময়।

অধ্যাপকের নাম	বেতন	অধ্যাপ্য-বিষয়	নিয়োগ-কাল	
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ	৯০৲	অলঙ্কার	১ ডিসেম্বর,	১৮৩২
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৯০৲	দর্শন	১১ মে,	১৮৪০
ভরতচন্দ্র শিরোমণি	৯০৲	স্মৃতি	১ ডিসেম্বর,	১৮৪০
রামগোবিন্দ তর্করত্ন	৪৫৲	ব্যাকরণ	১ ডিসেম্বর,	১৮৪০
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	৫০৲	ঐ	১৪ জানুয়ারি,	১৮৪৫
তারানাথ তর্কবাচস্পতি	৯০৲	ঐ	২৩ জানুয়ারি,	১৮৪৫
প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর	৪০৲	ঐ	২০ মে,	১৮৪৬
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৯০৲	সাহিত্য	২২ জানুয়ারি,	১৮৫১
নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪০৲	ব্যাকরণ	১২ নভেম্বর,	১৮৫১
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	৩০৲	ঐ	১৯ অক্টোবর,	১৮৫৩

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

সোনার ফুল

লীলাপুরের বিখ্যাত বসুবংশে গোবিন্দর জন্ম হয়। তাহার পিতা হরনাথ, পুরাতন বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের চিরন্তন নিয়মকে কেহ এড়াইতে পারে না ;—তিনিও পারেন নাই।

দিনে দিনে গৃহপ্রাঙ্গনে এবং প্রাচীরের উপর আশ্‌স্তেওড়া, ঘেঁটু, বট, অশ্বত্থের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল ; এবং ক্রমে দেখা গেল, তাহারা অট্টালিকার ইট, পাথর সরাইয়া আপনাদের শিকড় ও ঝুরি নামাইয়া, বসুকুলের সৌভাগ্যের দিনগুলিকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কারের অভাবে, বড় বড় ঘরগুলি বাস করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ফাটল। তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যায়। কোন ঘরে জানালা নাই। যে ঘরে আছে, তাহাও ব্যবহারের অভাবে এমন হইয়া গিয়াছে যে তাহা দিয়া কোনই উপকার হয় না। যেটি খোলা ছিল তাহা খোলাই আছে, তাহাকে বন্ধ করা যায় না। যেটি বন্ধ ছিল তাহা খুলিতে গেলে খিলান শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠে। একদিন যে ঘরগুলি মানুষের কান্না-হাসি প্রেমালাপে মুখরিত হইয়া থাকিত, এখন সেখানে বাদুড় চামচিকার চীৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ইহারই মধ্যে দু-একখানি ঘর পরিষ্কার করিয়া পুরাতন আস্‌বাব যাহা কিছু বাকি ছিল তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া লইয়া হরনাথ থাকিতেন।

তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অভাব একদিন ছিল না ; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়াকে লক্ষ্মী এবং তাহার 'বাহন', এক সঙ্গেই ছাড়িয়া যান। অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সকলেই সরিয়া গেল, তখন তিনি ইহার ভিতর বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বরং তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনা যাইত—আহা, আমার সঙ্গে থাক্‌লে বেচারাদের বড় কষ্ট হ'ত। ওদের আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌তাম না।

যাহারা তাঁহাকে একান্ত ছাড়িল না, যম তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইল। অবশেষে 'আপনার' বলিতে তাঁহার রহিল—গোবিন্দ এবং সুখ-দুঃখের স্মৃতিভরা জীর্ণ ঐ অট্টালিকাটি! এ দু'টিই পাষাণের মত তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া রহিল।

এই বেদনার ভার লাঘব করিবার আশায়, তিনি হরিনামের মালাটি হাতে লইয়া ঠাকুরঘরে আসিয়া বসিলেন ; ক্রমে সেইখানেই তাঁহার দিন ও রাত্রির অধিকাংশ ভাগ কাটিতে লাগিল।

হরনাথ বিষয়-চিন্তা ছাড়িলেন, কিন্তু বিষয়-চিন্তা তাঁহাকে ছাড়িল না। তাঁহার বাল্য বন্ধু প্রিয় ঘোষাল আসিয়া একদিন বলিলেন—ভায়া, নিজের 'পরকাল'টাকে নিয়ে এতই ব্যস্ত

যে অন্যের 'ইহকাল'টার দিকে একবার তাকাবারও ফুরসুৎ পাও না!—আমি বলছি কি, গোবিন্দ এখন আর নেহাত 'ছেলেমানুষ'টি নেই। ইহকালটা তার কাছে তোমার পরকালের চেয়ে একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—তার একটা গতি ত তোমায় করতে হবে?

এই কথা শুনিয়া যদিও হরনাথ বলিলেন—খেপেছ? কিন্তু তাঁহার চোখ দুটির সাম্‌নে আশার যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল, তাহাকে বড় সহজে নিভাইয়া দিতে পারিলেন না।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—গোবিন্দর চেয়েও কত 'দুঁদে' ছেলে, বিয়ে করে মানুষ হ'য়ে গেছে। এখন তারা স্ত্রী-পরিবার নিয়ে দিব্যি আছে।

হরনাথ কল্পনায় ভাঙ্গাবাড়ীটি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার কাণে ছোট ছেলেমেয়ের আনন্দের কোলাহল আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—আমাদের 'মেয়াদ' আর ক'দিনেরই বা! আজ ম'লে কাল দু'দিন হবে।

ঘোষাল মহাশয়ের উপদেশ বৃথা হইল না। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হরনাথ যখন ছেলের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন সে এমন 'লক্ষ্মী ছেলে'টির মত তাঁহার আদেশ মাথায় পাতিয়া লইতে প্রতিশ্রুত হইল, যে হরনাথও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! এমন বাধ্য হইয়া তাঁহার কোন কথা শুনিতে গোবিন্দকে তিনি কখনও দেখেন নাই।

(২)

বার বছর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত অক্লান্তপরিশ্রমে গোবিন্দ দুইটি কাজে বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমটি গঞ্জিকা সেবন; তাহাতে অবশ্য কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় কাজটির জ্বালায় লীলাপুর গ্রামবাসী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

হরনাথ ছেলেকে ভাল করিয়াই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার চোখ সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। গোবিন্দ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, 'ইয়ার' মহলে গর্ব্ব করিয়া বলিত—আমি 'চাল'গুলো সব এম্‌নি মাথা খেলিয়ে চালি, যে 'ব্রহ্মার' বেটা বিষ্টুও বুঝ্‌তে পারে না। লীলাপুর গ্রামের সে-ই ছিল সমস্ত জঘন্য কাজের 'ওস্তাদ'।

হঠাৎ সেদিন কিন্তু ভারি একটা গোল বাঁধিয়া গেল! তাহার এবারকার কাজটি 'ব্রহ্মার বেটা বিষ্টু' বুঝিতে পারিয়া ছিল কি জানি না, কিন্তু নিধু মোড়ল পারিয়াছিল। সে গ্রাম শুদ্ধ লোকের সামনে গোবিন্দকে লইয়া এমন একটি কাণ্ড করিল, যাহাতে 'ওস্তাদ' গোবিন্দর সুনাম 'সাক্‌রেদ' মহলে অনেকখানি নষ্ট হইয়া গেল। এমন কি, কিছু দিনের মত সে দিনের বেলায় পথে বাহির হইবার আশাও ছাড়িয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্দ্দিনে তাহার কাছে হরনাথ বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান গোবিন্দ ভাবিল— মন্দ কি ? গোঁফের ওপর পাকা 'আঞ্জীর' যদি আপনি এসে পড়ে, তা'হলে সেটাকে আর একটু এগিয়েই বা না নিই কেন ?

বাংলাদেশে ছেলের বিবাহ কোন দিনই আট্‌কাইয়া থাকে না—গোবিন্দরও হইয়া গেল।

হরনাথ মনকে সান্ত্বনা দিলেন—আমার কাজ আমি কর্‌লাম, এখন নিশ্চিন্ত মনে মর্‌তে পার্‌ব। গোবিন্দর শ্বশুর মন্মথনাথ ভাবিলেন—অত বড় কুলীনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলাম অথচ একটি পয়সা ত খরচ হ'ল না! গোবিন্দর শাশুড়ী মেয়ের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—অদৃষ্টকে কে খণ্ডাতে পারে বল ? কপালে যা লিখেছে বিধি, তা ত হ'বেই। আত্মীয়েরা বলিলেন—গোবিন্দর একটু আধটু দোষ আছে বটে, তা ও সেরে যাবে। আর 'বয়েস কালে' অমন সকলেরই থাকে।

সর্ব্বাঙ্গ লাল চেলীতে ঢাকিয়া গৃহলক্ষ্মী আবার বসুকুলপ্রদীপের ম্লান শিখাটি উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। হরনাথ পুত্রবধূর সুন্দর সুগঠিত হাতে রাঙ্গা রুলীটির দিকে তাকাইয়া সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিলেন। প্রতিবেশীনীগণ আসিয়া নব বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

হরনাথ একদিন বলিলেন—দেখ মা, অনেকগুলো কাজ তোমায় হাতে তুলে নিতে হবে। এই বাড়ীটার যা কিছু দেখ্‌ছ সবই ভাঙ্গা—কোথাও কিছু আস্ত দেখ্‌তে পাবে না। মানুষগুলো পর্য্যন্ত যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে!—এই দেখ না আমাকে! এ সমস্তই তোমায় গুছিয়ে নিতে হবে মা।

বৃদ্ধ হরনাথের বেদনাকাতর মুখের দিকে তাকাইয়া বধূর চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

হরনাথ বলিলেন—আমার সমস্ত আশা চলে গেছে মা—বছরের পর বছর এই ভাঙ্গনের সঙ্গে লড়াই করে এবার শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—আর ওঠাবার শক্তি নেই। তোমার পুণ্যে যদি আমার আবার সব ফিরে আসে।—কিন্তু আর কোন আশা কর্‌ব না। চাইব না কিছু। অনেক চেয়েছি, অনেক পেয়েছি; তারপর একে একে সব হারিয়েছি মা!—হারিয়েছি, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তোমায় একদিনের জন্যও শান্তি দিতে পার্‌ব না, এইটে জেনে বুকের ভিতরটা যেন আরো ভেঙ্গে পড়্‌ছে।

হরনাথের পায়ে প্রণাম করিয়া, বধূ বলিল—বাবা, ওসব আর কেন বলে কষ্ট পাচ্ছেন ? আমার কোনই অসুবিধা হবে না। হলেই বা ভাঙ্গা, এ ত আমারই বাড়ী ? নাইবা রইল বেশী লোকজন, আপনি ত আছেন ?

হরনাথ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন—ওরে মা রে মা! তুই যেন আমার ঘরের লক্ষ্মী! অনন্তকাল যেন তুই এই ভিটের মাটিকে বুকে করে নিয়ে পড়ে আছিস!—থাক্ অম্‌নি। দেখ্ যদি বাঁচাতে পারিস্।

(৩)

নূতন বধূর রূপের কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে, বধূকে লইয়া গ্রামের মেয়েরা কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিয়া যাইত। তাহাদের যাতায়াতে অট্টালিকার নির্জ্জীবতা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বহুকাল পরে গৃহে লোক সমাগম দেখিয়া, বৃদ্ধ হরনাথ শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন সমস্তই আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এত কাল তিনি যেন কোন এক দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বধূকে লইয়া যে কি করিবে তাহা যেন ভাবিয়া পাইত না। তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য অস্থির হইত; কোন ছেলে কিম্বা মেয়েকে বধূ যদি বেশী আদর করিত, অন্যরা তাহাতে অভিমান করিত, 'জন্মের আড়ি' দিয়া চলিয়া যাইবার ভয় দেখাইত।

সকলকে বুকে চাপিয়া, আদর করিয়া, কাহারও দিদি, কাহারও মাসী, কাহারও খুড়ী হইয়া তবে সে নিস্তার পাইত।

এত অল্পসময়ের মধ্যে কি করিয়া সে যে সকলের মন জয় করিয়া লইল, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। সকলেই শত মুখে বধূর প্রশংসা করিত। তুলনা করিতে হইলে বলিত— অমন বৌ আর হয় না! দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়!—আর মুখের কথা, আহা কি মিষ্টি! বুড়োর যে কপাল,—সইলে হয় এখন।

ঘোষাল মহাশয়ের পুত্রবধূ আসিয়া নূতন বধূর মুখটি একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল— তোমার নাম কি ভাই? তোমায় দেখ্‌তে এত ভাল লাগে যে আর কিছু জিজ্ঞেস কর্‌বার কথা মনেই থাকে না।

নূতন বধূ হাসিয়া বলিল—আমার নাম অপর্ণা। তোমার নাম কি ভাই?

আমার নাম—লক্ষ্মী। উনি আদর করে বলেন পাখী!

অপর্ণার মুখে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিল। সে বলিল—আমি যদি তোমার উনি হতাম, তা' হলে বোধ হয় ঐ বলেই তোমায় ডাক্‌তাম।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল -কিন্তু তুমি উনি হলে ত আমার মন উঠ্‌ত না। 'উনি'—'উনি' বলেই ত আমি এত——'

অপর্ণা। ওকি! থাম্‌লে যে?—শেষ কর।

লক্ষ্মী। আগে তোমার কথা কিছু শুনি।

অপর্ণা। কিন্তু আমার ত এখনও ভাই ভাব হয় নি, হলে বল্‌ব।

লক্ষ্মী। তবে আমি 'আনাড়ির' কাছে কেন বল্‌তে গেলাম? তুমি ত বুঝ্‌তে পার্‌বে সে সব কথা।

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা গো আচ্ছা আর ন্যাকামো কর্‌তে হবে না অত। এখন বল।

লক্ষ্মী। বল্‌ব আর কি? আচ্ছা সে যখন জোর করে মাথার কাপড়টা খুলে, গালের ওপর দুটো হাত রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন কি মনে হয় বল ত?

অপর্ণা একবার শিহরিয়া উঠিল! বড় বড় কালো দুটি চোখ দিয়া লক্ষ্মীর মুখ খানির দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লক্ষ্মী তখন সুখের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। অপর্ণার মুখের উপর দিয়া যে একখানি কালো ছায়া চলিয়া গেল, তাহা সে লক্ষ্য করিল না। আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিল মর্‌তেও চাই না, বাঁচ্‌তেও চাই না। কিন্তু সে আমি তোমাকে বোঝাতে পার্‌ব না কি হতে চাই! সমস্ত শরীরটা যেন কি রকম হয়ে যায় তার ছোঁয়া পেয়ে—না?

অপর্ণা গভীর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ।

লক্ষ্মী এবার তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেল! বলিল—ওকি! কি হল ভাই তোর?

হাসিয়া অপর্ণা বলিল—কৈ কিচ্ছু না ত! তুমি একটু বোস ভাই, আমি একবার দেখে আসি বাবার ঘুম ভাঙ্গল কি না।

লক্ষ্মী বলিল—আমিও আজ আসি, বেলা হয়ে গেছে। আবার আস্‌ব।

অপর্ণা। হাঁ ভাই এস।

ঐ ছোট কথাটি এমন দীনভাবে অপর্ণা বলিল যে, লক্ষ্মীর মন তাহার প্রতি করুণায় ভরিয়া গেল। সে বলিল—একা একা বড় কষ্ট হয় না ভাই? আর যে প্রকাণ্ড বাড়ী!—আচ্ছা আসি ভাই।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। অপর্ণা তাহার দিকে পলকহীনচোখে তাকাইয়া রহিল। লক্ষ্মী যেন তাহার জীবনের একটি সুখের স্বপ্ন! সে তাহার দৃষ্টির আড়ালে যাইতেই অপর্ণার চোখের সাম্‌নে বাড়ীটা তাঁহার বিরাট শূন্যতা এবং অনন্ত দৈন্য লইয়া ফুটিয়া উঠিল। কোথাও এমন কিছু নাই যাহা দেখিলে মন শান্তি পায়! আপনার ঘরখানির দিকে একবার তাকাইয়া, চোখ ফিরাইয়া লইয়া অপর্ণা হরনাথের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টায় এবং সাহায্যে একটি বৃহৎ 'আট্‌চালা' বাঁধা হইয়াছিল। সেখানে প্রতি বৎসর পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে নাচ, গান হইত। এবং অন্য সময়ে গ্রামের

বৃদ্ধেরা মিলিত হইয়া সকাল দুপুর সন্ধ্যা তাম্রকূট সেবন করিয়া গ্রামের বিষয়ে আলোচনা করিয়া কিম্বা একখানা খবরের কাগজ পাঠ করিয়া কাটাইত। যে ছোট ঘরখানিতে যাত্রা হইবার সময় সকলে সাজিত; সেই ঘরে কেবল নির্ব্বাচিত কয়েকটি মানুষ দল বাঁধিয়া, অতি গোপনে কিছু করিত। সকলের প্রবেশাধিকার সেখানে নাই, বা প্রবেশ করিতে হইলে যে সমস্ত নিয়মাবলী পালন করিতে হয়, তাহা সকলে পারিয়া উঠিত না। কিন্তু সকলেই ঐ ঘরের রুদ্ধ দ্বারের দিকে দীননয়নে চাহিয়া থাকিত, যেন জগতের যাহা কিছু গোপনীয় কথা উহারই মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বৃদ্ধেরা ভাবিত—ছেলেগুলো নিশ্চয়ই স্বদেশী কোন বিষয়ে লিপ্ত আছে, তাহারই আলোচনা এবং কাজ ঐ ঘরের মধ্যে হয়।

ছোটরা ভাবিত—নিশ্চয়ই ঐ ঘরের ভিতর দিয়া এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এবং তাহা একেবারে সোজা গিয়া কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের বারুদ কামরার পাশে থামিয়াছে। এবং ঐ ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ভিতর দিয়া যে এক তীব্র গন্ধযুক্ত ধূম নির্গত হইত তাহা হইতে সকলে স্থির করিয়াছে—উহা এক প্রকার 'গ্যাস' শত্রু মারিবার পক্ষে উহা একেবারে অব্যর্থ অস্ত্র।

সেদিন মধ্যাহ্নেও ঐ ছোট ঘরখানিতে সভা বসিয়াছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি 'কামানের' সাহায্যে 'শত্রুঘাতী গ্যাসে'র পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

কেদার বলিতেছিল—দেখ্ মোনা, তুই এখনও ছেলে মানুষ। যা 'রয় সয়' তা কর। একটানে 'কামান' থেকে আগুন বার কর্‌তে হলে, আরো কিছু দিন আমার 'সাক্‌রেদি' কর। তোদের টান মারা দেখ্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটে ব্যথা ধরে যায়।—আমার এই 'সাঁপ্পিটা'র বয়েস হল কত জানিস? পাক্কা একটি বছর! লক্ষ টাকা দিলেও এটা ছাড়িনা;—রং হয়েছে দেখেছিস? সেদিন তামাক কেনবার পয়সা ছিল না, এই থেকে একটুক্‌রো ছিঁড়ে নিয়ে সে যে—ওঃ সেকি 'রংদার' নেশা হল! দে তোদের দেখিয়ে দিই কি করে টান্‌তে হয় 'কামান'।

মোনার হাত হইতে ছিলামটি লইয়া হাতের আঙ্গুল জড়ো করিয়া সাঁপ্পি বা সেই মসীবর্ণ ন্যাক্‌ড়াটিকে ছিলামের মুখে চাপিয়া চোখ বন্ধ করিয়া কেদার এমন একটান দিল যে দপ করিয়া তাহা হইতে আগুন বাহির হইয়া আসিল।

মুখ হইতে প্রভূত ধূম নির্গত করিয়া বলিল—কি হে গোবিন্দ, এক পশলাতেই ভিজে গেলে বাবা! চলুক আর একবার।

মাখন। নারে ওকে দিস্‌নি। ও আজকাল সভ্য হয়েছে। দেখ্‌ছিস না, ওর গায়ে শিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে 'লপেটা'! কিন্তু ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, এই গোবিন্দর জুড়ি মেলা ভার! এক মাস মোটে বে হয়েছে, আর এরই মধ্যে একেবারে ভেড়া!

গোবিন্দ। না ভাই তা নয়। কি জানিস, সেদিন ও আমার মুখের গন্ধ পেয়ে বমি করে ফেলেছিল, তাই ভেবেছি, আর খাব না।

সকলে সাধু সাধু করিয়া উঠিল।

হারু। তাকে দেখ্‌তে কেমন রে গোবিন্দ? সেই যে ঘরে এনে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখ্‌লি, একবার দেখ্‌তেও পেলাম না জিনিষটা কেমন!

গোবিন্দ। বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বি না, তার হাতের আঙ্গুলগুলো লক্ষ্মী ঠাকুরুণের কান মলে দিতে পারে।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কেদার বলিল—যা যাঃ, তুই কেবল বিয়ে করেছিস্, আর ত কারো বৌ নেই?

চোখ দিয়া আগুন বাহির করিয়া গোবিন্দ বলিল—তোদের বৌ আমার বৌএর বাঁদীর বাঁদী হবারও যোগ্য নয়।—দে 'কামানটা' এগিয়ে, মাথা তেতে উঠেছে, একটা সুখটান না দিলে আর চল্‌ছেনা।

কেদার। এস বাবা এস! গোবিন্দরে, তোর কথাবার্ত্তা শুনে কি ভয় যে পেয়েছিলুম, তা আর কি বল্‌ব! ভাব্‌লাম বুঝি তোকে হারাতে হল!

গোবিন্দ। ধ্যেৎ পাগল! তা কি সম্ভব? ধোঁয়ার বাঁধন কি যে-সে বাঁধন রে?

ক্রমশঃ

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

তোমার দান

এ কোন সুধার স্রোতে ডুবালে হৃদয়,
কি আনন্দ দিলে প্রাণে হে আনন্দময়!
আঁধারে নিরাশা মাঝে ছিলাম মগন,
আনিলে সেথায় নব আশার স্বপন।
শুষ্ক এ হৃদয় মম কোন মায়া স্পর্শে
সঞ্জীবনী-সুধা-স্রোতে জেগে উঠে হর্ষে।

হৃদয়ের শুষ্ক শাখা মুঞ্জরি' উঠিল,
ছড়ায়ে মাধুরী নব কুসুম ফুটিল।
গাহিল সুকণ্ঠ পাখী কোন কলতানে,
দূর করি সব ব্যথা জুড়াইয়া প্রাণে।
বিশ্বের আনন্দধারা পড়িছে ঝরিয়া,
মুগ্ধ করি, পূর্ণ করি, শূন্য মোর হিয়া।

তোমারি দয়ার এ যে তোমারি এ দান,
তুলিয়া লয়েছি বক্ষে জুড়ায়েছে প্রাণ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

জাপানের সামাজিক প্রথা

(৩)

খাদ্য দ্রব্য

অনাহারে কাহারও জীবনযাত্রা চলিতে পারে না, ইহা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। সকল দেশের লোকেই জীবনরক্ষার জন্য সমানই চেষ্টাশীল। তবে দেশভেদে বা জাতিভেদে খাদ্য-দ্রব্যগুলি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং খাইবার প্রণালীও স্বতন্ত্র দেখা যায়; যেমন এ দেশীয়েরা প্রধানতঃ ডাল-ভাত এবং সঙ্গে সঙ্গে তরকারী ও মৎস্য কদাচিৎ বা মাংস প্রভৃতি আহার করিয়া থাকেন। অবশ্য আমি যতটুকু জানি তাহাতে এই বলিতে পারি যে, হিন্দুস্থানীরা এবং মাদ্রাস-অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা কখনও মাছ মাংস খান না। কাজে কাজেই তাঁহাদের পক্ষে ডাল-ভাত এবং তরকারীই প্রধান খাদ্য। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশীয়েরা প্রধানতঃ মাংসভোজী এবং সঙ্গে সঙ্গে পাউরুটী এবং আলু ইত্যাদি সব্‌জীগুলিও খাইয়া থাকেন।

ইহাতো হইল খাদ্যদ্রব্যের দেশভেদে বিভিন্নতার কথা; এখন খাইবার প্রণালীর কথা বলিতেছি। এদেশে রান্নাঘরের মেঝের উপর বসিয়া প্রথমে পুরুষদের এবং শেষে স্ত্রীদের আহার করা প্রায়ই নিয়ম; এবং থালার উপরে ভাতের সহিত তরকারী মিশাইয়া হাত দিয়া খাওয়ারই প্রথা; আর খাইতে বসিয়া কথা না বলাই শাস্ত্রের নিয়ম। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে চৌকীর উপর বসিয়া খাওয়াই পাশ্চাত্যদেশীয়দের প্রথা। তাহারা খাদ্যগুলি না মিশাইয়া কাঁটা ছুরী ও চামচে দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খায়; এবং খাইতে বসিয়া কথোপকথন ও গল্প করাই তাহাদের প্রথা।

দেশ ও জাতিভেদে খাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর কথা বলা হইল। এখন বলিতে হইবে, জাপানীরা কি খায় অর্থাৎ তাহাদের খাদ্যদ্রব্য কি এবং তাহাদের খাইবার প্রণালীই বা কিরূপ? গোড়ায় একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, এ দেশের লোকের খুব একটী ভুল ধারণা আছে যে, জাপানীরা আরশোলা খায়। অনেকে সময়ে সময়ে আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছে। যখন প্রথম আমি এদেশে আসি এবং প্রথমে আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমি আরশোলার মানে বুঝিতাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আরশোলা কি? তাহাতে উত্তর পাইয়াছিলাম—এক রকমের পোকা বিশেষ। আমি বলিয়াছিলাম আমাদের দেশের লোকেরা পোকাতো খায় না; সে কি পোকা? তখন একটা পুরানো আলমারী খুলিয়া আমাকে সেই

পোকাগুলি দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম—কিন্তু এই পোকাগুলিকে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, এই পোকা আমাদের দেশে একেবারেই নাই—খাওয়া তো দূরের কথা। আরসোলা ও ছারপোকা আমি এদেশে আসিয়াই প্রথমে দেখিয়াছি। এই পর্য্যন্ত জানি যে, ছারপোকাটা চীনদেশে যথেষ্টই আছে। আজকাল চীনদেশের লোকেরা জাপানে আসাতে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছারপোকাও জাপানকে আক্রমণ করিয়াছে। এই জন্য এই পোকাকে "নান্‌কিন্ মুসি" অর্থাৎ "নান্‌কিন্" চীন, "মুসি" পোকা—চীনে পোকা বলিয়া থাকে। কিন্তু এখনও ইহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেবল ইয়োকোহামা কোবে প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে যেখানে চীনেরা আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে সেখানেই প্রধানতঃ দেখা যায়। আজকাল এদেশে জাপানী ষ্টিমার যাতায়াত করাতে হয়তো আরসোলাও আমাদের দেশকে আক্রমণ করিতে পারে। যাহাহউক আরসোলা ইঁদুর ইত্যাদি আমাদের দেশের খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে যে নাই ইহা মনে রাখা উচিত, জাপানীদের প্রধান খাদ্য অবশ্য ভাতই। ইহা কেবল জাপানী মাত্রের নহে—চীন, শ্যাম, জাভা, বর্ম্মা, ভারত, তিব্বত ইত্যাদি—এসিয়াবাসী মাত্রেরই প্রধান খাদ্য। অবশ্য এসিয়ার মধ্যে আমি শুনিয়াছি যে, আফ্‌গানিস্থান ইত্যাদি দেশগুলিতে চাউল হয় না বলিয়া লুচিই সেখানকার প্রধান খাদ্য। ভাতের কথা বলিতে গিয়া এখানে ধান্যের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। এদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে বৎসরে একই ক্ষেত্রে দুইবার বা চেষ্টা করিলে তিনবারও চাষ হইতে পারে। কিন্তু জাপান শীতপ্রধান দেশ বলিয়া সেখানে বৎসরে একবারমাত্র চাষ হয়। এদেশে ধানের ক্ষেতে সাররূপে প্রধানতঃ গোয়ালের পচা গোবর ইত্যাদি আবর্জ্জনা গুলিই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু জাপানে ইহা ছাড়াও চূণ, মাছের হাড় ইত্যাদি অনেক জিনিসের ব্যবহার চলিত আছে। ইহাতে এদেশের চাউল অপেক্ষা আমাদের দেশের চাউলের আস্বাদ যেমন ভাল হইয়াছে, দামও তেমনি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এক সের মোটা চাউল খুব কম পক্ষে ছয় আনার কমে পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই আজকাল সাধারণ লোকেরা দেশীয় চাউল খাইতে পারে না বলিয়া প্রতিবৎসরই বর্ম্মা হইতে অনেক চাউল জাপানে রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্ম্মা অথবা চট্টগ্রামে বেনে চাউল বলিয়া একরকমের চাউল পাওয়া যায়; ইহার আস্বাদ খুব মিষ্ট। এই ধরণের চাউল আমাদের দেশেও জন্মায়।

জাপানীরা ভাতের সহিত তরকারী, মাছ ও মাংস খাইয়া থাকে। সেখানে কি কি তরকারী বা সব্জী পাওয়া যায় এবং কি কি মাছ ও কিসের কিসের মাংস খাওয়া হইয়া থাকে, ইহাও একটু একটু করিয়া বলিতে হইবে। আগে সব্‌জীর কথা হউক। গোল আলু, রাঙ্গা আলু, কচু, মানকচু, মূলা, শালগম, পেয়াজ, বেগুণ, শালবেগুণ, শসা, মিঠা কুমড়া, কাঁকুড়, মটরশুঁটি, বিন (Bean একরকম ডাল বিশেষ), বাঁধা কপি, সরিষা শাক, গাজর ইত্যাদি সবজীগুলি প্রধানতঃ সেখানে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাঁশের কোঁড়,

মৃণাল প্রভৃতিরও তরকারী রাঁধিয়া খাওয়া হয়। তরকারীতে মসলারূপে কেবল আদা ও গোলমরীচ মাত্র ব্যবহার করা হয়। এদেশের অন্যান্য প্রচলিত মসলাগুলির ব্যবহার আমাদের দেশে নাই। এই তো গেল সব্‌জীর কথা; এখন মাছের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ নদী বা পুকুরের মাছই ব্যবহার করেন। কিন্তু জাপানীরা প্রধানতঃ সমুদ্রেরই মাছ এবং কোন কোন নদীর কতকগুলি বিশেষ মাছ মাত্র ব্যবহার করেন। আপনারা সকলেই জানেন যে, জাপানের সবটাই সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত; তাই সেখানে সমুদ্রমৎস্যের চলনটাই বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এখানকার মাছের আস্বাদও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ এত বিচিত্র যে ব্যবসাদার ছাড়া সাধারণ লোকে তাহাদের সবগুলির নামও জানে না। যেগুলি এদেশে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে চিংড়ী, কাঁকড়া রুই, সেরম (ইহার বাঙ্গালা নামটী আমার মনে পড়িতেছে না), ইলিশ ইত্যাদি নামগুলি মাত্র আমার জানা আছে। ইহা ছাড়াও আমাদের দেশের অনেক মাছ আমি এখানে দেখিয়াছি এবং খাইয়াছিও, কিন্তু তাহাদের নামগুলি আমি জানি না। বলিতে গেলে জাপানীরা বাঙ্গালীর অপেক্ষাও মৎস্যপ্রিয়। তাহারা একবার খাইতে বসিলে এক-একজনে দুই তিনটা করিয়া না খাইয়া ক্ষান্ত হয় না, অবশ্য এই দুই তিনটা দুই তিন টুক্‌রা নহে—আস্ত এক একটী মাছ; এবং তাহাদের আকারও নিতান্ত ছোট নহে।

এইবার আপনাদের প্রিয় মাংসের কথা বলিব। মাংসের কথা বলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজ লইলে জানা যায়, প্রথমে জাপানীদের মধ্যে যাহারা সমুদ্রতীর ছাড়া অন্যত্র বাস করিত তাহারা কেবল সব্‌জীভোজীই ছিল। পরে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে মৎস্যভোজনের প্রথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মাংসভোজনের প্রথা একেবারেই ছিল না বলিতে পারা যায়। এই প্রথাটী ইয়োরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ স্পেনীস্ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতিরা আমাদের দেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরেজ, রাসিয়ান, এমেরিকানরা আসিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে তাহাদের সঙ্গে আমাদের মেশামেশি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সভ্যতা তাহাদের সামাজিক প্রথাও আমাদের দেশে চলিত হইতে আরম্ভ করিল। এই মাংস খাওয়াটা তাহাদেরই সামাজিক প্রথা—আমাদের নহে; কিন্তু উপরিকথিতভাবে তাহাদের সহিত মেলামেশার ফলে ক্রমে আমাদের দেশেরও প্রথা হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কাঁটা ছুরী চামচে দিয়া মাংস খাওয়া দেখিয়া প্রথমে কৌতূহলে একজন দুইজন মাংস খাওয়া আরম্ভ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া সকলের মধ্যে এই প্রথা ছড়াইয়া পড়িল। আমার বয়স এখন ৪১ বৎসর; আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এমন ছিল যে, আমাদের সহরে যে দুই তিন জন

মাংস খাইত, তাহাদের খুব গোপনে খাইতে হইত। তবুও মাংস রাঁধিবার গন্ধে জানিতে পারিয়া পাশের বাড়ীর লোকেরা তাহাদিগকে বড়ই নিন্দা করিত। কাজে কাজেই আমাদের ছেলে বেলায় মাংস খাওয়ার প্রথা সাধারণের মধ্যে চলিত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা মাংস খাইত তাহারাও নিন্দার ভয়ে সেই মাংস খাইতে খুব কষ্ট ভোগ করিত। কিন্তু আজকাল এমন হইয়াছে যে প্রায় সকলেই মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; তাই আর কেহ কাহাকেও নিন্দা করে না। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, আজকাল মাংস খাওয়ার প্রথা চলিত হওয়াতে যে সকল পশুর মাংস সাহেবেরা খায় আমাদের দেশের লোকেরাও প্রধানতঃ তাহাই খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও জাপানী মাত্রই স্বভাবতঃ মাংস অপেক্ষা মাছই ভালবাসে। তবে শীতপ্রধান দেশ বলিয়া ডাক্তারেরা মাংস খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল বলেন বলিয়া সকলেই উহা খাইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে মাছ মাংস খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল হইলেও সত্ত্বগুণ ও সচ্চরিত্র বজায় রাখিতে চাহিলে উহা ত্যাগ করাই ভাল। সাধু-সন্ন্যাসীদিগের নিরামিষ ভোজের ইহাই মর্ম্ম।

এতক্ষণ ধরিয়া জাপানীদের খাদ্যগুলির মোটামুটি নামোল্লেখ করা হইল। এখন কি প্রণালীতে ঐগুলি রান্না করা হয় তাহা বলিতেছি। আমি এইটুকু জানি যে, এদেশে ভাত রাঁধিবার পর তাহার ফেনটুকু ঝরাইয়া ফেলা হয়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐরূপ না করিলে ভাতগুলি হজম করিতে দেরী হয়। কিন্তু জাপান শীতপ্রধান বলিয়া সেখানে রাঁধিবার পর ফেন ঝরাইয়া ফেলিবার প্রথা নাই। কিন্তু একটা কথা হইতেছে এই যে, এদেশ বা ওদেশ যে দেশই হউক না কেন আস্বাদের পক্ষে ফেন ঝরাইয়া না ফেলাই ভাল। এদেশে তরকারী রাঁধিতে ঘৃত, তৈল, লবণ এবং ধনে মরীচ ইত্যাদি নানাবিধ মসলার ব্যবহার চলিত আছে। কিন্তু জাপানে ঐগুলির একেবারেই চলন নাই, উহাদের বদলে কেবল "সোইউ" বলিয়া এক রকমের সোস্ (Sauce) ব্যবহৃত হয়। ঐ সোস্ কি রকম করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা এখানে বলা বাহুল্য। কিন্তু উহার ব্যবহারে লোন্‌তা ও মিষ্টতা একত্র হইয়া আস্বাদ ভালই হয়। কোন কোন জিনিষ রাঁধিতে ঐ সোস্ ছাড়াও অল্প চিনি কিম্বা আদা বা মরীচ অথবা তেল ব্যবহার করা হয়। আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন একটী আস্বাদকর গুঁড়া মসলার আবিষ্কার হইয়াছে যে, রাঁধিবার সময় কিম্বা পরে তরকারীর উপর অল্প ছড়াইয়া দিলে খাইতে খুব ভালই লাগে। ইহার নাম "আজিনোমত" অর্থাৎ "আজিনো" আস্বাদ, "মত" মুল, আস্বাদের মূল। এই মসলাটী আজকাল এমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে খুব রপ্তানি হইতেছে। ইহা ছাড়া আলুভাজা, বেগুনভাজা, মাছ ভাজা ইত্যাদি এখানে যেরূপ হয় আমাদের দেশেও

সেইরূপ হইয়া থাকে। কেবল মাছভাজার বেলায় আমাদের দেশে প্রায়ই তেলের ব্যবহার না করিয়া মাছের দুইপাশে "সোইউ" মাখাইয়া আগুনের উপর ছ্যাঁকিয়া লওয়া হয়—এইটুকু মাত্র তফাৎ।

ক্রমশঃ

শ্রী আর, কিমুরা

রিটার গ্লুক্

[এই ক্ষুদ্র গল্পটীর রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ও প্রথিতনামা জর্ম্মান ঔপন্যাসিক আর্নষ্ট্ থিওডোর উইলহেল্ম্ হফ্ম্যান। হফ্ম্যান ১৭৭৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে কোনিগ্স্বর্গ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯২ খৃঃ ষোড়শ-বর্ষ বয়সে আইন শিক্ষার জন্য তিনি কোনিগ্স্বর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ১৭৯৫ খৃঃ কোনিগ্স্বর্গ আদালতে জুরীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে মাতার মৃত্যুহেতু এবং এক প্রেমব্যাপারে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কখনও বিচারকরূপে কখনও থিয়েটারের সঙ্গীতাধ্যক্ষরূপে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং অবসরকাল সাহিত্যচর্চ্চা, ও স্বরলিপি রচনায় কাটাইয়া দেন। ১৮২২ খৃঃ ২৪শে জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ই, টি, ডব্লিউ, হফ্ম্যান

হফ্ম্যান শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদিগের অন্যতম। তাঁহার রচনাপ্রণালী অধিকাংশে তাঁহার নিজস্ব ছিল। তাঁহার স্বভাব ছিল অদ্ভুত, সর্ব্বদাই তিনি যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন। এই স্বাপ্নিক ভাব তাঁহার রচনায়ও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রচিত চিত্র ছিল যেন স্বপ্নময়, যেন অতীন্দ্রিয়, যেন অশরীরী, কিন্তু তথাপি যেন এ জগতের, যেন বাস্তবতার ছাপযুক্ত;—যেন ভয়াবহ, কিন্তু অপরূপ। স্বপ্নের সহিত সত্যের মিশ্রণে তাঁহার রচনা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে আর ইহারই জন্য তিনি অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।]

শরতকালে অস্তগামী সূর্য্যের আলোতে সচরাচর সমস্ত বার্লিন সহরটি 'চক্মক্' করে। দিনের শেষে কাজ কর্ম্ম সারিয়া নানা রকমের পোষাক পরিয়া স্ত্রী পুরুষেরা দলে দলে 'লাইম্' গাছের তলায় জমা হয়। যে দিনের কথা আজ আমার মনে হইতেছে সেদিন ছিল রবিবার।

বার্লিনের চিড়িয়াখানায় যাইবার পথে খুব জনতা হইয়াছিল। আমার কোন বিশেষ কাজ ছিল না, আমি একটি পথের ধারের ছোট 'কাফে'তে বসিয়া চা খাইতেছিলাম। একটু দূরে একটা ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। যেমন সাধারণ ব্যণ্ড হয় এটাও সেই রকমের। আমার বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল। আমি বলিয়া উঠিলাম "কি আপদ্, এই ব্যাণ্ডগুলোর জ্বালায় একটু স্থির হইবার জো নাই!" এমন সময় কে বলিল "এরা দেখছি গ্লুকের নূতন সুরটি আয়ত্ত করিতেছে।" আমি মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি বৃদ্ধ ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধটির আকৃতিতে এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যাহা সচরাচর দেখা যায়না। বয়স পঞ্চাশের উপর বলিয়া বোধ হইল। মাথার চুল পাকিয়াছে। চোখের চাহনি কিন্তু ছেলে মানুষের মত। অথচ সে দৃষ্টি যেন বাহিরের কোন জিনিষের উপর স্থাপিত নয়। লোকটির পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা সেকেলে ধরণের। যেই বাজনাটা একটু থামিয়াছে আমি অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছায় বলিলাম "বাঁচা গেল! বাজ্‌নাটা থামিয়াছে। আমি ভাবিতেছিলাম এরা কাণ "ঝালাপালা" না করিয়া ছাড়িবে না।" বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবার বলিলাম "মহাশয় কি বলেন? এ রকম বাজনা যত কম শোনা যায় ততই তৃপ্তিকর নয় কি?" তিনি বলিলেন "আপনি বোধ হয় গান বাজনা ভাল বোঝেন তাই ঐ রকম বলিতেছেন। আমি নিজে ওসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোন মতামত দিতে পারি না।" আমি উত্তর শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম "আমি মোটেই সমজদার নই। তবে গোলমাল ভালবাসি না। গান বাজনার দোহাই দিয়া অনেক সময় লোকে কেবল চীৎকার করে ও কর্কশশব্দে কাণটা যেন ফাটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করে। তাই বলিতেছিলাম এ রকম শব্দের উৎপাত থেকে নিজেকে যতদূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল।" বৃদ্ধ বলিলেন, 'তাই নাকি?' এই বলিয়া আমার পার্শ্বের একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। একটু পরে আবার ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ চোখ বুজিয়া বাজনার তালে তালে হাত নাড়িতে লাগিলেন। খানিক পরে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তখন যে সুর বাজিতেছিল তাহা আমার কাছে কোন বিশেষত্বসূচক বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি যেন আমাদের চারিদিকের কোন জিনিষই দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার চোখে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি। বাজনার তালে তালে মুখের ভাব বদলাইতেছে।......গান শেষ হইল। বৃদ্ধ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মন্দ নয়। তবে এখনও ইহারা সব সুরটা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।" আমি বুঝিলাম লোকটা গানপাগ্‌লা।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি বার্লিনে থাকেন?" আমি বলিলাম "না, মাঝে মাঝে আমি বার্লিনে আসি এক সপ্তাহের বেশী কখন বার্লিনে বাস করি নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন "তাহা আপনি—বলিবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই একবার পদচারণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কখনও গানের বিশেষত্বটা কি তাহা ভাবিয়া

দেখিয়াছেন ?" আমি এই প্রশ্নটিতে একটু কৌতুক বোধ করিলাম। মনে ভাবিলাম গানের আবার বিশেষত্বটা কি ? উত্তরে বলিলাম 'না'। বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন "আপনি যে বার্লিনের লোক নহেন তাহা আপনার এই উত্তরে আমি আরও স্পষ্ট বুঝিলাম। আমরা বার্লিনে থাকি, আমাদের সকলেরই একটু একটু সুর বোধ আছে। আমি নিজে ছেলেবেলা থেকেই সুরের বিশেষত্ব চিনিতে শিখিয়াছি। লোকে মনে করে গোটা কতক বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিলেই গান ও সুরের ধরণ সব শেখা হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়, অন্য সমস্ত শিল্প-কলার মত গানে একটি নিজস্ব আছে যাহা সকলের চোখে ধরা পড়ে না। চোখে 'ধরা পড়ার' কথা বলিলাম এই জন্য যে গানের প্রকৃতি শুধু বুঝিবার নয়, এটি দেখিবারও জিনিষ। তবে সেটি দেখিতে হইলে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে আলো ছায়ার পরিকল্পনা আমাদের এ জগতের নিয়ম মানে না। সেখানে গাঢ় অন্ধকারের স্তরে স্তরে উজ্জ্বল আলোর ঢেউ উঠিতে থাকে। সেই আলোর ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি সুর স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন তাল, মান, লয় এক দীপ্ত শিখায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। সুরের আগুনে সমস্তদিক লাল হইয়া যায়।".........শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ সুপ্তোত্থিতের মত আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "হ্যাঁ আমি সেই স্বপ্নরাজ্যে একবার গিয়াছিলাম। তখন সেখানকার যত বেদনা যত যন্ত্রনা সব এক হইয়া এক গভীর সুরের নিস্তব্ধ আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। তখন চারিদিকের অন্ধকার ভেদ করিয়া এক দীপ্ত কিরণ-রশ্মি অনন্তের পথে চলিয়াছে। আমি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সুরের ভিতরকার অব্যক্ত ধ্বনিটি গানে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আজও তাহা পারি নাই।" বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি কিছু বলিবার আগেই একটু হাসিয়া বলিলেন "মহাশয় কিছু মনে করিবেন না। আমি মাঝে মাঝে এমনি অন্যমনস্ক হইয়া অসংলগ্ন অনেক কথা বলিয়া ফেলি। এখন তবে যাই"—এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম বুড়োটা শুধু গানপাগ্‌লা নয়, আধপাগ্‌লা।

মাস কয়েক পরে আবার বার্লিনে আসিয়াছি। বর্ষাকাল। সন্ধ্যার সময় থেকেই একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে। কোন কাজ কর্ম্ম নাই। সময় কাটাইবার জন্য ভাবিলাম থিয়েটারে যাই। বৃষ্টিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি সেই বৃদ্ধ পথের এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ চিনিলেন, বলিলেন "কি মহাশয়, বৃষ্টিতে কোথায় যাইতেছেন ?" আমি বলিলাম 'থিয়েটারে'। বৃদ্ধ বলিলেন "চলুন আমিও যাইব।"

আমরা থিয়েটারে গিয়া দেখি বড় ভিড়। গান হইতেছে। গ্লুকের "জীবন সন্ধ্যার" একটি সুর বাজিতেছে। বৃদ্ধ বলিলেন, "না! এরা ঠিক বাজাইতে পারিতেছে না। আমি আপনাকে ইহার চেয়েও ভাল সুর শোনাইব। এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া থিয়েটার হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

পথের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সেই ক্ষীণ আলোতে, ভিজে স্যাঁৎ সেঁতে রাস্তা দিয়া একটি ছোট দোতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি একটি আলো লইয়া আসি।" খানিক্ পরে একটি বাঁতির আলোতে পথ দেখাইয়া বৃদ্ধ আমাকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি বড় পিয়ানো রহিয়াছে। পিয়ানোর উপরে একটি চীনামাটির ফুলদানিতে খানকতক স্বরলিপি। কিন্তু সেইগুলি অনেকদিন ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ ফুলদানির উপর মাকড়ষায় জাল বুনিয়াছে। স্বরলিপির কাগজগুলার রং একটু হল্‌দে হইয়া গিয়াছে। ঘরটি সাজানর ধরণ দেখিয়া বোধ হয় এক সময় গৃহস্বামীর অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু এখন দারিদ্র্যের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের কার্পেট মলিন হইয়া গিয়াছে। জানালার পর্দ্দা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বসিবার চেয়ারগুলির অবস্থা শোচনীয়। বৃদ্ধ পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া বলিলেন 'দেখুন আপনাকে ঠিক গ্লুকের মতন সুর শোনাইতে পারি কি না।' এই বলিয়া গ্লুকের রচিত একটি বর্ষার গানের সুর বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বাহিরে বৃষ্টি টিপ টিপ্ করিয়া পড়িতেছে,—সুরের আওয়াজ সেই বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। একটু পরে বোধ হইল কে যেন ঝম্ ঝম্ করিয়া পা ফেলিয়া আসিতেছে। তারপর বোধ হইল ঘরের আলো নিভিয়া গিয়াছে। আকাশে ঘন মেঘ আরো ঘন হইয়া উঠিল। বৃষ্টির শব্দ ক্রমেই দ্রুত তালে পা ফেলিয়া চলিল। এইবার শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিল। আকাশে, বাতাসে এক বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি আরও বেগে আসিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। পিয়ানোর সুর কড়্ কড়্ করিয়া বাজের শব্দে যেন কাহার সমস্ত জীবনের বেদনাসম্ভূত উন্মত্ত আর্ত্তনাদে ঘর ফাটাইয়া দিল। আস্‌বাবপত্র সব চূরমার হইয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। গান থামিয়াছে। আকাশেও মেঘ নাই। গ্লুক পিয়ানোর সমুখে বসিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি

একি ?

শুধু ঝম্ ঝম্,—আর ঘর্ঘর ; ব্যথা থম্‌থম্,—কাঁপে অন্তর
একি, গুরু বিরহের ক্রন্দন ?
কিবা, অসীমে মিলন-বন্দন ?

কাজের সাড়া

[রচনা——————শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী]

জাগো মা জাগো বীরাঙ্গনা বিপদ্ বেধেছে !
ঘোরাল মেঘ জমে ক্রমে ঝড় ঐ উঠেছে !

এসেছে কাজের সাড়া, উঠে সব দাঁড়া দাঁড়া,
সে যে রে বিষম তাড়া, বিষম হয়েছে !
বীর-দুহিতা বীরের মাতা, বুঝ্‌বি তোরা আসল কথা !
প্রাণ দিয়ে মা, প্রাণের ব্যথা, মুছ্‌তে হ'বে যে !
সিংহ যারা ধুলার মাঝে, অলস ঘোরে সুপ্ত আছে,
ঘুম ভাঙ্গিয়ে দে জাগিয়ে, যাক্ তারা কাজে !

শক্তিরূপা, শক্তি তোরা, তেজ হারিয়ে ঢোঁড়া হ... ..,
বুক ভরে দে তেজে তারা,—উঠুক গরজে !
স্বার্থ পরের আনি-মানি, যা ভুলে বল 'জানি জানি,'
কাজের মত কাজের সময়, এবার এসেছে !
শক্তি পুজি মনে মনে, শক্তি জাগা সকল প্রাণে,
বীরাঙ্গনার হৃদয় বলে, বীর বলীয়ান যে।

কিসের কি ভয় ? থাক্‌বে ত জয়, সম্মানের মাঝে !!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মেঘ্‌রাগ—রূপক

০ ১ ২ ০ ১ ২
II{ র্সা র্সা ণা | ণা -া | পা -া I মা পা -মপা | র্সা -া | র্সা -া I
জা গো মা জা ০ গো ০ বী রা ০ ঙ্ গ ০ না ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ণা পা -মা | রা -া | মা -া I পা -ণা -া | -পা -মা | -রা -সা I
বি প দ্ বে ০ ধে ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I সা রা রা | মা -রা | মা পা I ণণা পা মা | ·পা ণণা | র্সা র্সা I
ঘো রা ল মে ঘ্ জ মে ক্র মে ঝ ড় ঐ উ ঠে

০ ১ ২
I র্রা -র্সা -ণা | -পা -মা | -রা -সা } II
ছে

০　　　　１　　　　২　　　　০　　　　１　　　　２
II{ মা　মরা　মা | মা　পপা | ণা　পা I মা　পা　ণর্সা | ণা　র্সা | র্রা　র্সা I
এ　সে॰　ছে　কা　জের্　সা　ড়া　উ　ঠে　সব্　দাঁ　ড়া　দাঁ　ড়া

০　　　　１　　　　২　　　　০　　　　１　　　　২
I ণা　র্সা　র্রা | র্মা　র্রর্মর্মা | র্রা　র্সা I মা　পা　-া | ণা　-র্সা | র্সা　-র্রা I
সে　যে　রে　বি　ষ॰ম্　তা　ড়া　বি　ষ　ম্　হ　॰　য়ে　॰

০　　　　১　　　　২　　　　১　　　　১　　　　২
I ণা　-া　-পা | -মা　-া | -পা　-া} I {ণণা　-া　মপা | পা　-া | মা　-া I
ছে　॰　॰　॰　॰　॰　॰　বী　র্　দু॰　হি　॰　তা　॰

I রা　মা　-পা | ণা　-া | পা　-া I মা　-পা　পা | ণা　-র্সা | র্সা　-া I
বী　রে　র্　মা　॰　তা　॰　বু　ঝ্　বি　তো　॰　রা　॰

I ণা　পা　-ণা | মা　-রা | রা　-া I মরা　-া　মা | পা　-া | মা　-রা I
আ　স　ল　ক　॰　থা　॰　প্রা　ণ্　দি　য়ে　॰　মা　॰

I সসা　রা　-সা | ণ্া　-া | প্া　-া I ম্প্া　-া　ণ্া | সা　-া | রা　-মপা I
প্রা　ণে　র্　ব্য　॰　থা　॰　মু॰　ছ্　তে　হ　॰　বে　॰॰

০　　　　１　　　　２
I ণা　-পা　-মা | -রা　-সা | -রা　-সা} II
যে　॰

০　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
II{ মমা　মা　-রা | মা　-া | পা　-া I ণণা　পর্সা　-া | র্সা　-ণর্সা | র্সা　-া I
লিং　হ　॰　বা　॰　রা　॰　ধু॰　লা॰　র্　মা　॰॰　খে　॰

০ ১ ২ ০ ১ ২
I র্রা স র্রা -া | মা -র্রা | র্মা -া I র্রা -র্সা র্রা | ণা -া | পা -া I
অ ল • স্ ঘো ০ রে ০ সু প্ ত আ ০ ছে •

০ ১ ২ ০ ১ ২
I মা -া ররা | মা -া | পা -া I মা -া পা | ণা -র্সা | র্সা -া I
ঘু ম্ ভা০ ঙ্গি ০ য়ে ০ দে ০ জা গি ০ য়ে ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ণা -র্ররা র্সা | ণা া | মপা -র্সা I মা -পা -মা | -রা -া | -র্সা -া} II
ষা ০ক্ তা রা ০ কা০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
II {মা -া পা | মা -া | রা -া I মা -রা মা | রা -সা | সা -া I
শ ক্ তি রূ ০ পা ০ শ ক্ তি তো ০ রা ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ণ্া -া সা | রা -া | সা -া I ণ্া -া সা | ণ্া -া | প্া -া I
তে জ্ হা বি ০ য়ে ০ ঢেঁা ০ ড়া যা ০ রা ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ম্া -প্া প্া | ণ্া -প্া | প্া -া I ণ্া সা -া | ণ্া -া | সা -া I
বু ক্ ভ বে • দে ০ তে জে ০ তা ০ রা ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I রা মা -া | পা -া | মা -পা I ণা -পা -মা | -মা -পা | -ণা -পা} I
উ ঠু ক্ গ • র ০ জে • ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I {মা -পা পা | ণা -া | পা -া I ণা র্সা -া | ণা -র্সা | র্সা -া I
স্বা র্ থ প • রে র্ আ নি • মা ০ নি •

০ ১ ২ ০ ১ ২
I র্রা র্মা -া | র্পা -া | র্মা -া I র্রা মা -া | র্র্া -া | র্রা -া I
যা ভু ০ লে ০ ব ল্ 'জা নি ০ জা ০ নি ০'

০ ১ ২ ০ ১ ২
I র্সা র্সা -া | র্রা -া | র্রা -া I ণা ণণা -া | পা -মা | পা -া I
কা জে র্ ম ০ ত ০ কা জে০ র্ স ০ ম য়

০ ১ ২ ০ ১ ২
I রা মা -পা | ণা -া | ণা -া I পা -মা -পা | -ণ্া -া | -মা -প্া} I
এ বা র্ এ ০ সে ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I{র্সা -া র্সা | ণা -া | পা -া I মা পা -া | ণা -র্সা | র্সা -র্রর্সা I
শ ক্ তি পূ ০ জি ০ ম নে ০ ম ০ নে ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ণা -া ণা | পা -া | মা -া I রা মা -া | রা -া | সা -া I
শ ক্ তি জা ০ গা ০ স ক ল্ প্রা ০ ণে ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I ণ্া সা -া | রা -া | মরা -ণ্া I সা রা -া | ণ্া -া | সা -া I
বি রা ঙ্ গ ০ না০ র্ হৃ দ য় ব ০ লে ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I রা -া মা | পা -া | মা -পা I পা -ণা -া | -পা -মা | -পা -া} I
বী র্ ব লি ০ য়া ন্ যে ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I{র্রা র্মা -া | র্পা -া | র্মা -া I র্রা -র্সা র্রা | ণা -া | পা -া I
কি সে র্ কি ০ ভ য় থা ক্ বে ত ০ জ য়

০ ১ ২ ০ ১ ২
I র্রা -মা মা | পা ণা | র্সা -র্রা I র্রা -র্সা -ণা | -পা -মা | -রা -সা} III
স ম্ মা নে র মা ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০ ০

প্রতিধ্বনি

(১)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচিত

বস্ত্র-সমস্যা

দেশীয় রঙে কাপড় রঙ করা

এমন দিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণ রঞ্জন-কার্য্যে সৌন্দর্য্য-সম্পর্কীয় সুরুচির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। কি বস্ত্ররঞ্জন-কার্য্যে, কি চিত্রে বর্ণবিন্যাসে বর্ণের স্থায়িত্ব ও মিশ্রণ-সম্বন্ধে যাদৃশ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন তাহা বস্তুতই অতুলনীয়। পূর্ব্বকালে লোমজ অথবা অন্যবিধ বস্ত্র রঞ্জনে এবং অজন্তাগুহাস্থিত চিত্র সমূহে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই সকল বর্ণ-ই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বর্ণের সুন্দর সমাবেশ-সম্বন্ধে আমাদের শিল্পিগণের ধারণা-গতি পরিষ্কার ছিল। আমাদের বিলাতী-প্রীতির বিষময় ফলের প্রভাবে আমাদের সমস্ত শিল্প-কলা ত লোপ পাইতে বসিয়াছে, তথাপি দুই একটা কাজে দেশীয় শিল্পীদের বর্ণ সমাবেশের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় প্রথায় রঞ্জিত গালিচা কিম্বা পর্দ্দা এখনও আমাদের নয়ন মুগ্ধ করে। বিদেশ হইতে আনীত রংএর জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত সুন্দর বর্ণ প্রস্তুতের কলা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক্ষণে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী রং আমদানী করা হইতেছে। চটকদার রংএর হীন অনুরাগ ও রুচিতে আজ দেশের সমস্ত লোক বিমোহিত।

আলকাতরা বা মঞ্জিষ্ঠা হইতে প্রাপ্ত তৈলবৎ দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ বর্ণ এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। উহাদের ভিতর দুই একটা বাস্তবিকই বেশ সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাহা হইলেও সাধারণতঃ বলিতে গেলে বিদেশ হইতে আমদানী রংএর তীব্রোজ্জ্বল দ্যুতিতে আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই বিদেশীয় রং ব্যবহার করিতে আমাদের দেশের টাকা যে বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহা বলাই অনাবশ্যক। এমন কি, যে সকল অস্থায়ী বা কাঁচা রং দেশীয় উপাদানের সাহায্যে সহজে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। সামান্য হলুদ চুণের অথবা হলুদ ও শিউলী ফুলের সাহায্যে যে রং প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে ব্যয় অতি সামান্য। কিন্তু সে সকল রং ব্যবহার করিতে আমাদের মন উঠে না। আমাদের রমণীগণের পায়ের আলতা এবং দোল-পর্ব্বে ব্যবহৃত আবীর রং করিবার জন্য এখন বৈদেশিক আলকাতরা-জাত উপাদান ব্যবহার করা হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা যে কালী ব্যবহার করিতাম, তাহা ভুষা এবং ঝিউনী অর্থাৎ পোড়া চাউল ভিজান জলের সহযোগে প্রস্তুত হইত; কত সহজে এবং কত অল্প খরচে ঐ কালী প্রস্তুত হইত। অথচ সে কালী কেমন সুন্দর ও চিরস্থায়ী ছিল। সে কালীর রং কখনও ম্লান হইত না এবং উহাতে কাগজও চুপ্‌সাইত না। এখন আর সে কালীর ব্যবহার নাই। বিদেশ হইতে আমদানী ব্লু-ব্লাক কালী অথবা উজ্জ্বল কালীর বড়ি উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও এখন এই কালীরই প্রচলন। ডাক চিঠি বিলি করিবার পিওনকে যদি ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে ভিজিতে হয় এবং তাহার ব্যাগের মধ্যস্থ চিঠিগুলিতে যদি জল লাগে, তাহা হইলে এখনকার কালীতে লেখা পোষ্টকার্ডগুলির এমন অবস্থা হয় যে, তাহা পাঠ করা একপ্রকার সাধ্যের অতীত হইয়া উঠে।

এখন কালীর অবস্থা ত এই ! তাই কি ছাই সস্তা ! এক মুঠা চাউলে আগে এক বোতল কালী তৈয়ারী হইত। এর চেয়ে সস্তা আর কি হইতে পারে? বৈদেশিক দ্রব্যের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই আমাদের রুচির বিকৃতি সাধন করিয়াছে। বিদেশে প্রস্তুত জিনিষের সাহায্যে 'সভ্য'-সাজা এখন আমাদের দেশের লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কারখানা সমূহে প্রত্যহ যে সহস্র সহস্র টন আলকাতরা-জাত রং প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি ত আমাদের এই প্রাচ্য দেশে বিক্রয় করা চাই। বিলাতী মার্কা-মারা সস্তা জিনিষের খরিদ্দার এমন অন্ধ দেশও আর কোথাও নাই! আমাদের দেশের কামার, কুমার এবং কাঁসারির তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর জিনিষ ফেলিয়া আমরা এখন বিলাতী হাঁড়িকুড়ী এবং এনামেলের বাসন কিনিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত! আমাদের দেশের কামার, কুমার এবং কাঁসারিরা যে কেমন করিয়া বাঁচিবে, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য আদৌ নাই। আমাদের দেশের উৎপন্ন খদির, খয়ের, হরীতকী এবং কুসুম ফুলের পরিবর্ত্তে আমরা এখন রং করিবার জন্য বিদেশী উপাদান আমদানী করিয়া থাকি। আমরা পাশ্চাত্যের মোহে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা যে ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছি, সেদিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই।

সম্প্রতি ভারতজাত দ্রব্যের প্রতি ভারতীয়গণের যে অভিরুচি জন্মিতেছে, সে জন্য মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। পরিবার ধূতি হইতে সামান্য চকমকি পর্য্যন্ত সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য যে হীন পরবশতা ছিল, এক্ষণে লোকে তাহা পরিহার করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। রং প্রস্তুতের ব্যবসা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদেশী আমদানী রং ছাড়া যে রং হইতে পারে একথা এখন আমরা বিশ্বাসই করি না। পূর্ব্বকালে লাল রং করিবার জন্য অলকাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মঞ্জিষ্ঠা হইতে যেরূপ লাল রং হয়, উহার শিকড় হইতেও সেইরূপ লাল রং পাওয়া যায়। কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার মত উহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ নহে। ঐ শিকড় এখন কলিকাতার বাজারে মিলান দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে কিন্তু উহা প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইত। অনেক অনুসন্ধানের পর একজন দোকানী আমাকে বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধের সময় অলশিকড়ের কিছু কারবার করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন উহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। যে জিনিষটা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত ও পাওয়া যাইত,—সে জিনিষ কলিকাতার মতন বাজারেও এখন মিলান দুষ্কর। লাল রং করিবার জন্য আর একটী জিনিষ 'বকম' কাঠ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের মারগুই নামক প্রদেশ হইতে একমাত্র ঢাকা জেলার জন্য পঞ্চাশ হাজার বিশ মণ পরিমাণ বকম কাঠ আমদানী করা হইত। ব্রহ্মদেশে ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে বকম গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্বে 'বকম' কাঠ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। 'বকমের' আর একটী নাম 'পটং'। এখন এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কলিকাতার কোন দোকানে এক সঙ্গে এক মণ 'বকম' কাঠ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। আগে যাহা টাকায় ৮।১০ মণ বিক্রীত হইত, এখন তাহার এক সেরের মূল্য দুই টাকা হইতে তিন টাকা। চাহিদা না থাকায় বকম কাঠের ব্যবসা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কোচিনীল বা ইন্দ্রগোপ পোকা * লাল রং এর আর একটি উপাদান। ইহা ঔষধার্থ এবং রেশম ও পশম রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কোচিনীলকীট মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং জলন্ধর—এই তিন স্থানে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতে প্রচুর পরিমাণে কোচিনীলের ব্যবসায় ছিল। ভারতে ইহার নাম

* সম্বলপুর অঞ্চলে ও ছত্রিশ গড়ে প্রথম বর্ষায় এই পোকা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। বং সং

কিরাক্ত। এখন সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের কোচিনীল আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে। আগে লাক্ষা হইতে লাল রং প্রস্তুত করা হইত। এখন কিন্তু লাক্ষা হইতে গালা বাহির করিয়া রংটা ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ সেই রংই বিদেশ হইতে আনা হয়। এ সকল কথা এখন গল্প বলিয়া মনে হয়।

আমার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংস্পৃষ্ট দুইজন ছাত্রকে দেশীয় উপাদান হইতে রং উৎপন্ন করিবার বিদ্যাটাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কয়েক মাসের ভিতর তাঁহারা এ কার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। কত সহজে এবং কত অল্প ব্যয়ে দেশীয় উপাদান হইতে রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে ঐ পুস্তকে বর্ণিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান হইবে যে, দুই পয়সা দামের হরীতকী ও বাইক্রমেট অব পটাশের সাহায্যে একটী কোটকে সুদক্ষভাবে খাকি রংএ পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারিবে। কি বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে এবং কি স্থায়িত্বে, বিদেশ হইতে আমদানী খাকি হইতে উহা কোন অংশেই ন্যূন হইবে না।

রং প্রস্তুতের কার্য্যে এবং রংএর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেশের বহু লোক যে জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেকালের রঞ্জক এখন রজক ধোপায় পরিণত হইয়াছে। এখন আর সে রঙ করে না, যদিও এটা ঠিক যে, প্রতি গ্রামে আজ যেমন ধোপা আছে, সে দিন এমনি রঞ্জক ছিল। কথন কথন সে কাপড়ও কাচিত এবং রংঙেও ছোপাইত। হিতোপদেশের গল্পে এক ধোপার কথা আছে, তাহার ভাঁটীতে একটা শিয়াল পড়িয়া গিয়াছিল, সে ধোপা নীলের রঙ করিত। ধোপার সেই ফিকে নীল রঙের ভাঁটীতে এক চুবন খাইবার পর সে শিয়ালের নকল রঙ বা অন্য জানোয়ার এ বলা অসম্ভব হইয়াছিল। যাহারা এই নীল রং করে তাহারা তোমায় নিসংশয়ে বলিয়া দিবে যে, তাহার এই রঙের ভাঁটীতে যে কোন শিয়াল এ চুবন খাইবে, তাহাকে তখনই পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। কিন্তু হায়! সে রঞ্জকেরা আজ কোথায়, আর সংখ্যায়ই বা কটা?

বিকাশ (বৈশাখ)

(২)

'বিজলী'র চিঠির ঝাঁপি

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠের কাগজখানা এক কলকেতার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পড়ে এলাম। 'বীরবল' কলকেতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কথা কয়টি লিখেছেন তাই পড়ে আপনাকে এই চিঠিখানা লিখ্‌তে বসলাম। আজ বছর ত্রিশ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঙা-চোরা টিম্‌টিমে lampএর আলোর আড়ালে নিজের গায়ে একটা 'ডিগ্রী'র ছাপ মেরেছিলাম; সেই ছাপের খাতিরে আজ খেতে পাচ্ছি বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এখনও ভুলতে পারিনি। আমরা কয়েক বছর অবাক হয়ে দেখছি, কেমন করে এক বাঙালীর পৌরোহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, কেমন করে তার lampএর আলো ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে বিশ্ব-বিদ্যার চোখ-ঝলসান আলোয় চারদিক ঝলমলিয়ে তুলেছে। কি ছিল আর কি হয়েছে তা' বোধহয় আমরা ভাবতেও ব্যস্ত নই। বাঙালী তার নিজের আসরে জম্‌কে বসেছে, 'কটা' চামড়ার মাত্র ছিঁটেফোঁটা আছে বল্লেই হয়। আমাদের এমনই বদ স্বভাব যে ফিরিঙ্গী ছোকরা বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে এদেশে এলেই আমরা তাকে বিদ্যার জাহাজ মনে করে তার কাছে ছুটে যাই; আর আমাদের নিজেদের জাত-ভাই আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে লেখাপড়া শিখে বেরিয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়ালে আমরা নাকসিঁটকে চলে যাই। কিন্তু ফিরিঙ্গির ল্যাজ চিরদিন কামড়ে থাকলে আমরা কখনও উঠতে পারব না এই সোজা কথাটা আমরা বুঝেও বুঝি না। কলকেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট' বিভাগটা যে এই আদর্শের উপর গড়ে তোলা হয়েছে—সে খাঁটি কথাটা আশুবাবুর গত কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতা পড়ে বেশ বুঝতে পারলাম। বিলেতকে যে শুধু বিলেত বলেই ঘেন্না করতে হবে—এ পথে অবশ্য তিনি চলেন নি। এখানকার জল হাওয়াতে গড়ে তোলা অধ্যাপকদের বেছে বেছে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দিয়ে সেখানকার শেখবার ভাল জিনিষ শিখিয়ে এনে, তাদের মেধাশক্তি আরও ফুটিয়ে তুলে তিনি তাদের নিজের বাগানে এনে বসিয়ে দিলেন। এই ত চাই—এতে আমাকে ফিরিঙ্গীর পায়ে তেল দিতে দিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়ে তাকে এখানে টেনে নিয়ে আনতে হল না; অথচ সেই দেশের ভাল যেটুকু তাই আমার নিজের লোক গিয়ে নিয়ে চলে এল। ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে বিদেশীরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, আর আমরাও সেটাকে ঘাড় পেতে গ্রহণ করব;—এ ভাবটা যে খুব গৌরবের নয়, পৌরুষের নয়, তা সকলেই মানতে হবে। তাই না—বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে গবেষণা মন্দির স্থাপনা করা হয়েছে, তাই না আজ বিশ্ববিদ্যার দ্বার খুলে সেখানে সকলকে আহ্বান করছে। এই নতুন করে গড়ে তুলবার সময় যে সব দিক Perfection এর আলোতে ফুটে উঠছে না এই ছুতোর দোহাই দিয়ে যারা এই বিরাট আয়োজনটা ধুয়ে মুছে ফেলতে চান, তাঁদের চিন্তাশক্তিকে আমরা প্রশংসা করতে পারি না। দেশের সব দিক থেকে রত্নরাজি কুড়িয়ে এনে, তাদের ঘষে মেজে ঝক্‌মক্ করে তুলে, দেশের উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্র সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে—এই মহান্ আদর্শের সামনে কি আমরা মাথা নত করব না? মোটে পাঁচ বছর হতে চলল এই নতুনের সৃষ্টি হয়েছে—এই পাঁচ বছর সমালোচকদের তিক্ত উপহাস আর তীব্র কশাঘাত ছাড়া বাঙলা একে আর কিছু পুরস্কার দেয় নি। পান থেকে চূণ খসলেই এঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, কল্পনার তুলিতে মনের মত রূপকথা এঁকে এঁরা সকলকে অপমান করেছেন। যখন ভারতের বাহির থেকে মনীষীরা এসে এই নতুনের সুনাম গাইলেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন আর পিছন দিকে তাকিয়ে অবাক সুরে বল্লেন—"তাইত এ যে অনেকদূর চলে এসেছি; এখন আবার এই পথটা ফিরে যাই কেমন করে?" নাকি সুরে কোন সমালোচক ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন—"ওগো! ভুলো না ওদের কথা শুনে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গলদ আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করি, গলদ কোথায় নেই? সেই সমালোচকের মনে গলদ নেই? সেখানে ব্যক্তিগত দ্বেষের কাঁটা কি থেকে থেকে খোঁচা মারছে না? আজ কিছুকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনার আড়ালে একটা মানুষকে নিয়েই সে টানাটানি করেছে; constructive criticism বলে জিনিষটা তার গণ্ডীর ভিতর ছিল না কখনও। সে সবার চেয়ে উচু একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিজের আসন সেখানে টেনে নিয়েছে, আর তার পর সবজান্তার চশমা এঁটে জগতের পানে চোখ নামাচ্ছে—"with a haughty contemptuous look."

আবার ওদিকে সরকার বাহাদুরও হয়ে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চটা। তাঁর পুরাণ অভিযোগ হচ্ছে সে কেন তাঁকে খাতির করে না, কেন তাঁর মুখের উপর "সত্যম্ অপ্রিয়ম্" কথাগুলো কটমট করে শুনিয়ে দেয়। ছাড়বার পাত্র তিনি নন্—ক্রূর হাসি হেসে বল্লেন "আচ্ছা টাকার থলি আমার হাতে, দেখা যাবে তোমাকে শেষরক্ষা করে কে?" সরকার বাহাদুরের মেজাজ মাঝে মাঝে খুবই সরিফ হয়ে ওঠে, তিনি দিস্তে দিস্তে কাগজে কালী ঢেলে উপদেশ পাঠান; কমিশন বসিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর টানের জোর দেখান। কিন্তু টাকার জন্যে যখন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি একহাত ঘোমটা টেনে কানে তুলা দিয়ে অন্দর মহলে

ঢুকলেন, আর টু শব্দটি নেই! তারপর বেগতিক দেখে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন বাঙলা সরকারের ঘাড়ের উপর। বাস্তবিক ভারতসরকারের ব্যবহারের কথা ভাবলে কালো কুচকুচে সাঁওতালও বোধ হয় লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ধরুন এইযে এতবড় দুটো বাঙালী তাঁদের কত বর্ষের কত কষ্টের সঞ্চিত রাশি রাশি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ঢেলে দিলেন একটা খাঁটি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে—কিন্তু সরকার সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্যে ক'পা এগিয়েছেন? বিশ্ববিদ্যালয় কতবার ছুটে গেছে সিমলে পাহাড়ের দেবতাদের কাছে, কিন্তু তাঁরা পাথরের মত নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকলেন; কথা যে কয়বার কয়েছেন, অছিলা আর ন্যাকামীর অভিনয় ছাড়া সে আর কিছু নয়।

আজ বাঙলার শিক্ষাদপ্তর বাঙালী মন্ত্রীর অধীনে। প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় মন্ত্রী। পুলিশের দপ্তর নয়, জমিদারীরও দপ্তর নয়, এমন কি আইনের দপ্তর নয়, শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে বসবার তাঁর দাবী কবে যে মাটী ফুঁড়ে উঠল তা'ত আমরা ভেবে পাচ্ছি না। সত্যিকথা বলতে গেলে, রাউলাট রিপোর্ট সই করার পর থেকে তাঁকে আমরা স্নেহের চক্ষে দেখতে পারি নি, মানুষ আমরা, তাঁকে ক্ষমাও করতে পারি নি। বোম্বাই তার সাধের পারাঞ্জপেকে মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে; আর আমাদের বাঙলা দেশে প্রভাসচন্দ্র ছাড়া আর শিক্ষা-মন্ত্রী জুটল না, এটা বাঙলার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হবে। তাঁর হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এই আক্রোশের কারণ কি তা, আমরা এখনও সমঝে উঠতে পারি নি। তিনি নিজে সব দেখে, সব বুঝে এই পথে অগ্রসর হচ্ছেন এটা বল্লে বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে কিছু বেশী দাবী করা হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা তিনি স্মরণ রাখবেন, যে তিনি যদি সত্যই এই ভাঙার কাজে ব্রতী হয়ে থাকেন, দেশ তাঁকে কখনও ক্ষমা করবে না। কৌন্সিলের ভিতর জনকয়েকের মাথানাড়া, বা নিজেদের দরবারে নিজেদের হাত-তালি দেশের অভিমত বলে তিনি যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। শুধু জেদের বশে অত বড় একটা সৌধ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা পাপ বলেই গণ্য হবে। "গলদ আছে" "গলদ আছে" বলে চীৎকার করে গলা ফাটালে চলবে না, কি কি গলদ আছে কাগজ কালি আর কলমে তাদের বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠাতে হবে, তার জবাব শুনতে হবে; একসাথে বসে আলোচনা করতে হবে। একি ঘরোয়া ব্যাপার যে খামখেয়ালীর বশে যা' হোক্ একটা কিছু করে ফেল্লেই হ'ল?

অধ্যাপকের, ছাত্রদের, ল্যাবরাটরির যন্ত্রপাতির, এমন কি সেনেট হাউসের ইঁটপাটকেল গুলোরও ব্যবস্থা "বীরবল" করে দিয়েছেন, দেখছি। কিন্তু একজনের ব্যবস্থা তিনি করতে ভুলে গেছেন। যাঁর এই তেত্রিশ বছরের হাড় ভাঙা খাটুনিতে বিনা পয়সার সেবায় এই জিনিষটা গড়ে উঠেছে, সেই ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা "বীরবল" কি করেছেন আমরা তা জানতে চাই। দূর থেকে তাঁর সারা জীবনের কাজ দেখে আমাদের মনে তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণা হয়েছে যে, তিনি কখনও কাহারও মুখের দিকে তাকিয়ে চলেন নি। তা' যদি তিনি চলতে পারতেন, কি সরকারের কি অন্য লোকের, তা' হ'লে তাঁর কর্ম্মের ধারা বিভিন্ন পথে ধাবিত হ'ত। আজ তাঁর নিজের হাতে গড়া দেবতাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্যে কত লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা সেটাকে ভাঙতে পারুক্ বা পারুক্, তাঁর আসন তাদের চেয়ে অনেক উচ্চে। দ্বেষবিদ্বেষের কোলাহল যখন কালের স্রোতে ভেসে চলে যাবে, তখন তাঁর যশ বিমল হয়ে ঝলমল করবে, আর লোক তখন একথা বলতে ভুলবে না যে এ কর্ম্মীর জন্ম হওয়া উচিত ছিল পঞ্চাশ বছর পরে।

প্রবাসী বাঙালী।

ডাক্তারী ব্যবস্থা

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

আমার দেশ—ডাক্তারবাবু, এই সবটা হালুয়াই কি আমাদের খেতে হবে ?

ডাক্তার—হ্যাঁ—নিশ্চয় !

আমার দেশ—মা বল্‌ছিলেন—এসব না দিয়ে—ভাতের ব্যবস্থা কর্‌লে——

ডাক্তার—না না—যা' বল্‌ছি তাই কর—লক্ষ্ণৌ থেকে আরও হালুয়া আস্‌চে ভাব্‌না কি তোমাদের—?

ছিটে-ফোঁটা

শাস্ত্রী অতি সস্তাদরে সাম্যনীতির মন্তরে,
জাহাজ বোঝাই কচ্চে স্বরাজ, অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে।

* * *

বঙ্গে দিয়ে বাঙ্গলা ভাষা, কচ্চে কেরে দণ্ডিত্ ?
সর্ব্বনাশ ! মাষ্টারেরা শেষ্‌টা হবে পণ্ডিত ?

* * *

শক্তি-বশে প্রাণটা তাজা উপবাসে, হর্ত্তালে ;
ভক্তি-রসে কানটা ঝাঁ ঝাঁ, স-মৃদঙ্গ কর্ত্তালে।

* * *

টকিয়ে যথা দুধেতে দই, রসের ভাঁড়ে মগ্ন,
ঠকিয়ে পায় স্বার্থে খ্যাতি, সভ্যজাতি অগ্ন।

* * *

পেঁচিয়ে গড়ি জিলিপি, আর সূক্ষ্ম যত তথ্য ;
পেঁচিয়ে আর চেঁচিয়ে গড়ি স্বরাজ খাঁটি সত্য।

* * *

কি বল্লে ? প্রতিদিন স্ত্রীকে পত্র লেখা অন্যায় ? আমি স্ত্রৈণ ? স্ত্রীকে অত তুচ্ছ কর্‌তে নাই দাদা ! তিনি বলে গেছেন—যেদিন চিঠি পাবেন না সেই দিনই বাপের বাড়ী থেকে এখানে এসে পড়্‌বেন। কাজেই——

* * *

[ছোট ছেলে রাস্তার দিকে চাহিয়া ভুলক্রমে] "বাবা, ও বাবা !" [মা হাসিয়া] "ওরে, বোকা ছেলে ! ও তোর বাবা নয় ; দেখ্‌ছিস্‌নে একজন ভদ্রলোক !"

শোক সংবাদ

(১)

স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি, আই, ই

গত ১৩ই মাঘ সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় স্বনামধন্য, দেশসেবক, খ্যাতনামা রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, সি, আই, ই, পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠনাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল্. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বহরমপুরে ওকালতী আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসা অবলম্বন করিবার প্রথম হইতেই তিনি ঐ ব্যবসায় অতুল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্যবহারজীবের কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈকুণ্ঠনাথ রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেন। বঙ্গ ভঙ্গের সঙ্গে যে স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি ও পুষ্টি, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে প্রাচীনের অনুরাগী বৈকুণ্ঠনাথ স্বদেশী। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আহারে, ব্যবহারে, বেশে স্বদেশী ছিলেন। জাতীয় সম্মিলনের বা কংগ্রেসের তিনি একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। মিসেস্ বেসাণ্ট যে অধিবেশনের সভাপতি হন তিনি সেই বৎসর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক অধিবেশনের বা কন্‌ফারেন্সের তিনি কয়েকবার সভাপতি হইয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। দুঃখী তাঁহার দুয়ার হইতে রিক্তহস্তে কখনও ফিরে নাই। তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠের জন্য তাঁহার বহরমপুরের বাটীতে একটি ছাত্রাবাস করিয়াছেন। সেখানে ২০।২৫টি ছাত্রের সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করিতেন। তাঁহারই দয়ায় আজ কত দরিদ্র ছাত্র মানুষ হইয়াছে।

রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ৯ বৎসর কাল তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন; এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান হন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত উক্ত গুরুভার পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অপরাপর জিলায় বে-সরকারী চেয়ারম্যানের প্রবর্ত্তন হয়।

জন্মস্থান এবং জন্মপল্লীর প্রতি বৈকুণ্ঠনাথের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতি বৎসর ৺ পূজার সময় ২ মাস তথায় বাস করিতেন এবং গ্রামের উন্নতি সাধনে বিশেষ চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বিশুদ্ধ পানীয়ের জন্য গ্রামে কূপ খনন ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং গ্রামের লোকদিগের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দেশের শিল্প উন্নতির জন্য তাঁহার সর্ব্বদাই যত্ন, উদ্যোগ ও অর্থব্যয় ছিল। দেশবিখ্যাত কাশিমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথের সহিত তিনি কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের স্থাপনা করেন। কি প্রকারে দেশের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি সাধন হইবে ও জাতি স্বাবলম্বী হইবে ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি দুইবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের অনেক সৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মত সামাজিক ব্যক্তি আজকাল বিরল; তাঁহার তিরোধানে বঙ্গদেশের একজন দিক্‌পালের পতন হইল, নব্যবঙ্গের এবং বৈদ্যজাতির গৌরব-রবিকর মলিন হইল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সবে ৪০ বৎসর বয়সে আমাদের এই কবি গেল আষাঢ় মাসে তাঁহার লীলা শেষ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের একমাত্র পৌত্র ও শেষ বংশধর। সত্যেন্দ্রের জীবনের বাতি নিভিল,—আর কেহই অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষয়কুমারের বংশে বাতি দিতে রহিল না। কবির প্রথম খ্যাতিতে তিনি কবিকুলতিলক রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য বলিয়া প্রচারিত হয়েন; তিনি গদ্যে বা পদ্যে, ছন্দে বা রচনার অন্য কোন ভঙ্গীতে, শব্দের যোজনায় কিম্বা ভাবের ব্যক্তিতে গুরুর অনুকরণ করিয়া চলেন নাই; সর্ব্বদাই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে 'ঝরণা' নামক পত্রে ঠিক 'ঝরণা' শীর্ষক তাঁহার এক কবিতা পড়িয়াছিলাম; ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে, সেটিকে ঝরণার মত নাচিতে দেখিয়াছিলাম। তাহার কবিত্ব সমালোচিত হইবার সময় আসে নাই, কিন্তু তিনি যে বঙ্গবাণীর একজন প্রতিভাশালী

উপাসক ছিলেন তাহা বলিতে পারি। এদেশের নবযুগে নির্ভীকভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রথম স্রোত

বহাইয়াছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সেই সাহিত্যরথীর পৌত্রটিও এই নির্ভীক স্বাধীন ভাবের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এ কথাটাও উল্লেখযোগ্য যে তিনি অনেক ভাষা শিখিয়া বহুদেশের সাহিত্য হইতে অনেক রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়াছেন।

কবিবর
৺সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি

বঙ্গে নবজীবনের সুপ্রভাতে আজি অকস্মাৎ
মাতৃভূমি করি অন্ধকার
কোথা গেলে দেশবন্ধু জনানন্দ মধুচ্ছন্দা কবি
রসসিন্ধু, হে বন্ধু আমার।
কাব্যরাষ্ট্র-যুবরাজ কোথা গেলে হে কবি-'প্রবার'
রথীদের শিরোচূড়ামণি,
তব শোকবজ্রে আজি কল্পকুঞ্জে জ্বলে দাবানল
দেশভরা হাহাকার ধ্বনি
না হ'তে বোধন মা'র হে পূজারী কোথায় চলিলে
ত্যজি অধিবাসন-সম্ভার?
কার শঙ্খ আমন্ত্রণে দলে দলে জুটিবে সাধক
কে ল'বে শ্রীনান্দীপাঠ-ভার?
জাতীয় জীবনাহবে হোতা, তব, আহুতি ইন্ধনে
পুষ্ট ত্যাগ-যজ্ঞানল-শিখা,
কে রচিবে হোমভস্মে, হে তরুণ-সমাজের গুরু,
তারুণ্যের ভালে জয়টীকা?
মুক্তিতীর্থ-যাত্রিগণ কার গীতে লভিবে পাথেয়,
শক্তি-উৎস, উৎসাহদীপনা?
কার মন্ত্রে অগ্নিমন্থ হবে হায় দেশমাতৃকার,
কার সূক্তে হবে উপাসনা?
স্বদেশের প্রতি ব্যথা তব কাব্যে হ'লো স্পন্দমান
হ'লো বন্ধু, ছন্দোময়ী ছবি।
প্রতি হৃদিস্পন্দ তার অনুভব করিলে অন্তরে
হে মরমী, হে দরদী কবি!

বিম্বিত হইল তব চিত্তাদর্শে জাতীয় জীবন
শ্রেণীবদ্ধ ছায়াচিত্র প্রায়
শুনালে অভয় মন্ত্র অমৃতের পুত্রবৃন্দে পুনঃ
গান্ধীচিত্ততপোবনচ্ছায়—।
তুমি ছিলে বঙ্গমা'র অকুণ্ঠিত কণ্ঠের গৌরব
তুমি তার স্বরূপ বাঙ্ময়
শৃঙ্খলিত দশভুজ আজি তার কণ্ঠও নীরব
দুনয়নে শুধু ধারা বয়।

বাণীর মন্দিরালিন্দে হিন্দু আর মুসলমান দোঁহা
মিলাইলে, প্রেম-পুরোহিত,
গঙ্গা যমুনার সাথে মিলাইলে "সাতাল আরবে,"
'সহজে'রে 'সুফী'র সহিত।
'কল্যাণের' সহ তুমি বিনাইলে 'ইমন'-মাধুরী,
'কাফি' সাথে 'সিন্ধুর' মূর্চ্ছনা,
চামেলী ফুলের সাথে দিলে দূর্ব্বা তুলসী করবী
করিবারে দেবীর অর্চ্চনা।
বঙ্গে নবজাতীয়তা গঠনের প্রজাপতি তুমি
সাহিত্যের নানক-কবীর,
পুরাণের ভক্তিরসে কোরাণের শক্তির মিলনে
তব প্রেম গহন-গভীর।
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তার গর্ভে হেরি মুকুলিত
ভবিষ্যৎ ভারতের আশা,

তোমার সঙ্গীত সুরে, পাবে ঢুঁড়ে, ইস্‌লামহিন্দুর
যুক্তবঙ্গ, অন্তরের ভাষা।

ছন্দের পিঙ্গল তুমি। গৌড়ে দিলে ছান্দোগ্য নবীন
বিরচিলে নব "থেরী গাথা।"
বঙ্গকাব্য-কলাশ্রীরে দিলে নব্য ভঙ্গি অপরূপ
তুমি "সাম্য-সামের" উদ্গাতা।
তোমার মানসকন্যারূপে জন্ম হ'লো, এ ভাষার
হোমভূমে, ছন্দোভারতীর,
শোভি' অঙ্গ শাঁখা শাড়ী আলতায় সিঁদুরে কাজলে
উজলিল মোদের কুটীর।
হে 'স্বচ্ছন্দ', ছন্দঃশ্রীরে দিলে 'মঞ্জুমরালের' গতি
খঞ্জনের আঁখি চপলতা,
খগেন্দ্রের ক্ষিপ্রবেগ কপোতের গ্রীবাভঙ্গি কিবা
নৃত্যে "মত্তময়ূরের" প্রথা।
ছান্দস পিঞ্জরে তব ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী
ঝঙ্কারিল অমৃত-ব্যঞ্জনা
যাদুকর, বশমন্ত্রে কল্পনার সহস্র নাগিনী
ও চরণে লুটাইল ফণা।
তোমার ও চিত্তদ্রুমে কল্পলতা উঠিল জড়ায়ে
প্রসবিল সোনার স্বপন
তোমার মানসহ্রদ-তটে তটে 'পরীদের' লীলা,
কিন্নরীর নূপুর নিক্কন।
বিহরিল কল্পলক্ষ্মী, শিল্পি, তব "বিদ্যুৎ তাঞ্জামে"
'বিদ্যুন্মালা' বিচ্ছুরিয়া নভে,
"বুল্ বুল্-গুল্‌জার" তব কাব্যকুঞ্জ হইল নীরব,—
হায় হায় চিরমূক রবে!

মেঘমল্লারের সনে কে গাহিবে বসন্তবাহার,
'কেকা' সহ 'কুহু'র মিলন?
কার স্পর্শে শুষ্কশীর্ণ পুষ্পবৃন্ত রেখার রঞ্জনে
হবে চারু "তুলির লিখন"?

কে বাজাবে রঙ্গমল্লী? কে গাহিবে বঙ্গের অঙ্গনে
"বেণুবীণা"-মিলনমঙ্গল?
মূর্ত্তিমান মধুমাস, গেলে চলে,—কে ফলাবে আর
কল্পকুঞ্জে ফুলের ফসল?

শততীর্থ হ'তে আনি পুণ্যবারি সাধিয়াছ কবি
অভিষেক বঙ্গভারতীর,
সুধাস্যন্দি তব কণ্ঠে ঝরিয়াছে গোমুখী-ধারায়
জ্ঞানগঙ্গা বিভিন্ন জাতির।
"গঙ্গাহৃদি বঙ্গে" রহি শুনিয়াছি তোমার সঙ্গীতে
সপ্তসিন্ধু-তরঙ্গের তান,
অর্হতের বোধিমন্ত্র, বিশ্বমহাকবিদের বাণী,
তব কণ্ঠে অমৃতায়মান।
মহামানবের ভক্ত মহাপ্রাণ, নর নারায়ণ
চিরবন্দ্য দৈবত তোমার
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে কে তোমারে করিবে বন্দিত?
চিত্ত তব বিরাট উদার।
বৈনতেয়সম তুমি ছুটিয়াছ অমৃত সন্ধানে
দাস্যমোক্ষ—আগ্রহে অধীর,
কৃত্রিম শৃঙ্খলা ভাঙি উড়ায়েছ মৈত্রীর পতাকা
হে স্বতন্ত্র, হে বিদ্রোহী বীর।

প্রবলের উৎপীড়ন নির্য্যাতন দুর্ব্বল-দলন
কোনোদিন থাকনিক' সয়ে',
উগ্ররোষে খড়্গাকরে ভদ্রকালী প্রতিভা তোমার
জ্বলিত যে রুদ্রকালী হয়ে'।
জাতিভেদ, পণপ্রথা, স্পর্শভীতি, বিধবানিগ্রহ,
আভিজাত্য-বিত্ত-অভিমান,
সহিতে পারনি তুমি। বিঁধিয়াছ লেখনীশায়কে
ধন্য তব ন্যায়-অভিযান।
যেখানে কাপট্য শাঠ্য হীনস্বার্থে হেরেছ উদ্যত
দেছ তুমি তীব্র কষাঘাত,

তুমি নাই, মৌনীমূক লাঞ্ছিতের সংসার আঁধার,
ভগুদেব হলো সুপ্রভাত।

হে ঋত্বিক ঋতম্ভর, ঋজুক্রতু, সারস্বতব্রতে
একনিষ্ঠ তুমি তপোধন,
ভারতের ভারতীর আরতির তরে মহামতি
সমুৎসৃষ্ট তোমার জীবন।
প্রাচীন-গৌরব-গাথাগীতাঞ্জলি প্রতিভা তোমার
ভারতের চির আরাধিকা
এ বঙ্গের শমীবনে, হে শমীন্দ্র, পাংশু হতে পুনঃ
সন্দীপিলে পূত "হোমশিখা"।
পিটক-পুরাণ-তন্ত্র-শ্রুতিধারা তব কণ্ঠে মিলে
হলো নবরস-পারাবার,
লভিল নীরস তথ্য মধুমতী সঙ্গীতমূর্চ্ছনা
গীতা,—গীতগোবিন্দ-ঝঙ্কার।
কৃত্তিকা কয়াধূ কুন্তী অরুন্ধতী মেনকার ব্যথা
আজো যে গো হয়নি বিলীন,
সাশ্রুনেত্রে হেরিয়াছ জ্বলে আজো মুম্মুর-দহনে
ভারতের মর্ম্মে নিশিদিন।
প্রজ্ঞান বিজ্ঞান তন্ত্র ইতিহাস সাহিত্য সঙ্গীত
অধিশ্রয় লভি একঠাই,
হে সত্য, সৃজিল তোমা, মূর্ত্তিমান সত্যাগ্রহ, শূর,
সত্যসন্ধ তুমি আজ নাই!
সত্য নাই? মিথ্যা কথা! সত্য যে গো অক্ষয়অমর
না—না—সত্য, তুমি সনাতন,
তোমার চিন্ময়ী সত্তা চিরদিন মৃন্ময়ী মাতার
জাগাইবে অঙ্গ শিহরণ।
সত্যেন্দ্র, তোমার দান অনশ্বর শাশ্বত সম্পদ্
নহে শুধু অলস ঝঙ্কার
এ ত নহে প্রাণহীন রসহীন বচন-রচনা
শুধু আত্মযশের প্রসার।

বজ্রের অক্ষরে তুমি বক্ষে যাহা দিয়াছ দাগিয়া
কেমনে তা, লুপ্ত হবে প্রিয়?
সত্য যাব প্রাণবস্তু, আত্মা যারে দিয়াছে স্বরূপ
সে যে নিত্য,—চিরস্মরণীয়।

হারায়ে লেখনী তব, এ বঙ্গের জীবন সংগ্রাম
হলো আজি পাশুপত-হারা
বিশ্বকবি সভা মাঝে কারে প্রেরি? মোদের গুরুর
কে রাখিবে গৌরবের ধারা?
আশানেত্রে চেয়ে ছিনু তোমাপানে, মনে মনে রচি'
সংকল্পিত বিজয় মঙ্গল,
কত স্বপ্ন গৌরবের, তোমা ঘেরি করেছি বয়ন
আজি সখা সকলি বিফল।
সাহিত্যের সব্যসাচি, জ্যারোপণ তোমার গাণ্ডীবে
করিবার যোগ্য নহি মোরা,
ঝঙ্কারিতে শক্তি নাই, তব তন্ত্রী বক্ষে চাপি শুধু,
ঝরঝর ঝরে অশ্রু ঝোরা।
স্মরি তব সৌম্য মূর্ত্তি নম্রকান্ত, হে বন্ধুবৎসল,
মিতভাষী যশে উদাসীন,
তোমার চরিত্র স্মরি অক্রূরের মতন অক্রূর,
অনবদ্য অবক্র স্বাধীন
ওষ্ঠাধরে চাপি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস পারিনা রুধিতে,
তুষানলে গুমরে অন্তর,
প্রাণের পুঞ্জিত অর্ঘ্য সমারোহে সঁপিতে তোমায়
হায় কই দিলে অবসর?
রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ, অরুন্তুদ মর্ম্মবেদনায়
শোকম্লান লোচন-দর্পণ,
কবিকল্প-স্বর্গে রহি লহ আজি হে অগ্রজদেব,
অনুজের প্রেমাশ্রু-তর্পণ।

শ্রীকালিদাস রায়

আইন আদালত

হজরত মোহানীর মোকদ্দমার বিচারের ফল জানিবার জন্য আমরা উৎসুক ছিলাম। কেননা, উহাতে অনেক আইনের কথা ছিল, কিন্তু এখনও হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হইল না। অন্য দিকে আবার আমাদের কাছের গোড়ায় সার্ভেণ্ট (Servant) কাগজের মাম্‌লা সম্বন্ধেও কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কারণ বড় বড় সাক্ষীদের এজেহারগুলি যত্ন করিয়াই পড়া গিয়াছিল; কিন্তু মোকদ্দমা হাইকোর্টের আপিলের অধীন বলিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। সার্ভেণ্ট কাগজ বলিয়াছিলেন যে, একটি দঙ্গলে পুলিশের লাঠি চলিয়াছিল বলিয়া একটি স্ত্রীলোকের মাথা ফাটে; পুলিশ বলেন যে সেকথা মিথ্যা। বিচারে সার্ভেণ্ট পত্র দণ্ডিত হইয়াছেন। আপিলের পর সকল কথা আলোচনা করিব।

* * *

মৃত বারিষ্টার **জে, এন্, রায়ের সম্পত্তি**-র কর্ত্তাগিরি চালাইবার মোকদ্দমায় হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা ১৮৭২-এর তিন আইন মতে বিবাহ রেজিষ্টারী করেন, তাঁহারা হিঁদুয়ানি প্রভৃতি অনেক প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস মানেন না বলিয়া লিখাইলেও, তাঁহাদের উৎপত্তি হিন্দু সমাজে হইয়া থাকিলে তাঁহারা দায়াধিকার প্রভৃতিতে Hindu Law কর্ত্তৃক শাসিত। হিন্দু-ল কথাটাই ব্যবহার করিলাম, কারণ হিন্দুর বিধি বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দায়াধিকারের প্রাচীন বিধান নাই। এ দেশের সকল প্রাচীন বিধানই এই যে, শাস্ত্র অপেক্ষা সামাজিক রীতির প্রাধান্য অধিক। মোকদ্দমায় বিচার্য্য ছিল যে ব্রাহ্মেরা যখন তাঁহাদের মতবাদ ও বিবাহের অনুষ্ঠানে, নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করেন, তখন এই একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রথার বশবর্ত্তী সুনির্দ্দিষ্ট দলকে, দেশের সাধারণ দায়াধিকারের সূত্রে বাঁধা চলে কিনা। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এইটিকেই আমি বিশেষ বিবেচ্য মনে করি। কথাটার আদৌ বিচার হয় নাই। বোম্বাই হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমায় সূচিত হয় (২৮ বোম্বাই বলামে মুদ্রিত) যে, ১৮৭২-এর তিন আইনে রেজিষ্টারী না করিয়াও জাতিভেদ-না-মানা উন্নতি-শীল ব্রাহ্মেরা বিবাহ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের পুস্তিকাদি হইতে জানা যায় যে এই সমাজে একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স না হইলে বিবাহ হয় না এবং বরকন্যার বিবাহ,—একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamous marriage)। ব্রাহ্ম-পদ্ধতির বিবাহ মন্ত্রে বরকন্যার সমান অধিকারের কথা উল্লিখিত আছে;—নব সংহিতাতেও আছে, ছাপা বিবাহ পদ্ধতিতেও পাওয়া যায়।

শ্রাবণে

ইউরোপের আবহাওয়া—মার্কিনের বিরাগ, ফরাসীর রাগ বা অতিজেদ আর রুশিয়ার হুঁসিয়ারী—এই ত্র্যহস্পর্শে হেগ্-এর বিবাদ-ভঞ্জন সভার কাজ একেবারে অচল হইয়াছে। স্বার্থের ঘর্ষণে আর একটু ব্যথা না জাগিলে কাহারও বিবাদ মিটাইবার থাঁটি চাঁড় হইবে না। আমেরিকা যখন ইংরেজের নিকটে পাওনা টাকা চাহিল, তখন একবার মনে হইয়াছিল, সকলেই টাকার দাবী ছাড়িয়া, নূতন করিয়া ঘরসংসার পাতিয়া বুঝি বিবাদ ভুলিবে। কিন্তু কথা ফুরাইল না; "নটে গাছটি মুড়াইল" বলিতে না বলিতেই, যেমন আমাদের উপকথায় নূতন ছড়া পাই তেমনই শুনিতেছি :—

"কেন ইংরেজ টাকা দাও না ?—"
"ফরাসী যে বাকীদার !"
"কেন ফরাসী বাকীদার ?"
"জর্মানি যে ধার শোধেনা ;"
"ওহে জর্মান্ কর কি ?"
"রুশিয়া যে মাল দেয় না।"

এবারে রুশিয়া বল্‌শেভিকি গর্ত্তের আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিত (মনে মনে বলিতেছেও) যে,

কুটুস্ করে কাম্‌ড়াব,—গর্ত্তের ভিতর লুকাব।

কিন্তু সে প্রকাশ্যে বলিতেছে,—আমেরিকা টাকা ধার দিলেই, সে টাকা বাড়াইয়া টাকা দিবে। আমেরিকার দাবী ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই ঘাড়ে চাপিল দেখিয়া মনে হয় টাকাটা সত্যই পৃথিবীর মত—গোলাকার।

টাকা পাওয়ার সম্পর্কে **ইংরেজ** জর্মানীকে কানে কানে বলিতেছেন যে,—সে যদি নানা রকম রং তৈয়ারীর হদিস্‌গুলি ইংরেজকে বলিয়া দেয়, তবে ইংরেজ তাহার দেনা কিছু-কিঞ্চিৎ মাপ করিতে পারেন। জর্মানি হয়ত ভাবিতেছে যে, ঐ হদিসের এক একটি তাহার সাত রাজার ধন; উহা বজায় থাকিলে, সে অনেক ধার শুধিতে পারিবে।

জর্ম্মানিতে আবার সম্রাট্ বসাইবার হাঙ্গামা ও নরহত্যা চলিতেছে; বিনা রাজায় তাহারা না কি দেশ জাগাইয়া ধনী ও বলী হইতে পারিতেছে না। ফ্রান্স ত গণতন্ত্রের পুরাতন দেশ, তবুও সেখানে এই রব উঠিয়াছে যে, রাজা খাড়া করিতে না পারিলে, আর যেন চলে না। রুশিয়াতেও লোকেরা লেনিনের ব্যবস্থায় কাহিল হইয়া পড়িয়া রাজা খুঁজিতেছে। মানুষে এত রাজা চায় কেন, সময়ান্তরে সে তথ্যের বিচার করিব।

রুশিয়ায় নূতন অরাজক বিধিকে সবল করিবার জন্য, সকল দেশে অরাজকতা বাড়াইবার তদ্বিরের সঙ্কল্পে Zinevieff কে বেহিসাবী টাকা খরচের ভার দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারের গোমস্তারা ঘুস্ দিয়া তদ্বির করিবার পথ পাইলে যেমন দুপয়সা করিয়া লয়, এই পুরুষটিও হয় ত বা তাহাই করিয়াছেন; হিসাব চাহিলে তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলনের জন্য তিনি ভারতে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কথাটা কেহ বিশ্বাস করে নাই। অন্য দিকে আবার তুর্কীস্থানে রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ভারতের "শঙ্করাকে" না ডাকিয়া তুর্কীস্থানের লোকের সুবিধা করা হইল না কেন?

আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ এ বারে হয় ত থামিবে, কারণ বিদ্রোহীরা দলে দলে ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহাদের নেতা ডি, ভেলেরা হয় শীঘ্র ধরা পড়িবেন আর না হয় একেবারে নিরুদ্দিষ্ট হইবেন। এই বিদ্রোহে সুন্দর ডব্‌লিন নগরটি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পাকা খৃষ্টীয়ানেরা মানেন যে, য়িহুদীদের উপর খৃষ্টের অভিসম্পাত আছে যে তাহারা দেশে না থাকিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। এই জন্য মনে মনে অনেকে অসন্তুষ্ট যে উহারা পেলেষ্টিনে রাজ্য বসাইতেছে। তাহা না করিতে দিলেও আরবীদিগকে লইয়া হয় ত অনেক গোল আছে। পেলেষ্টিনে য়িহুদীর ক্ষমতা বাড়িতেছে দেখিয়া, ইংলণ্ডে উহাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে দুইদল দেখা গিয়াছে।

* * *

বঙ্কিম স্মৃতি—যিনি বঙ্গবাণীর নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গদর্শনের সিংহাসনে যিনি সাহিত্য সম্রাটের আসন লইয়াছিলেন, আজ এত দিন পরে সাহিত্য পরিষদে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-মূর্ত্তিতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইল। কিছু হইল ইহাই এখন যথেষ্ট। এত কালের পরে যে বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি দেশের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই বৎসর যে তাঁহার স্মৃতি স্থাপিত হইল, ইহাতে যেন নিয়তির হাত দেখিতেছি। দেশের ভাষা, বিদেশের ভাষার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বড় হইবে, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন ও লিখিয়া গিয়াছেন।

* * *

সিবিল সার্বিসের ছাত্র—এই প্রথম সিবিল সার্বিস প্রার্থীদের পরীক্ষা হইল ভারতে। বাঙ্গালীর সুখ্যাতি ছিল, এদেশের কেন, অন্য দেশের লোকেরাও তাহাদের সঙ্গে পরীক্ষা-পাশে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; এ পরীক্ষায় ত বাঙ্গালীর সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে; নামগুলি দিতেছি, সকলেই দেখিবেন, তিনজন বাঙ্গালী একেবারে তলায়, আর তাহাদেরও দুইজন মাত্র কেবল খাঁটি

বাঙ্গলা দেশের। প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছেন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, আর চতুর্থও সেই মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজের ন্যয়ডু-মুদেলিয়ার-নায়ার প্রভৃতিরা দল পাকাইয়া বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সুবিধা পাইয়া সরকারী কাজে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় তাঁহারা কোথায়? নামগুলি এই :—(১) এম্. এস্. এ. বেঙ্কট সুব্রাহ্মণ্যম্ (২) আর. এ. শিবরামকৃষ্ণ আয়ার (৩) এ. এন্. সপ্রু (যুক্ত-প্র) (৪) পি. এন্. এ. রামস্বামী আয়ার (৫) এ. ডি. গরোয়ালা (বোম্বাই) (৬) পরমানন্দ (মধ্য-প্র) (৭) বি. কে. গুহ (বঙ্গ) (৮) এ. মুখোপাধ্যায় (বেহার-ওড়িষ্যা) (৯) এস্. এন্. গুহ রায় (বঙ্গ)।

* * *

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গলা—বাঙ্গলা জানেন বলিলে লজ্জিত হয়েন, এবং বাঙ্গলা পড়িয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে অপমানিত হয়েন, এখনও এমন কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির নাম আমি নিজে জানি; শুনিয়াছি তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী। এ দলের লোক এখনও অনেক আছেন বলিয়াই, সার আশুতোষের বিশ বৎসরের সাধনার ফলটিকে সকলে সমস্বরে মিষ্ট বলেন নাই। লাঞ্ছিত মাইকেল যাহার মধুচক্রের প্রসাদে মধু হইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া যাহাকে বিদেশের কাছে সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রবীন্দ্র যাহাকে পৃথিবীময় আদৃত করাইলেন এখনও এদেশে তাহার বিরোধী আছে। আশ্চর্য্যের কথায়, এটা মহাভারতের যক্ষের একটা প্রশ্ন হইতে পারে। স্বাধীন দেশের সর্ব্বত্রই যাহা চলিতেছে এদেশেও সেই ব্যবস্থা হইল; ইংরেজী শিখিবার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই জানে, এবং তাহার জন্য ভাল ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সার আশুতোষ যে আড়ির দলের চাপে একাজ করেন নাই তাহার সাক্ষী, গত বিশ বৎসরের ইতিহাস। কলেজি শিক্ষায় যখন রচনার ছলে, দেশের ভাষা পড়াইবার ব্যবস্থা হয়, যখন প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটাইয়া "সাহিত্য পরিচয়" সংগ্রহ করান হয়, তখন আড়ির দল বা ভাবের দলের সাড়া শব্দও ছিল না; যখন দেশের ভাষায় এম্ এ পড়াইবার ব্যবস্থা হইল, তখনও বড় বড় পত্রিকায় উহার প্রতিবাদ হইয়াছিল। যাহা হউক এবারে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতেরাই সেনেটের নূতন প্রস্তাবকে বরণ করিয়াছেন।

* * *

তুলার চাষ—ষ্টকহোলম্ সহরে তুলা ব্যবসায়ীদের এক মহাসভা বসিয়াছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধি এই সভায় পৃথিবীর তুলার চাষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের কর্ত্তারা ভারতের তুলার শুল্কের কথা লইয়া এখনও ইংরেজ-রাজমন্ত্রীর কাছে দরবার চালাইতেছেন। দীর্ঘ আঁশের তুলা আমেরিকা হইতে পাওয়া যাইত, কিন্তু মার্কিণেরা এখন

নিজেদের কলেই প্রায় সমস্ত তুলা ব্যবহার করে বলিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মুস্কিল ঘটিয়াছে। অন্যান্য দেশে ছোট আঁশের তুলার কাট্‌তি আছে; এখন ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে এই তুলার চাষ বাড়াইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কিছু সুবিধা হইতে পারে। চীনে, জাপানে ও ভারতবর্ষে ছোট আঁশের তুলা বাড়িলে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুবিধা হইবে আশায় উক্ত প্রতিনিধি মহাশয় তুলার চাষের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এদিকে ভারতবর্ষ জুড়িয়া প্রস্তাব চলিয়াছে যে চর্‌কা চালাইয়া তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করা চাই; তুলার চাষের কথাটা হয়ত এ প্রস্তাবে উহ্য আছে। আসল কথা এই, কি করিয়া বিরাট বাণিজ্য-গ্রাস হইতে ভারতের তুলা রক্ষা করিয়া উহা দেশের কাজে লাগান যায়। নহিলে চর্‌কাও চলিবে না খদ্দরও ফলিবেনা। চাষ বাড়াও, শনি তাড়াও, এবং শিল্পকৌশলে উন্নত হইয়া দাঁড়াও। শীঘ্রই ফিস্‌কল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে; তাহাতে যাহা উপকার হয় হইবে, কিন্তু আমাদের যাহা করিবার আছে, তাহা যেন করিতে না ভুলি।

* * *

চাষের উন্নতি—এক সঙ্গে চাষের ও শিল্পের উন্নতি না হইলে, এদেশের উদ্ধার নাই। কৃষি বিষয়ের শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যেটুকু ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই টুকুকেই কার্য্যকরী করিতে হইলে, চাষের জন্য নানা স্থানে জমী চাই। জমীদারেরা যদি ইহার ব্যবস্থা না করেন, তবে ভাল কাজ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থার বেলায়ই কয়েকজন ভ্রান্ত আত্মদ্রোহী (কিন্তু চটকদার) সমালোচক পাওয়া গিয়াছে; আশা করি সুচতুর জমীদারেরা আত্ম-ঘাতী সমালোচকদের কুহকে পড়িয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিবেন না। বহু ব্যয়ে আস্‌মানী ধরণের আদর্শ কৃষীক্ষেত্র খুলিয়া বেহার গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন যে অনেক অর্থ নষ্ট করা হইয়াছে; তাই সাবরের কলেজ ও অনেক আদর্শক্ষেত্রের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। চতুর ও কর্ম্মদক্ষ জমীদারেরা ও বড় বড় চাষারা, যদি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কাজ করেন, তবে কোন বিভ্রাট না ঘটিয়া ষোল আনা উপকারই হইবে। আপনাদের পায়ে না দাঁড়াইলে কিছুতেই চলিবে না।

* * *

ব্যবস্থাপক সভা—এমাসে ব্যবস্থাপক সভা খুলিবার সময়, গবর্ণর বাহাদুর কয়েকটি পাকা কথা সোজা ভাষায় বলিয়াছেন। একটা কথা এইযে, সমালোচকেরা ভাবেন যে, যাঁহার বা যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা, তাঁহারাই করিতেছেন টাকার অপব্যবহার, আর টাকাটা সমালোচক-

দের হাতে পড়িলে হইতে পারিত সদ্ব্যবহার। টাকা কমাইতে হইবে, এবং কাজ ভাল করিতে হইবে, এটা কতদূর সম্ভব, তাহা কাজ করিবার লোকেরাই বুঝিতে পারে। স্বাস্থ্যবিধা সম্পর্কে লাট্‌সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে, খুব বড়লোকের মন-গড়া হইলেও কোন উপপত্তির বা theory-র নামে একেবারে অনেক টাকা ঢালা মূর্খতা। উপপত্তির কামানে, অনেক টাকা ঢালাইলেই মশারা মরিবে কি না, আর মরিলেই মেলেরিয়া মরিবে কি না, তাহার খাঁটি প্রমাণ না পাইলে, টাকা খরচ ব্যর্থ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ফরেষ্টার সাহেবের প্রস্তাবটা আমরা একবার বিশেষ উপেক্ষা করিয়াছিলাম; ভাবিয়া দেখিলাম যে, মেম্বারদিগকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা ভাতা দিলে যথার্থই দরিদ্র অথচ যথার্থ হিতৈষীদের পক্ষে মেম্বর হওয়ার সুবিধা হয়। মিনিস্টারদের মাহিয়ানা কিছু কিছু কাটিয়া এই ভাতার টাকার আংশিক ব্যবস্থা করাই ভাল। সখের মেম্বারের পরিবর্ত্তে, একদিন খাঁটি মেম্বারেরা দেখা দিবেন ও দেশের ভাষায় বিচার চলিবে, এই সুখময় ভবিষ্যতের কথা এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন।

* * *

* * *

ভারতবাসীর প্রাণের পরিচয়—আমেরিকাবাসী মার্টিনেট নিছক পায়ে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিবেন বলিয়া বিনা সম্বলে ১৯২০ সনের ১৯শে এপ্রেল তারিখে দেশ হইতে বাহির হন, এবং গত ৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শুনিতেছি, ইনি প্রতিদিন ৪০ মাইল করিয়া পথ হাঁটিয়াছেন।

মার্টিনেটকে—বিলাতের কোন দেশে তাহার ঘর, সে ঠিক কি খেয়ালে পায়ে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিতেছে, ভারতের জনসাধারণ এ কথা জিজ্ঞাসাই করিতেছে না; ভারতবাসীরা দেখিল, যে একজন খালি পায়ে, খালি মাথায়, ছেঁড়া কাপড়ে নিঃসম্বলে এই বিপুল পৃথিবী ঘুরিতেছে, অমনি তাহারা তাহাকে সাধু বলিয়া পূজা করিয়াছে। ইউরোপীয়েরা বিস্মিত যে এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণের কেহ নয়, বরং ম্লেচ্ছ যবন দলের একজন, তবুও কেবল ভগবৎ মাহাত্ম্যে ও বৈরাগ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসীরা তাঁহাকে সাধু মহাত্মা বলিয়া পূজা

রিতেছে, এবং জাতিভেদে কিছু বাধিতেছে না। এখনও ভারতের খাঁটি প্রাণ ত্যাগের শ্রেষ্ঠ ও সাধুতার নামে মুগ্ধ ইহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত। ভারতকে যে গৌরবের ঠাটে চমকাইতে পারা যায় না, ক্ষমতার দাপটে ভক্ত করা যায় না,—ইউরোপীয়েরা ইহার প্রমাণ

ভূ-পর্য্যটনরত

হিপোলাইট মার্টিনেট ও তাহার সঙ্গী

পাইয়াও কথাটা ভুলিবেন কি? হাজার হাজার দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র এই নিঃসম্বল যবনের পাদস্পর্শ করিতেছে, আর যাহারা ক্ষমতায় দীপ্ত ও অনুগ্রহের আধার, তাঁহাদিগকে দূর হইতেও সেলাম করিয়া বিপদ ভঞ্জন করিতে চায় না, ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হয়েন।